ষষ্ঠ অধিবেশন

কার্য্য-বিবরণ

(দিনাজপুর)

দিনাজপুর-সাহিত্য-সম্মিলনের সম্পাদক

শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এম্ এ, বি এল

কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

১৩২৪

সূচী

বিষয়	পত্রাঙ্ক

সাহিত্য-সম্মিলন

ষষ্ঠ অধিবেশন

দিনাজপুর।

সূচনা

এই সম্মিলনের মালদহ-অধিবেশনের পরে দিনাজপুর নগরে পরবর্ত্তী অধিবেশন আহূত হইবার সম্ভাবনা ছিল; কিন্তু অনিবার্য্য কারণে তাহা হইতে না পারায় গৌহাটী-কামাখ্যায় ৬।৭ এপ্রিল (১৯১৩) সম্মিলনের পঞ্চম অধিবেশন সম্পন্ন হয়। দিনাজপুর নগরে সম্মিলনের ষষ্ঠ অধিবেশন আহ্বানের ব্যবস্থা করিবার নিমিত্ত উহার স্থায়ী সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী মহাশয় স্বয়ং উপস্থিত হইলে জনসাধারণের উদ্যোগে ৩০শে মাঘ (১৩১৯) ১২ই ফেব্রুয়ারী (১৯১৩) অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকার সময় স্থানীয় ডায়মণ্ডজুবিলি-থিয়েটার-গৃহে এক সাধারণ সভা আহূত হয়। এই সভায় দিনাজপুরের শ্রীল শ্রীযুক্ত গিরিজানাথ রায়বাহাদুরের সভাপতির আসন গ্রহণ করিবার কথা ছিল, কিন্তু অসুস্থতা-নিবন্ধন তিনি সভায় উপস্থিত হইতে না পারায় শ্রীযুক্ত কুমার শরদিন্দুনারায়ণ রায়সাহেব

এম, এ, প্রাজ্ঞ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। এই অধিবেশনে নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি গৃহীত হয়—

প্রথম প্রস্তাব

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত মধুসূদন রায় বি, এল্

সমর্থক—শ্রীযুক্ত ডাঃ হরিচরণ সেন এল্ এম্ এস্

উত্তরবঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনের ষষ্ঠ অধিবেশন আগামী গুড্‌ফ্রাইডের অবকাশে দিনাজপুর সদরে আহূত হইবে। এই সংবাদ সম্মিলনের কেন্দ্র-সভার নিকটে উহার স্থায়ী সম্পাদকের মধ্যবর্ত্তিতায় বিজ্ঞাপিত করিয়া উত্তরবঙ্গের ও অন্যান্য স্থানের সাহিত্যিকগণকে যোগদানার্থ আহ্বান এবং যথারীতি এই সম্মিলনের সভাপতি-নির্ব্বাচনার্থ কেন্দ্রসভাকে অনুরোধ করা হউক।

দ্বিতীয় প্রস্তাব

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রকুমার সেন বি, এল

সমর্থক—শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত গাঙ্গুলী বি, এল্

উত্তরবঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনের অধিবেশন-সঙ্ঘটনার্থ নিম্নলিখিত ব্যক্তি-গণকে লইয়া একটি অভ্যর্থনা-সমিতি গঠিত করা হউক। আবশ্যক হইলে অভ্যর্থনা-সমিতির সভ্য-সংখ্যা বৃদ্ধি করা যাইতে পারিবে।

অভ্যর্থনা-সমিতির সদস্য-তালিকায় প্রারম্ভিক অধিবেশনে ১২১ জনের নাম লিখিত হইয়াছিল; এবং শ্রীযুক্ত মহারাজ গিরিজানাথ রায়বাহাদুর সভাপতি, শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এম, এ, বি, এল্ সম্পাদক ও শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রকুমার সেন এম এ বি, এল কোষাধ্যক্ষ নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

তৃতীয় প্রস্তাব

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ চৌধুরী

সমর্থক—শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত বসু

অভ্যর্থনা-সমিতির সদস্যগণের মধ্য হইতে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে লইয়া একটি কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি গঠিত হউক। সম্মিলন-সংক্রান্ত ভিন্ন ভিন্ন বিভাগের কার্য্যনির্ব্বাহের জন্য ভিন্ন ভিন্ন শাখা-সমিতি গঠনের ভার এই কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির উপরে ন্যস্ত করা হইল।

কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সদস্যগণের নাম

শ্রীল শ্রীযুক্ত মহারাজ গিরিজানাথ রায়বাহাদুর সভাপতি।

শ্রীযুক্ত রায় রাধাগোবিন্দ রায়সাহেব
" কুমার পূর্ণেন্দুনারায়ণ "
" টঙ্কনাথ চৌধুরী (মালদুয়ার)
" ছত্রনাথ চৌধুরী "
" ক্ষিতীশচন্দ্র চৌধুরী (বাহিন)
" নগেন্দ্রবিহারী চৌধুরী (হরিপুর)
" করুণাকুমার দত্তগুপ্ত ডিঃ ইঞ্জিনিয়ার
" নগেন্দ্রনাথ সেন ডেঃ ম্যাজিঃ
" যতীন্দ্রমোহন সেন বি, এল
" বিধুভূষণ ঘোষ
" অন্নদাপ্রসাদ দত্ত

শ্রীযুক্ত কুমার শরদিন্দুনারায়ণ রায়সাহেব এম, এ, প্রাজ্ঞ
" রাধাগোবিন্দ চৌধুরী
" শ্রীকান্ত চক্রবর্ত্তী সব্ ইং
" ডাঃ গোপালচন্দ্র গাঙ্গুলী
" মৌঃ ইয়াকুনউদ্দীন আহাম্মদ গভঃ প্লীডার
" রজনীকান্ত বসু
" ললিতচন্দ্র সেন বি, এল
" মধুসূদন রায় বি, এল
" যোগেশচন্দ্র দত্ত বি, এল
" অমূল্যদেব পাঠক বি, এল
" গোবিন্দচন্দ্র সেন

শ্রীযুক্ত হরিচরণ সেন
» বরদাকান্ত রায় বিদ্যারত্ন বি, এল্
» বৃন্দাবনচন্দ্র রায়
» মাধবচন্দ্র সিকদার বি, এল
» রমেশচন্দ্র নিয়োগী
» আশুতোষ গুহ বি, এল
» মুন্সী জেহেরউদ্দীন্
» » আব্দুল খালেক্
» ডাঃ ক্ষেত্রনাথ বন্দোপাধ্যায় এম, ডি,
» যোগীন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এম, এ, বি, এল সম্পাদক

শ্রীযুক্ত ভূপালচন্দ্র সেনগুপ্ত
» দ্বিজেন্দ্রনাথ নিয়োগী বি এ, হেডমাষ্টার জেলা স্কুল
» তারকেশ্বর চক্রবর্ত্তী
» সতীশচন্দ্র রায়
» বরদাকান্ত গাঙ্গুলী বি, এল্
» নরেন্দ্রনাথ লাহিড়া মুন্সেফ
» হেমপ্রসন্ন রায়
» মৌঃ মহাতাবউদ্দীন আহাম্মদ
» শ্বাসকরণ দুগার
» সুরেন্দ্রকুমার সেন বি, এল কোষাধ্যক্ষ

উক্ত কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির ৬ই ফাল্গুন (১৩১৯) ১৮ই ফেব্রুয়ারী (১৯১৩) তারিখের প্রথম অধিবেশনে ৮ই ও ৯ই চৈত্র শুক্র ও শনিবার সম্মিলনের অধিবেশনের দিন স্থির হইয়াছিল, অন্যূন ৫০ জন স্বেচ্ছাসেবক-নিযুক্ত করার নিমিত্ত নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে লইয়া একটি স্বেচ্ছাসেবক সমিতি গঠিত হয়।

স্বেচ্ছাসেবক-সমিতির সদস্যগণের নাম

শ্রীযুক্ত অবিনাশচরণ সেন
» যতীন্দ্রমোহন সেন
» কুমুদনাথ সেন

শ্রীযুক্ত হেমপ্রসন্ন রায়
» লালনচন্দ্র রায়
» যতীন্দ্রনাথ রায়

সম্মিলনের ভিন্ন ভিন্ন বিভাগের কার্য্যের নিমিত্ত নিম্নলিখিত তিনটি শাখাসমিতি গঠিত হয়।

সাজসজ্জা-বিভাগ

সদস্যগণের নাম

শ্রীযুক্ত করুণাকুমার দত্ত গুপ্ত ডিঃ ইঞ্জিনিয়ার
" প্রফুল্লকুমার রায় ওভারসিয়ার
" কেদারনাথ ঘটক

শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী বসু ওভারসিয়ার
" উমেশচন্দ্র ঘটক ঐ
" ললিতমোহন চক্রবর্ত্তী
" শ্রীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

আহার্য্য-বিভাগ

সদস্যগণের নাম

শ্রীযুক্ত বৃন্দাবনচন্দ্র রায়
" কৃষ্ণজীবন চক্রবর্ত্তী
" ডাঃ ব্রজনাথ সান্যাল
" ডাঃ ক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
" বসন্তকুমার সমাজদার
" ললিতচন্দ্র সেন বি, এল্
" উমেশচন্দ্র ঘটক
" অমূল্যদেব পাঠক বি, এল্

শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রনারায়ণ রায়
" বিষ্ণুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য
" ডাঃ গোপালচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়
" তারাপ্রসন্ন রায়
" সীতানাথ ভট্টাচার্য্য
" যোগেশচন্দ্র খাসনবিশ
" পূর্ণচন্দ্র রায়

অভ্যর্থনা-বিভাগ

সদস্যগণের নাম

শ্রীযুক্ত মধুসূদন রায় বি, এল্
" ললিতচন্দ্র রায়
" বরদাকান্ত রায় বিদ্যারত্ন বি, এল্
" যতীন্দ্রমোহন ঘোষ
" সতীশচন্দ্র রায় বি, এল্
" তারকেশ্বর চক্রবর্ত্তী
" ইন্দ্রনারায়ণ ঘোষ
" করুণাকুমার দত্ত গুপ্ত ডিঃ ইঞ্জিনিয়ার
" ভূপালচন্দ্র সেন
" কুমুদনাথ সেন
" হেমপ্রসন্ন রায়

শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র সেন
" বরদাকান্ত গাঙ্গুলী বি, এল্
" যতীন্দ্রমোহন সেন
" নর্ম্মদাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়
" মাধবচন্দ্র শিকদার বি, এল্
" মতিলাল সরকার
" শ্যামাচরণ সেনগুপ্ত
ষ্টেশন মাষ্টার
আসিষ্টাণ্ট ঐ

অভ্যর্থনা-সমিতি কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া উত্তরবঙ্গীয়-সাহিত্যিকগণের মত গ্রহণপূর্ব্বক ১১ই ফাল্গুন (১৩১৯) তারিখে কেন্দ্রসভার কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির তৃতীয় অধিবেশনে মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরী এম, এ, বি, এল্, বি, এ, (ক্যাণ্টাব) বার-আট-ল মহোদয় যথারীতি এই সম্মিলনের সভাপতি নির্ব্বাচিত হন। এই নির্ব্বাচন কেন্দ্রসভার ১৪ই ফাল্গুন (১৩১৯) তারিখের ষষ্ঠ মাসিক অধিবেশনে অনুমোদিত হইলে চৌধুরী মহোদয়কে সভাপতিত্ব গ্রহণার্থ অভ্যর্থনা-সমিতি কর্ত্তৃক অনুরোধ জ্ঞাপন করা হয় এবং তিনি সানন্দে সভাপতিত্ব গ্রহণে সম্মত হন।

অভ্যর্থনা-সমিতির কার্য্য এতদূর অগ্রসর হইলে বঙ্গীয়-সাহিত্য-

সম্মিলনের চট্টগ্রাম-অধিবেশনের দিনও ইষ্টারের অবকাশে নির্দ্দিষ্ট হওয়ার সংবাদ ঐ সম্মিলন-পরিচালন-সমিতির পক্ষ হইতে দিনাজপুর-অভ্যর্থনা-সমিতির নিকটে জ্ঞাপনপূর্ব্বক উত্তরবঙ্গ-সম্মিলনের দিন অন্য সময়ে নির্দ্দিষ্ট করিবার নিমিত্ত অনুরোধ করা হয়। বঙ্গীয়-সম্মিলন-পরিচালন-সমিতি কলিকাতা পরিষদের অনুরোধ অনুসারে এই অভ্যর্থনা-সমিতি তাঁহাদের সম্মিলনের দিন পরিবর্ত্তন করিবার নিমিত্ত চেষ্টা করেন; কিন্তু ১৩১৯ সালের শেষ ও ১৩২০ সালের প্রারম্ভে এমন কোনও সুবিধাজনক অবকাশ পাওয়া যায় না যে, ভিন্ন ভিন্ন স্থানের সাহিত্যিকগণ সমবেত হইতে পারেন। এই অবস্থায় অভ্যর্থনা-সমিতির প্রতিনিধিরূপে শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র দত্ত বি, এল্ মহাশয়কে বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের সভাপতি শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র প্রমুখ সদস্যগণের নিকটে সাক্ষাৎ সমস্ত অবস্থা বুঝাইয়া দিয়াও এই সম্মিলনের দিন একান্তই পরিবর্ত্তন করা সঙ্গত বিবেচিত হয় তাহা হইলে অতঃপর কোন্ দিনে তাহা করা যাইতে পারে ইহা স্থির করিয়া আনিবার নিমিত্ত কলিকাতায় প্রেরণ করা হয়। শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র মহাশয় বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের পক্ষ হইতে এই অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি শ্রীল শ্রীযুক্ত মহারাজ গিরিজানাথ রায়বাহাদুরের নামে প্রেরিত প্রতিনিধির নিকট সমস্ত অবস্থা অবগত হইয়া তাঁহার মারফতে ১২ই ফাল্গুন (১৩১৯) তারিখের লিখিত যে পত্র প্রেরণ করেন তাহার মর্ম্ম নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

"গত ১০ই তারিখ আপনাদিগকে যে পত্র লেখা হইয়াছিল, তাহাতে ইষ্টার বাদ দিয়া অন্য সময়ে উত্তরবঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলন আহ্বান করিবার জন্য আপনাদিগকে অনুরোধ করা হইয়াছিল, কিন্তু যোগেশ বাবুর নিকট যাহা শুনিলাম তাহাতে বোধ হইল যে, এখন আর উপায় নাই। সুতরাং যদি আপনারা উপযুক্ত বিবেচনা করেন তাহা হইলে ইষ্টারের ছুটীতেই সম্মিলন আহ্বান করিবেন। তবে একথাও আমাদের বলা আবশ্যক যে, সম্মিলন-

পরিচালন-সমিতির অধিকাংশ বিদ্বজ্জন চট্টগ্রাম যাইতে বাধ্য হইবেন; এবং তজ্জন্য আপনারা ক্ষুণ্ণ হইবেন না। এরূপস্থলে ইষ্টারের ছুটীতে দিনাজপুরে সভা না হইলেই ভাল হয়।"

উল্লিখিত পত্রখানি অভ্যর্থনা-সমিতির ১৪ই ফাল্গুন (১৩১৯) তারিখের অধিবেশনে বিবেচনার্থ উপস্থিত করা হইলে নানা আলোচনার পর স্থির হয় যে, "পূর্ব্ব সভাতে আগামী ৮ই ও ৯ই চৈত্র শুক্র ও শনিবার সম্মিলনের অধিবেশন হওয়ার যে প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছিল ঐ প্রস্তাবই স্থির রহিল; এবং আগামী ৮ই ৯ই চৈত্র তারিখে সম্মিলনের অধিবেশনের আবশ্যকীয় আয়োজন করা হউক।"

এরূপ নির্দ্ধারিত হওয়ার পরে বিজ্ঞানাচার্য্য ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র রায় পি, এইচ্, ডি, প্রমুখ কতিপয় কলিকাতার সাহিত্যিকের স্বাক্ষরিত ও ১৩ই ফাল্গুন (১৩১৯) তারিখে লিখিত নিম্নোক্ত পত্র অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতির হস্তগত হয়।

"মান্যবর মহারাজ

শ্রীযুক্ত গিরিজানাথ রায় বাহাদুর

উত্তরবঙ্গ-সহিত্য-সম্মিলনের অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি

মহাশয় সমীপেষু।

সবিনয় নিবেদন

আগামী ইষ্টারের ছুটীতে চট্টগ্রামে সাহিত্যাচার্য্য শ্রীযুক্ত অক্ষয় চন্দ্র সরকার মহাশয়ের নেতৃত্বে বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের ষষ্ঠ অধিবেশন হইবে বলিয়া স্থির হইয়াছে। আমরা অবগত হইলাম যে, ঠিক ঐ সময়েই দিনাজপুরে উত্তরবঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনের এক অধিবেশন হইবে।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনেয় স্তবঙ্গের সমস্ত সাহিত্যিক সমবেত হন, ইহাই

প্রার্থনীয়। কিন্তু একই সময়ে দুইস্থানে অধিবেশন হইলে কোনটিতেই উপস্থিত সভ্যের সংখ্যা আশানুরূপ হইবে না।

সাহিত্য-সম্মিলন উপলক্ষে বঙ্গদেশকে দ্বিখণ্ডিত করা কখনই বাঞ্ছনীয় নয়। কিন্তু যদি একই সময়ে দুইস্থানে দুইটি সম্মিলন হয় তাহা হইলে কার্য্যতঃ তাহাই ঘটিবে। সমস্ত বঙ্গের শ্রদ্ধা ও সম্মানের পাত্র মহারাজ বাহাদুরের নেতৃত্বে সাহিত্যিকদিগের এইরূপ কার্য্য হওয়া অত্যন্ত ক্ষোভের বিষয় হইবে। আমরা সকলে মহারাজবাহাদুর ও দিনাজপুরের জন-সাধারণের নিকট সবিনয়ে প্রার্থনা করি, আপনারা অনুগ্রহপূর্ব্বক উত্তর-বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনের দিন পরিবর্ত্তন করুন।

আপনাদের কার্য্য কিছু অগ্রসর হইয়াছে বটে, এবং স্থানে স্থানে নিমন্ত্রণ-পত্রও প্রেরিত হইয়াছে বটে, কিন্তু সমস্ত অবস্থা বিবেচনা করিয়া যদি আপনারা উত্তরবঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনের দিন পরিবর্ত্তিত করেন তাহা হইলে আমরা বিশেষ অনুগৃহীত হইব। ইতি ১৩ ফাল্গুন, ১৩১৯।"

এই পত্রের উত্তরে অভ্যর্থনা-সমিতির পক্ষ হইতে উহার সম্পাদক মহাশয় প্রাগুক্ত সাহিত্যিকদিগকে যে সুদীর্ঘ পত্র প্রেরণ করেন নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করা হইল।

অশেষ শ্রদ্ধাভাজন মান্যবর ডাক্তার

শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায় প্রমুখ

বিদ্বন্মণ্ডলী সমীপেষু—

সসম্মান নিবেদন মেতৎ :—

আপনারা গত ১৩ই ফাল্গুন তারিখের দস্তখতি একখণ্ড পত্র উত্তরবঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনের অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি শ্রীল শ্রীযুক্ত মহারাজা গিরিজানাথ রায়বাহাদুর সমীপে প্রেরণ করিয়াছেন। ঐ পত্রে মহারাজা-

বাহাদুর এবং দিনাজপুরের জনসাধারণের নিকট আপনারা উত্তরবঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনের দিন পরিবর্ত্তন করিবার জন্য অনুরোধ জানাইয়াছেন। আপনাদিগের ন্যায় সাহিত্যজগতের শীর্ষস্থানীয় মনীষিগণের অনুরোধ দিনাজপুরের জনসাধারণের নিকট অলঙ্ঘনীয়। অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত মহারাজা বাহাদুর এবং অভ্যর্থনাসমিতির সকল সভ্যই আপনাদিগের এই যুক্তিসঙ্গত অনুরোধ রক্ষা করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু অবস্থানুসারে এক্ষণে আর দিন পরিবর্ত্তন করা সম্ভবপর কিনা, তাহা পুনরায় বিবেচনা করিবার জন্য অভ্যর্থনা-সমিতি আপনাদিগের নিকট সবিনয় প্রার্থনা জানাইতেছেন। গত তিন বৎসর ধরিয়া দিনাজপুরে উত্তরবঙ্গ-সাহিত্য সম্মিলনের অধিবেশনের প্রস্তাব চলিতেছে। নানা কারণে সে প্রস্তাব এতদিন কার্য্যে পরিণত হয় নাই। বর্ত্তমান বর্ষে শ্রীযুক্ত মহারাজা বাহাদুর নানা কারণে গত শারদীয় পূজার অবকাশের পর হইতে অনেক সময় কলিকাতা থাকিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। এ কারণে উত্তরবঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনের প্রস্তাবিত অধিবেশন তৎপূর্ব্বে ঘটিয়া উঠে নাই। গত ৺সরস্বতী পূজার কিছু পূর্ব্বে মহারাজাবাহাদুর দিনাজপুরে প্রত্যাবর্ত্তন করেন এবং তৎপর দিনাজপুরে সম্মিলনের অধিবেশনের প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করিবার কথা উঠে। তদনুযায়ী জনসাধারণের একটি সভা হইয়া গত ৩০শে মাঘ স্থির হয় যে, আগামী ইষ্টারের অবকাশে দিনাজপুরে উত্তর-বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনের অধিবেশন হইবে। সে সময়ে আমরা জানিতাম না যে, চট্টগ্রামে ঐ সময়ের বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন হইবে। চুঁচুড়ার অধিবেশনে এ কথা স্থির হওয়ার কথা প্রকাশিত হইতেছে; কিন্তু সে সংবাদ আমরা কিছুই জানিতাম না। তৎপর সাহিত্য-পরিষদের পক্ষ হইতে জানান হয় যে, ইষ্টারের অবকাশে চট্টগ্রামে সম্মিলন হইবে, অতএব উত্তরবঙ্গ-সম্মিলন অন্য সময়ে হওয়া উচিত। পরিষদের অনুরোধ অনুসারে আমরা দিন

পরিবর্ত্তন করিবার চেষ্টা করি, কিন্তু বর্ত্তমান বর্ষে এবং আগামী বর্ষেও শীঘ্র এমন কোন সুবিধাজনক দিন পাওয়া যায় না যে, ভিন্ন ভিন্ন স্থানের সাহিত্যিকগণ সমবেত হইতে পারেন। এই অবস্থায় আমরা সাহিত্য-পরিষদের সভাপতি শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র মহাশয় এবং অন্যান্য সভ্যগণের নিকট প্রতিনিধি প্রেরণ করি। আমাদিগের শ্রীযুক্ত যোগেশ চন্দ্র দত্ত মহাশয়ের উপর এই ভারার্পিত হয় যে, যদি পরিষদের সভ্যগণ অন্যদিন অবধারণ করা একান্তই প্রয়োজনীয় বোধ করেন, তাহা হইলে অন্য কোন্ দিনে উত্তরবঙ্গ-সম্মিলন হইতে পারে তাহা যোগেশবাবু পরিষদের কর্তৃপক্ষ-গণের সহিত পরামর্শ করিয়া স্থির করিয়া আসিবেন। পরিষদের কর্তৃপক্ষ-গণ অন্য কোন দিনের উল্লেখ করেন নাই। পরন্তু পরিষদের সভাপতি শ্রীযুক্ত মিত্র মহাশয় পরিষদের পক্ষ হইতে গত ১২ই ফাল্গুন তারিখের দস্তখত একখানি পত্র মহারাজা বাহাদুরের নামে যোগেশ বাবুর সহিত প্রেরণ করেন। সেই পত্রে সভাপতি মহাশয় বিজ্ঞাপিত করেন যে "গত ১০ তারিখ আপনাদিগকে যে পত্র লেখা হইয়াছিল তাহাতে ইষ্টার বাদ দিয়া অন্য সময়ে উত্তরবঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলন আহ্বান করিবার জন্য আপনাদিগকে অনুরোধ করা হইয়াছিল, কিন্তু যোগেশ বাবুর নিকট যাহা শুনিলাম তাহাতে বোধ হইল যে, এখন আর সে উপায় নাই। সুতরাং যদি আপনারা উপযুক্ত বিবেচনা করেন, তাহা হইলে ইষ্টারের ছুটিতেই সম্মিলন আহ্বান করিবেন। তবে একথাও আমাদের বলা আবশ্যক যে, সম্মিলন-পরিচালন-সমিতির অধিকাংশ বিদ্বজ্জন চট্টগ্রাম যাইতে বাধ্য হইবেন। এবং তজ্জন্য আপনারা ক্ষুণ্ণ হইবেন না, এইরূপ স্থলে ইষ্টারের ছুটিতে দিনাজপুরে সভা না হইলেই ভাল হয়।"

এই পত্র পাইয়া অভ্যর্থনা-সমিতি পুনরায় এই বিষয় বিশেষরূপে আলোচনা করেন এবং অন্য কোন সময় অধিবেশন সম্ভবপর নহে এই

বিবেচনায় অনন্যোপায় হইয়া ইষ্টারের অবকাশেই দিন অবধারণ করিতে বাধ্য হন।

চট্টগ্রামের অধিবেশনে সাহিত্যগুরু শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয় সভাপতি হইবেন ইহা বাঙ্গালীমাত্রেরই নিকট গৌরবের বিষয়। সমগ্র বঙ্গের এই সম্মিলনীর গৌরবে আমরা সকলে গৌরবান্বিত। এই সম্মিলনীর সহিত দলাদলি করা বা সাহিত্য-সম্মিলন লইয়া বঙ্গদেশকে দ্বিখণ্ডিত করার অভিপ্রায় আমাদিগের মনে কদাপি থাকিতে পারে না এবং নাই। "নায়কপত্রে" আমাদিগের সম্বন্ধে যে সকল কটূক্তি প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে মহারাজা বাহাদুর এবং দিনাজপুরের জনসাধারণ অতিশয় ক্ষুণ্ণ হইয়াছেন। বিশেষতঃ আপনাদিগের ন্যায় সুধীগণের নামসংযুক্ত পত্রের সহিত ঐরূপ সমালোচনা সন্নিবিষ্ট হওয়ায় অত্যন্ত পরিতাপের কারণ হইয়াছে।

উত্তরবঙ্গের উজ্জ্বলরত্ন মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরী মহাশয় উত্তরবঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনের সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। ইষ্টারাবকাশ ব্যতীত হাইকোর্টে এমন কোন অবকাশ নাই যে, তিনি দিনাজপুরে শুভাগমন করিয়া এই কার্য্যে যোগদান করিতে পারেন। সুতরাং তিনি যে সময়ে আসিতে সক্ষম হইবেন না এইরূপ সময়ে দিন অবধারিত করা পরিচালন-সমিতির পক্ষে কিরূপে সম্ভব হইতে পারে?

উত্তরবঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনে কলিকাতার মূল পরিষদ হইতে প্রতিবৎসর অল্পসংখ্যক প্রতিনিধিই আগমন করিয়া থাকেন। মহাশয়দিগের সকলের চট্টগ্রাম যাওয়া সম্ভবপর না হইতে পারে। উত্তরবঙ্গ হইতে অল্পসংখ্যক ব্যক্তির পক্ষেই চট্টগ্রাম যাওয়া সম্ভবপর হইবে। যাঁহারা চট্টগ্রাম যাইতে পারগ নহেন তাঁহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ দিনাজপুরে আসিলে দুইটা সম্মিলনের কার্য্যই সুন্দর হইতে পারে। আমরা কদাচ সম্মিলন ব্যাপারে

বিরোধ ঘটাইতে প্রস্তুত নহি। আপনারা সমগ্র বঙ্গদেশের সাহিত্যিকগণের পরিচালক। আপনাদিগের নিকট দিনাজপুরের জনসাধারণের পক্ষ হইতে এই মিনতি করিতেছি,—আপনারা দুইটি সম্মিলনই যাহাতে হইতে পারে তাহার ব্যবস্থা করুন। আপনাদিগের উৎসাহ-বাক্যই আমাদিগকে অনুপ্রাণিত করিবে। একই সময় দুইটি কেন, অবস্থানুসারে যত অধিক সম্মিলন হইবে ততই সাহিত্য-পরিষদের এবং বাঙ্গালা-সাহিত্যের গৌরব বর্দ্ধিত হইবে। আপনাদিগের নিকট বিনীতভাবে প্রার্থনা করিতেছি,—সকল অবস্থা বিবেচনা করিয়া আপনারা সচ্ছন্দচিত্তে আমাদিগের এই শুভ-অনুষ্ঠানের সহায়তা করুন এবং মহারাজ বাহাদুরের নিকট যে অনুরোধ-পত্র পাঠাইয়াছেন তাহা প্রত্যাহার করুন। ইতি ১৮ই ফাল্গুন সন ১৩১৯ সাল।

উত্তরবঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনের অভ্যর্থনা-সমিতির পক্ষে
বিনয়াবনত—
শ্রীযোগীন্দ্র চন্দ্র চক্রবর্ত্তী
সম্পাদক।

ইতিমধ্যে নির্ব্বাচিত সভাপতি মহাশয়ের সহিত বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের সভাপতি শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র এম, এ, বি, এল্ মহাশয় সাক্ষাৎ করিয়া রঙ্গপুর সাহিত্য-পরিষদের অনুষ্ঠিত উত্তরবঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনের দিনাজপুর-অধিবেশন ইষ্টারের অবকাশে স্থগিত রাখার জন্য সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করেন। তদনুসারে মাননীয় বিচারপতি চৌধুরী মহোদয় কেন্দ্রসভার সম্পাদকের নামে ২৪শে ফেব্রুয়ারী (১৯১৩) ১২ই ফাল্গুন (১৩১৯) তারিখে ইষ্টারের ছুটীতে সম্মিলনের অধিবেশন স্থগিত রাখার জন্য নিম্নলিখিতরূপ টেলিগ্রাম করেন।

Surendrachandra Roychoudhury Secretary Parishad
Rangpur.

Sarada Babu requests postponement Rangpur Parishad as Sahitya Parishad meets Chittagong during Easter Holidays so please postpone.

Chaudhuri

মাননীয় চৌধুরী মহোদয়ের এই টেলিগ্রামের উত্তরে কেন্দ্রসভার সম্পাদক মহাশয় ১৩ই ফাল্গুন (১৩১৯) তারিখে নিম্নলিখিত পত্র প্রেরণ করেন—

রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষৎ-কার্য্যালয়
১৩ই ফাল্গুন, ১৩১৯ বঙ্গাব্দ।

মাননীয় বিচারপতি

শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরী মহোদয় সমীপে—

নমস্কারপূর্ব্বক বিনীত নিবেদন,—

মহোদয়ের ২৪শে ফেব্রুয়ারী তারিখের টেলিগ্রাম প্রাপ্ত হইয়াছি।

আগামী ইষ্টারের অবকাশে উত্তরবঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনের অধিবেশনের দিন অন্য কোনও উপযুক্ত অবসর বর্ষমধ্যে না থাকায় বাধ্য হইয়া স্থির করা হয়। বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের দিন অন্য সময়ে নির্দ্দিষ্ট করার জন্য আমরা বহুপূর্ব্বে কলিকাতা সাহিত্য-পরিষৎকে অনুরোধ করিয়াছিলাম। বস্তুগত্যা ৪ দিন মাত্র অবকাশ চট্টগ্রাম-সম্মিলনের পক্ষে যথেষ্ট নহে। আমাদিগের সম্মিলনের দিন স্থগিত করিলেও উত্তরবঙ্গ হইতে অতি অল্প লোকই ঐ সম্মিলনে যোগদান করিবে। কেন না চট্টগ্রাম যাতায়াত বহু-ব্যয়-সাপেক্ষ এবং উহার প্রধান আকর্ষণ চন্দ্রনাথ-তীর্থদর্শনের সময় মাত্র

৪ দিন অবকাশে যাতায়াত ও সম্মিলনে যোগদানের পর কিছুতেই কুলাইবে না। এ কারণে আমি শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র মহাশয়কে অনুরোধ করিয়াছিলাম যে, আগামী পূজার অবকাশে ঐ সম্মিলনের ব্যবস্থা করিলে বঙ্গের সকল স্থান হইতে সাহিত্যিক-সমাগমের সুবিধা হইত। এদিকে ইষ্টারের অবকাশে দিনাজপুরে সম্মিলন না করিলে একত্র এমন দুই দিনও ছুটী দেখিতেছি না, যে তাহাতে দেওয়ানী ও ফৌজদারী বিভাগের কর্ম্মচারিগণ যোগদান করিতে সক্ষম হইবেন। আসাম হইতে আমাদিগের যে সকল উৎসাহী সভ্য বর্ষে বর্ষে সম্মিলনে শুভাগমন করেন তাঁহাদের পক্ষে আসাই একরূপ দুর্ঘট হইবে। আপনি সভাপতিরূপে উত্তরবঙ্গে শুভাগমন করিতেছেন ইহা অবগত হইয়া সকলেরই আমাদিগের এই সম্মিলনে যোগদান করার উৎসাহ হইয়াছিল। এরূপ অবস্থায় তাঁহাদিগের অসুবিধা করিয়া অন্যসময়ে সম্মিলন করা সঙ্গত হইবে কিনা বিবেচনা করিবেন। পূজার অবকাশে দিনাজপুর সম্মিলন সফল হইবে না। কেন না এখানে এমন কোনও আকর্ষণ নাই যাহাতে গৃহ, অথবা স্বাস্থ্যকর স্থানে না গিয়া সাহিত্যিকগণ ঐ সম্মিলনে যোগদান করিতে সম্মত হইবেন। ইহার পরবর্ত্তী অধিবেশন কোচবিহার অথবা জলপাইগুড়ীতে হইবার সম্ভাবনা আছে। এই উভয় স্থানেই মার্চ্চ হইতে এপ্রেল মাসেই মহারাজার ও রাজার উপস্থিত থাকার কাল। সুতরাং আগামী সেপ্টেম্বর মাসে সম্মিলন করিয়া ৬ মাস মধ্যে আবার সম্মিলন করা আমাদিগের ক্ষুদ্র-শক্তি পরিষদের পক্ষে অসম্ভব কিন্তু বৃহৎ পরিষদের পক্ষে সহজসাধ্য। বৃহৎ পরিষদের অধিবেশন পূর্ব্বে একবার পূজার অবকাশে মহারাজা শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুরের আলয়ে সঙ্ঘটিত হইয়াছিল।

এই সকল নানা কারণে আমরা দিন-পরিবর্ত্তন করিতে এত অনিচ্ছা প্রকাশ করিতেছি। পূর্ব্ববঙ্গের ঢাকার প্রাদেশিক-সমিতির অধিবেশন

হওয়া সত্ত্বেও যখন কলিকাতা পরিষদের অধিবেশন পূর্ব্ববঙ্গের অন্যতর প্রধান নগর চট্টগ্রামে হইতেছে, তখন এই ক্ষুদ্র সম্মিলন অনিবার্য্য কারণে সেই সময়ে সঙ্ঘটিত হইলে বিশেষ কোনও ক্ষতি হইত বলিয়া মনে হয় না। অবশ্য একই সময়ে তিনটি সম্মিলনের সময় নির্দ্দিষ্ট হওয়ায় বর্ত্তমান বর্ষে বিশেষ অসুবিধার কারণ হইয়াছে; কিন্তু আশানুরূপ লোক সমাগম হইবে না বলিয়া কোনও সম্মিলনেরই জীবননাশ হইতে দেওয়া সুধী-মাত্রেরই কর্ত্তব্য নহে। অপিচ প্রত্যেক স্থান হইতে যাহাতে প্রতিনিধি প্রেরণ করা যাইতে পারে তাহারই ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য। আমরা বহু অনুনয়-বিনয় করিয়া কলিকাতা পরিষদের নেতৃবর্গকে ইহা জানাইয়াছিলাম কিন্তু তাঁহারা কিছুতেই সম্মত হইতেছেন না। উত্তরবঙ্গের উদীয়মান নিজস্ব একটি অনুষ্ঠানে এরূপ ভাবে বাধা প্রদান করিলে আদৌ তাহার অস্তিত্ব থাকিবে কিনা ইহাই চিন্তার বিষয় হইয়াছে। নানা কারণে উত্তর-বঙ্গের নিজস্ব সম্মিলনকে জীবিত রাখিতেই হইবে, ইহা আপনার ন্যায় বিজ্ঞ ব্যক্তিকে বুঝাইতে যাওয়া বাহুল্য মাত্র। উত্তরবঙ্গের এই নিজস্ব অনুষ্ঠানে কেবল উত্তরবঙ্গের ক্ষুদ্র বৃহৎ সকলেরই উৎসাহ। কলিকাতা হইতে সহানুভূতি প্রদর্শিত হইলেও প্রতিনিধি সমাগম খুব কমই হইয়া থাকে। বঙ্গীয় সম্মিলনের বৃহৎ অনুষ্ঠানে সর্ব্ববঙ্গের ন্যায় উত্তরবঙ্গের সহানুভূতি থাকিলেও সাহিত্যিক দীনতাহেতু গমনার্থীর সংখ্যা অতি কম। এরূপ অবস্থায় এক সময়ে দুই সম্মিলন হইলেও কোনও সম্মিলনেরই যে বিশেষ অসুবিধা হইবে তাহা আমার মনে হয় না। আপনার নিকটে প্রেরিত উত্তরবঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনের কার্য্যবিবরণসহ বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের কার্য্যবিবরণে মুদ্রিত প্রতিনিধির উপস্থিতির তালিকা পাঠ করিলেই আপনি এ বিষয়ের সত্যতা উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

আপনাকে সমস্ত অবস্থাই খুলিয়া লিখিলাম। এক্ষণে আমাদিগের যাহা কর্ত্তব্য তৎসম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করিবেন। সম্মিলনের দিন-নির্দ্ধারণের জন্য কেন্দ্রসভায় আপনার মতই অগ্রগণ্য হইবে। কেন্দ্রসভার বিগত অধিবেশনের নির্দ্ধারণের একপ্রস্থ নকল এতৎসহ পাঠাইলাম। আপনার পত্র পাইলে পুনরায় আর একটি অধিবেশন আহ্বান করিয়া দিন স্থির করা হইবে। অবশ্য আপনার নিজের এবং উত্তরবঙ্গ ও আসামের সকল স্থান হইতে প্রতিনিধিগণের আগমনের সুবিধার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া আপনার মত প্রকাশ করিবেন।

দিনাজপুর হইতেও কলিকাতা-পরিষদের এবং আপনার মতামত গ্রহণার্থ শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র দত্ত বি, এল মহাশয় কলিকাতায় গিয়াছেন।

ভবদীয়

শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী—সম্পাদক।

কিন্তু বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন-পরিচালন-সমিতির মত পরিবর্ত্তিত না হওয়ায় এবং কলিকাতার সাহিত্যিকগণের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে ও কেন্দ্র-সভার নির্দ্দেশমত অভ্যর্থনা-সমিতির কার্য্যনির্ব্বাহক-সভা ১৪ই ফাল্গুন (১৩১৯) ৫ই মার্চ্চ (১৯১৩) তারিখে নিম্নলিখিত প্রস্তাব গ্রহণ করেন।

প্রস্তাব

সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থির হইল যে, ভিন্ন স্থানের প্রথিতনামা সাহিত্যিক-বর্গের বিশেষ অনুরোধ উপেক্ষা করা সঙ্গত বোধ না হওয়ায় আগামী ইষ্টারের অবকাশে দিনাজপুরে উত্তরবঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনের অধিবেশন হওয়ার যে প্রস্তাব ছিল তাহা পরিত্যাগ করা হউক।

অতঃপর কার্য্যনির্ব্বাহক-সভা ১৭ই ফাল্গুন (১৩১৯) ৮ই মার্চ্চ (১৯১৩) তারিখে মাননীয় মহারাজ শ্রীযুক্ত গিরিজানাথ রায়বাহাদুরের

সভাপতিত্বে আহূত উহার এক অধিবেশনে স্থির করেন যে, উত্তরবঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনের অধিবেশন আগামী দশহরার অবকাশে ৩০।৩১শে জ্যৈষ্ঠ শুক্র ও শনিবার আহূত হইবে। তদনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন স্থানে আহ্বান-পত্রাদি প্রেরিত হয়।

উত্তরবঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলন, ষষ্ঠ অধিবেশন

কার্য্য-বিবরণ।

উপস্থিত প্রতিনিধিগণ

রঙ্গপুর

শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দে বি, এ, আই, সি, এস্
রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষদের সভাপতি

„ রায় শরচ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বি, এল বাহাদুর
রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষদের সহঃ সভাপতি

„ সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী, রঙ্গপুর সাহিত্য-পরিষৎ ও
উত্তরবঙ্গ সাহিত্য-সম্মিলনের স্থায়ী সম্পাদক

„ ভুজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বি, এ, ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট

„ অবনীচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বি, এ, ঐ

„ বিপিনচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বি, এল, মুন্সেফ

„ যতীন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী বি, এ, সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ডাইরী-ফার্ম্ম

„ মণীন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী জমিদার কুণ্ডী

শ্রীযুক্ত রায় মৃত্যুঞ্জয় রায়চৌধুরী বাহাদুর এম, আর, এ, এস্ জমিদার
„ ভৈরবগিরি গোস্বামী, জমিদার
„ গোবিন্দকেলী মুন্সী ঐ
„ অনাথবন্ধু চৌধুরী ঐ
„ যোগেশচন্দ্র মজুমদার বি, এল্
„ দীননাথ বাগছী বি, এল্
„ উমাকান্ত দাস বি এল্
„ কবিরাজ কন্দর্পেশ্বর গুপ্ত কবিরত্ন
„ পণ্ডিত হরেন্দ্রচন্দ্র কাব্যতীর্থ বিদ্যাবিনোদ
সহঃ সম্পাদক রঙ্গপুর সাহিত্য-পরিষৎ
„ অন্নদাচরণ বিদ্যালঙ্কার ঐ
„ মদনগোপাল নিয়োগী ঐ
„ জগদীশনাথ মুখোপাধ্যায় চিত্রশালাধ্যক্ষ
„ বসন্তকুমার লাহিড়ী সম্পাদক বেলপুকুর, পল্লী-পবিষৎ
„ পূর্ণেন্দুমোহন সেহানবীশ
„ শশিমোহন অধিকারী সম্পাদক “বঙ্গজননী”
„ ধরণীধর অধিকারী
„ মন্মথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রধান কর্ম্মচারী রঙ্গপুর
জমিদার সভা
„ প্রভাসচন্দ্র ঘোষাল রঙ্গপুর-পরিষৎ কর্ম্মচারী
„ কামাখ্যাপ্রসাদ মজুমদার
„ সতীশচন্দ্র নিয়োগী
„ ভুবনমোহন সেনগুপ্ত
„ অনন্তকুমার দাস গুপ্ত পরিষদের চিত্রশিল্পী

শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ চট্টোপাধ্যায়
,, শেখ রেয়াজুদ্দীন আহাম্মদ

রঙ্গপুর সাহিত্য-পরিষদের ছাত্র-সদস্য

শ্রীযুক্ত কালীপদ বাগছী
,, মহেন্দ্রকুমার রায় চৌধুরী
,, সুধীরকুমার রায় চৌধুরী
,, নগেন্দ্রনাথ সরকার, ছাত্র-সভার সম্পাদক
,, ভবশঙ্কর চৌধুরী
,, হরিদাস বাগছী
,, অবিনাশচন্দ্র চৌধুরী
,, মাখনলাল রায়
,, হেমচন্দ্র সমাজদার
,, সুরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য
,, চারুচন্দ্র সরকার
,, ভূপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

মালদহ

শ্রীযুক্ত অধ্যাপক তারকেশ্বর ভট্টাচার্য্য এম, এ
,, বিনয়কুমার সরকার এম, এ
,, প্রমথনাথ মিশ্র
,, রাধিকানাথ সিংহ
,, যতীন্দ্রনাথ মজুমদার
,, রাইকিশোর পরামাণিক, মোক্তার
,, ডাক্তার বৈষ্ণবচরণ দাস

শ্রীযুক্ত নবকুমার মজুমদার
„ শরচ্চন্দ্র দাস (গম্ভীরা গায়ক)
„ কুমুদনাথ লাহিড়ী
„ বিপিনবিহারী ঘোষ বি, এল্ সম্পাদক
জাতীয় শিক্ষা-সমিতি
„ পণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রী
„ রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী
„ ডাক্তার নলিনীকান্ত বসু
„ প্রসন্নকুমার রাহা (উকীল)
„ কালীপ্রসন্ন সাহা (উকীল)
„ ভূতেশচন্দ্র দত্ত (উকীল)

কোচবিহার

শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র মুস্তফী

আসাম

(কামরূপ অনুসন্ধান সমিতির পক্ষ হইতে)

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ তত্ত্বসরস্বতী, এম, এ,
„ গোপালকৃষ্ণ দে, সহকারী সম্পাদক
„ নিশিকান্ত বিশ্বাস প্রধান শিক্ষক গৌহাটী বালিকাবিদ্যালয়
„ আনন্দরাম চৌধুরী লেবরেটারী আসিষ্টাণ্ট, কটন কলেজ

(গৌহাটী সাহিত্য-পরিষদের পক্ষ হইতে)

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন সেন এম, এ, সম্পাদক
„ আশুতোষ চট্টোপাধ্যায় এম, এ,
„ রাজেন্দ্রলাল চক্রবর্ত্তী

শ্রীযুক্ত মীর মোজাম্মিল হোসেন
" প্রবোধচন্দ্র সান্ন্যাল, বি, এ,

শ্রীহট্ট

শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র চৌধুরী, বি, এ,
" পণ্ডিত রমেশ চন্দ্র সাহিত্য-সরস্বতী

বগুড়া

শ্রীযুক্ত বেণীমাধব চাকী বি, এল, গভর্ণমেণ্ট প্লীডার "সীতা-নির্ব্বাসন" প্রণেতা
" রাজেন্দ্রলাল আচার্য্য বি, এ, সবডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট্
" পূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য বি, এ, বি, ই, ডিষ্ট্রীক্ট ইঞ্জিনিয়ার
" ডাক্তার পূর্ণচন্দ্র রায় অনারেরী ম্যাজিষ্ট্রেট্
" ললিতচন্দ্র দাস সেরেস্তাদার মুন্সেফকোর্ট
" নরেন্দ্রনাথ তরফদার শিক্ষক করোনেশন ইনষ্টিটীউসন
" ডাক্তার সুরেন্দ্রচন্দ্র বক্সী সাব এসিষ্ট্যাণ্ট সার্জ্জন "নির্ম্মলা" রচয়িতা
" রমেশচন্দ্র রায়
" রমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য বি, এল,
" নরেশচন্দ্র বসু বি, এল,
" ভবানীচরণ মজুমদার, উকিল
" পার্ব্বতীচরণ ভট্টাচার্য্য
" সত্যভূষণ উপাধ্যায় ছাত্র-সভা
" মহেন্দ্রচন্দ্র সেন "

শ্রীযুক্ত নীলমণি সান্ন্যাল ছাত্র-সভা
,, ভবেশচন্দ্র চৌধুরী ,,
,, যোগেন্দ্রনাথ দে সরকার, বি, এস্‌সি
,, সারদানাথ খাঁন বি, এল
,, সতীশচন্দ্র শর্ম্ম নিয়োগী জমিদার আদমদীঘি
,, যতীশচন্দ্র সান্ন্যাল
,, মতিলাল সেন বি, এল
,, সুরেশচন্দ্র সেন জামালগঞ্জ
,, সুরেশচন্দ্র চৌধুরী, উকীল
,, সুরেশচন্দ্র দাস গুপ্ত বি, এল সম্পাদক-সাহিত্য-সমিতি

রাজসাহী

শ্রীযুক্ত অক্ষয় কুমার মৈত্রেয় পঞ্চানন বি, এল,
,, অধ্যাপক যদুনাথ সরকার এম্‌, এ, পি, আর্‌, এস্‌
,, শ্রীরাম মৈত্রেয়
অধ্যাপক ,, পঞ্চানন নিয়োগী এম, এ সম্পাদক রাজসাহী শাখা সাহিত্য-পরিষৎ
,, ,, রাধাগোবিন্দ বসাক এম, এ
,, ,, রমাপ্রসাদ চন্দ বি, এ, সম্পাদক বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতি

পাবনা

শ্রীযুক্ত মাননীয় বিচারপতি আশুতোষ চৌধুরী, এম, এ, বি, এল, সম্মিলন-সভাপতি

শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ চৌধুরী
,, কালীকান্ত বিশ্বাস

অন্যান্য স্থান হইতে সমাগত সাহিত্যিকগণ।

ঢাকা

শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ রায় (সঙ্গীতাচার্য্য)
,, অধ্যাপক যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার বি, এ,
,, প্রসন্নকুমার বণিক্য

ফরিদপুর

শ্রীযুক্ত রওশন আলী চৌধুরী সম্পাদক (কহিনূর)

কলিকাতা

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন এম, এ, বি, এল্ এটর্নী আট্-ল
,, পাঁচকড়ি বন্দ্যাপাধ্যায় বি, এ সম্পাদক "নায়ক"
,, ব্যোমকেশ মুস্তফী সহকারী সম্পাদক বঙ্গীয়-সাহিত্যপরিষৎ
,, দুর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্রী ঐ
,, অধ্যাপক রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় এম্, এ, পি, আর্, এস্,
,, পণ্ডিত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব বিশ্বকোষ-সম্পাদক
,, জ্ঞানচন্দ্র গুপ্ত এম্, এ আই, সি, এস্
,, সুরেশচন্দ্র সমাজপতি সম্পাদক "সাহিত্য"
,, জলধর সেন সম্পাদক "ভারতবর্ষ"
,, নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত
,, পণ্ডিত অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ

বহরমপুর

শ্রীযুক্ত অধ্যাপক রাধাকমল মুখোপাধ্যায় এম্, এ

কৃষ্ণনগর

শ্রীযুক্ত বীরেশ্বর সেন অবসর প্রাপ্ত ডেপুটী সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট অব পুলিশ

কার্য্য-প্রণালী

৩০শে জ্যৈষ্ঠ শুক্রবার মধ্যাহ্নকাল ১২॥০
ঘটিকা হইতে ৩ ঘটিকা।

১। অভ্যর্থনা সঙ্গীত।

২। মঙ্গলাচরণ।

৩। অভ্যর্থনাসমিতির সভাপতি মহাশয়ের অভিভাষণ।

৪। সভাপতি নির্ব্বাচন।

৫। সঙ্গীত।

৬। সহানুভূতি বিজ্ঞাপকগণের নামোল্লেখ।

৭। সভাপতির অভিভাষণ।

৮। স্বর্গগত সাহিত্যিকগণের নিমিত্ত শোক প্রকাশ।

৯। উত্তরবঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনের স্থায়ী সম্পাদক কর্ত্তৃক বিগত বর্ষীয় কার্য্যাবলীর উল্লেখ।

১০। বিষয় নির্ব্বাচন-সমিতি গঠন।

উত্তরবঙ্গ সাহিত্য-সম্মিলন, ষষ্ঠ অধিবেশনের

কার্য্য-বিবরণ।

প্রথম দিন—৩০ জ্যৈষ্ঠ, ১৩২০ বঙ্গাব্দ।

সময়—১২॥ টা হইতে ৩ টা।

সম্মিলনের অধিবেশন ৩০ জ্যৈষ্ঠ শুক্রবার পূর্ব্বাহ্ণ ৮ ঘটিকার সময় আরম্ভ হইবে এরূপ বিজ্ঞাপিত হইয়াছিল; কিন্তু সভাপতি সহ যে ট্রেণ ৬ টা ৭ মিনিটের সময় দিনাজপুরে পৌছিবার কথা তাহা প্রায় বেলা ১০টার সময় আসায় ৮ টার পরিবর্ত্তে বেলা ১২॥ টার সময় সম্মিলনের কার্য্য আরম্ভ করা হইবে ইহা সহরময় ঘোষণা করা হয়।

যথাসময়ে সভাপতি মহাশয় মোটরগাড়ী যোগে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত মাননীয় মহারাজ গিরিজানাথ রায় বাহাদুর, কেন্দ্রসভা রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষদের সভাপতি শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দে, বি, এ, আই, সি, এস্ মহোদয়দ্বয় সমভিব্যাহারে সভাস্থলে উপনীত হন। বিরাট জন-মণ্ডলী দণ্ডায়মান হইয়া সসম্মানে তাহাদিগকে অভ্যর্থনা করিলেন।

সম্মিলনের পূর্ব্ব অধিবেশনের সভাপতি শ্রীযুক্ত শশধর রায় এম্, এ, বি, এল্ মহাশয় উপস্থিত না হওয়ায় প্রথম সম্মিলনের সভাপতি শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় বলিলেন যে, রঙ্গপুরে উত্তরবঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনের যে প্রথম অধিবেশন হইয়াছিল, সেদিন এই সম্মিলন শক্তিসঞ্চার করিয়া সমস্ত উত্তরবঙ্গে আপন প্রভাব বিস্তার করিবে ইহা বুঝিতে পারা যায় নাই। আজ বঙ্গের প্রধান প্রধান সাহিত্যিকগণ সাহিত্যপোষক মহারাজের আহ্বানে একত্রিত হইয়া মাতৃভাষার সেবা-যজ্ঞে সম্মিলিত

হইয়াছেন দেখিয়া প্রাণের আনন্দের সহিত এই সভার কার্য্য আরম্ভ করিতেছি।

প্রারম্ভিক সভাপতি শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় বি, এল্ মহাশয়ের আদেশে ঢাকা, উয়ারী নিবাসী সঙ্গীতাচার্য্য শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ রায় মহাশয় কর্ত্তৃক মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত প্রসন্নচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয়ের রচিত নিম্নোক্ত মঙ্গলাচরণ গীতি গীত হইল।

জয় জয় সতি সুরভারতি ভারতসুখ-কারিণী,
ইন্দু-কিরণ কুন্দ-কুসুম সুন্দর রুচি-ধারিণী।
ত্বমসি শরণমিহ বুধজন, সকল কলুষ-নাশিনী,
করুণাসিন্ধু বারিবিন্দু দানৈর্ব্বুধ তোষিণী।
ত্বমসি ভারতি সজ্জনগতিরিহ ত্রিতাপ-হারিণী,
ত্বমসি শক্তিরেকভক্তি রত্নমুক্তিদায়িনী।
এহি এহি দেহি দেহি জ্ঞানমাত্মরূপিণী,
দেহি কর্ম্ম দেহি শর্ম্ম ধর্ম্মভাববর্দ্ধিনী।
বাদয় ইহ পুনরহরহঃ সুন্দর পরিবাদিনী,
ভবভৈরব নটদীপক রাগৈর্জ্জন মোহিনী॥

শ্রীযুক্ত গিরিজাভূষণ সোম ও তাঁহার সহকারিগণ দিনাজপুর-রাজ-সভাপণ্ডিত শ্রীযুক্ত সারদাচন্দ্র কাব্যতীর্থ মহাশয় রচিত অভ্যর্থনা সঙ্গীত গান করিলেন—

সারঙ্গ-সুরফাঁকতাল।

গান

স্বাগত হে বঙ্গভূমি-তনয় সকল ;
ভারতের রত্ন সবে বিস্তার মঙ্গল।

হৃদয় ভূমিতে এই প্রীতির আসনে
সুখী কর বসি সুখে নত ভ্রাতৃগণে ॥
ভক্তিপুষ্পে অর্ঘ্য পূত আনন্দাশ্রুজলে
ধর ধর আশুতোষ! ধরহে সকলে ॥
ক্ষমহে আতিথ্য দোষ এস সবে মিলি
সে অমৃত বঙ্গবাণী-পদসেবা করি ॥
সকলের হৃদয় ভরুক সেই সুখে
সকলের ভেদবুদ্ধি যাক তাতে ঢেকে ॥
বিশ্বপতি দয়ারসে সে বঙ্গ রসনা।
গঙ্গাসম সকলের পূরা'ক কামনা ॥

স্থানীয় উকীল শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত রায় বিদ্যারত্ন বি, এল্ মহাশয় তাঁহার স্বরচিত সংস্কৃত স্তোত্র পাঠ করিলেন।

স্তোত্রপাঠ শেষ হইলে শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন সেন গুপ্ত মহাশয় নিম্নোক্ত "অভ্যর্থনা" কবিতা পাঠ করিলেন—

অভ্যর্থনা

কোরাস্

সাহিত্যিক-রথী—এস গো অতিথি,
এস গো তোমরা সবে,
তোমাদের পুণ্য পরশে সবার
এদেশ ধন্য হবে।

বাণীর-ভকত-সন্তান তোমরা
সেবিছ যতনে তায়,
তোমাদের পুণ্য কীর্ত্তিকলাপ
দেশ-বিদেশে গায়।

আরম্ভ।

দিনাজপুরবাসি, মনামদে আজ
মুরজ মন্দিরা বাজাও এস্‌রাজ,
কর সবে মিলে সুমঙ্গল গান
হৃদয়ে বহুক আনন্দ তুফান
এ দিন যেন না বিফলে যায়।

আন সবে ফুল্ল কুসুম তুলিয়া
যূঁই বেলা যাতী চামেলী মতিয়া,
দশদিক গন্ধে ক'রে ভরপূর
কুসুম চন্দন ছিটাও প্রচুর
আতর গোলাপ মাখিয়া তায়।

রোপি রম্ভা তরু প্রতি গৃহদ্বারে
মঙ্গল কলসী রাখ তার ধারে,
চ্যুতপত্র ফুল একত্র গাঁথিয়া
পথ-ঘাট দ্বার রাখ সাজাইয়া
প্রীতি পুষ্পাঞ্জলি লইয়া করে।

দাও উলুধ্বনি পুরনারীগণ
লও আসি সবে করিয়া বরণ
বাণী-পুত্র সবে, যাদের প্রভায়
আলোকিত দেশ—জয়গীতি গায়
ধন্য বঙ্গমাতা অবনী প'রে !

কোরস্

এস গো অতিথি—সাহিত্যিক-রথী
এস গো তোমরা সবে,
তোমাদের পুণ্য পরশে সবার
এ দেশ ধন্য হবে।

বাণীর ভকত সন্তান তোমরা
সেবিছ যতনে তায়,
তোমাদের পুণ্য কীর্ত্তিকলাপ
দেশ-বিদেশে গায়।

যে দেশে এসেছ বাণী-পুত্রগণ,
সে দেশে আছিল বীর অগণন,
আছিল সে দেশে কবি চিত্রকর,
সে দেশে আছিল শিল্পী বহুতর,
বিজ্ঞান-জ্যোতিষ, সে দেশের ভাষা,
সে দেশের জ্ঞান সে দেশের আশা,
কিছু ক্ষুদ্র নহে রাখিও মনে।

কবি নহি আমি নহি চিত্রকর,
সে চিত্র আঁকিয়া দেখাব সুন্দর,
হ'ত কালিদাস রাফেল মিল্টন,
ব্যাস কি বাল্মীকি হোমর বায়রণ,
রুমি টিসিয়ান সাদি, টেনিসন,
কিংবা চিত্রকর চৈন কোন জন,
দেখাইত তারা সে দৃশ্য আঁকিয়া,
শ্রোতা কি দর্শক থাকিত চাহিয়া,
দেহ রোমাঞ্চিত ভাবে গদ গদ
পাইয়া অমূল্য বাণীর-সম্পদ,
আনন্দের ঢেউ খেলিত প্রাণে।

হেথা,

পরিখা প্রাচীর কত সরোবর,
ভগ্ন অট্টালিকা ইষ্টক প্রস্তর,
যুগ যুগান্তের ইতিহাস নিয়া
এখনো তাহারা রয়েছে পড়িয়া,
কত হাসি অশ্রু উত্থান পতন
চিহ্ন রেখে তায় গেছে অগণন
প্রত্নতত্ত্ববিদে দিবে পরিচয়
শতজিহ্ব হয়ে সে সবে নিশ্চয়
কত সে কাহিনী অতীত কথা।

হেথা,

উত্তর গোগৃহে হের কুরুসেনা
ঊর্ম্মিমালা মুখে যেন চূর্ণ ফেণা,

নিনাদিছে শঙ্খ বীর শত শত
হুঙ্কারিছে মত্ত সৈন্য অবিরত
হের পিতামহে ভীষ্ম মহাবীরে
দ্রোণ কর্ণ আদি হের সে দ্রোণীরে,
কি ভীষণ রণ ভাব একবার
একা ধনঞ্জয় প্রতিদ্বন্দী তার!
কি অপূর্ব্ব শিক্ষা অপূর্ব্ব সন্ধান
মূর্চ্ছাগত সেনা সবে হতজ্ঞান
অথচ কেহ না পাইল ব্যথা।

হেথা,

ভগ্ন অবশেষ দেখ আছে প'ড়ে
কালের মাহাত্ম্য জানাইতে নরে
বাণ-রাজপুরী প্রস্তরনির্ম্মিত
কারুকার্য্যে যাহা আছিল খচিত।
ভাব একবার সমৃদ্ধি উহার
কি ছিল, এখন কিবা আছে আর
শত কণ্ঠে যাহা হ'ত মুখরিত
শত দীপালোকে হ'ত উদ্ভাসিত

তাহে,

ঘোর অন্ধকার রাজ্য বিস্তারিয়া
শৃগাল শ্বাপদে বক্ষে আবরিয়া
আর্ত্তনাদ শুন করিছে কত!
দিনাজপুর-রাজ সে পূর্ব্ব পুরুষ
প্রাণনাথ রায় কীর্ত্তিতে নহুষ,

লোক হিতকর শত কার্য্য করি
অমর যাহারা নর-দেহ ধরি।
হের তাহাদের কীর্ত্তি অতুলন
গোপাল মন্দির, কান্ত-নিকেতন,
নানাদেশে যার প্রতিকৃতি নিয়া
রাখিয়াছে সবে আদর করিয়া
শিল্প শোভা যার, সে ভক্তি সম্পদে
পূর্ণ হবে মন শ্রীকান্ত শ্রীপদে
ক্ষণ তরে যার বাসনা যত।
সাহিত্যিক রথী এস গো অতিথি
এস গো তোমরা সবে ;
তোমাদেব পুণ্য পরশে সভার
এ দেশ ধন্য হবে।
বাণীর ভকত সন্তান তোমরা
সেবিছ যতনে তায় ;
তোমাদের পূণ্য কীর্ত্তি কলাপ
দেশ বিদেশে গায়।

অনন্তর অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত মহারাজ গিরিজানাথ রায় বাহাদুর তাঁহার নিবেদন পাঠ করিলেন।

অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতির নিবেদন—

মা বাগ্বাদিনী বীণাপাণি ! আজ অকৃতী সন্তানের হৃদয়-সরোজে উদিত হও মা। তোমার করুণাকণায় উদ্বুদ্ধ হইয়া তোমারই ভক্ত, :তোমারই

সেবক, তোমারই বরপুত্রগণের আবাহন করিতে যেন সমর্থ হই। আজি আমি ধন্য, আজ দিনাজপুরবাসিগণ ধন্য, আজ বীণাপাণির বরপুত্রগণের সমাগমে দিনাজপুর সারস্বত-তীর্থ বলিয়া গণ্য। হে সমাগত সাহিত্যিক ও সাহিত্যানুরাগী সজ্জনবৃন্দ! এই গ্রীষ্মের নিদারুণ আতপতাপে সন্তপ্ত, তদুপরি অসাময়িক বর্ষায় উৎপীড়িত ও প্রবাসের নানা অসুবিধা অভাবের মধ্যে ক্লিষ্ট হইয়াও আপনারা যে এখানে পদার্পণ করিয়াছেন, তজ্জন্য আমরা কৃতার্থবোধ করিতেছি। কিন্তু প্রকৃত সাহিত্য-সেবার উপচারে অনভ্যস্ত আমাদের ন্যায় অসাহিত্যিকের নিকট আপনাদের কতই অসমাদর, কতই অসুবিধা ও কতই কষ্ট হইতে পারে, আশা করি আপনাদের স্বভাবসিদ্ধ ঔদার্য্যগুণে আমাদের সকল ক্রটী মার্জ্জনা করিবেন। এত অসুবিধা, এত অযোগ্যতার মধ্যেও আমরা আজ আপনাদিগকে কেন আহ্বান করিতে সমর্থ হইয়াছি, কেন আমরা এই দুঃসাহসের পরিচয় দিতে অগ্রসর হইয়াছি, তাহার কারণ আমরা জানি, আপনাদের সেবা করিলে—আপনাদের পরিচর্য্যা করিলে বীণাপাণি সরস্বতীরই পূজা করা হয়। যাঁহারা উন্নত-চিন্তায় ও উদ্দাম-আকাঙ্ক্ষায় মানস-আকাশে বিশ্ব-প্রেম অনুভব করিতে পারেন, কল্পনার-রাজ্যে যাঁহারা বাস্তবতা আনিতে উপযুক্ত, জ্ঞানবিজ্ঞানের সঙ্গমে যাঁহারা দেশভক্তি ও মাতৃভাষার বিকাশ করিতে সমর্থ, সংসারের কল্লোল-কোলাহল মধ্যে অশান্তিকর বিষয়লিপ্সার পার্শ্ব দিয়াও যাঁহারা ভাবরাজ্যে, জ্ঞানরাজ্যে ও প্রেমরাজ্যে বিচরণ করিতে অধিকারী, খরতর জ্ঞানজ্যোতির মধ্যেও যাঁহাদের হৃদয়-সরসী প্রেমের শান্তিময় কুসুম-সৌরভে আমোদিত,—তাঁহারা যে ভগবান্ পঞ্চাননের আত্মপ্রসাদের ন্যায় আমাদের পূজার উপযুক্ত সম্ভার না থাকিলেও সামান্য বিল্বদলে প্রীত ও হৃষ্ট হইবেন, এই বিশ্বাসে আজ দিনাজপুরবাসী তাঁহাদিগকে আহ্বান করিতে সমর্থ হইয়াছেন। অতিথি

নারায়ণ, বিদুরের খুদেও নারায়ণ সন্তুষ্ট হইবেন, তাহা আমরা ভক্তির সহিত ও আনন্দের সহিত বলিতে পারি।

আপনাদের শুভাগমনে আমাদের কতই স্মৃতি, কতই অতীত কীর্ত্তি, কতই আর্য্যগীতি স্মরণ হইতেছে। করতোয়া ও মহানন্দার মধ্যবর্ত্তী এই দিনাজপুর-ভূভাগ একদিন আর্য্য ও প্রাচ্যের মিলন-রঙ্গস্থলী বলিয়া ধন্য হইয়াছিল। এখানকার 'সদানীরা' যদিও এখন বর্ষা ব্যতীত স্রোতস্বতী বলিয়া গণ্য নহে; কিন্তু স্মরণাতীত বৈদিক যুগে ইহাই নিত্য জলসিক্তা পবিত্রসলিলা 'সদানীরা' বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছিল, ইহারই তীরে প্রাচ্যের সহিত প্রতীচ্য আর্য্য-সমাজের প্রথম মিলন হইয়াছিল। প্রাচীন-কালে এই স্থানই জ্যোতিষিক ও কোটিবর্ষ বলিয়া পরিচিত ছিল। এই স্থানেই খৃঃ পূঃ ৩য় শতাব্দে জৈন ও বৌদ্ধসম্প্রদায়ের কোটিবর্ষীয় নামক শাখার উদ্ভব হইয়াছিল। এই কোটি-বর্ষই বাণরাজাদিগের এক সময়ে লীলাস্থলী ছিল। বাণরাজবংশের যত্নে এখানকার শিল্পকলার যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছিল তাঁহাদেব যত্নে এখানে নানা স্থানে কতই দেব-কীর্ত্তি—কতই দেবসৌধ নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাঁহাদের সেই কীর্ত্তিসৌধ কালের করাল-কবলে নিপতিত হইয়াছে বটে, কিন্তু এখনও সেই বিরাট ধ্বংসের মধ্যে অতীত শিল্পের যে উজ্জ্বল নিদর্শন রহিয়াছে, তাহা সভ্যজগতের নিকট গৌড়-শিল্পের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত বলিয়া গণ্য হইতে পারিবে। সেই বাণবংশ ও গৌড়ের পালবংশের বহুকীর্ত্তির ধ্বংসাবশেষ এই দিনাজপুর জেলার নানা স্থানে বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। এই বিরাট্ ধ্বংসাবশেষ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া পুরাতত্ত্ব-উদ্ধারের এত দিন উপযুক্ত আয়োজন হয় নাই। সম্প্রতি "বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতি" সেই গুরুতর কার্য্যভার গ্রহণ করিয়া কেবল গৌড়-বঙ্গবাসী বলিয়া নহে, প্রত্নতাত্ত্বিক ও সমস্ত শিল্পকলাবিদের ধন্যবাদের পাত্র ও আমাদের পরম কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। এখানে যেমন অতি

পূর্ব্বকালে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মিলন হইয়াছে, সেইরূপ এখানে তৎপরবর্ত্তী কালেও ভারতের বাহিরে পূর্ব্ব-উপদ্বীপের প্রান্তে সুদূর চীনসমুদ্রতটবর্ত্তী অধুনা কাম্বোডিয়া নামে পরিচিত সুপ্রাচীন কম্বোজের রাজবংশেরও সম্বন্ধ ঘটিয়াছিল, অদ্যাপি দিনাজপুর-রাজবাটীতে রক্ষিত সেই কাম্বোজা-ন্বয়ের শিলালেখ হইতে তাহার স্পষ্ট নিদর্শন পাইতেছি। চীন-সমুদ্রকূল-বর্ত্তী কম্বোজ হইতে বর্ম্মনৃপতিগণের শত শত শৈবকীর্ত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে। সেই শৈব-রাজবংশই সম্ভবতঃ কেহ কেহ এই দিনাজপুর অঞ্চলে আসিয়া শিবমন্দির প্রতিষ্ঠার সহিত কাম্বোজীয় শৈবকীর্ত্তি-স্থাপনের আয়োজন করিয়াছিলেন। সেই কাম্বোজবংশই পরবর্ত্তী জনপ্রবাদে পরম শৈব বাণরাজ-বংশ বলিয়া গণ্য হইয়াছে কিনা তাহা ঐতিহাসিক ও পুরাবিদ্‌গণের বিশেষ ভাবে চিন্তনীয়। সম্ভবতঃ তাঁহাদেরই আধিপত্যকালে ভারত-বহির্ভূত প্রাচ্যভূভাগের বহুজাতি এই জেলায় উপনিবিষ্ট হইয়াছিল। এখনও তাহারা এই জেলার নানাস্থানে বাস করিতেছে। এই সকল জাতির প্রকৃত তত্ত্বোদ্ধারও আপনাদের একটি কর্ত্তব্য। উক্ত কাম্বোজবংশের সমকালে বৌদ্ধপালরাজবংশেরও এখানে যথেষ্ট প্রভাব ও প্রতিপত্তি বিস্তৃত হইয়াছিল, তাঁহাদের কীর্ত্তির নিদর্শন এই জেলার নানাস্থানে অদ্যাপি বিদ্যমান রহিয়াছে। এখানকার বুদালস্তম্ভে উৎকীর্ণ দর্ভপাণির প্রশস্তি ও বিশাল মহীপাল দীঘী, আমাদিগকে পালবংশের কথাই স্মরণ করাইয়া দিতেছে। এক সময়ে এখানে সর্ব্বত্রই মহীপালের গান গীত হইত। চেষ্টা করিলে এখনও সেই অতীত বৌদ্ধগাথা বাহির হইতে পারে। এখানকার দেবকোটেই প্রথম মুসলমান-রাজধানী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল এবং সেই সময় হইতে এখানকার অতীতকীর্ত্তি ধ্বংসমুখে পতিত হইতে থাকে। বৌদ্ধ, জৈন ও শৈব প্রভাবের ন্যায় এখানেও মহাতান্ত্রিক শাক্তসম্প্রদায়েরও প্রতিপত্তি প্রসারিত হইয়াছিল। এই জেলার প্রায় প্রতি গ্রামেই শাক্ত-

প্রভাবের নিদর্শন দেখিতে পাইবেন। আপনারা গোপীচাঁদের গানে হাড়িপা বা হাড়িসিদ্ধার নাম শুনিয়াছেন; এখনও এই দিনাজপুরের নানাস্থানে মহাশাক্ত হাড়িগণের সন্ধান পাইতেছি, তাহারাই স্বয়ং মহাকালীর পূজা করিয়া থাকে, স্বহস্তে বলি দিয়া থাকে, এমন কি কোন কোন গ্রামে তাহারা অগ্রে পূজা না করিলে অপর কেহ শক্তিপূজা করিতে পারে না। এই অপূর্ব্ব ধর্ম্মপ্রভাবের ও অপূর্ব্ব শাক্তপ্রভাবের ইতিহাস অবশ্যই আপনাদের অনুসন্ধেয়। মুসলান-প্রভাবের সঙ্গে এখানে বহু মুসলমান সাধু আগমন করেন এবং তাঁহাদের পদার্পণে এই জেলার নানা-স্থানে দরগা, মস্‌জেদ ও তক্ত নির্ম্মিত হইয়াছে, এখনও তাহার নিদর্শন রহিয়াছে। আশ্চর্য্যের বিষয়, যেখানে মুসলমান পীরের আস্তানা, তাহারই নিকট প্রায় সুপ্রাচীন বৌদ্ধস্তূপের ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়। এখানে একটি প্রসিদ্ধ আস্তানার সংবাদ দিতেছি, পাঁচবিবি থানার উত্তরপূর্ব্বে পাহাড়পুর হইতে প্রায় ৫৷৽ ক্রোশ উত্তরে তুলসীগঙ্গার ধারে নিমাই সা নামক এক পীরের আস্তানা এবং তাহারই নিকট বৃহৎ বৌদ্ধস্তূপ রহিয়াছে। উক্ত বৌদ্ধস্তূপের অর্দ্ধক্রোশ দূরে বৌদ্ধরাজ মহীপাল-স্থাপিত মহীপুর গ্রাম। উক্ত পাহাড়পুরেও বৌদ্ধস্তূপ আবিষ্কৃত হইয়াছে। পাহাড়পুরের ২৷৽ ক্রোশ পশ্চিমে যোগীগুফা নামে একটি বিখ্যাত স্থান রহিয়াছে। ইহার চারিদিকেই বিস্তর ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়। প্রবাদ আছে যে, ঐ স্থানে দেবপাল, দেবপালের মাতা ভীমাদেবী এবং চন্দ্রপাল, মহীপাল প্রভৃতির প্রাসাদ ছিল। এই স্থানের তিন ক্রোশ দূরে বদালস্তম্ভে নারায়ণপালের সময়কার শিলালিপি উৎকীর্ণ রহিয়াছে। পালরাজ দেবপালের নাম হইতেই দেবকোট নাম হইয়াছে কি না, তাহাও আপনারা অনুসন্ধান করিতে পারেন। এইরূপে এই জেলার নানাস্থানে বিভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের বিভিন্ন সময়ের বহু

কীর্ত্তি নিদর্শন ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে, সেই সমস্ত উল্লেখ করিয়া আপনাদের মহামূল্য সময় নষ্ট করিতে ইচ্ছা করি না।

দিনাজপুরের রাজা গণেশের নাম আপনারা অনেকে শুনিয়া থাকিবেন, খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীর শেষভাগে দিনাজপুর হইতেই রাজা গণেশের অভ্যুদয়। তিনি আমাদের উত্তররাঢ়ীয় কুলকারিকার দত্তবংশীয় বলিয়া পরিচিত আছেন। রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণদিগের কুলগ্রন্থে তিনি "দত্তখান" বলিয়া পরিচিত। সেই মহাত্মা মুসলমান-প্রভাব খর্ব্ব করিয়া সমস্ত গৌড়-মণ্ডলে কেবল যে নিজ আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন, তাহা নহে; তাঁহার যত্নে গৌড়ীয় হিন্দু-সমাজে বহু সংস্কার সাধিত হইয়াছিল। শিল্প ও সাহিত্য উভয়েরই তিনি উৎসাহ দাতা ছিলেন। বঙ্গের বাল্মীকি কৃত্তিবাস তাঁহারই নিকট পূজা পাইয়া, আমাদের শ্রেষ্ঠ কবি বলিয়া গণ্য হইয়াছেন। সুতরাং আপনারা বুঝিতে পারিতেছেন, এই দিনাজপুরের সহিত সমস্ত বঙ্গের ইতিহাসের এবং সমস্ত বাঙ্গালী-জাতির বিশেষ সম্পর্ক রহিয়াছে। এই অতীতের মহাশ্মশানে আপনাদের দেখিবার, ভাবিবার ও আলোচনা করিবার অনেক জিনিস আছে বুঝিয়াই আপনাদিগকে আহ্বান করিতে আমরা সাহসী হইয়াছি।

আমি ঐতিহাসিক বা প্রত্নতাত্ত্বিক নহি, অথবা সাহিত্যিকগণের মধ্যেও একজন সামান্য সেবক বলিয়া গণ্য হইবার অধিকার রাখি না। আপনাদের সমাগমে উৎসাহিত হইয়া যাহা বহুদিন হইতে শুনিয়া আসিতেছি এবং আপনাদের আলোচনার ফলে যে সকল চিন্তা আমার মনোমধ্যে উদিত হইয়াছে, কর্ত্তব্যবোধে সেই সকল কথাই আপনাদের নিকট নিবেদন করিলাম। আশা করি, আমার ধৃষ্টতা আপনারা নিজগুণে ক্ষমা করিবেন। যে জিনিসটি যাহার ভাল লাগে, সেই জিনিসটি তাহার পরমাত্মীয়ের নিকট উপস্থিত করিতে চায়, তাই আজ কর্ত্তব্যবোধে আপনাদের নিকট

উপস্থিত করিলাম। ইহাতে যদি কিছু আমার ধৃষ্টতা হইয়া থাকে, আপনারা দোষ বর্জ্জন করিয়া গুণটুকু গ্রহণ করিলে কৃতার্থ হইব।

আজ অভ্যর্থনা-সমিতি আপনাদের নিকট আমার মনের কথা প্রকাশ করিবার অবসর দিয়া বাস্তবিক আমাকে চিরকৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিয়াছেন। উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব্ব, পশ্চিম সকল স্থানের বঙ্গজননীর কৃতীসন্তানগণ আজ উত্তরবঙ্গের এই সাহিত্য-সম্মিলনে সম্মিলিত হইয়া আমাদের আতিথ্য-গ্রহণ করায় আমরা কৃতার্থ বোধ করিতেছি। এই শুভ-সম্মিলনে সাহিত্যিকগণের মিলন-বন্ধন দৃঢ় হউক, আমাদের উদ্দেশ্য সার্থক হউক, উত্তববঙ্গের গৌরব বৃদ্ধি হউক, বঙ্গবাণীর কল্যাণে আমাদের মাতৃভাষাব শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হউক, ইহাই পরম মঙ্গলালয় ভগবানের নিকট ও আপনাদের নিকট একান্ত প্রার্থনা।

শ্রীযুক্ত ললিতচন্দ্র সেন বি, এল্, মহাশয় সভাপতি নির্ব্বাচনের প্রস্তাব করিবার অনুমতি প্রাপ্ত হইয়া শ্রীভগবানের নিকট প্রার্থনা জ্ঞাপন পূর্ব্বক মাননায় বিচারপতি শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরী এম, এ, বি, এল্; বি, এ, (ক্যাণ্টাব) বার-আট্-ল, মহাশয়কে সভাপতির আসন গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেন। পাটনা কলেজের সুযোগ্য অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার এম, এ, মহাশয় সভাপতি মহোদয়ের নানা বিষয়ে জ্ঞানের পরিচয় দিয়া এই প্রস্তাব সমর্থন করিলেন।

শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় বি, এল্, মহাশয় নিজের স্বভাব-সিদ্ধ ওজস্বিনী ভাষায় বলিলেন—বাঙ্গালার মধ্যে এমন একজন লোকও বর্ত্তমান নাই যে মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরী মহাশয়ের সভা-পতির আসন গ্রহণ সম্বন্ধে অন্যমত হইতে পারে। এ প্রস্তাব আর অনুমোদনের আবশ্যক নাই। শারীরিক অসুস্থতা বশতঃ ইনি সমুদ্রতীর পুরীতে বাস করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। বাগ্‌যন্ত্রের পীড়া নিবন্ধন ইনি

স্বীয় অভিভাষণের কিয়দংশ মাত্র পাঠ করিয়া প্রতিনিধি দ্বারা অবশিষ্টাংশ পাঠ করাইবেন।

অতঃপর মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরী এম, এ, বি, এল্; বি, এ (ক্যাণ্টাব) মহোদয় মাল্য বিভূষিত হইয়া তুমুল করতল নিনাদের মধ্যে সভাপতির আসন গ্রহণ পূর্ব্বক বলিলেন—"আপনারা অনুগ্রহ করিয়া ডাকিয়াছেন তাই আসিয়াছি। আমার এখন চিকিৎসকের আজ্ঞা অবহেলা করিবার বয়স নহে। গত রবিবারেও আমি মনে করিনাই যে সম্মিলনে যোগদান করিতে পারিব।

এই দিনাজপুরে আমি জজ সাহেবের আদালতে অনেক অর্থোপার্জ্জন করিয়াছি। পূর্ব্বে অর্থের জন্য আসিয়াছিলাম এবার প্রকৃত কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সুযোগ পাইয়া আসিয়াছি। অসুস্থতা সত্ত্বেও আমি নিজেই যতদূর পারি অভিভাষণ পাঠ করিব অবশিষ্টাংশ অপরে পাঠ করিবেন এজন্য আমাকে ক্ষমা করিতে হইবে।"

সভাপতি মহাশয় অভিভাষণের কিয়দংশ পাঠ করিবার পর অবশিষ্টাংশ "নায়ক" সম্পাদক শ্রীযুক্ত পাচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ, মহাশয় পাঠ করিলেন।

সভাপতির অভিভাষণ

প্রাচীন ঋষিরাও সভা-সমিতিকে প্রজাপতি-দুহিতা বলিয়া আখ্যাত করিয়াছেন। এই সভা তাঁহাদিগের স্তুতি-চ্ছন্দের সম্পূর্ণ উপযুক্ত, যদিচ আমি তাহা উচ্চারণ করিবার যোগ্য নহি, তবে আজ পরিষদের অনুগ্রহে সভাপতি পদে বৃত হইয়াছি বলিয়া, সেই দ্যুতিমতী ভাষায় আপনাদিগের আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিবার অধিকার আছে।

"সভা চ সমিতিশ্চ অবতাম্ প্রজাপতে দুহিতরৌ সম্বিদানে।
চেনা সংগচ্ছে উপমা স শিক্ষাৎ চারুবদানি পিতর সঙ্গতেষু॥
বিদ্মাতে সভানাম্ নরিষ্টা নামবৈ অসি।
যে তে কে চ সভাসদস্তে তে মে সন্তু সবাচসঃ॥
এষামহং সমাসীনাং বর্চ্চো বিজ্ঞানমাদদে।
অস্যাঃ সর্ব্বস্যাঃ সংসদো মামইন্দ্র ভগিনং কৃনু॥
যদ্বো মনাঃ পরাগতং যদবদ্ধং ইহ বেহবা।
তদাবর্ত্তয়ামাস যয়ি বো রমতাং মনঃ॥"

এই সভা আমার উপর সুপ্রসন্ন হউন। আমি যেন উপস্থিত পিতৃদিগের আশীর্ব্বাদে উপস্থিত সভাস্থলে চারুবাদী হইতে পারি।

এই সভার অর্থ, আমি জ্ঞাত আছি, ইহার অন্যতর নাম অক্ষুণ্ণা।

সভাসদেরা যেন আমার সহবাচী হয়েন।

আমি যেন তাঁহাদিগের তেজ ও জ্ঞানের গৌরব প্রাপ্ত হই।

এই সংসর্গের সৌভাগ্য আমি যেন লাভ করিতে পারি।

যদি এই সভায় কাহারও মন পরাগত হইয়া থাকে, কিংবা ইতস্ততঃ আবদ্ধ থাকে, যেন এই স্থানে আবর্ত্তিত হইয়া আমার মনেতে অনুরক্ত হয়।

যে দেবভাষায় আপনাদিগকে অভিভাষণ করিলাম, তাহাতে আমার অধিকার নাই, স্বীকার করি। সেই জ্যোতির্ম্ময়ী ভাষা, আদি-কবিদিগের হৃদয়ের ভাষা, সকলের তাহাতে অধিকার নাই। অধিকার সত্ত্বেও আমরা অধিকার-ভ্রষ্ট। পূর্ব্বের অধিকার কিসে যে রক্ষা করিয়াছি, তাহা জানি না। নিজের ভিটা ছাড়িয়া, আবর্জ্জনাস্তূপের উপর স্থান গ্রহণ করিয়াছি। উচ্ছৃঙ্খল জীবন অবলম্বন করিয়াছি। ধর্ম্মের বন্ধন ছিন্ন করিয়াছি, সমাজের বন্ধন অবজ্ঞা করি, প্রাণের বন্ধন শিথিল হইয়া গিয়াছে। হৃদয়ে

অনার্য্যভাব জিহ্বাগ্রে অনার্য্যভাষা। গ্রামে গৃহস্থ নাই, দেবমন্দিরে জাগ্রত দেবতা নাই; নিজের ঘর ছাড়িয়া, পরের দ্বারে উপযাচক আমরা। আমাদের কিসের অধিকার আছে? নির্ম্মল হৃদয় নির্ব্বাক্, অথচ আমরা বহুবাচী, অতএব সত্যের প্রতি লক্ষ্যশূন্য। নির্ভীক আত্মা হিরণ্যবর্ত্মিনী, পঙ্কিল পদে সে পথে চলা যায় না। অথচ "মুস্কিল আশান" সাজিয়া, পরের কল্যাণ কামনা করিয়া বেড়াইতেছি। যদি তাহাতেই কিছু পাথেয় সংগ্রহ করিয়া লইতে পারি। শূন্য হস্তে আশীর্ব্বাদ করিতে শিখিয়াছি। ভিক্ষার ধন লইয়া দান করিতে বসিয়াছি। সূর্য্যোদয় হইবার পূর্ব্বে, আমরা পরাঙ্মুখ হইয়া আছি।

হে ইন্দ্র, আমাদিগকে জ্ঞান দাও, পিতা যেমন পুত্রকে জ্ঞান দান করে। এমন পথে শিক্ষা দাও, জীবনে যেন সূর্য্যকে দেখিতে পাই। হে পুরুহূত, আমরা যজ্ঞের জীব, আমরা যেন প্রত্যহ সূর্য্যকে প্রাপ্ত হই।

"ইদং ধাতুং ন আভর পিতা পুত্রভ্যো যথা।
শিক্ষা নো অস্মিন্ পুরুহুতয়ামনি, জীবা জ্যোতিরসীমহি॥"

যদি আমরা এই প্রার্থনা করিতে পারিতাম, ঈশ্বরও আমাদিগকে সুপথ দেখাইয়া দিতেন। সচন্দ্র জ্যোতিঃ-প্রকাশিতনেত্রা উষা আকাশের দ্বার উদ্ঘাটিত করিয়া, দাঁড়াইয়া আছেন। দীপ্তিমতী আলোক বিকাশিতাঙ্গী দেবী উষা প্রত্যহ সেই দ্বারে দণ্ডায়মানা; আমরা নিদ্রাতুর, কখনও তাঁহাকে দেখি না। এই বিচিত্রা বিস্তীর্ণা দেবীকে যাঁহারা দেখিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের স্তুতি দেবলোকে গ্রাহ্য হইত। আমরাও বিনীতভাবে আজ স্তুতি করিতেছি। আমাদের আঁধার হৃদয়ে আলোক আনিয়া দাও, প্রাণে বল আনিয়া দাও। অনাবৃত আকাশের নীচে, স্বাধীনচেতা কবি গুরু ছিলেন। নিতান্ত ক্ষুদ্রচেতা আমরা তাঁহাদিগের মত মনের সাহস আমাদিগের হইবে কিসে?

তাঁহাদিগের এক একটি শব্দ, এক একখানি আলেখ্য।

উষা জ্বলন্ত বলিয়া "ভাস্বতী", আলোকের উৎস বলিয়া "ওদতী", অন্যকে অলোকিত করেন বলিয়া "দ্যোতনা", রক্তিম বলিয়া "অরুষী", শ্রেষ্ঠ বলিয়া "মঘোনী", শুদ্ধ বলিয়া "রিতাবরী", জাজ্বল্যমান বলিয়া "বিভাবরী" যাহা আমাদের ভাষায় আজকাল রাত্রি, সঞ্চারিণী বলিয়া "সুনৃতা"।

দেবতা কি, না বুঝিলে তাঁহার উপযুক্ত নাম ধরিয়া ডাকিতে পারি না। বৈদিক কবি উষাকে অনাবৃতা-বক্ষা নর্ত্তকীর সহিত তুলনা করিতে সঙ্কোচ করেন নাই। যে কণ্ঠে তাঁহাকে মঘোনী ও রিতাবরী সম্বোধন করিয়াছেন, সেই কণ্ঠে, দেবী তুমি কন্যার ন্যায় শরীর বিকাশ করিয়া, দীপ্তিমান্ সূর্য্যের নিকট গমন কর; যুবতীর ন্যায় উজ্জ্বল দীপ্তি-বিশিষ্টা হইয়া, হাস্যমুখে তাঁহার সম্মুখে বক্ষোদেশ অনাবৃত কর বলিয়া স্তুতি করিয়াছেন।

মনে যেরূপ দেখিয়াছেন, সেরূপ অবতারণা করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হ'ন নাই। তাঁহাকে কখনও বালিকা, কখনও জরামৃতা, কখনও সূর্য্য-পত্নী, কখনও বা সূর্য্য-জনয়িত্রী বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। নির্ভীক কবি সহস্র ভিন্ন ভাবে তাঁহাকে দেখিয়াছেন—দ্বিধাশূন্যা, সংশয়শূন্যা, অপরের অবলম্বনরহিত। বীর্য্যশালী মহাপুরুষের পক্ষে যাহা সম্ভব হইয়াছিল, তোমার আমার সে চেষ্টায় পাপ স্পর্শে। সৃষ্টি বিষয়ে তাঁহারা কি বলিতেছেন শুন:—

"নাসদাসীন্নো সদাসীত্তদানীং নাসীদ্রজো নো ব্যোমা পরো যৎ।
কিমাবরীবঃ কুহ কস্য শর্ম্মন্নংভঃ কিমাসীদ্ গহনং গভীরং॥
ন মৃত্যুরাসীদমৃতং ন তর্হি ন রাত্র্যা অহ্ন আসীৎ প্রকেতঃ।
আনীদবাতং স্বধয়া তদেকং তস্মাদ্ধন্যন্নঃ পরঃ কিং চনাম॥"

R. V. 10. 129.

Nor aught no naught existed ; you bright sky was not, no heaven broad woof out streched above, what covered all ? what sheltered ? what concealed ?

Was it the waters' fathomless abyss ?
There was not death—There was naught immortal.
Maxmuller. p. 290.

দাম্ভিক কবি গর্ব্বের সহিত বলিয়াছেন—

আমরা সত্যবাদী—মিথ্যা কহিনা।
নুনমৃতা বদংতো অনৃতং রপেম।
R. V. 10. 10. 4.

এই সত্যের তেজোবলেই তাঁহাদিগের কাব্য তেজোময়। আমাদিগের হৃদয়ে যে দিন এইরূপ বল আসিবে, আমাদিগের কবিতাও ওজস্বিনী হইবে। সাহিত্যের মূলে সত্য ও সাহস চাই। এ বল আসিবে কিসে? ধর্ম্মের পথ অবলম্বন না করিলে, সামাজিক গ্রন্থি দৃঢ় না হইলে, অসত্য উপেক্ষী না হইলে, এ শক্তিব কখনও সঞ্চার হইবে না। আপনার পারিচর্য্যে আপনাহারা হইয়া চিরদিন রহিতে হইবে। একদিন ঘরের দিকে চোখ পড়িয়াছিল, অবসন্ন আত্মা গৃহ-দেবতাকে জাগ্রত দেখিতে পাইয়াছিল, নূতন আলোকে আপনার হৃদয় দেখিতে পাইয়াছিলাম, বহু দিনের কথা নহে, কিন্তু আলোক স্তিমিতপ্রায়, সে অঙ্কুর বিকাশের পূর্ব্বেই তাহা যেন শুকাইয়া গেল, দেবতা শিলাখণ্ডে পরিণত হইল, দৃষ্টি আবার বাহিরের জঞ্জালের উপর নিক্ষিপ্ত হইল—ভাগ্যের দোষ দেই না, বালকত্ব না ঘুচিতেই আমরা পিতা, শিক্ষা সম্পূর্ণ না থাকিতেই আমরা শিক্ষক, মাত্রা শুদ্ধ না হইতেই আমরা লেখক। সাধ্যাতীতের সাধনা অপচয় মাত্র, তাহাতে অকল্যাণ ভিন্ন কল্যাণ হইতে পারে না। যাহা আয়ত্তাধীন,

তাহাতেই বলের পরিচয় পাওয়া যায়। [illegible] স্বত্বই আমরা অতিক্রম করিতে চেষ্টা করিব, আমরা ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতর হইয়া পড়িব। জাতীয়-তার অবতারণা রাজসূয়-যজ্ঞ, সহজে সে যজ্ঞের অধিকারী হওয়া যায় না। শুদ্ধ, সংযমী, প্রশান্তচেতা হওয়া চাই। আমার হৃদয় আমারই রাজ্য অনুভব করা চাই, আমি আছি না বুঝিলে, আপনার কি অপরের চিনিয়া লইবে কি প্রকারে? আদর্শভ্রষ্ট আমরা পণ্যস্ত্রী বারবনিতার অঞ্চল ধরিয়া মার অনুসন্ধানে চলিয়াছিলাম। প্রথমে আপনার ঘরের ভিতর আপনার স্থান কর, পরে পৃথিবীর কোন্ খণ্ডে বাসা বাঁধিয়াছ, তাহা বুঝিতে পারিবে, বিশ্বের সহিত কি সম্বন্ধ তখন উপলব্ধি হইবে। ঋত্বিকে-রাই আহুতি দিতে সক্ষম; আহুতি-ভেদে দেব কি দানব, যজ্ঞক্ষেত্র অধিকার করে।

আদি কবিই আর্য্যাবর্ত্তে আদি পুরোহিত, গুরু, শিক্ষক ছিলেন, সেই স্থান আজ কে অধিকার করিতে পারে? আমরা নিজের খেয়ালে, আপন আপন ধর্ম্ম গড়িয়া লইতে শিখিয়াছি। কখনও বা ধর্ম্মের সহিত সম্বন্ধ একেবারেই পরিত্যাগ করিয়াছি, কিংবা করিতে প্রস্তুত হইয়াছি। আমরা বিজ্ঞানের দোহাই দিতে শিখিয়াছি, ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম্ মাপ জোক করিতে পারি, জগৎকারণ অপরিমেয় বলিয়া তাঁহার ধ্যান করা নিষ্ফল মনে করি। আমরা দেবতার ধার ধারি না, দেবালয়ের পাশ দিয়া চলি না—আমরা কি বলের উপর নির্ভর করিয়া অপরকে বল দান করিতে পারি। তুমি আপনি অবলম্বন রহিত? কি ভরসায় তোমায় অবলম্বন করিব? তাই বলি চিত্ত শুদ্ধ করিতে শিক্ষা কর, নিজের গৃহ পরিষ্কার করিয়া লও। ঘরের আঁধার অনুভব করা সহজ, কিন্তু অবারিত দ্বারে না দাঁড়াইলে জগতের বিস্তীর্ণ আলোক দেখা যায় না। তাই বলি হৃদয়ের দ্বার উদ্‌ঘাটিত কর। বিশ্বের প্রাণের ভিতর স্থান না

পাইলে বায়ু-বিতাড়িত বাষ্পের ন্যায় শূন্যে মিলাইয়া যাইবে। সমাজে প্রাণ নাই, বিশ্বের প্রাণ অনুসন্ধান নিষ্ফল।

স্বাধীনচেতারই হস্তে লেখনী জ্বালামুখী হয়। দেবীতমা সরস্বতী সূর্য্যালোকাবৃতা। অতীন্দ্রিয় দৃষ্টি ভিন্ন স্থূল দৃষ্টিগোচর নহেন। এই দৃষ্টি সাধনায় মেলে। যখন বলিতে পারিবে, My mind to me a Kingdom is, তখন সে রাজ্যে দেবীতমার পূর্ণোপচারে পূজা সম্ভব। মিথ্যার বোঝা ঘাড়ে লইয়া সমাজ গড়া যায় না। দেবীর পূজা সোলার ফুল দিয়া হয় না। সত্যই জীবনের ভিত্তি, মানবহৃদয়ের সাহস। ধর্ম্ম বল, কাব্য বল, সবই সত্যের উপর নির্ভর করে। সমাজে লুকোচুরি করিতে করিতে মন জরাগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছে। মুখে যাহা, কাজে তাহা যে জাতি করিতে অশক্ত, কোন্ আশা তাহার ফলবতী হইবে? বক্তা বাঙ্গালী বাহিরে বীর, গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেই মার্জ্জার হইয়া পড়েন। ধর্ম্মাচার্য্য বাঙ্গালী আপনার গৃহমধ্যে অত্যাচার করিতে কুণ্ঠিত হ'ন না, পরের কোষ্ঠি কাটিতে অনুমাত্র সঙ্কোচ করে না। কাণাকাণি করিয়া গালাগালি দিতে ছাড়ি না, সকলেই প্রায় অনাচারী, কিন্তু সকলেই আচারের গণ্ডীর ভিতর আছি বলিয়া বুঝাইতে চাই। মিথ্যার হাটে মূর্ত্তি কেনা-বেচা চলিতে পারে, দেবী পাওয়া যায় না।

প্রসিদ্ধ ফরাসী কবি, Beranger, Napoleonএর সমসাময়িক ছিলেন। Napoleonএর পতনের পর ফ্রান্সের সামাজিক অবস্থা পঙ্কিল হইয়া পড়িয়াছিল। Beranger সাহিত্য-সমাজের কাছে এই বলিয়া বিদায় লইয়াছিলেন, "আর লিখিব না বলিতে পারি না, কিন্তু লেখা প্রকাশ করিব না, ইহা প্রতিজ্ঞা করিতেছি। দেখিবার শক্তি আছে, কিন্তু আর লিখিতে চাই না, জীবনের শেষ সন্ধ্যাতে চক্ষু মুদিয়া থাকিতে থাকিতে ঘুমাইয়া পড়িতে ইচ্ছা নাই। সময় আসিয়াছে, মনে হইলে অকাতরে

ধরাশায়ী হইয়া চিরনিদ্রা লাভ করিব। প্রাণের কথা লইয়া হাটের মধ্যে দাঁড়াইতে পারি না, সে কথা যদি বেচা-কেনা চলে চলুক—ঘরে যে ক্ষুদ কুঁড়া আছে, তাহাতেই আমার চলিবে। আতুরের পায়ের ধূলি চক্ষুতে নিক্ষেপ করিতে ইচ্ছা নাই—আমি বিদায় লইলাম, সহজেই সে স্থান আপনারা পূরাইয়া লইতে পারিবেন।" অনেকেই এ কথার সত্যতা বোধ হয় অনুভব করেন, আমিও করিলাম বলিয়া আমাকে মাপ করিবেন। কারণ আপনাদিগকে বিশ্বাস করিতে বলি, আমি সত্য যাহা ভাবি, তাহাই বলিতেছি। হাটের মধ্যে বাস করিবার অনিচ্ছা সত্ত্বেও বাস করিতে বাধ্য মনে করি। হাটে বারওয়ারি হইতে পারে, উহা পূজার স্থান নহে।

কথা সত্য, তাহার অন্যতর প্রমাণ আছে। বাঙ্গালা নাটক সাধারণতঃ বলিতে গেলে নাট্য-জগতে উচ্চ স্থান পায় নাই। আমাদিগের সামাজিক অবস্থায় পাইতে পারে না। পৃথিবীর কোন স্থানে পারে নাই। নাটক সাহিত্যের মধ্যে সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করে। জাতীয় ধীশক্তির প্রধান পরিচয় নাটকেই পাওয়া যায়। অন্য কবিতা কবির মানস-জাত, গাথা নিজের প্রাণের গান, মহাকাব্য পৌরাণিক ইতিহাসের অবতারণা—যাহারা আর জগতে নাই কল্পনার সাহায্যে তাহা সাজাইয়া ল'ন, কঙ্কালে পুনর্জীবন দেন। তাঁহারা রচনার মধ্যে দেবদেবী মানব যেখানে উপযুক্ত মনে করেন, সেইখানে বসাইয়া ল'ন। কিন্তু যথার্থ নাটকে সামাজিক চিত্র যাহা আছে, কবি তাহাই পরিস্ফুট করিয়া তোলেন। যাহা প্রত্যহ দেখি, তাহার ভিতরে প্রাণ কোথায় প্রচ্ছন্ন আছে, তাহাই খুঁজিয়া বাহির করিতে হয়। একের মনোভাব নহে, সামাজিক প্রাণী সকল কি সূত্রে গ্রথিত আছে, যদি বিচ্ছিন্ন থাকে কোথায় তাহার ছেদ হইয়াছে তাহাই আবিষ্কার করা—তাহাই সেই সমাজের লোকের যাহাতে উপলব্ধি হয়, সে শিক্ষা নাটক হইতে হয়।

যোগ-বিয়োগ শুদ্ধমাত্র গণিতের ভাষা নহে, মানব-হৃদয়ের ভাষা। এক এক জনের আশা মনোভাব লইয়া সমাজ সৃষ্ট নহে—অথচ মানুষের নিজত্ব যতদিন আছে, আমার হৃদয়ের আশা আমারই, আমার স্নেহ মমতা আমারই, কিন্তু সমাজের শৃঙ্খলা কোথায় তাহা অবরোধ করিয়াছে—কোথায় তাহার বিস্তৃতি সাধনা করিতেছে, কোথায় তাহা বিশ্বজগতের প্রাণের ভিতর আমাকে হাত ধরিয়া লইয়া যাইতেছে, তাহাই যথার্থ নাটকে প্রতিভাত। সুন্দর, কুৎসিত, সত্য, মিথ্যা, অনুরাগ, বিরাগ সকলেরই স্থান আছে। নাটক মানব-সমাজের প্রতিরূপ মনুষ্য-হৃদয়ে জ্বলন্ত, জীবন্ত আখ্যান—পয়ারে তাহারে আবদ্ধ করা কঠিন, গদ্যে তাহা সম্পূর্ণ উদ্ঘাটিত হয় না; তাহার ভাষা, তাহার ছন্দ কবিকে আবিষ্কার করিয়া লইতে হয়, তাহা নিয়মবদ্ধ করা যায় না। বহির্জগৎ কিম্বা অন্তর্জগৎ বিশ্লেষণ করা কাব্যের উদ্দেশ্য নয়। সম্ভাবিতের বিস্তৃতি আর সুদূর আশাকে পরিস্ফুট করিয়া তোলা, অর্থাৎ অসম্ভাবিতকে সম্ভবপর করার সাধনা, বিরাগ হইতে নূতন-রাগের মূর্ত্তি অবতারণা করা, অকল্পিতকে কল্পনার আয়ত্ত মধ্যে আনা, সকল প্রকার কাব্যের কর্ত্তব্য। কিন্তু সেই আশা, সেই রাগ, সে আদর্শ সমাজের হৃদয়ে জাগ্রত করা নাটকের শিক্ষা। নাটকেই কবি শিক্ষক।

ইংলণ্ডের সাহিত্যের ইতিহাস দেখ, এই কথার সত্যতা প্রমাণ হইবে। এলিজাবেথের সময় ইংলণ্ড চরম উৎকর্ষ লাভ করে, সর্ব্বোচ্চ সোপানে আরোহণ করে। সে সময় ইংলণ্ডে নূতন প্রাণ আসিয়াছিল, নূতন আশা, নূতন শক্তির সঞ্চার হইয়াছিল। ক্ষুদ্রদ্বীপবাসী জগতের রাজ্য অধিকার-প্রয়াসী হইয়াছিল। সেই সময়ে ইংরাজী ভাষাতেও নূতন তেজের আবির্ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। যেমন এক সময় আমাদের দেশে বাঙ্গালা লেখা পড়ার অনাদর ছিল, ইংলণ্ডেও এই

সময়ের পূর্ব্বে ঠিক তাহাই হয়। লাটিন এবং গ্রীকের চর্চ্চা ভিন্ন শিক্ষিত সম্প্রদায় ইংরাজী ভাষার চর্চ্চা লজ্জাকর মনে করিতেন। আমাদিগের পণ্ডিতেরাও সংস্কৃত ভাষা ছাড়া, বাঙ্গালা ভাষার অনাদর বহুকাল পর্য্যন্ত করিয়াছিলেন; আর আমাদের ইংরাজী-ভাষামুগ্ধ শিক্ষিত সম্প্রদায় বাঙ্গলা ভাষা ব্যবহার করা, অনেক দিন ধরিয়া হেয় জ্ঞান করিতেন Rogen Ascham ইংরাজী ভাষায় বই লিখিবার সময় এইরূপ ভূমিকা করিয়াছিলেন "although to have written this book either in Latin or Greek had been more easier and fit for my trade in study, yet I have written this English matter in English tongue for Englishmen" তাহার পর কিছুকাল ধরিয়া লেখকেরা ল্যাটিন আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া এক অদ্ভুত রচনা-রীতি সৃজন করেন যখন I trust the learned poets will give me leave and vouchsafe my book passage as being for the rudeness thereof no prejudice to their noble studies but even (as my intent is) an instax cotes to stir up some other of mutability to listen travail in this matter. আমাদের দেশেও তাহা ঘটিয়াছিল, 'নবজলধরপটল সংযোগে' প্রভৃতি সমাসের ও অনুপ্রাসের বেড়ায় বাঙ্গলা ভাষা সোণার হাতকড়ি ও বেড়া পড়িয়াছিল। পুস্তকের নাম 'Hecatompathia' ও 'প্রত্নকম্রতত্ত্বনন্দিনী' প্রায় এক জাতীয়। তখন ইংরাজী ব্যাকরণ শুদ্ধ করিয়া লিখিবার প্রয়োজন জ্ঞান জন্মায় নাই, more easier প্রভৃতির ছড়াছড়ি দেখিতে পাওয়া যাইত। আমরাও তাহাই করিয়াছি, বাঙ্গলায় ব্যাকরণ নাই বলিয়া যাহা ইচ্ছা তাহা বলা হইয়াছে। 'রাজা' সতী অসতী, 'শনি' ভানুতনুজা প্রভৃতি অনেক কথা পাওয়া যায়। কিন্তু এরূপ করিতে

করিতে সহজ সরল ভাষায় লিখিবার চেষ্টা জন্মিতে থাকে। ল্যাটিন, দেবদেবী ছাড়িয়া, সাদাসিধা মানুষের জীবনের উপর ক্রমে দৃষ্টি পড়ে। morality plays, Interludes, Senecan Tragedies, Chronicle Plays একে একে পরিত্যক্ত হইয়াছিল। শূন্যপুরাণ, মাণিকচাঁদের গান, রামযাত্রা, পাঁচালী প্রভৃতি রচনা আমাদের মধ্যে আজকাল নাই। নিজের ঘরের ছেলে-মেয়ের উপর যখন চোক পড়ে, তখন নিজের শক্তির তেজও অনুভূত হয়। সেই সময় ইংলণ্ডে জাতীয় জীবন উদ্ভাসিত হয়। এই সময়ের কাব্য নাটক অদ্ভুত বীর্য্যশালী, তাহার প্রত্যেক ছত্রে নবজাত ভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। ভাষা ও প্রতিভা নূতন ছন্দে আবিষ্কৃত হয়। Saekville ও Shirleyর মধ্যবিৎ সময়ে এই বলের উদ্ভাস প্রত্যক্ষ হয়। দেখিতে দেখিতে সেক্সপীয়র সাহিত্য-জগতে সূর্য্যের মত উদিত হইলেন। এই নাটকগুলি পড়িয়া দেখিলে অনেক কুৎসিত কথা, কুশ্রীভাব দেখিতে পাইবেন। কিন্তু কুৎসিত কথা মানুষের মুখে আছে, কুৎসিত ভাব মানবের মনে আছে। পাপ অপ্রচ্ছন্নভাবে সমাজে আছে, পুণ্যই অনেক সময় প্রচ্ছন্ন থাকে। পাপ-পুণ্যে মানুষের হৃদয়, পাপপুণ্যে আমাদের জগৎ, অপাপবিদ্ধ জগৎ মানুষের নহে, দেবতার। এ জগতে ঈশ্বরের স্বরূপ রাহুগ্রস্ত, আমরাই ; তাহার সম্যক্ উপলব্ধি এ জগতে সম্ভবপর নহে।

সত্য যদিচ বলের কারণ, তাহাতে অহং এর অধিকার নাই, তাহা সার্ব্বজনীন। সত্য যেমন মানব-আত্মার ভাষা, মিথ্যা তেমনি মানব-হৃদয়ের দরদ-দিয়া-মাখা—এই সত্য-মিথ্যাজড়িত মানব-সমাজের চিত্র নাটকে প্রতিফলিত। সব সময়ে জীবনে মিথ্যা পরাজিত হয় না। Renan এক স্থানে বলিয়াছেন, জগদীশ্বর তোমার রহস্য বুঝিতে পারি না, তুমি যে আমাদের দৃষ্টি হইতে প্রচ্ছন্ন রাখ, সেটা আমাদের উপর

তোমার আশীর্ব্বাদ! সত্য যদি সর্ব্বত্র বিকাশিত হইত, তাহা হইলে মানব-হৃদয়ের স্বাধীনতা থাকিত না।

যথা ইচ্ছা মন যায়, পৃথিবীতে মানব যথা ইচ্ছা বিচরণ করে। নাটক এই যথেচ্ছাচারী মানব-সমাজের অন্তর্নিহিত, রহস্য উদ্ভাসিত করিয়া তোলে। সেক্ষপীয়রের পূর্ব্বে যেমন জনকতক ইংরাজ কবি তাঁহার জন্য স্থান প্রস্তুত করিয়াছিল, তাঁহার পরেও জনকতক কবি, সে স্থান অধিকার করিবার চেষ্টা করিয়াছিল। যত দিন ইংলণ্ডে সেই নব জীবনের স্রোত বহিয়াছিল, ততদিন ধরিয়া ইংরাজী নাটকের প্রতিপত্তি ছিল। যে সময় হইতে সে আবেগ মন্দীভূত হইল, সেই সময় হইতে ইংরাজী নাটকের গৌরবহ্রাস হইয়াছে। বড় গাছে যেমন পরগাছা আশ্রয় করে, সেইরূপ তাঁহাদিগের আধুনিক নাটক পরগাছা স্বরূপ। নাট্যশালায় তাঁহারা ফরাসী নাটক অনুবাদ করিয়া চালাইতেছেন। বিলাতের জীবনের বৈচিত্র্য গিয়াছে, উৎসাহ সীমাবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে, আজকাল বহুদেশের সংসর্গে তাহাদের সহিত মিলিয়া চলিতে হইতেছে। যাহা আছে, তাহা বজায় রাখিতে যত্নবান্ হইতে হইয়াছে। সমাজের প্রাণী আর এক ছাঁচে ঢালা। মানসিক তেজ বহু ব্যাপারে বিক্ষিপ্ত হইয়া কেন্দ্রীভূত হইতে পারিতেছে না। তাহা ছাড়া ঘরে কোঁদল বাঁধিয়াছে। গৃহের ভিতর কচ্‌কচিতে প্রাণ ওষ্ঠাগত—নাটক লিখিবার অবসর কোথায়? যেমন ইংরাজী-সাহিত্যে নাটকের উদ্ভাসের কথা বলিলাম, ফরাসী দেশেও ঠিক ঐরূপ হইয়াছিল। ফ্রান্সের চারিদিকে অন্য অন্য দেশ, কাজেই তাহাকে নিজের বিশিষ্টতা বজায় রাখিয়া চলিতে হইয়াছে। যখন রোমান্ সভ্যতা চূর্ণ হইয়া যায়, ফরাসী ভাষার তখন জন্ম—ল্যাটিন ভাষা হইতেই তাহার উৎপত্তি। রোমানদিগের পূর্ব্বের কেণ্টদিগের প্রভাবের ছায়া তাহাতে পড়ে নাই। Conquering Frankরাও সেই ভাষার মধ্যে নূতন

ভাষা চালাইতে পারে নাই। ক্রমে এই ভাষার তেজ বৃদ্ধি হইতে লাগিল, কিন্তু চতুর্দ্দশ ও পঞ্চদশ শতাব্দীতে Civil war গৃহবিচ্ছেদের দরুণ ফ্রান্সের সাহিত্য চাপা পড়িয়া গিয়াছিল। সেই সময়ের শেষভাগে বিশৃঙ্খল ফরাসী সমাজে নূতন ভাবের আভাস পাওয়া যায়। সেই বিশৃঙ্খল সমাজে এক মহাকবি জন্মগ্রহণ করেন। কিন্তু এই কবি দস্যু ছিলেন, বহুদিন ধরিয়া কারাবদ্ধ ছিলেন, একবার তাঁহার উপর প্রাণদণ্ডের আদেশ হইয়া কোনরূপে পরিত্রাণ পান, কিন্তু এই অসাধারণ পুরুষ, অসাধারণ কাব্যশক্তির পরিচয় রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার নাম Villon, সেই সময় হইতে Ronsard পর্য্যন্ত দিন দিন ফরাসী সাহিত্যের উন্নতি দেখিতে পাওয়া যায়। এই সময় Byzantine রাজত্ব ধ্বংস হয় এবং নূতনতেজ ফ্রান্স, ইতালি, স্পেন, ইংলণ্ডে উদ্ভূত হয়। ফ্রান্সে এই সময় Ronsard বলিয়া একজন মহাকবির অভ্যুত্থান হয় এবং নাট্যজগতে Cornneille, Racine পরে Moliere এবং অষ্টাদশ শতাব্দীতে Voltaire এক এক যুগের অবতারণা করিয়া গিয়াছেন। ফ্রান্সের ইতিহাস এক মহাকাব্য—ফ্রান্সের সাহিত্য তাহারই পথবর্ত্তী, ফ্রান্সে কবি, শিক্ষক চিরদিনই সমাদৃত। Plicads দিগের সময় হইতেই ফরাসী দেশে সাহিত্যের একটি বিশেষ সমাজ সৃষ্টি হয়। সে সমাজে রাজা প্রজা ছিল না, গুরু শিষ্য ছিল না, ধনী নির্ধন ছিল না। সকলেরই সেই সমাজে সমান অধিকার। ফ্রান্স যেমন দিন দিন প্রতাপান্বিত হইয়া উঠে, তাহার সাহিত্য সমাজ দিন দিন নূতন বলে বলীয়ান্ হইয়া উঠিয়াছে। French Revolutionএর সময় দেখ, জাতীয় তেজের কি আশ্চর্য্য বিকাশ দেখিতে পাইবে। এই সময়ের একটি চিত্র আপনাদিগের সম্মুখে উপস্থিত করিতে চাই।

ফরাসী-সমাজে যেমন এক সময়ে অভিজাতবর্গ এবং জনসাধারণের

মধ্যে একটি ঘোর বিচ্ছেদ হইয়া পড়িয়াছিল, ফরাসী সাহিত্য বিশেষ কাব্যের ভাষাতেও সেইরূপ Noble এবং Base, মহৎ ও নীচ জাতীয় কথার ভাগ হইয়াছিল। যাহা সাধারণের ভাষা তাহা নীচ বলিয়া অভিহিত ও কাব্যে অব্যবহার্য্য ছিল। নীচের ভাষা নীচভাবে কলুষিত মনে করা হইত। গাছ বলা অসঙ্গত বিটপী কিংবা পাদপ না বলিলে ভাগবত অশুদ্ধ হইত। Racine তাঁহার একখানি নাটকে Chien কুক্কুর কথাটি ব্যবহার করেন, তাহা লইয়া কতই না আন্দোলন চলিয়াছিল। Moncheir রুমাল কথা এক স্থানে ব্যবহার হইয়াছিল বলিয়া, নাট্যশালায় খুনোখুনি হইয়া গিয়াছিল। আমাদের দেশে এখন পর্য্যন্ত কেহ কেহ চলিত কথা ব্যবহার করিতে কাতর হ'ন। কথার মধ্যেও আমরা ব্রাহ্মণ চণ্ডালের ন্যায় জাতিভেদ দাঁড় করাইবার চেষ্টা করিয়াছি। কিন্তু যে জাতিতে বড় ছোটর মধ্যে ভেদ অবহেলায় উঠাইয়া দিতে সক্ষম হইয়াছিল, সেই জাতির কবিই বা কতদিন ধরিয়া কথার জাতিভেদ সহ্য করিতে পারে? এই বিষয় লইয়া সাহিত্য-জগৎ Victor Hugoর কিছু পূর্ব্ব হইতে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছিল। একদল লেখক Romantic School নামে পরিজ্ঞাত সাধারণ কথাগুলি ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিলেন, তাঁহাদের Classic schoolএর সহিত ঘোর দ্বন্দ্ব বাধিয়া গেল। যাঁহারা আধুনিক তাঁহাদের বয়স কম, সাহস অধিক, তাঁহারা উন্মাদের মত এই বিবাদে যোগ দিলেন। এমন কি অনেকে নিজের পারিবারিক নাম পর্য্যন্ত তুলিয়া দিলেন। তাহার স্থানে Dick, Tom, Harry যাহা মনে আসিল, তাহাই ডাকনাম করিয়া লইলেন। পোষাক পরিচ্ছদ সম্বন্ধে তাহাই হইল। তাঁহারা শুদ্ধমাত্র পূর্ব্ববর্ত্তী ভদ্রসমাজের কালো Hat, Coat ছাড়িয়া—বিবিধ রকমের কাপড় পরিতে আরম্ভ করিলেন। কেহ লম্বা চুল রাখিলেন, কেহ মাথা মুড়াইয়া লইলেন, পারিসের রাস্তায়

যেখানে সেখানে এই অদ্ভুত বেশধারী, অভিনবের দল দেখা যাইতে লাগিল। ইহার প্রায় সকলেই সাহিত্য-সেবক, অপর দলের মধ্যে কতিপয় যুবক, Jupiter, Neptune, Mars প্রভৃতি দেবতাদিগের সাজে সজ্জিত হইয়া পথে চলিতে লাগিলেন। দুই দলে কথাবার্ত্তা আরম্ভ হইলে লাঠালাঠিতে পরিণত হইত। এই সময় Victor Hugoর কাব্যের অভ্যুদয় হয়। সময় থাকিলে তাঁহার প্রথম নাটক Cromwellএর উপক্রমণিকা পড়িয়া শুনাইতাম। Theophile Gantier এই উপ-ক্রমণিকাকে সাহিত্যে Mount Sinaiএর Ten Commandments বলিয়া গিয়াছেন।

Cromwell লইয়া অনেক বাদ-বিসংবাদ চলিল। তাহার পরেই তিনি Hernani বলিয়া নাটকখানি লেখেন। ফরাসী সাহিত্য-সমাজে, 25th Feb. 1830, যে দিন Hernani অভিনীত হয়, 14th Julyএর মত তাহা পূজার দিন বলিয়া গণ্য। Hernani পৌরাণিক শৃঙ্খল ছিঁড়িয়া ফ্রান্সের কাব্য-জগতকে নূতন আলোকে আলোকিত করিলেন। পুরাতন ছন্দের নিয়ম অনায়াসে ওলট-পালট করিয়া নূতন ছন্দের সৃষ্টি করিলেন। প্রথম অভিনয়ের দিন বেলা দ্বিপ্রহর হইতে সহস্রাধিক সেবকের দল রঙ্গালয় দখল করিয়া লইলেন। পৌরাণিকদলও স্থান বলপূর্ব্বক অধিকার করিতে ছাড়িলেন না। অদ্ভুত বেশধারী শত শত যুবকবৃন্দ সারাদিনের খাদ্য-দ্রব্য লইয়া রঙ্গালয়ে সারাদিন যাপন করিবার যোগাড় করিয়া লইয়া গিয়াছিল। দাঙ্গা হইবার আরম্ভ জানিয়া, ভিতরে পুলিশ বাহিরে সৈনিকের দল রঙ্গালয়-রক্ষার্থে নিয়োজিত হইয়াছিল। অভিনয়ের সময় উপস্থিত হইল। পটোত্তোলনমাত্র অভিনবের দলের হুঙ্কারে আকাশ যেন ভাঙ্গিয়া পড়িল। পৌরাণিকেরাও গর্জ্জন করিতে ছাড়িল না। একটু অবসর পাইবামাত্র অভিনয় আরম্ভ হইল। সূত্রপাতেই Escalier

Derobe (বিবস্ত্র সোপানাবলি) উচ্চারিত হইবামাত্র, বিষম হুলস্থুল পড়িয়া গেল। Derobe নূতন রকমের বিশেষণ আবার তাহার উপর একচ্ছত্রের শেষভাগে বিশেষ্য Escalier, তার পর ছত্রে তাহার বিশেষণ Derobe, ভাষার উপর একি ভয়ঙ্কর অত্যাচার বলিয়া পৌরাণিক গালাগালি আরম্ভ করিলেন। অভিনবেরা তাঁহাদিগকে বাপান্ত করিতে ছাড়িলেন না, তুমুল সংগ্রাম বাঁধিয়া গেল। গোলমাল কিছু কমিয়া গেলে আবার অভিনয় আরম্ভ হইল। সাপেও বংশীধ্বনিতে মুগ্ধ হয়, এই অসাধারণ কবির ভাষা ও ছন্দে মন্ত্রমুগ্ধবৎ ক্রমে সকলে ধীরভাবে কতকটা শুনিলেন, মধ্যে মধ্যে তর্জ্জন-গর্জ্জনও চলিতে লাগিল। একজন প্রকাশক চতুর্থ অঙ্ক অভিনয়ের পূর্ব্বেই Victor Hugoর নিকট গিয়া নাটকখানি প্রকাশের সত্বের জন্য ৬ হাজার Franc দিবেন বলিয়া হাতে পায়ে ধরিতে লাগিলেন; বলিলেন, ১ম অঙ্ক শেষ হইতে দুই হাজার ফ্রাঙ্ক দিব ঠিক করেন, ২য় অঙ্কের শেষে ৪০০০, তৃতীয় অঙ্কের পর ৬০০০ দিতে প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছেন, অভিনয় স্থগিত থাকুক, কথাবার্ত্তা শেষ করা না হইলে পঞ্চম পর্য্যন্ত শুনিলে ১০,০০০ ফ্রাঙ্ক দিতে ইচ্ছা হইবে, কিন্তু দিবার সাধ্য নাই। Hugoর তখন দুই পাউণ্ড পর্য্যন্ত ঘরে সম্বল ছিল না; তিনি ৬ হাজার ফ্রাঙ্ক আনন্দসহকারে গ্রহণ করিলেন ও অভিনবেরা আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া, সজোরে গান ধরিয়া দিলেন। অন্য পক্ষও ছড়া কাটিতে ছাড়িলেন না। এইরূপে অভিনয় শেষ হইল। কোনরূপে পুলিশ ও সৈনিক শান্তিরক্ষা করিল। কিছু দিন ধরিয়া এইরূপ ঝগড়াঝাটি চলিয়াছিল—পরে সকলেই নতমস্তকে কবির শিক্ষা সত্য বলিয়া মানিয়া লইলেন। ভাষায় ব্রাহ্মণ চণ্ডাল নাই স্বীকার করিয়া লইলেন। Hernani নাটক কল্পনায় উচ্চ স্থান অধিকারের উপযুক্ত নহে, কিন্তু ফরাসী সাহিত্যে ইহা নূতন ধর্ম্মগ্রন্থ বলিয়া এখনও পূজিত।

আমি তাই বলি, মাতৃভাষার আদর না জানিলে, নিজ সমাদর করিতে না শিখিলে, মিথ্যার মধ্যে সত্যের রূপ না দেখিতে পাইলে, সাহিত্য-সেবা বৃথা। আমাদের ভাষার আদর করা কি এতই কঠিন? যে ভাষায় মাকে আহ্বান করিতে শিখিয়াছি, তাহার যদি সম্মান করিতে না জানি, নরকেও আমাদের স্থান হইবে না। আজকাল মনে হয়, এ কথাটি আমরা বুঝিয়াছি। তবে দুটি কথা বলিতে পারি কি? নিজের মা থাকিতে পরের গৃহিণীকে মা বলিও না। আর নিজের মাকে বিদেশী জামা-জোড়া পরাইও না। প্রথমটি স্বতঃসিদ্ধ, দ্বিতীয়টির অর্থ বুঝাইয়া দেওয়ার প্রয়োজন আছে কি?

এক স্থানে পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বাঙ্গালার পায়ে এক সময় সোণার শৃঙ্খলে ভূষিত করিবার চেষ্টা হইয়াছিল। কিন্তু আজকাল আমরা দেব-প্রতিমা জর্ম্মান ডাকের সাজে সাজাই, দেবীর পূজায় হোটেলের খানা দিয়া দেবের ভোগ দিই। আর্য্যসঙ্গীত হার্ম্মোনিয়ামের সাহায্য ভিন্ন চলে না। তেমনই ঘরের কথাগুলিকে বিদেশী রূপ না দিলে আমাদের বিশ্বাস বাঙ্গালাভাষায় তেজ হয় না। তাই আজকাল দেখি বর্ণসঙ্কর ও জারজ কথার ছড়াছড়ি। জিজ্ঞাসা করি, বাঙ্গালা লিখিয়া যদি তাহার পার্শ্বে ইংরেজী phraseএ, কি sentenceএ তাহার অর্থ বুঝাইয়া দিতে হয়, সেটা কি উচিত? বাঙ্গালীর ছেলেকে বাঙ্গালা লিখিয়া বুঝাইতে পারিলাম না, ইহা লজ্জার কথা। যে ইংরেজি ভাবটি (চৌর্য্যবৃত্তিলব্ধ) বাঙ্গালায় অনুবাদ করিতে হয়, করুন, কিন্তু এমন কথা প্রয়োগ করিয়া অনুবাদ করিবেন না, যাহার পাশাপাশি ইংরেজি কথাগুলি না বসাইয়া দিলে বোধগম্য হয় না। আজ কাল দেখিতে পাই, ইংরেজি এক আধটি কথা মাত্র নহে, সমগ্র পদ এবং sentence পর্য্যন্ত না বসাইয়া দিলে অর্থবোধ সঙ্কট। সংস্কৃত যে ভাষার মাতা তাহার অভাব কি? তবে সংস্কৃত

পড়ি না, জোর করিয়া শব্দ গড়াইতে বসি। ইংরেজি ভাব, সংস্কৃত ধাতু অবলম্বন করিয়া অনুবাদ করা সহজ নহে, কিন্তু আমরা এ কথাটি যেন ভুলিয়া না যাই যে, শব্দমাত্রেরই জীবনের ইতিহাস আছে। পৃথিবীতে Geological periods আছে, শব্দেরও সেইরূপ। সুব্যবহারেই শব্দ গৌরবান্বিত, অসাধু প্রয়োগে তাহার অগৌরব। শব্দের প্রাণ পিঞ্জরাবদ্ধ করা কঠিন। সে একের নহে, কোটী প্রাণের ধন, অগণ্য কণ্ঠে উচ্চারিত। তবে যিনি মৃত কথায় জীবন দান করিতে পারেন, কিম্বা নূতন কথা সৃজন করিতে পারেন, তিনি সঞ্জীবনী মন্ত্রজ্ঞ ঋষিপুরুষ, তিনি দেবতুল্য, তবে আমরা নাকি সকলেই গঙ্গামৃত্তিকা লইয়া শিব গড়িতে বসিয়াছি, তাহাতেই মনে দ্বিধা উপস্থিত হয়। কি গড়িয়া তুলিতে গিয়া কি গড়িয়া বসি। ভাস্কর হস্তে দেবমূর্ত্তি বিকশিত হয়। হাতুড়ীপেটা কথা সহজে চলে না।

বাঙ্গালা-সাহিত্য জটিল হইয়া পড়িতেছে। ইংরেজি না জানিলে অনেক সময় লেখকের মনের ভাব খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। ইংরেজি-ভাষা জারজ, Froude বলেন Mongrel, তাহার শব্দার্থে অনেক বৈচিত্র্য আছে। পরের ঘর হইতে মেয়ে আনিয়া নিজের ঘরের করিয়া লইতে সময় লাগে। অনেক সময় একেবারেই নিজের ঘরের হয় না। হৃদয়ে অনুরাগ না জন্মাইলে একপ্রাণ হইতে পারে না। ক্ষেত্রতত্ত্ব না বলিয়া জ্যামিতি বলা, রসায়নশাস্ত্রকে কিমিতিনিম্বিতি বলাতে পাগলামি আছে। জোর করিয়া Geometry ও Chemistryর জ্ঞাতিত্ব স্থাপন করা বিধেয় মনে করি না। কুল ভাঙামিতে গৌরব নাই। এক সময় শিক্ষিত বাঙ্গালী-সম্প্রদায় নিজের নামেও বিদেশীয় রূপ দিয়াছিলেন, তাহা মনে করিলে হাসি পায়। হিন্দু দেবীর "কালী" নামের পরিবর্ত্তে collie স্কচ্ কুকুরের নামে আনন্দ বহন করিতে দেখা

গিয়াছে। সেইরূপ নিজের দেশের কথাকেও বিলাতি চেহারা দেওয়া হেয় জ্ঞান করি। যাহারা নিজের হাট-বাজারে পরের জিনিষ লইয়া বেচা-কেনা করে, তাহাদের পক্ষে ভাঁড়ানই প্রয়োজন। তবে সাহিত্য পণ্য জগতের নহে, সাহিত্যের গৌরব যদি রক্ষা করিতে চাহ, বিলাতি সজ্জা দূর করিবার চেষ্টা কর; বুঝি কথার অভাব প'ড়ে। ভাষাতে নূতন ভাববিকাশের সহিত নূতন কথার প্রয়োজন। France এর Academy যেমন নূতন কথার উপর, কথার নূতন ব্যবহারের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখে, আমাদিগের পরিষদের সেইরূপ কর্ত্তব্য। একবার বসিয়া বাঙ্গালার অভিধান ঝাড়িয়া বাছিয়া লওয়া প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। আর সহ্থ করিতে পারি না, আধ আধ-ভাষা, সে.ভাষা অপোগণ্ড শিশুর মুখে ভাল লাগিতে পারে, মানুষের মুখে নহে। আজকাল কবিতাতে এইরূপ কথার ছড়াছড়ি দেখিতে পাই—মুখানি, আলো, জোছনা, দিঠি, ইত্যাদি। "নায়মাত্মা বলহানেন লভ্যঃ"। চিরদিন কি আমরা সৌখীন কবিতা লিখিয়া সময় কাটাইব? তরু লতা, জাতিযুথি, সোণার আলা, সাজের বেলা, জোছনা রাতি সবই অতি সুন্দর, কিন্তু এই সৌন্দর্য্য উপভোগ করিতে ক্লান্তি কি কখনও হয় না? স্বীকার করি, বাঙ্গালী কবি এই সৌখীন কাব্য-জগতে অদ্বিতীয়। বাঙ্গলা-ভাষার মত মধুর ভাষা কাব্য জগতে নাই, বাঙ্গালীর মুক্তার হার গাঁথা সহজ। তবে "জোছনা" দেখিতে দেখিতে মনে হয়, বলি, "আবার গগনে কেন সুধাংশু উদয় রে?" রাহুর পায়ে ধরিয়া বলিতে ইচ্ছা করে, যদি চন্দ্র গ্রাস করিলেন, তবে অত সহজে তাহাকে ছাড়িবেন না। আমরা এই অবসরে গঙ্গা-স্নান করিয়া লই—আঁধারের মাহাত্ম্য একটু বুঝিয়া লই। মনে হয় না কি—মনে হয় না কি, কি কারণে "মহাকাব্য" লিখিতে বসিয়া বাঙ্গালী কবি লিখিতে পারিলেন না। তোড়, জোড়ের অভাব হয় নাই, তবে,

বাঙ্গালী ঢাল-তলওয়ার লইয়া বেহাত হইয়া পড়েন। মাতৃদুগ্ধ-পিপাসু বালিকার হৃদয়ের দুলাল, দুধে-আল্‌তা দেওয়া সরস ভাষার পক্ষপাতী। আমাদের দেশেই রাইরাজা। আমাদের কবি শৈশব—যৌবনের মিলনের সৌন্দর্য্য-বিমুগ্ধ, সন্ধিস্থলে মোহমুগ্ধ হইয়া কত দিন যাপন করিবে? তোমার মদন-মনোহর বেশ ত্যাগ করিতে বলি না; বেশে তুমি অতি সুন্দর কবি, আমার বিশ্বাসে ত তুমি অন্য বেশেও সুন্দর। তোমার মত ধীশক্তি জগতে বিরল, তোমাতে অসাধারণ কল্পনার প্রতিভা আছে, তুমি সরস্বতীর বরপুত্র, তবে রতি-মন্দিরে দিন যাপন করিও না। সহস্র নির্ঝর-প্রসূত মন্দাকিনী-বারিবিধৌত সাহিত্যের প্রাণ মহাসাগরে লীন হইয়া আছে। এই সাগর মন্থন করিবার শক্তি সাধনায় মেলে। আমি একস্থানে বলিয়াছি সত্য জগতে "অহং"-এর স্থান নাই। ইহাতে প্রকৃত আমার যাহা বলিবার ইচ্ছা, তাহা পরিস্ফুট হয় নাই। সত্যে কাহারও বিশেষ অসম্মতি নাই। একজনের মনে সত্য আবিষ্কার হইতে পারে, কিন্তু সত্য আবিষ্কার হইবা-মাত্র সমগ্র জগতের ধন হইয়া যায়। সত্যে কোন ব্যক্তি কিংবা কোন সম্প্রদায়ের স্বতন্ত্র অধিকার নাই। সাহিত্য ও ধর্ম্ম, বহির্জগতের সহিত অন্তর্জগতের যে সম্বন্ধ আছে, ভিন্ন পথে তাহারই আবিষ্কারের চেষ্টা করিয়া থাকে, সেইজন্য কবি ও ঋষি সময়ে একই ছিলেন। Prophet, Poet, Vates and Seer অনেক ভাষাতেই একই নাম। সাহিত্য সেই জন্য "সাধনা"। সত্যের অবতারণাতেই সাহিত্যের সৌন্দর্য্য ও সাহিত্যের শক্তি।

জাতীয়-জীবনের ইতিহাস ও সাহিত্যের ইতিহাস একই। এই জীবন পরিস্ফুট না হইলে সাহিত্যেও তেজ ও বল দেখা যায় না। মধ্যে মধ্যে বড় বড় লেখক জন্মাইতে পারে, কিন্তু যথার্থ যাহাকে সাহিত্য বলে তাহার জন্মগ্রহণ হয় না। ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্সের ইতিহাসে এই কথার

সত্যতা সপ্রমাণ হয়, এবং এই দুই সাহিত্য দেখিলে দেখিতে পাইবেন যে, জাতীয় ইতিহাস কতকটা সাহিত্যের সহায়।

সুকুমার সাহিত্যে বাঙ্গালীর বিশেষ প্রতিপত্তি আছে। তবে সুকুমার সাহিত্যে যে "সাধনার" কথা আমি বলিলাম, তাহার উপযোগী নয়। যেমন চন্দ্রালোক সুন্দর, প্রচণ্ড সূর্য্যালোকও সুন্দর। চন্দ্রালোকে পুষ্প প্রস্ফুটিত হইতে পারে, কিন্তু জীবনের উল্লাসের জন্য রৌদ্রতেজের প্রয়োজন।

আমি পূর্ব্বে একস্থানে বলিয়াছি যে, জাতীয় ভাষার সাহায্য ভিন্ন জাতি কখন গঠিত হয় না। নিজের হৃদয়ে নিজের দেশের ভাষা ভিন্ন অন্য ভাষারই স্থান সঙ্কীর্ণ। সাহিত্যকে বিদেশী সাজে সাজাইলে কখনই সুন্দর হইতে পারে না। যেমন ভাষা জারজ হয়, সেই রকম বিভিন্ন ভাব মিশ্রণে ভাবের বর্ণসঙ্করের উৎপত্তি হয়। Burns আপনারা সকলেই জানেন Scotlandএর মহাকবি, তিনি ইংরাজীতেও অল্পসল্প কিছু কবিতা লিখিয়াছিলেন, তাহার সবগুলিই প্রায় অপাঠ্য। French কবি Musset, Italianএ কবিতা লিখিয়াছিলেন, Heine Frenchএ সেইগুলিও প্রায়ই অপাঠ্য। এ কথাটি বিশেষ করিয়া বলার আমার উদ্দেশ্য আছে। বাঙ্গালায় বিদেশী ভাষার ছাঁদ আমার কাছে অত্যন্ত ঘৃণিত মনে হয়। আমি ইংরেজ-নবীশ সম্প্রদায়ের মধ্যে 'অমুকে আমার উপর ডাকিয়া-ছিলেন' অর্থাৎ আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন ইংরাজীতে (called on me)র অনুবাদে এ ভাষা কি নিতান্ত ঘৃণাজনক নয়? তাঁহারা আমাকে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন না বলিয়া আমাদের ডাকিয়াছেন বলিতে শুনিয়াছি, অর্থাৎ (They have asked me) এইরূপ ভাষা সর্ব্বতোভাবে পরিহার্য্য, কিন্তু যাঁহারা এইরূপ ভাষা ব্যবহার করেন, তাঁহাদেরই এই দোষ দিই বা কি করিয়া? মাতৃদুগ্ধ-

পালিত শিশু ও Mellin's food প্রভৃতিপায়ী শিশুতে প্রভেদ আছে। শিক্ষার প্রথম অবস্থায় যদি বাঙ্গলা না শিখিয়া অন্য ভাষা শিখিবার জন্য আমরা সকলেই প্রাণপণ প্রয়াসী হই, তাহা হইলে শিখিবার শক্তি কত অপচয় হয়; আমাদের শিক্ষার এইটি মৌলিক দোষ। এই দোষ যত দিন পর্য্যন্ত রহিবে, ততদিন বাঙ্গালীর জাতীয়তা লাভ করিবার আশা স্বল্পমাত্র। নিজের দেশের ভাষার অর্থ যতখানি বুঝাইব, পরের ভাষাতে তাহা বুঝাইতে পারা যায় না। বিমাতা মাতা হইয়াও মাতা নহে। সৌভাগ্যের বলে আমরা এখনও পর্য্যন্ত বিপিতা প্রাপ্ত হই নাই, তবে কপালে কি আছে বলিতে পারি না। কথার রূপ আছে। সেই রূপ সম্যক উপলব্ধি না হইলে তাহার উপযুক্ত ব্যবহার করা কঠিন ও তাহার প্রকৃত পরিচয় দেওয়া কঠিন। ইংরাজী শিক্ষার গুণে আমাদের মানসিক অনেক উপকার হইয়াছে, তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। আমাদের সাহিত্যও বলীয়ান্ হইয়াছে তাহার কোন সন্দেহ নাই। তবে ইউরোপীয় সাহিত্য ইহুদীয় আদর্শ ও গ্রীক্ মনোবিজ্ঞানের আদর্শের উপর সংগঠিত। এই ইহুদীয় প্রভাবটুকু আমরা পাশ্চাত্য বলিয়া ধরিয়া লইতে পারি। সেইখানেই যাহা কিছু সামঞ্জস্য আছে। বাইবেলের ভাষা ও ভাবে অনেক স্থলে আমাদের আর্য্য ঋষিদের ভাষা ও ভাবের আভাস দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু ইউরোপীয় সাহিত্যের বৈচিত্র্যের কারণ বহুতর। তাহাদিগের সমাজ একেবারে স্বতন্ত্র। তবে মানুষের হৃদয়মাত্রই এক এবং সেই নিমিত্ত গীতিকাব্য প্রায় সব দেশেরই সমান। একজন ফ্রেঞ্চ মহাকবি বলিয়াছেন, মানুষ ভিন্ন ভিন্ন ভাষা বলিয়া থকে, কিন্তু অমর জগতের ভাষা একই। এ বিষয় উল্লেখ করিবার এই উদ্দেশ্য যে, একভাষা হইতে অন্য ভাষায় অনুবাদ একপক্ষে উন্নতির কারণ হইতে পারে; তেমনই অপরপক্ষে সাহিত্যের প্রাণ যাহা, তাহা ক্রমশঃ লোপ পায়; অর্থাৎ জাতীয় বিশেষত্ব

ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়া পড়ে। সেই জন্য সাহিত্যে আমি অনুবাদের বিশেষ পক্ষপাতী নহি। যতদিন হইতে ইংল্যাণ্ডে, Russian কিম্বা Danish উপন্যাস অনুবাদ আরম্ভ হইয়াছে ততদিন হইতে ইংলণ্ডে কোন বিশেষ বড় নভেল প্রকাশিত হয় নাই। তাঁহাদিগের জীবনের বৈচিত্র্য এবং সকলে নিয়ত বিবিধ ব্যাপারে ব্যাপৃত থাকার দরুণ আজকাল ইংলণ্ডে চিন্তার সময় কম হইয়া পড়িয়াছে। দেশ-বিদেশের কথা এবং দেশ-বিদেশের বিভিন্ন সমাজের প্রয়োজনোদ্ভূত নূতন উত্তেজনার প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। সাধারণ সাদাসিধা কথায় ও দৈনিক সামাজিক চিত্রে মনের উত্তেজনা পায় না বলিয়া বাহিরের উত্তেজনার জন্য মন ব্যাকুল হইয়া থাকে। তাহার জন্য আজকাল-কার ইংরাজী-সাহিত্যে ইংরাজ-জাতীয় বিশেষত্ব দেখিতে পাওয়া যায় না। ফরাসী দেশের সাহিত্যের প্রথম উদ্ভাসের সময় Les Chansens de geste এবং পরে Chante Fables এর দরুণ অর্থাৎ জাতীয় গীতিকবিতার বলে সাধারণের মধ্যে সাহিত্য প্রচারিত হইয়া পড়ে। আমাদের দেশেরও সাহিত্যের প্রথম অবস্থায় মাণিকচাঁদের গীত প্রভৃতি, গম্ভীরা, চণ্ডী ইত্যাদির প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু আজকাল কিসের বলে সাহিত্য গড়িয়া তুলিবেন? বাঙ্গালার ইতিহাসের আলোচনা নিতান্ত প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। এই ইতিহাস যদি উদ্ধার করিতে পারেন তাহা হইলে আমাদিগের সাহিত্য সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইবে, আমার বিশ্বাস। সেই জন্য আনন্দ ও উৎসাহের সহিত বরেন্দ্র-অনুসন্ধান সমিতির কার্য্য এখানে উল্লেখ করিতেছি। যাঁহাদের যত্নে এবং চেষ্টায় এই সমিতি সংগঠিত হইয়াছে ও সংরক্ষিত হইতেছে, তাঁহাদিগের নিকট আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া উপসংহারে বাল্যবন্ধু দ্বিজেন্দ্রলালের কথা দুএকটি বলিতে চাই। তাঁহার বিয়োগে আমার মনে অত্যন্তই আঘাত লাগিয়াছে। অনেক বৎসর ধরিয়া আমরা একত্রে ছিলাম, চিরকাল তাঁহাকে আমার

নিজের ভাইয়ের মত দেখিয়া আসিয়াছি এবং সেও আমাকে বড় ভাইয়ের মত শ্রদ্ধা করিত ও ভালবাসিত। অতি বাল্যকালে তাহার সুমধুর সংগীত শুনিয়াছি; তাহাও অদ্য মনে পড়িতেছে। সে যদি "আমার দেশ" ও "আমার জন্মভূমি" এই দুইটি গান মাত্র রচনা রাখিয়া যাইত, তাহার কীর্ত্তি চিরদিন অক্ষয় রহিত। সে যেখানে গিয়াছে সেখানে অনেকের স্থান নাই, অনেকের স্থান কখন হবেও না। তাহার পার্শ্বে বসিবার আমাদের মধ্যে অনেকের স্থান হবে না। কিন্তু তাহার স্মৃতি চিরদিন আদরের সহিত রক্ষা করিব। এই প্রার্থনা করি, আমাদের ছেলে মেয়েরা—সে যে চক্ষে নিজের দেশকে সুন্দর দেখিয়াছিল—তাহারাও যেন সেইরূপ সুন্দর দেখে এবং তাহারাও সেই দেশের ছেলে-মেয়ে বলিয়া গৌরবান্বিত মনে করে। স্বর্গ হইতে হে দ্বিজেন্দ্র! তুমিও তাহাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ করিও।

পূর্ব্বোক্ত রাজ-সভাপণ্ডিত মহাশয়ের রচিত নিম্নলিখিত সঙ্গীতটি গায়কগণ কর্ত্তৃক গীত হইল—

মায়ের মন্দির-দ্বারে আজি
মঙ্গল রাগিণী বাজে।
পূজার সঙ্গীত উঠে জাগি
ভক্ত হৃদয় মাঝে॥
লইয়া পূজার অর্ঘ্য
বাণীর চরণ তলে;
এসেছে সুযোগ্য সুত
মায়েরে পূজিবে ব'লে,
ভরিয়া পূজার ডালা
সচন্দন শতদলে,

সাজিয়া এসেছে সবে
পবিত্র পূজারী সাজে ॥
ধরি হাতে হাতে চল সাথে সাথে
থেক'না আর মিছে কাজে
এস সেজে পুণ্য সাজে।
পূজার মন্দির-দ্বারে আজি
মঙ্গল রাগিণী বাজে ॥
দিগন্ত মুখরি উৎসব-বাঁশরী
বাজিছে মধুর তান।
গীত-গন্ধ ভরা প্রাণ পূর্ণ করা
জাগিছে স্বর্গের গণ।
কুমুদ কহ্লার পূজা উপচার
অঞ্জলি করহে দান।
সুললিত ছন্দে আবাহন মন্ত্রে
পুলক পূর্ণিত প্রাণ ॥
ধরি হাতে হাতে চল সাথে সাথে
থেক'না আর মিছে কাজে।
এস সেজে পুণ্য সাজে।
মায়ের মন্দির-দ্বারে আজি
মঙ্গল রাগিণী বাজে ॥

অনন্তর সভাপতি মহাশয়ের আদেশে উত্তরবঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনের স্থায়ী সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী মহাশয় সম্মিলনের উদ্দেশ্যের প্রতি সহানুভূতিজ্ঞাপক পত্র ও টেলিগ্রামপ্রেরকগণের নামোল্লেখ করিলেন।

সহানুভূতি বিজ্ঞাপকগণের নাম

অনারেবল মহারাজ শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর কাশিমবাজার
F. C. French, Esq. I. C. S. Commissioner of the Rajshahi Division.

শ্রীযুক্ত পণ্ডিত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী, কলিকাতা
„ রায় পার্ব্বতীশঙ্কর চৌধুরী বাহাদুর, তেঁওতা
„ বিষ্ণুপ্রসাদ শর্ম্মা দলই, কামাখ্যা
„ মোহিনীনাথ বিসি জোয়ারী, রাজসাহী
„ রায় বৈকুণ্ঠনাথ সেন বাহাদুর বি, এল্, বহরমপুর
„ সার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, নারিকেলডাঙ্গা
„ কুমার শরৎকুমার রায় এম, এ, দয়ারামপুর
„ ছকমল চোপড়া, কলিকাতা
„ অনারেবল রাজা প্রভাতচন্দ্র বড়ুয়া বাহাদুর, গৌরীপুর
„ দীনেশচন্দ্র সেন রায় সাহেব, কলিকাতা
„ রায় শরচ্চন্দ্র দাস বাহাদুর সি, আই, ই, দার্জ্জিলিঙ্গ
„ কামিনীকুমার বসু, শিলচর
„ প্রিয়নাথ ঘোষ এম, এ, দেওয়ান কোচবিহার
„ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ, কলিকাতা
„ চৌধুরী আমানত উল্লা আহম্মদ, বড়মরিচা কোচবিহার
„ হরিশ্চন্দ্র দত্ত বি, এল্, বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের ষষ্ঠ অধিবেশনের অভ্যার্থনা সমিতির সম্পাদক, চট্টগ্রাম
„ সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, গৌহাটী
„ কিশোরীমোহন চৌধুরী এম্, এ, বি, এল্, রাজসাহী

শ্রীযুক্ত শশধর রায় এম, এ, বি, এল্, পাবনা
„ কুমার জগদিন্দ্রদেব রায়কত
„ প্রসন্ননারায়ণ চৌধুরী বি, এল্
„ কামিনীকুমার রায়
„ মহারাজ বাহাদুর সিং, বালুচর
„ অনারেবল রায় হরিমোহন চন্দ বাহাদুর, দার্জ্জিলিঙ্গ
„ কুমুদনাথ চৌধুরী জমিদার কুঠীবাড়ী, সেরপুর, বগুড়া
„ পণ্ডিত যোগেন্দ্রচন্দ্র বিদ্যাভূষণ শিমুলজানি, ময়মনসিংহ
„ কিশোরীমোহন রায় সম্পাদক "স্বরাজ" পাবনা
„ রাধারমণ মজুমদার, জমিদার রঙ্গপুর
„ গোপালচন্দ্র ঘোষ বি, এ, হেড্‌মাষ্টার তাজহাট রঙ্গপুর
„ বৈদ্যনাথ সান্যাল বি, এল্ বগুড়া
„ উত্তমচন্দ্র বরুয়া কামরূপ
„ গোবিন্দচন্দ্র পাণ্ডা নীলাচল, আসাম
„ সারদাচরণ ধর মুন্সী, শিলং
„ দৌলত আবিদ, সোণামুড়া
„ শান্তিনাথ শর্ম্মা পাণ্ডা, কামাখ্যা গৌহাটী
„ অন্নদাপ্রসাদ মজুমদার বি, এল্, মুনসেফ, গাইবান্ধা
„ অক্ষয়চন্দ্র সরকার, কদমতলা, চুচুড়া
বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের ষষ্ঠ অধিবেশনের সভাপতি
„ যোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, কৃষ্ণনগর নদীয়া
„ অধ্যাপক হেমচন্দ্র সরকার এম, এ, কটক
„ সেতাবচাঁদ নাহার আজিমগঞ্জ
„ কুমার সিং নাহার আজিমগঞ্জ

শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র রায় আইহাই, দিনাজপুর

শ্রীযুক্তা ও শ্রীযুক্ত ইউসুফ স্কোয়ার আই. সি, এস্

রঙ্গপুরের ডিষ্ট্রীক্ট ও সেসন জজ ও তাঁর পত্নী

শ্রীযুক্ত কামিনীকুমার বসু শিলচর

„ অধ্যাপক রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম, এ, কলিকাতা

„ আমীরউদ্দীন আহম্মদ, কোচবিহার

নিম্নোক্ত সাহিত্যিকগণের মৃত্যু বার্ত্তা সম্মিলন-সম্পাদক মহাশয় কর্ত্তৃক দুঃখের সহিত বিঘোষিত হইল—হিতবাদী সম্পাদক সখারামগণেশ দেউস্কর, পণ্ডিত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি, সাহিত্য-সভার সভাপতি রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুর, সুবলচন্দ্র মিত্র, নাট্যকার অতুলকৃষ্ণ মিত্র, কবিরাজ দেবেন্দ্রনাথ সেন, অধ্যাপক বিনয়েন্দ্রনাথ সেন, অধ্যাপক গৌরীশঙ্কর দে, কবিবর দ্বিজেন্দ্রলাল রায়।

সভাপতি মহাশয়ের আদেশে উত্তরবঙ্গ সাহিত্য সম্মিলনের স্থায়ী সম্পাদক মহাশয় সম্মিলনের বিগত ১৩১৭, ১৩১৮ সনের কার্য্যাবলীর উল্লেখ করিলেন।

উত্তরবঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলন

১৩১৭ ও ১৩১৮ বঙ্গাব্দের কার্য্য-বিবরণ

এই সম্মিলনের ৺কামাখ্যাশৈলে আহূত বিগত পঞ্চম অধিবেশনে তৎপূর্ব্ববর্ষের অর্থাৎ ১৩১৭ বঙ্গাব্দের কার্য্যবিবরণ যে অনিবার্য্যকারণে উপস্থাপিত করিতে পারা যায় নাই তাহা সাহিত্যিকগণের কাহারও অবিদিত নাই। কারণটি সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত হইলেও ইহা তৎকালে যেরূপ সার্ব্বজনীন সহানুভূতি আকর্ষণ করিয়াছিল তাহা প্রাগুক্ত সম্মিলনে গৃহীত

প্রস্তাবদ্বয় মধ্যে আদ্য প্রস্তাবের দ্বারা পরিস্ফুট হইয়াছে। সম্মিলন পরিচালন-সমিতির কর্ম্মব্যবস্থার গুরুভার যাঁহার প্রতি ন্যস্ত হইয়াছে তাঁহার অযোগ্যতা সত্ত্বেও তৎপ্রতি এতাদৃশ অনুরাগ প্রকাশ উত্তরবঙ্গীয় তথা সর্ব্ববঙ্গের সাহিত্যিকগণের পক্ষে অসঙ্গত হয় নাই। অপিচ সম্মিলন সম্পর্কিতের প্রতি সম্মান দানে প্রকারান্তরে সম্মিলনেরই গৌরববৃদ্ধি করা হইয়াছে। তদর্থে ব্যক্তিগতভাবে আন্তরিকতাপূর্ণ কৃতজ্ঞতা সমপন্থাবলম্বী হিতৈষীগণের নিকটে সর্ব্বাগ্রে জ্ঞাপন করিয়া ১৩১৭ ও ১৩১৮ বঙ্গাব্দের কর্ম্মপঞ্জী একত্রে উপস্থাপিত করিতেছি।

এই সম্মিলনের প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধিবেশনে গৃহীত প্রস্তাবগুলি কার্য্যে পরিণত করিবার উদ্দেশ্যে ১৩১৬ বঙ্গাব্দের তৃতীয় অধিবেশনে রঙ্গপুর সাহিত্য-পরিষদের কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতিকে উহার স্থায়ী পরিচালক সমিতিরূপে গণ্য করা হয়। (গৌরীপুর সম্মিলনের কার্য্যবিবরণ প্রথম-ভাগের ৫৩ পৃষ্ঠার প্রথম প্রস্তাব দ্রষ্টব্য)

এই পরিচালন সমিতি সম্মিলনের আরব্ধ কার্য্যগুলি শৃঙ্খলাসহকারে ক্রমে সম্পন্ন করার সঙ্গে সঙ্গে উত্তরবঙ্গ ও আসামের পল্লীতে পর্য্যন্ত সাহিত্যের স্পন্দন অনুভূত হইতেছে।

এই সার্ব্বজনীন সাহিত্যিক জাগরণ এই প্রদেশে নানা ভাবেই ব্যক্ত হইয়াছে, সম্মিলনের প্রয়োজনীয়তাও একারণে ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে। সম্মিলনের দ্বিতীয় বার্ষিক কার্যবিবরণে উল্লিখিত হইয়াছে যে উত্তরবঙ্গে বিশেষভাবে সাহিত্যালোচনার প্রবর্ত্তনাই সম্মিলনের মুখ্য উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য সাধনার্থ গৃহীত পন্থা চতুষ্টয় যথা (ক) নানাস্থানে সাহিত্য-সমিতির প্রতিষ্ঠা (খ) স্বল্প সাহিত্যিক উত্তরবঙ্গে নব সাহিত্যিকদলের গঠন (গ) সারস্বত ভবন প্রতিষ্ঠা ও (ঘ) বাঙ্গালা ও সন্নিহিত অসমীয় সাহিত্যিকগণের পরস্পরের মধ্যে ভাব বিনিময়ের দ্বারা উভয় ভাষার উন্নতি সাধন।

এই বিভাগ চতুষ্টয়েই আশানুরূপ ফল প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। উত্তর-বঙ্গ-সম্মিলনের চেষ্টায় স্থাপিত বগুড়া সাহিত্য-সমিতি ও মালদহ সাহিত্য-সমিতির প্রতিষ্ঠার বিষয় প্রাগুক্ত কার্য্য বিবরণেই বর্ণিত হইয়াছে।

বগুড়া সাহিত্য-সমিতি

বগুড়া সাহিত্য-সমিতি নীরবে কর্ম্ম করিলেও বগুড়ার পুস্তকাগার সংলগ্ন ক্ষুদ্র চিত্রশালা তাহার একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় মধ্যে গণ্য করা যাইতে পারে। এই চিত্রশালা ক্রমেই বর্দ্ধিতায়ন প্রাপ্ত হইয়া বিশেষজ্ঞগণের সমাদর লাভ করিবে সন্দেহ নাই।

মালদহ জাতীয় শিক্ষা সমিতি

মালদহ সাহিত্য-সমিতি এক্ষণে ভিন্নাকার ধারণ করিয়া মালদহ জাতীয় শিক্ষা সমিতিতে পরিণত হইয়াছে। নানা সদ্‌গ্রন্থের ও শিক্ষার প্রচার দ্বারা এই সমিতি এক্ষণে সমগ্র ভারতে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে। সমিতির অনন্যকর্ম্মা সদস্যগণ মালদহের পুরাতত্ত্ব ভৌগোলিক বিবরণাদি সঙ্কলনেও বহুদূর অগ্রসর হইয়াছেন। ইহাদের যত্নে তথায় একটি স্থানীয় চিত্রশালারও সূচনা হইয়াছে। মালদহের ঐতিহাসিক তথ্যানুসন্ধান কার্য্য ঐ সমিতির অন্যতম সদস্য শ্রীযুক্ত হরিদাস পালিত মহাশয়ের যত্নে নানা প্রাচীন পুথি ও মূর্ত্তি ইত্যাদি সংগৃহীত হইয়া ভোলাহাট জাতীয় বিদ্যালয়ে আপাততঃ রক্ষিত হইতেছে। পরে ঐ সকল সংগৃহীত দ্রব্য সদরে নীত হইয়া একটি চিত্রশালা স্থাপিত করার কল্পনা আছে। স্বর্গীয় রাধেশচন্দ্র শেঠ মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত এই সমিতি অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার এম্, এ, এবং শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী ঘোষ মহাশয়দ্বয়ের নেতৃত্বে নবকলেবর ধারণ পূর্ব্বক উত্তরবঙ্গের গৌরবের স্থল হইয়াছে সন্দেহ নাই। এই সমিতি গৌড় পাণ্ডুয়া প্রদর্শক ও বঙ্গানুবাদসহ শেখ-শুভোদয় নামক গৌড়ের সংস্কৃত ইতিহাস গ্রন্থ প্রকাশার্থ রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষদের হস্তে প্রদান করিয়াছেন, সত্বরেই উহাদের প্রকাশ আরম্ভ হইবে।

প্রাগুক্ত সমিতিদ্বয়ের পরেই আমরা সমগ্র ভারতের গৌরবস্থল বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতির কর্ম্মের উল্লেখ করিব। উত্তরবঙ্গে অচিরকাল মধ্যে এই সমিতি যে কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন তাহা ভারতেতর দেশেও গৌরবের সহিত উল্লিখিত হইতেছে। গৌড়ের সর্ব্ববিভাগের ধারাবাহিক ইতিহাস রচনায় এই সমিতি হস্তক্ষেপ করিয়া ইতিমধ্যেই গৌড়-রাজ-মালা ও গৌড়-লেখ-মালা নামক অমূল্য গ্রন্থদ্বয় প্রকাশ করিয়াছেন। সমিতি উত্তরবঙ্গের নানা স্থান হইতে উপকরণ সংগ্রহ করিয়া রাজসাহিতে যে চিত্রশালা প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, এ পর্য্যন্ত সরকারী চিত্রশালা ব্যতীত বঙ্গের আর কুত্রাপি এরূপ চিত্রশালা প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত কুমার শরৎকুমার রায় এম্ এ মহোদয়ের অকাতর অর্থব্যয় ও শ্রম এবং ঐতিহাসিকবর শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় প্রমুখ সদস্যগণের গভীর গবেষণা, ঐকান্তিকতা শ্রমসহিষ্ণুতাই এই সমিতির সাফল্যের কারণ।

বরেন্দ্র-অনুসন্ধান সমিতি

গৌড় অনুসন্ধান কার্য্য আরম্ভ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সন্নিহিত কামরূপ অনুসন্ধানের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি হইতেছিল, কেননা এই উভয়দেশের মধ্যে স্মরণাতীত কাল হইতেই ঘনিষ্ঠতা ছিল। উভয়ের মধ্যে ঐতিহাসিক নানা ব্যাপার এরূপভাবে জড়িত আছে যে একের অভাবে অন্যের ইতিহাস রচনার প্রয়াস ব্যর্থ হইবার যথেষ্ট কারণ রহিয়াছে। উত্তরবঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনের বিগত পঞ্চম অধিবেশনে গৃহীত একটি প্রস্তাব দ্বারা এই অনুসন্ধান-সমিতি গঠিত হওয়ার পর একবর্ষ মধ্যে তাহার উল্লেখযোগ্য কর্ম্ম-পরিচয় প্রদানের অবসর উপস্থিত হইয়াছে। এই সমিতির চেষ্টায় অনাবিষ্কৃতপূর্ব্ব ভাস্করবর্ম্মার তাম্রশাসনের পাঠোদ্ধার হইয়াছে। এই তাম্রশাসনের আলোচনা সহ পাঠ এবং কামরূপের অন্যান্য রাজগণ

কামরূপ-অনুসন্ধান সমিতি

প্রদত্ত তাম্রশাসন "কামরূপ শাসনাবলী" আখ্যায় রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় ধারাবাহিকরূপে প্রকাশিত হইতেছে। পরে উহাকে পৃথক্ গ্রন্থাকারে চিত্রাদিসহ মুদ্রিত করা হইবে। এই সমিতির কর্ম্মবিবরণ সম্মিলনের বর্ত্তমান অধিবেশনে উপস্থাপিত করা নির্দ্ধারিত হইয়াছিল তদনুসারে সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত কালীচরণ সেন মহাশয় তাঁহার কর্ম্মবিবরণ সহ অদ্য এখানে উপস্থিত হইয়াছেন আপনারা তাহার নিকটেই উহা শ্রবণ করিবেন এবং সম্মিলন বিবরণীর সহিত ঐ কার্য্য-বিবরণীও যথাসময়ে মুদ্রিত হইবে।

ইহার পরেই পুরাতত্ত্বালোচনায় রঙ্গপুর-পরিষৎ নিজে বিগত দুইবর্ষে যতদূর অগ্রসর হইয়াছেন তাহারও একটু উল্লেখ প্রয়োজন।

রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষৎ সংসৃষ্ট অনুসন্ধান-সমিতি ও চিত্রশালা।

রঙ্গপুরের সুযোগ্য কালেক্টর ও রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষদের নবনির্ব্বাচিত সভাপতি শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দে আই, সি, এস্ মহোদয়ের নেতৃত্বে রঙ্গপুরের ঐতিহাসিক স্থানগুলির অনুসন্ধান ও প্রত্নতত্ত্বের উপকরণ সংগ্রহার্থ একটি অনুসন্ধান-সমিতি গঠিত হইয়াছে। এই অচির গঠিত সমিতির কর্ম্মানুষ্ঠান মধ্যে শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার লাহিড়ী মহাশয় সংগৃহীত কতকগুলি প্রস্তর মূর্ত্তি একখানি প্রস্তর ফলক এবং শ্রীযুক্ত অবনীচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বি, এ, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট কর্ত্তৃক সংগৃহীত প্রস্তর ও ধাতুমূর্ত্তি উল্লেখযোগ্য।

পূর্ব্ব সংগৃহীত বিবিধ উপকরণ ও গ্রন্থাদি রক্ষার নিমিত্ত মহামান্য ভারত সম্রাট্ এড্ওয়ার্ডের স্মৃতি রক্ষার্থ ভবনের সঙ্গে চিত্রশালা গৃহ নির্ম্মাণ আরম্ভ হইয়াছে। উদ্দেশ্যের "ঘ" সংখ্যক বিষয়টি এতদ্দ্বারা ও অন্যান্য চিত্রশালার প্রতিষ্ঠা দ্বারা সংসাধিত হইয়াছে। এই সকল স্থানীয় চিত্রশালা প্রতিষ্ঠার দ্বারা উত্তরবঙ্গে

প্রত্নতত্ত্বালোচনার ভিত্তি দৃঢ় হইতে চলিল। এই প্রসঙ্গে সদাশয় ভারতগবর্ণমেণ্ট হইতে কিয়ৎকাল পূর্ব্বে যে মন্তব্যলিপি প্রচারিত হইয়াছে তাহা আমাদিগের সম্পূর্ণ অনুকূল। স্থানীয় চিত্রশালা প্রতিষ্ঠায় ভারত গবর্ণমেণ্টের অধীনস্থ প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ হইতে নানা প্রকারে সাহায্য করা হইবে এবং প্রয়োজন হইলে অর্থসাহায্যও প্রদত্ত হইবে। গবর্ণমেণ্টের এই উদার মন্তব্য সর্ব্বত্র সাদরে গৃহীত হইয়াছে এবং তজ্জন্য সাহিত্যিক মণ্ডলী আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছেন।

উত্তরবঙ্গের প্রধান প্রধান সাহিত্যিক সমিতি গুলির উল্লেখ করিয়া পল্লীগ্রামেও যে এরূপ অনুষ্ঠান আরব্ধ হইয়াছে তাহার পরিচয়রূপে রঙ্গপুরের অন্তর্গত বেলপুকুর পল্লীগ্রামের সাহিত্য-পরিষৎ ও বগুড়ার অন্তর্গত রায়কালী পল্লীর সাহিত্য সমিতির নামোল্লেখ করিতেছি। প্রথমোক্ত সমিতি রঙ্গপুর পরিষদের সংগ্রহ কার্য্যে নানারূপে সাহায্য করিতেছেন।

এতদতিরিক্ত সাহিত্য-সমিতির বিষয় আমরা অবগত হইতে পারি নাই। উত্তরবঙ্গ ও আসামের বঙ্গ-সাহিত্য-সমিতিগুলি তাঁহাদের কর্ম্ম পরিচয় বর্ষে বর্ষে সংক্ষেপে লিখিয়া পাঠাইলে আমরা সম্মিলন কার্য্যবিবরণের সহিত তাহা মুদ্রিত করিয়া তাঁহাদিগকে উৎসাহিত করিতে পারি। আশা করি ঐ সকল সমিতির কর্ত্তৃপক্ষগণ এ বিষয়ে সম্মিলন-পরিচালক-সমিতিকে সাহায্য করিবেন। সংবাদ না দেওয়ায় অনেক সমিতির কর্ম্ম পরিচয় আমরা বিশদরূপে প্রদান করিতে অক্ষম হইয়া থাকি ইহা বাঞ্ছনীয় নহে। একত্রে উত্তর-বঙ্গের সাহিত্যিক অনুষ্ঠানের এরূপ একটা বিবরণ বর্ষে বর্ষে সম্মিলনের পরিচালন সমিতির তত্ত্বাবধানে মুদ্রিত হইলে কার্য্যবিবরণের মূল্য বৃদ্ধি হইবে এবং ভবিষ্যতে উহা বিশেষ প্রয়োজনে আসিবে সন্দেহ নাই।

এই সকল সাহিত্য সমিতির সদস্যগণ মধ্যে বর্ষে বর্ষে বঙ্গভাষার লেখক সংখ্যা আশাতীত রূপে বৃদ্ধি পাইতেছে। এতদ্ব্যতীত উত্তরবঙ্গসম্মিলনের প্রতি অধিবেশনে প্রবন্ধসহ নূতন লেখকগণ উপস্থিত হইতেছেন। উত্তর-বঙ্গের সাহিত্যিক পত্রী যাহা গৌরীপুর সম্মিলনের কার্য্যবিবরণীর সহিত মুদ্রিত হইয়াছে এই প্রকারে তাহার আকার এরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছে যে বর্দ্ধিত কলেবরে ঐ সাহিত্যিক পত্রী পুনঃ প্রকাশের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

বাঙ্গালা ও অসমীয় সাহিত্যিকগণের পরস্পরের মধ্যে ভাব বিনিময়ের দ্বারা উভয় ভাষার উন্নতি সাধনের চেষ্টা করে বিগত কামাখ্যা সম্মিলন আহূত হইয়াছিল। ৺মায়ের কৃপায় এই সম্মিলনের উদ্দেশ্য অনেকটা সফলতা লাভ করিয়াছে। ঐ সম্মিলনের উজ্জ্বল কার্য্য-বিবরণ সম্মিলন-পরিচালন-সমিতি হইতে মুদ্রিত হইয়াছে।

উত্তরবঙ্গের প্রাচীন কীর্ত্তিগুলির নিদর্শন মধ্যে যে কয়েকটি রক্ষা করার নিমিত্ত সম্মিলনে প্রস্তাব করা হইয়াছিল তন্মধ্যে দিনাজপুর বাদাল গ্রামের গরুড়-স্তম্ভটির মূলদেশ পূর্ব্বতন এক কালেক্টারের চেষ্টায় বাঁধাইয়া দেওয়া হইয়াছে। সুতরাং উহা সম্প্রতি আর নষ্ট হইবার আশঙ্কা নাই।

প্রাচীনকীর্ত্তি রক্ষা

পালরাজ ভবচন্দ্র প্রতিষ্ঠিত বাগ্দেবীর মন্দির, সাহইস্মাইল গাজীর সমাধিমন্দির রক্ষার্থ ভূতপূর্ব্ব পূর্ব্ববঙ্গ ও আসাম গবর্ণমেণ্টের নিকটে আবেদন করা হইয়াছিল এতৎসম্বন্ধে গবর্ণমেণ্ট হইতে অনুসন্ধানও করা হইয়াছে; ঐ গবর্ণমেণ্টের পরিবর্ত্তনের পরে তৎসম্বন্ধে কিরূপ বিবেচিত হইয়াছে তাহা আজও জানিতে পারা যায় নাই। হিন্দু ও মুসলমানের নিজ নিজ সম্বন্ধে পবিত্র এরূপ দুইটি ঐতিহাসিক স্মৃতি নিদর্শন রক্ষা করে মহাশয় বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্টের সকরুণ দৃষ্টি আমরা পুনরায় আকর্ষণ করিতেছি।

বগুড়ার সুপ্রসিদ্ধ ও সুপ্রাচীন কালগ্গেশ্বরীর মন্দির সংস্কার-কল্পে দিনাজপুরাধিপতি মহারাজা বাহাদুরের দৃষ্টি আকর্ষিত হইয়াছে। ঐ মন্দির সমীপবর্ত্তী পঙ্কিল পুষ্করিণীর পঙ্কোদ্ধার কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে। এক্ষণে মূল-মন্দিরটির সংস্কার হইলে মহারাজ বাহাদুরের নাম মন্দিরের সঙ্গে স্মরণীয় হইয়া থাকিবে। বঙ্গসাহিত্যের জনক-স্থানীয় মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের আদি কর্ম্মভূমি রঙ্গপুরে তাঁহার স্মৃতিরক্ষার নিমিত্ত রঙ্গপুর সাহিত্য-পরিষৎ সাহায্য সংগ্রহ করিতেছেন। অচিরে এই স্মৃতি রক্ষার্থ ফলকসহ একটি স্তম্ভ বা তদ্রূপ কোন নিদর্শন প্রতিষ্ঠা করার ব্যবস্থা করা হইবে।

অতঃপর সম্মিলন সমক্ষে নূতন প্রস্তাব উপস্থাপিত করার অবসর আসিয়াছে। দিনাজপুর জেলার বংশীহারা থানার অন্তর্গত টাঙ্গন নদীর তীরে মদনবাটী গ্রামে সুপ্রসিদ্ধ খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারক কেরী সাহেব একটি মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন পূর্ব্বক "মথি লিখিত সুসমাচার" নামক গ্রন্থ ১৭৯৩ খৃঃ অব্দে প্রচার করিয়াছিলেন, অনুসন্ধানে এরূপ অবগত হওয়া গিয়াছে। মদনবাটী বঙ্গসাহিত্যের মুদ্রিত গ্রন্থের আদি স্থান হইলে তাহাকে চিহ্নিত করিয়া রাখিতে চেষ্টা করা একান্ত কর্ত্তব্য।

রঙ্গপুর পীরগঞ্জ থানার অধীন শিবপুর গ্রামের দক্ষিণে ক্ষুদ্র ঝাড়বিশিলা গ্রামে অম্বিয়াবাণী, জঙ্গনামা, হেতুজ্ঞান, মহরমপর্ব্ব প্রভৃতি বঙ্গভাষায় রচিত বিবিধ মহম্মদীয় ধর্ম্মগ্রন্থ প্রণেতা কাজি হেয়াতমামুদের সমাধি স্থানে আজও কোন স্মৃতি ফলক প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। মহম্মদীয় ভ্রাতৃগণ সাহায্য করিলে এই স্মৃতিফলক প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত সচেষ্ট হওয়া যাইতে পারে। রাজসাহী জেলার ওয়ালিয়া থানার অন্তর্গত বরবরিয়া গ্রামে আত্রায়ী নদীর তীরে প্রসিদ্ধ রামায়ণ রচয়িতা কবি অদ্ভুতাচার্য্যের বাসবাটী ছিল, ঐ স্থানও পরিচিহ্নিত করিয়া রাখা কর্ত্তব্য। সাহিত্যসেবী কুমার

শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায় এম্, এ, মহোদয়ের অর্থানুকূল্যে এই মহাকবির সুবৃহৎ রামায়ণ গ্রন্থের আদিকাণ্ড বঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষৎ হইতে সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়া তাঁহার কীর্ত্তি রক্ষিত হইয়াছে। এবম্বিধ আরও রক্ষাযোগ্য নিদর্শন রক্ষার্থ আপনারা সম্মিলন হইতে প্রস্তাব উপস্থাপিত করিতে পারেন।

কেন্দ্র-সমিতিকে অর্থসাহায্য করার জন্য পৃথক কোনও আয়োজন না করিয়া উত্তরবঙ্গ ও আসামে রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষদের সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি করার প্রস্তাব গৌরীপুরে গত তৃতীয় অধিবেশনে গৃহীত হইয়াছে। দিনাজপুর, রঙ্গপুর, বগুড়া এই জেলাত্রয় প্রধানতঃ সম্মিলনের এই নির্দ্দেশ পালন করিয়াছেন। মালদহ, রাজসাহী ও কোচবিহার অংশতঃ পালন করিয়াছেন কিন্তু পাবনা, জলপাইগুড়া, দার্জ্জিলিঙ্গ এই জেলাত্রয়ে সদস্য সংখ্যা বিরল, নাই বলিলেও চলে। আসাম কিয়ৎ পরিমাণে সদস্য দিয়াছে। সদস্য সংখ্যা আশানুরূপ বৃদ্ধি না হইলে সম্মিলনের উদ্দিষ্ট বিষয় গুলির সমাধান দুরূহ হইবে। এজন্য বিশেষ রূপে চেষ্টা করা সম্মিলন-হিতৈষীমাত্রেরই কর্ত্তব্য। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ এ বিষয়ে উত্তরবঙ্গকে যে সাহায্য করিতে ছিলেন তৎসম্বন্ধে সম্প্রতি তাহারা ভিন্নরূপ কথা তুলিয়াছেন। সম্মিলনে এ বিষয়ের মীমাংসা হওয়াও বাঞ্ছনীয়।

শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী
সম্মিলন-সম্পাদক।

এই কার্য্যবিবরণ গ্রহণার্থ বগুড়ার প্রবীণ সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত বেণী মাধব চাকী বি, এল, মহাশয়ের প্রস্তাব রাজসাহীর শ্রীযুক্ত শ্রীরাম মৈত্রেয় মহাশয় সমর্থন করিলে সর্ব্বসম্মতিতে পরিগৃহীত হইল।

শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় বিষয়-নির্ব্বাচন-সমিতির সদস্যগণের

নিম্নলিখিত নাম তালিকা পাঠ করিয়া ঘোষণা করিলেন যে সভাপতি মহাশয় সন্ধ্যার পর সাহিত্যিকগণের বাসের নিমিত্ত নির্দ্দিষ্ট গবর্ণমেণ্ট বিদ্যালয়ে বিষয়-নির্ব্বাচন-সমিতির অধিবেশনে যোগদান করিবেন। বিষয়-নির্ব্বাচন-সমিতির নাম তালিকা পাঠের পর বগুড়া সাহিত্য-সমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্রদাস গুপ্ত বি, এল্ মহাশয় আর কয়েকজনের নাম যোগ করিতে অনুরোধ করিলে তাহাও তালিকা ভুক্ত করা হইল।

সমিতির সদস্যগণের নাম তালিকা।

১। শ্রীযুক্ত মাননীয় বিচারপতি আশুতোষ চৌধুরী
সম্মিলন-সভাপতি।

২। শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দে বি, এ, আই, সি, এস্,
সম্মিলন-পরিচালন-সমিতির সভাপতি।

৩। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী
উত্তরবঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনের স্থায়ী সম্পাদক।

৪। শ্রীযুক্ত মহারাজ গিরিজানাথ রায় বাহাদুর
অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি।

৫। শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এম্, এ, বি, এল্,
অভ্যর্থনা-সমিতির-সম্পাদক।

রঙ্গপুর সদর

৬। শ্রীযুক্ত জগদীশনাথ মুখোপাধ্যায়

গাইবাঁধা

৭। শ্রীযুক্ত তারাসুন্দর রায় বি, এল্,

নীলফামারী

৮। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য বি, এল্

কুড়িগ্রাম

৯। শ্রীযুক্ত কামাখ্যাপ্রসাদ মজুমদার

বগুড়া

১০। " বেণীমাধব চাকী বি, এল্,

১১। " সুরেশচন্দ্র দাস গুপ্ত বি, এল,

মালদহ

১২। " বিপিনবিহারী ঘোষ, বি, এল

১৩। " রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী

রাজসাহী

১৪। " অধ্যাপক যদুনাথ সরকার এম্, এ,

১৫। " অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় বি, এল্,

নাটোর

১৬। " রাজেন্দ্রলাল আচার্য্য বি, এ,

নওগাঁ সবডিবিসন

১৭। " শ্রীরাম মৈত্রেয়

আসাম

১৮। " পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ এম্, এ,

১৯। " আশুতোষ চট্টোপাধ্যায় এম্, এ

সম্মিলনে পঠিতব্য প্রবন্ধগুলি তিনভাগে বিভক্ত করিয়া তাহার পরীক্ষার ভার নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণের উপরে অর্পিত হইল—

সাহিত্য

শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ এম, এ,

পণ্ডিত রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী

ইতিহাস

শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার এম্, এ,

„ অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় বি, এল্,

বিজ্ঞান

„ পঞ্চানন নিয়োগী এম্, এ,

বিবিধ

„ বিনয়কুমার সরকার এম্, এ,

„ হরেন্দ্রচন্দ্র বিদ্যাবিনোদ

অতঃপর সভাপতি মহাশয়ের আদেশে বারিপাতনিবন্ধন অপরাহ্ণ ৩টা হইতে ৪টা পর্য্যন্ত সম্মিলনের কার্য্য স্থগিত থাকে।

(অপরাহ্ণ ৪৷৷০ ঘটিকা হইতে ৭ ঘটিকা)

১। সঙ্গীত—

২। অভ্যর্থনা-সমিতির সম্পাদকের মন্তব্য।

৩। কামরূপ-অনুসন্ধান-সমিতির সম্পাদকের কার্য্যবিবরণী পাঠ।

৪। বিবিধ প্রস্তাব।

৫। প্রবন্ধ পাঠ।

৬। আলোকচিত্র প্রদর্শন ও বক্তৃতা।

বৃষ্টি থামিবার সম্ভাবনা নাই দেখিয়া সভামণ্ডপ হইতে স্থানীয় নাট্যশালায় অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকার সময় সভাপতি মহাশয়ের অসুস্থতা নিবন্ধন তাঁহার অনুমোদন ক্রমে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার এম্, এ, মহাশয়ের সভাপতিত্বে সম্মিলনের কার্য্য পুনরায় আরম্ভ হইল।

এই অধিবেশন প্রারম্ভে নিম্নোক্ত সঙ্গীত হইল,—

মূলতান—একতালা।

গান।

জনম অবধি যে ভাষা শ্রবণে
ঢালিছে স্বরগ অমিয়া,
মরমে মধুর পশে যার সুর,
শোক, তাপ, দুখ মুছিয়া।
মায়ের প্রথম আহ্বান পুণ্য
যে ভাষায় শুনি শ্রবণ ধন্য
দয়াময় নাম সে যে যে ভাষায়
যার প্রেমে হিয়া প্লাবিয়া (গলিয়া)
সহস্র ভাষা এখানে না ভাযে
আপনায় তুচ্ছ মানিয়া।
প্রাণ মুগ্ধ করা হেন মধু বাণী,
বিনা সাধনায় সিদ্ধি-বিধায়িনী,
হরিষে বিষাদে আনন্দ দায়িনী,
ধরায় মেলেনা খুঁজিয়া,
শিরায় শিরায় শান্তি ধারা বয়
যে বাণী শুনিয়া বলিয়া।
রাজরাজেশ্বরী সকল ভাষার,
এ বঙ্গ-ভারতী জননী আমার,
পূজিতে তাঁহারে আয়োজন এই
দীন উপচার লইয়া

ধন্য হইব বাণীর চরণ
বাণী-সুত সনে পূজিয়া।
এস ধনী মানী জ্ঞানী সুধীজন,
এস দীন হীন এস অভাজন,
মায়ের সন্তান সবাই সমান,
এস সব ভেদ ভুলিয়া।
আজি ভাই ভাই মিলে একঠাই,
ধন্য হই মায়ে পূজিয়া।

সঙ্গীত অন্তে অভ্যর্থনা-সমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এম্, এ, বি, এল্, মহাশয় দিনাজপুর-সম্মিলন সম্বন্ধে নিম্নোক্ত সারগর্ভ ও সুদীর্ঘ মন্তব্য প্রকাশ করিলেন—

দিনাজপুর সাহিত্য-সম্মিলন সম্বন্ধে মন্তব্য।

এবার উত্তর-বঙ্গসাহিত্য-সম্মিলনের দিনাজপুরের অধিবেশন লইয়া সাহিত্যিক মহলে বেশ একটু আন্দোলন হইয়া গেল। ইহা দিনাজপুরবাসীর পক্ষে আনন্দের কথা। সাহিত্য-চর্চ্চায় বা সাহিত্যানুশীলনে দিনাজপুর বিশেষ অগ্রগামী নহে এবং দিনাজপুরের অধিবেশন সাহিত্যিকগণের বিশেষরূপ চিত্তাকর্ষণ করিতে পারিবে এরূপ কল্পনা আমাদিগের হয় নাই। তথাপি ঘটনাচক্রে, দিনাজপুরে এবং চট্টগ্রামে একই সময়ে বাঙ্গালা দেশের দুই প্রান্তে সম্মিলনের দুইটি অধিবেশনের প্রস্তাবে সাহিত্যিকগণের প্রতিবাদ দিনাজপুরের অধিবেশনটিকে আমাদিগের আশার অতিরিক্ত উচ্চ স্থান প্রদান করিয়াছে। দিনাজপুরে গত ইষ্টারের অবকাশে সম্মিলন বসিবার কথা ছিল, তাহা আপনারা অবগত আছেন। চট্টগ্রামে বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের অধিবেশনের সময় দিনাজপুরে উত্তর-বঙ্গ

সাহিত্য-সম্মিলনের অধিবেশনের প্রস্তাব করায় আমাদিগের কার্য্য এবং আমাদিগের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কোন কোন সমালোচক বেশ একটু তীব্র ভাষায়, এমন কি লৌকিক ভদ্রতার সীমা অতিক্রম করিয়া, নানা কথা সংবাদপত্রে লিখিয়াছিলেন। আমরা চট্টগ্রাম-সম্মিলনের সময়-সম্বন্ধে অভিজ্ঞ থাকা সত্ত্বেও ঐ সম্মিলনটি যাহাতে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর না হয় কতকটা এই অভিপ্রায়ে দিনাজপুরে ঠিক ঐ সময়েই আর একটি সাহিত্য-সম্মিলনের উদ্যোগে রত হইয়াছিলাম কিনা তাহার যথোচিত কৈফিয়ত আমরা তৎকালেই দিয়াছি। মূল পরিষদের কর্তৃপক্ষের সম্মতি অনুসারেই আমরা ইষ্টার-অবকাশে সম্মিলনকে আহ্বান করিয়াছিলাম। কিন্তু অদ্যকার এই সম্মিলনে সমবেত সাহিত্যিকবর্গকে মুক্তকণ্ঠে বলিতে চাই যে, আমরা বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের সফলতার বিরোধী কোন কার্য্যের অনুষ্ঠান করা ত দূরের কথা, তাহা কল্পনাতেও আনিতে পারি না, এবং যে-সকল সমালোচক আমাদিগকে একতরফা বিচারে অপরাধী সাব্যস্ত করিয়াছিলেন তাঁহারা যুক্তি এবং ন্যায়ের পথ অনুসরণ করেন নাই। বঙ্গের সমগ্র সাহিত্যিকবর্গের চেষ্টা এবং উদ্যমের ফল যে-সম্মিলন তাহাকে ব্যর্থ করিবার কল্পনা বাঙ্গালা সাহিত্যের হিতাকাঙ্ক্ষী কোন ব্যক্তির হৃদয়ে স্থান পাইতে পারে না, ইহা বলাই বাহুল্য। উত্তরবঙ্গ-সাহিত্য-পরিষৎ মূল-পরিষদের শাখা। শাখা কর্তৃক মূলের অবজ্ঞা কখনই সম্ভব নহে। তবে আমরা পৃথক হইতেই সম্মিলনের সময়াবধারণ করিয়া কার্য্যে অনেকদূর অগ্রসর হইয়াছিলাম বলিয়া মূল পরিষদের কর্তৃপক্ষগণের মত গ্রহণ করিয়াই কার্য্যে ব্রতী হইতেছিলাম। কলিকাতায় পত্র লিখিয়া ও প্রতিনিধি প্রেরণ করিয়া আমরা ঐ মত প্রাপ্ত হইয়াছিলাম। সাহিত্যসেবিগণের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ উপেক্ষা করা অসম্ভব মনে করিয়া ইষ্টার অবকাশে সম্মিলনের প্রস্তাব ত্যাগ করিয়া বর্ত্তমান সময়ে এই সম্মিলনের উদ্যোগ করিতে বাধ্য

হইয়াছি। বন্ধুগণ! আপনারা ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইতে এই অসহনীয় গ্রীষ্মের মধ্যে শারীরিক নানাবিধ ক্লেশ স্বীকার করিয়া বাণীর পদসেবার জন্য আজ এই মণ্ডপে সমবেত হইয়াছেন, ইহাতে আপনাদিগের "ভগবতী ভারতী"র প্রতি ঐকান্তিক ভক্তি এবং তাঁহার সেবার জন্য তীব্র অনুরাগেরই পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। আমরা আপনাদিগের অভ্যর্থনার জন্য উপযুক্তরূপ আয়োজন করিতে পারি নাই এবং আপনারা প্রত্যেক বিষয়ে নানা অসুবিধা অনুভব করিবেন ইহা অনিবার্য্য; কিন্তু ভক্ত যখন মাতৃ-মন্দিরে পূজোপকরণ সহ উপস্থিত হয়, তখন তাহার বাহ্য সুখ স্বচ্ছন্দতার প্রতি লক্ষ্য থাকে না; তিনি অন্তরে যে আনন্দ উপভোগ করেন তাহাতেই বিভোর হইয়া থাকেন; একথা জানি বলিয়াই আজ আমাদিগের এই ক্ষুদ্র আয়োজন সত্ত্বেও মাব এই পূজামণ্ডপে আপনাদিগকে আহ্বান করিতে সাহস করিয়াছি। আমাদিগের শত অপরাধ আপনারা মার্জ্জনা করিবেন এবং আমাদিগের কার্য্যে শত শত ত্রুটি থাকিলেও আপনারা আমাদিগের আন্তরিক শ্রদ্ধা এবং প্রীতি সাদরে গ্রহণ করিবেন ইহাই আমাদিগের প্রার্থনা।

উত্তরবঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনের এইটি ষষ্ঠ অধিবেশন। সাহিত্য-সম্মিলন সম্বন্ধে কয়েকটি সাধারণ কথা আপনাদিগের নিকট আজ উপস্থিত করিব,— ভরসা করি তাহা অপ্রাসঙ্গিক বলিয়া বিবেচিত হইবে না। এই সাহিত্য সম্মিলনগুলি সাহিত্য-পরিষদের চেষ্টাতেই সংঘটিত হইতেছে। উত্তরবঙ্গ-সাহিত্য-পরিষৎ মূল-সাহিত্য-পরিষদের শাখা মাত্র। এজন্য কেহ কেহ এরূপ মত প্রকাশ করিয়া থাকেন যে, মূল পরিষদের পক্ষ হইতে একটি সাহিত্য-সম্মিলন তো প্রতি বৎসর হইয়াই থাকে, আবার উত্তর-বঙ্গের একটা সাহিত্য-সম্মিলন কেন? আর এই সেদিন চট্টগ্রামে অত বড় একটা সম্মিলনের পর আবার এই ক্ষুদ্র সম্মিলনের আয়োজন

কেন? সাহিত্য-সম্মিলনগুলি যদি কেবল মাত্র একটি করিয়া বাৎসরিক উৎসব বলিয়া পরিগণিত হয় এবং পরস্পরের সহিত পরিচয় এবং আনন্দবৰ্দ্ধনই যদি ইহার চরম ফল হয়, তাহা হইলে এই শ্রেণীর মতাবলম্বী ব্যক্তিগণের উক্তিই ঠিক বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। কিন্তু সাহিত্য-সম্মিলনকে কেবল মাত্র কতকগুলি সাহিত্যানুরাগী ব্যক্তির একত্র সমাবেশ এবং পরস্পর পরিচয় এবং তদ্দ্বারা আনন্দবৰ্দ্ধনই ইহার উদ্দেশ্য এরূপ মনে করিলে সাহিত্য-সম্মিলনকে বড়ই খাটো করা হয়। বঙ্গভাষাকে নানা উপায়ে পরিপুষ্ট এবং বৰ্দ্ধিত করিয়া ভাষার এবং বঙ্গসাহিত্যের উন্নতিকল্পেই বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের প্রতিষ্ঠা হয়। কিন্তু কেবল কলিকাতায় বসিয়া মুষ্টিমেয় সাহিত্যানুরাগী ব্যক্তির চেষ্টায় বঙ্গসাহিত্যের উন্নতি সম্ভব নহে। এই জন্যই প্রতি বৎসর ভিন্ন ভিন্ন স্থানে সাহিত্য-সম্মিলনের উদ্যোগ হইতেছে। সাহিত্য-পরিষদের যে-সকল শাখা-সভা স্থানে স্থানে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহাদিগের দৃষ্টিও এই পথে পতিত হওয়ায় তাঁহারাও এক একটি করিয়া সম্মিলনের আয়োজন করেন। আমরা সর্ব্বদাই নিজ নিজ বিষয়কর্ম্মে এতই নিরত যে, সাহিত্য-সেবানুরাগ আমাদিগের হৃদয়ে প্রায়ই স্থান পায় না এবং যাহারা ভগবতী ভারতীর সেবানুরক্ত তাঁহাদিগেরও উপযুক্তরূপ সুযোগ ঘটিয়া উঠে না। বঙ্গদেশের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে কত নীরব সাহিত্যিক অজ্ঞাতভাবে কাল কাটাইতেছেন যাঁহাদিগের বীণা একটু আঘাত প্রাপ্ত হইলেই মুখরিত হইয়া উঠিতে পারে, কত অতীত গৌরবের পুঙ্খাকৃত স্মৃতিচিহ্ন নানা স্থানে নিহিত রহিয়াছে যাহা এক হইতে বহু ঘটনাবলীর প্রকৃত ইতিহাসের উপাদান সংগ্রহ করা যাইতে পারে, বঙ্গসাহিত্য-গঠনোপযোগী কত মূল্যবান সামগ্রী নানা স্থানে ছড়াইয়া রহিয়াছে যাহাকে একত্রিত এবং কেন্দ্রীভূত করিলে বঙ্গভাষা এবং বঙ্গ-সাহিত্যকে নানা অলঙ্কার-সুশোভিত করা যাইতে পারে। সাহিত্য-

সম্মিলন বর্ষে বর্ষে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে অধিষ্ঠিত হইয়া এই নীরব সাহিত্যিক-দিগকে মুখর করিয়া তুলিবে; যাঁহারা সাহিত্য-সেবানুরাগী কিন্তু সময় এবং সুযোগ অভাবে সাহিত্য-সেবায় বিরত, তাহাদিগকে বাণীর পূজার জন্য আহ্বান করিয়া তাঁহাদিগের হৃদয়ে সাহিত্যানুরাগ বর্দ্ধিত করিয়া দিবে; ইতিহাসের এবং বঙ্গসাহিত্যের যে-সকল অমূল্য উপাদান অপরি-জ্ঞাত অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে সেইগুলিকে কুড়াইয়া আনিয়া বঙ্গ সাহিত্যকে বর্দ্ধিত এবং পুষ্ট করিবে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ এই উদ্দেশ্যেই সাহিত্য-সম্মিলনের অনুষ্ঠান প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন; কিন্তু এই সম্মিলনকে প্রকৃতপক্ষে উদ্দেশ্য সাধনের উপযোগী করিতে হইলে কেবল মাত্র বড় বড় সহরে প্রথিতনামা সাহিত্যিকগণের একটি করিয়া সভা প্রতিবর্ষে আহ্বান করিয়া নিরস্ত হইলে চলিবে না। প্রত্যেক বাঙ্গালীকে তাহার মাতৃভাষার প্রতি অনুরাগ জাগাইয়া দিবার জন্য তাহার রুদ্ধ দ্বারে উপস্থিত হইয়া আঘাত করিতে হইবে এজন্য বঙ্গদেশের ভিন্ন ভিন্ন কেন্দ্রে ভিন্ন ভিন্ন পরিষৎ স্থাপন করিয়া কর্ম্মক্ষেত্রকে যতদূর সম্ভব বিস্তৃত করিতে হইবে। আবার এই সকল ভিন্ন ভিন্ন শাখা-পরিষৎ তাহাদিগের কর্ম্মভূমির অন্তর্গত ভিন্ন ভিন্ন স্থানে নিজের সম্মুখে সাহিত্যালোচনার জন্য সম্মিলন আহ্বান করিয়া বঙ্গসাহিত্যের সেবকগণের কার্য্যের সহায়তা করিবেন। অতএব, সাহিত্য-সম্মিলনকে কেবলমাত্র সাহিত্য-রথীগণের একটি বিচার সভায় পরিণত করিলে চলিবে না, ইহাকে একটা আড়ম্বরের গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ রাখিলে চলিবে না। ইহাকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত করিতে হইবে। ইহাকে সর্ব্বসাধারণের আপনার জিনিষ করিতে হইবে। যাঁহারা সাহিত্য-জগতে অপরিচিত অথচ প্রকৃত পক্ষে সাহিত্যের উন্নতি কামনা করেন তাঁহাদিগকে সম্মিলনে উপযুক্তরূপ স্থান প্রদান করিয়া সম্মিলনের কার্য্যে তাঁহাদিগের সহায়তা লাভ করিতে হইবে।

এই কারণেই বঙ্গদেশের নানা স্থানে এইরূপ ক্ষুদ্র সম্মিলনের আয়োজন একান্ত প্রয়োজন। এ জগতে "বড়"র আদর এবং সম্মান সর্ব্বত্র; কিন্তু "ছোট"কে অবহেলা করিলে চলিবে না। "ছোট"র মর্য্যাদা রক্ষা করিতে হইবে; নতুবা "বড়"র দাঁড়াইবার শক্তি থাকিবে না।

প্রসঙ্গক্রমে গত ইষ্টার অবকাশে দিনাজপুরের এবং চট্টগ্রামে দুইটি সম্মিলনের একই অধিবেশনের উদ্যোগের কথা আসিয়া পড়িল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, চট্টগ্রাম সম্মিলনকে খাটো করিবার অভিপ্রায়ে বা তাহার প্রতি অসম্মান প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে এরূপ প্রস্তাব হইয়াছিল এ কথা যাঁহারা প্রকাশ করিতে কুণ্ঠিত হন নাই তাঁহারা অত্যন্ত অন্যায় বিচারে আমাদিগকে বিড়ম্বিত করিয়াছেন। আমরা তৎকালে বলিয়াছিলাম এবং এখনও বলিতে চাই যে, বাগ্দেবীর পূজার আয়োজন কোন একস্থানে খুব আড়ম্বরের সহিত হইয়াছিল বলিয়া অন্য কোন স্থানে পূজার আয়োজন হইলে দেবীর অসম্মান হয় এরূপ যুক্তি গ্রহণ করিতে পারি না। বঙ্গদেশে যখন এমন দিন আসিবে যে উত্তরবঙ্গ পূর্ব্ববঙ্গ পশ্চিম-বঙ্গ দক্ষিণ-বঙ্গ প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে মায়ের পূজার মঙ্গল-শঙ্খ ভক্ত সাধকগণকে আহ্বান করিবে এবং একই সময়ে বঙ্গের নগরে নগরে এবং পল্লীতে পল্লীতে নানাবিধ পূজা-সম্ভার সহ পূজকগণ সমবেত হইবেন, তখন মনে করিব বাঙ্গলাদেশ প্রকৃত-পক্ষেই জাগিয়া উঠিয়াছে, ভগবতী ভারতীর পূর্ব্বাশিস আমরা লাভ করিয়াছি। আমরা অন্তরের সহিত কামনা করি বঙ্গদেশে এরূপ দিন আসুক, সুধীসমাজে বঙ্গবাসীর সাহিত্যোদ্যম দৃষ্টান্তস্বরূপে পরিগণিত হউক।

সাহিত্য-সম্মিলনীর আর একটি মহদুদ্দেশ্য লোকশিক্ষা। এই উদ্দেশ্য সাধন করিতে হইলেও সম্মিলনকে মুষ্টিমেয় সাহিত্যরথীর চেষ্টার ভিতরে

আবদ্ধ রাখিলে চলিবে না। লোকশিক্ষা যাহার উদ্দেশ্য তাহার দ্বার অবারিত থাকিবে, ক্ষুদ্রকে তাহাতে স্থান দান করিতে হইবে। সর্ব্বসাধারণকে ইহার ভিতরে টানিয়া লইতে হইবে। এজন্য সাহিত্য জগতে অপরিচিত ব্যক্তিগণকে সাহিত্যালোচনায় উৎসাহ প্রদান করিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। যাঁহাদিগের বড় বড় সাহিত্য-সভায় উপস্থিত হইয়া আপন যোগ্যতার পরিচয় দিবার সাহস এবং সামর্থ্য নাই, তাঁহাদিগকে ক্ষুদ্র সম্মিলনগুলিতে সাদরে আহ্বান করিয়া তাঁহাদিগের সাহিত্যানুশীলনের সুযোগ এবং সুবিধা করিয়া দিতে হইবে। এরূপ না করিলে সাহিত্য চিরকাল একটি ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকিবে, কখনও সর্ব্বসাধারণের সম্পত্তি হইবে না।

আজ দিনাজপুরবাসীর পরম সৌভাগ্য যে তাহারা দেশের খ্যাতনামা সাহিত্যিকগণকে আহ্বান করিয়া তাঁহাদিগের নিকট সাহিত্য বিষয়ক নানা কথা শুনিবার এবং দিনাজপুরের অবস্থা সম্বন্ধে তাঁহাদিগকে দুই একটি কথা বলিবার সুযোগ প্রাপ্ত হইয়াছেন।

দিনাজপুরের অবস্থার কথা উত্থাপন করিলে অনেকেই মনে করিবেন যে, এই স্থানের প্রাচীন তথ্য আবিষ্কার করাই সাহিত্যসেবিগণের একমাত্র কর্ত্তব্য। আমার মনে হয় এটি ঠিক নহে। সাহিত্য-পরিষৎ প্রাচীনের পক্ষপাতী। প্রাচীন কীর্ত্তি, প্রাচীন গৌরবস্মৃতি প্রভৃতির প্রকৃত ইতিহাস এবং বিবরণ সংগ্রহ করিয়া দেশের প্রকৃত ইতিহাস রচনা করা সাহিত্য পরিষদের একটি প্রধান ব্রত। কিন্তু এই প্রাচীনের অনুসন্ধান এবং প্রাচীন তথ্য আবিষ্কারের ঝোঁক সময় সময় এত অতিমাত্রায় দেখিতে পাওয়া যায় যে, অনেকে মনে করেন সাহিত্য-পরিষদের একমাত্র কার্য্য প্রাচীন তথ্য আবিষ্কার এবং ভগ্ন প্রস্তর ও ইষ্টকখণ্ড সকল সংগ্রহ করিয়া তাহা হইতে সম্ভব এবং অসম্ভব নানা প্রকার অনুমানিক সিদ্ধান্ত স্থির করা।

প্রকৃতপক্ষে প্রাচীন কীর্ত্তিচিহ্ন-সকল সংগ্রহ করা এবং তাহা হইতে দেশের প্রকৃত ইতিহাসের উপাদান গঠিত করা সাহিত্য-পরিষদের একটি প্রধান কার্য্য হইলেও একমাত্র কার্য্য নহে। আমরা বর্ত্তমান সময়ের সহিত অতি ঘনিষ্ঠভাবে সম্বদ্ধ। বর্ত্তমানে আমাদিগকে বাস করিতে হইতেছে। বর্ত্তমানকে গঠিত করিয়া ভবিষ্যতের উপযোগী করিতে হইবে। এই জন্যই অতীতের আদর্শ আমাদিগকে বুঝিতে হইবে। অতীতের আদর্শ বুঝিতে হইবে বর্ত্তমানকে গঠন করিবার জন্য। বর্ত্তমানকে আমরা অবহেলা করিতে পারি না। দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় আমাদিগের শিক্ষা কোন পথে যাইবে, আমাদিগের জাতীয় আদর্শকে কি করিয়া গঠিত করিতে হইবে, আমাদিগের জাতীয় সাহিত্যের অভাবগুলি কি উপায়ে পূর্ণ করা যাইতে পারে, ইহাই আমাদিগের প্রধান বিবেচ্য বিষয়। সাহিত্য পরিষদকে এই মহৎ কার্য্যটি সম্পন্ন করিতে হইবে। সাহিত্য সম্মিলনকে ইহার উপায় নির্দ্দেশ করিয়া দিতে হইবে। সাহিত্য-সম্মিলন যখন যেখানে অধিষ্ঠিত হন তখন সেই স্থানের শিক্ষার অবস্থার প্রতি দৃষ্টি করিবেন; স্থানীয় সাহিত্যানুরাগ এবং সাহিত্যানুশীলনের প্রতি লক্ষ্য রাখিবেন; এবং এইরূপে দেশের প্রকৃত অভাব নির্ণয় করিবেন।

দিনাজপুর সাহিত্য-সম্মিলন দিনাজপুরের সাহিত্য-সম্পদের অবস্থা জানিবার জন্য উৎসুক হইতে পারেন। দুঃখের বিষয় এই যে, দিনাজপুরের সাহিত্য-সম্পদের বিশেষ কোন চিত্তাকর্ষক বিবরণ আপনাদিগের সমক্ষে উপস্থিত করিতে পারিব না। আমাদিগের মধ্যে দুই একজন নীরব কবি এবং আড়ম্বরহীন গ্রন্থরচয়িতা না আছেন এমন নহে; কিন্তু তাঁহারা সাহিত্যক্ষেত্রে ধরা দিতে নিতান্তই নারাজ। তথাপি বঙ্গসাহিত্যকে যাঁহারা প্রকৃতপক্ষে অলঙ্কৃত করিয়াছেন, তাঁহাদিগের দুই একজনের নাম আমি এস্থলে উল্লেখ করিব। পরলোকগত কবি এবং শাস্ত্রাধ্যাপক

পণ্ডিত মহেশচন্দ্র তর্কচূড়ামণি সংস্কৃত-সাহিত্য এবং শাস্ত্রাদির আলোচনায় সর্ব্বদা ব্যাপৃত থাকিলেও বঙ্গসাহিত্যেরও তিনি বিশেষভাবেই সেবা করিয়াছেন। তাঁহার রচিত 'নিবাত-কবচ-বধ মহাকাব্য' তাঁহার বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রতি প্রীতি এবং শ্রদ্ধার সাক্ষ্য দিতেছে। তাঁহার বঙ্গভাষায় রচিত সঙ্গীতগুলি আজিও গায়কের মধুর কণ্ঠে আমাদিগের চিত্তবিনোদন করিয়া থাকে। সংস্কৃত ভাষায় তিনি যে-সকল গ্রন্থরচনা করিয়াছেন, তাহাতেই তাঁহার যশোরাশি সুদূর মহারাষ্ট্র এবং বোম্বাই প্রদেশে বিস্তৃত হইয়া দিনাজপুরকে ধন্য করিয়াছে। সাহিত্যিকগণ তাঁহার রচিত "ভগবচ্ছতকে" তাঁহার ভক্তির এবং ভাবের পরিচয় পাইয়া আনন্দিত হইবেন বলিয়া মনে করি। তাঁহার রচিত অন্যান্য সংস্কৃত গ্রন্থ 'রসকাদম্বিনী', 'কাব্যপেটিকা', 'দিনাজপুর-রাজবংশ' তাঁহার কবিত্বের উৎকৃষ্ট নিদর্শন। ইহা ব্যতীত তাঁহার রচিত আরও কয়েকখানি গ্রন্থ আছে, কিন্তু তাহা এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই।

"পাগলের পাগলামী" রচয়িতা পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত শ্যামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় একজন ভাবুক এবং ভক্ত কবি। তাঁহার রচিত সঙ্গীতগুলি বাঙ্গালা-সাহিত্যের বিশেষ অলঙ্কারস্বরূপ হইয়া রহিবে। ইনি আপাততঃ রাজসাহী-জেলাবাসী হইলেও প্রকৃতপক্ষে ইনি দিনাজপুরেরই লোক এবং আমরা ইঁহাকে আপনার বলিয়া গণ্য করিয়া থাকি।

'দিনাজপুর-পত্রিকা' নামে এখানে একখানি মাসিক পত্র ছিল। কিছুদিন হইল পত্রিকাখানি পরিচালনের পক্ষে বহু অন্তরায় উপস্থিত হওয়ায় লুপ্ত হইয়াছে। একখানি মাসিক অথবা সাপ্তাহিক পত্রের আবশ্যকতা অনেকেই অনুভব করিতেছেন, কিন্তু এ পর্য্যন্ত তাহার কোন ব্যবস্থা হয় নাই।

স্থানীয় 'ডায়মণ্ড জুবিলি' নামক রঙ্গালয়ের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীযুক্ত হরিচরণ

সেন মহাশয় রঙ্গালয়ের সহিত সংসৃষ্ট থাকিয়া বঙ্গসাহিত্যকে নানারূপে অলঙ্কৃত করিতেছেন। তাঁহার রচিত 'সীতারাম', 'অরুন্ধতী' এবং 'অদৃষ্ট' দৃশ্যকাব্যগুলি স্থানীয় সাহিত্যানুশীলনের হিসাবে উল্লেখযোগ্য বটে। ইহা ব্যতীত তাঁহার রচিত আরও তিনখানি নাটক আছে। স্থানীয় জেলা-স্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রপ্রসাদ নিয়োগী মহাশয় বিদ্যালয়ের পাঠোপযোগী গ্রন্থ রচনা করিয়া গভর্ণমেন্টের নিকট বিশেষ পুরস্কার লাভ করিয়াছেন। তিনি দিনাজপুরের অধিবাসী না হইলেও সম্প্রতি এখানে উপস্থিত থাকায় তাঁহার নাম এস্থলে উল্লেখ করিলাম।

স্থানীয় জনৈক ভূম্যধিকারী শ্রীযুক্ত রামপ্রাণ গুপ্ত মহাশয় বাঙ্গালার সাময়িক-পত্রের একজন সুপরিচিত লেখক। তাঁহার রচিত, রিয়াজউস্-সালাতিন, মোগল-রাজবংশ, পাঠান-রাজবংশ, ইসলাম-কাহিনী, রত্নমালা প্রভৃতি গ্রন্থ বঙ্গসাহিত্যের পুষ্টিসাধন করিয়াছে এবং তাঁহার প্রবন্ধাদি সাহিত্য-পরিষদের সভ্যগণের নিকট সুপরিচিত। স্থানীয় সবজজ শ্রীযুক্ত আশুতোষ মিত্র মহাশয়ের রচিত 'জেঠা মহাশয়' এবং 'আনন্দময়ী' বেশ ভাবপূর্ণ গ্রন্থ।

দিনাজপুরে সাহিত্য-চর্চ্চার প্রসঙ্গে দিনাজপুরে শিক্ষার অবস্থার কিঞ্চিৎ উল্লেখ করিতে চাই। দিনাজপুর জেলার বিস্তৃতি ৪০০০ বর্গ মাইল এবং লোকসংখ্যা মোটামুটি প্রায় ১৭ লক্ষ। ইহা হইতেই বুঝিতে পারিবেন যে, স্থানের বিস্তৃতি অনুসারে লোকসংখ্যার পরিমাণ অত্যন্ত কম। ইহার মধ্যে হিন্দু ৮ লক্ষ ৫৯ হাজার এবং মুসলমান ৪ লক্ষ ২৮ হাজার এবং বাকী অন্যান্য জাতি। এ বৎসর দিনাজপুর জেলার শিক্ষা-সম্বন্ধে যে মন্তব্য প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা হইতে জানা যায় যে, যে সকল ছাত্র এই জেলাতে শিক্ষালাভ করিতেছে তাহাদিগের সংখ্যা মোট ১৭ হাজার। ইহার মধ্যে বালক ৩২ হাজার ৪ শত এবং বালিকা সাড়ে চারি হাজার। অর্থাৎ

বিদ্যালয়ে পাঠ করিবার উপযুক্ত বয়স্ক মোট লোকসংখ্যার হিসাবে শতকরা ২৪জন বালক এবং ৩ জন বালিকা বিদ্যাশিক্ষা করিতেছে। গড়ে ৭টি গ্রামের মধ্যে এবং ৩ বর্গমাইল মধ্যে একটি করিয়া বিদ্যালয় আছে; সুতরাং এখানে শিক্ষার অবস্থা অতি শোচনীয়। তবে সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, পূর্ব্বে যাঁহারা সন্তানগণের শিক্ষা-বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলেন তাঁহারা তাঁহাদিগের সন্তানাদির শিক্ষার জন্য বিশেষ সচেষ্ট হইয়াছেন। গভর্ণমেণ্ট স্কুল-কলেজ প্রভৃতি স্থাপন করিয়া আমাদিগের উচ্চ শিক্ষার বন্দোবস্ত করিয়াছেন। নিম্ন-শিক্ষার ভার শিক্ষাবিভাগের ডাইরেক্টর মহোদয়ের হস্তেই সম্পূর্ণভাবে আছে একথা বলা যাইতে পারে। কিন্তু যাঁহারা বালকগণের বিদ্যাশিক্ষা সম্বন্ধে চিন্তা করেন, তাঁহারা সকলেই এ কথা বেশ বুঝিতে পারেন যে, আমাদিগের নিম্ন-শ্রেণীর এবং উচ্চ-শ্রেণীর বিদ্যালয়গুলিতে যে শিক্ষা আমাদিগের বালকগণ প্রাপ্ত হইতেছে কেবল তাহারই উপর নির্ভর করিলে আমাদিগের প্রকৃতপক্ষে শিক্ষালাভ হইতে পারে না। আমাদিগের ধর্ম্ম, আমাদিগের সমাজ, আমাদিগের ভাষা, আমাদিগের আচার-ব্যবহার, আমাদিগের অভাব এবং তাহা পূরণের উপায় প্রভৃতি অবশ্যজ্ঞাতব্য বিষয়-সম্বন্ধে আমরা কোনই উপদেশ প্রাপ্ত হওয়ার সুবিধা পাই না। এক কথায় বলিতে গেলে—আমাদিগের শিক্ষা আমাদিগকে স্বদেশের সহিত পরিচিত হইবার সুবিধা দেয় না। এজন্য বিদ্যালয়ের নিম্নশ্রেণীতে পাঠোপযোগী গ্রন্থাদির অভাব সম্পূর্ণরূপে দায়ী না হইলেও প্রধানতঃ দায়ী, ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। সাহিত্য-পরিষদের একটি প্রধান কার্য্য হওয়া উচিত, আমাদিগের দেশের শিক্ষাকে প্রকৃত পথে পরিচালিত করা। আমাদিগের বালক-বালিকা এবং যুবক-যুবতীগণের যে সকল অবশ্যজ্ঞাতব্য বিষয় আছে তৎসম্বন্ধে সরল ভাষায় গ্রন্থাদি রচিত হওয়া নিতান্ত প্রয়োজন। সাহিত্য-পরিষৎ এ বিষয়ে নিশ্চেষ্ট

নহেন। সাহিত্য-পরিষদের এই চেষ্টা ফলবতী হইলে শিক্ষার প্রকৃত সংস্কারের উপায় হইবে। উত্তর-বঙ্গ সাহিত্য-পরিষৎ আবার উত্তর-বঙ্গের ভিন্ন ভিন্ন স্থানের উপযোগিতা এবং প্রয়োজনানুসারে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর গ্রন্থাদি রচনার বন্দোবস্ত করিবেন। দিনাজপুর কৃষিপ্রধান স্থান, এখানকার বালক এবং যুবকগণের শিক্ষার জন্য এ স্থানের উপযোগী শস্যাদির উন্নতি এবং এ স্থানে যে সকল উত্তম ফলাদি উৎপন্ন হইয়া থাকে তাহার উন্নতিবিষয়ক গ্রন্থাদি প্রস্তুত হইলে সাধারণের শিক্ষার বিশেষ সাহায্য হইতে পারে। এজন্য সাহিত্য-পরিষদের পক্ষ হইতে ব্যক্তি নির্ব্বাচন করিয়া তাঁহাদিগের দ্বারা এসকল বিষয়ে পাঠ্য-পুস্তক করিবার আয়োজন করিতে হইবে। এস্থানে গো জাতির ক্রমশই অবনতি হইতেছে। সম্প্রতি স্থানীয় লোকদিগের এ বিষয়ে চিত্ত আকৃষ্ট হইয়াছে, কিন্তু গো-জাতীর উন্নতি কিসে হইতে পারে তৎসম্বন্ধে জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি সন্নিবিষ্ট হইয়া গ্রন্থাদি রচিত হওয়া উচিত।

দিনাজপুরের লোকসংখ্যা পূর্ব্বেই বলিয়াছি প্রায় ১৭ লক্ষ। দিনাজপুরের প্রকৃত অধিবাসিগণকে প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে—মুসলমান এবং হিন্দু। হিন্দুর মধ্যে ব্রাহ্মণাদি উচ্চ বর্ণের সংখ্যা অতি কম। মুসলমান এবং পলি অথবা ভঙ্গ-ক্ষত্রিয় এই দুই জাতিই দিনাজপুরের প্রধান অধিবাসী। এ স্থানের লোক প্রধানতঃ কৃষিজীবী। ব্যবসা-বাণিজ্য স্থানীয় লোকের হস্তে অতি অল্প পরিমাণেই আছে; এত অল্প, যে, নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

দিনাজপুরকে বুঝিতে হইলে এই দুই জাতিকে বুঝিতে হইবে। কোন স্থানের দুই চারিজন উচ্চ শ্রেণীর ব্যক্তির সহিত পরিচয় হইলে সে স্থানটিকে প্রকৃতপক্ষে বুঝা হইল না। জাতীয় উন্নতির মূলসূত্র লক্ষপতির প্রাসাদে খুঁজিতে গেলে পণ্ডশ্রম হইবে মাত্র। যাহারা সূর্য্যোদয় হইতে আরম্ভ

করিয়া সূর্য্যাস্তকাল পর্য্যন্ত এক মুঠা পেটের ভাতের জন্য মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া দেশের অন্নসংস্থানের উপায় করিতেছে, তাহাদিগেরই ভগ্ন কুটীরে আমাদিগকে দেশের প্রকৃত অবস্থা জানিবার জন্য যাইতে হইবে। ঐ দরিদ্র কুটীরবাসী কৃষকই জাতীয় জীবনের প্রাণ। ঐখানে আমাদিগের উন্নতি এবং অবনতির মাপ-কাঠি রহিয়াছে ঐ দরিদ্রের সুখ এবং দুঃখ, বিপদ এবং সম্পদ, শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য, অভাব এবং অভিযোগের প্রতি আমাদিগকে মনোযোগী হইতে হইবে। যাঁহারা চিন্তাশীল তাঁহাদিগের চিন্তা এই কৃষককুলের অবস্থার প্রতি নিয়োগ করিবেন; যাহারা কর্ম্মী তাঁহাদিগের কর্ম্ম ইহাদিগেরই উন্নতির জন্য পরিচালিত করিবেন; যাহারা তত্ত্বদর্শী তাঁহাদিগের তত্ত্বজ্ঞান চাষার জ্ঞানবৃদ্ধির জন্য উৎসর্গ করিবেন, যাহারা কবি তাঁহাদিগের গাথায় এই অন্নহীন বঙ্গসন্তানের দুঃখ-কাহিনী গাহিয়া বঙ্গবাসীকে তাঁহার প্রকৃত কর্ত্তব্যের পথ দেখাইয়া দিবেন। সাহিত্য-পরিষৎ সমগ্র শিক্ষিত সমাজের পরিষৎ; সুতরাং সাহিত্য-পরিষৎ, এই সমাজের নিম্নস্তরে অবস্থিত, নানারূপে লাঞ্ছিত এবং উৎপীড়িত জাতি-সকলের জন্য, প্রকৃত সাহিত্য রচনার ব্যবস্থা করিবেন। নতুবা সাহিত্য-পরিষদের একটা খুব বড় কাজ অসম্পূর্ণ থাকিবে।

দিনাজপুরের বর্ত্তমান অবস্থার সহিত অতীতের তুলনা করিলে বিস্ময়ান্বিত হইতে হয়। যাহারা প্রত্নতত্ত্ববিৎ এবং ঐতিহাসিক তাঁহাদিগের পক্ষে দিনাজপুর একটি মহাতীর্থ। অতীত যুগের কত প্রাচীন স্মৃতি "পুনর্ভবার" এবং "আত্রেয়ীর" জলপ্রবাহ আজিও বহিয়া লইয়া যাইতেছে। কত অসংখ্য ভগ্ন এবং অভগ্ন প্রস্তর এবং ইষ্টকরাশি, কত অসংখ্য পরিখা, গড় এবং দীঘি, কত প্রাচীন কালের মন্দির এবং মসজেদ হিন্দু-মুসলমানের অতীত গৌরবকাহিনী আজিও প্রকৃত দর্শকের প্রাণে জাগাইয়া

দিতেছে তাহা বলিয়া শেষ করিতে পারা যায় না। আমি এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে দিনাজপুরের প্রাচীন কীর্ত্তি-সকলের আলোচনার চেষ্টা করিব না। কেননা ইহা আমার পক্ষে একেবারেই অনধিকারচর্চ্চা হইবে। দিনাজপুরের গৌরব স্বদেশবৎসল বিদ্যোৎসাহী জনসাধারণের পরম সুহৃৎ শ্রীযুক্ত মহারাজা গিরিজানাথ রায় বাহাদুর, যিনি আপনাদিগকে আজি এই শুভ সম্মিলনের জন্য দিনাজপুরে আহ্বান করিয়াছেন, তিনি তাঁহার অভিভাষণে দিনাজপুরের প্রাচীনত্বের উল্লেখ করিয়াছেন। মহারাজা বাহাদুর আপনাদিগকে রাজধানীতে আহ্বান করিবেন। সেখানে দিনাজপুরের প্রাচীন কীর্ত্তির যে সকল নিদর্শন আপনারা দেখিতে পাইবেন, সেগুলি যে-কোন সভ্য দেশের অধিবাসীকে অতীত যুগের প্রতি শ্রদ্ধাযুক্ত না করিয়াই পারে না। মহারাজা বাহাদুর স্বয়ং বিশেষ চেষ্টা করিয়া যে-সকল প্রাচীন কীর্ত্তিচিহ্ন সংগ্রহ করিতেছেন তাহা প্রত্নতত্ত্ব-বিদ্‌গণের বিশেষ প্রীতিবর্দ্ধন করিবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

পৌরাণিক যুগের সময় হইতে দিনাজপুর একটি প্রসিদ্ধ স্থান ছিল। তাহার কিছু কিছু পরিচয় প্রচলিত কিম্বদন্তী, স্থান এবং নদীগুলির নাম হইতে অনুমান করা যাইতে পারে। এই নগরের দুই প্রান্তদেশ দিয়া দুইটি স্রোতস্বতী প্রবাহিতা। একটি পুনর্ভবা অপরটি গর্ভেশ্বরা। পুনর্ভবা বা পূর্ণভবা এবং গর্ভেশ্বরার কোন পৌরাণিক বিবরণ যদিও সংগ্রহ করা যায় না, তথাপি এইসকল স্রোতস্বতীর নামকরণ যে-সময়ে হইয়াছিল, তৎকালে এস্থানের সভ্যতা এবং সাহিত্যানুরাগের কিঞ্চিৎ আভাষ এই নামকরণ হইতেই পাওয়া যায়। এই নগর হইতে ১২ মাইল উত্তরে এক্ষণে যেখানে ৺কান্তজীউর সুপ্রসিদ্ধ মন্দির অবস্থিত, সেই স্থানটিতে বিরাট রাজার উত্তর গো-গৃহ ছিল বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। কান্তনগরে চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী মৃৎপ্রাচীরশ্রেণীর কোন সন্তোষজনক ঐতিহাসিক

বা কিম্বদন্তীমূলক বিবরণ পাওয়া যায় না। ইহা কোন বৃহৎ রাজ-অট্টালিকার প্রাচীর বলিয়াই অনুমিত হয়। গঙ্গারামপুর থানার অন্তর্গত বাণগড়ের পৌরাণিকত্ব আছে কিনা তাহা প্রত্নতত্ত্বানুসন্ধানকারী পণ্ডিতগণ আলোচনা করিবেন, তবে করদহতে শ্রীকৃষ্ণ বাণের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন এ প্রবাদ প্রচলিত আছে। পার্ব্বতীপুর থানার অন্তর্গত হাবড়া গ্রামে বিরাটপাটে রাজা বিরাট তাঁহার সৈন্যসামন্ত রক্ষা করিতেন, তৎসম্বন্ধে প্রচলিত প্রবাদ এবং ভগ্নস্তূপগুলি একমাত্র প্রমাণ। বিরাটপাটের উত্তরে কীচক-দুর্গের ভগ্নাবশেষ আজপর্য্যন্তও বিরাজমান রহিয়াছে। নবাবগঞ্জ থানার অন্তর্গত সীতাকুণ্ড নামক স্থানে সীতাদেবী তাঁহার নির্ব্বাসনকালে বাস করিয়াছিলেন এবং এই প্রবাদের পোষকতায় করতোয়া-তীরে বাল্মীকিমুনির আশ্রম এবং তর্পণঘাট বাল্মীকিমুনির স্নান এবং তর্পণের ঘাট ইত্যাদি ছিল বলিয়া কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে। ইহা ব্যতীত বালুরঘাট মহকুমার অন্তর্গত খাটনগর-রাজবাড়ীর ভগ্নাবশেষ এবং আগরা-দণ্ডনের হোরা রাজার বাড়ীর ভগ্নস্তূপ কতকালের ঐশ্বর্য্যের পরিচয় দিতেছে কে বলিতে পারে? দিনাজপুর জেলার পল্লীগ্রামগুলির নামের প্রতি দৃষ্টি করিলেও জানিতে পারি যে, নামগুলি প্রায়ই দেবদেবীর নাম-সংযুক্ত এবং সম্পূর্ণ সংস্কৃতমূলক। ইহা হইতেও এ স্থানের প্রাচীনকালের সাহিত্য-সম্পদের পরিচয় পাওয়া যায়। পৌরাণিক যুগের পর হিন্দু-রাজত্বের এবং মুসলমান-রাজত্বের সময় দিনাজপুরের সমৃদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়। দিনাজপুরের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে যে সকল অসংখ্য প্রস্তরমূর্ত্তি পাওয়া যাইতেছে, তাহা হইতে হিন্দুরাজগণের এবং বৌদ্ধরাজগণের রাজত্ব-কালে দিনাজপুর একটি প্রসিদ্ধ স্থান ছিল বলিয়াই অনুমিত হয়। তৎপর স্বদেশবৎসল আদর্শ-ভূম্যধিকারী শ্রীযুক্ত কুমার শরৎকুমার রায় এবং উত্তর-বঙ্গের উজ্জল রত্ন সাহিত্য-রথী প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক এবং প্রত্নতত্ত্ববিৎ

শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়প্রমুখ কর্ম্মিগণের অক্লান্ত পরিশ্রমে এবং যত্নে রামপুর-বোয়ালিয়াতে উত্তর-বঙ্গের পুরাকীর্ত্তির যে সঙ্কলন হইয়াছে, তাহা দর্শন করিলে বিস্মিত হইতে হয় এবং এই সকল অসংখ্য মূর্ত্তি এবং অন্যান্য বস্তুর ভিতরে যে অতীত কালের ইতিবৃত্ত সন্নিহিত আছে তাহা কতকালে উদ্ধার হইবে কে বলিতে পারে ? কুমার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার এবং শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার বঙ্গসাহিত্যের যে সকল অমূল্য উপাদান সংগ্রহ এবং তাহার বিবরণ সঙ্কলনের ব্যবস্থা করিয়াছেন তজ্জন্য সাহিত্য-পরিষৎ ইহাদিগের নিকট চিরকাল ঋণী রহিবে এবং ইহাদিগের দীর্ঘ জীবন এবং অক্ষয় যশের জন্য ভগবৎ-সমীপে প্রার্থনা করিবে। দিনাজপুরের পুরাতত্ত্ব উদ্ধার জন্য বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতি বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন। দিনাজপুরবাসী যিনি যতদূর পারেন এই সমিতির কার্য্যে সহায়তা করিলে সমিতির বিশেষ উপকার হইতে পারে। ঐতিহাসিকের নিকট যে সকল স্থান বিশেষ প্রসিদ্ধ তাহারই মধ্যে কয়েকটির এইস্থানে উল্লেখ করিব মাত্র। গঙ্গারামপুর থানার অন্তর্গত বাণগড়ের উল্লেখ পূর্ব্বেই করিয়াছি। মোল্লা আতাউদ্দিন সাহার মসজেদ এবং দরগা, ধল দীঘি, কাল দীঘি, বখতিয়ার খিলিজির সেনানিবাস এবং গোরস্থান, মহীপাল দীঘি, ঘোড়াঘাটের নিকটবর্ত্তী বাদাল-স্তম্ভ বা ভীমের পান্টি, পির বদরুদ্দিনের মসজেদ এবং গোরস্থান, ধীবর দীঘি, আগরা ডুগুল প্রভৃতি বহু পরিচিত এবং অপরিচিত স্থান হিন্দু, বৌদ্ধ এবং মুসলমান-রাজগণের কীর্ত্তি অদ্যাবধি ঘোষিত করিতেছে।

দিনাজপুরের বর্ত্তমান রাজবংশের সহিত দিনাজপুরের ঐতিহাসিক বিবরণ বিশেষরূপে সংসৃষ্ট। মুসলমান-রাজত্বের সময় এই রাজবংশের অভ্যুদয় হয়। মুসলমান-রাজত্বকালে ইহারা রাজ্যশাসন এবং বিচারাদি কার্য্য স্বাধীন নরপতিগণের ন্যায়ই করিতেন। দিনাজপুরের ভিন্ন ভিন্ন

স্থানে ইঁহাদিগের নির্ম্মিত মন্দিরাদি এবং ইঁহাদিগেরই খনিত দীর্ঘিকাদি আজিও এই বংশের ধর্ম্মপ্রাণতা এবং লোকহিতৈষণার পরিচয় দিতেছে। এই বংশের সুপ্রসিদ্ধ বিগ্রহ ৺কান্তজিউ দেবের মন্দিরটি বাঙ্গালাদেশে একটি অতুলনীয় কীর্ত্তি এবং এই বংশের দেবসেবার আন্তরিকতার পরিচয়-স্বরূপ আজিও দণ্ডায়মান রহিয়াছে। ইহা ছাড়া গোবিন্দনগর, প্রাণ-নগর, গোপালগঞ্জ, আনন্দ-সাগর, মাতা-সাগর, শুক-সাগর, রাম-সাগর, প্রভৃতি এই বংশের বহু কীর্ত্তি দর্শকগণকে আজিও চমৎকৃত করিতেছে। এই সাহিত্য-সম্মিলনের অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতির আসন যিনি অলঙ্কৃত করিয়াছেন এবং যাঁহার অকৃত্রিম সাহিত্যানুরাগের ফলস্বরূপ এই সাহিত্য-সম্মিলন, তিনি বঙ্গ-সাহিত্যের নানা উপাদান সংগ্রহের জন্য যেরূপ চেষ্টা এবং যত্ন করিতেছেন তাহা অতীব প্রশংসার্হ। সমবেত প্রতিনিধিগণের জন্য দিনাজপুর রাজবংশের প্রধান কীর্ত্তি কান্তনগরের মন্দির দর্শনের ব্যবস্থা করিয়া ইনি আমাদিগকে চির কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিয়াছেন। যাঁহা-দিগের প্রতি কমলার কৃপা আছে তাঁহারা যদি সাহিত্য-পরিষদের কার্য্যে এইভাবে স্বয়ং যোগদান করেন, তাহা হইলে সাহিত্য-পরিষদের কার্য্য অনেক পরিমাণে সহজ হইয়া আইসে।

সাহিত্য পরিষৎ যে মহৎ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন তাহা সাধন করিতে হইলে অর্থের প্রয়োজন। স্থান এবং প্রয়োজন-অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর গ্রন্থসকল রচনার কার্য্যটি অতিশয় ব্যয়-সাধ্য। আজি দিনাজপুরাধিপতি মহারাজা বাহাদুরের উৎসাহ এই সম্মিলনের কার্য্যে বিশেষ সহায়তা করিতেছে দেখিয়া প্রাণে আশা হয় যে, এমন দিন আসিয়াছে যে অর্থের অভাবে যাহা প্রকৃত জাতীয় উন্নতির পক্ষে হিতকর এরূপ কোন কার্য্য বন্ধ থাকিতে পারে না। এ সম্বন্ধে দিনাজপুরের মাড়োয়ারী-ব্যবসায়িগণ আমাদিগকে যেভাবে উৎসাহিত করিয়াছেন তাহাতে দেশের

পক্ষে অশেষ মঙ্গল সূচিত করিতেছে। সুদূরস্থিত মাড়োয়ার হইতে আগমন করিয়া ইহারা বঙ্গদেশকে আপনার করিয়া লইয়াছেন। বাঙ্গালীর সুখ-দুঃখ, বাঙ্গালীর আশা-ভরসা, বাঙ্গালার উন্নতি এবং অবনতির সহিত ইহাদিগেরও সুখ-দুঃখ, আশা-ভরসা, উন্নতি এবং অবনতি বিশেষভাবে সম্বদ্ধ। এ সভা ইহারা উপলব্ধি করিয়াছেন, ইহা অতি সুখের বিষয়। আমাদিগের মাড়োয়ারি-ভ্রাতৃগণের সম্বন্ধে কেহ কেহ বলেন যে, অর্থ ব্যতীত অন্য কোন বিষয়ের জন্য ইহারা বড় ব্যস্ত হন না। কিন্তু আজি এই সম্মিলনের জন্য এই সাহিত্যসেবা-প্রাঙ্গণে তাহারা যেরূপ অকৃত্রিম শ্রদ্ধার সহিত যোগদান করিয়াছেন তাহাতেই মনে হয় ইহারা চিরকাল লক্ষ্মীর বরপুত্র হইলেও সরস্বতীর কৃপালাভের জন্য প্রকৃতই উৎসুক হইয়াছেন। ইহা দেশের মঙ্গলের কথা। ইহা এই ক্ষুদ্র সম্মিলনের ও একটি গৌরবের সহিত উল্লেখ করিবার বিষয়।

দিনাজপুর-সম্বন্ধে একটি অবশ্য-উল্লেখযোগ্য বিষয়ের কথা বলিতে এখনও বাকি আছে। সেটি আমাদের ভাষা। রঙ্গপুর দিনাজপুর অনেকের নিকট "বাহের দেশ" এবং "হুজর" দেশ বলিয়া পরিচিত। দিনাজপুর বাঙ্গলা দেশের কোন দিকে অবস্থিত এবং আসামের নিকটবর্ত্তী কোন পর্ব্বত শ্রেণীর মধ্যে এই অদ্ভুত স্থানটি থাকিতে পারে এরূপ জ্ঞান কোন কোন প্রদেশের তথাকথিত শিক্ষিত সমাজের মধ্যে কিছুদিন পূর্ব্বেও ছিল, এরূপ কাহিনী আমরাও শুনিয়াছি। সে যাহা হউক, এক্ষণে বোধ হয় একথা অবিসংবাদিতরূপে বলা যায় যে, আজ বঙ্গদেশের যাঁহারা কোন সন্ধান রাখেন তাঁহাদিগের মধ্যে এরূপ হাস্যোদ্দীপক জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায় না।

দিনাজপুরের ভাষার সম্বন্ধে মোটামুটি একথা বলা যাইতে পারে যে, এটি রঙ্গপুর এবং পূর্ণিয়ার ভাষার একটি সংমিশ্রণ। দিনাজপুর

বঙ্গদেশান্তর্গত হইলেও বিহার-প্রদেশের সহিত বিশেষভাবে সংসৃষ্ট এবং দিনাজপুরের পশ্চিমাঞ্চলের ভাষা ভাঙ্গা খোট্টাই ভাষা বটে। ইহার যথেষ্ট কারণ আছে। এক্ষণে যেখানে বারসই রেলষ্টেসন হইয়াছে, সেখান হইতে পশ্চিমাঞ্চলটি পূর্ব্বে বিহারান্তর্গতই ছিল। তাহাতেই আমরা দেখিতে পাই, এ দেশের অনেক হিন্দু-পরিবার মিতাক্ষরা আইন-শাসিত এবং পূর্ণিয়া-অঞ্চলের আচারবিশিষ্ট। আবার পূর্ব্বাঞ্চলের ভাষার সহিত রঙ্গপুরের ভাষার অতি অল্পই পার্থক্য আছে। রঙ্গপুরের প্রচলিত ভাষার সহিত গ্রন্থাদির পরিচয় মাঝে মাঝে পাওয়া যায়; কিন্তু দিনাজপুরের ভাষায় লিখিত কোন গ্রন্থাদির সহিত আমাদিগের এ পর্য্যন্ত কোনরূপ পরিচয় হয় নাই। দিনাজপুরের ভাষা নিম্নশ্রেণীর অধিবাসীগণের মধ্যেই প্রচলিত। যাঁহারা শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহাদিগের মধ্যে আমরা এ ভাষার কোনই পরিচয় পাই না।

দিনাজপুরবাসী আজি সাহিত্যিকগণের এই সম্মিলনে আনন্দের সহিত যোগদান করিয়াছে। বিদ্যালয়ের ছাত্র হইতে আরম্ভ করিয়া নানা বিষয়-কর্ম্মে লিপ্ত বৃদ্ধ পর্য্যন্ত সকলেই এক নবীন উৎসাহের সহিত সাহিত্যিকগণের অভ্যর্থনার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করিতেছেন। ভগবৎ সমীপে প্রার্থনা করি, আমাদিগের এই উদ্যম সফলতা লাভ করুক, আমাদিগের এই চেষ্টা সাহিত্যপরিষদের মহদুদ্দেশ্য সাধনের সহায়তা করুক। বিদ্যায় এবং সৌজন্যে, রাজসম্মানে এবং জনসাধারণের পরিচালনে, স্বদেশ-প্রীতিতে এবং চরিত্রমাধুর্য্যে যিনি উত্তর বঙ্গকে এবং সমগ্র বঙ্গদেশকে ভূষিত করিয়াছেন, সেই সৌম্যমূর্ত্তি আশুতোষ আজ এই সম্মিলনকে পরিচালিত করিতেছেন। দিনাজপুরবাসী তাঁহার নায়কত্বে এই সম্মিলনে উপস্থিত নানা স্থানের প্রসিদ্ধ সাহিত্যিকগণের নিকট বহু জ্ঞানলাভ করিবার আশায় উদ্‌গ্রীব হইয়া রহিয়াছে। ভগবতী ভারতী দিনাজপুর-

বাসীর এই দীর্ঘকাল পোষিত আশাকে ফলবতী করুন, আমাদিগের এই সম্মিলন ভিন্ন ভিন্ন স্থানের সাহিত্যিকবর্গের মধ্যে প্রীতির বন্ধন দৃঢ়তর করিয়া মাতৃভাষার সাধনারূপ একই মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া তাঁহাদিগের সমুদয় চেষ্টা তাঁহাদিগের সর্ব্ব প্রকারের সাহিত্যোদ্যম জাতীয় উন্নতির পথে লইয়া যাউক, ইহাই ভগবৎ-সমীপে আমাদিগের আন্তরিক প্রার্থনা।

শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় বি, এল্ মহাশয় বলিলেন—দিনাজপুর অভ্যর্থনা সমিতির সম্পাদক মহাশয় যে, অভিভাষণ পাঠ করিয়াছেন তাহাতে এক অংশে বলিয়াছেন যে, দিনাজপুরের পুরাতত্ত্ব-উদ্ধার জন্য বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতি বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন। বঙ্গদেশের ইতিহাস সঙ্কলন করাই ঐ সমিতির প্রধান কার্য্য। সুসমাচার এই যে, কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ১২ খণ্ডে ভারতের ইতিহাস সঙ্কলিত হইবে। এই ইতিহাস সঙ্কলনের করিতে যত অর্থের প্রয়োজন হইবে তাহা স্বনামধন্য পারসীক বণিক টাটার সুযোগ্য পুত্র বহন করিবেন। এই দ্বাদশ খণ্ড মধ্যে বঙ্গদেশের ইতিহাস দুই খণ্ডে লিখিত হইবে। আমাদের ন্যায় অক্ষমদিগের উপরেই উক্ত খণ্ডদ্বয়ের রচনার ভার অর্পিত হইয়াছে। এই সুসমাচার শ্রবণে সদস্যগণ আনন্দ প্রকাশ করিলেন। অভ্যর্থনা-সমিতির সম্পাদকের মন্তব্য প্রসঙ্গে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার মহাশয় বলিলেন—একটা নদীতে কখনই জ্ঞানের পিপাসা মিটিতে পারে না। যত বেশী সম্মিলন হইবে ততই জ্ঞানবৃদ্ধির ও প্রচারের সুযোগ হইবে। প্রধানতঃ দুইটি কারণে নানা সম্মিলনের প্রয়োজন হইয়াছে। (১) প্রাদেশিক বিশেষত্ব রক্ষা করিয়া চলিতে হইবে; (২) স্থানীয় লোকদিগকে কাজের অবসর দিলে অনেক কাজের লোক বাহির হইবে, কর্ম্মের অবসর দিলে কর্ম্মী প্রস্তুত হইবে।

সভাপতি মহাশয়ের আহ্বানে বিগত গৌহাটী-সম্মিলনে গঠিত

কামরূপ-অনুসন্ধান-সমিতির প্রথম বর্ষের নিম্নলিখিত কার্য্য-বিবরণ ঐ সমিতির সদস্য শ্রীযুক্ত গোপালকৃষ্ণ দে মহাশয় পাঠ করিলেন।

কামরূপ-অনুসন্ধান-সমিতির প্রথম বার্ষিক কার্য্য-বিবরণী।

১—মহাপীঠ নীলাচলে উত্তরবঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনের ৫ম অধিবেশনে কোচবিহারের অন্যতর জমিদার ও রাজমন্ত্রণা-সভার সদস্য মৌলবি আমানতউল্লা আহম্মদ চৌধুরী সাহেবের প্রস্তাবে এবং রঙ্গপুরের সুপ্রসিদ্ধ জমিদার রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত মৃত্যুঞ্জয় রায়চৌধুরী মহাশয়ের সমর্থনে সর্ব্বসম্মতিক্রমে নিম্নলিখিত প্রস্তাবটি গৃহীত হয়।

"এই সম্মিলন, অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত কালীচরণ সেন মহাশয়কে অনুরোধ করিতেছেন যে, তিনি নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে লইয়া "কামরূপ-অনুসন্ধান-সমিতি" নামে একটি সমিতি গঠন করিবেন এবং তদ্দ্বারা এতদঞ্চলের প্রাচীন পুঁথি, প্রত্নতত্ত্ব ও মানব-তত্ত্ব সংগ্রহ এবং বিবিধ জাতির ইতিহাস প্রভৃতি সঙ্কলন ও ঐ সকল বিষয়ের বিবরণ বাঙ্গালা ও অসমীয়া ভাষায় লিখিবার ব্যবস্থা করিবেন। কার্য্য কতদূর অগ্রসর হইল তাহা এক বৎসর পরে সম্মিলনের আগামী অধিবেশনে উপস্থাপিত করিবেন। তিনিই এই সমিতির উদ্দেশ্য সাধনার্থ সংগৃহীত অর্থের ন্যাস-রক্ষক নিযুক্ত হইলেন।"

সমিতির সদস্যদিগের নাম :—

শ্রীযুক্ত মহামহোপাধ্যায় ধীরেশ্বরাচার্য্য কবিরত্ন
„ আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ কবিবিশারদ
„ পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য বিদ্যাবিনোদ এম এ

শ্রীযুক্ত শিবনাথ স্মৃতিতীর্থ

" তারানাথ কাব্যবিনোদ

" প্রতাপচন্দ্র গোস্বামী

" গোবিন্দচন্দ্র শর্ম্মা

" উত্তমচন্দ্র বড়ুয়া

" রজনীকুমার দাস

" সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

" উমেশচন্দ্র দে

" গোপালকৃষ্ণ দে

ইহাতে আবশ্যকমত সময় সময় অন্য নামও যুক্ত হইতে পারিবে।

২।—এই প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য সাধারণ্যে বিজ্ঞাপন দ্বারা ১৩১৯ সালের ২২ বৈশাখ রবিবার অপরাহ্ণ ৩॥০ ঘটিকার সময় সোণারাম-স্কুলগৃহে গৌহাটিস্থ অসমীয়া ও বাঙ্গালী অনেক ভদ্রলোকের সমবায় হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত বাবু কালীচরণ সেন বিএ বিএল্ মহাশয় সর্ব্বসম্মতিক্রমে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

প্রারম্ভিক অধিবেশন

প্রথমতঃ শ্রীযুক্ত গোপালকৃষ্ণ দে এই সমিতির নামকরণ ও উদ্দেশ্য একটি নাতিদীর্ঘ বক্তৃতায় বিশদভাবে ব্যক্ত করেন। তাঁহার বক্তব্যের সংক্ষিপ্তসার এই :—

"কামরূপ" এই নামের সহিত কত গৌরবমণ্ডিত ইতিবৃত্ত এবং মহিমময়ী কীর্ত্তিকাহিনী জড়িত রহিয়াছে; যাহার স্মরণ এবং কীর্ত্তনে ভারতবর্ষীয়দিগের প্রাণে অভূত-পূর্ব্ব আনন্দের সঞ্চার হয়। এহেন পুণ্যভূমির তথ্যানুসন্ধান জন্য মহাপীঠ নীলাচলে কামরূপেশ্বরী ভগবতী কামাখ্যাদেবীর মন্দির-প্রাঙ্গণে

নামকরণ

এই সুবিশাল কর্ম্মক্ষেত্রের কেন্দ্রস্থলে জন্মলাভ করায় এই সমিতির নাম "কামরূপ-অনুসন্ধান-সমিতি" রাখা হইয়াছে।

উদ্দেশ্য

এতদঞ্চলের অনুসন্ধানযোগ্য যাবতীয় বিষয়ের তথ্যানুসন্ধান দ্বারা জ্ঞান-ভাণ্ডার পূর্ণ করা ও ভাষার উন্নতি-সাধন এই সমিতির উদ্দেশ্য। এই বিস্তৃত দেশের নানাবিধ তথ্য অবগত হইবার জন্য জ্ঞানের সাধনা দ্বারা নবশক্তি লাভ করিয়া বহুবিধ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে হইবে। এইরূপ সাধনায় আত্মসমর্পণ করাই প্রকৃত স্বদেশপ্রীতি—যে কর্ম্মী ও জ্ঞানী এই সাধনায় সিদ্ধ তিনিই "জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী" এই মহামন্ত্র উচ্চারণের অধিকারী। কামরূপ-অনুসন্ধান-সমিতি এইরূপ সাধক প্রস্তুত করিবেন এই আশা হৃদয়ে পরিপোষণ করিয়া সিদ্ধপীঠে উদ্ভূত হইলেন। পীঠাধিষ্ঠাত্রী মহা-শক্তির করুণা-কণাই ইহার ভরসার সম্বল।"

কার্য্য-প্রণালী ও কর্ম্ম-চারী-নিয়োগ

তৎপর নানা আলোচনা দ্বারা স্থির হয় যে, এই সমিতির কার্য্যক্ষেত্র প্রাচীন কামরূপের অন্তর্গত সমস্ত স্থান লইয়া হইবে। অতঃপর কয়েকজন নূতন সভ্য নিযুক্ত হন এবং সভাপতি মহাশয়ের প্রস্তাবে নিম্নলিখিত কর্ম্মচারী নিযুক্ত হইলেন।

২ জন কার্য্যাধ্যক্ষ—শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র গোস্বামী
„ কালীচরণ সেন কোষাধ্যক্ষ

৩ জন সহকারী—শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
„ লক্ষ্মীনাথ বড়া
„ গোপালকৃষ্ণ দে

"মন্ত্রণার্থ উহাঁরা আবশ্যকমত ২।১ জনকে লইয়া মন্ত্রণা-সভা করিবেন। সাধারণ সভার প্রয়োজন হইলে সমস্ত সভ্যদিগকে লইয়া তাঁহারা সভা করিবেন।

শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র গোস্বামী মহাশয়ের প্রস্তাবে, শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সমর্থনে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

(১) অনুসন্ধানের ফল অন্যূন তিনমাসে একবার সভায় পেশ করিতে হইবে। আবশ্যক মত মন্ত্রণা-সভা বিশেষ অধিবেশন ডাকিতে পারেন।

(২) উত্তরবঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনের মুখপত্রস্বরূপ রঙ্গপুর-পরিষদের সম্পাদক মহাশয়কে অনুরোধ করা হউক যেন অনুসন্ধান-সমিতির ফল-স্বরূপ প্রবন্ধাদি তিনি পরিষদ-পত্রিকায় প্রকাশ করেন।

(৩ মন্ত্রণা-সভা-সমিতির সম্পূর্ণ নিয়মাবলী গঠন ও সাধারণ্যে প্রচারার্থ আবেদন-পত্র প্রস্তুত করিয়া একমাস মধ্যে সাধারণ সভায় পেশ করিবেন।

৩।—ইহার পরে নিয়মমত কোনও সভা হয় নাই বটে ; তবে সমিতির কার্য্য অল্প-সল্প যাহা হইয়াছে তাহার বিবরণ আপনাদের নিকট উপস্থিত করিতেছি।

৪।—বর্ত্তমানে কামরূপ-অনুসন্ধান-সমিতি সমষ্টিভাবে অনুসন্ধান-কার্য্যের জন্য ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত শক্তিকে কেন্দ্রীভূত করিয়া অধিকতর কার্য্যকরী করিবার সূচনা করিলেন বটে

পূর্ব্বাভাস

কিন্তু আজ কয়েক বৎসর হইতে ব্যষ্টিভাবে এই অনুসন্ধান-কার্য্য চলিতেছে। "কামরূপ-অনুসন্ধান-সমিতি-সংসৃষ্ট ব্যক্তিগণের দ্বারা অনুষ্ঠিত অনুসন্ধান-সম্পর্কীয় কার্য্যাবলী সমিতির আবির্ভাবের সহায়তা এবং ইহার অনুষ্ঠেয় কর্ম্মের পথ পরিষ্কার করিয়াছে এই নিমিত্ত সে গুলির একটা মোটামুটি বিবরণ এস্থলে দেওয়া বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

১৩১৩ সালের পৌষমাসে শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত পণ্ডিত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য বিদ্যাবিনোদ এম এ মহাশয় "পরশুরাম-কুণ্ড" পরিভ্রমণ করিয়া ইংরাজীতে যে

বিবরণ লিপিবদ্ধ করেন উহা প্রথমতঃ অমৃতবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত হয়, পরে "Statesman" "Times of Assam" এবং Weekly Cronichle পত্রে উদ্ধৃত হইয়াছিল, অবশেষে পুস্তিকাকারে পুনর্মুদ্রিত হইয়া সাধারণ্যে বিতরিত হইয়াছিল। শ্রীহট্টের উকীলসরকার অনারেবল রায় শ্রীযুক্ত দুলালচন্দ্র দেব বাহাদুর বি-এ বি এল কর্ত্তৃক ইহার বিষয় গবর্ণমেণ্টের উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারিবর্গের গোচরীভূত হয়; ইহাতে কর্ত্তৃপক্ষ পরশুরামের রাস্তা নির্ম্মাণে হাত দেন এবং এতদ্বিষয়ক সরকারী মন্তব্যের প্রথমেই সেই "Diary of a Pilgrim to Parsuram Kunda" এর উল্লেখ হইয়াছিল। আবার বঙ্গভাষায় এ সম্বন্ধে প্রবন্ধ রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষদের ৬ষ্ঠ বর্ষ পঞ্চম মাসিক অধিবেশনে (৪ঠা অগ্রহায়ণ ১৩১৭ সন) পঠিত হইয়া পরিষদ-পত্রিকার ৫ম ভাগে ৩।৪ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। উক্ত সভায় প্রবন্ধালোচনা-কালে শ্রীযুক্ত সম্পাদক মহাশয় যাহা বলিয়াছিলেন তাহা এস্থলে উদ্ধৃত হইতেছে।

"গত গৌরীপুর-সাহিত্য-সম্মিলনে শ্রদ্ধেয় বিদ্যাবিনোদ মহাশয় সভাপতি-রূপে তাঁহার অভিভাষণে আভাস দিয়াছিলেন যে, সুদূর বদরিকাশ্রমের বিবরণ লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে; কিন্তু বঙ্গের পার্শ্ববর্ত্তী পরশুরাম কুণ্ডের পথ-ঘাটের বিষয় আজও বঙ্গীয় সাহিত্যিকগণের আলোচনার বিষয়ীভূত হয় নাই। ইহা তাঁহাদের আসামসম্বন্ধে ঔদাসীন্যের অকাট্য প্রমাণ। এইরূপ আভাস দেওয়ার পর বঙ্গসাহিত্য-সমাজের কলঙ্ক মোচনার্থ তিনি নিজেই (বহুশ্রম স্বীকারপূর্ব্বক এই দুর্গম স্থানে গমন করিয়া যে তথ্য সংগ্রহ করেন) তাহার আবশ্যকীয় বিবরণ লিখিতে লেখনী ধারণ করিয়া-ছেন। আসামের অতীত কাহিনী বঙ্গীয় সাহিত্যিকগণের আলোচনার গণ্ডীর বাহিরেই যে এতকাল পড়িয়াছিল, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। যদিও বহু শিক্ষিত বঙ্গবাসী আসামের অন্নে প্রতিপালিত হইয়া

আসামের অনেকেই জীবনপাত করিয়াছেন কিন্তু তাঁহারা কেহই উল্লেখযোগ্য-রূপে এই বঙ্গসন্নিহিত গৌরবময় প্রদেশের তত্ত্বান্বেষণে হস্তক্ষেপ করেন নাই।" ইত্যাদি

বস্তুতঃ বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের পরশুরাম কুণ্ড ভ্রমণে একযাত্রায় নানা-বিধ ফল ফলিয়াছিল ১ম ঃ—ভৌগোলিক-তথ্য (কুণ্ডের সংস্থানাদি) প্রবন্ধ-মুখে প্রচার, ২য় বঙ্গভাষায় পরশুরাম-কুণ্ড সম্বন্ধীয় বৃত্তান্তের প্রথম প্রকাশ, ৩য় পরশুরামযাত্রিগণের যাতায়াতের সুবিধার জন্য গবর্ণমেণ্ট হইতে পথ-প্রস্তুতের উপায় নির্দ্দেশ ইত্যাদি। অতএব তিনি যে সর্ব্বতোভাবে আমাদের ধন্যবাদার্হ তৎপক্ষে আর সন্দেহের কথা কিছু আছে কি ?

৫। – এই যাত্রার ফল কেবল পরশুরামে পর্য্যবসিত হয় নাই। বিদ্যাবিনোদ মহাশয় পরশুরাম হইতে ফিরিবার সময়ে পথে বিশ্বনাথ ও তেজপুর পরিদর্শন করিয়া ইংরাজীতে Notes on the ruins at Tezpur শীর্ষক প্রবন্ধ লিখিয়া আসাম প্রদেশের প্রত্নতত্ত্ববিভাগের পরি-চালক শ্রীযুক্ত কর্ণেল গর্ডন বাহাদুরের নিকট প্রেরণ করেন এবং যাহাতে গৌহাটি সহরে একটি চিত্রশালা (Museum) স্থাপিত হইয়া তাদৃশ প্রাচীন কীর্ত্তির স্মারক-প্রস্তরাদি তাহাতে সংরক্ষিত হয় তজ্জন্য একটি প্রস্তাব করেন। কর্ণেল গর্ডন বাহাদুর, প্রবন্ধটি এসিয়াটিক সোসাইটিতে এবং ঐ প্রস্তাব গবর্ণমেণ্টে প্রেরণ করেন। প্রবন্ধ আংশিক সোসাইটীর পত্রিকায় মুদ্রিত হয় পরে Malabar Quarterly Reviewতে সম্পূর্ণ প্রকাশিত হয়। পশ্চাৎ "আসাম-ভ্রমণ" নামধেয় বাঙ্গালা প্রবন্ধাকারে তেজপুর ও বিশ্বনাথ ভ্রমণ-কাহিনী বঙ্গসাহিত্যানুশীলনী সভায় পঠিত হইয়া বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ পত্রিকায় মুদ্রিত হইয়াছিল।

চিত্রশালা-স্থাপনের এই প্রস্তাব যেন শুভমুহূর্ত্তেই করা হইয়াছিল। বর্ত্তমানে তেজপুরস্থ বাণরাজবাটীস্থ ধ্বংসাবশেষ কিরূপভাবে কোথায়

রক্ষিত হইবে এতৎসম্পর্কে ১৯১৩ সনের ২২শে জানুয়ারি গেজেটে প্রকাশিত বিজ্ঞাপনী দৃষ্টে অনেকে উপলব্ধি করিতে পারিবেন। পরে এ বিষয়ে আরও কথা যথাস্থানে উল্লেখ করা হইবে।

৬।—১৩১৪ বঙ্গাব্দের কার্ত্তিক মাসে বিদ্যাবিনোদ মহাশয় যোড়হাট গমন করিয়া আহোম-রাজগণের শেষ রাজধানী পরিদর্শন করেন। তৎপর পৌষমাসে বড়দিনের মধ্যে ডিমাপুর গিয়া কাছাড়-রাজগণের প্রাচীনতম কীর্ত্তিসমূহ প্রত্যক্ষ করেন। ঐ সময়েই শিবসাগর গিয়া জয়সাগর, রঙ্গপুর, শিবসাগর ও গড়গাওঁ পরিদর্শন করিয়া আইসেন। ১৩১৫ সালের ফাল্গুন মাসে মাইবঙ্গ গিয়া কাছাড়-রাজগণের আরও কীর্ত্তিকলাপের সাক্ষাৎ পরিচয় গ্রহণ করেন। ঐ সকল অনুসন্ধানের ফল ও তল্লিখিত আসাম-ভ্রমণ ২য় ও ৩য় প্রবন্ধে প্রকাশিত হইয়াছে।

৭।—তৎসময় বঙ্গসাহিত্যানুশীলনী সভা সংস্থাপিত হওয়ায় এইরূপ প্রত্নতত্ত্ব ও ঐতিহাসিকবিষয়ক অনুসন্ধানের প্রসার বৃদ্ধি হয়। যাহা বিদ্যাবিনোদ মহাশয় একাকী করিতেছিলেন তাহাতে অপরেরাও আসিয়া যোগ দিতে লাগিলেন। শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত বিশ্বাস, শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র দে, শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত প্রিয়কুমার চট্টোপাধ্যায় এবং শ্রীযুক্ত গোপালকৃষ্ণ দে প্রভৃতি আসামের নানাবিধ তথ্য-বিষয়ক আলোচনায় যোগদান করিলেন। শ্রীযুক্ত দেবনারায়ণ ঘোষ যিনি অনেক পূর্ব্ব হইতেই আসামের ঐতিহাসিক তথ্যাদি লইয়া আলোচনা করিতেছিলেন তিনিও এই সভায় যোগ দিলেন। অধিকন্তু সুখের বিষয় এই যে, আসামের অধিবাসী প্রত্নতত্ত্বজ্ঞ শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র গোস্বামী মহাশয়প্রমুখ আসামদেশীয় দুই একজন তাঁহাদের অভিজ্ঞতা ও সহায়তা দ্বারা এই কার্য্যে উৎসাহ দান করিতে লাগিলেন।

৮।—ব্যষ্টিভাবে যে কাজ হইতেছিল সমষ্টিভাবে সেকার্য্য প্রথমতঃ

কেবল প্রবন্ধাদির আলোচনাতেই আবদ্ধ ছিল; কিন্তু ক্রমশঃ তাহা অন্যবিধ আকারে পরিণত হইতে লাগিল। একাধিক

সূচনা

জনে মিলিয়া ঐতিহাসিক বা পুরাতত্ত্বের বিষয়ীভূত বস্তুর অনুসন্ধান-কার্য্যও আরব্ধ হইল। ১৩১৬ সনের চৈত্রমাসে প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগের শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ মহাশয় কার্য্যোপলক্ষে গৌহাটীতে আসেন। তাঁহাকে লইয়া শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র গোস্বামী মহাশয় এবং আমাদের বিদ্যাবিনোদ মহাশয় গৌহাটি সহর ও তন্নিকটবর্ত্তী কোনও কোনও স্থান পরিভ্রমণ করেন। তাহাতে একটি কাজ হইল। ৺রী কামাখ্য পর্ব্বতের পাদদেশে প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের পশ্চিম দ্বারের পরিচায়ক একটি লিপি একটা বৃহৎ প্রস্তর খণ্ডে খোদিত আছে; সেই প্রস্তর-খণ্ড Preservation of ancient monument, act অনুসারে সংরক্ষিত হইয়াছে। সেই প্রস্তরটির চতুষ্পার্শ্বে লোহার খুঁটা পুঁতিয়া একটা লোহ শিকল দ্বারা ঘেরিয়া দেওয়া হইয়াছে।

তথ্যানুসন্ধান জন্য অভিযান

৯।—পর বৎসরে (১৩১৭ সালে) সমষ্টিভাবে তিনটি এবং ব্যষ্টিভাবে একটি তথ্যানুসন্ধানের অভিযান হয়।

১ম ঃ—ইদের বন্ধ-উপলক্ষে পৌষমাসে কটন কলেজের কতিপয় অধ্যাপক এবং বঙ্গসাহিত্যানুশীলনী সভার কতিপয় উৎসাহী সদস্য মিলিয়া দিষপুর নামক স্থানটি দেখিয়া আইসেন। সাধারণের বিশ্বাস যে, এই প্রাচীন প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের স্মারকচিহ্ন। এতদুপলক্ষে আহোমরাজগণের সময়ে নির্ম্মিত গৌহাটির দক্ষিণ দিক-সংরক্ষক একটি প্রাচীরের ভগ্নাবশেষ পরিদৃষ্ট হয়। ইহার ইষ্টক-চিহ্ন এখনও ভূরি ভূরি দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এতদুপলক্ষে একটি রসাল প্রবন্ধ লিখেন। গৌহাটিস্থ সাহিত্যানুশীলনী সভায় উহা পঠিত হয়।

২য় ঃ—বড় দিনের বন্ধে বড়পেটায় সত্রাদি প্রেক্ষণার্থ একটি অভিযান করা হয়। মহাপুরুষ ৺শঙ্করদেবের জীবনীলেখক শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র দে এবং বড়পেটানিবাসী শ্রীযুক্ত মল্লনারায়ণ দাস মহাশয়, আরও ২।১ জন সহ মিলিয়া উক্ত মহাপুরুষের অবস্থান-ভূমি বড়পেটার নানা স্থান পর্য্যটন করেন। এই বিষয়ে একটি প্রবন্ধ সাহিত্যানুশীলনী সভায় পাঠার্থ শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র দে মহাশয় প্রদান করিয়াছিলেন।

৩য় ঃ—ইংরেজী নবমবর্ষের ১ম দিবস নবগ্রহ-পাহাড়ে পরিভ্রমণ করা হয়। এস্থানে প্রাচীনকালে কোন মানমন্দির ছিল কিনা তদ্বিষয়ে খোঁজ করাই এ অভিযানের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। তদুপলক্ষে নবগ্রহের ও শিলপুখুরির লিপি পাঠ করা হয়। এতৎসম্বন্ধে বিবরণ শ্রীযুক্ত গোপালকৃষ্ণ দে সাহিত্যানুশীলনী সভায় পাঠ করেন।

এই গেল সমষ্টিভাবের কথা। ব্যষ্টিভাবে শ্রীযুক্ত গোপালকৃষ্ণ দে সেন্সাসের কার্য্যোপলক্ষে হাজোনামক প্রসিদ্ধ তীর্থক্ষেত্রে গমন করিয়া অনেক তথ্য সংগ্রহ করেন এবং সাহিত্যানুশীলনী সভায় তথা হইতে সংগৃহীত ৩ খানি কারুকার্য্যসম্বলিত ইষ্টক প্রদর্শন করেন। উহা বর্ত্তমানে কার্জ্জন-হলে রক্ষিত হইয়াছে। তাঁহা কর্ত্তৃক সংগৃহীত তথ্য চিত্রসহ সত্বরেই লিপিবদ্ধ করিয়া অনুসন্ধান-সমিতির মারফতে সাধারণ্যে প্রকাশিত করিবেন।

১০ ঃ—১৩১৮ সালে ঈদৃশ ঐতিহাসিক অভিযান একটিমাত্র হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত বিদ্যাবিনোদ মহাশয় কাছাড়ের শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র লস্কর এবং শ্রীযুক্ত নন্দলাল বর্ম্মা মহাশয়দ্বয়ের সহযোগে কাছাড়ের শেষ রাজধানী খাসপুরস্থ মন্দিরাদির ধ্বংসাবশেষ পরিদর্শনার্থ গমন করেন। এতদ্বিষয়ক বিবরণী ruins at khaspur শীর্ষক প্রবন্ধে লিখিত হইয়া প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগের পরিচালক শ্রীযুক্ত কর্ণেল গর্ডন বাহাদুরের নিকটে দাখিল

করেন। এবং যাহাতে ধ্বংসোন্মুখ মন্দিরাদি সংরক্ষিত হয় তজ্জন্য ব্যবস্থা করিতে প্রস্তাব করেন। তাঁহার অনুজ্ঞামতে প্রবন্ধটি Dacca Review পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। ইতিমধ্যে এই প্রবন্ধ কাছাড়-রাজমন্ত্রির বংশ-সম্ভূত উক্ত শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র লস্কর কর্ত্তৃক কাছাড়ের ডিপুটীকমিশনর বাহাদুরের গোচরীভূত হইলে তিনি খাসপুরে গমন করিয়া তাঁহার Diaryতে ইহার অবস্থাদি লিপিবদ্ধ করেন। এইরূপে আসল ব্যাপার মহামান্য চীফ্ কমিশন বাহাদুরের গোচরে আইসে। তৎফলে বিগত ১৪ই মে তারিখের আসাম-গেজেটে ঐ সকল মন্দিরাদি সরকার বাহাদুর কর্ত্তৃক Under ancient monument preservation act. সংরক্ষিত হইবে বলিয়া বিজ্ঞাপনী প্রচারিত হইয়াছে।

১১।—১৩১৭ সালের আরও দুইটি বিষয়ে বিদ্যাবিনোদ মহাশয় অপর কয়েকজন তথ্যানুসন্ধায়ী মহোদয়-সহযোগে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন। প্রথমতঃ আসামের প্রাচীন পুঁথি-সংগ্রহ ও ঐ গুলির বিবরণ লিপিবদ্ধ করা; ২য় ধারাবাহিকরূপে আসামের পৌরাণিক ও প্রাচীন ইতিবৃত্ত ও সামাজিক তথ্য ইত্যাদি লিপিবদ্ধ করা। প্রথম বিষয়ের ভার বিদ্যাবিনোদ মহাশয় স্বয়ং গ্রহণ করেন, ইহার ফলে "হেড়ম্বরাজ্যের দণ্ডবিধি" খানি সংগৃহীত হইয়া গৌহাটিস্থ সাহিত্যানুশীলনী সভায় ও উত্তরবঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনের মালদহ-অধিবেশনে প্রদর্শিত হইয়া সচিত্র ভূমিকা সহকারে কাছাড়ের প্রাগুক্ত শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র লস্কর মহোদয়ের সাহায্যে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে; অসমীয়া দুইখানি পুঁথি বিষয়ক একটি সচিত্র প্রবন্ধ রঙ্গপুর-পরিষদের এক অধিবেশনে আলোচিত হইয়া ঐ পরিষদ পত্রিকায়-মুদ্রিত ও প্রচলিত হইয়াছে—তন্মধ্যে একখানি পুঁথি বঙ্গসাহিত্যানুশীলনী সভায় প্রদর্শিত হইয়াছিল এবং 'দীপিকাছন্দ' নামক সুপ্রাচীন বলিয়া কথিত অপর একখানি অসমীয়া গ্রন্থের সমালোচনা

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে পঠিত হইয়া পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। অতঃপর এই কার্য্যভার শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র দে মহাশয়ের উপর অর্পিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত উত্তমচন্দ্র বড়ুয়া মহাশয়ও দুখানি পুথির বিবরণ লিখিয়া সাহিত্যানুশীলনী সভায় প্রেরণ করেন। উহা ঐ সভায় পঠিত হইবার পরে সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় মুদ্রিত হয়।

দ্বিতীয় বিষয় অর্থাৎ আসামের পৌরাণিক ও প্রাচীন ইতিবৃত্ত ও সামাজিক তথ্য ইত্যাদি সম্বন্ধে। শ্রীযুক্ত গোপালকৃষ্ণ দে উত্তরবঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনের মালদহ-অধিবেশনে "প্রাচীন কামরূপ"-শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করেন, যাহা উক্ত সম্মিলনের রিপোর্টে প্রকাশিত হইয়াছে। অতঃপর ১৩১৮ সালে "কামরূপের সামাজিক-প্রথা" শীর্ষক প্রবন্ধ উত্তরবঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনে কামাখ্যা-অধিবেশনে পঠিত হয় এবং বিগত ফাল্গুন মাসের "বঙ্গদর্শনে" প্রকাশিত হয়। তিনি এতদ্বিষয়ক আরো কয়েকটি প্রবন্ধ ১৩১৮ সালে "বিশ্ববার্ত্তায়" প্রকাশিত করেন।

১২।—এই সকল কার্য্যের সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীন কীর্ত্তির পরিচায়ক বস্তু-সংগ্রহও কিছু কিছু হইতে লাগিল। হাজোর ইষ্টকের কথা বলা হইয়াছে। তৎপর "মাইবঙ্গ" হইতে একটি ভগ্ন শিলামূর্ত্তি শ্রীযুক্ত বিদ্যাবিনোদ মহাশয় আনিয়া তৎপার্শ্বে রক্ষা করিলেন। ক্রমশঃ আরও দুই একটি বস্তু যথা—প্রস্তরের সিংহ-মূর্ত্তি ইত্যাদি আহরণ করা হইয়াছে।

১৩।—১৩১৮ সাল হইতে গৌহাটিস্থ সাহিত্যানুশীলনী সভা অভিযানাদির প্রতি তেমন সাগ্রহ নয়নে দৃষ্টিপাত না করাতে তাদৃশ কার্য্যস্রোত একটু মন্দীভূত হইয়া পড়ে—ব্যষ্টিভাবে একটি অভিযান মাত্র হইয়াছিল—সে কথা পূর্ব্বে বলা হইয়ছে। তথাপি প্রাগুক্ত উৎসাহী ব্যক্তিগণকর্ত্তৃক ঐতিহাসিক তথ্যাদি সংগ্রহ, পুস্তক-বিবরণী সংকলন এবং বস্তু-আহরণকার্য্য ধীরে ধীরে চলিতে লাগিল।

১৪।—১৩১৮ সনের শেষার্দ্ধে ৺মহামায়া কামাখ্যাপীঠে উত্তরবঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনের অধিবেশন প্রস্তাব স্থির হইল। শ্রীযুক্ত বিদ্যাবিনোদ মহাশয়, বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতির অনুকরণে কামরূপ অনুসন্ধান-সমিতি সংস্থাপন সম্ভবপর কিনা, এতৎ-সম্বন্ধে স্বদীয় বান্ধবগণের সহিত পরামর্শ করিতে লাগিলেন; পরিশেষে কামাখ্যা-সম্মিলন-উপলক্ষে এ বিষয়ে যথোচিত কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিবার সংকল্প স্থির হইল। অতঃপর উত্তরবঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনীর ৺কামাখ্যা অধিবেশনের "বিষয়নির্দ্ধারণ কমিটি"র আলোচনাকালীন শ্রীযুক্ত গোপাল-কৃষ্ণ দে মহাশয় কমিটিতে প্রশ্ন করেন যে উত্তরবঙ্গ সাহিত্য-সম্মিলনের দুইবারই আসামপ্রদেশে অধিবেশন হইল কিন্তু অসমীয়া সাহিত্যিকগণ হইতে আশানুরূপ সহানুভূতি না পাইবার কারণ কি? দেখা যায় উঁহাদের একটা ধারণা এই জন্মিয়াছে যে বাঙ্গালীরা তাঁহাদের ভাষাকে বড়ই তুচ্ছতাচ্ছিল্য করেন, ইহাকে একটা ভাষাই মনে করেন না—এমন কি এই ভাষার অস্তিত্ব পর্য্যন্ত বিলোপ করিবার জন্য বাঙ্গালীরা যথাসাধ্য প্রয়াস করেন। আর এই সম্মিলনের ভাণ করিয়া তাঁহাদের কার্য্যোদ্ধার অর্থাৎ বাঙ্গালা সাহিত্যের পুষ্টিকল্পেই যত্ন করেন কিন্তু আসামী ভাষার জন্য কিছুই করেন না। অতএব এইভাব দূর করিয়া যথার্থ সৌহার্দ্দ জন্মাইবার জন্য আসামীভাষার ও আসামের তথ্যানিরূপণের আসামের সাহিত্যের উন্নতিকল্পে কি করা যাইতে পারে তাহার একটা উপায় নির্দ্ধারণ হউক। অনেক আলোচনার পর স্থির হয় যে, সংকল্পিত কামরূপ-অনুসন্ধান-সমিতির দ্বারাই এই মিলন-কার্য্যের শুভসংকল্প কার্য্যে পরিণত করিতে হইবে। তাই এই সমিতি এইরূপ ভাবে গঠিত হইয়াছে, যাহাতে যে সকল আসামবাসী সাহিত্যিক ও সাহিত্যানুরাগী ভদ্রলোক নানা বিঘ্ন উপেক্ষা করিয়া ৺কামাখ্যা-সম্মিলনে আন্তরিকভাবে যোগ দিয়াছিলেন—

কামরূপ-অনুসন্ধান-সমিতির গঠনকল্পনা।

তাঁহাদিগকেও সমিতির মধ্যে সদস্যরূপে অন্তর্নিবিষ্ট করা হইয়াছে এবং বঙ্গভাষার সঙ্গে সঙ্গে অসমীয়া ভাষায়ও ইহার অনুসন্ধান-ফল প্রকাশিত হইবে বলিয়া বিধান করা হইয়াছে।

১৫।—অনুসন্ধান-সমিতির গঠনের পর নানা কারণবশতঃ বিশেষ-ভাবে অভিযানাদি কার্য্য না হইলেও যাহা হইয়াছে, তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া যাইতেছে।

(১) :—১৩১৯ সালের পৌষ-সংক্রান্তি দিবস কটন কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত তারকেশ্বর ভট্টাচার্য্য এম, এ, শ্রীযুক্ত বিদ্যাবিনোদ মহাশয় এবং শ্রীযুক্ত গোপালকৃষ্ণ দে কামাখ্যাপাহাড়ের পাদমূলস্থ শিলালিপি (যাহার বিষয় পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে) পাঠ ও তল্লিখিত পরিখা ও প্রাচীরের অনুসন্ধান করেন। শিলালিপি লিখিত বিষয়টি [illegible] :—আহোমরাজ শ্রীমৎ শিবসিংহের আদেশক্রমে শ্রীমদ্দহিঙ্গীয়া ব[illegible] কর্ত্তৃক প্রাগজ্যোতিষপুরের শিলেষ্টকাদি নির্ম্মিত পশ্চিমদ্বারেব দক্ষিণভাগ দুইশত পঞ্চাশধনু পরিমিত প্রাচীব ও দুইশত বাইশ ধনু পরিমিত পরিখাদ্বারা ১৬৫৪ শকে অলঙ্কৃত হইল।

শিলালিপিপাঠ

(২) :—১[illegible] মাঘ তারিখে শ্রীযুক্ত গোপালকৃষ্ণ দে ও তদীয় বন্ধু শ্রীযুক্ত সোনারাম চৌ[illegible] (কমিশনার আপিসের জনৈক কর্ম্মচারী) গৌহাটি সহরস্থ সার্কিট [illegible]ব হাতায় যে শিলালিপি রহিয়াছে তাহা পাঠ করেন। তাহার স[illegible] এই :—শক্রবংশাবতংশ সৌমারেশ্বর স্বর্গদেব শ্রীশ্রীমৎশিবসিং[illegible]দেশক্রমে দুবরাকুলকমল দিনকর শ্রীমত্তকণ দুবরা বৃহৎফুকন দে[illegible]ব দুর্গম প্রাকারবেষ্টিত (বিজয়নামক দক্ষিণদ্বার-বিশিষ্ট) বিচি[illegible]মন্দির ১৬৬০ শকে নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।

(৩) :—১[illegible] পুনঃ তারকেশ্বর বাবু, বিদ্যাবিনোদ মহাশয় এবং গোপালবাবু [illegible] ছত্রাকার প্রভৃতি স্থান পরিদর্শন করেন কিন্তু

ইহাতে দুইবৎসর পূর্ব্বকৃত কার্য্যালোচনা ভিন্ন বিশেষ কোনও কাজ হয় নাই।

(৪):—১৪ই মাঘ তারিখে শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত বিশ্বাস, বিদ্যাবিনোদ মহাশয় এবং গোপালবাবু আমিনগাঁও হইতে ২॥০ মাইল দূরবর্ত্তী গৌরীপুর গ্রামে চিলা নামধেয় পর্ব্বতগাত্রস্থ শিলালিপি পাঠ করেন। তাহার বিবরণ এই:—

"শিলাচলের পূর্ব্বভাগে ১২৪৮ ধনু পরিমিত রঙ্গমহাল নামক গড়খাই ১৬৫৪ শকে মহারাজ শিবসিংহের আদেশক্রমে দিহিঙ্গীয় বড়ফুকন কর্ত্তৃক খনিত হইল।" কামাখ্যাপাহাড়ের পাদমূলস্থ শিলালিপি এবং এই শিলালিপি একই বৎসরের। পরে ফিরিবার সময় ইতিহাসপ্রসিদ্ধ শরাইঘাট যুদ্ধক্ষেত্র এবং অন্য একটি গড় পরিদর্শন করা হইয়াছিল। এই সকলের বিবরণ যথাযথ লিপিবদ্ধ হইলে, আসাম-ইতিহাসের অনেক তথ্য দ্বারা সাহিত্যের ভাণ্ডার কথঞ্চিৎ পুষ্ট হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

(৫):—তারপর এই বৎসরের জন্য শেষবার বিদ্যাবিনোদ মহাশয় একাই বশিষ্ঠাশ্রমে গিয়া মন্দিরস্থ শিলালিপি পাঠ করেন এবং অরুন্ধতী-গুহা দর্শন করেন। তদ্বিষয়ক সচিত্র প্রবন্ধ জ্যৈষ্ঠের "মানসী"তে প্রকাশিত হইয়াছে।

এতদুপলক্ষে আর একটি বিষয়ের উল্লেখ করা যাইতে পারে। বিগত মাঘমাসে বিখ্যাত প্রত্নতত্ত্বজ্ঞ শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয়ের গৌহাটিতে আসিবার কথা ছিল। তখন সমিতির পক্ষ হইতে বিদ্যাবিনোদ মহাশয় আসাম-প্রত্নতত্ত্ববিভাগের পরিচালক কর্ণেল গর্ডন বাহাদুর দ্বারা নগেন্দ্রবাবুর গৌহাটি হইতে তেজপুর গমনাগমনের ব্যয় মঞ্জুর করাইয়াছিলেন এবং তেজপুর গিয়া যাহাতে তিনি তত্রত্য পর্ব্বত-গাত্রলিপি পাঠ করিতে পারেন তদর্থে সুবিধা করা হইয়াছিল। কিন্তু

দুঃখের বিষয় কোনও কারণে নগেন্দ্রবাবুর গৌহাটিতে আগমন ঘটিয়া উঠে নাই।

১৬।—এই বৎসরের কার্য্যাবলীর মধ্যে কামরূপ-শাসনাবলীর অনুষ্ঠান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কামরূপ-অনুসন্ধান-সমিতির সভ্য আসামের পণ্ডিতরত্ন মহামহোপাধ্যায় ধীরেশ্বরাচার্য্য কবিরত্ন মহাশয় "বলবর্ম্মার তাম্রশাসন"খানি ১৩১৬ সালে গৌহাটি-সাহিত্যানুশীলনী সভায় প্রদর্শন করেন। ইহা বহুপূর্ব্বে সর্ব্বপ্রথম তাঁহারই দ্বারায় 'আসাম'-নামক পত্রে, পরিশেষে এসিয়াটিক সোসাইটিতে প্রত্নতত্ত্বজ্ঞ ডাক্তার হর্ণলি দ্বারা ইংরাজীতে আলোচিত হয়। যাহাই হউক, এই তাম্রশাসনখানির বঙ্গানুবাদ এবং হর্ণলি সাহেবের পাঠ ও ব্যাখ্যার সমালোচনা করিয়া আমাদের বিদ্যাবিনোদ মহাশয় একটি প্রবন্ধ লেখেন। তাহা বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে পঠিত হইয়া পরিষদ-পত্রিকায় ১৩১৭ সালে প্রকাশিত হয়। ঐ প্রবন্ধে তিনি এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত অন্যান্য তাম্রশাসনও এইরূপে বঙ্গভাষায় অনুবাদসহ বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হন।

কামরূপ-শাসনাবলী

ইতিমধ্যে অনুসন্ধান-সমিতির অন্যতর সম্পাদক আসাম-প্রত্নতত্ত্ব-বিশারদ শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র গোস্বামী মহাশয় নবাবিষ্কৃত ধর্ম্মপালের তাম্রশাসনখানির পাঠোদ্ধার করেন এবং শ্রীযুক্ত বিদ্যাবিনোদ মহাশয় ইহার বঙ্গানুবাদ করেন। সাহিত্যানুশীলনী সভায় ইহারও আলোচনা হইয়াছিল।

অতঃপর যখন বিদ্যাবিনোদ মহাশয় পূর্ব্বপ্রতিশ্রুতি-অনুসারে ইন্দ্র-পালের তাম্রশাসন সমালোচনায় হাত দেন, তখন কামরূপ-অনুসন্ধান-সমিতির পত্তন হইল; তিনিও তাঁহার কর্ম্মফল সমিতিতে অর্পণ করিয়া পূর্ব্বে আলোচিত বলবর্ম্মার শাসনকে ১ম সংখ্যক কল্পনা করিয়া ইন্দ্রপালের

তাম্রশাসনকে কামরূপ-শাসনাবলীর ২য় সংখ্যক করিয়া সমিতির নিয়মানুসারে রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষদে প্রেরণ করেন—তাহা ঐ পরিষদের এক অধিবেশনে পঠিত হইয়া রঙ্গপুর পরিষদ-পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে।

অতঃপর এই অনুসন্ধান-সমিতি যাঁহার দ্বারে জন্মপরিগ্রহ করিয়াছে তাঁহারই কৃপায় অভাবনীয় উপায়ে এক অতি প্রাচীন তাম্রশাসন বিদ্যা-বিনোদ মহাশয়ের হস্তে আসিয়া পতিত হইয়াছে। ইহা এতৎপ্রদেশে এযাবৎ প্রাপ্ত সমস্ত লিপি অপেক্ষা প্রাচীনতম। ইহার সম্বন্ধে "সাহিত্য-সংবাদ"পত্রের জ্যৈষ্ঠ-সংখ্যায় যে সংবাদটুকু প্রচারিত হইয়াছে, তাহাই এস্থলে উদ্ধৃত হইতেছে।

"কামরূপ অনুসন্ধান সমিতির প্রাণস্থানীয় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য বিদ্যাবিনোদ এম্, এ মহাশয় সম্প্রতি এক প্রাচীন তাম্রশাসনের আবিষ্কার করিয়াছেন। শ্রীহট্টের অন্তর্গত পরগণা পঞ্চখণ্ডে ৬ হাত মাটীর নীচে ঐ তাম্রশাসন পাওয়া গিয়াছে। ঐ তাম্রশাসন-পত্রের পাঠোদ্ধারে, শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ বাবু প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, ঐ তাম্রশাসন-খানি কামরূপাধিপতি ভাস্করবর্ম্মার প্রদত্ত। চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েনসাং কামরূপে ইহাঁকে রাজত্ব করিতে দেখিয়া যান। তবেই দেখা যায় যে, শাসনপত্রখানি ৭ম শতাব্দীর প্রথমাংশে প্রদত্ত হইয়াছিল। ভাস্করবর্ম্মা তদীয় স্কন্ধাবার কর্ণসুবর্ণ হইতে শাসন আদিষ্ট করিয়াছেন। এই শাসনে তাঁহার দ্বাদশ পুরুষের নাম আছে। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয়, মধ্যে ৩য় ফলকখানি নাই; সেই নিমিত্ত সম্প্রদানীভূত ব্রাহ্মণের নাম-ধাম, তথা, প্রদত্ত ভূমির ঠিকানা কিছুই জানিবার উপায় নাই। যাহা হউক অতি প্রাচীন এই শাসনখানিকে সন্ধান করিয়া "কামরূপ অনুসন্ধান-সমিতি" সার্থকনামা হইলেন, ইহা বড়ই আনন্দের বিষয়।"

ইহা কামরূপ-শাসনাবলীর ৩য় সংখ্যকরূপে প্রকাশার্থে রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষদে প্রেরিত হইয়াছে। উক্ত পরিষদের বার্ষিক অধিবেশনে ইহা পঠিত হইয়াছিল, শীঘ্রই পরিষদের পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে।

সম্প্রতি বিদ্যাবিনোদ মহাশয় রত্নপালের তাম্রশাসনের আলোচনা করিতেছেন।

এই কামরূপ-শাসনাবলী বঙ্গভাষায় অনুবাদসহ সমগ্র প্রকাশিত হইলে বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতির প্রকাশিত গৌড়লেখমালার ন্যায় বঙ্গীয় ঐতিহাসিক-সাহিত্যের বিশেষ পুষ্টিসাধন করিবে, তৎসম্বন্ধে সংশয় নাই।

কামরূপের পুরাবৃত্ত

১৭।—কামরূপের পুরাবৃত্তসম্বন্ধেও সমিতির কিঞ্চিৎ কাজ হইয়াছে। শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এ সম্বন্ধে একখানি বিস্তৃত গ্রন্থ প্রণয়নে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। তিনি প্রারম্ভেই প্রতিপাদন করিতেছেন যে, প্রাচীন কামরূপ ইতিহাস-প্রসিদ্ধ স্থল। ইহার গৌরব-কথা সমগ্র ভারত অতি প্রাচীন কাল হইতে জ্ঞাত ছিল। এমন কি এখানকার অকাপ্রভৃতি পার্ব্বত্য-জাতিরাও সময়ে আর্য্যজাতির শাখাভুক্ত ছিল। কালবশাৎ যে সব কারণে বর্ত্তমান অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে তাহার আভাস দিয়াছেন। তিনি এ ভূমির প্রাচীন সভ্যতা, শিল্প প্রভৃতি নানা বিষয়ের গবেষণা করিয়া বিস্তৃত বিবরণী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। অতি প্রাচীনকাল অর্থাৎ নরকাসুর হইতে কোচরাজত্ব পর্য্যন্ত এ যাবৎ এ গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। ভবিষ্যতে তিনি উপাদান সংগ্রহপূর্ব্বক পরবর্ত্তী ইতিবৃত্ত সাধারণের সমক্ষে উপস্থিত করিবেন বলিয়া আশা করেন।

চিত্রশালা ও গবর্ণমেণ্টের নিকট প্রস্তাব

১৮।—গত জানুয়ারি মাসের ২২ তারিখের আসাম গেজেটে তেজপুরস্থ বাণরাজার বাড়ীর ধ্বংসাবশেষ রক্ষণ-সম্বন্ধে চি[illegible] সাহেব বাহাদুরের একটি রিজলিউশান

প্রকাশিত হয় এবং জনসাধারণের অভিপ্রায় জ্ঞাপন জন্য অনুরোধ করা হয়। তদনুসারে আমাদের সমিতি এতদ্বিষয়ে পত্রদ্বারা এইমত প্রকাশ করিয়াছেন যে আসামের কেন্দ্রস্থানীয় গৌহাটিতে কেন্দ্র-চিত্রশালা central museum স্থাপন করিয়া তেজপুর এমন কি অন্যান্য স্থান হইতেও যে সকল প্রস্তরাদি স্থানান্তর করা যাইতে পারে সেই সকল এখানে আনিয়া আসামের ভবিষ্যৎ আশাস্থল কলেজের ছাত্রবর্গের চক্ষুর সম্মুখে রক্ষা করিলে স্বদেশের প্রাচীন গৌরব-সম্বন্ধে তাঁহাদের একটা ধারণা জন্মিবে। যাহা হউক ইহা অত্যন্ত সুখের বিষয় যে, গবর্ণমেণ্ট গৌহাটিতে একটি চিত্রশালা সংস্থাপনের জন্য সংকল্প করিতেছেন। আশা আছে, শীঘ্রই এই সংকল্প কার্য্যে পরিণত হইয়া এ প্রদেশের প্রত্নতত্ত্বানুশীলনের পথ সুবিস্তৃত হইবে এবং তাহাতে আমাদের অনুসন্ধান-সমিতির সভ্যগণ কর্ত্তৃক সংগৃহীত দ্রব্যগুলিও সংস্থাপিত দেখিয়া আমরা তৃপ্ত হইব।

পুস্তক-সংগ্রহ ও তাদ্বিবরণী প্রকাশ

১৯।—আলোচ্য বর্ষে শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র দে মহাশয় তিনখানি অসমীয়া পুস্তকের বিবরণ সঙ্কলন করিয়াছেন। তাহা সমিতির নিয়মানুসারে রঙ্গপুর-পরিষদ-পত্রিকায় প্রকাশার্থ প্রেরিত হইয়াছে। সমিতির অন্যতর সম্পাদক শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র গোস্বামী মহাশয় গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক পুস্তক-সংগ্রহ কার্য্যে বৃত হইয়া বহু পুস্তক সংগ্রহ করিয়াছেন। চিত্রশালা museum স্থাপিত হইলে ঐ পুস্তকগুলি তথায় রক্ষিত হইলে সেই গুলির বিবরণ সংগ্রহের বিশেষ সুবিধা হইবে।

আর্থিক অবস্থা

২০।—কার্য্যের সফলতা অনেক পরিমাণে আর্থিক অবস্থার উপর নির্ভর করে। আমাদিগের সমিতির আর্থিক-অবস্থা-সম্বন্ধে এই বলা যায় যে, ধনগৃহ এক প্রকার শূন্য। কেবল গত সম্মিলনীর সভাপতি ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত শশধর রায় মহাশয় অনুসন্ধান-সমিতি-গঠনকালীন মানবতত্ত্ব-সম্বন্ধীয় তথ্যানুসন্ধানের ব্যয়-নির্ব্বা-

হের জন্য যে কয়টি মুদ্রা দিয়াছিলেন উহাই আমাদের একমাত্র সম্বল। এখন যাহাতে অর্থের স্বচ্ছলতা ঘটে তৎকল্পে যত্ন করার আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে।

২১।—আমাদের এই প্রথম বৎসরের কার্য্যে অনেক ত্রুটি রহিয়াছে।

ত্রুটি-স্বীকার

আমরা এ যাবৎ সংকল্পিত কার্য্যের অনেকই সম্পাদিত করিতে পারি নাই। উদাহরণ-স্থলে বলা যাইতে পারে যে, আমরা অসমীয়া-ভাষায় এ পর্য্যন্ত আমাদের সমিতির কোনও অনুসন্ধান-ফল প্রকাশিত করিতে পারি নাই। কিন্তু আমাদের ভরসা আছে যে, ভবিষ্যতে সমিতির অসমীয়া সভ্যমহোদয়গণের সাহায্যে এই কার্য্য-সম্পাদনে আমাদের কোনও রূপ ত্রুটি হইবে না।

দ্বিতীয়তঃ ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত শশধর রায় মহাশয় যে বিষয় মনস্থ করিয়া সমিতির হাতে টাকা দিয়াছেন তাহার এ যাবৎ কোনও কিছুই করিতে পারা যায় নাই। তিনি তথ্য-সংগ্রহের যে ফারম অঙ্কিত করিয়া দিয়াছিলেন, তাহা দুই এক স্থলে বিলিও হইয়াছিল কিন্তু দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে ইহাতে উল্লেখযোগ্য কোন ফল হয় নাই।

তৃতীয়তঃ নিয়মিতরূপে সমিতির ত্রৈমাসিক অধিবেশনও হইয়া উঠে নাই। এবং নিয়মাবলী গঠনাদির নিমিত্তে কোনও প্রয়াস করা এ যাবৎ হয় নাই।

২২ :—উপসংহারকালে এত ত্রুটি ও অভাবের মধ্যেও একটি আনন্দকর সংবাদ আপনাদের নিকট উপস্থিত করিতেছি।

উপসংহার

গত ৩০শে অগ্রহায়ণ রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষদ তাঁহাদের অষ্টম বার্ষিক ২য় মাসিক অধিবেশনে প্রাচীন কামরূপ অনুসন্ধানের বিশেষ ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। এবং ৫ম মাসিক অধিবেশনে উঁহাদের অনুসন্ধান সমিতির উদ্যোগে অন্যতম সদস্য শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার লাহিড়ী মহাশয়ের সংগৃহীত একখানি প্রস্তরফলক ও বিবিধ প্রস্তর-মূর্ত্তি

প্রদর্শিত হইয়াছিল। রঙ্গপুরস্থ ভদ্র মহোদয়েরাও যে কামরূপ-অনুসন্ধান-সমিতির পক্ষে কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছেন উহা বস্তুতঃই আশা ও আহ্লাদের বিষয়। যখন বঙ্গদেশস্থ ভ্রাতৃবৃন্দ আসামের প্রবাসী ও অধিবাসীর সহিত একযোগে একই কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছেন তখন বলা যাইতে পারে যে, কামরূপ-অনুসন্ধান-সমিতির ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল ও আশাপ্রদ। আসুন আমরা সকলে জগৎ-জননী মহামায়ার চরণে প্রণত হইয়া তাঁহার আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করি। তাঁহার সম্মুখে সংবৎসর পূর্ব্বে যে কর্ম্মের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে, তাহাতে আত্মদান করিয়া ফলাফল তাঁহাতেই অর্পণ করিয়া বলি—যৎকিঞ্চিৎ কৃতমস্মাভিস্তত্রাম্ব প্রীতিরস্তুতে।

শ্রীকালীচরণ সেন
কার্য্যাধ্যক্ষ ও কোষাধ্যক্ষ।

অতঃপর নিম্নলিখিত প্রবন্ধগুলি পঠিত হইল—

প্রবন্ধ	লেখক
১। শ্রীচন্দ্রদেবের নবাবিষ্কৃত তাম্রশাসন	অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ বসাক এম, এ
২। মুরাদের প্রতি ঔরঙ্গজেবের তিনখানি পত্র	স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট-বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ নিয়োগী বি এ

এই প্রবন্ধ-সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত অধ্যাপক যদুনাথ সরকার এম,এ মহাশয় বলিলেন যে, এই চিঠি তিনখানির একখানির নকল রাজপুতানার রাজ-গ্রন্থাগারে পাইয়া কর্ণেল টড ইংরেজী অনুবাদ করেন। আর একখানি রয়েল-এসিয়াটিক-সোসাইটীতে আছে।

৩। রঙ্গপুরেপ্রাপ্ত বিষ্ণুমূর্ত্তি — শ্রীযুক্ত অবনীচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বি,এ এম্, আর্, এ, এস্

৪। ভারতে পর্ত্তুগীজ — নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত (ছাত্রসদস্য)

এই চারিটি প্রবন্ধপাঠের পর সম্মিলনের অগ্য দিবসীয় অধিবেশনের কার্য্য সন্ধ্যা প্রায় ৭ ঘটিকার পরে স্থগিত রাখা হয়।

রজনী দশ ঘটিকা হইতে স্থানীয় "দিনাজপুর ড্রামেটিক ক্লাব" অভিধেয় নাট্যশালার সদস্যবৃন্দ সমাগত প্রতিনিধিগণের মনোরঞ্জনার্থ "চন্দ্রগুপ্ত" নাটক অভিনয় করিয়াছিলেন।

দ্বিতীয় দিবস ৩১শে জ্যৈষ্ঠ শনিবার

প্রাতঃকাল ৮টা হইতে ১২টা।

সভাপতি মহাশয় যথাসময়ে স্বীয় আসন পরিগ্রহ করিলে পুনরায় প্রবন্ধপাঠ আরম্ভ হইল। প্রবন্ধের বিষয় ও লেখকের নাম নিম্নে প্রদত্ত হইতেছে।

প্রবন্ধের নাম	লেখক
সাহিত্য	
(৫) ১। বিদ্যাপতি	শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ মিশ্র
(৬) ২। মালদহের কবি ও গায়কগণ	„ কুমুদনাথ লাহিড়ী
ইতিহাস	[পাঠক-মোহন্ত বলদেবানন্দ গিরি]
(৭) ৩। বাণগড়	শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী রায় [লেখকের অনুপস্থিতিতে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার মহাশয় এই প্রবন্ধ পাঠ করেন]

(৮) ৪। ভারতীয় কলা-শিল্প শ্রীযুক্ত ভুজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
[এই প্রবন্ধের কিয়দংশ পঠিত হইয়াছিল]

বিজ্ঞান-বিভাগ।

(৯) ৫। আয়ুর্ব্বেদোক্ত শস্ত্র-নির্ম্মাণ অধ্যাপক পঞ্চানন নিয়োগী এম,এ

এইস্থানে প্রবন্ধপাঠের মুখবন্ধস্বরূপে সভাপতি মহাশয়ের অনুরোধে শ্রীযুক্ত অধ্যাপক পঞ্চানন নিয়োগী মহাশয় বলিলেন যে, বাঙ্গালাভাষায় বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ ও পুস্তক লিখিবার আয়োজন বহুদিবস হইতে চলিয়া আসিতেছে; কিন্তু উহা সম্পূর্ণরূপে সফলতা লাভ করে নাই। স্বর্গীয় রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয় এই বিষয়ে অগ্রণী ছিলেন। স্বর্গীয় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় "বঙ্গদর্শনে" বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ লিখিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় ও শ্রীযুক্ত জগদানন্দ রায়প্রমুখ কয়েকজন বৈজ্ঞানিক পুস্তক ও প্রবন্ধ রচনা করিয়া বঙ্গসাহিত্যের বৈজ্ঞানিক-বিভাগের পুষ্টি-সাধন করিতেছেন; কিন্তু বঙ্গসাহিত্যের বৈজ্ঞানিক-বিভাগ আশানুরূপ গঠিত হইতেছে না। তাহার কারণ প্রধানতঃ দুইটি। প্রথম—আমাদের দেশে বৈজ্ঞানিক শিক্ষা সমস্তই ইংরাজী ভাষাতে সম্পন্ন হইয়া থাকে, দ্বিতীয়—আমাদের দেশের বৈজ্ঞানিকগণ তাঁহাদের মৌলিক গবেষণা ইংরাজী ও জর্ম্মণ-ভাষায় প্রকাশ করিয়া থাকেন। এই দুইটি কারণ বহুদিবস পর্য্যন্ত দেশে বর্ত্তমান থাকিবে। যতদিন পর্য্যন্ত দেশে বৈজ্ঞানিকের সংখ্যা সমধিক বর্দ্ধিত না হইবে, ততদিন এ দেশজাত মৌলিক গবেষণা ইউরোপের বিশাল বৈজ্ঞানিক সমাজের ভাষায় প্রকাশিত হইতে থাকিবে এবং যতদিন দেশের জনসাধারণ বিজ্ঞানশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিতে না পারিবেন, ততদিন বঙ্গভাষায় বৈজ্ঞানিক গ্রন্থাদি লিখিবার জন্য লেখক মিলিবে না।

এই সকল প্রতিবন্ধক সত্ত্বেও একটু স্বার্থত্যাগ করিলে আমরা এখন

হইতেই নিম্নলিখিত তিনটি উপায়ে বঙ্গ-সাহিত্যে বিজ্ঞান-বিভাগের উন্নতি-সাধন করিতে পারি। প্রথমতঃ—বৈদেশিক ভাষা হইতে প্রধান প্রধান বৈজ্ঞানিক গ্রন্থাবলী সরল বাঙ্গালাভাষায় অনুবাদ করিতে হইবে। দ্বিতীয়তঃ—প্রাচীন ভারতের বিজ্ঞানসম্বন্ধে জ্ঞান লইয়া যে সকল আলোচনা হইতেছে তাহা প্রথমেই বঙ্গভাষায় লিখিতে হইবে। পরে আবশ্যক হইলে ইংরাজী প্রভৃতি বৈদেশিক ভাষায় উহাদিগকে ভাষান্তরিত করিলে চলিবে। এই সকল গ্রন্থ বঙ্গভাষায় লিখিত হইলে কাহারও বুঝিতে কষ্ট হইবে না। উপরন্তু ঐ সকল গ্রন্থ বঙ্গভাষা হইতে ইংরাজী প্রভৃতি বৈদেশিক ভাষায় ভাষান্তরিত হইলে বঙ্গভাষার মর্য্যাদা বৃদ্ধি হইবে। তৃতীয়তঃ—ভারতের বৈজ্ঞানিকগণের মৌলিক গবেষণা এখনও বহুদিন পর্য্যন্ত বিদেশীয় ভাষায় প্রকাশিত হইতে থাকিবে। কিন্তু প্রতিবৎসর সেই সকল মৌলিক গবেষণার সংক্ষিপ্ত ফল সরল ভাষায় দেশবাসীকে বুঝাইয়া দিতে হইবে। অধিকাংশ লোকেই বিদেশীয় বৈজ্ঞানিক পত্রিকাদি পাঠ করেন না; তাঁহাদিগকে স্বদেশপ্রসূত বৈজ্ঞানিক তথ্যগুলি মাতৃ-ভাষায় বুঝাইয়া দিলে তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন দেশে বিজ্ঞান-চর্চ্চা কিরূপ অগ্রসর হইতেছে। এই ভার বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ বা সাহিত্য-সম্মিলন গ্রহণ করিতে পারেন। এইরূপে ক্রমশঃ বঙ্গভাষায় বৈজ্ঞানিক বিভাগ গঠিত হইবে এবং এমন দিন আসিবে যে, আমাদিগের বৈজ্ঞানিকগণকে তাঁহাদিগের মৌলিক গবেষণার ফল প্রকাশিত করিবার জন্য মাতৃভাষা ছাড়িয়া ইউরোপের দ্বারস্থ হইতে হইবে না।

এই স্থানে শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী মহাশয় বলিলেন যে, পঞ্চানন বাবু নিজে ১০০ শত টাকা দিবেন এবং আরও ১০০ শত টাকা বন্ধুগণের নিকট হইতে সংগ্রহ করিয়া দিতে স্বীকৃত। সুতরাং শস্ত্র-নির্ম্মাণ-কার্য্য সত্বর আরম্ভ করার জন্য মূল পরিষৎকে আমি সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিতেছি।

প্রবন্ধের নাম	লেখক
বিজ্ঞান	
(১০) ৬। গো-দুগ্ধ	শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী
(১১) ৭। প্রাচীন ভারতে ধাত্রীবিদ্যা	" কালীকান্ত বিশ্বাস
(১২) ৮। ভারতে রোগোৎপত্তির কারণ ও পল্লীবাসের অযোগ্যতা	" নলিনীকান্ত বসু
বিবিধ	
(১৩) ৯। অর্থ-নীতি	" যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার

এই প্রবন্ধের সারমাত্র বিজ্ঞাপনের পূর্ব্বে লেখক বলিলেন যে আপনারা কাজ করিতেছেন করুন, পুরাতন ইষ্টক-প্রস্তর সংগ্রহ করুন, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে যাহাতে উদরান্নের সংস্থান হয় তাহার চেষ্টা করিবেন। ইতিহাসের আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে সেই জন্য অর্থ-নীতিরও আলোচনা আবশ্যক। আশা করি শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় এ বিষয়ে দৃষ্টিপাত করিবেন।

(১৪) ১০। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর দুরবস্থা — অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রাধাকমল মুখোপাধ্যায় এম্,এ

এই প্রবন্ধপাঠের পূর্ব্বে লেখক বলিলেন যে, বৈষয়িক-সম্বন্ধে কোন তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা এ পর্য্যন্ত হয় নাই। এই আলোচনার সৃষ্টি মৈমনসিংহ-সাহিত্য-সম্মিলনে। তাহার পর আমি ৩।৪ বৎসর অবিরত চেষ্টা করিয়া বহু তথ্য সংগ্রহ করিয়াছি; বহু গ্রামে ঘুরিয়া বহু মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকের নিকট হইতে যে সমুদয় জ্ঞাতব্য বিষয় অবগত হইয়াছি, তাহারই একটি তালিকা মাত্র পাঠ করিব।

(১৫) ১১। আধুনিক সমাজে সুকুমার শিল্প ও সাহিত্যের স্থান — শ্রীযুক্ত [illegible] ঘোষ

সাহিত্য

(১৬) ১২। বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা — বিধুশেখর শাস্ত্রী

নিম্নলিখিত প্রবন্ধগুলি পঠিত বলিয়া গৃহীত হয়।

সাহিত্য

(১৭) ১৩। কবি দ্বিজেন্দ্রলাল — শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র সান্যাল

(১৮) ১৪। নাট্যসাহিত্য ও দ্বিজেন্দ্রলাল — " রাজেন্দ্রলাল চক্রবর্ত্তী

(১৯) ১৫। বাঙ্গলাভাষা — " বীরেশ্বর সেন

(২০) ১৬। বাঙ্গলাভাষা ও জাতীয়-সাহিত্য — " দুর্গাচন্দ্র সান্যাল

(২১) ১৭। মৈমনসিংহের নিরক্ষর কবি — " যোগেন্দ্রচন্দ্র বিদ্যাভূষণ

(২২) ১৮। বৈদিক সাহিত্য — " রমেশচন্দ্র সাহিত্য-সরস্বতী

ইতিহাস

(২৩) ১৯। বালুরঘাটের কয়েকটি প্রাচীন স্থানের পবিচয় — শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত চক্রবর্ত্তী

(২৪) ২০। দিনাজপুরের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস — " প্রফুল্লকুমার সেনগুপ্ত

(২৫) ২১। উত্তরবঙ্গ ভ্রমণ — " কালীকান্ত বিশ্বাস

(২৬) ২২। প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্য অবলম্বনে বণিকজাতির ইতিহাস — " যোগেশচন্দ্র দত্ত

বিবিধ

(২৭) ২৩। হিন্দু-মুসলমান-সম্বন্ধে চিন্তার কতিপয় জলবিম্ব — " মৌলবী ইয়াকুনউদ্দিন আহাম্মদ

(২৮) ২৪। পল্লীচিত্র — " মাধবচন্দ্র শিকদার

এতদ্ব্যতীত নিম্নোক্ত প্রবন্ধ ও কবিতাগুলি নানা কারণে পঠিত হইতে পারে নাই।

প্রবন্ধ

২৯।	সঙ্গীত	চন্দ্রনাথ রায়
৩০।	জগ্লেশ দর্শন	
৩১।	দেশীয় ভাষা	
৩২।	হিন্দুর বর্ত্তমান অবস্থা	শিবনাথ বুজর বরুয়া স্মৃতিতীর্থ
৩৩।	কাঠগড়	কৃষ্ণনাথ সেন
৩৪।	কবি ও সমালোচক	শৈলেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী
৩৫।	বঙ্গে স্ত্রীশিক্ষা	সুরেন্দ্রনাথ সেন
৩৬।	নব্যভাবত	নরেশচন্দ্র মজুমদার
৩৭।	কামরূপের পুরাবৃত্ত	সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
৩৮।	আসামপ্রদেশের প্রাচীন তথ্য	ঐ
৩৯।	অসমীয়া ও বাঙ্গালাভাষা	ঐ
৪০।	শিক্ষা	রমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য বি, এল্

কবিতা

১।	দিনাজপুর-পরিচয়	দেবেন্দ্রবিজয় চক্রবর্ত্তী
২।	অর্চ্চনা	রেবতীরমণ দত্ত
৩।	ভগবচ্চরণ স্তোত্রম্	হেমচন্দ্র সরকার
৪।	বিজ্ঞান গায়ত্রী	ভুবনমোহন দাসগুপ্ত
৫।	নাম-মাহাত্ম্য	জানকীনাথ গোস্বামী
৬।	সম্বর্দ্ধনা	রাধামোহন ঘোষ
৭।	বাণী-বন্দনা	জানকীনাথ গোস্বামী
৮।	সভ্যগণের প্রতি নিবেদন	গোবিন্দকেলি মুন্সী

প্রবন্ধ পাঠ সমাপ্ত হইলে সম্মিলনে-সভাপতি মহাশয় কর্ত্তৃক উত্থাপিত নিম্নলিখিত সাতটি প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিতে গৃহীত হয়—

প্রথম প্রস্তাব।

স্থানীয় চিত্রশালা-স্থাপন-সম্বন্ধে বঙ্গগভর্ণমেণ্ট সম্প্রতি ১৯১০ সালের ১১নং সারকিউলার দ্বারা যে অনুকূল মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, তজ্জন্য এই সম্মিলন গভর্ণমেণ্টকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছেন।

দ্বিতীয় প্রস্তাব।

এই সম্মিলন উত্তরবঙ্গের সাহিত্য-সমিতিগুলিকে অনুরোধ করিতেছেন যে, সম্মিলনের অধিবেশনের অন্ততঃ একমাস পূর্ব্বে ঐ সকল সমিতির বার্ষিক কার্য্য-বিবরণী লিখিয়া সম্মিলন-পরিচালন-সমিতির সম্পাদকের নিকটে পাঠাইয়া দিবেন এবং সম্পাদক ঐ কার্য্য-বিবরণ সম্মিলন-সমক্ষে উপস্থাপিত করিবেন।

তৃতীয় প্রস্তাব।

বিরাজ্-উস্-সলাতিন্ রচয়িতা গোলাম হোসেনের ইংরেজবাজারের অন্তর্গত চক কোরবানআলী পল্লীতে যে সমাধি আছে তদুপরি একখানি স্মৃতিফলক প্রতিষ্ঠিত হউক। মালদহ-জাতীয়-শিক্ষাসমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী ঘোষ বি,এল্ মহাশয় উহার ব্যয় ও কর্ম্মভার গ্রহণে সম্মত হওয়ায় এই সম্মিলন তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছেন।

বঙ্গভাষায় নানা মুসলমান ধর্ম্মগ্রন্থপ্রণেতা কাজি হায়াত মামুদের রঙ্গপুর-স্থিত পীরগঞ্জ থানার অন্তর্গত শিবপুর গ্রামের দক্ষিণে ঝাড়বিশিলা গ্রামে অবস্থিত সমাধির উপরে একখানি স্মৃতিফলক প্রতিষ্ঠার জন্য রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষদের সভাপতি মহাশয়কে অনুরোধ করা হউক। ইহার

ব্যয় ও কর্ম্মভার ঐ সভাকর্ত্তৃক গৃহীত হওয়ায় সভাকে ধন্যবাদ প্রদত্ত হইতেছে।

অদ্ভুতাচার্য্যের বাসস্থান-নির্ণয়ের ভার শ্রীযুক্ত শ্রীরাম মৈত্রেয় মহাশয়ের উপরে ন্যস্ত করা গেল।

রস-কদম্বের গ্রন্থকার কবিবল্লভের বগুড়াস্থিত বাসস্থানে স্মৃতিফলক প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করা হউক। বগুড়ার সাহিত্য-সমিতি ঐ স্মৃতিফলক প্রতিষ্ঠার ব্যয় ও কর্ম্মভার গ্রহণ করায় এই সম্মিলন, সমিতির সদস্যগণকে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছেন।

চতুর্থ প্রস্তাব।

সম্মিলনের নিয়মাবলী।

উত্তরবঙ্গ সাহিত্য-সম্মিলন-পরিচালনের নিমিত্ত নিয়মাবলী প্রণীত হওয়ার সময় উপস্থিত হইয়াছে। এ নিমিত্ত এ সম্মিলন-পরিচালন-সমিতি রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষদের উপরে নিয়মাবলীর পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করিয়া উত্তরবঙ্গের সাহিত্যিকগণ মধ্যে বিতরণপূর্ব্বক মতামত গ্রহণের ভার প্রদত্ত হইল। ঐ নিয়মাবলী সম্মিলনের আগামী অধিবেশনে গ্রহণার্থ উপস্থাপিত করা হয়।

পঞ্চম প্রস্তাব।

বগুড়া সাহিত্য-সমিতির পক্ষ হইতে পূর্ব্ব-সম্মিলনের নির্দ্দেশমত শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রলাল আচার্য্য মহাশয়ের রচিত শিশুপাঠ্য-সাহিত্য "বাঙ্গালার প্রতাপ" গ্রন্থের পরীক্ষার ভার নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণের উপরে অর্পিত হইল—

শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরী
„ হীরেন্দ্রনাথ দত্ত
„ বিনয়কুমার সরকার

ষষ্ঠ প্রস্তাব।

মুদ্রাযন্ত্র-স্থাপনের পূর্ব্বে কাষ্ঠফলকে খোদিত বগুড়ায় কোনও কবির রচিত গ্রন্থের মুদ্রালিপির আদর্শ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে রক্ষিত আছে। তাহার আসল বর্ণে ছাপা কাষ্ঠফলকের প্রতিকৃতি মুদ্রণের জন্য উক্ত পরিষদকে অনুরোধ করা হয়।

সপ্তম প্রস্তাব।

এই সম্মিলন দিনাজপুরবাসীকে অনুরোধ করিতেছেন যে, দিনাজপুরে সাহিত্যালোচনার নিমিত্ত একটি সাহিত্য-সমিতির ও বিবিধ ঐতিহাসিক নিদর্শনাদি সংগ্রহপূর্ব্বক একটি চিত্রশালা প্রতিষ্ঠা করা হউক।

সভাপতি মহাশয় কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া কলিকাতা হইতে সমাগত শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম্,এ, বি,এল্ বেদান্তরত্ন মহাশয় নিম্নলিখিতরূপ বক্তৃতা প্রদান করিলেন—

সভাপতি মহাশয় আমাকে উপদেশ দিতে বলিলেন। আমার এমন কোনই শক্তি নাই যদ্দ্বারা আমি উপদেশ দিতে পারি। বিশেষতঃ মাননীয় শ্রীযুক্ত চৌধুরী মহাশয়ের সমক্ষে। তবে দিনাজপুরে আসিয়া যে শান্তি-সুখ ও প্রীতি লাভ করিয়াছি তজ্জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি। কেবল দিনাজপুরে নহে—সমগ্র বাঙ্গালায় একটা সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। জাতীয়-শক্তির উন্মেষকালে নানা বিষয়ে শক্তি স্ফুরিত হয়। আমাদিগকও শুধু শিলালিপির আলোচনা না করিয়া ধন-বিজ্ঞান, শিল্পকলা প্রভৃতি সর্ব্ববিষয়ে দৃষ্টি রাখা চাই। বাঙ্গালার সর্ব্বত্রই এই উৎসাহ দেখিয়া

আসিয়াছি। আজ উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব্ব, পশ্চিম সর্ব্বত্র একই ধরণে কার্য্য চলিয়াছে।

রঙ্গপুর সাহিত্য-পরিষদের বার্ষিক অধিবেশন উপলক্ষে কয়েক বৎসর পূর্ব্বে একবার রঙ্গপুরে উপস্থিত হইয়াছিলাম—তখন সেখানে যে সাহিত্যের পূজা দর্শন করিয়াছিলাম—এক্ষণে তাহা সমগ্র উত্তরবঙ্গ ও আসামে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। তাহার ফলে এই পৃথক সাহিত্য-সম্মিলন। তদ্দর্শনে অনেকের ভয় হইতেছে যে, ইহা ভেদবুদ্ধিপ্রসূত। কিন্তু আমি আশা করি ভেদ-বুদ্ধি যেন আদৌ না আসে। এ বিষয়ে একটা গল্প মনে পড়িল—পুরাকালে স্বীয় শ্রেষ্ঠত্ব লইয়া প্রাণ এবং দেহের অপর অপর যন্ত্রগুলির সঙ্গে একবার কলহ উপস্থিত হইয়াছিল। স্ব স্ব প্রাধান্য রক্ষা করিতে গিয়া দেহের সকল অংশই ক্রমে দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল, শরীর ধ্বংস হইল, প্রাণ আধারশূন্য হইয়া পড়িল। তখন সকল দেহাংশ-গুলি ও প্রাণ বুঝিতে সক্ষম হইল যে, স্ব স্ব স্থানে সকলেই শ্রেষ্ঠ এবং কার্য্যকারী। সকলেই এক দেহযন্ত্র পরিচালনপূর্ব্বক প্রাণকে ধারণ করিতেছে। সাহিত্য-পরিষদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাখাগুলিও সেইরূপ। বঙ্গ-সাহিত্য যদিও বহু শতাব্দী ব্যাপিয়া আলোচিত হইয়া আসিতেছিল—তথাপি ইহা অতি ক্ষুদ্র আকারে জন্মগ্রহণ করে। আমরা পুরাণে ও ব্রাহ্মণে এইরূপ একটি ঘটনার বিবরণ পাঠ করি! মনু একটি ক্ষুদ্র মৎস্য প্রাপ্ত হন, তিনি সেইটিকে ক্ষুদ্র একটি চৌবাচ্চাতে রাখিয়া দিলেন—ক্রমে ক্রমে সেটি বড় হইল আর চৌবাচ্চায় ধরে না, তখন তিনি সেটিকে পুকুরে ছাড়িয়া দিলেন—ক্রমে নদীতে তারপর সাগরেও তাহার দেহ ধরে না! সাহিত্য-পরিষদও ঠিক তেমনি করিয়া আকারে বর্দ্ধিত হইতেছে। যখন ইহার জন্ম হয়, তখন ক্ষুদ্র পরিষদ-গৃহে ইহার স্থান হইয়াছিল, ক্রমে ধীরে ধীরে ইহা সমগ্র বঙ্গদেশে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে—

কে বলিতে পারে ইহা সমগ্র ভারতবর্ষব্যাপী না হইবে? মনু যেমন সেই মৎস্যের সাহায্যে প্রকাণ্ড প্রলয়-জলধি অতিক্রম করিয়াছিলেন, আমরাও তেমনি হয় তো এই পরিষদের সাহায্যেই দুর্ব্বার জাতীয়বিপ্লব অতিক্রম করিতে সক্ষম হইব।

অনন্তর সাহিত্য-সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি মহাশয় সভাপতি মহাশয়ের আহ্বানে বলিলেন যে—

সভাপতি আমায় বক্তৃতা করিতে আদেশ করিলেন। যিনি বাল্যকাল হইতে আমাকে স্নেহ করিয়া আসিতেছেন, তিনি আজ আমাকে এই সভার মধ্যে অপ্রস্তুত করিলেন কেন তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। আমার এই যাত্রা— এই বিরাট সাহিত্য-অভিযান—একরূপ ভাবরাজ্যে নিরুদ্দেশ যাত্রা। বঙ্গ-সাহিত্যের যে গতির কথা দত্ত মহাশয় উল্লেখ করলেন তাহা সত্য—সত্য হ'তে সত্য – ধ্রুব। ইহার লক্ষ্য কোথায় কে জানে! জাতীয় জীবন অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইলে স্ব-শক্তির উপর দাঁড়াইয়া বিশ্বে আত্মপ্রকাশ করিতে হইলে—সাহিত্যচর্চ্চা আমাদের অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম। আ'জ ভারতবর্ষে সর্ব্বত্র বাঁচিবার ও আত্মগরিমা গাহিবার একটা বিপুল চেষ্টা হইতেছে—সর্ব্বত্র সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। তাই জীবন-সঞ্চারিণী মূর্ত্তিতে সাহিত্য আমাদের সম্মুখে উপস্থিত! কে আ'জ এই সাহিত্যের সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিবে? ধর্ম্মই সাহিত্যের জীবন! বৈষ্ণব ও শাক্ত এই দুই ধর্ম্ম ধারাপাতে আমাদের সাহিত্য পুষ্ট হইয়াছে, এখনও যে ইহার গতি কোন্ দিকে তাহা বঙ্গবাসীর কাছে বলিতে হইবে না। এই সাহিত্যে মাতৃনিষ্ঠার ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে বলিয়াই—প্রাণশক্তি আজ স্ফূর্ত্তিতে নাচিয়া উঠিতেছে। এই দেশ ধর্ম্মের উপাসক। যদি সাহিত্যের পুষ্টি চাই—যদি জড়ের মধ্যে চেতনা দেখিতে ইচ্ছা করে—তবে পূর্ব্বপুরুষগণের পদাঙ্ক অনুসরণ করা একান্ত কর্ত্তব্য! তাহা হইলে মাতৃধর্ম্মে সিদ্ধিলাভ

নিশ্চিত! কিন্তু কেহ যেন ভাবের ঘরে চুরি না করেন। যাহাতে এই আরাধনায় সিদ্ধিলাভ করিতে পারি, তাহারই চেষ্টা করা কর্ত্তব্য! যদি আমরা একনিষ্ঠ সাধক হই—আমাদের শক্তি এই মাতৃপূজায় নিযুক্ত করি—তবে নিশ্চয়ই সফলকাম হইব। কাপট্য-বর্জ্জন করিয়া—ভাবের ঘরে চুরি না করিয়া—চল আজ সভাপতি মহাশয় যে নবীন পথের সন্ধান দিয়াছেন—সেই পথে! সিদ্ধি নিশ্চিত!

অতঃপর "নায়ক" সম্পাদক শ্রীযুক্ত পাচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ মহাশয় নিম্নলিখিত সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করিলেন—

যিনি আজ আপনাদের সভাপতি—আমি তাঁহারই তল্পী বহন করিতে কলিকাতা হইতে আসিয়াছিলাম। আমি শুধু মুটের কাজ করিব এই বন্দোবস্ত ছিল—সুতরাং তিনি আমাকে বক্তৃতা করিতে বলেন কোন অধিকারে? আমি চিরকাল কলিকাতার সভ্যের পক্ষ হইতে ধন্যবাদ দিয়া থাকি সেই কাজই করিব। সাহিত্যের নানা বর্ণনা শুনিলাম কিন্তু সবই কি সুকুমার সাহিত্য? বাঙ্গালীর বাঙ্গালীত্ব যেমন ফুটবে তেমনি তারা মানুষ হবে।

"এবার নূতন ভাব পেয়েছি।
ভাবীর কাছে ভাব শিখেছি॥"

এবার সভাপতির অভিভাষণে নূতন ভাব পেয়েছি। নিজের চেষ্টায় নিজের ছাঁচে মাকে গড়ে তু'লতে হবে। যাকে মা ব'লেছি তাকে এমন সাজে সাজাব যেন সকলেই তাকে বুঝতে পারে। তাহা হইলে জাতীয় ভাষার সার্থকতা। সাহিত্য বল, ভাষা বল, সবই মনের কথা। ভীষ্মের শরশয্যার কথা মনে পড়িল। সেই কোলাহল মুখরিত শরশয্যায় প'ড়ে ভীষ্ম—পিপাসায় শুষ্ককণ্ঠে দুর্য্যোধনের কাছে জল চাহিলেন। দুর্য্যোধন স্বর্ণ-ভৃঙ্গারে জল এনে দিলেন। ভীষ্ম হেসে বল্লেন এখন কি আমায় ঐ জলে

পিপাসা নিবৃত্তি হইবে। তখন অর্জ্জুনকে ডাকালেন, তিনি এসে গাণ্ডীব দিয়ে পাতাল ভেদ ক'রে ভোগবতী আকর্ষণ করে তার জল আনলেন। তাতেই ভীষ্মের পিপাসা শান্তি হল! আজ সমাজের শরীর এইরূপ শত শত শরে বিদ্ধ। কে এমন অর্জ্জুন আছে সমাজের সব দুর্নীতি সব স্তর ভাবের বাণে ভেদ ক'রে জাতীয় ভাবের ভোগবতী কুল কুল স্বরে প্রবাহিতা করিবে। উহার বিন্দুমাত্র দানে সব অভাব পূর্ণ করাইবে। আমরা গৃহে-গৃহে রাজরাজেশ্বর ছিলাম, আজ অনাথ হ'য়েছি। সত্য সত্যই আজ আমরা ভিখারী হ'য়েছি কিন্তু ভিক্ষা করাও হবে তার কাছে যে বিদুরের মত কৃষ্ণগত প্রাণ। আমরা Wordsworth Swinborne এর Parallel passage সদৃশ কবিতা খুঁজতে ভালবাসি কেন? আমাদের দাশুরায়ের পাঁচালী যে আমাদের প্রাণের ভাব। সেটিকে অনাদর করি কেন? তার সেবা-যত্নের মধ্যে স্নেহের ধারা। আজ যে আদর পাচ্ছি তার মধ্যে যে কত সুধার স্রোত তা কি ক'রে মুখে ব'লবো? এই আদরই লঙ্কাকেও মিষ্টি ক'রে দিচ্ছে। এখানে আর আপনি আমি নাই। এমনি স্নেহের টান যেন সব এক ক'রে দিচ্ছে। হীরেন বাবুর কথাই ঠিক। এই পরিষদই ভারতের ভাবসমুদ্র পার করিয়া দিবে। আমরা যাঁকে অগ্রজ ব'লে ভক্তি করি তাঁর কথাগুলি যেন মনে গাঁথা থাকে। এস ভাই সেইখানে ডুব দেই। অক্ষয় যেমন প্রস্তর তাম্রশাসন তুলছেন আমরাও যদি তা তুলি তাহাতেও কোন দোষের কথা নাই। সাহিত্য-দর্শন যা পাই তাই আমাদের ভাল। এস, এই ভাবসাগরে ডুব দেও। এই ভাব-সাগরে যা থাকে তাই তোল। সঙ্গে সঙ্গে স্নেহের সহিত ভাবের ঘরে যেন চুরি না করি। যাঁর কৃপায় আমরা স্নেহ-ধারা পাচ্ছি এস তাঁকে চিনিতে চেষ্টা করি। তা হ'লে আমাদের নাচাও সার্থক হবে, জীবনও সাথক হবে।

ইহার পরে শ্রীযুক্ত রামতারণ ভট্টাচার্য্য (দিনাজপুরের চতুষ্পাঠীর জনৈক ছাত্র) সংস্কৃত-ভাষায় অনর্গল বক্তৃতা প্রদান করেন।

অক্ষয় বাবু বলিলেন সভার শেষে সভাপতিকে ধন্যবাদ জ্ঞাপনের প্রথা আছে, আমি সে জন্য একজন যোগ্যতম মুখপাত্র স্থির করেছি। তিনি আমাদের সাহিত্য-পরিষদের স্থায়ী সভাপতি এবং রঙ্গপুরের ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দে মহাশয়। আপনারা তাঁহাকে এই সভাস্থলে দেখিয়া নিশ্চয়ই আনন্দিত হইয়াছেন।

শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দে মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ প্রদান প্রসঙ্গে বলিলেন—

আমি জানি এ প্রস্তাব সকলেই গ্রহণ ক'রবেন। সভাপতি মহাশয় শত কষ্ট স্বীকার করিয়াও আমাদের সভার কার্য্য সুশৃঙ্খলার সহিত নির্ব্বাহ করিয়াছেন তাহাতে তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদান না করিয়া থাকিতে পারা যায় না।

এই প্রসঙ্গে "ভারতবর্ষ" পত্রিকা সম্পাদক শ্রীযুক্ত জলধর সেন মহাশয় বলিলেন—

আজ কয়দিন থেকেই জলধরের যেরূপ বর্ষণ হ'য়েছে তাতে এখন যদি আমার আবার আবির্ভাব ঘটে তবে সকলেই বিরক্ত হবেন। আমাকে যদি সকলে ধরে প্রহারও দেন তবুও আমার কিছু ব'লতে থাকবে না। কারণ হাইকোর্টের জজও সামনে এবং জেলার ম্যাজিষ্ট্রেটও সামনে। আমি যখন ছোট-বেলা ভূগোল পড়তেম, তখন পড়েছিলেম যে বাঙ্গালা দেশে নানান জেলা আছে এখন দেখছি সব এক। পূর্ব্ব-উত্তর কিছুই ভেদ নাই। সভাপতি তাঁহার নিজের কর্ত্তব্য প্রতিপালন করিয়াছেন, তজ্জন্য আমি তাঁহাকে ধন্যবাদ দিতে পারি না। কর্ত্তব্য প্রতিপালন করার জন্য যদি ধন্যবাদ দিতে হয় তবে বাড়ীতে গিয়া একাদশীর উপবাস বা কালীপূজা

করার জন্য পিসীমা বা পুরোহিত ঠাকুরকে ধন্যবাদ দিতে হয়। তবে মামুলী প্রথা অনুসারে সমাগতগণের পক্ষ হইতে সভাপতিকে ধন্যবাদ দিতেছি।

বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় বলিলেন—আমাকে শেষের জন্যই রেখে দিয়েছেন। আমরা নানা দেশ-বিদেশ থেকে বহু কষ্ট নিয়ে এসেছি। আজ ছয় বৎসর এই দুটো সাহিত্য-সম্মিলনের জন্য সাহিত্যিকগণের সহিত দেখা-সাক্ষাৎ এবং মাতৃভাষায় কথা বলিবার অবকাশ হচ্ছে। এতদিন সাহিত্য-সম্মিলন ক'রে আসছি কিন্তু এরূপভাবে কর্ম্মপরিচালনা আর কোন স্থানে দেখি নাই। আমরা আপনাদিগকে এইরূপ কষ্ট দিয়াই চলিলাম। আবার একবৎসর পরে কি হইবে তাহা ভগবানই জানেন। আমরা রেলওয়ের কর্ত্তৃপক্ষগণের নিকটও কৃতজ্ঞ। তাঁহারা একভাড়ায় যাতায়াতের সুযোগ প্রদান করিয়া আমাদের মিলনের সাহায্য করিয়াছেন। দিনাজপুরের ড্রামেটিক এসোসিয়েসনের কর্ত্তৃপক্ষ আমাদিগকে সভাধিবেশনের জন্য তাঁহাদের গৃহ ছাড়িয়া দেওয়ায় তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

শ্রীযুক্ত চন্দ্রনারায়ণ রায় বি, এল্ স্বেচ্ছাসেবক-অধিনায়ক মহাশয় স্বেচ্ছাসেবকগণের পক্ষ হইতে অভ্যাগতগণের নিকটে নানা ত্রুটিনিবন্ধন বিনীতভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন।

সর্ব্বশেষে সভাপতি মহাশয় তাঁহার নিম্নলিখিত শেষ মন্তব্য প্রকাশ করিয়া এই সম্মিলনের সপ্তম অধিবেশন পাবনায় সঙ্ঘটনার্থ সাদরনিমন্ত্রণ-জ্ঞাপন করিলেন।

সভাপতির শেষ মন্তব্য

আমি যে সব কথা লিখিয়াছি, সে গুলি সকলের মতের সঙ্গে মিলিবে না, কিন্তু আমি যা বলেছি তা সত্যজ্ঞানেই ব'লেছি। আমার বিশ্বাস নয়,

যে আমরা সম্পূর্ণরূপে নিদ্রিত। মানুষ ঘুমোয় কিন্তু হৃদয় ঘুমোয় না। আমি প্রস্তাব করছি যে, আগামী বৎসর আপনারা সকলে পাবনায় উপস্থিত হবেন—সম্মিলন পাবনাতেই হবে।

অতঃপর ঢাকা উয়ারীনিবাসী সঙ্গীতাচার্য্য শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ রায় মহাশয় কর্ত্তৃক "এই কি সেই আর্য্যস্থান, আর্য্যসন্তান" ইত্যাদি কাঙ্গাল হরিনাথ-রচিত গানটি গীত হইল।

তারপর সভাপতির আদেশে বেলা ১২ টার সময় সম্মিলনের কার্য্য শেষ হইল। রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষদের চিত্রশিল্পী শ্রীযুক্ত অনন্তকুমার দাসগুপ্ত কর্ত্তৃক এই সময়ে সভাপতিসহ সমাগত বিশিষ্ট সাহিত্যিকগণের প্রভাচিত্র গৃহীত হইয়াছিল।

অভ্যর্থনা সমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় অভ্যাগত সাহিত্যিকবৃন্দকে আন্তরিক ধন্যবাদ-জ্ঞাপনপূর্ব্বক বহু ত্রুটির নিমিত্ত ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন।

শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র চৌধুরী বি এ মহাশয় অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি ও স্বেচ্ছাসেবকদিগকে ধন্যবাদ প্রদান প্রসঙ্গে বলিলেন—আপনাদের নিকটে আমার কতকগুলি প্রার্থনা ছিল কিন্তু বলবার সময় নাই। এবার দিনাজ-পুরে এসে নানা সাহিত্যিকের নিকটে নানা উপদেশ পাওয়া গেল। এ সকলের মূল হচ্ছেন আমাদের অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত মহারাজ বাহাদুর। আমি প্রতিনিধিগণের পক্ষ হ'তে তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি আর স্বেচ্ছাসেবকগণ আমাদের জন্য আয়াস স্বীকার ক'রেছেন এজন্য তাঁহাদিগকেও ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

আধুনিক সমাজে সুকুমার শিল্প ও সাহিত্যের স্থান

বর্ত্তমানকালে বঙ্গসাহিত্য ও বাঙ্গালীর জাতীয় জীবন-সম্বন্ধে সাধারণতঃ যে সকল আলোচনা হইয়া থাকে, তাহার মধ্যে দেখা যায় যে, চিন্তাশীল ও দায়িত্ববোধসম্পন্ন সমাজনেতৃগণের মধ্যে অনেকেই বলিতেছেন যে, বাঙ্গালী কিছু অধিক মাত্রায় সুকুমার সাহিত্য ও ললিতকলার চর্চ্চা করিয়াছে; এখন কিছুদিন কাব্য, উপন্যাস ও সঙ্গীত-চর্চ্চা বন্ধ রাখিয়া ইতিহাস, বিজ্ঞান ও ব্যবহারিক শিল্পের চর্চ্চা করিলেই দেশের ও সমাজের কল্যাণ। সাধারণ বাঙ্গালী-সমাজের মধ্যে বিশেষতঃ শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে, অনেকেই যে সমাজনেতৃগণের এই কথায় অল্পাধিক পরিমাণে সায় দিতেছেন, তাহাও নিঃসন্দেহ। শিল্প ও সাহিত্য এখন ক্রমশঃই এক প্রকার সৌখীন চিত্ত-বিলাসের সামগ্রী বলিয়া বিবেচিত হইতেছে। বাঙ্গালীর প্রাত্যহিক জীবনের ও ব্যবহারিক জীবনের সহিত সুকুমার সাহিত্য ও শিল্পের যে কোনরূপ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে তাহা ক্রমশঃই অস্বীকৃত হইতেছে। যে কারণেই হউক, সাধারণ বাঙ্গালীর মধ্যে সুকুমার শিল্প ও সাহিত্যের প্রতিপত্তি যে অনেক পরিমাণে কমিয়া গিয়াছে ও যাইতেছে তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই।

বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনে ও সাহিত্যিক জীবনে এই যে অবস্থাটা দাঁড়াইয়াছে, তাহা ধীরভাবে আলোচনার যোগ্য। কেবল আমাদের বাঙ্গালা দেশ নয়, বর্ত্তমান সভ্যতার যুগে সর্ব্বত্রই এই প্রশ্ন উঠিয়াছে— জাতীয়-জীবনে সুকুমার শিল্প ও সাহিত্যের স্থান আছে কি না ও যদি

থাকে সে কোথায়? এটি কেবল বাঙ্গালী জীবনের সমস্যা নয়, এটি বর্ত্তমান যুগের সমস্যা। বর্ত্তমান যুগধর্ম্ম যেখানে প্রবলভাবে কাজ করিতেছে, আধুনিক সভ্যতার কেন্দ্রস্থল সেই ইউরোপে এই বিশেষ সমস্যাটি বেশ স্পষ্টরূপ ধারণ করিয়াছে। সেখানে দেখিতে পাই যে, একদিকে সাধারণ লোকের মধ্যে শিল্প ও সাহিত্যের প্রসার-প্রতিপত্তি খুবই কম ও সাহিত্যিক ও শিল্পিগণ জাতীয়-জীবনের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে একরূপ অসমর্থ; অন্যদিকে শিল্পিগণ নিজেদের বৃত্তি-সম্বন্ধে অতি উচ্চধারণা পোষণ করিয়া থাকেন, তাঁহারা সমাজনেতা, সমাজ-শিক্ষক ও বর্ত্তমানকালোপযোগী যুগধর্ম্মের পুরোহিত বলিয়াই পরিচিত হইতে চাহেন।

একটু ভাবিয়া দেখিলেই বুঝা যায় যে অবস্থাটা অস্বাভাবিক। এত-দিন ধরিয়া সভ্য মানব-সমাজমাত্রই যে ভাবে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া আসিয়াছেন, তাহার সহিত ইহার মিল নাই। সর্ব্বদেশে ও সর্ব্বকালে সভ্য মানব-সমাজমাত্রেরই শিল্প ও সাহিত্য প্রাত্যহিক জীবনের নিত্য সহচর ছিল।

সামাজিক জীবনের উপর কাব্যচিত্র, সঙ্গীতের প্রভাব প্রবলভাবে কাজ করিত। সামাজিক-জীবনে উচ্চ আদর্শের প্রতিষ্ঠাকার্য্যে শিল্প ও সাহিত্যই প্রধান সহায় ছিল। দৃষ্টান্তস্বরূপ প্রাচীন গ্রীস, মধ্য যুগের ইউরোপ, এবং বর্ত্তমান যুগের পাশ্চাত্য সভ্যতা দ্বারা অনুপ্রাণিত হইবার পূর্ব্বকালীন ভারতবর্ষ, চীন, জাপান প্রভৃতি প্রাচ্যদেশের উল্লেখ করা যাইতে পারে। প্রাচীন গ্রীসে ভাস্কর্য্যশিল্প, নাট্যাভিনয় ও সঙ্গীত আদর্শ পৌরচরিত্র গঠনের প্রধান উপাদানস্বরূপ বিবেচিত হইত। বর্ত্তমান ইংলণ্ডের একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখক G. Lowes Dickinson তাঁহার প্রণীত Greek View of Life নামক গ্রন্থে গ্রীকদিগের সঙ্গীত-চর্চ্চা-

প্রসঙ্গে প্রাচীন গ্রীক সভ্যতার এই বিশেষত্বটুকু লক্ষ্য করিয়াছেন। গ্রীকেরা চরিত্র-গঠনের দিক দিয়া সঙ্গীত-শাস্ত্রের অনুশীলন করিতেন। বিভিন্ন প্রকার সুর ও mode অর্থাৎ রাগ-রাগিণী শ্রোতার মনে কিরূপ বিভিন্ন প্রকার ভাবের উদ্রেক করে ও শ্রোতার চরিত্রের উপর কিরূপ প্রভাব বিস্তার করে, তাঁহারা সে দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখিতেন। এমন কি প্লেটো তাঁহার Republic গ্রন্থে লিখিতেছেন যে, আদর্শ পৌরচরিত্র গঠন করিতে হইলে পৌরগণকে সুসঙ্গত ও বিধিবদ্ধ সঙ্গীত শুনাইতে হইবে; কারণ, উচ্ছৃঙ্খল সঙ্গীতের দ্বারা কেবল উচ্ছৃঙ্খল চরিত্রেরই সৃষ্টি হয় এবং রাজ্য-মধ্যে অরাজকতার প্রাদুর্ভাব হয়। ডিকিন্সন সাহেব বলেন যে, আধুনিক ইউরোপীয়ের নিকট প্রাচীন গ্রীক্-জীবনের এই দিকটা দুর্ব্বোধ্য প্রহেলিকার মত বোধ হয়; কারণ, বর্ত্তমানকালে ইউরোপীয় জনসাধারণের মধ্যে যে সঙ্গীতের অধিকমাত্রায় প্রচলন, সেই Music Hall ও Orchestra সঙ্গীত অধিকাংশ লোকের নিকট শ্রবণেন্দ্রিয়ের একপ্রকার বিলাসরূপেই পরিগণিত হয়। ইউরোপের মধ্যযুগে কাব্য, সাহিত্য, সঙ্গীত, চিত্রাদির দ্বারাই একদিকে খৃষ্টধর্ম্ম, অন্যদিকে বীরধর্ম্ম বা Chivalry সমাজের মধ্যে প্রসারলাভ করিয়াছিল।

সাধু মহাপুরুষ অবতারদিগের লীলাচিত্র-শোভিত গীর্জ্জাঘর, ধর্ম্মকথা-সম্বলিত Mystery ও Miracle নাট্যাভিনয়, সাধু-সন্তানদিগের জীবনী, বাইবেল-বর্ণিত ঘটনাবলী ও খৃষ্টলীলা-সম্বলিত কাব্য-সমূহের পাঠ, আবৃত্তি ও কীর্ত্তন, ক্যাথলিক ধর্ম্মপন্থার নানা পর্ব্ব ও উৎসব—এই সকলের দ্বারা ইউরোপের মধ্যযুগে সাধারণ জন-সমাজের মধ্যে খৃষ্ট-ধর্ম্ম যে জীবনী-শক্তি লাভ করিয়াছিল তাহা পরবর্ত্তীকালের সংস্কৃত খৃষ্টধর্ম্ম এ পর্য্যন্ত লাভ করিতে পারে নাই। অন্যদিকে সেই যুদ্ধ-বিগ্রহ অশান্তির যুগে যোদ্ধৃবর্গের মধ্যে নানা Romance কাব্যের মধ্য দিয়া আর একটি

প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। এক কথায় তাহার নাম হয় Chivalry বা বীরধর্ম্ম। যুদ্ধে ন্যায়ধর্ম্ম-পালন, সবলের অত্যাচার হইতে দুর্ব্বলের উদ্ধার, স্ত্রীজাতির প্রতি সম্মান ও একনিষ্ঠ প্রেমের সাধনা—এইরূপ কয়েকটি আদর্শ লইয়া এই রোমান্স-সাহিত্যের সৃষ্টি। এই সকল আদর্শ কেবল কাব্য ও সঙ্গীতের রাজ্যেই আবদ্ধ ছিল না, সে কালের যোদ্ধৃ-সমাজের জীবনেও এই আদর্শগুলি অল্পাধিক পরিমাণে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিল। ভারতবর্ষ, চীন, জাপান প্রভৃতি প্রাচ্যদেশে অতি প্রাচীন-কাল হইতে এখন পর্য্যন্ত শিল্প ও সাহিত্য সামাজিক জীবনে প্রধান স্থান অধিকার করিয়া আসিয়াছে। আমাদের দেশে যাত্রা, কথকতা, পাঠ, আবৃত্তি, পাঁচালী, কীর্ত্তন প্রভৃতি নানা উপায়ে সাহিত্যের আদর্শ সমাজে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে। রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত, চণ্ডী, মনসার ভাসান প্রভৃতি গ্রন্থের আদর্শই আমাদের সমাজে গার্হস্থ্য-জীবনের আদর্শ-স্বরূপ স্বীকৃত হইয়া আসিয়াছে। অন্যদিকে চিত্র, ভাস্কর্য্য ও স্থাপত্যও এই কার্য্যে সহায়তা করিয়া আসিয়াছে। মন্দিরাদির গাত্রে দেব-দেবীর ও অবতারের লীলা-চিত্র ও রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণোক্ত-কাহিনী এবং বৌদ্ধ-বিহারাদিতে বুদ্ধদেবের লীলা-চিত্র—ভারত-সমাজের সর্ব্বোচ্চ আদর্শগুলিকে লোক-চক্ষুর সম্মুখে সর্ব্বদা জীবন্ত করিয়া রাখিত। আদর্শ পুত্র, আদর্শ-পত্নী, আদর্শ-ভ্রাতা, আদর্শ-পরিবার, আদর্শ-রাজা, আদর্শ-বণিক্, আদর্শ-ক্ষত্রিয়, আদর্শ-গৃহী, আদর্শ-ত্যাগী ও ভক্ত, সামাজিক ও আধ্যাত্মিক জীবনের সমস্ত আদর্শগুলিই সাহিত্য ও শিল্পের সাহায্যেই সমাজে প্রতিষ্ঠা-লাভ করিয়াছিল। ভারতীয় রাজদরবারে কবি, শিল্পী ও পুরাণপাঠক ও সঙ্গীতাচার্য্যদিগের স্থান সুনির্দ্দিষ্ট ছিল। মহাভারতের শান্তিপর্ব্বে ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে রাজধর্ম্ম-সম্বন্ধে যে উপদেশ দিতেছেন তন্মধ্যে অমাত্য-সভাগঠন-প্রসঙ্গে ব্যবস্থা দিতেছেন যে, রাজার অমাত্যসভায়

ব্রাহ্মণ-বৈশ্য ও শূদ্র অমাত্যের পার্শ্বে একজন করিয়া সূত বা পুরাণপাঠককে স্থান দিতে হইবে।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, প্রাচীন সভ্য-সমাজমাত্রেই শিল্প ও সাহিত্যের শক্তি ব্যক্তিগত ও সামাজিক চরিত্রগঠনে নিয়োজিত হইয়া আসিয়াছে; এবং সমাজ-নেতৃগণ এই গুলিকে সমাজ-ব্যবস্থার সুপরিচালন-কার্য্যে প্রধান সহায়স্বরূপ অবলম্বন করিয়া আসিয়াছেন। কিন্তু বর্ত্তমান-কালে কি প্রাচ্যে কি প্রতীচ্যে আধুনিক পাশ্চাত্য সভ্যতা যেখানেই প্রসার লাভ করিয়াছে, সেই খানেই ইহাদিগকে আর সেরূপ সহায় মনে করা হয় না। যাহারা সমাজের মধ্যে সংসারের নানাবিধ কর্ম্মে নিযুক্ত আছেন, যাহারা বিশেষভাবে সাহিত্যরস-চর্চ্চায় নিযুক্ত নহেন, এক কথায় সমাজের বার আনা লোকের কাছে সাহিত্য ও শিল্পের এই যে প্রতিপত্তি হ্রাস হইয়াছে, তাহার কারণ কি! এরূপ বলা যায় না যে, সাহিত্য ও শিল্প-সৃষ্টির অভাবই ইহার কারণ। এই মুদ্রাযন্ত্রের যুগে সপ্তাহে সপ্তাহে কত শত কাব্য-উপন্যাস প্রভৃতি নানাবিধ সাহিত্য-সম্ভার বহন করিয়া গ্রন্থপ্রকাশকগণ জনসাধারণের নিকট উপস্থিত করিতেছেন তাহার ইয়ত্তা নাই। প্রতিভাবান্, দৈবশক্তিসম্পন্ন গ্রন্থকার ও শিল্পীর যে অসদ্ভাব আছে তাহাও বলা যায় না। আমাদের দেশের মাইকেল, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ, আধুনিক ইউরোপের গেটে, ওয়াস্ ওয়ার্থ, টেনিসন, শেলি, ব্রাউনিং, বারণ-জোন্স, রোদাঁ প্রভৃতি সাহিত্যিক ও শিল্পিগণ যে কোনও যুগের সাহিত্য ও শিল্প-দরবারে উচ্চাসন পাইবার যোগ্য।

বর্ত্তমান বাঙ্গালা-সাহিত্য-প্রসঙ্গে যাঁহারা এই বিষয় আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা আধুনিক বাঙ্গালা-সাহিত্যের প্রসারহীনতার মোটামুটি এই কারণ নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন যে, অধিকাংশ বাঙ্গালী ইংরাজী শিক্ষা

প্রাপ্ত হন নাই, অথচ অধিকাংশ বাঙ্গালী গ্রন্থকার ইংরাজী শিক্ষায় শিক্ষিত এবং কি ভাবে, কি ভাষায় ইংরাজী আদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত। সুতরাং তাঁহাদের এই 'ইংরাজী গন্ধি' সাহিত্য সাধারণ বাঙ্গালীর নিকট হয় একেবারে দুর্ব্বোধ্য, অথবা বোধগম্য হইলেও তেমন প্রাণস্পর্শী হয় না। কথাটার মধ্যে অনেকটা সত্য নিহিত আছে; কিন্তু এতৎসম্বন্ধে ইহাই শেষ কথা নহে। কারণ, শুধু যে বাঙ্গালাদেশেই সাহিত্য ও শিল্প সামাজিক হিসাবে পঙ্গু ও শক্তিহীন হইয়াছে, তাহা নহে। আধুনিক ইউরোপীয় সাহিত্যকেও এই ব্যাধি প্রবলভাবে আক্রমণ করিয়াছে। সুতরাং ব্যাধির মূল নিরূপণ করিতে হইলে সাহিত্যের সঙ্কীর্ণ ক্ষেত্র ছাড়িয়া বর্ত্তমান যুগের জীবনযাত্রা প্রণালীর যে বিশেষ ধর্ম্ম তাহার মধ্যেই ইহার সন্ধান করিতে হইবে।

আধুনিক পাশ্চাত্য-সমাজ-সম্বন্ধে যাহারা কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়াছেন তাঁহারা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিবেন যে, এটি বিশেষভাবে ব্যবসাদারীর যুগ। এ পর্য্যন্ত যে সকল নানা বিচিত্র মানবসম্বন্ধ ব্যবহারিক জীবনের শুষ্কতা অপহরণ করিয়া নানা অসুবিধা সত্ত্বেও সামাজিক-জীবনে রস-সঞ্চার করিত, বর্ত্তমানকালে সেই সকল সম্বন্ধ ক্রমশঃই অস্বীকৃত হইতেছে, এবং আইন আদালত, চুক্তি ও ব্যবসাদারী তাহাদের স্থান অধিকার করিয়া বসিতেছে। রাজার সহিত প্রজা, প্রতিবেশীর সহিত প্রতিবেশী, প্রভুর সহিত ভৃত্য, বণিকের সহিত গৃহস্থ, স্বজাতীয়ের সহিত স্বজাতীয়, গ্রামবাসীর সহিত গ্রামবাসী, এমন কি, এক পরিবারভুক্ত বিভিন্ন ব্যক্তি এখন আর সেরূপ পরস্পর আত্মীয়সম্বন্ধ স্বীকার না করিয়া, ক্রমশঃ কেবল চুক্তির বন্ধনে আবদ্ধ হইতেছেন। বৈষয়িক সম্বন্ধমাত্রই এখন পূরাপূরি বৈষয়িক, তাহার সহিত ধর্ম্ম বা অন্য কোনও প্রকার স্বাভাবিক ভাব-বন্ধনের সংস্রব নাই। কাহারও সম্বন্ধে

কাহারও দায়িত্ববোধ নাই, সমাজের ব্যক্তিমাত্রই এখন এক একটি স্বতন্ত্র ব্যক্তি। যে দায়িত্ব আইন-আদালতের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত, সে দায়িত্ব ভিন্ন অন্য প্রকার দায়িত্ব এখন আর সেরূপ স্বীকৃত হয় না। এই বাঙ্গালা-দেশে প্রাচীন সমাজে দেখা যায় যে, সরকারের বিশেষ বিধি-ব্যবস্থা ব্যতিরেকেও বৃক্ষ-জলাশয় দেবালয়-প্রতিষ্ঠা, পাঠশালা-চতুষ্পাঠী-পরিচালন, অন্নসত্র, জলসত্র-স্থাপন, দরিদ্র আতুরদিগের ভরণপোষণ, এমন কি অক্ষম বা ব্যাধিগ্রস্ত গো-পশ্বাদির চিকিৎসা ও ভরণপোষণের ব্যবস্থা প্রভৃতি সমাজ-হিতকর নানা অনুষ্ঠান অতি সুচারুরূপে ও স্বাভাবিক-ভাবে সম্পন্ন হইত। এখন আইন-আদালত সমেত সরকারের সমস্ত শক্তি নিয়োজিত না হইলে সামাজিক কোন অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয় না। একটা ছোট কথা দিয়া ইহার দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। এ বিষয়ে সকলেই অল্লাধিক পরিমাণে ভুক্তভোগী যে, এই সভ্যতার যুগে সাধারণ লোকের পক্ষে উপযুক্ত মূল্য দিয়াও আহার্য্যই হউক আর পরিধেয়ই হউক, খাঁটি বা আসল দ্রব্য পাওয়া ক্রমশঃই অসম্ভব হইয়া উঠিতেছে। অথচ এই অভি-যোগটি সম্পূর্ণ আধুনিক। মিউনিসিপালিটীর আইনের কোনই কড়াকড়ি ছিল না, অথচ প্রাচীন সমাজে খাঁটী দ্রব্যের অভাব ঘটিত না। কারণ, সমাজের মধ্যে একটা মোটামুটি রকমের সামাজিক ধর্ম্মবোধ জাগ্রত ছিল। বণিক-সম্প্রদায়ের মধ্যেও সেই ধর্ম্মবোধ বা ভাব-প্রবণতা সমান ভাবেই কাজ করিত। বণিক কখনও নিজকে সমাজ হইতে বিশ্লিষ্ট, সকল সম্বন্ধমুক্ত, স্বতন্ত্র ব্যক্তিরূপে ভাবিতে পারিতেন না। সমাজের অন্তর্ভুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তিই যে ধর্ম্মের অবতার ছিলেন, এ কথা কেহই বলিবেন না, কিন্তু সমাজের মধ্যে যে সকল আদর্শ প্রতিষ্ঠিত ছিল, সমাজের সেই জীবন্ত-জাগ্রত অবস্থায় কোনও ব্যক্তিবিশেষের পক্ষে সমাজ-ধর্ম্ম লঙ্ঘন অপেক্ষা পালনই তখন সহজ ও স্বাভাবিক ছিল। আমরা এই ব্যক্তি-

স্বাতন্ত্র্যের যুগে এই সমাজানুগত্যকে দাসত্ব বলিতে শিখিয়াছি এবং নানা প্রকার আন্দোলন ও বিপ্লবের দ্বারা সমাজের নানা বন্ধন ছিন্ন করিয়া দিয়া, মজ্জাগত সমাজবোধের যে সংস্কার এখনও ক্ষীণভাবে লোকের মনে জাগিয়া আছে তাহা নানা যুক্তি ও প্রলোভনের দ্বারা উৎপাটিত করিয়া সমাজস্থ প্রত্যেক ব্যক্তিকে স্বাধীনতা স্বাতন্ত্র্য দিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছি। সুতরাং বর্ত্তমান কালের সভ্য মানব-সমাজ ক্রমশঃ যে আদর্শের দিকে অগ্রসর হইতেছেন, তাহাতে সমাজ বলিলে আমরা এদেশে যাহা বুঝি, সে বস্তুর কোনও স্থান নাই। রাষ্ট্রশক্তিই এখন যথাসম্ভব সমাজ-ধর্ম্মের স্থান অধিকার করিতেছে।

শক্তি রাষ্ট্রেরই হউক বা ব্যক্তিবিশেষেরই হউক, তাহার ধর্ম্মই এই যে, তাহার সহিত ভাবের কোন সংস্রব নাই। যেখানে কেবল শক্তি দ্বারা কাজ চালান হয়, সেখানে ভাব জাগাইয়া রাখার কোন আবশ্যকতা অনুভূত হয় না। সকলেই জানেন যে, ইংলণ্ড প্রভৃতি পাশ্চাত্যদেশে ষ্টেট্ অর্থাৎ রাজ-সরকারকে দরিদ্রের ভরণপোষণের ভার লইতে হইয়াছে। তজ্জন্য সরকারের আইন অনুসারে প্রত্যেক গৃহস্থের নিকট হইতে একটি নির্দ্দিষ্ট কর আদায় করা হয়। ব্যক্তিগতভাবে কোন গৃহস্থের নিকট ভিক্ষা প্রার্থনা করা সেখানে দণ্ডনীয় অপরাধ বলিয়া পরিগণিত। সুতরাং ইচ্ছায় হউক, অনিচ্ছায় হউক, দরিদ্রের প্রতি যে স্বাভাবিক করুণা ও সমবেদনার ভাব তাহা থাকুক আর নাই থাকুক, প্রত্যেক গৃহস্থকে রাজ-শক্তির তাড়নে এই দরিদ্র-পোষণের জন্য অর্থব্যয় করিতে হয়। ফলে যে পরিমাণে এই দরিদ্রভরণের দায়িত্ব গৃহস্থের স্কন্ধ হইতে অপসারিত হইয়া রাজ-শক্তির উপর ন্যস্ত হইয়াছে, সেই পরিমাণে গৃহস্থের অন্তঃকরণে দুঃস্থ লোকের প্রতি যে স্বাভাবিক করুণার ভাব ছিল, তাহা চর্চ্চার অভাবে ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়া আসিয়াছে। এইরূপ সামাজিক সর্ব্ববিধ কার্য্যের

মধ্যে যে পরিমাণে যন্ত্র-শক্তির প্রাদুর্ভাব হইয়াছে, যে পরিমাণে কলের নিয়মে সকল কার্য্য সম্পন্ন হইতেছে, সেই পরিমাণে সামাজিক-জীবনে ভাব বা ধর্ম্মবোধের স্থান সঙ্কীর্ণ হইয়া আসিয়াছে।

অথচ এই ভাব লইয়াই সাহিত্য ও শিল্পের কারবার। বাস্তব-জগতের মধ্যে অতীন্দ্রিয় জগতের প্রতিষ্ঠা, কাজের মধ্যে ভাবের প্রতিষ্ঠা, ইহাই শিল্প ও সাহিত্যের কার্য্য। সুতরাং যে সমাজে ভাবের ক্ষেত্র সঙ্কীর্ণ হইয়া আসিয়াছে, সেখানে শিল্প ও সাহিত্যের শক্তি ও প্রসার যে হ্রাসপ্রাপ্ত হইবে তাহা আর আশ্চর্য্য কি? যে সাহিত্য ও শিল্প সমাজব্যবস্থায় অপরিহার্য্য অঙ্গ স্বরূপ বিবেচিত হইত এখন তাহা সামাজিক-হিসাবে অনাবশ্যক অথবা সৌখীনতা ও বিলাসের সামগ্রী বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে।

তাহা হইলেই প্রশ্ন উঠিতেছে যে, এই যন্ত্রশক্তির যুগে মানুষের প্রাত্যহিক ও ব্যবহারিক জীবনের হিসাবে শিল্প ও সাহিত্যের কোন উপযোগিতা আছে কিনা? যদি কলেই সকল কাজ সুসম্পন্ন হয়, সে রাজশক্তি-পরিচালিত আইনের কলই হউক, আর বাষ্পশক্তি-পরিচালিত কারখানার কলই হউক--কলেই যদি সব কাজ সুনিয়মে ও সুব্যবস্থায় সম্পন্ন হয়, তাহা হইলে সমাজের মধ্যে পরিব্যাপ্ত অনিশ্চিত ও অনির্দ্দিষ্ট ভাবপ্রবণতা ও ধর্ম্মবোধের উপর নির্ভর করিয়া থাকার আবশ্যকতা কি? সাহিত্য ও শিল্পকে এখন সমাজের কার্য্য হইতে অবসর দিলে ক্ষতি কি? তাহাতে সমাজেরও ক্ষতি নাই, বরং শিল্প ও সাহিত্য স্বাধীনতালাভ করিয়া অভিনবভাবে নানা বিচিত্র সৌন্দর্য্যে বিকশিত হইয়া উঠিবে। শিল্প-সাহিত্যের সহিত সমাজের এই সম্বন্ধ-বিচ্ছেদে শিল্প-সাহিত্যের কোন ক্ষতি আছে কিনা, তাহা পরে আলোচনা করা যাইবে। এখন দেখা যাউক, ইহাতে সমাজের কোনও ক্ষতি আছে কিনা। ইতঃপূর্ব্বে আধুনিক সমাজের আলোচনা-প্রসঙ্গে দেখা গিয়াছে যে, রাজশক্তি যে পরিমাণে সামাজিক

কার্য্যপরিচালনের ভার গ্রহণ করিয়াছে, সেই পরিমাণে সমাজের মধ্য হইতে স্বাভাবিক ভাবগুলি অন্তর্হিত হইয়াছে। এই ভাব-দারিদ্র্য ও ধর্ম্মহীনতা কখনই কোনও সমাজের পক্ষে কল্যাণকর হইতে পারে না। ভাব লইয়াই মানুষের মনুষ্যত্ব। ভাবের অসদ্ভাবে মনুষ্যে ও পশুতে প্রভেদ কোথায় ? একথা চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেই স্বীকার করিবেন (এবং পাশ্চাত্য-সভ্য-সমাজে ইহা শতাধিক বৎসরব্যাপী অভিজ্ঞতার দ্বারা নিঃসন্দিগ্ধ-ভাবে প্রমাণিত হইয়াছে) যে, কি সমাজ ব্যবস্থায় কি জড়জগতে যন্ত্রশক্তি যতই কার্য্যকুশল ও সুনিয়ন্ত্রিত হউক, তাহা কখনই সম্পূর্ণভাবে মানুষের স্বাভাবিক ধর্ম্মবুদ্ধি ও ভাবপ্রবণতার স্থান পূরণ করিতে পারে না। মানুষের স্বার্থপরতা ও ভোগবাসনাকে ধর্ম্মের বন্ধন—ভাবের বন্ধন হইতে মুক্ত করিয়া যথেচ্ছভাবে একবার কাজ করিতে দিলে তাহাকে আবার আইনের কল দিয়া বাঁধিয়া ব্যবস্থা রক্ষা করা যে কত কঠিন, তাহা পাশ্চাত্যজগতের সমাজনেতা ও দর্শকবৃন্দ এখন বিশেষভাবে অনুভব করিতেছেন। ধনীর সহিত নির্ধনের দ্বন্দ্ব, ব্যবসায়ীর সহিত ব্যবসায়ীর দ্বন্দ্ব, ক্রেতার সহিত বিক্রেতার দ্বন্দ্ব, দেশের সহিত দেশের দ্বন্দ্ব—পাশ্চাত্য-জগতের এই দ্বন্দ্ব প্রতিদ্বন্দ্বের অগ্নি সমস্ত পৃথিবী ছাইয়া ফেলিতেছে, এবং সমাজব্যবস্থাপকদিগের নিকট সমস্যার পর সমস্যা সৃষ্টি করিতেছে। এদিকে পারিবারিক ও সামাজিক ভাবগ্রন্থি শিথিল হওয়ায় পরিবার ও সমাজের অনেক কার্য্যের ভার এখন ষ্টেটকে লইতে হইয়াছে। বয়ঃস্থ ও অক্ষম আত্মীয়-কুটুম্বের এমন কি পিতামাতার প্রতি যে স্বাভাবিক ভক্তি, শ্রদ্ধা বা প্রীতির ভাব তাহা কমিয়া গিয়াছে, সুতরাং রাজসরকার হইতে Old Age Pensions Act পাশ করিয়া তাহাদিগের ভরণপোষণের ব্যবস্থা করিতে হইতেছে। শ্রমজীবী মজুরের সহিত কারখানার মালিকের ঠিকাচুক্তির বন্ধন ভিন্ন অন্য কোনও সম্বন্ধ নাই, সুতরাং বাণিজ্য-ব্যাপারের

সামান্য পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে সহস্র সহস্র শ্রমজীবী কাজ না পাইয়া জীবিকাবিহীন হইয়া পড়ে। শেষে ষ্টেট হইতে Insurance আইন পাশ করিয়া তাহাদের ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করিতে হয়, ষ্টেট হইতে Minimum Wages Act পাশ করিয়া ন্যায্য মজুরীর হার নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিতে হয়। এমন কি যে দাম্পত্য-সম্বন্ধ পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের ভিত্তি, তাহাও শিথিল হইতে শিথিলতর হইয়া এমন অবস্থায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে যে, পাশ্চাত্য-জগতের নারী-সমাজ এখন পুরুষ হইতে স্বতন্ত্রভাবে রাজনৈতিক ভোটের অধিকার এমন কি, মাতৃত্ব ও সন্তান-পালন প্রভৃতি গৃহস্থালীর কাজকর্ম্মের জন্য নির্দ্দিষ্ট মজুরীর দাবী করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। সুতরাং সমাজের ছোট-বড় যাবতীয় কার্য্য ক্রমশঃ ষ্টেটের স্কন্ধে ন্যস্ত হওয়ায়, ব্যবস্থাপকদিগের দায়িত্ব-ভার অসম্ভব রকম বাড়িয়া উঠিয়াছে। প্রত্যহ নূতন নূতন সমস্যার সৃষ্টি হইতেছে; নূতন নূতন বিপদ ও বিপ্লবের সম্ভাবনা আসিয়া সমাজকে অনবরত শঙ্কিত করিয়া তুলিতেছে এবং আইনের পর আইন পাশ করিয়া সেই সকল সমস্যার ক্ষণিক সমাধান করা হইতেছে। বিস্ময়ের বিষয় এই যে, অনেকে এই নূতন নূতন আইন পাশ করাকেই উন্নতির লক্ষণ বলিয়া ধরিয়া লন। কিন্তু চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেই স্বীকার করিবেন যে, আইন-যন্ত্রের এই অতিরিক্ত চালন, সমাজ-শরীরে এই অহরহঃ ঔষধপ্রয়োগ ও অস্ত্রচালনা সমাজের ব্যাধিরই পরিচয়, উন্নতির নহে। পাশ্চাত্য-মনীষিগণের মধ্যে অনেকেই একথা বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন, সমাজের স্বাভাবিক অবস্থা ফিরাইয়া আনিতে হইলে সমাজ-শরীরে পুনরায় ভাবরস সঞ্চার করিতে হইবে।

সুতরাং সমাজের দিক দিয়া দেখা গেল যে, শিল্প-সাহিত্যের সহিত সমাজের সম্বন্ধচ্ছেদ সমাজের পক্ষে কখনই কল্যাণকর নহে। এখন দেখা

যাউক, এই সম্পর্কচ্ছেদে সাহিত্যের কোনও ক্ষতি-বৃদ্ধি আছে কি না।

প্রশ্নটি গুরুতর এবং এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের মধ্যে ইহার সম্যক্ ও বিস্তারিত আলোচনা সম্ভবপর নহে। তথাপি মোটামুটিভাবে বর্ত্তমান যুগের সাহিত্য ও শিল্পের যে বিশেষ প্রকৃতি, প্রাচীন শিল্প-সাহিত্যের সহিত তুলনায় তাহার আলোচনা করিলে এই লাভক্ষতি-হিসাবের দিকে অগ্রসর হওয়া যাইতে পারে। পূর্ব্বেই দেখা গিয়াছে যে, ভাবরস ও সৌন্দর্য্যবোধ শিল্প-সাহিত্যের প্রাণস্বরূপ, তাহা এখন সমাজ অর্থাৎ সমষ্টির জীবন হইতে একরূপ অন্তর্হিত হইয়াছে। সাহিত্য ও শিল্প এখন তাই সমষ্টিকে ছাড়িয়া সমাজকে ছাড়িয়া একএকটি স্বতন্ত্র মানবকে অবলম্বন করিয়াছে। কারণ, যে ভাবপ্রবণতা ও সৌন্দর্য্যবোধ মনুষ্যের স্বাভাবিক ধর্ম্ম, তাহা যদিও সমাজ হইতে ক্রমশঃ বিতাড়িত হইয়াছে, তথাপি এখনও তাহা অনেক স্বতন্ত্র মানুষের অন্তঃকরণে জাগিয়া আছে। তাই আজকাল ব্যষ্টিভাবে এক একটি স্বতন্ত্র মানবের মনে যে সকল ভাব ফুটিয়া উঠে, এক একটি স্বতন্ত্র মানবের মনশ্চক্ষে সৌন্দর্য্যের যে যে বিশেষ মূর্ত্তি প্রকটিত হয়, এক একটি স্বতন্ত্র মানবের চরিত্র জীবনের নানা ঘটনার উপর ঘাত-প্রতিঘাতে নানা সুখ-দুঃখের ভিতর দিয়া যেরূপ ভিন্ন ভিন্ন ভাবে বিকশিত হয়, সেই বিচিত্র মানবকাহিনীই আধুনিক শিল্প ও সাহিত্যের উপকরণ। সাহিত্যের ইতিহাস বর্ত্তমান যুগকে বিশেষভাবে ব্যক্তিগত-ভাবোচ্ছ্বাসপূর্ণ lyric বা গীতিকাব্য ও ব্যক্তিগত চরিত্র-বিশ্লেষপূর্ণ উপন্যাসের যুগ বলা যাইতে পারে। কাব্য, চিত্র, সঙ্গীত প্রভৃতি কলাশিল্প এখন সমাজের সিংহাসন হইতে স্থানচ্যুত হইয়া বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির নিভৃত অন্তরের কোণে আশ্রয় লইয়া চারিদিকের শুষ্কতা ও নীরসতার মধ্যেও কোনরূপে প্রাণধারণ করিতেছে। কবি, শিল্পী বা কাব্যরসিক কোনরূপে সাংসারিক

জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া অবসরকালে একটি কাল্পনিক সৌন্দর্য্য জগৎ সৃষ্টি করিয়া লইয়া কাব্য ও কলাশিল্পের রসাস্বাদন করিয়া থাকেন। বর্ত্তমান ইংলণ্ডের একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখক G. K. Chesterton কীটস্ প্রভৃতি ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভকালের কবিগণের উল্লেখ করিয়া একস্থলে বলিয়াছেন—"It was an age of inspired office boys" অর্থাৎ সাহিত্যের ইতিহাসে এটা দিব্যোন্মাদগ্রস্ত আফিসের কেরাণীর যুগ। অর্থাৎ কবি ও শিল্পী এখন সমস্ত দিন ধরিয়া আধুনিক আফিসের শুষ্কতার মধ্যে জীবনের অধিকাংশ সময় কাটাইয়া দিয়া আসিয়া সন্ধ্যাকালে যখন দ্বারে অর্গল দিয়া বসেন, তখন তাঁহার কল্পনার সাহায্যে এক দিব্য জগতের মধ্যে প্রবেশ করিয়া কাব্য বা শিল্পচর্চ্চা করিয়া থাকেন। এ অবস্থায় যে বিশেষ ছাঁচের সাহিত্য বা শিল্পের সৃষ্টি হয় তাহাকে "ব্যক্তিগত সাহিত্য বা শিল্প" এবং প্রাচীন ছাঁচের শিল্প-সাহিত্যকে "সামাজিক শিল্প বা সাহিত্য" এই আখ্যা প্রদান করা যাইতে পারে।

ব্যক্তিগত শিল্প-সাহিত্য ও সামাজিক শিল্প-সাহিত্যে বিভিন্ন দিক্ হইতে এই দুই ছাঁচের শিল্প-সাহিত্যের তুলনা করিলে ইহাদিগের বিশেষ প্রকৃতি সম্বন্ধে আরও একটু স্পষ্ট ধারণা হইতে পারে। প্রথমে ভাবের দিক দিয়া দেখা যাউক। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, যে সকল ভাব অবলম্বন করিয়া প্রাচীন কাব্যচিত্রাদি রচিত হইত, তাহা সমাজের সাধারণ জন-গণের মধ্যে পরিব্যাপ্ত ছিল। প্রাচীনকালের সামাজিক আদর্শের সহিত এই সকল ভাবের ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল। সেকালে সমাজের ক্ষেত্র হইতে স্বাভাবিক ভাবে যে সকল বড় বড় ভাব ও আদর্শ উদ্ভূত হইত, শিল্প ও সাহিত্য তাহারই সেবায় নিযুক্ত ছিল। লোক-সমষ্টির হৃদয়ে সেই সকল ভাব সহজেই সহানুভূতি লাভ করিত এবং এই জন্যই তাহাদের প্রেরণাশক্তি ও ব্যক্তিগত ভাবোচ্ছ্বাস অপেক্ষা সমধিক প্রবল ছিল।

সহজে সমাজে প্রতিষ্ঠালাভ করিত বলিয়া শিল্পিগণের ভাবপ্রকাশের ভঙ্গীও অপেক্ষাকৃত সরল, অনাড়ম্বর ও নিঃসঙ্কোচ ছিল। কিন্তু বর্ত্তমানকালে শিল্পী স্বীয় রচনা-মধ্যে যে সকল ভাবের অবতারণা করেন, তাহা সমাজের বর্ত্তমান অবস্থায় ব্যক্তিগত না হইয়া পারে না। তাহা সাধারণতঃ ভাবুক হৃদয়ের নিভৃত অন্তঃপুরের কথা, নির্দ্দিষ্টসংখ্যক সমভাবাপন্ন ভাবুক ও কাব্য-রসিক ব্যক্তির চিত্তেই তাহা প্রসারলাভ করিতে পারে। এমন অবস্থায় শিল্প-রচনার মধ্যে একটা সঙ্কোচের ভাব আসিয়া পড়ে। শিল্পীর মনে এখন সর্ব্বদাই এই সন্দেহ জাগিয়া থাকে যে, হয় ত তাঁহার অন্তরের গভীর ভাবগুলি অধিকাংশ লোকের নিকট সহানুভূতি পাইবে না। সেই জন্য তাঁহাদের রচনায় হয় ভাবপ্রকাশের জটিলতা, না হয় একটা বিদ্রোহের সুর লক্ষ্য করা যায়। সহজ সরল ভঙ্গীতে ভাবপ্রকাশের ক্ষমতা এখন তাই অধিকাংশ শিল্পীর অনায়ত্ত। প্রাচীন সাহিত্যে গভীর ও নিবিড় ভাবের অভাবই যে এই সরলতার কারণ তাহা বলা যায় না। বাঙ্গালা দেশের বৈষ্ণব-মহাজনদিগের পদাবলী, পারস্যদেশের সুফি, কাব্য ও সঙ্গীত, প্রাচীন হিন্দু ও বৌদ্ধ-ভাস্কর্য্য, ইউরোপের মধ্যযুগের ম্যাডোন্না চিত্রগুলি, আধুনিক শিল্প ও সাহিত্যের অপেক্ষা যে ন্যূন তাহা কেহই বলিবেন না। তথাপি এই সকল প্রাচীন কাব্য-চিত্রাদি সর্ব্বসাধারণের পক্ষে সহজ অধিগম্য ছিল এবং আপামর সাধারণের জীবনের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ হইত। আধুনিক কবি ও শিল্পিদিগের রচনা কিন্তু কখনও অধ্যয়ন-কক্ষ ও আর্ট-গ্যালারির বাহিরে জীবনের ক্ষেত্রে নামিতে পারে না। ইহার একটা কারণ এই যে, [illegible]। ভাব-সাধনা বলিয়া একটা বস্তু ছিল, এখন তাহার একান্ত অসদ্ভাব। চণ্ডীদাস, রামপ্রসাদ Fra Angelicoর রচনা কেবল ক্ষণিক ভাবের উচ্ছ্বাস মাত্র নহে। তাঁহারা যে কয়টি ভাব অবলম্বন করিয়া শিল্প রচনা করিতেন,

তাহা সংখ্যায় অল্প ও সুনির্দ্দিষ্ট। কিন্তু সেই কয়েকটি নির্দ্দিষ্ট ভাব তাঁহারা জীবন-ব্যাপী সাধনায় পরিণত করিয়াছিলেন। তাঁহারা যেমন একদিকে শিল্পী, তেমনি অপরদিকে ভাবসাধক। সেইজন্য তাঁহাদের ভাব বস্তুতন্ত্র ও শক্তিশালী হইত। তাঁহারা নিজেদের সাধনার ধন শিল্পের সাহায্যে সমাজের সাধারণ সম্পত্তি করিয়া দিয়া গিয়াছেন। সমাজ ও সম্প্রদায়ের মধ্যে পুরুষপরম্পরাক্রমে একই ভাবের সাধনার দ্বারা যে সঞ্চিত শক্তির উদ্ভব হয়, তাহা কেবল বাস্তব-সংসারে অতীন্দ্রিয় ভাব-প্রতিষ্ঠায় সমর্থ। শিল্পের আলোচনাপ্রসঙ্গে বর্ত্তমান ইংলণ্ডের সুপ্রসিদ্ধ স্থাপত্যবিদ্ লেথাবী (W. R. Lethaby) তাঁহার প্রণীত Architecture নামক গ্রন্থের একস্থানে লিখিয়াছেন যে, শিল্প কেবল ব্যক্তিবিশেষের কল্পনাশক্তি হইতে উদ্ভূত না হইয়া যদি সহস্র শিল্পীর ফলস্বরূপ হয়, তাহাই মহান শিল্প বলিয়া পরিচিত হইতে পারে (The art which is not one man deep, but a thonsand men deep.) আধুনিক শিল্প-সাহিত্যে যে সকল ভাবের অবতারণা হয়, তাহা সংখ্যায় অসীম ও অনির্দ্দিষ্ট। ব্যক্তিবিশেষের মনে বিভিন্ন অবস্থায় যে সকল বিচিত্র ভাবের স্পন্দন অনুভূত হয়, তাহা সে যতই সূক্ষ্ম ও অসাধারণ হউক না, সমস্তই এখন শিল্পের বিষয়ীভূত। ভাব এখন সাধারণ বস্তু নয়, সেইজন্য প্রত্যহ অভিনব ভাব ও অভিনব মানসিক অবস্থার চিত্রণেই শিল্পী নিযুক্ত। নূতনত্বের সন্ধান পুরাতন ভাবের সাধনের স্থান অধিকার করিয়াছে। সেইজন্য অনেক স্থলে দেখা যায়, এই সকল সাময়িক ও অস্থায়ীভাব শিল্পী বা শিল্পামোদীর জীবনে সেরূপ প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে না। শিল্প সাহিত্য এখন মানুষের মনোরাজ্যের প্রচ্ছন্ন কোণে নূতন নূতন প্রদেশ আবিষ্কার-কার্য্যে নিয়োজিত, এখনও কোথাও ঘরবাড়ী বাঁধিবার কোন উদ্যম নাই। ফলে আধুনিক শিল্প বৈচিত্র্য ও অভিনবত্ব লাভ করিয়াছে কিন্তু ভাবের

গভীরতা ও বস্তুঅন্তরতা-হিসাবে প্রাচীন শিল্পের তুলনায় দীন ও শক্তিহীন হইয়া রহিয়াছে।

ভাবের সম্বন্ধে যে কথা, শিল্পের বিষয়-নির্ব্বাচন-সম্বন্ধেও সেই কথা বলা যাইতে পারে। প্রাচীন শিল্পের বক্তব্য-বিষয় ও আখ্যানাবলীও সংখ্যায় অল্প ও নির্দ্দিষ্ট। পুরুষপরম্পরা ধরিয়া সর্ব্বসাধারণের নিকট সুপরিচিত একই আখ্যানবস্তু অবলম্বন করিয়া বিভিন্ন শিল্পী শিল্প রচনা করিতেন। প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্যের ইতিহাসে ইহার বহু দৃষ্টান্ত পাওয়া যাইতে পারে। এক মহাভারতের আখ্যানবস্তু লইয়া, কাশীরামদাস ব্যতীত সঞ্জয়, কবীন্দ্র পরমেশ্বর, নিত্যানন্দ ঘোষ, রামেশ্বর নন্দী প্রভৃতি বহু বাঙ্গালীকবি বঙ্গভাষায় কাব্য রচনা করিয়াছেন। সেইরূপ বেহুলার উপাখ্যান লইয়া কাণা হরিদত্ত, নারায়ণদেব, বিজয়গুপ্ত, ক্ষেমানন্দ, কেতকাদাস প্রভৃতি কবি, কালকেতু ও শ্রীমন্তের আখ্যান অবলম্বন করিয়া জনার্দ্দন, মাধবাচার্য্য ও মুকুন্দরাম প্রভৃতি কবি, রাধাকৃষ্ণ ও শ্রীগৌরাঙ্গ-লীলা অবলম্বন করিয়া বহুতর বৈষ্ণবকবি ও মহাজন আপন আপন কাব্য রচনা করিয়াছেন। ইউরোপের মধ্যযুগেও সেইরূপ দেখা যায় যে, আর্থার, লান্সলট, পার্সিভ্যাল, আলেকজন্দার, সার্লিমেন প্রভৃতি বীরগণের কাহিনী লইয়াই ইউরোপের বিভিন্নদেশে ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় বহুতর Romance কাব্য গদ্যে-পদ্যে রচিত হইয়াছিল। সে কালের কবি ও শিল্পিগণ আখ্যানবস্তুর মৌলিকতা লইয়া চিন্তা করিতেন না। পুরাতন ও লোক-প্রচলিত আখ্যানবস্তু অবলম্বন করিয়া কতকগুলি বিশেষ ভাবের উদ্রেক করিয়া দেওয়ার দিকেই তাঁহাদের লক্ষ্য ছিল। কোনও আখ্যানবস্তু কাহারও একচেটিয়া সম্পত্তি ছিল না—সেগুলি সমাজেরই সম্পত্তি। এইরূপ অবস্থায় একটি সুবিধা এই ছিল যে, সমাজে কাব্য বা শিল্পের আখ্যানবস্তু সুপরিচিত থাকায় অতি সহজেই শিল্পীর বক্তব্য জনসাধারণের হৃদয় স্পর্শ

করিতে পারিত। তদ্ভিন্ন শ্রোতৃসমাজের একএকটি ভাবতন্ত্রীতে পুনঃ-পুনঃ আঘাত পড়ায় সমাজে কতকগুলি বিশেষভাবের অনুশীলন হইত। যখন ভাবরসাস্বাদ অপেক্ষা কৌতূহলপরিতৃপ্তি ও মানসিক উত্তেজনাই শিল্পচর্চ্চার উদ্দেশ্য হইয়া পড়িল, সেই লঘুচিত্ততার যুগেই শিল্পিগণকে নিত্য নূতন আখ্যানবস্তু-রচনার জন্য নানা কষ্টকল্পনার আশ্রয় লইতে হইল।

আখ্যানবস্তু ও ভাব-সম্বন্ধে যে কথা বলা হইল, রচনা-ভঙ্গী ও অলঙ্কার-সম্বন্ধেও ঠিক সেই কথা বলা যাইতে পারে। এখানেও দেখা যায় যে, কতকগুলি বিশেষ রচনা-ভঙ্গী শিল্পিসমাজের সাধারণ সম্পত্তিরূপে বিবেচিত হইত। "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য" প্রণেতা শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় তাঁহার গ্রন্থমধ্যে বাঙ্গালী কবির অনুকরণপ্রিয়তার উল্লেখ করিয়া অনেকগুলি দৃষ্টান্ত একত্র করিয়া দেখাইয়াছেন। তাঁহার গ্রন্থের সেই অংশ এস্থলে উদ্ধৃত করা যাইতে পারে;—

"কেবল বড় বড় কাব্যে নহে কাব্যের অংশগুলিতেও সেই অনুকরণ-বৃত্তির পরিচয় লক্ষিত হয়। একটি উৎকৃষ্ট ভাব পাইয়া কবিকে প্রশংসা করিবার পথ নাই, কোন্ কবি সেই ভাবের আদি-প্রণেতা, সে প্রশ্ন সহজে মীমাংসিত হইবার নহে। আমরা প্রতি চণ্ডীকাব্যেই ফুল্লরা ও খুল্লনার "বারমাস্যা" পাইয়াছি। এতদ্ব্যতীত বিজয় গুপ্তের পদ্মাপুরাণে পদ্মাবতীর "বারমাস্যা," পদকল্পতরুতে বিষ্ণুপ্রিয়ার বারমাস্যা, বিদ্যাসুন্দরে বিদ্যার বারমাস্যা, সৈয়দ আলওয়াল কবির পদ্মাবতীতে নাগমতীর বারমাস্যা, মুরারি ওঝার নাতি শ্রীধর প্রণীত "রাধার বারমাস্যা" সেক জালাল প্রণীত "সখীর বারমাস্যা" এইরূপ রাশি রাশি বারমাস্যার সঙ্গে প্রাচীন বাঙ্গালা-সাহিত্যের পথে-ঘাটে সন্ধান লাভ করিয়াছি। বিদ্যাপতির—

"না পুড়িও মোর অঙ্গ না ভাসাও জলে।
মরিলে রাখিও বাঁধি তমালেরি ডালে॥

কবহুঁ সো পিয়া যদি আসে বৃন্দাবনে।
পরাণ পায়ব হাম পিয়া দরশনে॥"

এ কবিতাটির ভাব রাধামোহন ঠাকুর "এ সখি কর তহুঁ পর উপ-কার। ইহ বৃন্দাবনে দেহ উপেখব মৃততনু রাখবি হামার॥ কবহুঁ শ্যাম তনু পরিমল পাওব, তবহুঁ মনোরথ পূর॥" যদুনন্দন দাস—"উত্তরকালে এক করিহ সহায়; এই বৃন্দাবনে যেন মোর তনু রয়। তমালের কাঁধে মোর ভুজলতা দিয়া। নিশ্চয় করিয়া তুমি রাখিবা বাঁধিয়া॥" ইত্যাদি পদে এবং এতদ্ব্যতীত নরহরি, কৃষ্ণকমল, কবিশেখর প্রভৃতি বহু কবি স্বরচিত পদে নকল করিয়াছেন।" শ্রদ্ধেয় দীনেশ বাবু প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যের এই বিশেষত্ব টুকুকে বিশেষভাবে বাঙ্গালা-সাহিত্যের লক্ষণ বলিয়া ধরিয়া লইয়াছেন ও ইহাকে বাঙ্গালীসুলভ অনুকরণপ্রিয়তা বা পুচ্ছগ্রাহিতার দৃষ্টান্তস্বরূপ ধরিয়া লইয়াছেন। কিন্তু এটি বাঙ্গালী-সাহিত্যের বা বাঙ্গালী-চরিত্রের বিশেষ লক্ষণ নহে, ইহা প্রাচীন সামাজিক শিল্পমাত্রেরই লক্ষণ। মধ্যযুগের ইংরাজী, ফরাসী বা জার্ম্মাণ সাহিত্যেও এই ভাবসাদৃশ্যের বহু দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়।

উপমা প্রভৃতি অলঙ্কার-প্রয়োগেও এই সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। সাহিত্যের অবনতির যুগে এই ভাবভঙ্গী ও অলঙ্কার-সাদৃশ্য বিকারপ্রাপ্ত হইয়া নির্জ্জীবতা ও নীরসতার সৃষ্টি করে, ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য। কিন্তু সাহিত্যের জীবন্ত অবস্থায় এই সকল পরম্পরাগত ভাব ও উপমা নানাপ্রকার অপ্রত্যক্ষভাব ও দৃশ্যের ব্যঞ্জনা দ্বারা নানাপ্রকার স্মৃতির উদ্রেক করাইয়া দিয়া, জনসাধারণের মনে যে ঘনরসের সৃষ্টি করে, তাহা অপূর্ব্ব। বিশেষ করিয়া চিত্র বা ভাস্কর্য্য-শিল্পে এই বাঁধা রচনা-পদ্ধতির একটা সুবিধা এই যে, জনসাধারণের নিকট শিল্পিগণের বক্তব্য বিষয় ইহাতে সহজে হৃদয়ঙ্গম হয়। শিল্পব্যাখ্যা ও শিল্প-সমালোচক বলিয়া এক শ্রেণী মধ্যস্থের আবশ্যকতা

থাকে না। আজকাল শিল্পের রাজ্যে নানা অভিনব প্রণালী প্রত্যহ অবলম্বিত হইতেছে, তাহাতে একটা ফল এই দাঁড়াইয়াছে যে, বিশেষজ্ঞ শিল্পসমালোচকের ব্যাখ্যা-ব্যতিরেকে শিল্পের বক্তব্য বিষয় সহজে সকলের অধিগম্য হয় না।

এইবার চরিত্র-চিত্রণের দিক দিয়া এই উভয়বিধ সাহিত্যের তুলনা করা যাইতে পারে। উপন্যাসই আধুনিক সাহিত্যের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে। আধুনিক উপন্যাসের বিশেষত্ব এই যে, ইহাতে স্বতন্ত্র মানব-চরিত্রের বিচিত্র বিকাশ চিত্রিত ও বিশ্লেষিত হয়। প্রাচীন সাহিত্যিক ও শিল্পিগণ ব্যক্তি-চরিত্র অপেক্ষা আদর্শ-চরিত্র-চিত্রণে বিশেষ মনোযোগী ছিলেন। জনসাধারণের সম্মুখে সামাজিক, গার্হস্থ্য ও ধর্ম্মজীবনের আদর্শগুলি স্থাপন করাই এই সাহিত্যের উদ্দেশ্য। মানুষে মানুষে যে কত প্রভেদ, আধুনিক উপন্যাসপাঠে তাহা আমরা জানিতে পারি। কিন্তু প্রাচীন কাব্য, কথা-কাহিনীতে মানুষ কোন্ কোন্ আদর্শ ও উচ্চভাবের সম্মুখে নত মস্তকে একত্র হইয়া ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করে, তাহারই বার্ত্তা শুনিতে পাওয়া যায়। এই শেষোক্ত উপায়ে সমাজমধ্যে যে ভ্রাতৃত্বভাব বা সৌভ্রাত্রের উদ্ভব হয়, তাহার নানা সামাজিক বৈষম্যসত্ত্বেও রাজা প্রজা, ধনী নির্ধন, প্রভু ভৃত্য, ব্রাহ্মণ শূদ্র, উচ্চ নীচ, সকলকেই এক পর্য্যায়ভুক্ত করিয়া দেয়। Chesterson সাহেব তাঁহার Victorian Age in Literature গ্রন্থে এই প্রসঙ্গে Chancerএর Canterbury Tales ও Thackerayর উপন্যাসের তুলনা করিয়া বলিয়াছেন যে, Chaucerর কাব্যে Knight Squire ময়দাওয়ালা, কৃষক, ছাত্র, পুরোহিত, মঠের মহান্ত প্রভৃতি সমাজের বিভিন্ন স্তর হইতে যে সকল চরিত্র একত্র হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে সামাজিক ও ব্যক্তিগত বৈষম্য প্রচুর; অপর দিকে Thackerayর উপন্যাসের চরিত্রগুলিও বিভিন্ন পর্য্যায়ের লোক। Chancerএর কাব্যে

ধনী, নির্ধন, উচ্চ, নীচ সকলে মিলিয়া পাশাপাশি ঘোড়ায় চড়িয়া গল্প বলিতে বলিতে Canterbury র St. Thomas এর সমাধি-উদ্দেশে তীর্থযাত্রায় চলিয়াছে। তীর্থযাত্রার উপলক্ষে সকলে মিলিয়া যে আদর্শের ছায়ায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন, তাহার তুলনায় সামাজিক সমস্ত বৈষম্য তুচ্ছ হইয়া গিয়াছে। কিন্তু Thackeray র উপন্যাসে ধনী, দরিদ্র, উচ্চ, নীচ একত্র মিলিয়া পাশাপাশি ঘোড়ায় চড়িয়া যাইতে পারেন, এরূপ কল্পনা কেহ স্বপ্নেও ভাবিতে পারে না। অথচ Thackeray র যুগে সাম্য মৈত্রীর জয়ধ্বনি উচ্চকণ্ঠে ঘোষিত হইয়া ছিল। Chesterton সাহেব বলেন—তাহার কারণ এই যে, এই যে আধুনিক সমাজের মাথার উপরে ধর্ম্ম বা তত্ত্বা অন্য কোনও উচ্চ আদর্শ বর্ত্তমান নাই। Chaucer এর সমাজ ও Thackeray র সমাজ-সম্বন্ধে যে কথা বলা হইল, আমাদের দেশের প্রাচীন ও আধুনিক সাহিত্যে চিত্রিত সমাজ-সম্বন্ধে যথাক্রমে সেই কথা বলা যাইতে পারে।

এইবার শিল্প ও সাহিত্য-প্রচারের দিকটা দেখা যাউক। আধুনিক সাহিত্য মুদ্রিত গ্রন্থাকারে জনসাধারণের মধ্যে প্রচারিত হয়। সুতরাং ইহা অনেক পরিমাণে অধ্যয়ন-কক্ষের গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ থাকে। প্রাচীন সাহিত্য কিন্তু কেবল গ্রন্থ-মধ্যে আবদ্ধ থাকিত না। অধিকাংশ প্রাচীন কাব্যই গানের জন্য রচিত হইত এবং গান, আবৃত্তি, কথা প্রভৃতি দ্বারা পণ্ডিত হইতে নিরক্ষর পর্য্যন্ত সমাজের সকল শ্রেণীর লোকের মধ্যে প্রচারিত হইত। সামাজিক-জীবনের নানা পর্ব্ব ও উৎসব উপলক্ষে এই সকল কাব্য সর্ব্বসাধারণের মধ্যে গীত হইত। দৃষ্টান্তস্বরূপ আমাদের দেশে মনসার ভাসান, চণ্ডীর গান, শিবের গান প্রভৃতি ও ইউরোপে Romance কাব্যগুলির উল্লেখ করা যাইতে পারে। আধুনিক সমাজে যে পরিমাণে ভাব-রস-চর্চ্চা উঠিয়া গিয়াছে ও যাইতেছে, সেই পরিমাণে

সামাজিক জীবনে যে সকল আনন্দ মিলনের ক্ষেত্র ছিল তাহা ক্রমশঃ লোপ পাইতেছে। বর্ত্তমান যুগের democracy বা প্রজাতন্ত্রের যে আদর্শ তাহাতে প্রীতি অপেক্ষা স্বাতন্ত্র্যের ভাবই প্রবল। সুতরাং এই democracy র আদর্শ অবলম্বন করিয়া কোনও সামাজিক মিলনক্ষেত্র বা সামাজিক শিল্প-সাহিত্য গড়িয়া তাই সাহিত্যে এখন ক্রমশঃই বিশেষভাবে কলারসাভিজ্ঞ পণ্ডিত সমাজেরই উপভোগ্য হইয়া উঠিতেছে, নিরক্ষর ও অশিক্ষিত জনসমাজের সহিত তাহার আর কোন সম্পর্ক নাই। সাহিত্য-সম্বন্ধে যে কথা, শিল্পসম্বন্ধেও তাই। আধুনিক চিত্রপ্রতিমাদি এখন Art Galleryর কাচের আলমারীতেই শোভা পাইয়া বিশেষজ্ঞের আনন্দ সম্পাদন করিয়া থাকে। প্রাচীন শিল্প ঘটী-বাটী সাজ-সরঞ্জাম হইতে আরম্ভ করিয়া মন্দিরাদির প্রাচীর গাত্রে চিত্রিত বা খোদিত কাহিনী পর্য্যন্ত সকল ক্ষেত্রেই সামাজিক সৌন্দর্য্য-বোধ ও ভাবুকতার পরিচয় প্রদান করিত।

শেষে শিল্পী ও শিল্পসৃষ্টির দিক হইতে একবার উভয়বিধ শিল্পের প্রকৃতি পর্য্যালোচনা করা যাউক। প্রাচীন শিল্পে শিল্পী সামাজিক ভাব ও আদর্শের ভৃত্য বা সেবকমাত্র। বিষয় ও ভাব নির্ব্বাচন হইতে আরম্ভ করিয়া রচনাভঙ্গী পর্য্যন্ত সকল বিষয়েই শিল্পীকে প্রচলিত বাঁধা পদ্ধতি অবলম্বন করিতে হইত। কেহ কেহ মনে করেন, এ অবস্থায় শিল্পীর স্বতঃস্ফূর্ত্ত প্রতিভার সম্যক্ বিকাশ সম্ভবপর নহে। কিন্তু বাঁধা পদ্ধতি প্রতিভাবান্ ব্যক্তির পক্ষে বাধা স্বরূপ না হইয়া সহায়রূপেই পরিণত হয়। কারণ, কবিকে নিজের ভাষা, নিজের মালমসলা নিজে সৃষ্টি করিয়া লইবার জন্য বৃথা শক্তিক্ষয় করিতে হয় না। প্রচলিত ছাঁচের মধ্যে রস-প্রতিষ্ঠাই তাঁহার প্রধান কার্য্যের মধ্যে গণ্য হয়। সুতরাং প্রাচীন শিল্পের একটা গুণ এই দেখা যায় যে, তাহা অতি সহজেই শ্রোতা বা দ্রষ্টার

মনে বিশেষ বিশেষ ভাবের উদ্রেক করিতে সমর্থ হয়। অপর দিকে যে-সকল শিল্পী প্রতিভা-হিসাবে নিকৃষ্ট তাঁহাদিগকেও একটি সুনির্দ্দিষ্ট পন্থা অবলম্বন করিতে হইত বলিয়া তাঁহাদের শিল্পরচনা-চেষ্টা একেবারে ব্যর্থ হইতে পারিত না। বৈষ্ণব-পদকর্ত্তৃদিগের মধ্যে সকলেই কিছু চণ্ডীদাস বিদ্যাপতির সমকক্ষ ছিলেন না—তথাপি এক নির্দ্দিষ্ট পন্থা ও রচনাভঙ্গী অবলম্বন করার দরুণ সকলেরই রচনা বেশ সরস ও হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে। আধুনিক শিল্পী যদি নিকৃষ্ট শ্রেণীর হন তাহা হইলে তাঁহার শিল্প-রচনা চেষ্টা প্রায়ই ব্যর্থতায় পরিণত হয়।

আর এক দিক দিয়াও প্রাচীন শিল্পীর সুবিধা ছিল। প্রাচীন-কালে যে ভাবের আবহাওয়ার মধ্যে জনসমাজের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ হইত, তাহা শিল্পরচনার পক্ষে বিশেষ অনুকূল। শিল্পী সমাজের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার মধ্যেই শিল্পের উপকরণ পাইতেন। এখন সামাজিক জীবনে ভাবের হাওয়া বহে না। সুতরাং শিল্পীকে কষ্ট কল্পনা করিয়া প্রায়ই প্রাচীন সমাজের চিত্রপট, কল্পনার সাহায্যে সম্মুখে ধরিয়া শিল্প রচনা করিতে হয়। কারণ, আধুনিক জীবনের শুষ্কতার মধ্যে শিল্পের মালমসলা বড় বেশী পাওয়া যায় না। এইজন্যই উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে ইংরাজ কবিদিগের মধ্যে প্রাচীন গ্রীস ও মধ্যযুগের আখ্যানাদি ও সেই সেই যুগের জীবনযাত্রা-প্রণালী অবলম্বন করিয়া কাব্য-রচনার একটা চেষ্টা দেখা যায়। এই সকল কারণে পাশ্চাত্য জগতে ভাবপ্রাণ শিল্পী ও সাহিত্যিকগণ অনুকূল বেষ্টনীর অভাবে হাঁপাইয়া উঠিয়াছেন। সে দিন বর্ত্তমান ইংলণ্ডের এক জন শ্রেষ্ঠ কবি W. B. Yeates কবিবর রবীন্দ্রনাথের ইংরাজী গীতাঞ্জলির ভূমিকায় লিখিয়াছেন যে, আধুনিক পাশ্চাত্য-সমাজে কবি ও শিল্পিদিগের বার আনা শক্তি ও উদ্যম বিরুদ্ধ পারিপার্শ্বিকের সহিত সংগ্রামেই ব্যয়িত হয়।

শিল্পীর সমস্ত শক্তি এখন আর সৌন্দর্য্য-সৃষ্টিতে নিয়োজিত হইতে পারে না। প্রমাণ-স্বরূপ Ruskin ও Morrisএর নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। তাঁহারা সৌন্দর্য্য-সৃষ্টি ও সৌন্দর্য্য-ব্যাখ্যাই স্ব স্ব জীবনের মুখ্য সাধনা বলিয়া বিবেচনা করিতেন। কিন্তু তাঁহারা দেখিলেন বর্ত্তমান সমাজের অবস্থা শিল্পসৃষ্টির অনুকূল নহে, অথচ বর্ত্তমান জীবন্ত সমাজের মধ্য হইতে অনুপ্রাণনা না পাইলে কি শিল্প সৃষ্টি হইতে পারে? কষ্ট-কল্পনা করিয়া প্রাচীন যুগের স্বপ্ন-রচনা আর কত দিন করা যায়? তাঁহারা দেখিলেন, আধুনিক সমাজের এ শুষ্কতার মধ্যে পুনরায় ভাবরসের সঞ্চার না করিতে পারিলে শিল্পের উৎস একেবারে শুকাইয়া যাইবে। তাই তাঁহারা আধুনিক সমাজ-ব্যবস্থা-সংস্কার ও পরিবর্ত্তনের জন্য বদ্ধপরিকর হইলেন। তাঁহাদিগের সেই আকাঙ্ক্ষার বাণী এখন পাশ্চাত্য জগতের নানা স্থান হইতে প্রতিধ্বনিত হইয়াছে। ভাবুকমাত্রেই এখন প্রাচীন সমাজের মত একটা কিছু ব্যবস্থার পুনঃ প্রবর্ত্তনের জন্য সচেষ্ট হইয়াছেন।

এতক্ষণ আমরা আমাদের মূলবিষয়ের আলোচনা প্রসঙ্গে বেশীর ভাগ পাশ্চাত্য সমাজের কথাই আলোচনা করিয়াছি। তাহার কারণ এই যে, বর্ত্তমান যুগের জীবনযাত্রা প্রণালীর যে সকল বিশেষ ধর্ম্ম আমাদের সমাজে ক্রমশঃ সংক্রামিত হইতেছে, তাহার পূর্ণ পরিণতির চিত্র দেখিতে হইলে পাশ্চাত্য সমাজেই দেখিতে হইবে। আমাদের সমাজে আধুনিক সভ্যতার পূর্ণ পরিণত স্বরূপ বেশ স্পষ্টভাবে প্রকটিত হয় নাই। এখনও আমরা অন্ততঃ সমাজের বার আনা লোক যাত্রা কথকতা কীর্ত্তনে রস পাই, এখনও আমাদের দেশে পারিবারিক ও সামাজিক সকল প্রকার বন্ধন শিথিল হইলেও ছিন্ন হয় নাই। Old Age Pension আইন পাশ করিতে হইবে কি আশু নারী সমাজকে রাজনৈতিক ভোটযুদ্ধে নামাইয়া দিতে হইবে, এরূপ আশঙ্কা এখনও আমাদের মনে স্থান পায় নাই। কিন্তু

প্রাচীন বাঙ্গালী সমাজের তুলনায় আমাদের সামাজিক বন্ধনগুলি যে এখন অনেকটা শিথিল হইয়া আসিয়াছে তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। এখন আর সেরূপ স্বাভাবিকভাবে মন্দির জলাশয় বৃক্ষ পান্থশালা প্রভৃতি প্রতিষ্ঠিত হয় না। অন্ততঃ—ভারতবর্ষের যে যে প্রদেশে যে যে সমাজে ইংরাজী শিক্ষা ও ইংরাজী আদর্শের প্রবল প্রতাপ সেই সেই সমাজে ও প্রদেশে এই সমাজ ধর্ম্মপালন একরূপ বন্ধ হইয়াছে। এ অবস্থায় দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে শিল্প সাহিত্য ও সমাজ ব্যাপারে দেশীয় ভাব রক্ষার জন্য যে এক নূতন আকাঙ্ক্ষা ও চেষ্টার পরিচয় পাওয়া যাইতেছে, তাহা সমাজের পক্ষে ও শিল্প-সাহিত্যের পক্ষে শুভ লক্ষণ মনে করিতে হইবে। কিছুদিন হইল চিত্র-শিল্পের রাজ্যে এই বাঙ্গালা দেশে এইরূপ একটা ভারতীয় ভাব ফুটাইবার চেষ্টা আরব্ধ হইয়াছে। সাহিত্যেও এই চেষ্টার অল্পাধিক পরিমাণে পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু কেবল শিল্প ও সাহিত্যের রাজ্যে ভারতীয় ভাব ফুটাইবার চেষ্টা করিলেই চলিবে না। সমাজের চারিদিকে যদি বিদেশীভাবের বাহ্যিকতা বাহ্যের চাপ্‌ বহিতে থাকে শিল্পী ও সাহিত্যিককে যদি প্রাত্যহিক সংসারের কাজে পাশ্চাত্য স্বাতন্ত্র্যের আদর্শই অনুসরণ করিতে হয়, তাহা হইলে চিত্র বা কাব্যের বিষয় বা রচনা ভঙ্গী ভারতীয় হইলেও, ভাবের আন্তরিকতার অভাবে সেই শিল্প এক প্রকার সৌখীনতা বা স্বপ্ন-বিলাসের মত হইয়া পড়িবেই। সেইজন্য এখন দেশীভাবে দেশী ছাঁদের শিল্পচর্চ্চা করিতে হইলে সমাজের মধ্যেও সেই সকল দেশী ভাব রক্ষা করিয়া চলিতে হইবে। আমাদিগের সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, যে সময়ে আমাদের চৈতন্যোদয় হইয়াছে সে সময়ে পুরাতন সামাজিক জীবনের প্রাণ শক্তি একেবারে অন্তর্হিত হয় নাই। গার্হস্থ্য পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের যে সকল দেশী আদর্শ তাহা এখনও অনেক পরিমাণে বজায় আছে। এখনও পুরাতন আনন্দ মিলনের ক্ষেত্রগুলি বর্ত্ত-

মান। যাঁহারা দেশী শিল্প ও দেশী সাহিত্য চান তাঁহাদিগের এই জীবন্ত সমাজকে উপেক্ষা করিলে চলিবে না। এই ক্ষীণ প্রাণ সমাজশরীরে প্রাণ শক্তি সঞ্চার করিয়া ইহাকে পুনরায় সবল করিতে না পারিলে শিল্পের রাজ্যে সেই ভারত শিল্প ও সাহিত্য সেই Pre. Raphaeliteদের শিল্পের মত অতীত যুগের স্বপ্ন লইয়া খেলায় মাতিয়া থাকিবে।—তাহা সামাজিক জীবনে, জাতীয় জীবনে প্রভাব বিস্তার করিতে পারিবে না।

সমাজের ক্ষেত্র হইতে শিল্প সাহিত্য যেমন জীবনী রস সংগ্রহ করে, অপর দিকে তেমনি সমাজের পুনরুজ্জীবন কার্য্যেও শিল্প সাহিত্য সহায়তা করিতে পারে। শিল্পিগণ যদি জীবন্ত সমাজের অনুপ্রাণনায় ধন্য হইতে চান, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে এখন এই সামাজিক জীবনের পুনঃ প্রতিষ্ঠা কল্পে তাঁহাদের শিল্প চেষ্টা পরিচালিত করিতে হইবে। আদর্শ সমাজের জীবন্ত উজ্জ্বল চিত্র লোক চক্ষুর সম্মুখে উপস্থিত করুন ও ভাবরসসৌন্দর্য্যহীন মানব সম্বন্ধলেশ শূন্য আধুনিক সমাজের যে বীভৎসতা, তাহাও যথাযথরূপে অঙ্কিত করিয়া দেখান; পাশ্চাত্য জীবনপ্রণালীর যে মোহিনীশক্তি আমাদের উপর এতটা প্রভাব বিস্তার করিতেছে, পাশ্চাত্য সমাজের পূর্ণ পরিণত সর্ব্বাঙ্গীণ চিত্র সম্বন্ধে অজ্ঞতা বা সংস্কারের অভাব তাহার একটা কারণ। এই কৃত্রিম ঐন্দ্রজালিক মোহ নষ্ট করিয়া দিয়া আমাদের মনশ্চক্ষুর স্বভাবিক দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়া পাইতে হইলে পাশ্চাত্য সমাজ সম্বন্ধে পূর্ণ জ্ঞান লাভ করিতে হইবে। সেইরূপ, প্রাচীন সমাজেই যে লোভনীয়তা, তাহাও পরিপূর্ণ জ্ঞানের অভাবেই আমাদের সম্মুখে সেরূপ প্রতিভাত হইতেছে না। সাহিত্যিক ও শিল্পিগণ কিছু দিন এই এই সমাজ চিত্রকেই নিজ নিজ রচনার বিষয়ীভূত করিয়া লউন। দেশের শিক্ষিত সমাজের সুপ্ত সমাজ বোধ এইরূপে জাগ্রত করিয়া দিন। যেন আমাদের এই সনাতন সমাজকে কখনও

Old Age Pensions Act ও Insurance Actএর দ্বারা বিড়ম্বিত ও অপমানিত হইতে না হয়। যেন পুনরায় আমরা শিক্ষিত অশিক্ষিত সকলে মিলিয়া সাংসারিক জীবনে ভাবের রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিতে পারি, বৃহৎ সামাজিক ভাবের মধ্যে আপন আপন ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য ডুবাইয়া দিয়া যেন আবার সামাজিক সাহিত্য ও শিল্পের রসাস্বাদন করিতে সমর্থ হই।

শ্রীরবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ

বাঙ্গালা ভাষা

দেশের যাহা কিছু ভাল তাহার যত্ন করা, তাহার উন্নতির চেষ্টা করা, তাহার বিশুদ্ধতা রক্ষা করা, অপর কোন ব্যক্তি সেই বিশুদ্ধতা নষ্ট করিতে চেষ্টা করিলে তাহার প্রতিবাদ ও প্রতিকার করা এবং দেশের যাহা কিছু মন্দ তাহা প্রাকৃতিকই হউক বা সামাজিকই হউক তাহা ভাল করিতে চেষ্টা করা, বা স্থান-বিশেষে তাহা সমূলে দূর করিতে চেষ্টা করাই প্রকৃত দেশানুরাগ। কোন বাঙ্গালী যদি বলেন যে "আমাদের দেশে ম্যালেরিয়া চিরদিনই ছিল সুতরাং বঙ্গদেশে ম্যালেরিয়া ঈশ্বরের অভিপ্রেত বা স্বাভাবিক। অতএব সেই অভিপ্রায় বা স্বভাবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ-ঘোষণা করিয়া দেশ হইতে ম্যালেরিয়া দূর করিবার চেষ্টা করা উচিত নহে।" যদি কোন হিন্দুস্থানী উচ্চশিক্ষা লাভ করিয়াও তাঁহাদের দেশ-প্রচলিত দোলের সময়ের উচ্ছৃঙ্খলতার এবং কোন সুশিক্ষিত আসামবাসী যদি তাঁহাদের

দেশের বিরুদ্ধ অশ্লীল আমোদ-প্রমোদের সমর্থন করেন তাহা হইলে তাঁহাদিগকে কোনমতেই স্বদেশানুরাগী বলা যাইতে পারে না; বরং তাঁহারাই প্রকৃতপক্ষে স্ব স্ব দেশের পরমশত্রু।

প্রত্যেক দেশের লোক উত্তরাধিকার-সূত্রে দেশের প্রাকৃতিক অবস্থা, সমাজগত আচার-ব্যবহার প্রভৃতি যে সকল বস্তু লাভ করে, দেশের ভাষা তাহার অন্যতম। সুতরাং নিজ নিজ দেশের ভাষার প্রতি অনুরাগ—ভাষার শ্রীবৃদ্ধি-সাধন ও বিশুদ্ধতা-সংরক্ষণ, ভাষার যে যে অঙ্গ দুর্ব্বল তাহা সবল করিবার চেষ্টা করা, যে যে অঙ্গ নাই তাহা পূরণ করিবার চেষ্টা করা, ভাষাকে অপরের আক্রমণ হইতে রক্ষা করা, অর্থাৎ শিক্ষিত লোক অসাবধানে বা ইচ্ছাপূর্ব্বক যখন অশুদ্ধ ভাষা ব্যবহার করেন, যাহা সাধারণে অনুকরণ করিতে পারে তখন তাহার প্রতিকার করা প্রত্যেক শিক্ষিত ভদ্রলোকের কর্ত্তব্য। বঙ্গভাষা এবং বঙ্গের শিক্ষিত ব্যক্তিরও এই সাধারণ নিয়মের বহির্ভূত হওয়া উচিত নহে। আমি এই প্রবন্ধে বঙ্গভাষার প্রকৃতি ও গঠন-প্রণালী, বঙ্গভাষার বর্ণমালা, বানান ও উচ্চারণ, বঙ্গভাষার লিখন ও কথোপকথন এবং বঙ্গভাষা-প্রয়োগের শুদ্ধাশুদ্ধতা বিষয়ে কিঞ্চিৎ সমালোচনা এবং বঙ্গভাষার উন্নতিকল্পে দুই একটি প্রস্তাব উত্থাপন করিব। বঙ্গদেশের মস্তিকস্বরূপ প্রধান পণ্ডিতগণ এই সভায় উপস্থিত আছেন। তাঁহাদের অনুমোদন ও ইচ্ছা হইলে আমার এই প্রস্তাব দেশের অন্যান্য পণ্ডিতদিগের দ্বারাও আলোচিত হইয়া একটা মীমাংসা হইতে পারে।

বঙ্গভাষার প্রকৃতি ও গঠন-প্রণালী।

ইংরেজী, সংস্কৃত, হিন্দী প্রভৃতি অপেক্ষা বঙ্গভাষা স্বভাবতঃ কিছু দীর্ঘায়ত। অর্থাৎ একই অর্থ প্রকাশ করিতে হইলে অন্য ভাষায় যতগুলি

স্বর বা syllable এর প্রয়োজন হয়, বঙ্গভাষায় তাহা অপেক্ষা অধিক স্বর লাগে। কোন একটা ভাব ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় প্রকাশ করিলেই ইহা উপলব্ধ হইবে। ইংরেজী Whatever you do, do well, হিন্দী "জোকুছ কর্না, অচ্ছী তরেহ সে কর্না" বাঙ্গলা "যাহা কিছু করিবে, ভাল করিয়া কবিবে "এই তিনটি বাক্য একই ভাব প্রকাশ করে। কিন্তু ইংরেজীতে এই ভাব প্রকাশ করিতে সাতটি মাত্র স্বর লাগে, হিন্দীতে লাগে এগারটি এবং বাঙ্গালায় পনরটি লাগে। কখন কখন একই ভাব প্রকাশ করিতে ইংরেজী, হিন্দী, উর্দ্দু এবং সংস্কৃতে প্রায় সমানসংখ্যক স্বরের প্রয়োজন হয়; কিন্তু বাঙ্গলায় সর্ব্বদাই অধিক স্বর লাগে। ইংরেজী Blessed are they that Hunger and thirst after righteousness এই বাক্যটিতে পনরটি স্বর আছে। হিন্দী "ধন্য বে জো ধর্ম্মার্থ ক্ষুধিত ঔর তৃষিত হৈং" ইহাতে এগারটি স্বর, উর্দ্দু "মবারক বে জো রাস্ত রাজীকে ভূকে ঔর পিয়াসে হৈং" ইহাতে ষোলটি স্বর, সংস্কৃত "ধন্যাস্তে যে ধর্ম্মার্থং ক্ষুধিতা তৃষিতাশ্চ" ইহাতে চৌদ্দটি স্বর কিন্তু বাঙ্গালা "ধন্য তাহারা যাহারা ধর্ম্মের জন্য ক্ষুধিত ও তৃষিত" ইহাতে উনিশটা স্বর। এইরূপে বাঙ্গলায় মনোভাব প্রকাশ করিতে হইলে অধিক স্বরের প্রয়োজন হয় বলিয়া উহা যেন কিছু গুরুভার; সুতরাং অন্য ভাষার তুলনায় দুর্ব্বহ। দূরদেশ গমনেচ্ছু ব্যক্তি যেমন দুর্ব্বহ পয়সা বা টাকার পরিবর্ত্তে নোট বা মোহর লইয়া যান, তেমনই একই অর্থ প্রকাশ করিতে হইলে অল্প স্বর-যুক্ত বাক্য ব্যবহার করিবার ইচ্ছা স্বাভাবিক। এই জন্যই যাহারা ইংরেজী জানে না তাহারাও লাইব্রেরী বলে কিন্তু পুস্তকালয় বলে না; হস্পিটালের অপভ্রংশ হাসপাতাল বলে কিন্তু চিকিৎসালয় বলে না। অধিক স্বর লাগে বলিয়াই ব্যবসা-বাণিজ্যের বা টেলিগ্রাফের ভাষা বাঙ্গলা হওয়া কঠিন। দ্রুত মনোভাব প্রকাশ করিতে হইলে যাহারা বাঙ্গলা ভিন্ন অন্য কোন

ভাষা জানেন তাঁহারা বাঙ্গলা ছাড়িয়া সেই ভাষাই বলেন। ক্রোধ বা মস্তের উত্তেজনাবশতঃ মনোভাব যখন দ্রুত বাহির হইয়া পড়ে তখন যাহারা ইংরেজী জানেন তাঁহারা ইংরেজীই বলিয়া থাকেন। বাঙ্গলা সাময়িক-পত্রিকার সম্পাদকেরা কোন প্রবন্ধ পাইলে তাহাতে ইংরেজীতে হয় Approved না হয় Not approved লিখিয়া থাকেন। কেননা একেত বাঙ্গলা অক্ষর লিখিতে ইংরেজী অপেক্ষা অধিক সময় ও শ্রম ব্যয়িত হয়, তাহার উপর বাঙ্গলায় "মনোনীত" বা "মনোনীত হইল না" পুনঃপুনঃ লিখিতে হইলে ধৈর্য্যচ্যুতি ও ক্লান্তির সম্ভাবনা। বাঙ্গলাভাষার এইরূপ দুর্ব্বহ হইবার অন্যতম অপরিহার্য্য কারণ এই যে, ইহাতে ক্রিয়াবিশেষণ পদ প্রস্তুত করিতে হইলে বিশেষণের সহিত "করিয়া" "ভাবে" "রূপে" প্রভৃতি একাধিক স্বরযুক্ত প্রত্যয়ের একটা না একটা যোগ করিতে হয়। ইংরেজীতে ক্রিয়াবিশেষণ প্রস্তুত করিতে হইলে বিশেষণ-পদে একটি এক-স্বর-প্রত্যয় অর্থাৎ Ly যোগ করিলেই হয়। সংস্কৃতে হসন্ত ম বা অনুস্বার যোগ করিলেই হয় অর্থাৎ স্বর মোটেই লাগে না।

শব্দের বহুবচন নিষ্পন্ন করিতে হইলেও একাধিক স্বরের প্রয়োজন।

বাঙ্গলা দীর্ঘায়ত হইবার একটা কারণ এই যে, ইহাতে ক্রিয়াপদের বড় অপ্রচুরতা। করা, খাওয়া, যাওয়া, দেখা প্রভৃতি বহু ক্রিয়াপদ বাঙ্গালার নিজস্ব বটে কিন্তু বহুতর ক্রিয়াপদ সেই সেই ক্রিয়াজ্ঞাপক সংজ্ঞার সহিত কৃ ও ভূ ধাতুর অথবা করা ও হওয়া ধাতুর ভিন্ন ভিন্ন রূপের যোগ হইয়া নিষ্পন্ন হয় সুতরাং সেগুলি দীর্ঘায়ত হইয়া পড়ে। "He has passed" He has failed" It 'seems' এই সকল বাক্যের বাঙ্গালা হয় "তিনি পাশ হইয়াছেন" "তিনি ফেল হইয়াছেন" এবং "বোধ হয়।" Investigate অনুসন্ধান করা, beat প্রহার করা, Kill বধ করা ইত্যাদি অসংখ্য ক্রিয়াপদের প্রয়োগ দ্বারা বাঙ্গলা দীর্ঘায়ত হয় বটে কিন্তু এরূপ

প্রয়োগ সাধুভাষায় অপরিহার্য্য। অনেক গ্রন্থকার বিশেষতঃ কবিগণ স্বতন্ত্র ক্রিয়াপদের অপ্রচুরতা দেখিয়া অনুসন্ধানিল, প্রহারিল, বধিল, ঘ্রাণিল, সৃজিল প্রভৃতি পদ সৃষ্টি করিয়াছেন। কবি ও কাব্যের ভাষায় কথা স্বতন্ত্র ; কিন্তু প্রচলিত সাধুভাষায় এইরূপ প্রয়োগ সমীচীন বলিয়া বোধ হয় না। কোন নূতন ক্রিয়াপদ প্রস্তুত করিতে হইলে দেখা উচিত যে, তাহাতে সকল বিভক্তি ও প্রত্যয় যুক্ত হইতে পারে কিনা। যদি অনু-সন্ধানিল, বধিল, প্রহারিল, ঘ্রাণিল, সৃজিল পদ হয়, তবে তাহাদের মধ্যম পুরুষের অনুজ্ঞায় কি হইবে? অনুসন্ধানো, বধো, প্রহারো, ঘ্রাণো, সৃজো হইবে কি? এবং তাহাদের মূল ধাতুই বা হইবে কি? অনু-সন্ধানা, বধা, প্রহারা, ঘ্রাণা, সৃজা হইবে কি? কোন কোন ক্রিয়াপদ কৃ ধাতুর সাহায্য বিনা অথবা অন্য একটা ধাতুর যোজনা বিনা প্রস্তুত হইতেই পারে না। যথা Kick শব্দের বাঙ্গলা "পদাঘাত করা" অথবা "লাথিমারা" ভিন্ন আর কিছুই হইতে পারে না। পূর্ব্ববঙ্গের চট্টগ্রাম প্রভৃতি স্থানে লাথি এবং অন্য বহু শব্দ নামধাতুরূপে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু সেই সকল পদ এমনই শ্রুতিকটু যে সেগুলি সাধুভাষায় স্থান পাইতে পারে না।

কিন্তু উক্ত হেতু ভিন্ন একটি গুরুতর হেতু আছে যে জন্য অনুসন্ধানিল, ঘ্রাণিল প্রভৃতি পদ ব্যবহৃত হওয়া উচিত নহে। পূর্ব্বকালে বহু বস্তু, বহু কল্পনা, বহু জন্তু, বহু ভাষা অতিকায়, জটিল, শ্লথগতি এবং এখনকার লোকের পক্ষে বিভীষণ ছিল। কিন্তু অভিব্যক্তির নিয়মানুসারে সকল বস্তুই অল্পায়তন, লঘুকলেবর ও সুগম হইয়াছে ও হইতেছে। এখন আর ম্যামথ প্রভৃতি অতিকায় জন্তু নাই। দুই তিন শত বৎসরের মধ্যে হস্তীরও লোপ হইবে বলিয়া বোধ হয়। এখন আর কুড়ি হাত দশমুণ্ড মনুষ্যের কল্পনাও হয় না। সংস্কৃত, গ্রীক, লাটিন, আরবী প্রভৃতি অনন্ত জ্ঞানের ভাণ্ডারগুলিকে দুষ্প্রবেশ্য করিবার জন্যই যেন ইহাদের বহির্ভাগ ও

অভ্যন্তর বিভক্তি, লিঙ্গভেদ, বচনের বহুত্ব, প্রত্যয়ের অনন্তত্ব প্রভৃতি দ্বারা কণ্টকিত। কিছু কালের বিবর্ত্তনে এই সকল ভাষার কত পরিবর্ত্তন হইয়াছে। গ্রীকে এখন আর দ্বিবচন নাই। বৈদিক সংস্কৃতে ও লৌকিক সংস্কৃতে কত প্রভেদ তাহা পণ্ডিতেরা অবগত আছেন। আবার সাহিত্যিক-লৌকিক সংস্কৃত অপেক্ষা মহারাষ্ট্র-দেশপ্রচলিত কথোপকথনের সংস্কৃত কত সুগম তাহা অভিজ্ঞব্যক্তিরা বিলক্ষণ জানেন। যখন বিভক্তিরূপ কণ্টক ভাষার শরীর হইতে আর টানিয়া বাহির করা যায় না অথচ কর্ম্মশীল লোকের তাড়াতাড়ি মনোভাব ব্যক্ত করিবার প্রয়োজন আসিয়া উপস্থিত হয় কিন্তু সেই বিভক্তিময় ভাষা আয়ত্ত করিবার অবকাশ থাকে না, তখন অপেক্ষাকৃত অল্প বিভক্তিযুক্ত ভাষার জন্ম হয়। এইরূপে ভাষা হইতে বিভক্তির সম্পূর্ণ লোপ হওয়াই ভাষাব চরম অভিব্যক্তি। ইংরেজীতে কয়েকটা মাত্র বিভক্তি আছে কিন্তু শব্দের লিঙ্গভেদ উঠিয়া গিয়াছে। এখন ইংরেজীতে বস্তুর স্ত্রী-পুং-ভেদ ব্যতীত শব্দের লিঙ্গভেদ স্বীকৃত হয় না। Sun এর যে পুংলিঙ্গ সর্ব্বনাম এবং Earth এর যে স্ত্রীলিঙ্গ সর্ব্বনাম ব্যবহৃত হয় তাহা Sun এবং Earth যথাক্রমে পুংলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ বলিয়া নহে কিন্তু রূপকচ্ছলে তাহারা পুরুষ ও স্ত্রী বলিয়া বর্ণিত হয় সেই জন্য। বাঙ্গলা ও উত্তর-ভারতবর্ষ-প্রচলিত সংস্কৃতমূলক অন্যান্য ভাষা এখনও বিভক্তিবহুল আছে বটে কিন্তু এই সকল বিভক্তির সংখ্যা সংস্কৃত বিভক্তি অপেক্ষা অনেক কম। সংস্কৃতে যে সম্পূর্ণ অযৌক্তিকভাবে শব্দের লিঙ্গভেদ আছে বাঙ্গলায় তাহাও উঠিয়া যাইতেছে। বঙ্গীয় লেখকেরা এখন বরং "শস্তশালিনী বঙ্গদেশ" লিখিবেন তথাপি "সংস্কৃত বড় সুন্দরী ভাষা" এমন কথা লিখিবেন না। স্ত্রীলোক শব্দটা পুংলিঙ্গ বলিয়া এখন অতি উৎকট বৈয়াকরণও "গর্ভবান স্ত্রীলোক" লিখিতে সাহস করেন না কিন্তু "গর্ভবতী স্ত্রীলোক" লিখিয়া থাকেন। এখন আর পাত্র শব্দ ক্লীব-

লিঙ্গ নহে। এখন পাত্র হইয়াছে পুরুষ এবং নূতন ব্যাকরণদুষ্ট পাত্রী আসন্নবিবাহা কন্যাকে বুঝায়। যদি বিভক্তির লোপই অভিব্যক্তির নিয়ম হয়, তাহা হইলে অনুসন্ধানিল, ঘ্রাণিল প্রভৃতি ক্রিয়াপদ সৃষ্টি করিয়া ক্রিয়াপদের রূপের সংখ্যা বাড়াইয়া সেই নিয়মের পরিপন্থী হওয়া উচিত নহে। যথাসাধ্য করা ও হওয়া ধাতুর যোগে সমস্ত ক্রিয়াপদ নিষ্পন্ন করাই সমীচীন।

বাঙ্গলাভাষার আরও কয়েকটা অভাব আছে। ইহাতে সর্ব্বনামের স্ত্রী-পুরুষ-ভেদ নাই। তিনি এবং সে স্ত্রীলিঙ্গেও ব্যবহৃত হয় পুংলিঙ্গে ও হয়। এই অভাব অনেক সময়ে অনুভব করিতে হয়।

ইংরেজীতে Participipial adjective এবং সংস্কৃতে শতৃ-শানচ্ প্রত্যয় দ্বারা নিষ্পন্ন পদের অনুরূপ পদ বাঙ্গলায় সর্ব্বদা প্রস্তুত হইতে পারে না। "Laughing man", "Running train" "Talling body" প্রভৃতির ভাল বাঙ্গলা কি হইতে পারে তাহা আমি অবগত নহি। ইংরেজীতে যৎ শব্দ বা Relative pronoun দিয়া যে বড় বড় বিশেষণ বাক্য (Adjective sentence) রচিত হয় বাঙ্গলায় তদ্রূপ হয় না। ছোট ছোট বিশেষণবাক্য রচিত হইলেও বিশেষ্যকে পুনরাবৃত্তি করিতে বাঙ্গলা লেখকেরা পদে পদেই বিশেষতঃ ইংরেজী হইতে অনুবাদ করিবার সময়ে এই অভাব অনুভব করিয়া থাকেন।

কিছুদিন পূর্ব্ব পর্য্যন্ত আমার বিশ্বাস ছিল যে, বাঙ্গালায় নির্দ্দেশক সংখ্যাবাচক শব্দ (Cardenels) হইতে পারে না; 62nd, 53rd, 55th প্রভৃতি শব্দের বাঙ্গালা কি হইতে পারে, তাহা আমি ভাবিয়া পাইতাম না। কিন্তু ময়মনসিংহ-সাহিত্য-সম্মিলনে একজন প্রবন্ধ পাঠকের মুখে, বাষট্টিতম, তিপ্পান্নতম, পঞ্চান্নতম প্রভৃতি বা তদনুরূপ শব্দ শুনিয়াছিলাম। বাঙ্গালা সংখ্যাবাচক শব্দের সহিত সংস্কৃত-প্রত্যয় জোড়া

দিয়া প্রস্তুত, এই সকল সঙ্কর শব্দ উত্তমরূপে কার্য্যোপযোগী, সুতরাং আমার বিবেচনায় এইরূপেই নির্দ্দেশক সংখ্যাবাচক শব্দ প্রস্তুত করা উচিত। আমি গত ১৩১৮ সালের মাঘের উৎসবের সময়ে কলিকাতা আদি-ব্রাহ্মসমাজ এবং সাধারণ-ব্রাহ্মসমাজে গিয়া দেখিলাম যে, এক সমাজে সেই উৎসবের নাম দ্ব্যধিকাশীতম মাঘোৎসব, অন্য সমাজে দ্ব্যশীতি-তম ব্রাহ্মোৎসব। এই দুইটা দাঁতভাঙ্গা সংখ্যাবাচক সংস্কৃত বিশেষণের পরিবর্ত্তে যদি সরল বাঙ্গালায় বিরাশীতম শব্দ ব্যবহৃত হইত, তাহা হইলেই বোধ হয় ভাল হইত। বাঙ্গলা সংখ্যাবাচক শব্দের সহিত তম-প্রত্যয় যোগ করিয়া পদ নিষ্পন্ন করায় আর একটা লাভ এই যে, উহাতে ভগ্নাংশ পড়িবার সুবিধা হয়। একটি ভগ্নাংশের লব যদি তিন এবং হর বিরাশী হয়, তাহা হইলে এই নিয়মানুসারে "তিন বিরাশীতম" বলা যায়। কিন্তু পূর্ব্ব-নিয়মানুসারে তিন দ্ব্যধিকাশীতিতম বলা একটা প্রাণান্তকর ব্যাপার। আমার বিবেচনায় "প্রথম" হইতে "দশম" পর্য্যন্ত শব্দ কয়েক্‌টির পর হইতে এগারতম, বারতম শব্দ ব্যবহার করা উচিত।

বাঙ্গালাভাষায় ইংরেজীর মত "হওয়া" ধাতুর অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতের রূপ, অন্য ধাতুর ক্ত-প্রত্যয়ান্ত পদের সহিত যুক্ত হইয়া কর্ম্মবাচ্য প্রস্তুত হয়। সংস্কৃতে কি কর্ম্মবাচ্যে, কি ভাববাচ্যে প্রত্যেক পদে ভিন্নরূপ হয়। একটা দৃষ্টান্ত দিতেছি :—বলির্ববন্ধে, জলধির্মমন্থে, অমৃতং জহ্রে, দৈত্যকুলং বিজীগ্যে, বসুধা উহে এই গুলির বাঙ্গালা—বলি বদ্ধ হইয়াছিল, জলধি মথিত হইয়াছিল, অমৃত আহৃত হইয়াছিল, দৈত্যকুল পরাজিত হইয়াছিল। কেহ কেহ প্রত্যেক ধাতুর সম্পূর্ণ ভিন্নরূপ হয় না বলিয়া বাঙ্গলাভাষার প্রতি অসন্তুষ্ট। কিন্তু আমার বিবেচনায় ইহাতে বাঙ্গালার শক্তি বাড়িয়াছে বই কমে নাই। কিন্তু

তাহা হইলেও বাঙ্গালায় কর্ম্মবাচ্য নাই বলিলেই হয়! দুই একটা উদাহরণ দিতেছি। I am told এই বাক্যটির বাঙ্গলা অনুবাদ "আমি শুনিয়াছি" ভিন্ন আর কিছু হইতে পারে না। I am owed three Rupees by you ইহারও বাঙ্গালা "তুমি আমার তিন টাকা ধার" ভিন্ন আর কিছুই হইতে পারে না। বাঙ্গলায় যে সমস্ত কর্ম্মবাচ্যের ব্যবহার আছে, সে গুলিরও আকার বিরূপ হইয়া গিয়াছে। কোন কোনগুলি কর্ত্তৃবাচ্যের আকার ধারণ করিয়া আছে, কিন্তু কর্ত্তাকে বিকৃত করিয়া দিয়াছে। ভোজের সময়ে পরিবেশকগণ ভোক্তাদিগকে "লুচি চাই" "সন্দেশ চাই" প্রভৃতি প্রশ্ন করিয়া থাকে। "চাই" পদ যে হিন্দী "চাহিয়ে" পদের অপভ্রংশ সুতরাং কর্ম্মবাচ্য সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কেননা তাহা না হইলে লুচি ও সন্দেশের সহিত উহার অন্বয় হয় না। এখানে কর্ম্মই কর্ত্তৃপদের স্থানে আছে। সেইজন্য লুচি ও সন্দেশের কোন বিকার হয় নাই। কিন্তু "বেদে বলে" এই বাক্যে বেদই সাক্ষাৎকর্ত্তা। তাহা অধিকরণরূপ ধারণ করিয়াছে। "গরুতে ঘাস খায়" "কুকুরে কামড়াইয়াছে" প্রভৃতি বাক্যে ক্রিয়াররূপ কর্ত্তৃবাচ্য কিন্তু কর্ত্তাররূপ অধিকরণ। আমার এই মতের সহিত অনেকের হয়ত মিলিবে না। কেননা শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় এবং শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র বিদ্যানিধি মহাশয় এই সকল কর্ত্তৃপদের বিকৃতির অন্যরূপ কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

বাঙ্গলায় যখন অন্য ধাতুর সহিত কৃ-ধাতুর ভিন্ন ভিন্ন রূপের যোগ করিয়া ক্রিয়াপদ নিষ্পন্ন করিতে হয়, তখন তাহাতে যে কোন নামধাতুরূপে ব্যবহৃত হইয়া তাহা হইতে ক্রিয়াপদ নিষ্পন্ন হইবে তাহা আশা করা যাইতে পারে না। ইংরেজীতে boycott, lesterate, macadamise, galvanise, mesmerise প্রভৃতি ভূরি ভূরি নামধাতুর

ব্যবহার আছে। সংস্কৃতে শব্দায়তে নামক ক্রিয়াপদ যে নামধাতু হইতে নিষ্পন্ন তাহা অনেকেই জানেন। একটা রসায়নের ফলশ্রুতিতে লিখিত আছে যে তাহাদ্বারা "গর্দ্দভী অপ্সরায়তে" অর্থাৎ কুৎসিতা নারীও অপ্সরার মত সুন্দরী হয়। সংস্কৃতে যে কেবল একটা শব্দ লইয়াই ক্রিয়াপদ প্রস্তুত হইতে পারে তাহা নহে, বড় বড় সমাস দিয়াও ক্রিয়াপদ প্রস্তুত হয়। ইহার একটা দৃষ্টান্ত অপ্রীতিকর হইবে না বলিয়া দিতেছি।

কালিন্দীয়তি কজ্জলীয়তি কলানাথাঙ্ক মালীয়তি
ব্যালীয়ত্যবিমণ্ডলীয়তি মুহুঃ শ্রীকণ্ঠ কণ্ঠীয়তি
শৈবালীয়তি কোকিলীয়তি মহানীলাভ্রজালীয়তি
ব্রহ্মাণ্ডে রিপুতুর্যশস্তব নৃপালঙ্কার চূড়ামণে।

কিন্তু বাঙ্গালা হিন্দী আসামী প্রভৃতি ভাষার সাধু সাহিত্যে গৃহীত হইবার উপযুক্ত নামধাতু হইতে ক্রিয়া পদ প্রস্তুত হইতে পারে না। যে দুই চারি নামধাতু আছে তাহা কেবল ব্যঙ্গার্থেই প্রযুক্ত হয়। একজন কবি স্বরচিত কাব্যে কয়েকটা নামধাতু ব্যবহার করিয়াছিলেন, তাঁহাকে বিদ্রূপ করিয়া আর একজন এক কবিতা লেখেন। বাল্যকালে তাহা পাঠ করিয়াছি সুতরাং এখন তাহার এক চরণমাত্র মনে আছে। তাহা এই:

"কৌশল্যিয়া দশরথ যবে অযোধ্যিল" ইহার পাদটীকায় লিখিত ছিল "কৌশল্যিয়া অর্থাৎ কৌশল্যাকে বিবাহ করিয়া, অযোধ্যিল অর্থাৎ অযোধ্যায় ফিরিয়া আসিল।"

বাঙ্গালা, হিন্দী, আসামীভাষায় নামধাতু এবং স্বতন্ত্র ক্রিয়াপদ সম্ভবে না, কিন্তু খাসিয়া ভাষায় ঠিক ইংরেজী ও সংস্কৃতের মত সমস্ত ক্রিয়াপদই স্বতন্ত্র এবং সমস্ত নামই ধাতুরূপে ব্যবহৃত হইতে পারে।

বাঙ্গালায় ক্রিয়াপদ বাক্যের শেষে ব্যবহৃত হয়। ইহা অস্বাভাবিক

প্রথমে কর্ত্তা, কর্ত্তা হইতে ক্রিয়ার উৎপত্তি এবং কর্ম্মে তাহার পর্য্যবসান। সুতরাং প্রথমে কর্ত্তা মধ্যে ক্রিয়া এবং সর্ব্বশেষে কর্ম্ম ইহাই স্বাভাবিক-ক্রম। ইংরেজীভাষা এই স্বাভাবিক পৌর্ব্বাপর্য্যের অনুসরণ করে বলিয়া তাহা বাঙ্গালা, হিন্দী, ফ্রেঞ্চ প্রভৃতি ভাষা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ভারতবর্ষে এক খাসিয়া ভাষা ভিন্ন অন্য কোন ভাষা এই স্বাভাবিক ক্রম-অনুসারে চলে কিনা জানি না।

উপরে বাঙ্গালাভাষার মোটামুটি যে কয়েকটা অভাব, ত্রুটি ও অঙ্গহীনতার কথা বলিলাম, কালে তাহার প্রতিবিধান হইবে কিনা বলিতে পারি না। কিন্তু বিকলাঙ্গ স্থূলদেহ ব্যক্তিও অঙ্গপরিচালন দ্বারা সুস্থাঙ্গ ও লঘুকলেবর হয়। অন্ততঃ তাহার যে অঙ্গ আছে তাহা সবল হইয়া যে অঙ্গে নাই তাহার অভাব পূরণ করে। সুতরাং প্রচুর অনুশীলন হইলে বাঙ্গালাভাষারও উন্নতি অবশ্যই হইবে। আমি যাহা বাঙ্গালা-ভাষার সহজাত রোগ বলিয়া নির্দ্দেশ করিলাম পণ্ডিতেরাও যদি সেই গুলিকে রোগ বলিয়া বিবেচনা করেন তাহা হইলে সময়ে আরোগ্যও হইতে পারে। যাঁহারা কখনও ইংরেজী বা সংস্কৃত হইতে বাঙ্গালায় অনুবাদ করিয়াছেন তাঁহারাই বাঙ্গলা ভাষার অভাব ও দারিদ্র্য উপলব্ধি করিয়াছেন। স্বর্গগত কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ও অন্যান্য পাদ্রিগণ যে সকল পুস্তক বাঙ্গলায় অনুবাদ করিয়াছেন সেই অনুবাদের ভাষা অত্যুৎকৃষ্ট না হইলেও তাহা যে প্রকৃত অনুবাদ তাহাতে সন্দেহ নাই। তাঁহাদের অনুবাদ ভিন্ন অন্য কোন পুস্তকের যথাযথ অনুবাদ বাঙ্গলায় নাই বলিলেই হয়। অনুবাদকেরা প্রায়ই লেখেন যে, বাঙ্গালী পাঠকের উপযোগী করিয়া তাঁহারা নিজ নিজ অনুবাদে পরিবর্ত্তন ও পরিবর্জ্জন করিয়াছেন। ইহার প্রকৃত কারণ আমার এই বোধ হয় যে, বাঙ্গলায় দারিদ্র্য-বশতঃ তাঁহারা সকল স্থানের অনুবাদ করিতে সমর্থ হন নাই।

বর্ণমালা—বানান ও উচ্চারণ।

বোধ হয় কোন ভাষার বর্ণমালাই সর্ব্বাঙ্গ সম্পূর্ণ নহে। আরবীতে চ ও গ নাই। পারসী চঙ্গ শব্দ আরবীতে সঞ্জ্ হইয়া যায়। সংস্কৃত চতুরঙ্গ স্থলে আরবীতে সৎরঞ্জ্ হয়। তাহাই ঈষৎ পরিবর্ত্তিত হইয়া সংস্কৃত চতুরঙ্গ-ক্রীড়া অর্থাৎ দাবা-খেলার নাম সতরঞ্চ-খেলা হইয়াছে। গ্রীকেও চ স্থলে স লিখিত হয়। সংস্কৃত চন্দ্র শব্দ গ্রীকে সন্দ্ররূপে লিখিত হইয়া থাকে। ইংরেজীতে ত, থ, দ, ধ নাই। ফ্রেঞ্চ, ইটালি প্রভৃতি ভাষায় ট, ঠ, ড, ঢ নাই। তবে যে আমরা ইটালি, লাটিন্, বোর্ডো প্রভৃতি শব্দ দেখিতে ও শুনিতে পাই তাহার কারণ এই যে, ইংরেজেরা ইতালি, লাতিন, বোর্দো প্রভৃতি শব্দকে ইটালি, লাটিন বোর্ডো প্রভৃতিতে পরিবর্ত্তিত করিয়াছেন এবং আমরা এই শব্দগুলি ইংরেজী হইতে লইয়াছি। যখন বহু অনুশীলিত ভাষাগুলির বর্ণমালা এইরূপ অসম্পূর্ণ তখন আমাদের বর্ণমালাও যে অসম্পূর্ণ হইবে তাহা বিচিত্র নহে। আমি এই প্রবন্ধে দেখাইতে চেষ্টা করিব যে, বাঙ্গলায় যতগুলি ধ্বনি আছে বাঙ্গলা বর্ণমালায় তদনুরূপ অক্ষর নাই। কিন্তু তাহা বলিয়া আমার এরূপ ইচ্ছা নহে যে, বাঙ্গলায় কতকগুলি নূতন অক্ষরের সৃষ্টি হয়। সংস্কৃত ও হিন্দীভাষায় যত ধ্বনি আছে ঠিক তদনুরূপ অক্ষরও আছে। একটাও কম বা বেশী নাই। উর্দ্দু ভাষায় ব্যঞ্জন-সম্বন্ধেও এই কথা খাটে। কিন্তু তাহাতে স্বরধ্বনির অনুরূপ সকল অক্ষর নাই। এক আলেফের সঙ্গে জের, জবর, পেশ, এবং মদ্ দিয়া ই উ এবং আ প্রকাশ করিতে হয়। কিন্তু অন্যপক্ষে বাঙ্গলা, আসামী, ইংরেজী, ফ্রেঞ্চ প্রভৃতি ভাষায় যত ধ্বনি আছে ততধ্বনির প্রতিনিধিত্ব করিবার উপযুক্ত অক্ষর নাই। অথচ এই সমস্ত ভাষায় এমন কতকগুলি অক্ষর আছে, যাহা না

থাকিলেও চলে। ইংরেজীতে এক A অক্ষরের Fate, fat, fare fall, fast, far, what, many এই আটটি শব্দে আট প্রকার উচ্চারণ হয়। ইংরেজীতে এই আটটি উচ্চারণ যখন একমাত্র A অক্ষর দ্বারা সম্পন্ন হইতে পারে তখন আমাদেরই বা বর্ণমালার অক্ষর-সংখ্যা বাড়াইবার প্রয়োজন কি? চীনদেশের বর্ণমালায় এতদিন ৮০০০ অক্ষর ছিল, এখন এই আট হাজারের স্থলে আটচল্লিশটি মাত্র অক্ষর প্রচলিত হইতে যাইতেছে। গ্রীকেরও অক্ষর-সংখ্যা অল্পীকৃত হইয়াছে। V ধ্বনিজ্ঞাপক F•(দিগম্মা) নামক অক্ষর একেবারে পরিত্যক্ত হইয়াছে। এখন গ্রীকে চব্বিশটিমাত্র অক্ষর। লাটিনে পঁচিশটি অক্ষর। ইংরেজীতে ছাব্বিশটি অক্ষর দ্বারা সমস্ত কার্য্য চলিয়া যাইতেছে। সুতরাং আমাদের যে পঞ্চাশটা অক্ষর আছে তাহাতেই আমাদের সন্তুষ্ট থাকা উচিত। তবে ইংরেজী অভিধানে যেমন প্রত্যেক অক্ষরের ভিন্ন ভিন্ন উচ্চারণ প্রদর্শন করিবার জন্য সাঙ্কেতিক চিহ্ন আছে আমাদের অভিধানেও সেইরূপ সাঙ্কেতিক চিহ্ন থাকা উচিত।

বাঙ্গলা ও আসামীভাষায় সংস্কৃত অকারের উচ্চারণ নাই। But শব্দের u অক্ষরের যে উচ্চারণ, সংস্কৃত অকারের ঠিক সেই উচ্চারণ। কিন্তু All শব্দের a অক্ষরের যে উচ্চারণ বাঙ্গালা ও আসামীতে অকারের ঠিক সেই উচ্চারণ। এই উচ্চারণ সংস্কৃতে নাই এবং বঙ্গদেশের পশ্চিমে কোন প্রদেশেই নাই। সুতরাং সংস্কৃত অকারের উচ্চারণ-প্রদর্শক একটা চিহ্ন বাঙ্গালা অকারের সহিত যুক্ত করিয়া দেওয়া উচিত। এই চিহ্ন একটি বিন্দু হইলে ই হয় এবং সেই বিন্দুটি অকার এবং অকারযুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণের দক্ষিণ-পশ্চিমভাগে দিলে ভাল হয়। অকার এইরূপ চিহ্নযুক্ত হইলে তাহা দেখিতেও কতকটা দেবনাগরের অকারের মত হইবে। বাঙ্গালা ও আসামীতে 'অবসর' 'অবলম্বন' প্রভৃতি শব্দের অকারের যে

উচ্চারণ তাহাই এই দুই ভাষার অকারের স্বাভাবিক উচ্চারণ। কিন্তু অনেকস্থলে অকারের অন্যরূপ উচ্চারণ দেখিতে পাওয়া যায়। "ব্যক্তি" এবং "ব্যক্ত" এই দুই শব্দে আমরা অকারের স্বাভাবিক উচ্চারণ করি না। অকারের পর ই বা উ বর্ণ থাকিলে অকারের উচ্চারণ প্রায় ওকারের মত হয়। যেমন সই, কই, সখী, রবি, অপি, কপি, হউক, অমুক, শম্বুক, শত্রু ইত্যাদি। চট্ শব্দের এবং ওঁ ফট্ স্বাহার ফট্ শব্দের অকারের যে উচ্চারণ তাহা অবলম্বনের অকার অপেক্ষা হ্রস্ব।

বাঙ্গালায় আকারেরও দুই উচ্চারণ আছে। একটি প্রকৃত সংস্কৃত উচ্চারণ যাহা ইংরেজী Father শব্দে a অক্ষরের। অন্যটি প্রায় সংস্কৃত অকার অথবা ইংরেজী Fast শব্দের a অক্ষরের মত। বাঙ্গলার অধিকাংশ-স্থলে আকারের এই উচ্চারণ, যথা আমি, আমার, আমাকে, তোমার, তাহারা, তাহাদের, তামাশা ইত্যাদি। তামাশা শব্দটা আমরা যেরূপে উচ্চারণ করি, হিন্দুস্থানীরা ও ইংরেজেরা সেরূপ উচ্চারণ করেন না। তাঁহাদের উচ্চারণই বিশুদ্ধ। ইংরেজীতে Fat শব্দের a অক্ষরের যে ধ্বনি তাহা বাঙ্গালায় আছে, কিন্তু তাহার অনুরূপ কোন অক্ষর নাই। আমরা লিখি এক, কিন্তু বলি য়্যাক্। হিন্দীতে একারের নিম্নে একটি বিন্দু দিয়া এই উচ্চারণ লিখিত হইয়া থাকে। আমাদেরও তদ্রূপই আভিধানিক-সঙ্কেত হওয়া উচিত। য় এ আকার দিয়া এই ধ্বনি প্রকাশ করিবার বিরুদ্ধে যুক্তি এই যে Fat শব্দের a একটি অবিমিশ্র স্বর, কিন্তু আকারযুক্ত য ফলা, স্বরযুক্ত ব্যঞ্জন। সুতরাং একটা অন্যটার প্রতিনিধি হইতে পারে না। এই ধ্বনি প্রকাশ করিতে কেহ কেহ "অ"এ এবং কেহ কেহ "এ"তে য ফলা আকার দিয়া এক অদ্ভুত সৃষ্টি করিয়া থাকেন।

বাঙ্গালায় ই এবং উ বর্ণের উচ্চারণে কোন গোল নাই। কিন্তু

আমরা অনেক সময়ে হ্রস্ব ই কে এবং হ্রস্ব উ কে দীর্ঘ ঈ এবং দীর্ঘ ঊ রূপে উচ্চারণ করিয়া থাকি। একস্বরবিশিষ্ট শব্দমাত্রেরই হ্রস্ব ই এবং হ্রস্ব উ দীর্ঘ ঈ এবং দীর্ঘ ঊ রূপে উচ্চারিত হয়। যথা দ্বি, ত্রি, কি, ঘি, ঝি, ছি, কিল্, খিল, হিম, শিব, বিষ, বিশ, ত্রিশ, দিন, তিন, শিম, ঢিল, তিল, মিল, স্থির, ডিম, ভিড় ইত্যাদি, এবং সু, কু, শুঁড়, গুড়, শুঁঠ, উট, ফুট, মুট, ভুল, কুল, ভুর, বুক, পুট, বুট, সুখ, সুখ, দুধ, খুন, ফুল, মুন, লুন, গুণ, চুল, পুর ইত্যাদি।

আমরা উচ্চারণে ই বর্ণ, উ বর্ণের মাত্রায় প্রভেদ করি না বলিয়া আমাদিগকে সর্ব্বদাই হ্রস্ব ই, দীর্ঘ ঈ ইত্যাদি বলিতে হয়। আবার শ্রীহট্টের লোকে ওকারকেও উকাররূপে উচ্চারণ করেন—গোলোককে গুলক বলেন। সুতরাং তাঁহারা ওকারকে বলেন, সন্ধ্যক্ষর উ। বাঙ্গালায়ও অনেকস্থলে ওকার স্থানে উকারের উচ্চারণ হয়, কিন্তু সেই সকল শব্দের বানানেও একেবারে ওকার ত্যাগ করিয়া উকার গ্রহণ করা হইয়াছে, যথা রোটি স্থানে রুটি, টোপি স্থানে টুপি, ধোতি স্থানে ধুতি ইত্যাদি। এই শব্দগুলি সংস্কৃত হইলে কখনই তাহাদের বানান পরিবর্ত্তিত হইত না।

আমাদের মধ্যে ই, উ এবং কখন কখন অবর্ণের মাত্রার প্রভেদ নাই বলিয়া বাঙ্গালার ইন্দ্রবজ্রা, উপযাতি, মালিনী, শিখরিণী, তোটক, তূণক, Trochaic এবং Iambic ছন্দে কবিতা হইতে পারে না। ভারতচন্দ্র, বলদেব পালিত প্রভৃতি কবিগণ সংস্কৃতচ্ছন্দে বাঙ্গালার কবিতা লিখিয়াছেন বটে, কিন্তু সে কবিতা স্বাভাবিক নহে—তাহা পড়িবার সময়ে স্বাভাবিক উচ্চারণ বিকৃত না করিলে ছন্দোভঙ্গ হয়। সুতরাং এখন কোন কবিই ব্যঙ্গচ্ছলে ভিন্ন সেরূপ কবিতা লেখেন না।

ঋকারকে হিন্দুস্থানী ও মহারাষ্ট্রীয়েরা যেরূপে উচ্চারণ করেন, সে

উচ্চারণ বঙ্গদেশে নাই। একখানি বাঙ্গালা নভেলে পড়িয়াছিলাম যে, একজন উৎকলবাসী ক্রুষ্ণ ক্রুষ্ণ বলিতেছেন। তাহাতে ভাবিয়াছিলাম যে উড়িষ্যায়ও বুঝি সেরূপ উচ্চারণ আছে। কিন্তু শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় মহাশয় বলেন যে সেরূপ উচ্চারণ উড়িষ্যায় নাই। এক ভাষার ব্যাকরণে (কিন্তু কোন ভাষার ব্যাকরণে তাহা এখন মনে নাই) পড়িয়াছিলাম যে, সেই ভাষায় এমন একটি স্বর আছে যাহা উচ্চারণ করিতে হইলে নিম্নলিখিত চেষ্টার প্রয়োজন হয় ;—উ উচ্চারণ করিতে হইলে, ওষ্ঠদ্বয় যে আকার ধারণ করে, ওষ্ঠদ্বয়কে সেই আকারধারণ করাইয়া ই উচারণ করিতে হয়। উল্লিখিত পশ্চিমদেশীয় লোকেরা প্রায় তদ্রূপ করিয়া ঋ উচ্চারণ করিয়া থাকেন। কিন্তু আমার বোধ হয় যে, আমরা ঋকে যে রি রূপে উচ্চারণ করি, সংস্কৃত বৈয়াকরণেরা তাহারও অনুমোদন করিতেন। কেননা ব্যাকরণে দেখিতে পাই যে, ঋষি শব্দ রিষিরূপে, কৃমি শব্দ ক্রিমিরূপে এবং পৈতৃক শব্দ পৈত্রিকরূপেও লিখিত হইতে পারে। কিন্তু তথাপি বাঙ্গলাতেও ঋ ফলার ও ইকারযুক্ত র ফলার মধ্যে প্রভেদ আছে। অনেকেই কিন্তু ইহার ভুল উচ্চারণ করেন। আমি কোন কোন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতকেও তাদৃশ, যাদৃশ, জতুগৃহ, সরীসৃপ্ প্রভৃতিকে তাদ্রিশ, যাদ্রিশ, জতুগ্রিহ, সরীস্রিপ্ রূপে উচ্চারণ করিতে শুনিয়াছি। অর্থাৎ তাঁহারাও ঋকে ব্যঞ্জনবর্ণরূপে উচ্চারণ করেন। এইরূপ উচ্চারণ যে ভুল তাহা একটিমাত্র দৃষ্টান্ত দিয়া বুঝাইতে চেষ্টা করিব। মালিনীচ্ছন্দের প্রথম চারিটা অক্ষর যদি "জতুগৃহ" হয় এবং "জতুগৃহ" যদি "জতুগ্রিহ" রূপে উচ্চারিত হয়, তাহা হইলে দ্বিতীয় স্বর গুরু হইয়া যায়, সুতরাং ছন্দোভঙ্গ হইবে। কেননা মালিনীর প্রথম ছয়টি স্বরই হ্রস্ব হওয়া উচিত।

হ্রস্ব এ বোধক কোন বর্ণ বাঙ্গলায় নাই—হিন্দীতেও নাই। হিন্দীতে

হ্রস্ব একারের ধ্বনিও নাই। কিন্তু বাঙ্গলায় একার প্রায় হ্রস্বরূপে উচ্চারিত হয়। যখন আমরা সংস্কৃত পাঠ করি, তখন একারের উচ্চারণ দীর্ঘই করিয়া থাকি। কিন্তু বাঙ্গলা কথা কহিবার সময়েই হউক বা পাঠ করিবার সময়েই হউক, সংস্কৃত শব্দের একারও আমরা হ্রস্বরূপে উচ্চারণ করি, যথা এই, এস (আইস) যেখানে, সেখানে, স্বেচ্ছা, কেশব, সেবক ইত্যাদি। সংস্কৃত বৈয়াকরণেরা বলেন যে, ইকারই হ্রস্ব একার। ইংরেজীতেও বোধ হয়, আভিধানিকেরা পূর্ব্বে সেইরূপই মনে করিতেন। ওআকার (Walker) প্রণীত Dictionaryর পুরাতন সংস্করণে দেখিতে পাই যে, College, damage প্রভৃতি শব্দের উচ্চারণ colij, damij বলিয়া লিখিত আছে। ওএব্‌সটর (Webster) প্রণীত Dictionaryর পুরাতন সংস্করণে দেখা যায় যে, Sunday, Monday প্রভৃতির উচ্চারণ Sunday, Monday রূপে লিখিত আছে। ইংরেজী Ticket বাঙ্গলায় টিকিট হইয়া গিয়াছে। কলেজকে হিন্দুস্থানীরা এখনও কালিজ বলেন। এই সকল দৃষ্টান্ত হইতে আমরা স্পষ্টই বুঝিতে পারি যে, হ্রস্ব ই এবং হ্রস্ব এ একবস্তু নহে। কিন্তু হ্রস্ব এ এবং দীর্ঘ একারের প্রভেদ আমার নিকট অতি অকিঞ্চিৎকর বলিয়া বোধ হয়। তথাপি উভয়ের পার্থক্যসূচক একটা চিহ্ন থাকা ভাল।

একার-সম্বন্ধে যাহা বলা গেল, ওকার-সম্বন্ধেও তাহাই বলা যাইতে পারে। আমরা ওকারকে প্রায়ই হ্রস্বরূপে উচ্চারণ করি। হঠাৎ এ কথাটায় অনেককেই চমকিত করিবে। কিন্তু তাঁহারা একটু ভাবিয়া দেখিলেই আমার মতে মত দিবেন। তথাপি একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যাউক।

"গোপালের সনে ফিরিতে ঘুরিতে।" এই দ্বাদশটি অক্ষর বাঙ্গলা স্বাভাবিকভাবে পড়িলে বোধ হইবে যে, ইহা বাঙ্গলা কবিতার একটা

চরণ। কিন্তু ইহার ওকার এবং আকারের স্বাভাবিক বাঙ্গলা উচ্চারণ করিয়া যদি একার চারিটি কিছু অস্বাভাবিকভাবে দীর্ঘ করিয়া উচ্চারণ করা যায়, তাহা হইলে অক্ষরগুলির সমষ্টি তোটকছন্দের এক চরণে পরিণত হয়। যথা—

গোঁপাঁলেরঁ শঁনে ফিঁরিঁতে ঘুঁরিঁতে।

এই এক পংক্তি হইতেই দেখা যায় যে, দীর্ঘস্বরগুলিকে হ্রস্ব করিয়া উচ্চারণ করাই বাঙ্গলার প্রকৃতি। সংস্কৃত বৈয়াকরণেরা বলেন যে, ওকারের হ্রস্বই উকার। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে।

অন্যান্য ভাষায় আরও স্বর আছে। International Phonetic Society কর্ত্তৃক যে বর্ণমালা প্রস্তুত হইয়াছে, তাহাতে নাকি বত্রিশটি স্বর আছে। কিন্তু আমাদের আট নয়টি স্বরের দ্বারাই কাজ চলে।

এখন কয়েকটা স্বরান্ত বাঙ্গলা শব্দের নব-প্রবর্ত্তিত বানানের কথা বলিয়া প্রবন্ধের এই অংশের উপসংহার করিব। আমরা বহুকাল হইতে ছোট, খাট, বার, তের, পনর কোন, ত, মত, প্রভৃতি বহু শব্দ অকারান্ত করিয়া লিখিয়া আসিতেছি। কিন্তু কিছুদিন হইতে "ভারতী" ও "প্রবাসী" পত্রিকায় এই শব্দগুলি ওকারান্ত করিয়া লিখিত হইতেছে। শব্দগুলি যখন সংস্কৃতমূলক নহে, তখন সে গুলির উচ্চারণানুযায়ী বানান তেমন দোষের নহে বটে। কিন্তু শব্দগুলিতে ওকার যোগ করিতে যে শ্রম ও সময় ব্যয় হয়, তদনুরূপ কোন লাভ হয় কি? বিশেষতঃ আমরা যখন হই, হউক, করি, করুক, অপি, অম্বু, কপি, বপু প্রভৃতি শতসহস্র শব্দের অকারকে হ্রস্ব ও রূপে উচ্চারণ করি, অথচ বানানে তাহা ওকারে পরিবর্ত্তিত করি নাই, তখন কেবল শেষের অকারগুলিকেই কেন ওকার করিয়া দিব। এই শব্দগুলির মধ্যে কয়েকটির অনুরূপ হলন্ত শব্দ আছে, যথা কোন, কোন্; মত, মত্, বার, বার্। পাছে শীঘ্র

অর্থবোধ না হয়, এইজন্য যদি বানানে পরিবর্ত্তনের প্রয়োজন বোধ হয়, তাহাহইলে হলন্তগুলিকে চিহ্নিত করিয়া দিলেই হয়। কোন অক্ষরে ওকার যোজনা করা অপেক্ষা হসন্তের চিহ্ন দিতে সময় ও শ্রম কম লাগে। কোন চিহ্ন না দিলেও অর্থবোধ হইতে কতক্ষণ লাগে? এতৎ সম্বন্ধে আরও কয়েকটা কথা স্থানান্তরে বলিব।

এখন আমরা বাঙ্গলায় ব্যঞ্জনের প্রচুরতা-অপ্রচুরতার বিষয় আলোচনা করিব।

স্পর্শবর্ণের ঙ, ঞ এবং ণ ছাড়া অন্য কোন বর্ণের উচ্চারণে মত-দ্বৈধ নাই। শিশুদিগকে বর্ণমালা শিখাইবার সময়ে ঙকে উঁঅ বা ঁউঅ এবং ঞকে ইঁয় বলিতে শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। কিন্তু উহাদের প্রকৃত নাম শেখানই উচিত। ঙকারেব সহিত গ যুক্ত হইলে রাঢ়-প্রদেশ ভিন্ন বঙ্গের অন্য স্থানে প্রায়ই ঙ্ঙ উচ্চারিত হয়—বঙ্গকে বঙ্ঙ এবং গঙ্গাকে গঙ্ঙা বলে। গ্রীকে বঙ্গ ও গঙ্গা, বগ্গ ও গগ্গা রূপে লিখিত হয়। জকারের সহিত যখন ঞ যুক্ত হয়, তখন সেই যুক্তাক্ষরের উচ্চারণ কিছু কষ্টসাধ্য হয়। এই যুক্তবর্ণ উচ্চারণ করিতে বাঙ্গালীরা ও মহারাষ্ট্রীয়েরা উভয়েই ভুল করেন। বাঙ্গালীরা জ্ঞানকে গ্যান বলেন, মহারাষ্ট্রীয়েরা বলেন দান। মহারাষ্ট্রের "জ্ঞানোদয় পত্রিকা"র নাম ইংরেজীতে Dnano-day রূপে লিখিত হইয়া থাকে। বাঙ্গলায় যাজ্ঞা শব্দের চলিত উচ্চারণ যাচ্ঞা কিন্তু প্রায় যাঞ্চা হওয়া উচিত। মূর্দ্ধণ্য ণ-কারের উচ্চারণ বাঙ্গলায় নাই। হিন্দুস্থানীদের মধ্যেও নাই বলিলেই হয়। কিন্তু ট, ঠ, ড, ঢ, র উপরে থাকিলে আমরা ণ-কারের উচ্চারণ অনেকটা করিতে পারি ও করিয়া থাকি। বিদ্যানিধি মহাশয় ইহা স্বীকার করেন না। কিন্তু ইচ্ছা করিলে সকলেই পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন যে, কণ্টক, কণ্ঠ এবং দন্ত শব্দের অনুনাসিক ণকারকে যে স্থান স্পর্শ করাইয়া উচ্চারণ

করিতে হয়, অন্ত, পান্থ, মন্দ প্রভৃতি শব্দের অনুনাসিক উচ্চারণ করিবার সময়ে জিহ্বা তাহা অপেক্ষা নিম্নস্থান অর্থাৎ দন্তমূল স্পর্শ করে। যাহা হউক, ণ ও ন'র মধ্যে যে প্রভেদ তাহা অকিঞ্চিৎকর। দয়ানন্দ সরস্বতী ণ স্থানে ন-ই উচ্চারণ করিতেন।

স্পর্শবর্ণের অন্যগুলির কোন্‌টার কিরূপ উচ্চারণ সে বিষয়ে মতভেদ না থাকিলেও কার্য্যত কোন কোন স্থানের লোক কোন কোন বর্ণকে অশুদ্ধভাবে উচ্চাচরণ করে। বঙ্গের অনেক স্থানে বিশেষতঃ পূর্ব্ববঙ্গে ও আসামে চ ও ছ স বা S রূপে এবং জ ও ঝ Z রূপে উচ্চারিত হয়। আসামের অনেক শিক্ষিতলোকও ঝ উচ্চারণ করিতে পারেন না। উপর-আসামে ট, ঠ, ড, ঢ এবং ত, স, দ, ধ এই বর্ণগুলি যথাক্রমে পরিবর্ত্তনীয়রূপে ব্যবহৃত হয়। আমরাও যে কখন কখন সেরূপ না করি তাহা নহে—আমরা দাড়িম্বকে ডালিম এবং দ্বিদল অর্থাৎ দালকে ডাল বলি। পূর্ব্ববঙ্গের অশিক্ষিত লোক কোন বর্ণের চতুর্থ বর্ণ উচ্চারণ করিতে পারে না, চতুর্থ বর্ণ স্থানে তৃতীয় বর্ণ উচ্চারণ করিয়া থাকে। আসামের মিরিরা কোন মহাপ্রাণ বর্ণ অর্থাৎ বর্গের দ্বিতীয় ও চতুর্থ বর্ণ এবং হ উচ্চারণ করিতে পারে না। বাঙ্গালায় স্পর্শবর্ণের সংখ্যা সাতাশ। অতিরিক্ত অক্ষর দুইটি ড় ও ঢ়। পূর্ব্ববঙ্গের অশিক্ষিত লোক এই দুইটা বর্ণ উচ্চারণ করিতে পারে না—ড় কে বর্গীয় র বলে। কোন অক্ষরের প্রকৃত উচ্চারণ না হইয়া যদি অন্য একটা অক্ষরের মত উচ্চারণ হয়, তাহা হইলে সেই অক্ষরগুলিকে বিশেষিত করিবার জন্য প্রত্যেক অক্ষরের সংস্কৃত ব্যাকরণে যে উচ্চারণ স্থান উক্ত আছে সেই স্থানের নাম দিয়া তাহাকে পরিচিত করিতে হয়। আমরা সেইজন্য দন্ত্য ন, মূর্দ্ধন্য ণ বলিতে বাধ্য হই। উপর-আসামে মূর্দ্ধণ্য ত এবং দন্ত্য ত বলে। মূর্দ্ধণ্য ত অর্থাৎ ট। অথবা দন্ত্য ট অর্থাৎ ত। আমরা বর্গীয় জ এবং অন্তঃস্থ জ এবং তালব্য শ, মূর্দ্ধণ্য শ এবং দন্ত্য-

শ বলি। [illegible] পাঁচটা স প্রথম স অর্থাৎ চ দ্বিতীয় স অর্থাৎ ছ, তালব্য স অর্থাৎ শ, মূর্দ্ধণ্য স অর্থাৎ ষ এবং দন্ত্য স।

স্পর্শবর্ণের পর অন্তঃস্থ ব। ইহা কখনও জ-রূপে কখনও য়-রূপে উচ্চারিত হয়। কিন্তু ইহাতে আকার দিয়া কখনও স্বরের আকারের ধ্বনি প্রকাশ করা উচিত নহে। খাওয়া, যাওয়া প্রভৃতি শব্দের শেষ অক্ষর য়া না হইয়া আ হওয়া উচিত। ইংরেজীতে বর্ণান্তরিত করিতে হইলে উহাদের স্থানে Khaou, jaoa ই লেখে, কিন্তু Khaoya, jaoya লিখিত হয় না। soda water কথাটা বাঙ্গালায় সোডাওয়াটার লিখিত হয়। ইহাও নিতান্ত অশুদ্ধ, কেননা ইংরেজী শব্দটায় য় কারের লেশমাত্র নাই। প্রাকৃত-ভাষার নিয়মানুসারে দুই স্বরের মধ্যস্থিত অসংযুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণের লোপ হয়। সুতরাং সংস্কৃত গোপাল শব্দ প্রাকৃতে গোআল হয়। তাহার স্থানে বাঙ্গালায় গোআলা হয়। সুতরাং গোআল ও গোআলা কখনই গোয়াল ও গোয়ালা-রূপে লেখা উচিত নহে। এরূপস্থলে সম্পূর্ণ আ না লিখিয়া লুপ্ত-আকারের চিহ্ন অথবা Apostrophe লিখিয়া তাহার গায়ে আকারের দাঁড়ি (।) সংযোগ করিয়া দিলে লেখার সুবিধাও হয়। কেহ কেহ কোন কোন সংস্কৃত শব্দের য়া স্থানে ও আ উচ্চারণ করেন। উত্তরবঙ্গের বিখ্যাত নদী করতোয়াকে উত্তরবঙ্গের অনেক লোক করতোআ রূপে উচ্চারণ করেন। কিন্তু সেই সকল লোকই স্বচ্ছতোয়া শব্দের ঠিক উচ্চারণ করেন। ওকারের পর অকার হিন্দীতে ব্যবহৃত হয়, সুতরাং বাঙ্গালায়ও ব্যবহৃত হইতে পারে।

বাঙ্গালায় অন্তঃস্থ ব ঠিক বর্গীয় ব এর মতই লেখা হইয়া থাকে। এই দুই বর্ণের উচ্চারণগত প্রভেদও বাঙ্গালায় নাই। কিন্তু বাঙ্গালা অক্ষরে সংস্কৃত ও ইংরেজী লিখিবার জন্ত অন্তঃস্থ ব কারের পৃথক্ আকার থাকা নিতান্ত উচিত। সে জন্ত কোন নূতন সৃষ্টি না করিয়া দেবনাগরের অন্তঃস্থ ব বাঙ্গলায় প্রচলিত করিলেই উত্তম হয়।

বাঙ্গালায় তালব্য শ কারের যেরূপ উচ্চারণ আমরা করিয়া থাকি, সেইরূপ উচ্চারণ হিন্দুস্থানীয়াও করেন। মহারাষ্ট্রীয়দের উচ্চারণও প্রায় তদ্রূপ। মহারাষ্ট্রীয়েরা মূর্দ্ধন্য ষ কারের যে উচ্চারণ করেন, আমাদের পক্ষে তাহা কিছু কষ্টসাধ্য। কিন্তু তাহা তালব্য শকারের উচ্চারণের এতই অনুরূপ যে, তাহার পৃথক্‌রূপ উচ্চারণ শিক্ষা করিতে চেষ্টা করার প্রয়োজন নাই। কিন্তু আমরা যে দন্ত্য স কারকে তালব্য শ-রূপে উচ্চারণ করি, ইহা বড়ই দোষের কথা। বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগকে এই অক্ষরের প্রাকৃত উচ্চারণ শিখাইয়া দিয়া স্কুলে কথা কহিবার সময়ে সেইরূপ উচ্চারণ করিতে বাধ্য করা উচিত। সেরূপ না করিলে আমাদের দেশের পতিত উচ্চারণের উদ্ধার হইবে না। পূর্ব্ববঙ্গের এবং আসামে শ, ষ, এবং স এই তিনটাই অনেক স্থলে হ উচ্চারিত হয়। পশ্চিমদেশীয় এবং হাস্যরসপ্রিয় কবি বলিয়াছেন যে, পূর্ব্বদেশীয় লোকে "শতায়ুর্ভব" বলার পরিবর্ত্তে "হতায়ুর্ভব" বলিয়া আশীর্ব্বাদ করেন; সুতরাং পূর্ব্বদেশীয়দের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিবে না।

আশীর্ব্বাদ ন গৃহ্ণীয়াৎ পূর্ব্বদেশনিবাসিনাম্।
শতায়ুরিতে বক্তব্যে হতায়ুরিতে ভাষিণাম্॥

পূর্ব্ববঙ্গে শ, ষ, স স্থানে হ এবং হ স্থানে অ উচ্চারিত হয়।

শ, ষ ও স স্থানে হ বলা, হ স্থানে অ বলা, এবং চ, ছ, শ, ষ স্থানে স বলা, যেমন অন্যায়, দন্ত্য স স্থানে তালব্য শ বলা তেমনই অন্যায়। কিন্তু যে সকল শব্দের উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে বানানেরও পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে, তাহাদের বোধ হয় সংশোধন আর হইবে না। আসামে অনেক শব্দের শ, ষ, স স্থানে হ লিখিত হয়। আশ্বিনকে আহিন, বৈশাখকে বহাগ; আষাঢ়কে অহার, পৌষকে পুহ; হাঁসকে হাঁহ, মাসকে মাহ বলে।

বাঙ্গলায়ও কোন কোন শব্দের স স্থানে হ লিখিত ও উচ্চারিত হয়। ইহা পরে প্রদর্শিত হইবে।

উপরে যে সকল বর্ণের বিবরণ দেওয়া গেল তদ্ভিন্ন তিনটি উচ্চারণ-জ্ঞাপক চিহ্ন বাঙ্গলায় আছে তাহা অনুস্বার, বিসর্গ এবং চন্দ্রবিন্দু। ইহাদের মধ্যে অনুস্বার ও বিসর্গের প্রকৃত উচ্চারণ বাঙ্গলায় হয় না। অনুস্বার বঙ্গদেশের সর্ব্বত্র এবং আসামে ও মিথিলায় ঙ রূপে উচ্চারিত হয়। কিন্তু ইহার প্রকৃত সংস্কৃত উচ্চারণ চন্দ্রবিন্দুর প্রায় অনুরূপ। প্রভেদের মধ্যে এই যে চন্দ্রবিন্দু যুক্ত হইলে কোন লঘুস্বর গুরু হয় না কিন্তু অনুস্বারযুক্ত হইলে লঘুস্বর গুরু হয়। শব্দের শেষের বিসর্গ বাঙ্গলায় মোটেই উচ্চারিত হয় না। এই সমস্ত বিসর্গ একেবারে বাদ দেওয়া উচিত। অনেক বিসর্গের ব্যবহার ইতিমধ্যেই উঠিয়া গিয়াছে। তেজ, মন, ছন্দ, স্রোত, প্রায়, রক্ষ, বক্ষ প্রভৃতি শব্দে এখন আর বিসর্গ দেখা যায় না। কিন্তু ক্রমশঃ, প্রথমতঃ, বস্তুতঃ কার্য্যতঃ প্রভৃতি শব্দে এখনও বিসর্গ ব্যবহৃত হয়। এগুলি উঠাইয়া দিলে লাভ বই ক্ষতি হয় না। চন্দ্রবিন্দুর প্রচলন বোধ হয় অল্পদিন হইয়াছে। কেননা আমরা প্রাচীন পুস্তকে চাঁদের পরিবর্ত্তে চান্দ, কাঁদিলর পরিবর্ত্তে কান্দিল দেখিতে পাই। পূর্ব্ববঙ্গের লোক চন্দ্রবিন্দু উচ্চারণ করিতে পারেন না। অন্যপক্ষে রাঢ়ে ও আসামে চন্দ্রবিন্দুর বড় বাহুল্য।

বাঙ্গলা বর্ণমালায় যে সকল উচ্চারণজ্ঞাপক বর্ণ আছে, তাহাদের কথা নিঃশেষে বলা হইল। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, সকল বর্ণের প্রকৃত উচ্চারণ হয় না। আসামের উচ্চারণ-সংস্কারের চেষ্টা হইতেছে। কিন্তু বঙ্গদেশের স্কুলে বাঙ্গলা উচ্চারণ শিক্ষা দেওয়া হয় না। ছাত্রদিগকে প্রত্যেক বর্ণের উচ্চারণ বুঝাইয়া দিয়া স্কুলের মধ্যে কথা কহিবার সময়ে সেই সেই উচ্চারণ করিতে পদ্মকে পদ্‌ম বলিতে, ভিক্ষাকে ভিক্‌খা বলিতে

অন্তঃস্থ বকে য় বলিতে বাধ্য করা উচিত। পূর্ব্বে বাঙ্গালী পণ্ডিতেরা কাশ্মীরকে কাশ্‌শীঁর বলিতেন। যদি সেই উচ্চারণটার সংশোধন উচিত হইয়াছে বলিয়া বিবেচিত হয় তাহা হইলে পদ্‌ম উচ্চারণ প্রচলিত হইবে না কেন? আসামীরা সাহেব শব্দটার স স্থানে চ লিখিয়া থাকেন, আমরা বাঙ্গলায় Shakespear লিখিতে সেক্ষপীর লিখিয়া থাকি। এ উভয়ই সমান অন্যায়। যদিও আসামীরা চকে স-রূপে উচ্চারণ করেন এবং আমরা দন্ত্য সকে তালব্য শ রূপে উচ্চারণ করি, তথাপি যখন চ ও শ এর একটা স্বীকৃত উচ্চারণ আছে এবং দন্ত্য স ও তালব্য শ উচ্চারণ করিবার স্বীকৃত স্বতন্ত্র বর্ণ আছে তখন সাহেব ও সেক্‌স্‌পিয়ার লিখিতে কখনই চাহাব ও সেক্ষপীর লেখা উচিত নহে। Parcel শব্দটা বাঙ্গলায় তালব্য শ দিয়া লেখা হইয়া থাকে। কিন্তু উল্লিখিত কারণে দন্ত্য স দিয়া লেখা উচিত। ইংরেজী Stamp, Station, fast প্রভৃতি বহু st যুক্ত শব্দ আমরা বাঙ্গলায় সর্ব্বদাই ব্যবহার করিয়া থাকি এবং সেগুলির উচ্চারণও ইংরেজীর মতই করি। কিন্তু লিখিবার সময়ে আমরা মূর্দ্ধণ্য ষ এর নীচে ট দিয়া থাকি। মূর্দ্ধণ্য ষকারের পরিবর্ত্তে সেই সকল স্থানে দন্ত্য স হওয়া উচিত। হিন্দীতে দন্ত্য সই ব্যবহৃত হয়। সুতরাং আমাদেরও সেইরূপ করা উচিত।

কতকগুলি ধ্বনি প্রকাশ করিবার উপযুক্ত বর্ণ বাঙ্গলায় নাই। যথা ইংরেজী F. V. Z. ZH.। ঘড়ীটা Fast, violet রঙ্গ, Zebra, Leisure প্রভৃতি শব্দ আমরা পুনঃপুনঃ ব্যবহার করিয়া থাকি। এই কয়েকটিই মিশ্রধ্বনি বলিয়া বোধ হয়। ফ'এ ব ফলা দিয়া দ্রুত উচ্চারণ করিলে E উচ্চারিত হয়। হিন্দুস্থানীরা F স্থানে ফর নীচে একটা বিন্দু দিয়া থাকেন। বাঙ্গলায়ও সেই চিহ্নই প্রচলিত হওয়া উচিত। সেইরূপে ভ এ ব ফলা দিলে অন্তঃস্থ বকারের সহিত হ যুক্ত হইলে V উচ্চারিত হয়। দেবনাগরের

দন্ত্যোষ্ঠ ব বাঙ্গলায় গৃহীত হইলে তাহার নীচে একটা বিন্দু দিয়া V ধ্বনি প্রকাশ করা যাইতে পারে। নতুবা ভ এর নীচে বিন্দু দিয়াও সেই কার্য্য হয়। অন্তঃস্থ ব এবং V র উচ্চারণ এক নহে। V মহাপ্রাণ কিন্তু ব অল্পপ্রাণ। হিন্দুস্থানীরা কিন্তু অপরিবর্ত্তিত ব দ্বারাই V জ্ঞাপন করেন। Z সম্বন্ধে গ্রীক-বৈয়াকরণেরা বলেন যে, দন্ত্য স র সহিত দ যুক্ত হইলে এই ধ্বনি উৎপন্ন হয়। আমার বোধ হয় দন্ত্যস র সহিত যে কোন বর্গের তৃতীয় বর্ণ যুক্ত হইলে Zএর উচ্চারণ হয়। সুতরাং দন্ত্যসকারের নীচে বিন্দু দিয়া Z প্রকাশ করাই সমীচীন। কিন্তু Zএর সহিত যখন বর্গীয় জকারের উচ্চারণের অনেক সাদৃশ্য আছে এবং যখন হিন্দীতে জকারের নিম্নে বিন্দু দিয়াই Zএর ধ্বনি প্রকাশ করা হয় তখন আমাদেরও তাহাই করা কর্ত্তব্য। Z H ধ্বনিসম্বন্ধে আমার বোধ হয় যে, মূর্দ্ধণ্য ষকারের সহিত যে কোন বর্গের তৃতীয় বর্ণ অথবা ব যোগ করিলে মূর্দ্ধণ্য Z H রূপে উচ্চারিত হয়। সুতরাং মূর্দ্ধণ্য ষকারের নীচে বিন্দু দিয়াই এই ধ্বনি প্রকাশ করা উচিত।

এখন সাধারণতঃ বানান-সম্বন্ধে কয়েকটা কথা বলিতে ইচ্ছা করি। অনেকের মত এই যে, সমস্ত শব্দের বানান আমাদের উচ্চারণানুযায়ী হওয়া উচিত। ইহাতে আমারও অমত নাই। বানানের পরিবর্ত্তনে যদি অর্থ-বোধের ব্যাঘাত না হয়, যদি প্রতিবেশীগণের উপহাসাস্পদ হইতে না হয়, যদি শ্রম ও সময়ের লাঘব হয় এবং যদি নব প্রবর্ত্তিত বানান ঠিক উচ্চারণ প্রকাশ করে, তাহা হইলে যে সকল শব্দের উচ্চারণ সমগ্র বঙ্গদেশে এক সেই সকল শব্দের বানান উচ্চারণানুযায়ী করাই উচিত। অনেক বাঙ্গলা শব্দের বানান বহুদিন হইতে এইরূপ উচ্চাচরণানুসারে লিখিত হইয়া থাকে। হিন্দীতে উনসত্তর, একাত্তর, বাহাত্তর, তিয়াত্তর প্রভৃতি শব্দ উন্‌হত্তর, একহত্তর, বাহাত্তর, তিহত্তর প্রভৃতি রূপে উচ্চারিত ও লিখিত

হয়। এই সকল শব্দের শেষার্দ্ধ হত্তর, সত্তর শব্দের রূপান্তর, সত্তরের স স্থলে হ হইয়া গিয়াছে। বাঙ্গলায় কেবল বাহাত্তর শব্দে হ আছে কিন্তু অন্য গুলিতে হকার মহাপ্রাণতা হারাইয়া আকারে পরিণত হইয়াছে। কি "হ" কি "আ" উভয়েই সকারের উচ্চারণস্থানীয়। যদি কোন শব্দের বানান পরিবর্ত্তন করিতে হয়, তাহাহইলে এইরূপ পরিবর্ত্তনই হওয়া উচিত। ইহাতে অর্থবোধের ব্যাঘাত নাই, লিখিবার অসুবিধা নাই। পরিবর্ত্তনও ঠিক উচ্চারণানুযায়ী। কিন্তু বড়কে ওকারান্ত করিয়া লিখিলে আমাদের সেরূপ সুবিধা হয় না। তাহাতে অর্থবোধের ব্যাঘাত হয়না বটে কিন্তু শেষবর্ণে ওকার যোজনা করিতে সময় ও শ্রমের প্রয়োজন। তাহার পর যে ওকারটার প্রবর্ত্তন করা হইয়াছে তাহারই কি প্রকৃত উচ্চারণ হয়? কখনই হয় না। ওকার একটি দীর্ঘস্বর। বাঙ্গলায় যে হ্রস্ব-ওকারের ধ্বনি আছে তাহা ওকারের বিকৃত হ্রস্ব-উচ্চারণ। বড় শব্দে ওকারের যে ধ্বনি আছে, তাহা ওকারের সেই বিকৃত হ্রস্ব উচ্চারণ। যদি স্বাভাবিক ত্যাগ করিয়া নব-প্রবর্ত্তিত বানানের অক্ষরের বিকৃত উচ্চারণই গ্রহণ করিতে হয় তাহা হইলে পুরাতন বানানের অক্ষরের বিকৃত উচ্চারণ থাকাই ভাল। বড় শব্দের শেষ আকারের যে ওকারবৎ বিকৃত ধ্বনি আছে তাহা অশ্ব, কল্য, হই, গরু প্রভৃতি শত-সহস্র শব্দে আছে ইহা আমি পূর্ব্বে প্রদর্শন করিয়াছি।

আর একটা নব প্রবর্ত্তিত বানানের কথা বলিতেছি। প্রবাসী ও ভারতী পত্রিকায় দেখিতে পাই কেহ কেহ "কি" শব্দটা দীর্ঘ-ঈকার দিয়া লেখেন। কিন্তু আমি উপরে দেখাইয়াছি যে ঝি, ঘি, ছি, স্থির, তিন প্রভৃতি সমস্ত একস্বরবিশিষ্ট শব্দের হ্রস্ব ই দীর্ঘ ঈ রূপে উচ্চারিত হয়। যদি "কি" কে দীর্ঘ ঈ দিয়া লিখিতে হয় তাহা হইলে সেই সমস্ত শব্দই দীর্ঘঈকার দিয়া লেখা উচিত।

তাহার পর যে সকল শব্দ সংস্কৃত বা সংস্কৃতমূলক সেগুলিকে আমাদের বিকৃত উচ্চারণানুযায়ী বানান করিলে বিষম গোলযোগ হইবে। দন্ত্য "স" যুক্ত সকল শব্দের অর্থ সমস্ত, তালব্য শ যুক্ত সকলের অর্থ খণ্ড। দন্ত্য স যুক্ত সুর শব্দের অর্থ দেবতা, তালব্যশ যুক্ত শূর শব্দের অর্থ বীর। এই শব্দগুলির একই বানান হওয়া কোনমতেই বাঞ্ছনীয় নহে। আমরা দন্ত্য সকে তালব্যশ রূপে উচ্চারণ করি বলিয়া যদি আমরা আমাদের জাতিকে তালব্য শ দিয়া শ্বজাতি লিখি অথবা Self reliance এর বাঙ্গলা যদি তালব্য শ দিয়া শ্বাবলম্বন লিখি তাহা হইলে আমরা কেবল আমাদের প্রতিবেশী অন্য ভারতবাসীর নহে কিন্তু আমাদের নিজেদের চক্ষেও বড় কৃপার পাত্র হইব।

সুতরাং সংস্কৃত শব্দের বানান কোনমতেই পরিবর্ত্তন করা উচিত নহে। বরং আমাদের উচ্চারণেরই যথাসম্ভব সংশোধন করিতে চেষ্টা করা উচিত। বর্ত্তমান সময়ের কোন বাঙ্গালীরই settled fact এর দোহাই দিয়া এই প্রস্তাবটি উঠাইয়া দেওয়া উচিত নহে।

তাহাহইলে বাকী রহিল খাঁটি বাঙ্গলা শব্দ। সেগুলির বানান যেখানে সম্ভব সেখানে উচ্চারণানুযায়ী করা উচিত। সেইজন্য আমি বাওয়া, খাওয়া, সোডাওয়াটার, ষ্টেশন, সেক্সপিয়ার প্রভৃতি শব্দের অশুদ্ধ বানানের সংশোধনের প্রস্তাব করিয়াছি।

বাঙ্গলাভাষার শুদ্ধাশুদ্ধতা।

বানান ব্যতীত অন্য কারণেও ভাষা শুদ্ধ বা দোষযুক্ত হয়। এখন তৎসম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলিব। ইংরেজেরা নিজের ভাষা কত সাবধান হইয়াই বলেন ও লেখেন। তথাপি যদি কোন লেখক অসাবধানে বা অজ্ঞানতাহেতু কোন অশুদ্ধ শব্দ প্রয়োগ করেন তাহা হইলে অবিলম্বেই

তাহার সমালোচনা হয়। বাঙ্গলায় সেরূপ সমালোচনা প্রায়ই হয় না
কত শব্দের ভ্রান্ত প্রয়োগ চলিয়া যাইতেছে। বিদ্বান্ ব্যক্তিদিগের ভু
যদি ধরিয়া দেওয়া না যায় তাহা হইলে অল্পশিক্ষিত লোকে সেই ভুলে
শুদ্ধ ভাবিয়া তাহার অনুকরণ করে। সুতরাং ভাষার বিশুদ্ধতা ও পবিত্রত
নষ্ট হয়। বাক্‌শুদ্ধি পণ্ডিতদিগকে পূত ও বিভূষিত করে। একজ
পাদ্রী সমস্ত সপ্তাহ পরিশ্রম করিয়া রবিবারের উপদেশ (Sermon)
প্রস্তুত করেন। তাঁহারা উপদেশকালে এবং ব্যারিষ্টারেরা আদালতে
বক্তৃতা করিবার সময়ে যেরূপ উচ্চারণ করেন তাহাই অপর সাধারণের
আদর্শ হয়। পূর্ব্বে কোন বানানের পরিবর্ত্তন যত দিন Times পত্রিকা
স্বীকার না করিতেন ততদিন সাধারণকর্ত্তৃক তাহা গৃহীত হইত না। এখনও
Times এর সেই প্রাধান্য আছে কিনা জানি না। কিন্তু Times
পত্রিকাও হঠাৎ কোন একটা বানানের পরিবর্ত্তন করিলে তাহারও
প্রতিবাদ হইত। আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরাও ভাষাবিষয়ে বড় সাবধান
ছিলেন। দেবস্থানে যাইবার সময়ে চিত্তশুদ্ধির সহিত শরীর, বস্ত্র এবং
বাক্‌শুদ্ধিও আবশ্যক মনে করিতেন। এই জন্য স্নান করিয়া, শুদ্ধবস্ত্র
পরিধান করিয়া সংস্কৃতস্তোত্র পাঠ করিতেন। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে
আমরা এমনই ভাবুকতা বিবর্জ্জিত হইয়াছি যে, আমরা উপাসনা-গৃহে
যাইবার সময়ে বস্ত্র-পরিবর্ত্তন করা আবশ্যক মনে করি না। যাহা পরিয়া-
ছিলাম তাহাই পরিয়া যাই। এবং না ভাবিয়া চিন্তিয়া যাহা মুখে আসে
তাহাই বলি। তাহা বিশুদ্ধ কি অশুদ্ধ একবারও মনে ভাবি না। এখন-
কার কোন আচার্য্যই উপাসনা-বেদী হইতে সাধুভাষায় বক্তৃতা প্রদান
করেন না। অন্যের কথা দূরে থাকুক দেশের সর্ব্বপ্রধান কবি ও চিন্তাশীল
শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়কেও প্রার্থনার সময়ে বাস্তবিক অর্থে
"সত্যকার" এই স্ত্রৈণ এবং অশুদ্ধ শব্দটা বলিতে শুনিয়াছি। কলিকাতা-

অঞ্চলের স্ত্রীলোকেরা বাস্তবিক এই অর্থে "সত্তিকার" বলিয়া থাকেন। রবীন্দ্রবাবু সেই অদ্ভুত শব্দটাকে একটা সংস্কৃত আকার দিয়া পুনঃ পুনঃ ব্যবহার করিয়া থাকেন।

অন্যান্য লেখকের আরও দুই-চারিটা ভ্রান্ত-প্রয়োগ দেখাইতেছি।

কয়েকস্থানে "কায়াদান" "কায়াধাবণ" প্রভৃতি কথা পড়িয়াছি ও শুনিয়াছি। কিন্তু এই কথাগুলি অশুদ্ধ। সংস্কৃতে কায়া নামে কোন শব্দ নাই। কায়মনোবাক্য, কায়েন মনসাবাচা, কায়ক্লেশ প্রভৃতি কথা হইতে আমরা জানি যে কায় শব্দ সংস্কৃতে অকারান্ত। সংস্কৃত অকারান্ত বহু শব্দ বাঙ্গলায় আকারান্ত হইয়া যায়, যথা গল স্থলে গলা, স্বর্ণ স্থলে সোনা, রৌপ্য স্থলে রূপা ইত্যাদি। কায়া শব্দও সেইরূপে কায় হইতে হইয়াছে। কিন্তু এই সকল বাঙ্গলা শব্দ সংস্কৃতের সহিত মিলিয়া সমাস হইতে পারে না। সংস্কৃতে-সংস্কৃতে সমাস হয়, বাঙ্গালায় বাঙ্গালায়ও হইতে পারে। কিন্তু সংস্কৃতে বাঙ্গলায় হয় না। যেমন সোনালঙ্কার, রূপাপাত্র, গলাদেশ হয় না কিন্তু স্বর্ণালঙ্কার, রৌপ্যপাত্র, গলাধাক্কা হয়। সেইরূপ কায়াধারণ বা কায়াদান হইতে পারে না।

চওড়া বা আয়ত অর্থে প্রশস্ত শব্দের ভ্রান্ত-ব্যবহার হইতে বঙ্গদেশের অনেক পণ্ডিত ব্যক্তিও অব্যাহতি পান নাই।

এক পত্রিকায় এক প্রবন্ধলেখক কোন বনদেশ সুগন্ধে মুখরিত হওয়ার কথা লিখিয়াছিলেন। সুগন্ধে সুশ্রাব্য ও সুরঞ্জিত লিখিলে আরও ভাল হইত।

ভারতবর্ষের দক্ষিণভাগকে দাক্ষিণাত্য বলা বাঙ্গালীদিগের একটা রোগ হইয়াছে। সেই দেশের সংস্কৃত নাম দক্ষিণ এবং দক্ষিণাপথ। দক্ষিণদেশে বা দক্ষিণদিকে যাহা জন্মে তাহাই দাক্ষিণাত্য। দাক্ষিণত্য ব্রাহ্মণ, দাক্ষিণাত্য আচার-ব্যবহার হইতে পারে কিন্তু দাক্ষিণাত্যদেশ হইতে পারে না।

দেশকে দাক্ষিণাত্যও বলা যাইতে পারে না। হরিভট্ট শাস্ত্রী মানিকর নামক একটি মহারাষ্ট্রীয় পণ্ডিত ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে আমাকে এই ভুলটি বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। তারিণীচরণ চট্টোপাধ্যায় তাঁহার প্রণীত ভূগোলে এই ভুলের প্রথম প্রবর্ত্তন করেন। তাহা হইতেই ইহার সার্ব্বভৌম বিস্তার হইয়াছে। যদি দক্ষিণদেশকে দাক্ষিণাত্য বলা যায় তাহা হইলে এই দেশকে অত্রত্য এবং সেই দেশকে তত্রত্য বলা যাইতে পারে। আমরা যদি অত্রত্য হইতে দাক্ষিণাত্যে গিয়া এবং তত্রত্য হইতে পাশ্চাত্য, পৌলস্ত্য এবং প্রাচ্য ঘুরিয়া আবার অত্রত্যে ফিরিয়া আসি, তাহা হইলে পৃথিবীর গোলত্ব প্রমাণিত হইতে পারে বটে কিন্তু শব্দগুলির ভ্রান্ত-প্রয়োগের দোষ ক্ষালিত হয় না।

যথেষ্ট শব্দের অর্থ যত প্রয়োজন। কিন্তু এই শব্দটা বহু পরিমাণ অর্থে ব্যবহৃত হইতে দেখিতে পাই।

সমর্থ অর্থে সক্ষম শব্দের ব্যবহার এক অদ্ভুত কার্য্য। ব্রাহ্ম-সমাজের একজন প্রচারককে আবার ইহার উপর অক্ষম অর্থে অসক্ষম বলিতে শুনিয়াছি।

স্বর্গগত বা পরলোকগত অর্থে স্বর্গীয় শব্দের ব্যবহারও দুষ্ট-প্রয়োগ।

সাধুভাষা ও চলিত ভাষা।

যাহা হউক এ সকল অকিঞ্চিৎকর বিষয়। বাঙ্গলা ভাষা,সম্বন্ধে প্রধান কথা এই যে, ভদ্র ও শিক্ষিত লোক সাধুভাষায় অর্থাৎ যে ভাষায় পুস্তক, পত্র, পত্রিকা এবং সংবাদপত্র সাধারণতঃ লিখিত হয় সেই ভাষায় কথা কহেন না। আর কোন সভ্যদেশেই বোধ হয় এরূপ নহে। হিন্দী ও উর্দ্দু ভাষা-ভাষী শিক্ষিত ব্যক্তিগণ পরস্পরের সহিত কথোপকথনের সময়ে বাক্‌শুদ্ধি-বিষয়ে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করেন। ধর্ম্মালয়ে এবং আদা-

লতের ভাষার ত কথাই নাই ইংরেজেরাও ঠিক সেইরূপ করেন। জর্ম্মানিতে লিখিত ও কথিত ভাষার প্রভেদ ছিল ; এখন সকল ভদ্রলোকেই কথাবার্ত্তায় লিখিত ভাষা অবলম্বন করিয়াছেন বলিয়া শুনিয়াছি। কিন্তু আমাদের দেশে অন্য স্থানের কথা দূরে থাকুক ধর্ম্মালয়েও সাধুভাষা শ্রুত হয় না। সাধুভাষা কথোপকথনে প্রচলিত হওয়া উচিত কি চলিত ভাষা লেখায় প্রচলিত হওয়া উচিত এ প্রশ্ন অনেকের মনেই উদিত হইয়াছে। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র হইতে আরম্ভ করিয়া এ পর্য্যন্ত আমি এ বিষয়ে যত লোকের সমালোচনা পাঠ করিয়াছি তাঁহারা কেহই ভাষা সম্বন্ধে সর্ব্বপ্রধান বিষয় লইয়া আলোচনা করেন নাই। সকলেই বস্তুর নাম-বিষয়ে যথাচলিত ভাষায় পুষ্করিণী বলা হইবে, না লিখিত ভাষায় পুকুর লেখা হইবে ইহা লইয়া বিচার করিয়াছেন। কিন্তু আমার বিবেচনায় বস্তুর নামের উপর ভাষা নির্ভর করে না। একটা অশ্ব কৃষ্ণবর্ণ হউক বা শ্বেতবর্ণ হউক, স্থূল হউক বা কৃশ হউক, বলিষ্ঠ হউক বা দুর্ব্বল হউক অশ্বই থাকে। সুতরাং অশ্বে এমন কোন অপবিবর্ত্তনীয় বস্তু আছে যাহার উপর অশ্বত্ব নির্ভর করে। সেই অপরিবর্ত্তনীয় বস্তু অশ্বের কঙ্কাল। সেইরূপ প্রত্যেক শ্রেণীর জীবেরই ভিন্নরূপ কঙ্কাল আছে। প্রত্যেক ভাষায়ও সেইরূপ কঙ্কাল আছে যাহা পরিবর্ত্তিত হইতে পারে না। ইহা কয়েকটি দৃষ্টান্ত দ্বারা প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিব। জিঅগ্রাফি, ফিলসফি, প্রভৃতি গ্রীক্ শব্দ আরবী ও পারসী ভাষায় গৃহীত হইয়াছে। হোরা, কেন্দ্র, জামিত্র প্রভৃতি গ্রীক-শব্দ, ঘোটক, ঘট, গঠন, প্রভৃতি দ্রাবিড়-শব্দ ; আরবী হইতে দ্রেক্কাণ শব্দ, Venice হইতে বণিজ বা বণিক্ শব্দ, Phoenicia হইতে পণ্য শব্দ সংস্কৃতে প্রবেশলাভ করিয়াছে ! লণ্ঠন, রেল, দলীল, বিছানা, আদালত প্রভৃতি শত শত ইংরেজী ও পারসী শব্দ বাঙ্গলায় ব্যবহৃত হইতেছে। কিন্তু তাহাতে আরবী, পারসী, সংস্কৃত ও বাঙ্গলা ভাষার বিশেষত্ব কিছুমাত্র নষ্ট

হয় নাই। লাটিন, গ্রীক, সেকসন, আরবী, সংস্কৃত এবং অন্য বহুভাষা হইতে বহু শব্দ পরিবর্ত্তিত বা অপরিবর্ত্তিতভাবে ইংরেজী ভাষায় প্রচলিত আছে। কিন্তু ইংরেজী ভাষা যাহা ছিল তাহাই আছে ও থাকিবে। যে সকল বাঙ্গালী ইংরেজী জানেন তাঁহারা বাঙ্গলা বলিবার সময়ে অনেক ইংরেজী শব্দের ব্যবহার করিয়া থা'কন। কিন্তু সেই মিশ্রভাষার প্রত্যেক পদই ইংরেজীতে পরিবর্ত্তনীয় নহে। "তিনি আমাকে মারিয়াছেন" এই বাক্যটি মিশ্র-ভাষায় প্রকাশ করা যাইতে পারে না। "তোমার ভাই কলিকাতায় গিয়াছেন" ইহার মিশ্র বাঙ্গলা হয়, "তোমার brother Calcuttaয় গিয়াছেন।" এইরূপ বহু দৃষ্টান্তে আমরা দেখিতে পাই যে, মিশ্র-ভাষায় প্রধানতঃ সর্ব্বনাম ও ক্রিয়াপদের পরিবর্ত্তন হইতে পারে না। প্রধানতঃ নাম ও বিশেষণই ইংরেজীতে পরিবর্ত্তিত হইতে পারে। ইহা যে কোন বাঙ্গলা-ভাষার বিশেষত্ব তাহা নহে। প্রত্যেক ভাষারই ক্রিয়াপদ সর্ব্বনামযোজক-বিভক্তি প্রত্যয় প্রভৃতি লইয়া কঙ্কাল প্রস্তুত হয়, অর্থাৎ প্রত্যেক ভাষাই ব্যাকরণের উপর নির্ভর করে। ম্যাক্স্-মুলর বলেন, "It matters not how many words may be derived in common from another language. It does not prove the identity of any two diabcts. It is the grammer wre must look to, to decide their identity." সুতরাং যদি বস্তুর ভিন্নদেশীয় নামই বাঙ্গলায় প্রচলিত হইতে পারিল, তখন প্রাদেশিক ভিন্ন ভিন্ন নামও কখন কখন সাহিত্যে ব্যবহৃত হইতে পারে। অনেকে হয়ত "destroy করা" "prove করা" প্রভৃতি দেখিয়া বা শুনিয়া হঠাৎ ভাবিতে পারেন যে, ইংরেজী ক্রিয়াপদও মিশ্র-বাঙ্গলায় ব্যবহৃত হয়। কিন্তু কিঞ্চিৎ মনোযোগ করিয়া দেখিলেই বুঝা যাইবে, এইরূপ কথাগুলি ইংরেজী ক্রিয়া-জ্ঞাপক শব্দকে বাঙ্গলার ছাঁচে ঢালিয়া প্রস্তুত করা হইয়াছে। ইংরেজী ক্রিয়াপদ বাঙ্গলায় এবং

বাঙ্গলা ক্রিয়াপদ ইংরেজীতে অপরিবর্ত্তিতভাবে কখনই ব্যবহৃত হইতে পারে না।

সর্ব্বনামের নানা আকার বাঙ্গলায় প্রচলিত আছে। যথা তিনি, তেও, তানি, তাঁহারা, তাঁরা, তানরা, তিনিরা, তেনরা, তাঁহাকে, তাঁকে, তিনিকে, তাক, তেঁওক, তাঁহার, তাঁর, তিনির, তেনার, তেওর, তাহাদের, তাঁহাদিগের, তাদের, তানাদের, তেনরায়, তিনিরার। উত্তম পুরুষ এবং মধ্যম পুরুষের সর্ব্বনামেও সেই প্রকার নানারূপ আছে। এই সমস্ত রূপের মধ্যে তাহাদের সাহিত্যিকরূপ বহুদিন হইল স্থির হইয়া গিয়াছে। আইডিয়াল না হইলেও শিক্ষিত ভদ্রলোক কথা কহিবার সময়েও সেইরূপ ব্যবহার করিয়া থাকেন। কেবল কথোপকথনে আমাদিগের, তোমাদিগের, তাঁহাদের, তাঁহাদিগের প্রভৃতি এবং বাঢের আমাদিগকে, তোমাদিগকে প্রভৃতি শুনিয়াছি বলিয়া মনে হইতেছে না।

ক্রিয়াপদেরও সাহিত্যিক আকার স্থির হইয়া গিয়াছে। কিন্তু অনেক লেখকের লেখায় বোধ হয় যে, তাঁহারা সে আকার ভাঙ্গিয়া ক্রিয়াপদগুলির নূতন আকার দিতে চাহেন। এইরূপ করা উচিত কিনা, তাহা আলোচনা করিবার পূর্ব্বে এক একটা ক্রিয়াপদের কত প্রকার রূপ বঙ্গদেশে প্রচলিত আছে, তাহার কয়েকটা দৃষ্টান্ত দিতেছি। সাহিত্যিক খাইলাম পদের প্রাদেশিক প্রতিশব্দ খেলাম, খেলেম, খা'লেম, খালাম, খেলোম, খেনুম, খেনু, খালি, খালু। সাহিত্যিক খাইব পদের প্রাদেশিক প্রতিশব্দ খাব, খাবো, খামু, খাইতাম, খাম। সাহিত্যিক খাইতাম পদের প্রাদেশিক প্রতিশব্দ খেতাম, খেতেম, খেতুম, খালু হয়, খালুহেতেন। সাহিত্যিক খাইতেছি পদের প্রাদেশিক প্রতিশব্দ খেতেছি, খাচ্চি, খা'তেছি, খাইআছুঁ। এইরূপে প্রত্যেক ধাতুরই প্রত্যেক কালে এবং প্রত্যেক পুরুষে নানাপ্রকার রূপ হইয়া থাকে। এখন সমস্যা

এই যে, দেশে এই জন-শিক্ষার আরম্ভ সময় হইতে ক্রিয়াপদের প্রাদেশিক কোন একরূপ লিখিত ভাষায় এবং কথোপকথনে ব্যবহৃত হইবে, না সাধু ভাষার রূপেরই সর্ব্বত্র প্রচলন হইবে? প্রত্যেক প্রদেশের লোক সেই প্রদেশের চলিত ভাষায় কথা কহিবেন বা লিখিবেন এরূপ মত প্রকাশ করিতে বোধ হয় কেহই সাহস করিবেন না। কেননা সেরূপ হইলে এক প্রদেশের লোক অন্য প্রদেশের লোকের ভাষা বুঝিতেই পারিবেন না। কেবল ইহাই নহে, তাহা হইলে ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের মধ্যে সামান্য সদ্ভাবও স্থাপিত হইবে না। যদি বলা যায় যে, কেবল কলিকাতার প্রচলিত প্রাদেশিক ভাষাই সকলের ব্যবহার করা উচিত, কেননা কলিকাতাই বঙ্গদেশের রাজধানী। তাহা হইলে সকলেরই স্মরণ করা উচিত যে, এখন বঙ্গদেশে দুইটি রাজধানী হইয়াছে। একটি কলিকাতা, একটি ঢাকা। তবে কি বঙ্গদেশে দুইটা ভাষার প্রচলন হওয়া উচিত? কখনই নহে। বিশেষতঃ কলিকাতার ভাষা চট্টগ্রাম, ঢাকা, রঙ্গপুর, রাজশাহী প্রভৃতি দূরবর্ত্তী স্থানের কথা দূরে থাকুক, নিকটবর্ত্তী বর্দ্ধমান বীরভূমের লোকেও আয়ত্ত করিতে পারে না। আর একটা কথা এই যে, এক প্রদেশের বস্তুরই আদর হইবে, অন্য প্রদেশের বস্তু বাজারে বিকাইবে না, তাহাই বা অন্য স্থানের লোকে পছন্দ করিবে কেন? এরূপ অসন্তোষ ও ঈর্ষ্যা অস্বাভাবিক নহে। সুতরাং কলিকাতার ভাষা সাহিত্যে প্রচলনের প্রস্তাব সাধারণতঃ কেবল যে গ্রাহ্য হইবে না এরূপ নহে; যাঁহারা আন্তরিক ভাবে এই প্রস্তাব করিবেন তাঁহারা নূতনরূপে বঙ্গ-বিভাগের উদ্যোগ করিতেছেন বলিয়া দেশের শত্রুরূপে পরিগণিত হইবেন। ইহা ভিন্ন তাঁহাদের আরও কয়েকটি বিষয় বিবেচনা করা উচিত। ভাষার প্রধান উদ্দেশ্যই মনোভাব ব্যক্ত করা। তাহা যত অল্প কথায় হয় তাহাই ভাল। এই হিসাবে খাইতেছি ও খাইলাম অপেক্ষা

খাচ্চি ও খেলুম ভাল। কেননা প্রথম দুইটি শব্দে যথাক্রমে চারিটা ও তিনটা স্বর, শেষ দুই শব্দের প্রত্যেক টাতেই দুইটা স্বর, এবং সেজন্য শেষ দুইটি উচ্চারণ করিতে অল্প সময় ব্যয়িত হয়। "উদ্দেশ্য সিদ্ধি যদি অল্প ব্যয়ে হয়, তাহা হইলে সে জন্য অধিক ব্যয় করা নির্ব্বুদ্ধিতা, তাহা অর্থব্যয়ই হউক আর সময়-ব্যয়ই হউক। কিন্তু মনুষ্যের কোন উদ্দেশ্যই অমিশ্র নহে— অমিশ্র হওয়া উচিতও নহে। শীতাতপ হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য আচ্ছাদনের প্রয়োজন হয়। কেবলমাত্র সেই প্রয়োজন পশু চর্ম্মদ্বারা, অগ্নিদ্বারা, শীতল জল দ্বারা এবং আরও নানা উপায়ে সাধিত হইতে পারে। ব্যয়কুণ্ঠ কৃপণেরা করিয়াও থাকে তাহাই। কিন্তু সমস্ত মুখ্য উদ্দেশ্যের সহিতই অন্য বহুভাব মিশ্রিত থাকে - সৌন্দর্য্যের ভাব, সময় ও স্থানের উপযোগিতা, প্রতিবেশীগণের মতের প্রতি মর্য্যাদা। ভাষাতেও এ সকল বিষয়ের প্রতি উপেক্ষা করা কর্ত্তব্য নহে। তবে খাচ্চি ও খেলুম সুন্দর কি খাইতেছি ও খাইলাম সুন্দর ইহা কেহই যুক্তি দ্বারা প্রতিপন্ন করিতে পারে না। এদেশে ফ্রেঞ্চ-একাডেমির মত কোন সমিতি নাই, যাহার মতের প্রতি সকলেরই আস্থা হইতে পারে। তবে প্রণিধান করিতে হইবে যে খাচ্চি ও খেলুম এক প্রদেশের স্বভাবজাত শব্দ কিন্তু খাইতেছি ও খাইলাম কোন প্রদেশেরই কথা নহে। সকল প্রকার ক্রিয়াপদ উপেক্ষা করিয়া সমগ্র দেশের লোকের সম্মতিক্রমে যখন এইরূপ পদ সাহিত্যে ব্যবহৃত হইবে বলিয়া প্রস্তুত হইয়াছে তখন দেশের লোক এই গুলিকেই সুন্দর বলিয়া বিবেচনা করিয়াছেন। ইহা অপসিদ্ধান্ত নহে। সুতরাং সাহিত্যে ত ইহাদের ব্যবহার হইবেই অন্যান্য বিশিষ্ট কার্য্যেও হওয়া উচিত। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার দত্ত, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি মনীষীগণ চিরকাল সুন্দরের উপাসনা করিয়াছেন। তাঁহাদের যে ভাষা-বিষয়েও সৌন্দর্য্যবোধ ছিল তাহা বোধ হয় কেহই অস্বীকার করিবেন

না। তাঁহারা যখন এইরূপ ক্রিয়াপদ ব্যবহার করিয়াছেন তখনই বুঝিতে হইবে যে এই গুলিতেই অপেক্ষাকৃত অধিক সৌন্দর্য্য আছে। তাহার পর স্থান ও সময়ের উপযোগিতা। যে ভাষা হাটে-বাজারে ও ক্রীড়াস্থানে এবং আমোদপ্রমোদের সময়ে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, সাধুসঙ্গকালে, উপাসনা-গৃহে এবং সাহিত্যে যদি তাহাব অপেক্ষা ভালভাবা পৃথক্ করিয়া রাখিয়া দিতে পারি তবে তাহাই করা উচিত। যে পরিচ্ছদে নিমন্ত্রণ খাইতে যাই, নাচ দেখিতে যাই, সে পরিচ্ছদে রাজ-সন্দর্শন করিতে যাইবার চেষ্টা করিলেও বাধা পাইতে হয়। ইহাব পর প্রতিবেশীর মতের প্রতি মর্য্যাদার কথা। আমি যদি কেবল আমার নিজের সুখস্বচ্ছন্দতার প্রতি-দৃষ্টি রাখিয়া এমন একটা অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিতে প্রবৃত্ত হই যে, তাহাতে আমার প্রতিবেশীগণের বাতালোকের ও গমনাগমনের পথ রুদ্ধ হয়, তাহা হইলে যেমন আমার তদ্রূপ অট্টালিকা নির্ম্মাণ করা উচিত নহে সেইরূপ যে ভাষা আয়ত্ত করা কলিকাতা ব্যতীত অন্য স্থানের লোকের পক্ষে দুঃসাধ্য ও অসাধ্য, সাহিত্যে সেই ভাষাব প্রচলনের চেষ্টা করাও অন্যায়।

প্লেটো বলেন যে স্বর্গে একটা আইডিয়াল ত্রিকোণ ক্ষেত্র আছে, যাহা সমকোণও নহে, স্থূলকোণও নহে, সূক্ষ্মকোণও নহে; সমবাহুও নহে, সমদ্বিবাহুও নহে, অসমবাহুও নহে। খাইলাম ও খাইতেছি রূপের ক্রিয়া-পদ লইয়া আমাদের ভাষাটা সেইরূপ আইডিয়াল হইয়াছে। আইডিয়াল শব্দটা গ্রীক-ইহাব বাঙ্গালা প্রতিশব্দ জানি না। আদর্শ বলিলে হইতে পারে না। কেননা অনুকরণ করিবার জন্য যাহা সম্মুখে রাখা যায় তাহাই আদর্শ বা মডেল। এই আদর্শ আইডিয়াল নাও হইতে পারে। আইডিয়াল শব্দের অর্থ "যেরূপ হওয়া উচিত বলিয়া কল্পিত হইতে পারে সেইরূপ।"

বাঙ্গালী সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে থাকিতে চাহেন না। তাঁহার ভাষা সুতরাং প্রাদেশিক হইতে পারে না। কি আসামে, কি পঞ্চনদে, কি

ইংলণ্ডে, কি আমেরিকায়, বাঙ্গালী যেখানেই গিয়াছেন সেখানেই বিদ্যাবত্তা ও বুদ্ধিমত্তার জন্য প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছেন। বাঙ্গালীতে কিছু আই-ডিয়াল না থাকিলে তাঁহার সেরূপ প্রতিপত্তি কথনই হইত না। বাঙ্গালীর ভাষা বাঙ্গালীর চরিত্রের অনুরূপ। যে ভাষা রাঁচি হইতে চট্টগ্রাম পর্য্যন্ত ভূভাগে আধিপত্য স্থাপন করিতে চাহে তাহাকে অনেকটা আইডিয়াল হইতে হইবে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। বিহার প্রভৃতি অঞ্চলে এবং আসামে উচ্চারণানুযায়ী বানান হয় কিন্তু বাঙ্গালায় সেরূপ হয় না। ইহার কারণ এই যে, হিন্দী ও আসামী ভাষার বিস্তার লাভের ক্ষমতা অর্জ্জন করিবার প্রয়াস নাই কিন্তু বাঙ্গালার সেই প্রয়াস বিলক্ষণ আছে। এইজন্যই বাঙ্গালা ভাষা উচ্চারণানুরূপ বানান লিখিয়া এবং সাহিত্যে কোন প্রাদেশিক ভাষা অবলম্বন করিয়া সঙ্কীর্ণ হইতে পারে নাই।

ভাষায় কৃত্রিমতা।

• কিন্তু যে ভাষার প্রচলন কোন প্রদেশেই নাই তাহা কৃত্রিম ও অস্বাভাবিক বলিয়া আপত্তি ও আশঙ্কা হইতে পারে। কিন্তু আশঙ্কার কোন কারণ নাই। একদিক দিয়া দেখিতে গেলে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে কোন কিছুই অস্বাভাবিক নাই। বাবুই যে নীড় নির্ম্মাণ করে, মধুমক্ষিকা যে চক্র নির্ম্মাণ করে, বীবর এবং শূকর যে গৃহ নির্ম্মাণ করে সেগুলিকে কেহ অস্বাভাবিক বলে না। কিন্তু মনুষ্য যে ইষ্টকালয় নির্ম্মাণ করে তাহা অস্বাভাবিক ও কৃত্রিম বলিয়া পরিগণিত হয়। বাবুই মধুমক্ষিকা, বীবর ও শূকর যে বুদ্ধিদ্বারা স্ব স্ব আবাস প্রস্তুত করে সে বুদ্ধিও যেমন স্বভাবলব্ধ মানুষ যে বুদ্ধিদ্বারা ইষ্টকালয় প্রস্তুত করে তাহাও তেমনই স্বভাবলব্ধ। সুতরাং মানুষ যাহা কিছু করে তাহাও স্বাভাবিক। কিন্তু তথাপি মানুষ বুদ্ধিদ্বারা যাহা করে তাহাকেই কৃত্রিম বা অস্বাভাবিক বলে। আমিও

সেই অর্থেই কৃত্রিমতা বা অস্বাভাবিকতা শব্দ ব্যবহার করিব। মনুষ্যের সভ্যতার নামান্তরই কৃত্রিমতা। আমরা বস্ত্র পরিধান করি, গৃহ নির্ম্মাণ করি, বিদ্যাশিক্ষা করি, ঔষধ প্রস্তুত করি, রেলে বা অশ্বারোহণে ভ্রমণ করি এ সমস্তই কৃত্রিম ও অস্বাভাবিক। এত কৃত্রিমতার মধ্যে আমাদের ভাষায় কিছু কৃত্রিমতা থাকিলে আশঙ্কার বিষয় নাই। কৃত্রিম বা অস্বাভাবিক বস্তু শীঘ্র বিনাশ প্রাপ্ত হয় একথাটা সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক। কৃত্রিমতা দ্বারাই স্বভাব জয় করা যায়। স্বাভাবিক বিনাশ হইতে রক্ষা পাইবার চেষ্টা করার নামই কৃত্রিমতা। স্বভাবের সৌন্দর্য্য রচনা করিবার ক্ষমতা নাই, স্বভাবের নীতিজ্ঞান নাই, স্বভাবের দয়ামায়া নাই, স্বভাবের শক্তি স্থিতিশীল এবং সীমাবদ্ধ।

বক্‌ল বলেন—The powers of nature, notwithstanding their apparent magnitude, are limited and stationary ; at all events, we have not the slightest proof that they have ever increased or that they will ever be able to increase. But the powers of man, so far experience and analogy can guide us, are unlimited : nor are we possessed of any evidence which authorises us to assign even an imaginary boundary at which the human intellect will of necessity be brought to a stand.

যে বাড়ীটা যত কৃত্রিমভাবে নির্ম্মিত হইয়াছে তাহাই তত অধিক দিন স্থায়ী হইবে। অধিক কৃত্রিমতাই তাজমহলের আদর ও স্থায়িত্বের কারণ। ভাষাবিষয়েও সেইরূপ, সংস্কৃতে কৃত্রিমতা প্রবেশ করান হইয়াছিল বলিয়াই উহার এখন মৃত্যু হয় নাই এবং এত সম্মান। সুতরাং বঙ্গের সমস্ত বিদ্বজ্জনের প্রতি আমার অনুরোধ এই যে, তাঁহারা সমবেত হইয়া আমাদের এই মাতৃভাষার সৌন্দর্য্য ও স্থায়িত্বের বৃদ্ধিকল্পে যত্নবান হউন।

বর্ত্তমান সময়ে বাঙ্গালার কঙ্কালের অন্যান্য ভাগ এক প্রকার দৃঢ় হইয়াছে। কেবল ভাষার মেরুদণ্ডস্বরূপ ক্রিয়াপদের রূপ লইয়া তর্ক উপস্থিত হইয়াছে, বিদ্বজ্জনেরা সেইটা ঠিক করিয়া দিউন। সকলে তাহা স্বীকার করিলেই শিক্ষা-বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে প্রাদেশিকত্ব অল্পে অল্পে দূর হইবে। ডারউইনের survival of the fittest নিয়মানুসারে কেবল যে সকল প্রাদেশিক শব্দ, সুন্দর, লঘু কলেবর ও কার্য্যকর তাহারাই থাকিয়া যাইবে ও সার্ব্বভৌম হইবে—তাহা তাহারা সংস্কৃতমূলকই হউক বা খাঁটি বাঙ্গলাই হউক। শ্রীযুক্ত ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সাধুভাষা বনাম চলিত ভাষা নামক সুরস এবং সুচিন্তিত উৎকৃষ্ট প্রবন্ধে কতকগুলি খাটি বাঙ্গলা শব্দের সংগ্রহ আছে। সেই শব্দ গুলির সৌন্দর্য্য মোটেই নাই বরং সে গুলিকে কুৎসিত শব্দ বলা যায়। সাহিত্যে এবং ভদ্রলোকের মুখে সেইরূপ শব্দের স্থান পাওয়া অনুচিত। এইরূপ সকল শব্দের একটা কোশ (কোষ) প্রস্তুত হইতেছে শুনিয়াছি। কিন্তু তাহাতে ফল কি? কুৎসিত কোন বস্তুকে স্থায়ীকরা উচিত নহে। ভবিষ্যতের প্রত্নতত্ত্বপ্রিয়-দিগের তাহাতে ক্ষণিক বৃথা আমোদ ভিন্ন আঁদর, জ্যাঁদড়, ব্যাদড়া, প্রভৃতি শব্দের অর্থ জানিলে সাধারণের কোন লাভ হইবে না। পূর্ব্বকালে গ্রীসদেশে কোন কারুকার্য্য বা কাব্য অসুন্দর হইলে তাহা সাধারণ্যে বাহির করিতে দেওয়া হইত না—একেবারে নষ্ট করা হইত। তাহার ফলে আমরা গ্রীস হইতে যাহা কিছু পাই তাহাই সৌন্দর্য্যে মণ্ডিত। ইংলণ্ডের মহারাজ্ঞী এলিজাবেথ একবার একখানা কদাকার তরবারি দেখিয়া আদেশ করিলেন যে তাঁহার রাজ্যমধ্যে সেইরূপ তরবারি যত আছে সমস্ত নষ্ট করিতে হইবে। কলির বিশ্বামিত্র কালিফর্ণিয়ার শ্রীযুক্ত লুথর বারবঙ্ক শত শত প্রকারের নূতন বৃক্ষ, ফল, পুষ্প সৃষ্টি করিতে করিতে যদি কুৎসিত একটা কিছু সৃষ্টি করিয়া ফেলেন তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ তাহা নষ্ট

করেন। এই সকল দৃষ্টান্ত, কি সাহিত্যে কি অন্য বিষয়ে আমাদের আদর্শ হওয়া উচিত। যদি আমরা নানা ব্যক্তির উত্তরাধিকারী হইয়া টাকা, মোহর, শাল, বনাত পাই তাহা হইলে আমাদের পূর্ব্বসঞ্চিত ছিন্ন-কন্থা, মলিন বস্ত্র ও কুটা কড়ির প্রতি কেন আদর করিব।

অন্যান্য কথা।

বাঙ্গলা-ভাষাসম্বন্ধে আর দুই একটা কথা বলিয়াই এই প্রবন্ধটির উপসংহার করিব। Linguistic Survey of British India নামক গ্রন্থের এক স্থানে লিখিত আছে—Bengalis themselves struggle vainly with a number of complex sounds which the disuse of centuries has rendered their vocal organ unable or too lazy to pronounce. The result is a number of half pronounced consonants, broken vowels not provided for by their alphabet amid which the unfortunate foreigner wanders without guide and for which his own larynx is so unsuited as is Bengali for the sounds of Sanskrit. বাঙ্গালীরা কিন্তু কোন ভাষা উচ্চারণ করিতে অক্ষম নহেন। কেবল আলস্যবশতই সংস্কৃত অশুদ্ধ-রূপে উচ্চারণ করেন। এখন যত স্থানে সংস্কৃত শিক্ষা দেওয়া হয় সর্ব্বত্রই সংস্কৃতের প্রকৃত উচ্চারণ শিক্ষা করিতে বাধ্য করা উচিত। তাহা হইলে কালে আমাদের বাঙ্গালার উচ্চারণ সংশোধিত হইতে পারে।

উল্লিখিত মহামূল্য ও অসাধারণ পুস্তকের আর একস্থানে লিখিত আছে Bengali is sent out to the world masqueraded in the clothes of her grandmother, Sanskrit. কিন্তু আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে বহুল সংস্কৃতপ্রয়োগে বাঙ্গলার গৌরব বাড়িয়াছে বই কমে নাই। তবে সুন্দর বাঙ্গলা শব্দ পাইলে সংস্কৃতের পরিবর্ত্তে তাহাই

ব্যবহার করা উচিত। কুল ও পেয়ারা প্রাদেশিক শব্দ হইলেও যখন সুশ্রাব্য ও সর্ব্বত্র প্রচলিত হইয়াছে তখন বদরী ও ববাহ ফল না লিখিয়া কুল ও পেয়ারা লেখাই উচিত।

মুষ্টিমেয় একদল লোকের ইচ্ছা যে দেবনাগর অক্ষরে বাঙ্গলা লিখিত হয়। সংসারে অমিশ্র ভাল কি মন্দ কিছুই নাই। দেবনাগর অক্ষরে বাঙ্গলা লিখিলে একমাত্র লাভ যে আমাদের ভাষা ভারতবর্ষের অন্য প্রদেশের লোক কিছু অনায়াসে শিখিতে পারেন। কিন্তু তাহাও সন্দেহ-স্থল। আসামী ও বাঙ্গলা একই বর্ণমালার সাহায্যে লিখিত হইয়া থাকে কিন্তু বাঙ্গলাদেশে থাকিয়া অর্থাৎ আসামে না গিয়া কয়জন বাঙ্গালী আসামী শিখিয়াছেন? শিক্ষিত বাঙ্গালীমাত্রেই এখন দেবনাগর অক্ষর জানেন। অথচ সেই দেবনাগরের লিখিত হিন্দী ভাষা কয়জন বাঙ্গালী শিখিয়াছেন? অন্যপক্ষে বাঙ্গলা অক্ষর সাধারণতঃ ত্রিকোণ। সংস্কৃত অক্ষর চতুষ্কোণ। ত্রিকোণ অঙ্কিত করিতে অপেক্ষাকৃত অল্প সময় ও শ্রম লাগে। দেবনাগর অপেক্ষা বাঙ্গলার আয়তন অল্প। দেবনাগর অপেক্ষা বাঙ্গলা দেখিতেও সুশ্রী। আমরা উত্তরাধিকার-সূত্রে এই সুন্দর সম্পত্তি আমাদের পূর্ব্ব-পুরুষদিগের নিকট হইতে লাভ করিয়াছি। কত শত বৎসরের ইতিহাস ইহার সহিত সম্পৃক্ত হইয়া আছে। তান্ত্রিকগণ এই বর্ণমালাকে কত উচ্চে আসন দিয়াছেন। কেন আমরা এই অমূল্য পৈত্রিক-সম্পত্তি বিসর্জ্জন করিব? একজন ভূতপূর্ব্ব সিবিলিয়ান ইংলাণ্ড হইতে ১৯১০ খৃষ্টাব্দের নবেম্বর মাসের Indian World নামক পত্রিকায় লিখিয়াছেন The writer of the articls in the Modern Review proposes gravely to abandon the beautiful and clear Bengali script in favour of the greatly inferior Devanagri whose thick lines and minute differences between letters especially compound letters are extremely trying to the eye.

যে প্রবন্ধ হইতে উল্লিখিত অংশ উদ্ধৃত করিলাম তাহাতে বাঙ্গলা-ভাষা-সম্বন্ধে চিন্তা করিবার অনেক কথা আছে। যাহারা বাঙ্গলা ভাষায় আলোচনা করেন তাঁহাদের সকলেরই সেই প্রবন্ধ পাঠ করা উচিত। প্রবন্ধলেখক নিজের নাম প্রকাশ করেন নাই। কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, তিনি চট্টগ্রামের ভূতপূর্ব্ব কমিশনর শ্রীযুক্ত জে, ডি, এণ্ডরসন্। ইহাঁর বিদ্যা, বুদ্ধি, দয়া, দাক্ষিণ্য, বিনয়, সৌজন্য, আমোদপ্রিয়তা, নানা ভাষায় পাণ্ডিত্য বাঙ্গলা ভাষায় অসাধারণ অধিকার এবং বাঙ্গালীদিগের প্রতি সহানুভূতির জন্য পরিচিত বাঙ্গালীরা মুগ্ধ ছিলেন। কটনসাহেব ভিন্ন বাঙ্গালীদের প্রতি এরূপ সহানুভূতি আর কোন ইংরেজ প্রদর্শন করিয়াছেন কিনা আমি অবগত নহি। আমি প্রসঙ্গক্রমে তাঁহার সদাশয়তার কথা বলিতে পারিলাম বলিয়া ধন্য হইলাম মনে করি। তিনি এবং কটন সাহেব কতদিন এদেশ ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছেন কিন্তু এখনও এদেশের উপকার করিতে উভয়েই প্রস্তুত। সংপ্রতি তিনি নাম দিয়া ফেব্রুয়ারি ও মার্চের Modern Reviewতে বাঙ্গলা ভাষাসম্বন্ধে দুইটী প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। তাহা সমস্ত শিক্ষিত বাঙ্গালীর পাঠ করা উচিত।

১৯১০ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসের Modern Reviewতে প্রকাশিত এক প্রবন্ধে লিখিত হইয়াছিল যে বাঙ্গলাভাষাই কালে ভারতবর্ষের Lingua Franca হইবে। কিন্তু বাঙ্গলা যেরূপ নানা প্রকারে সীমাবদ্ধ, তাহাতে এই সুখস্বপ্ন যে কখনও সফল হইবে তাহা আমার বিশ্বাস হয় না।

উপসংহারে আপনারা ধীরভাবে আমার কথাগুলি শুনিলেন সেজন্য আপনাদিগকে শত সহস্র ধন্যবাদ। আমি নগণ্য ব্যক্তি। তবে সাহিত্যের সাধারণ তন্ত্রে কথা কহিবার অধিকার সকলেরই আছে বলিয়া আপনাদের সমক্ষে এত কথা বলিলাম। শ্রীবীরেশ্বর সেন।

কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

বাংলাদেশে "কালবৈশাখী" বলিয়া একটা আছে। কথটা সহরবাসী সুশিক্ষিত বাঙ্গালী পরিচিত না হইতেও পারে, কিন্তু পল্লাবাসিগণ কথাটা শুনিলে শিহরিয়া উঠেন। বাংলাদেশের অনেক পল্লীতেই বৈশাখ মাসের প্রারম্ভ হইতে কালধর্ম্মে ভীষণ ঝড় হইয়া থাকে। এই ঝড়ে বহু দরিদ্রের পর্ণকুটীর ধরাশয়ী হয় এবং অনেক বলবান্ মহীরূহের উন্নত কাণ্ড ধরণীর ধূলিতে লুটাইয়া পড়ে। কালধর্ম্মে ঝড় হয় বলিয়াই বোধহয় পল্লীবাসিগণ ইহাকে কাল-বৈশাখী নামে অভিহিত করিয়াছেন। কিন্তু নামটি যে সার্থক হইয়াছে তাহার আর কোনই সন্দেহ নাই। কেননা কালবৈশাখী মহাকালের অগ্রদূত হইয়াই সুজলা, সুফলা, শস্য-শ্যামলা বাংলার শান্তিময়ী পল্লীতে প্রবেশ করে। কালবৈশাখীর দৌরাত্ম্য প্রতিবৎসরই যে একরূপ হইবে এমন কথা বলিতেছি না; কিন্তু বর্ত্তমান বৎসর ইহার বিষদন্ত যেরূপ অনুভূত হইয়াছে ইতিপূর্ব্বে সেরূপ হইয়াছে কিনা বলিতে পারি না। ইহার দৌরাত্ম্যে বাংলা এবার গণিতবিদ গৌরাশঙ্করকে হারাইয়াছে, উদীয়মান চিকিৎসক গণেন্দ্রনাথকে হারাইয়াছে, ভিষগাচার্য্য দেবেন্দ্র সেনকে হারাইয়াছে, সাহিত্যিক সুবলচন্দ্রকে হারাইয়াছে, রাজনীতিক জানকীনাথকে হারাইয়াছে আর হারাইয়াছে বাঙ্গালীর আদরের মণি, বঙ্গনাট্য-সাহিত্যের সম্রাট কবিশ্রেষ্ঠ দ্বিজেন্দ্রলালকে। তাই আজ সমগ্র বঙ্গ শোকে ম্রিয়মান, বঙ্গভাষা পুত্রশোকাতুরা কাঙ্গালিনী, বঙ্গের বীণা স্তব্ধ, বঙ্গের "সুরধাম" নিরানন্দ। অর্দ্ধপথেই আজ সঙ্গীত থামিয়া গিয়াছে; যে বীণায়-রাজপুত বীরত্বের ভৈরবরাগ নিনাদিত হইয়া উঠিয়াছিল, সেই বীণার তার আজ ছিঁড়িয়া গিয়াছে। আর তাহাতে নিত্য

নব ঝঙ্কার উঠিবে না; আর তাহাতে স্বদেশের গৌরবগাথা উদ্‌গীত হইবে না।

"ভেঙ্গে গেছে আজ স্বপ্নের ঘোর, ছিঁড়ে গেছে আজ বীণার তার;
এ মহাশশ্মানে ভগ্ন পরাণে কে গান জননী গাহিবে আর?"

সব ফুরাইয়াছে; যাহা গিয়াছে আর তাহা ফিরিয়া আসিবে না। আর কেহ অমন করিয়া বঙ্গবাসীকে হাসিয়া হাসাইতে কাঁদিয়া কাঁদাইতে পারিবে না। আরত কেহ "যতেক ভণ্ড চণ্ডী নন্দ, ইত্যাদির দণ্ড দিবে না; আর কাহারো স্বচ্ছ মুকুরে Reformed Hindoos এর অবিকল চিত্র প্রতিফলিত হইবে না। আর কে সাহসে ভর করিয়া আমাদের চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া দিবে যে, অকর্ম্মণ্য অলসেরা আপনাদের সারহীনতা লোক-চক্ষুর অন্তরালে রাখিবার জন্য "বোঝাতে চান্ হিন্দুধর্ম্মের অতি সূক্ষ্ম মর্ম্ম, ভীরুতাটা আধ্যাত্মিক ও কুড়েমিটা ধর্ম্ম?" আরত কাহারো বীণার তারে অমন প্রাণ-মাতান স্বরে "আমার দেশ ও আমার জন্মভূমির" গান বাজিবে না। শাব্দ-কবির অভাব বঙ্গে নাই, সত্য, কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলালের ন্যায় যথার্থ কবি সমগ্র বাংলায় এক রবীন্দ্রনাথ ব্যতীত আর দ্বিতীয় কই? আজ সমগ্র বাংলায় যে শোকোচ্ছ্বাস উঠিয়াছে তাহা কেবলমাত্র লোক দেখাইবার জন্য নহে। অভাব অনুভূত না হইলে কেহ কখন কাঁদে না; আজ চারি কোটী বাঙ্গালী অন্তরের অন্তঃস্থলে যে একটি যথার্থ অভাব অনুভব করিতেছে তাহারই বাহ্যপ্রকাশ এই শোকোচ্ছ্বাসে।

আজ আমরা এখানে যাহার শোক-সভায় উপস্থিত হইয়াছি, তিনি কে ছিলেন এবং কি করিয়াছেন তাহা কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না। বাঙ্গলা দেশের এমন এক সময় ছিল যখন কোন এক ইংরাজিনবীশ বাঙ্গালী ঘটিরাম প্রকাশ্য সভায় গর্ব্ব করিয়া বলিয়াছিলেন "আমি বঙ্কিম বাবুর লেখার এক ছত্রও পড়ি নাই।" কিন্তু বঙ্গদেশে এমন কেহই নাই

যে, দ্বিজেন্দ্রলালের হাসির গান দুই একটা জানেন না। যতই ইংরাজিতে লায়েক হই না কেন, মজলিশে বসিয়া ইংরাজি হাসির গান গাহিয়া নিজেরা আনন্দলাভ করি অথবা বন্ধু-বান্ধবের মধ্যে হাসির ফোয়ারা খুলিয়া দেই, এত সাধ্য আমাদের নাই। হাসিবগান ছাড়াও কবি দ্বিজেন্দ্রলাল একখানি অতি সুন্দর ইংরাজি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন। যাহারা দুইপাতা ইংরাজি পড়িয়া সেক্ষপীয়র, বেকনের মামলার ডিক্রি ডিসমিস করেন, সেই সকল ময়ূরপুচ্ছধারী দাঁড়কাকগণ সেই ইংরাজি পুস্তক খানি হইতেও কবির সহিত পরিচিত হইতে পারেন। আর একটা কথা, কবি দ্বিজেন্দ্রলালের যশঃ-গৌরব, যে যুগে চতুর্দ্দিকে পরিব্যাপ্ত হইয়াছে সেটা স্বদেশী আন্দোলনের যুগ। এই তিনটি কারণে, ইংরাজিনবীশ ও খাটি বাংলানবীশ উভয় সম্প্রদায়েই, কবিবর দ্বিজেন্দ্রলালের আদর হইয়াছে। অতএব হেম, মধু, বঙ্কিম, নবীনের কাব্যামৃত পানে যাহারা বঞ্চিত তাঁহারাও যে দ্বিজেন্দ্রলালের দুই একটি গান অথবা দুই একখানি নাটক পাঠ করেন নাই এমন কথা বলিতে পারি না। "মহৎব্যক্তি সুপরিচিত হইলেও তাঁহার বিষয় আলোচনা করা অনুচিত নহে" এই নীতি-বাক্যের দোহাই দিয়া কবিবরের জীবনী ও গ্রন্থাবলী-সম্বন্ধে দুই চারিটি কথা বলিতে অগ্রসর হইলাম।

কবির কাব্যগুলিকে জানিয়া লাভ আছে সত্য কিন্তু কবিকে জানায় তদধিক লাভ আছে। কবির কাব্যগুলি বুঝিতে পারিলে আমরা ধন্য হই কিন্তু কবিকে না বুঝিয়া কবির কাব্য বুঝাইবার চেষ্টা প্রায়শঃই ফলোপধায়িনী হয় না। অতএব কাব্য বুঝিবার পূর্ব্বেই কবিকে বুঝিতে হইবে। আবার একথাও সত্য যে, কাব্যের ভিতরেই কবি আত্ম-প্রকাশ করেন। যেমন ব্রহ্মের সহিত ব্রহ্মাণ্ডের অঙ্গাঙ্গী-সম্বন্ধ, সেইরূপ কবির সহিত কাব্যেরও অঙ্গাঙ্গী-সম্বন্ধ। অতএব ফলকথা এই দাঁড়াইল যে,

কবি ও কাব্য উভয়কেই একত্র বুঝিবার চেষ্টা করিতে হইবে। বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা কবিকে তাঁহার কাব্য হইতে পৃথক করিয়া দেখাইবার চেষ্টা করিব না। কবি ও তাঁহার কাব্যকে একত্র দেখিবার চেষ্টা করিব। কাব্যের দিক হইতে দেখিতে গেলে কবির জীবনের দুই একটি ঘটনার বেশী আমাদের চোখে পড়িবে না।

কবিবর দ্বিজেন্দ্রলালের পিতা দেওয়ান কার্ত্তিকেয় চন্দ্ররায় মহাশয় একজন অতি বিখ্যাত ব্যক্তি ছিলেন। তিনি সংস্কৃত ভাষায় কৃষ্ণনগরে রাজবংশের ইতিহাস রচনা করিয়া যশস্বী হইয়াছেন। এই সুবিখ্যাত ইতিহাস-গ্রন্থ খানির নাম "ক্ষিতীশ-বংশাবলীচরিতং"। এতদ্ভিন্ন তিনি "গীত-মঞ্জরী" ও "আত্মজীবনচরিত" বাংলা ভাষায় রচনা করিয়া গিয়াছেন। তিনি এতদূর প্রতিষ্ঠাপন্ন ব্যক্তি ছিলেন যে, বঙ্গের ছোটলাট টমসন সাহেব তাঁহার সহিত দেখা করিবার জন্য একবার তাঁহার নিজ বাটিতে গিয়াছিলেন। কার্ত্তিকেয়চন্দ্র নানা গুণের আধার ছিলেন—কার্ত্তিকেয় চন্দ্র মিষ্টভাষী, সদালাপী, সত্যনিষ্ঠ এবং পরোপকারী—কার্ত্তিকেয়চন্দ্র যেমন চারুদর্শন তেমনি মধুর কণ্ঠ গায়ক ছিলেন। তৎকালীন বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির সহিত তিনি সৌহার্দ্দসূত্রে আবদ্ধ ছিলেন। তিনি যে আত্মজীবন-চরিত গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন, তাহাতে তদানীন্তন সমাজ-সংস্কারের অনেক কথা লিখিত আছে। এ সকলে তাঁহার চিন্তাশীলতা ছত্রে ছত্রে প্রতিভাত।*

---

* দীনবন্ধুর "সুরধুনী কাব্যে" জলাঙ্গী গঙ্গাকে বলিতেছেন :—

"কার্ত্তিকেয় চন্দ্ররায় অমাত্য-প্রধান
সুন্দর, সুশীল, শান্ত, বদান্য, বিদ্বান্।
সুললিতস্বরে গীত কিবা গান তিনি ;
ইচ্ছা হয় শুনি হয়ে উজান-বাহিনী।

কবি দ্বিজেন্দ্রলালের ভ্রাতৃগণও সুশিক্ষিত ও সাহিত্য-সংসারে পরিচিত। তাঁহার জ্যেষ্ঠ সহোদর জ্ঞানেন্দ্রলালের "নবদেবী বা মায়া" নামক উপন্যাসখানি অনেকেই পাঠ করিয়াছেন। বঙ্গসাহিত্যের ইতিহাসে জ্ঞানেন্দ্রলালের নামও অনেকদিন লিখিত থাকিবে। কবিবর দ্বিজেন্দ্রলাল বাল্যকালেই স্বীয় প্রতিভার পরিচয় দিয়াছিলেন। বাল্যকালেই তিনি অতি সুন্দর কবিতা লিখিতে পারিতেন। তাঁহার প্রথম পুস্তক "আর্য্যগাথা" চতুর্দ্দশ বৎসর বয়সে রচিত। এই গ্রন্থ যখন প্রথম প্রকাশিত হয়, তখন গ্রন্থের আবরণীর উপর গ্রন্থকারের নাম ছিল না। কিন্তু অনেক বিখ্যাত সমালোচক গ্রন্থখানির ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছিলেন। চতুর্দ্দশ বৎসরের বালকের পক্ষে ইহা কম সৌভাগ্যের কথা নহে। দ্বিজেন্দ্রলাল কিছুদিন আর্য্যগাথার গ্রন্থকার বলিয়াই পরিচিত ছিলেন এবং যখন তাঁহার Lyrics of Ind প্রকাশিত হয়, তখন তিনি "Author of Aryan Melodies" অর্থাৎ "আর্য্য গাথার গ্রন্থকার" বলিয়া নিজের পরিচয় দিয়াছিলেন। আর্য্যগাথা প্রকাশিত হইবার কাল হইতে "আষাঢ়ে", "হাসির গান" প্রভৃতি প্রকাশিত হইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তিনি গীতি-কবিতালেখক বলিয়াই পরিচিত ছিলেন। গীতি-কবিতা রচনায় তাঁহার যে কতদূর দক্ষতা ছিল তাহা তাঁহার স্বদেশী সঙ্গীতগুলি পড়িলেই বুঝিতে পারা যায়। তাঁহার রচিত "ভেঙ্গেগেছে মোর স্বপ্নের ঘোর" প্রভৃতি গানটি বোধ হয় আপনারা সকলেই জানেন। আমার বিশ্বাস তিনি যদি আর কিছুই রচনা না করিয়া এইরূপ কয়েকটি সঙ্গীত রচনা করিতেন, তাহা হইলেও তাঁহার নাম বঙ্গে অমর হইত। উল্লিখিত গানটিতে যে একটা বিষাদময় গভীর নিরাশার করুণ বেদনা আত্মপ্রকাশ করিয়াছে তাহার তুলনা বাংলা-সাহিত্যে একান্ত দুর্লভ! যখন সমগ্র দেশের বুকের উপর দিয়া একটা সর্ব্ববিধ্বংসী জলপ্লাবন চলিয়া গিয়াছে, তখনও যেবার কবির সাধের মেবার মাথা তুলিয়া

দাঁড়াইয়াছিল! তাই দেখিয়া কবি ভাবিয়াছিলেন বুঝি মেবারের পতন নাই—বুঝি বা মেবারের পুত্রগণ নিজেদের আত্মত্যাগের দৃষ্টান্তে ভারতের ৩০ কোটী নরনারীকে উজ্জীবিত করিয়া তুলিবে—মানুষ করিয়া তুলিবে! কিন্তু তাহাদেরও যে পতন হইল, তাহারাও যে মানুষ হইল না—কবির সাধের মেবারও যে অতল সলিলে ডুবিয়া গেল! এই মর্ম্মভেদী দৃশ্য ত আমরা ৭০০ বৎসর হইতে দেখিয়া আসিতেছি, তাহার জন্য ত মাঝে মাঝে মায়া-কান্নাও কাঁদিতেছি। কিন্তু মেবারের দুঃখে—আমাদের দুঃখে—আমাদের পতন দর্শনে আমরা প্রাণ হইতে ত কাঁদিতেছি না! মেবারের পতন কবির প্রাণকে আঘাত করিয়াছে সন্দেহ নাই, কিন্তু তদপেক্ষা অধিক আঘাত করিয়াছে আমাদের প্রাণহীনতা আমাদের জড়বৎ আচরণ! সেই নিষ্ঠুর আঘাতে কবির প্রাণের ব্যথা কাঁদিয়া উঠিয়াছে এবং তাহারই ফলে বঙ্গ সাহিত্য একটি গানের সেরা গান পাইয়াছে। কবির কবিতা-সম্বন্ধে আর যাহা বলিবার আছে তাহা পরে বলিব। আপাততঃ কবির বাল্যজীবন-সম্বন্ধে দুই একটি গল্প বলিলে আপনারা বোধ হয় বিরক্ত হইবেন না।

শ্বেতদ্বীপের কবি Pope সম্বন্ধে একটি গল্প প্রচলিত আছে। Pope বাল্যকাল হইতেই কবিতা রচনা করিতে পারিতেন। অনেক সময় তিনি পাঠে অবহেলা করিয়াও কবিতা-দেবীর পূজা করিতেন। তজ্জন্য একদিন তাঁহার পিতা তাঁহাকে অতিশয় প্রহার করিয়াছিলেন। যখন প্রহারের মাত্রাটা দারুণ চড়িয়া উঠিয়াছে তখন বালক পিতার করুণা উদ্রেক করিবার জন্য কাঁদিতে কাঁদিতে বলিয়া ফেলিলেন :—"Papa papa pity take. No more verses Shall I make." আমাদের দেশেও গুপ্ত কবি তিন বৎসর বয়সের সময় দুইছত্র কবিতায় কলিকাতার তদানীন্তন অবস্থা বর্ণনা করিয়াছেন। কবি দ্বিজেন্দ্রলালের সম্বন্ধেও এইরূপ একটি গল্প

শুনিয়াছি। একদিন তাঁহার দাদা "দেখি তুমি কেমন কবিতা রচনা করিতে পার" বলিয়া কোন একটি বিষয়সম্বন্ধে তাঁহাকে একটি কবিতা রচনা করিতে বলিলেন। বালক দ্বিজেন্দ্রলালও কিয়ৎকাল চিন্তা করিবার পর কয়েক লাইন স্বরচিত কবিতা আবৃত্তি করিয়া সকলকে বিস্মিত করিলেন। তাঁহার বাল্যজীবনের আর একটি গল্প শুনিয়াছি। এক অপরাহ্ণে বেশ এক পসলা বৃষ্টি হওয়ায় বালক দ্বিজেন্দ্রলাল বাটীর বাহির হইতে পারেন নাই। কিন্তু অলসের ন্যায় চুপ করিয়া বসিয়া থাকা তাঁহার স্বভাববিরুদ্ধ ছিল। তাই এক দেওয়ালের উপর দাঁড়াইয়া বাটীর ভৃত্য-গণের নিকট অদম্য উৎসাহে বক্তৃতা আরম্ভ করিলেন। এমন সময় প্রাতঃস্মরণীয় বিদ্যাসাগর মহাশয় সেই স্থান দিয়া গমন করিতেছিলেন। তিনি পুলকিতচিত্তে কিছুক্ষণ বালকের বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া বলিলেন "কালে এই বালক একজন অতি বিখ্যাত লোক হইবে।" বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ভবিষ্যৎবাণী সফল হইয়াছে আজ কবি দ্বিজেন্দ্রলালের যশঃ-সৌরভে দশদিক আমোদিত। আপনারা, চন্দ্রগুপ্ত নাটকের প্রথম দৃশ্যেই সেকান্দার সাহার ভবিষ্যৎবাণী পাঠ করিয়াছেন। এখন আমার জিজ্ঞাস্য এই :—সেকান্দার সাহার ভবিষ্যৎবাণী কি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ভবিষ্যৎ-বাণী স্মরণে লিখিত হয় নাই ?

বাল্যকালেই দ্বিজেন্দ্রলাল অতিসুন্দর ইংরাজী লিখিতে পারিতেন। কথিত আছে তিনি যখন প্রবেশিকা শ্রেণীতে পাঠ করেন, সেই সময় তাঁহার টেষ্টপরীক্ষার প্রশ্নের উত্তরে লিখিত ইংরাজী পড়িয়া কৃষ্ণনগর কলেজের অধ্যক্ষ সুপ্রসিদ্ধ বো সাহেব মুগ্ধ হইয়া বলিয়াছিলেন "এত সুন্দর ইংরাজী লিখিতে পারিলে কোন ইংরাজকেও লজ্জিত হইতে হইবে না।" তাঁহার ইংরাজী লিখিবার ক্ষমতা যে ইংরাজের অপেক্ষা ন্যূন ছিল না তাহা তাঁহার Lyrics of Ind নামক গ্রন্থপাঠেই বুঝা যায়। এই গ্রন্থ ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দের

সেপ্টেম্বর মাসে প্রকাশিত হয়। কবির বয়স তখন ২৩ বৎসরের অধিক নহে। তখন তিনি কৃষিশিক্ষা ব্যপদেশে ইংল্যাণ্ডে অবস্থান করিতেছিলেন। এই গ্রন্থ সুপ্রসিদ্ধ Edwin Arnold এর নামে উৎসৃষ্ট এবং সুপ্রসিদ্ধ Trübner Company কর্ত্তৃক প্রকাশিত। গ্রন্থের মুখবন্ধ অতি সুন্দর—সেই স্থান হইতে কয়েকটি লাইন উদ্ধৃত করিতেছি :—

"My principal object in the composition of the following verses has been to harmonise English and Indian poetries as they ought to be. Both are beautiful but whilst the one is visionary and sensuous, the other is Vigorous and chaste ; whilst one dreams the other soars ; whereas the one makes a poetry of Religion the other makes a religion of Poetry. ... It is the aim of the author to establish a meddiage and an intellectual commerce between the poetries." কবি এক অতি মহৎ উদ্দেশ্য লইয়া তদীয় গ্রন্থ রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন সন্দেহ নাই। তিনি কতদূর সফল মনোরথ হইয়াছেন তাহা সুধীগণের বিবেচ্য। আমাদের বিশ্বাস এতবড় একটি কাজ একব্যক্তির দ্বারা সুসম্পন্ন হইতে পারে না। আমরা অতঃপর দেখিতে পাইব যে, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সমন্বয়ের আবশ্যকতা জনসাধারণকে বুঝাইয়া দেওয়াও কবির জীবনের একটি কাজ ছিল। আমরা এখন অনেকের মুখেই গ্রীস্ ও ভারতের আদর্শের সমন্বয় করিবার কথা শুনি, কিন্তু কবিবর দ্বিজেন্দ্রলাল সেলুকস্ কন্যা হেলেনের সহিত চন্দ্রগুপ্তের বিবাহোপলক্ষে এই বিষয়ে একটি ইঙ্গিত করিবার পূর্ব্বে ঐ সমন্বয়ের কথা বড় একটা শোনা যাইত না। আমাদের আলোচ্য গ্রন্থখানিতে "The land of the Sun," "Hymn to the Spirit of Love" প্রভৃতি ২৫টি কবিতা আছে। "Krishna to Radha" কবিকর্ত্তৃক ও "Universal Prayer" সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

কর্ত্তৃক বঙ্গভাষায় অনূদিত হইয়াছে। "A farewell" নামক অতি সুন্দর কবিতাটি একটি বাংলা গানের অনুসরণে রচিত। গ্রন্থখানির কোথাও কোন বিষাদের রেখা নাই—নবীন কবি নবভাবোন্মেষে সকলের প্রাণে এক নব আনন্দ জাগাইবার জন্যই স্বীয় লেখনী ধারণ করিয়াছেন। আমরা "The land of the sun" এইতে কয়েকছত্র কবিতা উদ্ধৃত করিলাম, তাহাতেই আপনারা পুস্তকখানির একটু পরিচয় পাইবেন। কবির প্রিয় ভারতবর্ষই তাঁহার Land of the sun—সেই দেশে।

'In the arms of the slumbering valleys,
The young moon beams enamoured repose;
And the loveliest stars faint, entangled
In the mazes of *Champok* and rose—
'Whom the year woos with tears, smiles & whispers
Whom the seasons with rare treasures greet:
Where Dawn blushes with fragrance and music
And the Sunset is glorious and sweet."

উদ্ধৃত লাইনগুলির সৌন্দর্য্য বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইতে হইবে না। রসজ্ঞগণ স্বীকার করিবেন যে, "where dawn blushes with fragrance and music এই ছত্রটি যে কোন শ্রেষ্ঠ কবির অনুপযুক্ত নহে। ভারতবর্ষীয় কবিরা ইংরাজীতে যে সকল কবিতা গ্রন্থ লিখিয়া যশস্বী হইয়াছেন তন্মধ্যে দ্বিজেন্দ্রবাবুর গ্রন্থখানির স্থান প্রথম না হইলেও প্রথম শ্রেণীতে। দ্বিজেন্দ্রবাবুর কি করিয়া ভ্রম নিরাকরণ হইল, এখন তাহাই বলিতেছি। ভারতবাসীর পক্ষে ইংরাজী ভাষায় কবিতা লিখিয়া যশোলাভ করা বামনের চাঁদ ধরার ন্যায় অসম্ভব।

সত্য বটে দ্বিজেন্দ্রলাল প্রথমেই "আর্য্যগাথা" রচনা করেন, কিন্তু "Lyrics of Ind" হইতে তিনি যেরূপ উৎসাহ ও প্রশংসা লাভ করিয়াছিলেন, তাহাতে যে কোন নবীন কবির মাথা বিগড়াইয়া যাওয়াই সম্ভব।

উৎসাহের মধ্যে Edwins Arnoldকে বইখানি উৎসর্গ করিবার অনুমতি পাওয়াই সর্ব্বপ্রধান।' প্রশংসারত কথাই ছিল না। ভারতবন্ধু States-man প্রশংসার সুর চড়াইয়া লিখিয়াছিলেন "যদি গ্রন্থকারের নামোল্লেখ না থাকিত তবে গ্রন্থখানিকে আমরা কোন বিখ্যাত ইংরাজ কবির রচনা বলিয়া মনে করিতে পারিতাম।" কিন্তু এমন সময় এক মহাত্মার উপদেশে কবি তাঁহার ভুল বুঝিতে পারেন। সেই মহাত্মা স্বর্গীয় রাজনারায়ণ বসু মহাশয়। "Lyrics of Ind" প্রকাশিত হইলে একদিন কবি স্বয়ং রাজনারায়ণবাবুকে কয়েকটি কবিতা পড়িয়া শুনান। নবীন কবিকে নানা-রূপে উৎসাহিত করিয়া অবশেষে রাজনারায়ণবাবু বলিলেন "লিখেছত বেশ কিন্তু এইগুলি যদি বাংলায় লিখ্‌তে তবে আরও ভাল হ'ত। বাঙ্গালীর ছেলের ইংরাজীতে কবিতা লেখা পণ্ডশ্রমমাত্র।" সুবিজ্ঞ রাজনারায়ণ বাবুর উপদেশে কবি তাঁহার ভুল বুঝিতে পারিলেন এবং সেইদিন হইতে বঙ্গবাণীর পূজায় আপনার সমগ্র শক্তি নিয়োগ করিলেন তাহার একাগ্রতা ও একনিষ্ঠার পরিচয় বঙ্গসাহিত্যের পাঠকমাত্রেই পাইয়াছেন। তিনি একদা ভক্তিভরে জননীর নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন ;—"জননী বঙ্গভাষা, এ জীবনে চাহি না অর্থ চাহি না মান, যদি তুমি দাও তোমার ওদুটি অমল কমল-চরণে স্থান।" আজ জননী বঙ্গভাষা তাঁহার প্রিয়পুত্রের বাসনা পূর্ণ করিয়াছেন।

সাধক আজ আরাধ্য দেবতার পায়ে স্থান পাইয়া ধন্য হইয়াছে। জননী বাগ্দেবী আর দূর হইতে পুত্রের পূজা গ্রহণ করিয়া সন্তুষ্ট নহেন, তাই তাঁহার প্রিয়পুত্রকে নিকটে ডাকিয়া লইয়াছেন।

এখন আমরা কবির সাহিত্য-সাধনার কাহিনী অতি সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিব। কবির জীবন-চরিত বলিতে তাঁহার সাহিত্য-সাধনার কাহিনী-কেই বুঝায়। সাহিত্য-সাধনার পরিচয় লইতে গিয়াই আমরা কবি যে,

"স্বপ্ন দিয়ে তৈরি ও স্মৃতি দিয়ে ঘেরা" মানস-জগতে বিচরণ করেন তাহার খবর পাইব। কবির জীবনের এই দিকটা বাদ দিলে যাহা থাকে তাহার সহিত সাহিত্য-পাঠকের কোনই সম্বন্ধ নাই। বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিবার অব্যবহিত পরেই কবি "একঘরে" নামক একখানি পুস্তক রচনা করেন। এই পুস্তকে তিনি দেশের লোককে ও সমাজকে প্রকাশ্যভাবেই গালাগালি দিয়াছিলেন। দেশের লোকের ও সমাজের অপরাধ, বিলাতফেরতা কবি বিনা প্রায়শ্চিত্তে সমাজে প্রবেশ করিতে গিয়া বিফল মনোরথ হইয়া ফিরিয়া আসেন। এই পুস্তকখানি বহুদিন পরে সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে। শুনিয়াছি "একঘরে" গ্রন্থে দ্বিজেন্দ্রলালের সাহিত্যিক প্রতিভার—পরিহাস-রসিকতার প্রচুর পরিমাণ পাওয়া যায়। এই পুস্তক লইয়া তাৎকালীন সমাজে কাদৃশ আন্দোলন-আলোচনা হইয়াছিল তাহা জানিবার উপায় নাই। অতএব আমরা বলিতে পারিলাম না কেন তিনি স্পষ্ট প্রতিবাদের পরিবর্ত্তে ব্যঙ্গ কবিতার আশ্রয় গ্রহণ করেন। বোধ হয় ইহার একটি কারণ এই কবি বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, ভণ্ডামি, ন্যাকামি, জ্যাঠামি, বাদরামি প্রভৃতির প্রতিবাদে বিপরীত ফল ফলে। এইরূপ স্থলে ব্যঙ্গের ক্ষমতা অসীম। শুনিতে পাওয়া যায় Punch এর এক একটি কার্টুনের ফলে মন্ত্রী-সভার পরিবর্ত্তন হইয়াছে। ইংরাজীতে একটি কথা আছে কথাটি বড় সত্য এবং কথাটি এই :—

Ridicule shall frequently prevail

And cut the knot where graver reasones fail.

এই কথাটি বুঝিতে পারিয়াই বোধ হয় কবি স্পষ্ট প্রতিবাদ পরিত্যাগ করিয়া ভণ্ডামি প্রভৃতিকে হাসিয়া উড়াইয়া দিবার জন্যই ব্যঙ্গের আশ্রয় গ্রহণ করেন। তাহারই ফলে তাঁহার "Reformed Hindoos", "চণ্ডীচরণ", "নন্দলাল", প্রভৃতি কবিতাগুলির জন্ম হইয়াছে। তাহাদের

মধ্যে ব্যক্তিগত আক্রমণ নাই সত্য, কিন্তু তাহারা অনেকের হৃদয়েই ব্যথা দিয়াছে। যে সময় কবি এই সকল কবিতাগুলি রচনা করিয়াছেন তখনও তিনি ঠিক বুঝিতে পারেন নাই যে কেবল ব্যঙ্গ করিয়াই সমাজ-সংস্কার করা যায় না। যাহাদের সংস্কার করিতে হইবে তাহাদের জন্য কাঁদিতেও হইবে। এই সকল কবিতা রচনা করিবার সময় যে কবি পূর্ব্বোক্ত কথা-গুলি ঠিক বুঝিয়াছিলেন একথা জোর করিয়া বলা যায় না। স্বীকার করি, হাসির গানে দ্বিজেন্দ্রলালের সমকক্ষ বঙ্গে কেহই নাই। কিন্তু দ্বিজেন্দ্র-লালের Reformed Hindoosকে রজনীকান্তের "কন্যাদায়গ্রস্ত কুলীন-ব্রাহ্মণবিষয়ক কবিতাদ্বয়ের সহিত তুলনা করিলেই আপনারা বুঝিতে পারিবেন যে, দ্বিজেন্দ্রলালের কবিতা লেখা অনেকটা গায়ের ঝাল মিটাইবার জন্য, কিন্তু ঠাট্টা করিতে গিয়াও "দেশের দশা হেরি কান্ত করে অশ্রু-বরিষণ।" দ্বিজেন্দ্রলালও যে দেশের দশা হেরি অশ্রু বরিষণ করেন নাই তাহা নহে কিন্তু যে সময়ের কথা বলিতেছি ঠিক তখন করেন নাই। প্রথমে প্রাচীন সমাজের ভণ্ডামিটাই তাঁহার চোখে পড়ে এবং তাহাদের প্রতিই ব্যঙ্গের বল নিক্ষেপ করেন। কিছুদিন পরে তিনি নবীন দলের মধ্যেও ভণ্ডামির প্রাচুর্য্য দেখিতে পাইলেন। অতএব কেবল প্রাচীনগণকে লইয়া থাকাই তাঁহার পক্ষে অসম্ভব হইল। তিনি প্রাচীন ও নবীন সকল প্রকারের ভণ্ডামির উপর কষাঘাত করিবার জন্য কল্কীকে আসরে নামাইয়া তাঁহার দরবারে ভক্তগণকে লইয়া হাজির করিলেন। কবির সর্ব্বপ্রথম ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্যঙ্গনাটক "কল্কি-অবতার।" এই গ্রন্থখানি প্রথম শ্রেণীর ব্যঙ্গ-কাব্য। এই পুস্তকে তিনি তাঁহার নাটক লিখিবার শক্তির যথেষ্ট পরিচয় দিয়াছেন। কবির রচিত বিস্তানিধিটি এক অপূর্ব্ব জীব। এরূপ জীব জগতে একান্ত দুর্লভ নহে—ইহারা মাছও ধরে পাণিও ছোঁয় না – শ্যামও রাখে কুলও রাখে। এইরূপ লোকের চরিত্র যথাযথভাবে চিত্রিত করা

অসাধারণ নৈপুণ্যের পরিচায়ক। আমরা ইতিপূর্ব্বেই বলিয়াছি কবি শিক্ষালাভের জন্য সাগর-পারে গিয়াছিলেন এবং যাহারা তাঁহাকে তজ্জন্য সমাজে গ্রহণ করিতে না চাহিয়া শাস্ত্রের দোহাই দিয়াছিলেন তাঁহাদিগকে বেশ দুই কথা শুনাইয়া দিয়াছিলেন—তিনি সেই গোঁড়াদের মুখের উপর একটু রূঢ়ভাবেই বলিয়াছিলেন "সাগরপারে যাত্রা নিষেধ লক্ষ্মীছাড়ার যুক্তি ও"। কবি তাঁহাদের দুই গালে যে বেশ করিয়া চূণকালী মাখাইয়া দিয়াছিলেন তাহার নিদর্শন তাঁহার কয়টি গানে ও "কল্কি অবতারে" পাই। কিন্তু অল্পবয়সে বিদেশ-যাত্রার যে কুফল ফলে তাহাও কবির সূক্ষ্মদৃষ্টিকে এড়াইতে পারে নাই। বিলাতফের্ত্তা সমাজে যে অর্থলোলুপতা, কৃত্রিমতা ও বিলাসিতা প্রবেশ করিয়াছে তাহা তাঁহার ন্যায় স্বদেশভক্তকে মর্ম্মপীড়া দিয়াছিল। বিলাত ফের্ত্তাদের সমাজে যে দুই চারিটি রেবেকার আমদানী হইয়াছে তাহাও তাঁহার দৃষ্টি অতিক্রম করিতে পারে নাই। বিলাতফের্ত্তা চম্পটিদের দেখাদেখি নব্য হিন্দু উমেশ, রমেশ, পরেশ, সুরেশদের ও "আর ভাল লাগেনাকো প্রত্যহই একঘেয়ে, মেউ মেউ করা যত বাঙ্গালীর সব মেয়ে" কেননা তাহারা "না জানে নাচতে, না জানে গাইতে বিদ্যাবত্তায় একটি একটি হস্তিমূর্খ যেন, না পড়েছে Shakespeare না পড়েছে Gamot Adam Smithএর Political Economy জানে না, Malthusএর Theory of Population মানে না ··· Huxley, Tyndale, Spencer, Mill এর ধারও ধারে নাক, Dynamics এর একটা আঁকও কষতে পারে নাক।" তাই দেখাদেখি নব্যহিন্দুরা সুকেশিনী, সুবাসিনী, সুভাসিনী, সুহাসিনী প্রভৃতিকে এক একটি রেবেকা করিয়া তুলিলেন। তারপর যাহা হইল, তাহা উমেশের কথায় কতকটা বোঝা যাবে :—"এই আমি এলাম সমস্ত দিন গাধার পরিশ্রম করে, বাকিখাজনায় রায় লিখে, আর স্ত্রীর খাবারের জোগাড় করা চুলোয় যাক্, তিনি গেলেন

engagement রাখতে।” অতএব দেখিতে পাইতেছেন যদিও প্রথমে প্রাচীনদলের ভণ্ডামিটাই কবির চোখে পড়িয়াছিল। তবু নবীনদলের বাঁদরামিটাও তাঁহার সূক্ষ্মদৃষ্টিকে এড়াইতে পারে নাই। এই বিলাত-ফের্ত্তাও নবীন দলের বাঁদরামিকে কষাঘাত করিবার জন্যই কবির প্রায়শ্চিত্ত রচিত হয়। নাট্যকলা-হিসাবে প্রায়শ্চিত্তের স্থান কল্কি অবতারের নিম্নে। প্রায়শ্চিত্তের গল্পটার বিভিন্ন অংশের মধ্যে যে খুব বড় একটা ঐক্য আছে এমন কথা বলিতে পারি না। কিন্তু কবির জীবন-চরিতে প্রায়শ্চিত্তের প্রয়োজন আছে। আমরা প্রায়শ্চিত্তেই প্রথমে দেখিতে পাই মানব-চরিত্র-সম্বন্ধে কবি কতদূর অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন। কবির এই গ্রন্থেই আমরা আমাদের অতি পরিচিত কয়েকটি সঙ্গীতের প্রথম সাক্ষাৎ পাই। সেই সঙ্গীতগুলি সাহিত্য-সংসারে সুপরিচিত ; শুধু তাহাই নহে তাহারা বঙ্গের হাটে মাঠে-গোঠেও গীত হইয়া থাকে অতএব তাহাদের নামোল্লেখ করিলেই যথেষ্ট হইবে। সেই সঙ্গীত গুলি :—“নূতন কিছুকর”, আমরা বিলাত-ফের্ত্তা কভাই”, “হো’ল কি” প্রভৃতি।

প্রায়শ্চিত্ত রচিত হইবার পূর্ব্বেই কবির “বিরহ” ও “ত্র্যহস্পর্শ” রচিত হয়। ইহাদের যে কোন গুরুগম্ভীর উদ্দেশ্য ছিল তাহা বোধ হয় না। জন-সাধারণকে একটু বিশুদ্ধ আনন্দদান করাই এই গ্রন্থদ্বয়ের একমাত্র উদ্দেশ্য। কবি লিখিয়াছেন, “শুধু লুটিব একটু মজা শুধু কবিব একটু পেয়ার, শুধু নাচিব একটু, গাহিব একটু”। কিন্তু বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাসে “বিরহের” অভিনয় একটি পরিবর্ত্তন আনিয়া দেয়। ইতিপূর্ব্বে যে সকল প্রহসন অভিনীত হইত তাহারা প্রায়শঃই শীলতাবিরোধী হইত। কিন্তু এই “বিরহ” গ্রন্থে দ্বিজেন্দ্রলাল লোককে দেখাইয়া দিলেন যে, হাস্যরস শীলতার বিরোধী নহে। কবি দীনবন্ধুর হাস্যরসও অশ্লীল নহে—যাঁহারা “যমালয়ে জীবন্ত মনুষ্য” পাঠ করিয়াছেন তাঁহারাই এ বিষয় সাক্ষ্য দিবেন।

ব্যঙ্গ করিবার শক্তি দীনবন্ধুর অসীম ছিল। দীনবন্ধুও বিনাকারণেই বিশুদ্ধ হাসির ফোয়ারা খুলিয়া দিতে পারিতেন। এ বিষয়ে দ্বিজেন্দ্রলালের সমকক্ষ বোধ হয় দীনবন্ধু ব্যতীত বঙ্গে অপর কেহই জন্মে নাই এবং আমাদের বিশ্বাস ব্যঙ্গনাটক রচনায় কবি দীনবন্ধুর স্থান সর্ব্বপ্রথম এবং তৎপরেই দ্বিজেন্দ্রলালের স্থান। কিন্তু একটি কথা স্বীকার করিতেই হইবে তাহা এই, দীনবন্ধুর রুচি অপেক্ষা দ্বিজেন্দ্রলালের রুচি অধিক পরিমার্জ্জিত। এই প্রসঙ্গে আর একটি বিষয়ের প্রতি আপনাদের মনোযোগ আকর্ষণ করিতে চাহি। আপনারা বোধ হয় জানেন যে, কবি দ্বিজেন্দ্রলালের "বিরহ" নাটিকাখানি কবিবর রবীন্দ্রনাথকে উৎসর্গীকৃত হইয়াছে। এই সময় কবিদ্বয়ের তথাকথিত বিরোধের সূত্রপাতও হয় নাই। বিরহের সমসাময়িক পুস্তক "আর্য্যগাথা" দ্বিতীয় ভাগ। এই পুস্তকের প্রশংসা নানা স্থানে হইয়াছিল। পূর্ব্বে যে আর্য্যগাথার কথা বলিয়াছি তাহা আর্য্যগাথা প্রথম ভাগ। আর্য্যগাথা প্রথমভাগ চোখে দেখিবার সৌভাগ্য আমার হয় নাই। আর্য্যগাথা দ্বিতীয়ভাগ বইখানি চোখে দেখিয়াছিলাম। বই খানি সমস্ত পড়ি নাই অতএব বিশেষ কিছু বলিতে পারিলাম না। তবে গ্রন্থখানির কবি রবীন্দ্রনাথ কর্ত্তৃক ১৩০১ সালের "সাধনায়" প্রকাশিত সমালোচনা আধুনিক সাহিত্যে পড়িয়াছি। রবীন্দ্রবাবুর মতে গ্রন্থখানিতে বিশুদ্ধ সঙ্গীত ও বিশুদ্ধ কাব্য উভয়ই আছে। রবীন্দ্রবাবুর পুস্তকে উদ্ধৃত আর্য্যগাথার একটি সঙ্গীত উদ্ধৃত করিবার প্রলোভন সম্বরণ করিতে পারিলাম না :—

"ছিল বসি সে কুসুম কাননে।
আর অমল অরুণ উজল আভা
ভাসিতেছিল সে আননে।
ছিল এলায়ে সে কেশরাশি (ছায়াসম হে);

ছিল ললাটে দিব্য আলোক, শান্তি
অতুল গরিমা রাশি।
সেথা ছিল না বিষাদভরা (অশ্রুভরা গো) ;
সেথা বাঁধা ছিল শুধু সুখের স্মৃতি
হাসি, হরষ, আশা ;
সেথা ঘুমায়ে ছিলরে, পুণ্য, প্রীতি,
প্রাণভরা ভালবাসা।
তার সরল সুঠাম দেহ ; (প্রভাময় গো, প্রাণভরা গো) ;
যেন যা কিছু কোমল ললিত, তা দিয়ে
রচিয়াছে তাহে কেহ ;
পরে সৃজিল সেথায় স্বপন, সংগীত
সোহাগ সরম স্নেহ।
যেন পাইলরে উষা প্রাণ (আলোময়ী রে) ;
যেন জীবন্ত কুসুম, কনকভাতি
সম্মিলিত, সমতান।
যেন সজীব সুরভি মধুর মলয়
কোকিল কুজিত গান।
শুধু চাহিল সে মোর পানে (একবার গো) ;
যেন বাজিল বীণা মুরজ মুরলী
অমনি অধীর প্রাণে ;
সে গেল কি দিয়া, কি নিয়া, বাঁধি মোর হিয়া
কি মন্ত্রগুণে কে জানে।"

রবীন্দ্রবাবুর পুস্তকে আরও ৩।৪টি গান উদ্ধৃত আছে কিন্তু

আপনাদের বিরক্তিভাজন হইবার ভয়ে একটির বেশী নমুনা দিবার সাহস হইল না।

এই সময় দ্বিজেন্দ্র বাবুর সহিত অন্যান্য সাহিত্যিকগণের চেনা-শুনা হয়। তখন "ইণ্ডিয়া ক্লাবের" পুরা বাহার। ইণ্ডিয়া ক্লাবের কয়েকটি সভ্য মিলিয়া একটি "ডাকাইত ক্লাব" সংগঠন করিয়াছিলেন—রবীন্দ্রনাথ ও দ্বিজেন্দ্রলাল উভয়েই এই ক্লাবের সভ্য ছিলেন। তখন রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার মধ্যাহ্নকাল। তিনি তখন সাধনার সম্পাদন করিতেছিলেন। বঙ্কিমের বঙ্গদর্শনের পর যতগুলি সাময়িক পত্র বাহির হইয়াছে তন্মধ্যে এই যুগের সাধনাই শ্রেষ্ঠ। এই সাধনায় "কেরাণী" শীর্ষক বিখ্যাত কবিতাটি বাহির হয়। কেরাণী-জীবনের চিত্র অনেকেই আঁকিয়াছেন কিন্তু কাহারও চিত্র এত উজ্জ্বল হয় নাই। কবি রজনীকান্তের উক্ত বিষয়ক একটি কবিতা "অভয়াতে" প্রকাশিত হইয়াছে। সে কবিতাটিও অতি সুন্দর কিন্তু তাহা এই কবিতার সমকক্ষ নহে। কেরাণী বাবু "সারা দিনটা খেটে খেটে আপিস থেকে ছুটে" বাড়ী আসিয়া দেখেন :—

"ধুতি গেছে উড়ে, দিয়েছে কে ছুঁড়ে
একপাট চটি বিছানায় আর একপাট আস্তাকুড়ে
বিশু গেছে বাজারেতে, ঘুমোয় রামা কুঁড়ে
বামুন দিয়েছে ঝির সঙ্গে মহাতর্ক জুড়ে!
"ফরাসের সতরঞ্চে একটি কোমর মাটি
পুত্ররত্ন গিয়ে হুঁকো গাছটি নিয়ে
ঘুর্নসি পড়ে তাকিয়াতে কচ্চেন বসে নৃত্য;
ঘুমোচ্চেন তাঁর পার্শ্বে শ্রীরামকান্ত ভৃত্য।"

অতঃপর বাবুর করতল চপেটাঘাতরূপে কাহারো বা গণ্ডে কাহারো বা পৃষ্ঠে দুই একবার স্পর্শ করিল। স্বয়ং গৃহিণীও বাদ গেলেন না কারণ

"সকল সময় জ্ঞান থাকে না তবলা কি অবলা।"* আষাঢ়ের শেষ কবিতার নাম "কর্ণবিমর্দ্দন-কাহিনী।" কিন্তু কবির কি অসীম ক্ষমতা তিনি যখন "কর্ণবিমর্দ্দন করেন" তখনও আমরা না হাসিয়া পারি না। আষাঢ়ের কবিতাসম্বন্ধে কবীন্দ্র রবীন্দ্র লিখিয়াছেন:—"এরূপ প্রকৃতির রহস্য কবিতা বাংলা-সাহিত্যে সম্পূর্ণ নূতন এবং আষাঢ়ের কবি অপূর্ব্ব প্রতিভা-বলে ইহার ভাব, ভাষা, ভঙ্গী, বিষয় সমস্তই নিজে উদ্ভাবন করিয়া লইয়া-ছেন।" তাঁহার "বাঙালী-মহিমা", "ইংরাজ-স্তোত্র", "ডিপুটি-কাহিনী" ও "কর্ণবিমর্দ্দন" সর্ব্বত্র উদ্ধৃত, পঠিত ও ব্যবহৃত হইবার পক্ষে অত্যন্ত অনুকূল হইয়াছে। এই লেখাগুলির মধ্যে যে সুনিপুণ হাস্য ও সুতীক্ষ্ণ বিদ্রূপ আছে তাহা শাণিত সংযত ছন্দের মধ্যে সর্ব্বত্র ঝকঝক করিতেছে। "'বাঙালা-মহিমা,' 'কর্ণবিমর্দ্দন-কাহিনী' প্রভৃতি কবিতায় যে হাস্য প্রকাশ পাইতেছে, তাহা লঘু হাস্য মাত্র নহে, তাহার মধ্যে কবির হৃদয় রহিয়াছে, তাহার মধ্য হইতে জ্বালা ও দীপ্তি ফুটিয়া উঠিতেছে। কাপুরুষতার প্রতি যথোচিত ঘৃণা এবং ধিক্কারের দ্বারা তাহা গৌরববিশিষ্ট।" এই সুদীর্ঘ মন্তব্যের উপর কথা বলা আমার ন্যায় ব্যক্তির পক্ষে নিতান্ত বেয়াদবি।

কবির "হাসির গান" নামে অতি বিখ্যাত বইখানি সম্বন্ধে দুই চারিটি কথা বলা বোধ হয় নিতান্ত অনুচিত হইবে না। হাসির গানের কবিতা-গুলি বিভিন্ন সময়ের লেখা এবং সাধনা, ভারতী, সাহিত্য প্রদীপ প্রভৃতি সাময়িক-পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। অত্যধিক প্রসিদ্ধ দুই চারিটি

---

* বর্ত্তমান সময়ের বাংলা সাহিত্যে বাংলা দেশের পাটচিত্র প্রায়শঃই পাওয়া যায় না। তাই একজন লেখক বলিয়াছেন:—"হয়ত ভবিষ্যতে কোন প্রত্নতত্ত্ববিদ্ বলিবেন, যে, যখন বাংলা সাহিত্য রচিত হইয়াছিল তখন বাংলা দেশটা মোটেই ছিল না।" আমাদের সুখের বিষয় দ্বিজেন্দ্রলালের "কেরাণী" কাব্যটি এইরূপ প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের মুখ বন্ধ করিবে।

কবিতার নাম ইতিপূর্ব্বেই করিয়াছি। হাসির গানের অনেকগুলি গানই কবির বিভিন্ন ব্যঙ্গ নাট্যগুলির ভিতর ছড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে। হাসির গানে নানাজাতীয় হাসির কবিতাই দেখিতে পাওয়া যায়। অনেকগুলি ভণ্ডদের কর্ণমর্দ্দন করিবার জন্য রচিত, কিন্তু দুই চারিটি উদ্দেশ্যহীন বিশুদ্ধ হাসির ফোয়ারা। "বিষ্যুদ্‌বারের বারবেলা," "বুড়োবুড়ী," "তানসান-বিক্রমাদিত্য-সংবাদ" "চাষার প্রেম", "সব সত্যি" প্রভৃতির ভিতর যদি কেহ কোন উদ্দেশ্য বাহির করিতে পারেন তবে তাঁহার অতি বুদ্ধির বালাই লইয়া মরিয়া যাইতে হয়। অসম্ভব জিনিষের একত্র সমাবেশ করিলে স্বতঃই আমাদের হাসি পায়—এই হাসির বিশ্লেষণ করিতে গেলে কিছুই অবশিষ্ট থাকে না, তানসেন-বিক্রমাদিত্য-সংবাদের হাসি ঠিক এই জাতীয়। কবির আর দুইটি হাসির কবিতা সমধিক প্রসিদ্ধ সে দুইটি "আমি হোতে পার্ত্তাম" এবং "এমন অবস্থাতে পড়লে সবারই মত বদলায়" এই কবিতাদ্বয় সম্বন্ধে মন্তব্য অনাবশ্যক। কবির রচিত আর একজাতীয় হাসির গান আছে তাহা শুনিয়া আমরা হাসি বটে কিন্তু সে হাসা ঠিক

"লাথি খেয়ে ওরে চাষা এবং যে তোর উচিত হাসা
যে তোর কথাও মাঝে মাঝে তবু আমার মনে জাগে।"

এরই জ্ঞাতিভাই। কবির "ইরান দেশের কাজি" যখন আপনার শ্রেষ্ঠত্ব ও পার্শীর মিথ্যাভাষিত্ব প্রভৃতি প্রমাণ করিয়া আমাদের হাসাইতে আসেন তখন প্রপীড়িতের দুঃখে আমাদের ন্যায় পদদলিতগণের চক্ষে জল আসে, কারণ তাহারা আমাদের দুর্দ্দশাই আমাদিগকে স্মরণ করাইয়া দেয়। আমরা কবিকে ব্যঙ্গপ্রিয় বলিয়াই জানি। অনেকের ধারণা তিনি ছোট-বড় সবাইকেই ব্যঙ্গ করেন। অর্থাৎ তিনি দশের কাছে বাহবা পাইবার জন্য মুরুব্বিয়ানা করিয়া সদনুষ্ঠাতৃ, একনিষ্ঠ, কর্ত্তব্যপরায়ণ ব্যক্তিকেও ব্যঙ্গ করিতে ছাড়েন না। যদি কাহারো এই ধারণা থাকে তবে তিনি কবিকে

বুঝিবার চেষ্টা মোটেই করেন নাই। আমরা বলিয়াছি "একঘরে" ও "Reformed Hindoos" প্রভৃতিতে অনেকটা গায়ের ঝাল ঝাড়িবার চেষ্টা আছে। কিন্তু তাঁহার ন্যায় স্বদেশভক্ত সুধু গায়ের ঝাল ঝাড়িবার জন্যই কলম ধরেন নাই। তিনি যেমন স্বদেশের ভণ্ডামিকে ঝাঁটাইয়া বহিষ্কৃত করিতে চাহিয়াছেন সেইরূপ দেশের মধ্যে যাহা ভাল, ও মনুষ্যত্বের নিদর্শন আছে তাহার রক্ষা যাহাতে হয় তাহারও যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছেন। আপনাদিগকে আলেখ্যের চতুর্দ্দশ ও পঞ্চদশ চিত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে অনুরোধ করি। চতুর্দ্দশ চিত্রটির নাম নেতা। কবি মেকী নেতাগণের ভক্তিহীন স্বদেশপ্রেম ও অনুপ্রাসে ক্রন্দনের অনুমোদন করিতে পারেন নাই। নেতাদের অনেকেই যে এই সুযোগে বেশ দুই পয়সা রোজগার করিয়াছেন তাহাও কবির সূক্ষ্মদৃষ্টিকে এড়ায় নাই। কবি লিখিতেছেন :—

"কেউবা খাসা নিজের থলে ভরে নিল
দেশের নামে দিয়ে সবায় ধাপ্পা ;
কেউবা খাসা দুপয়সা বেশ করে নিল
বিদেশীকে দিয়ে দেশী ছাপ্পা।"

"নিজের খাবার গুছিয়ে নিয়ে খেয়ে দেয়ে
ক্ষেপাও নিয়ে স্কুলের কটি ছাত্র ;
পরের ছেলের ভবিষ্যতের মাথা খেয়ে
আপনি গিয়ে বোসো ঝেড়ে গাত্র।"

"খেতে না পায় পরের ছেলেই পাবে নাক,
মরে যদি পরের ছেলেই মর্ব্বে ;
নিজের সিন্দুক বন্ধ করে বসে থাক,
(বটে, তখন তুমি তা কি কর্ব্বে ?")

কবি ক্রোধে ও ঘৃণায় এই সকল স্বয়ংসিদ্ধ নেতাগণের চক্ষু ফুটাইবার জন্য যাহা লিখিয়াছেন তাহাতে ইহাদের চক্ষু ফুটিলেই দেশের ও দশের মঙ্গল। ইহারা "নামের জন্য জুয়াচুরি" আরম্ভ করিয়াছে এবং যাহা অপেক্ষা ঘৃণার বিষয় কিছুই নাই তাহাই করিতেছে :—

"মায়ের নামটাও কর্চ্ছে অপবিত্র !!!"

ইহাদের চিত্র হইতে ঘৃণায় নয়ন ফিরাইবামাত্র আমাদের চোখের সামনে জনৈক প্রকৃত মাতৃভক্তের চিত্র ফুটিয়া উঠে। সেই চিত্রের নমুনা আশা করি, আপনারা নিজেই দেখিয়া লইবেন। সেই চিত্রটি দেখিলেই আপনারা বুঝিতে পারিবেন অপর ব্যঙ্গকবি হইতে দ্বিজেন্দ্রলালের পার্থক্য কোথায়। এই বিষয় কবি নিজেই বলিয়াছেন :—

"ব্যঙ্গকবি আমি ? ব্যঙ্গ করি শুধু ?
নিন্দা করি শুধু—সকলে ?
কভু না ! আসলে ভক্তি করি আমি,
ঘৃণা করি শুদ্ধ নকলে।
যেথা আবর্জ্জনা, ধরি সম্মার্জ্জনা ;
তাই বলে আমিত অন্ধনা ;
যেখানে দেবতা, ভক্তি পুষ্প দিয়ে
স্তুতি ছন্দে করি বন্দনা।"

"বিরহ", "আষাঢ়ে" প্রভৃতি রচিত হইবার সময় হইতে এতাবৎকাল কবির যে সকল হাস্যেতররসাত্মক কবিতা বিভিন্ন সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে তাহাদেরই কয়েকটি "মন্দ্র" ও "আলেখ্যে" প্রকাশিত। ঐ উভয় পুস্তকই বঙ্গসাহিত্যে সুপরিচিত। "মন্দ্র" কাব্যের কবিতাগুলি কেবলমাত্র হাস্যরসাত্মক নহে। প্রত্যেক কবিতাতেই হাস্য করুণ

প্রভৃতি নানা রসের অপূর্ব্ব সমাবেশ আছে। নমুনা স্বরূপ আমরা যে কোন কবিতার নাম করিতে পারি। "মন্দ্র" কাব্যখানি বাংলার সাহিত্যকে অপরূপ বৈচিত্র্য দান করিয়াছে। ইহা নূতনতায় ঝলমল করিতেছে। এই কাব্যে যে ক্ষমতা প্রকাশ পাইয়াছে অবলীলাকৃত ও তাহার মধ্যে সর্ব্বত্রই প্রবল আত্মবিশ্বাসের একটি অবাধ সাহস বিরাজ করিতেছে। মন্দ্র কাব্যের প্রায় প্রত্যেক কবিতা যেন নব নব গতিভঙ্গে নৃত্য করিতেছে। ইহার কবিতাগুলির মধ্যে পৌরুষ আছে। "আলেখ্য" পুস্তকখানি "মন্দ্রের" অনেক বৎসর পরে প্রকাশিত এবং এখানি মন্দ্রের জাতি ভাই নহে। যাহাকে চিত্র বা নক্সা বলে আলেখ্যের কবিতাগুলি সেই জাতীয়। বঙ্গভাষায় এই জাতীয় কবিতা অধিক নাই। আলেখ্যের অধিকাংশ চিত্রই করুণ রসাত্মক। "মাতৃহারা", "হতভাগ্য" প্রভৃতি চিত্র-গুলি দেখিলে কাহার না চক্ষে জল আসে। আমাদের বিশ্বাস "মন্দ্রে" যতটা ক্ষমতা প্রকাশ পাইয়াছে "আলেখ্যে" তদপেক্ষা অধিক ক্ষমতা প্রকাশ পাইয়াছে। হাসির গানের লেখক যে সুন্দর করুণ রসাত্মক কবিতাও লিখিতে পারেন তাহা না পড়িলে কাহারও বিশ্বাস হইবে না। আলেখ্যের ভাষা, ভাব সমুদয় খাঁটি বাংলা। এই বইখানি সম্বন্ধে আরও একটি কথা বলিবার আছে তাহা কবির নিজের ভাষায় বলাই ভাল :—
"আলেখ্যের পদ্যগুলি কবিতা হোক বা না হোক—প্রহেলিকা নয়। এ গ্রন্থের কোন কবিতা পড়ে তার মানে দশজনে দশ রকম বের করে তাঁদের নিজেদের মধ্যে বিবাদ করার প্রয়োজন হবে না। কবিতাগুলির মানে যদি থাকে ত এক রকমই আছে। কোন কবিতায় দুই একটি শ্লোক যদি বোঝা না যায়, সেখানে আমি বল্‌বো যে সেটা আমার ভাষার দোষ; বৃহৎ ভাব দাবী কর্ব্ব না। পরিশেষে এও বলে রাখি যে আমার বর্ণিত বিষয়গুলি পার্থিব; আমি যে ভাবের ধারণা কর্ত্তে পারি সেই ভাব

সম্বন্ধেই লিখি; আর আমি নিজের কবিতার মানে নিজে বেশ বুঝ্‌তে পারি।" যাঁহারা কবির আনন্দবিদায় বা "up to date কৃষ্ণলীলা" পাঠ করিয়াছেন তাঁহারাই উদ্ধৃত কথা কয়েকটীর ইঙ্গিত বুঝিতে পারিবেন।

অতঃপর নাটককার দ্বিজেন্দ্রলালকে বুঝিবার চেষ্টা করা যাউক। দ্বিজেন্দ্রলাল "পাষাণী", "তারাবাই", "রাণাপ্রতাপ", "দুর্গাদাস", "সীতা", "নুরজাহান", "মেবারপতন", "সাহজাহান", "চন্দ্রগুপ্ত", "পরপারে" ও "সিংহল-বিজয়" এই এগারখানি নাটক "সোরাব রুস্তম" নামক একখানি অপেরা (নাট্যরসিক), "আনন্দবিদায়", "পুনর্জ্জন্ম", "হরিনাথের শ্বশুরবাড়ী যাত্রা" ও পূর্ব্বোক্ত কয়েকখানি ব্যঙ্গনাট্য রচনা করিয়াছেন। "সিংহল-বিজয়" কবির শেষ দান এবং মরণের পূর্ব্বমুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত তিনি এই গ্রন্থখানি সংশোধনে ব্যাপৃত ছিলেন। "সিংহল-বিজয়" এখনও সাধারণ্যে প্রকাশিত হয় নাই।—আশা করা যায় বইখানি "সাজাহান" লেখকের অনুপযুক্ত হইবে না। পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থগুলির মধ্যে "আনন্দবিদায়", "পুনর্জ্জন্ম" ও "হরিনাথ" কবির উপযুক্ত নহে। "তারাবাই" এর নাটকীয় উপাখ্যান-টিতে একটু রোমান্স আছে কিন্তু চরিত্র-চিত্রণ প্রভৃতি খুব বেশী ক্ষমতার পরিচায়ক নহে। অন্যান্য নাটকগুলির কোন্‌খানা স্থায়ী হইবে এবং কোন্‌খানা হইবে না তাহা জোর করিয়া বলিতে পারি না; আমাদের বিশ্বাস তাহাদের সকলগুলিতেই স্থায়িত্বের লক্ষণ আছে। দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকের পরিচয় দিতে যাওয়া বিড়ম্বনামাত্র। কোন এক বিখ্যাত কলেজের ইংরাজি সাহিত্যের অধ্যাপক "সাজাহান" পাঠ করিয়া বলিয়াছিলেন, এতদিনে বাংলা ভাষায় Study করিবার উপযুক্ত একখানি নাটক হইল। নিপুণ চরিত্রাঙ্কনেই নাটককারের শক্তির ও প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। পাত্র-পাত্রীর কথায় নাটকের বর্ণনীয় উপাখ্যান ফুটিয়া উঠে সত্য,

কিন্তু পাত্র-পাত্রীর কথোপকথনের ভিতর দিয়া একটি গল্প বলাইলেই নাটক হয় না। নাটকের আর একটি নাম দৃশ্যকাব্য। ছন্দোবদ্ধ ও শ্রুতিসুখকর বাক্যের সমষ্টিই কাব্য নহে। নিতান্ত ইট-পাথুরে গদ্যের ভিতরও কাব্যসুন্দরী সময় সময় স্বীয় অস্তিত্ব লুকাইয়া রাখেন। জহুরী যেমন পাথুরিয়া কয়লার ভিতর হীরকের অস্তিত্ব আবিষ্কার করেন তেমনি হৃদয়বান্ ব্যক্তি সাংসারিক ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ঘটনার মধ্যেও কাব্যের উপযোগী সৌন্দর্য্য আবিষ্কার করিয়া থাকেন। কাব্যে কেবল মেঘমালার পর-পারের দেশের পরীকন্যাগণের কাহিনী বর্ণিত হয় না; আমাদের আট-পহুরে জীবনের আহার-নিদ্রার কাহিনীও কাব্যে বর্ণিত হয়।

কবি তিনিই যিনি বিশ্বের মধ্যে বিশ্বেশ্বরের সুন্দর মূর্ত্তি নিরীক্ষণ করিয়া ধন্য হইয়াছেন; কবি তিনিই যিনি সেই অনন্ত সৌন্দর্য্যকে নিজের অন্তরের মধ্যে অনুভব করিয়াছেন এবং কবি তিনিই যিনি "শিবেতরক্ষতয়ে" অর্থাৎ অমঙ্গল বিনাশের জন্য স্বকীয় প্রাণের রংএ অঙ্কিত অনন্তদেবেশ জগন্নি-বাসের চিত্র জগৎবাসীকে দেখাইয়াছেন। এই সকল বরেণ্য কবির তুলিকা-স্পর্শে আমাদের চারিপার্শ্বের জগতের যে সকল উজ্জ্বল চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে তাহা দেখিয়া আমরা "অবাক্ হইয়ে থাকি।" নবীনা জননীর ক্রোড়ে শিশু না দেখিয়াছে কে? কিন্তু এই চিরপরিচিত দৃশ্যটিকে র‍্যাফেল যে চক্ষে দেখিয়াছেন, সেই চক্ষে আমরা কখনো দেখিয়াছি কি?

"আয় চাঁদ আয় রে চিক্ দিয়ে যারে" এই ছড়াটি বলিয়া "নূতন মাতা" শিশুকে চাঁদ দেখাইয়া থাকেন, কিন্তু এই শিশুকে চাঁদ দেখানোর চিত্রটির মধ্যে যে সৌন্দর্য্য নিহিত আছে তাহা একমাত্র কবি দ্বিজেন্দ্রলালই দেখিয়া-ছেন এবং তাঁহার দেশবাসীকে দেখাইয়াছেন। তাই তিনি কবি। কবি নিজেই লিখিয়াছেন :—

"নিদাঘ-সন্ধ্যার মহান্ দৃশ্য যাহার পক্ষে বর্ণসার,
কবিই নয় সে তাহার আত্মা শুষ্ক পিণ্ড মৃত্তিকার।
কবি সেই যে সে সৌন্দর্য্যে দেখে একটা মহাপ্রাণ;
কবি সেই যে দেখে, বিশ্ব গভীর অর্থে কম্পমান্।"

কাব্য সাধারণতঃ তিনভাগে বিভক্ত হইয়া থাকে যথা—মহাকাব্য, গীতিকাব্য ও নাট্যকাব্য। বর্ত্তমান যুগের ধাত ঠিক মহাকাব্যের উপযোগী নহে। আজ-কাল নাট্যকাব্য ও গীতিকাব্যেরই প্রাদুর্ভাব পরিলক্ষিত হয়। আপনারা কস্তুরিমৃগের কথা সকলেই জানেন। কস্তুরি-মৃগ নিজের দেহের সৌরভে আকুল হইয়া সমগ্র বন-গ্রাম ভ্রমণ করে এবং সর্ব্বত্রই সেই অপূর্ব্ব সৌরভ অনুভব করিয়া থাকে। গীতি কবিতার কবি ঠিক কস্তুরিমৃগের ন্যায়। তিনি নিজেকেই লইয়া সতত ব্যস্ত। সমগ্র জগৎকে তিনি দেখিয়া থাকেন, নিজের অনুভূতির ভিতর দিয়া তাঁহার নিকট সমগ্র জগতের পৃথক অস্তিত্ব হারাইয়া গিয়াছে। তাই গীতি-কবিতার তানের মধ্যে কবির সুখ দুঃখের, আশা-নিরাশার সুরটিই বিশেষ করিয়া বাজে। গীতি-কবিতার পাঠক কবির সুখ-দুঃখ প্রভৃতির সহিতই বিশেষরূপে পরিচিত। গীতি-কবিতা পাঠ করিবার সময় পাঠকের প্রাণের বীণার তার কবির প্রাণের বীণার তারের সহিত এক-সুরে বাঁধা হইয়া যায়। আপনারা শব্দবিজ্ঞানে পাঠ করিয়াছেন যে, যদি একগৃহে একই সুরে বাঁধা দুইটি বীণা-যন্ত্র থাকে, তবে একটিতে যে গান বাজান যায় অপরটিতেও ঠিক সেই গান বাজিতে থাকে। সংগীত শ্রবণ করিবার সময় কিম্বা গীতি-কবিতা পাঠ করিবার সময়ও ঠিক তাহাই হয়। আমরা আমাদের স্বতন্ত্র সত্ত্বা ভুলিয়া গিয়া কবির সহিত এক মন এক প্রাণ হইয়া "স্বপ্ন দিয়ে তৈরি" এক মানস-রাজ্যে বিচরণ করিতে থাকি। শ্বেত-দ্বীপের কবি Dryden এর রচিত Alexander's Feast এ এই

সত্যটি বিশেষরূপে বুঝান হইয়াছে। Alexander's Feast যে খুবভাল গীতিকবিতা তাহা বলিতেছি না। একটি উদাহরণ দিতেছি:—কবি Wordoworth এর *Lucy Gray* ও *Lucy* নামক সর্ব্বজন-বিদিত দুইটি কবিতা গ্রহণ করুন। "Lucy Gray" খুব উৎকৃষ্ট কবিতা কিন্তু তাহা সংগীত নহে; অথচ ঐ দ্বাদশ লাইনের ক্ষুদ্র কবিতা *Lucy* সংগীত। কবি দ্বিজেন্দ্রলালের মেবার-পতনের "ভেঙ্গে গেছে মোর" গানটির উল্লেখ করিয়াছি এবং সে গানটির অর্থ আমরা যাহা বুঝি তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি এবং পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি যে তাহা একটি সংগীত। কবির আর্য্যগাথা হইতে যে গানটি ইতিপূর্ব্বে নমুনাস্বরূপ উদ্ধৃত করিয়াছি তাহাও একটি সংগীত। ঐ কবিতাটিতে কবি তাঁহার একটি সুখ-স্মৃতির কথা আমাদিগকে শুনাইতেছেন কিন্তু যখন কবিতাপাঠ সমাপ্ত হয় তখন আমাদের মনে হয়, যেন আমরা জড়জগতের বাহিরে কোথায় চলিয়া গিয়াছিলাম। আমরা যেন অতীত সুখ স্মৃতির রাজ্যে বিচরণ করিতে-ছিলাম। অতএব বলিয়াছি যে কবিতাটি একটি সংগীত। "চণ্ডীদাস" "বিদ্যাপতি" "রামপ্রসাদ" প্রভৃতি গীতিকবিগণের রাজা। তাঁহাদের সংগীতের তুলনা জগতের সাহিত্যে বিরল! আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, হাঁসির গানের কবি যে করুণরসাত্মক কবিতা লিখিতে পারেন তাহা না পড়িলে বিশ্বাস করা যায় না। কিন্তু আর্য্যগাথা ও Lyrics of Ind এর কবির "নুরজাহান" ও "সাজাহান" রচনা করা তদধিক আশ্চর্য্যের বিষয়। নাট্য-কাব্যের ধাত ও গীতিকাব্যের ধাত এক নহে। নাটককার একজন দর্শক। জগতের আঘাত-সংঘাতের মধ্যে কিরূপে মানব-চরিত্রের অভিব্যক্তি হয় তাহই দেখান নাটকের অথবা দৃশ্য-কাব্যের উদ্দেশ্য। নাটককারকে একজন সুনিপুণ মনোবিজ্ঞানবিদ্ হইতে হইবে। মানব-চরিত্রের অন্তস্তলে প্রবেশ করিবার ক্ষমতা না থাকিলে নাটক রচনা করা

যায় না। কিরূপ পারিপার্শ্বিকের সংঘর্ষে কিরূপ চরিত্রের অভিব্যক্তি হইবে নাটককারের তাহা জানিতে হইবে। অনুভূতি ও চিন্তার প্রকৃতি কি নাটককার তাহা না জানিতে পারেন, কিন্তু অবস্থার বিপর্য্যয়ে মানবের মনে কিরূপ অনুভূতির বিপর্য্যয় ঘটিয়া থাকে তাহা তিনি জানেন। উভয়েই মনস্তত্ত্বজ্ঞ কিন্তু তাই বলিয়া William James একটি Hamlet গড়িতে পারিতেন না অথবা Shakespeare "Principles of Psychology" রচনা করিতে পারিতেন না। সেক্ষপীয়র একটি গোটা Hamlet তৈয়ার করিয়াছেন কিন্তু সেই Hamlet এর বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আমাদিগকে খুলিয়া দেখাইতে হইলে তিনি William James এর নিকট পরাজয় স্বীকার করিবেন সন্দেহ নাই। অতএব দেখা যাইতেছে যে, নাটককারের কার্য্য সংশ্লেষক (অর্থাৎ Synthetic) ও মনোতত্ত্ববিদের কার্য্য বিশ্লেষক অর্থাৎ (Analytic)—উভয়েই জগতের ক্রোড়ে পালিত হইয়াছেন এবং বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্ন মানবের সহিত মেলামেশা করিয়া আপনাদের অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছেন কিন্তু মনোবৈজ্ঞানিক সেই অভিজ্ঞতার ফলে জটিল মানব-চরিত্র বিশ্লেষণ করিয়া মনোজগতের ঘটনাবলীকে কার্য্য-কারণ-শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়া জগদ্বাসীকে দেখাইতেছেন এবং নাটককার স্বীয় অভিজ্ঞতালব্ধ মাল-মসলাসহযোগে একটি জটিল মানব-চরিত্র চিত্রিত করিয়া জনসাধারণকে উপহার দিতেছেন। মনোবিজ্ঞানের ভাষায় বলা যায়, একজনের কল্পনা বিশ্লেষকারী (Analytic) এবং অপরের কল্পনা সৃষ্টিকরী (Constructive)। আমরা মনোবিজ্ঞানে পাঠ করিয়াছি যে, দুষ্ক্রিয়ার সহযোগী সয়তান এবং সৎ-কর্ম্মের চিরসহচর পরমেশ্বর অথবা দুষ্ক্রিয়ার চিরসঙ্গী অনুতাপ এবং সৎ-কর্ম্মের পুরস্কার "আত্মতুষ্টি" ও "বিবেকের সহায়তা" (অর্থাৎ Green এর কথিত Self-Satisfaction এর Martineau কথিত Approval of

Conscience)। আমরা মনোবিজ্ঞানে আরও দেখিতে পাই কিরূপে মানব সয়তানের রাজ্য পদদলিত করিয়া ভগবানের রাজ্যে প্রবেশ করে। জার্ম্মান-দার্শনিক ফিক্‌টা বলিয়াছেন :—"পাপ হইতে পরিত্রাণ লাভ করা একটি অলৌকিক ঘটনাবিশেষ (miracle) কিন্তু এই অলৌকিক ঘটনার আরম্ভ আমাদের অন্তঃকরণেই হওয়া উচিত।" আমরা যতদিন আমাদের অন্তরে অন্তরে না বুঝি এটা পাপ ততদিন শত উপদেশেও সেটাকে পরিত্যাগ করি না। কিন্তু পাপকে পাপ বলিয়া বুঝিতে পারা যায় পুণ্যের সহিত পাপের তুলনায়। আমাদের নিজেদের পাপের গুরুত্ব যখন আমরা অনুভব করিতে পারি তখনই অনুতাপ জন্মে। বায়ু যেমন অগ্নির তেজ বৃদ্ধি করিয়া থাকে লোকনিন্দা ও সমগ্র জগতের ঘৃণা তেমন পাপীর অনুতাপের মাত্রা ক্রমেই বৃদ্ধি করিতে থাকে। তখন বিধাতার করুণা প্রেমাস্পদের আহবানরূপে আমাদের হৃদয়ে প্রতিভাত হইয়া অনুতাপের অগ্নি নির্ব্বাণ করিয়া থাকে। তখন আমরা পাষাণী অহল্যার মত বলি—"নাথ। তব পুণ্যতেজে আজি অন্ধ আমি, কোথা তুমি? কতদূর? সঙ্গে করে লও।" যেমন হীনধাতুমিশ্রিত স্বর্ণকে পোড়াইলে তাহা বিশুদ্ধ হইয়া স্বকীয় স্বাভাবিকী আভায় আমাদের নয়নরঞ্জন করে তেমনি অনুতাপের দ্বারা বিশুদ্ধ হইলে পুনরায় পাপীর হৃদয়ও কৌস্তভ মণির ন্যায় ভগবানের বক্ষে বিরাজ করে। উপরে যে সকল মনোবিজ্ঞানের "airy nothings"এর কথা বলা হইল, কবি তাহাদিগকে একটি "local habitation and name" দিয়াছেন তাঁহার "পাষাণী" নাটকে। যে পাষাণী স্বেচ্ছায় পাপিনী সেই পাষাণীই আবার প্রত্যেক হিন্দুর প্রাতঃস্মরণীয়া। রামায়ণের কবি "পাষাণীর" উপাখ্যানে যে মনোবিজ্ঞানের কথাগুলি বলিতে চাহিয়াছেন তাহা না বুঝিতে পারিয়া অনেক কবিই পাষাণীর উপাখ্যানের যথেচ্ছ পরিবর্ত্তন করিয়াছেন। সমালোচকশ্রেষ্ঠ বিজয়চন্দ্র

মজুমদার মহাশয় "পাষাণীকে" জর্ম্মাণ কবি গেটার "ফাউষ্টের" সহিত তুলনা করিয়াছেন। নব্যভারত-সম্পাদক মহাশয় পাষাণী-সমালোচনায় বলিয়াছিলেন:—"অপূর্ব্ব, সুন্দর, মহান্; ফিডিয়সের ভাস্কর-কর্ম্ম, রাফেলের চিত্র। মহর্ষি গৌতমের চিত্র গেটে ও সেক্সপীয়রের নিন্দার বিষয় নহে।" এই সমালোচনাদ্বয় যে অত্যুক্তিদোষদুষ্ট সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই কিন্তু কবির পাষাণীও যে এক অপূর্ব্ব বস্তু তাহাতেও কোন সন্দেহ নাই। মহাকবি মিল্‌টনের Paradise lost ও Paradise Regainedএর তুলনা জগতের সাহিত্যে বিরল। উদ্দেশ্য-হিসাবে বিচার করিতে গেলে আপনারা পাষাণীকে একখানি Paradise lost ও Paradise Regained বলিতে পারেন। কবিত্ব-হিসাবে Miltonএর সহিত দ্বিজেন্দ্র-লালের তুলনা করিতেছি না, কেননা তাহা করিলে লোকে আমাকে পাগলা-গারদে প্রেরণ করিবার ব্যবস্থা করিবে। পাষাণী প্রথম প্রকাশিত হয় ১৩০৭ সালে অর্থাৎ "আষাঢ়ে" প্রকাশিত হইবার কিছুদিন পরে। "পাষাণী" হইতেই কবির জীবনের তৃতীয় অধ্যায় আরম্ভ হইল। কবির জীবনের প্রথম অধ্যায় "গীতি-কাব্যের যুগ," দ্বিতীয় অধ্যায় "হাসির গানের যুগ" ও তৃতীয় অধ্যায় "নাট্যকাব্যের যুগ"। কবির জীবনের তৃতীয় অধ্যায়-সম্বন্ধে অনেক কথা বলিবার আছে কিন্তু কথাগুলি আপনারা সকলেই জানেন অতএব অতি বিস্তার করিয়া বলিবার কোনই প্রয়োজন নাই। পাষাণীর পর কবি যতগুলি নাটক রচনা করিয়াছেন, তন্মধ্যে "সীতা" ও "পরপারে" ব্যতীত সকলগুলিই ঐতিহাসিক। "পরপারে" গ্রন্থখানি দ্বিজেন্দ্রবাবুর প্রথম সামাজিক নাটক। গল্পটি করুণরসাত্মক—আরম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত পাঠকের অশ্রু-বিসর্জ্জন করিতে হয়। কিন্তু এখানে একটি কথা বলা ভাল, "পরপারে পাঠ করিয়াই পাঠক যেন বঙ্গীয় সমাজ-সম্বন্ধীয় কোন ধারণা করিয়া না বসেন।"

ঐতিহাসিক নাটকগুলির মধ্যে "চন্দ্রগুপ্ত" হিন্দুযুগের এবং অপর কয়েকখানি মুসলমান রাজত্বকালের কোন না কোন ঘটনা অবলম্বনে রচিত। চন্দ্রগুপ্ত নাটকে কবি হিন্দু নাটককারগণেরই অনুসরণ করিয়াছেন এবং ব্রাহ্মণ চাণক্যের প্রভুত্ব দেখাইয়াছেন। চাণক্যের চরিত্র অতি সুন্দর ফুটিয়াছে কিন্তু গ্রন্থের নায়ক চন্দ্রগুপ্তের চরিত্র সুন্দর-ভাবে চিত্রিত হয় নাই। চাণক্যের পার্শ্বে চন্দ্রগুপ্তকে নিতান্তই নিষ্প্রভ দেখায়। "আণ্টিগোনাস" চরিত্রটি অতি যত্নের সহিত চিত্রিত হইয়াছে। আর একটি চরিত্র আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে সেটি "হেলেন" কিন্তু হেলেনকে "মেহেরউন্নিসার" চিত্র দেখিবার পর অতীব নিষ্প্রভ মনে হয়। চন্দ্রগুপ্তের প্রথম দৃশ্যে ভারতবর্ষের বর্ণনা অতি সুন্দর। পঞ্চম অঙ্কের চতুর্থ দৃশ্যে গ্রন্থখানির উদ্দেশ্য অতি সুন্দরভাবে বর্ণিত হইয়াছে। কবির মতে প্রধান গ্রীস ও প্রাচীন ভারতের সমন্বয় করিতে হইবে। সে কি উজ্জ্বল দৃশ্য! প্রাচীন গ্রীস ও প্রাচীন ভারতের সমন্বয় জগতে এক অপূর্ব্ব সভ্যতা আনয়ন করিবে। সে সভ্যতা ও সে উন্নতির নিকট বর্ত্তমান য়ুরোপ ও আমেরিকার প্রাণহীন সভ্যতা পরাজয় স্বীকার করিবে। অতঃপর যে চরিত্র এই গ্রন্থখানিকে বঙ্গ-সাহিত্যে অমর করিয়া রাখিবে সেই চাণক্য-চরিত্রের পরিচয় দিতে চাহি। চাণক্যের চরিত্রচিত্রণে অনন্য-সাধারণ নৈপুণ্য ও ক্ষমতা প্রকাশ পাইয়াছে। প্রথমেই আমরা দেখিতে পাই চাণক্য শ্মশানবাসী। যে সকল বন্ধন মানুষকে সংসারে ধরিয়া রাখে চাণক্যের একটি একটি করিয়া সে সকলগুলিই ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। চাণক্যের হৃদয় নাই। অত্যাচারে, অবিচারে প্রপীড়িত হইয়া চাণক্যের মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। তাঁহার মনে প্রবল প্রতিবিধিৎসা-বহ্নি নিরন্তর ধিকি-ধিকি করিয়া জ্বলিতেছে। এই অবস্থায় মানুষ, মানুষকে মানে না, সমাজকে মানে না এবং পরমেশ্বরকেও মানে না। ইহারা পরমে-

শ্বরের বিদ্রোহী পুত্র—Milton এর সয়তানের সহিত সমস্বরে ইহারাই বলিয়া থাকে "Evil be thou my good" চাণক্য সয়তানকে তাঁহার প্রেয়সী করিয়াছেন এবং সয়তানের সহিত সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছেন। এইরূপ ব্যক্তি অনন্যসাধারণ প্রতিভার অধিকারী হইলে যেরূপ হইয়া থাকে চাণক্য ঠিক সেইরূপ। চাণক্য কূট, চাণক্য প্রতিভাবান্, চাণক্য সয়তানের রাজা, চাণক্য হৃদয়হীন, চাণক্য নাস্তিক, চাণক্য প্রতিহিংসাপরায়ণ, ও চাণক্য ব্রাহ্মণের লুপ্ত প্রভুত্বের পুনরুদ্ধারে বদ্ধপরিকর। এই সংক্ষিপ্ত পরিচয় হইতেই আপনারা বুঝিতে পারিবেন চাণক্যের চরিত্র কত জটিল। আমরা জানি মানুষ রাক্ষস হইলেও তাহার অন্তর্নিহিত মনুষ্যত্বকে গলা টিপিয়া মারিয়া ফেলিতে পারে না! কোন না কোন সময়ে সেই মনুষ্যত্ব আত্মপ্রভাব বিস্তার করিবেই করিবে। এই কথাটি কবি অতি সুন্দর করিয়া তাঁহার চাণক্যে দেখাইয়াছেন। যখন চাণক্য পর্ব্বতশৃঙ্গে দণ্ডায়মান হইয়া মহাপতনের জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন তখনও তাঁহার অন্তর্লীন মনুষ্যত্ব একেবারে মরিয়া যায় নাই। তখনও থাকিয়া থাকিয়া হৃতাকন্যা আত্রেয়ীর কথা অন্তঃসলিলা ফল্গুর ন্যায় তাঁহার হৃদয়-মরুকে সরস করিত। কিন্তু দূরে ঐ কাহার কণ্ঠ শুনা যায়—কে ভিখারিণী রাজপথে করুণকণ্ঠে গান গাহিয়া যাইতেছে? ঐকি সেই—ঐকি হৃদয়হীন চাণক্যের সর্ব্বস্বধন—ঐকি হৃতাকন্যা আত্রেয়ী? হাঁ ঐত সেই—ঐত হৃতা আত্রেয়ী! চাণক্য বুঝিতে পারিলেন না তিনি জীবিত কি মৃত! তিনি জানেন না তিনি স্বর্গে কি নরকে! তিনি বুঝিতে পারিতেছেন না ভিক্ষুককে দণ্ড দিবেন কি পুরস্কার দিবেন! এখন আর চাণক্য হৃদয়হীন নহেন—তাঁহার ভাঙ্গা-হৃদয় আবার জোড়া লাগিয়াছে—তিনি মগধরাজ্যাপেক্ষা বড় রাজ্য পাইয়াছেন সে আত্রেয়ীর স্নেহের রাজ্য। তিনি এখন সেই রাজ্যের রাজা—পিশাচ

চাণক্য এখন আবার মানুষ চাণক্য—চন্দ্রগুপ্তের মন্ত্রিত্ব আর তিনি চাহেন না। এখন তিনি যে রাজা, আর মন্ত্রিত্বের ভিখারী হইবেন কোন্ দুঃখে? কবির অপর কয়েকখানি নাটক বঙ্গ-সাহিত্যের চিরস্থায়ী সম্পদ। চরিত্র-চিত্রণে, কবিত্বে, ভাষার মধুরতায়, ভাবের গাম্ভীর্য্যে তাহারা বংলা নাটকের আদর্শ। "সাজাহান," "নুরজাহান," "রাণাপ্রতাপ," "দুর্গাদাস," ও "মেবার-পতন" কবিকে বঙ্গভূমে অমর করিয়া রাখিবে। সাজাহানের ঔরংজীব-চরিত্র বিশ্লেষণ করিবার সাধ্য আমার নাই, নুরজাহানের নুরজাহান-চরিত্র বুঝাইতে হইলে সমগ্র পুস্তকখানি পাঠ করিয়া শুনাইতে হয় এবং রাণাপ্রতাপের শক্তসিংহকে শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত আমরা ঠিক বুঝিতে পারি না। দুর্গাদাসের "দুর্গাদাস" ও "দিলীর খাঁ" আদর্শ মানুব এবং দীন "কাসিম" স্বর্গের দেবতা। এই তিনটি চরিত্র অঙ্কিত করিয়া কবির লেখনি ধন্য হইয়াছে এবং নিরীক্ষণ করিয়া সাহিত্য-পাঠকের নয়ন সার্থক হইয়াছে। রাণাপ্রতাপের মেহেরউন্নিসার চরিত্র এক অপূর্ব্ব জিনিস। মেহেরউন্নিসার পূর্ণবিকাশ হইয়াছে "মেবার-পতনের" মানসীতে। মানসীর চিত্র নিরীক্ষণ করিলে বস্তুতঃই কাব্যবিশারদের ভাষায় বলিতে ইচ্ছা করে:—"ধন্য সেই কবিবর; ধন্য সেই চিত্রকর চিত্রিত মানসী দেবী যার তুলিকায়।" কবির এই কয়েকখানি গ্রন্থ বুঝিতে হইলে তাহাদিগকে প্রথমতঃ "ব্যষ্টিভাবে" বুঝিতে হইবে এবং দ্বিতীয়তঃ তাহাদিগকে "সমষ্টিভাবে" বুঝিতে হইবে। ঔরংজীবকে বুঝিতে হইলে প্রথমতঃ সাজাহানের ঔরংজীবকে বুঝিতে হইবে তৎপরে দুর্গাদাসের ঔরংজীবকে বুঝিতে হইবে এবং তৎপরে কিরূপে সাহাজানের ঔরংজীব দুর্গাদাসের ঔরংজীবে পরিণত হইলেন তাহাই বুঝিতে হইবে। আমাদের সময়াভাবে উক্ত গ্রন্থগুলির বিস্তৃত পরিচয় দিতে পারিলাম না। কবি "মেবার-পতনের" ভূমিকায় স্বীয়

নাটকাবলীর যে সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়াছেন তাহা পাঠ করিলেই যথেষ্ট হইবে।

কবি ও তাঁহার গ্রন্থাবলীর পরিচয় দিলাম। বঙ্গ-সাহিত্যে কবিবর দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের স্থান কোথায় এ প্রশ্নের উত্তর দিবার ভার উপস্থিত ভদ্রমহোদয়গণের (বিশেষতঃ সভাপতি মহাশয়ের) উপর থাকিল। উপসংহারে কবি দ্বিজেন্দ্রলাল বঙ্গবাসীকে যাহা শিখাইতে চাহিয়াছেন সেই বিষয়ে দুই একটী কথা বলিব। কবি কিরূপে বঙ্গ-সমাজ হইতে ভণ্ডামি প্রভৃতি দূর করিয়া মনুষ্যত্ব প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিয়াছেন তাহা প্রবন্ধের অনেক স্থানেই বলিয়াছি। কবি কিরূপে বঙ্গবাসিগণের প্রাণে স্বদেশপ্রেমের সঞ্চার করিয়াছেন তাহা তাঁহার কয়েকটি সংগীত পাঠ করিলেই বোঝা যায়। হিন্দু-মুসলমান এক হইয়া যে মায়ের পূজা করিতে হইবে তাহা তাঁহার প্রত্যেক নাটকেই বলিয়াছেন।

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সান্যাল।

নাট্য সাহিত্য ও দ্বিজেন্দ্রলাল

ইউরোপ, আমেরিকা প্রভৃতি মহাদেশ যখন ঘোর অজ্ঞানান্ধকার-সমাচ্ছন্ন, হিন্দুস্থান তখন সভ্যতাগগনে প্রচণ্ড মার্তণ্ডের ন্যায় দেদীপ্যমান থাকিয়া জ্ঞানের জ্যোতি বিকীরণ করিতেছিল। বৈদিককালের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, দেবগণের লীলাভূমি এই ভারতবর্ষ হইতেই কলাবিদ্যার বিমল স্নিগ্ধ কিরণ দিগদিগন্ত আলোকিত

করিয়াছিল। কলাবিদ্যার প্রধান অঙ্গ সঙ্গীত-শাস্ত্র। প্রাচীন ভারতে বিজ্ঞান ভিত্তিমূলক সঙ্গীতশাস্ত্র উন্নতির পরাকাষ্ঠালাভ করিয়াছিল। সঙ্গীতকে হিন্দুগণ মুক্তির সর্ব্বপ্রধান সোপান বলিয়া বিবেচনা করিতেন। ব্রহ্মা চতুর্ম্মুখে বেদগান করিতেন; মহাদেব পঞ্চমুখে হরিগুণ কীর্ত্তন করিতে করিতে শ্মশানে-মশানে ভ্রমণ করিয়াছেন। ভগবান ভক্তকুল-শ্রেষ্ঠ নারদকে বলিয়াছেন—

"নাহং বসামি বৈকুণ্ঠে যোগীনাং হৃদয়ে ন চ।
মদ্ভক্তা যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ।"

সেইজন্যই বোধ হয় নারদঋষি বীণাযন্ত্র সহকারে হরিগুণ গান করিতে করিতে পৃথিবী ভ্রমণ করিয়াছেন; আর্য্যঋষিগণ অমৃতোপম উদাত্ত ও অনুদাত্ত স্বরে বেদগান করিয়া পুণ্যতোয়া তটিনীতট ও চিরশান্তি-নিকেতন তপোবন মুখরিত করিয়াছেন। অতীত বৈদিকযুগের ইতিহাস পরিত্যাগ করিয়া বর্ত্তমান যুগের উপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেও দেখিতে পাওয়া যায় নদীয়ার অবতার চৈতন্যদেব সঙ্গীত-সাহায্যেই এই নীতিব

"জীবে দয়া নামে রুচি ভক্তি নারায়ণে,
সকল ধর্ম্মের পরে রাখিও স্মরণে।"

প্রবর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন। শুনাযায় সাধকশ্রেষ্ঠ রামপ্রসাদ একমাত্র সঙ্গীতমন্ত্রেই মহামায়ার মহাশক্তিকে আয়ত্ত করিয়া সিদ্ধ-পুরুষের ন্যায় ইচ্ছানুরূপ ব্যবহার করিতেন। সঙ্গীতের অপূর্ব্ব আকর্ষণী শক্তি আছে বলিয়াই শাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়:—

"জপ কোটীগুণং ধ্যানং ধ্যানকোটী গুণং লয়ঃ।
লয়কোটী গুণং গানং গানাৎ পরতরং নহি।"

সেইজন্যই বোধ হয় আর্য্যঋষিগণ দৈনন্দিন আধ্যাত্মিক-কার্য্যকলাপ-বিষয়ক মন্ত্রতন্ত্র উচ্চারণে সুর ব্যবহার করিতেন। আতিথ্য...

সঙ্গীত সর্ব্বত্র পূজিত। শোকতাপবিদগ্ধ প্রাণে অমৃত সিঞ্চন করিতে সঙ্গীত অদ্বিতীয়। সঙ্গীতের আকর্ষনী শক্তি বনের পশু প্রভৃতি ইতর জীবগণকেও আকৃষ্ট করে। ধন্য সঙ্গীত! ধন্য তোমার অলৌকিক দিব্যশক্তি! নৃত্য-গীত-বাদ্যের সাধারণ সংজ্ঞাই সঙ্গীত।

"গীতং বাদ্যং নর্ত্তনঞ্চ ত্রয়ং সঙ্গীতমুচ্যতে।"

সঙ্গীতের এই তিন অংশের সহিতই নাট্য-সাহিত্য সম্পর্কিত। নাট্য-সাহিত্য সঙ্গীতশাস্ত্রেরই অন্তর্গত। অতি প্রাচীনকাল হইতেই ভারতে নাট্যকলার বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। পণ্ডিতগণ অনুমান করেন যে, মহর্ষি ভরতই পৃথিবীতে সর্ব্বপ্রথম নাট্য-কলার প্রচার আরম্ভ করিয়াছিলেন। রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থসমূহেও নাট্যাভিনয়ের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। অতি প্রাচীনকালের নাট্য-সাহিত্য-গ্রন্থের ও নাট্যকারগণের নামসংগ্রহ করা এক প্রকার অসম্ভব। কালিদাস, ভবভূতি প্রভৃতির পূর্ব্বকালে "দশকুমার-চরিত" ও "কাব্যাদর্শ" রচয়িতা কবি নাট্যকার দণ্ডীর নাম দৃষ্ট হয়। কালিদাস, ভবভূতি প্রভৃতির অভ্যুদয়-সময়কেই প্রাচীন ভারতে নাট্য-সাহিত্যের উৎকর্ষের কাল বলা যাইতে পারে, ভারতের তদানীন্তন নাট্য-সাহিত্য অপূর্ব্ব শ্রীধারণ করিয়া উন্নতির পরাকাষ্ঠালাভ করিয়াছিল। যতদিন পর্য্যন্ত ভাষার আদর থাকিবে, কাব্যের সম্মান থাকিবে, ততদিন পর্য্যন্ত অমর কবি কালিদাস ও ভবভূতি প্রভৃতির অমূল্য গ্রন্থনিচয় সাহিত্য-জগতের অতি উচ্চ আসন অলঙ্কৃত করিবে। কালের সর্ব্ববিধ্বংসী নিয়মানুসারে হিন্দু-রাজত্বের অবসান হইলে এবং দেবভাষা সংস্কৃত বাণপ্রস্থ ধর্ম্ম অবলম্বন করিলে হিন্দু-সাহিত্য আর আপন প্রভাব-প্রতিপত্তি বৃদ্ধি করিতে সমর্থ হয় নাই। এই সময়কেই প্রাচীন ভারতে নাট্যসাহিত্যের অপকর্ষের কাল বলা যাইতে পারে। যেমন এক রাজত্বের অবসান এবং অপর রাজত্ব-সংস্থাপন মধ্যবর্ত্তী-কাল

অতীব ভয়াবহ, সমস্তই উচ্ছৃঙ্খল, সাহিত্য জগতেও সেই প্রকার এক ভাষার তিরোভাব এবং অন্য ভাষার আবির্ভাব মধ্যস্থ সন্ধিকাল ভয়ঙ্কর দুঃসময়। এক সংস্কৃত ভাষার স্থলে দেশ ও জাতিভেদে নানাভাষায় সৃষ্টি আরম্ভ হইল। বঙ্গভাষার সহিতই আমাদিগের সম্বন্ধ। অতএব বাঙ্গলা-ভাষার জন্ম ও ক্রম-বিকাশ হইতেই আমরা নাট্য-সাহিত্যের-সংক্ষিপ্ত আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব। বাঙ্গলাভাষা বিকাশের প্রাক্কালে দোহা, পদাবলী প্রভৃতি, পরে পাঁচালী ও ভাসান পরোক্ষভাবে নাট্য-কলার কার্য্য-সাধন করিয়া আসিতেছিল। অনুমান ২৫০ আড়াই শত বৎসর পূর্ব্বে "মনসার-ভাসান" রচিত হইয়া গীত হয়। ক্রমে নাট্য-কলার উপর বঙ্গের ধনী ও বিদ্বৎ-সমাজের শুভ দৃষ্টি পতিত হয়। মহারাজা স্যার যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর বাহাদুর, ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র, প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, নরেন্দ্রনাথ সেন, কৃষ্ণবিহারী সেন প্রভৃতি গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ নাট্যাভিনয় করিয়া গিয়াছেন। ইহারা অস্থায়ী নাট্যশালা প্রস্তুত করিয়া অভিনয় করিতেন। মহারাজ স্যার যতীন্দ্রমোহনের নিকট বাঙ্গলার প্রাথমিক নাট্য-সাহিত্য বহু বিষয়ে ঋণী। তিনি স্বয়ং বিদ্যাসুন্দর হইতে নাটক রচনা করিয়া পাথুরিয়াঘাটার বঙ্গ-নাট্যালয়ে ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে উহার প্রথম অভিনয় প্রদর্শন করেন। আমরা অভিনয় পর্য্যায়ক্রমে তদানীন্তন প্রধান প্রধান নাট্য-সাহিত্যের নামোল্লেখ করিব।

১৮৩১ খৃষ্টাব্দে কলিকাতার শ্যামবাজারে বিদ্যাসুন্দর প্রথম অভিনীত হয়। এই নাটকের স্ত্রী-চরিত্র স্ত্রীলোক দ্বারা অভিনীত হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ। কোন অজ্ঞাতলেখককর্ত্তৃক মূল সংস্কৃত হইতে অনুবাদিত হইয়া কলিকাতা ছাতুবাবুর বাড়ীতে শকুন্তলা ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে প্রথম অভি-নীত হয়। মাইকেল মধুসূদন দত্তের শার্ম্মিষ্ঠা ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর

মাসে বেলগাছিয়ায় অভিনীত হয়। মহারাজা স্যার যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রভৃতি কৃতবিদ্য লোক এই নাটক অভিনয় করেন।

উমেশচন্দ্র মিত্ররচিত বাঙ্গলাভাষার প্রথম বিয়োগান্ত নাটক বিধবা-বিবাহ কলিকাতার সিন্দুরিয়াপটীতে প্রথম অভিনীত হয়। কথিত আছে, কৃষ্ণবিহারী সেন, নরেন্দ্রনাথ সেন, প্রতাপচন্দ্র মজুমদার প্রভৃতি বিখ্যাত ব্যক্তিগণ এই নাটকের অভিনয় করিয়াছিলেন।

১৮৬৫ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে শোভাবাজার প্রাইভেট থিয়েটার-সোসাইটী কর্তৃক কৃষ্ণকুমারী প্রথম অভিনীত হয়। এই নাটকের গানগুলি মহারাজা স্যার যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর বাহাদুরের রচিত বলিয়া প্রকাশ। রামনারায়ণ তর্করত্নপ্রণীত সামাজিক "নবনাটক" ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে জানুয়ারী মাসে এবং মূল সংস্কৃত নাটক অবলম্বনে লিখিত "মালতী মাধব" ঐ সনেরই সেপ্টেম্বর মাসে প্রথম অভিনীত হয়। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দের মে মাসে কলিকাতার বাগবাজারে দীনবন্ধু বাবুর "লীলাবতী" প্রথম বার অভিনীত হইয়াছিল। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দের ৭ই ডিসেম্বর দীনবন্ধু বাবুর "নীলদর্পণ" লইয়া জোড়াসাঁকো মধুসূদন সান্ন্যালের বাড়ীতে ন্যাশনেল থিয়েটার খোলা হয়। নটকুলচূড়ামণি পরলোকগত অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফী মহাশয় একই অভিনয়ক্ষেত্রে গোলকচন্দ্র, সাবিত্রী, মিঃ উড্ ও জনৈক চাষার চরিত্র অতিশয় কৃতিত্বের সহিত অভিনয় করিয়াছিলেন। ইহার পর হইতেই মুস্তফী মহাশয় নাট্য-জগতে সবিশেষ পরিচিত হইয়া উত্তরকালে "নটকুল চূড়ামণি" আখ্যা প্রাপ্ত হন। দীনবন্ধু বাবুর সর্ব্বপ্রধান ও শক্তিশালী নাটক "নীলদর্পণ" নীলকরদিগের অত্যাচার নিবারণে অতিশয় সাহায্য করিয়াছিল! নীলদর্পণ ইংরেজীতে অনুবাদ করিয়া একজন ইংরেজী পাদ্রী অর্থ ও কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। কথিত আছে মাইকেল মধুসূদন দত্তও নীলদর্পণের ইংরেজী অনুবাদ করেন কিন্তু তিরস্কৃত হইয়া তাহা

প্রকাশ করিতে সাহসী হন নই। ইউরোপের অনেক ভাষায় নীলদর্পণ অনুবাদিত হয়। ইহা বঙ্গনাট্য-সাহিত্যের নিতান্ত সৌভাগ্য ও শ্লাঘার কথা। ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে দীনবন্ধু বাবুর ২য় নাটক "নবীন-তপস্বিনী" এবং ঐ সনেরই ডিসেম্বর মাসে কবির শেষ-রচিত "কমলে কামিনী" ন্যাসনেল থিয়েটারকর্ত্তৃক প্রথম অভিনীত হয়। বহুবাজার-নাট্য-সম্প্রদায়কর্ত্তৃক মনোমোহন বসুর "হরিশ্চন্দ্র", "সতীনাটক", "প্রণয় পরীক্ষা নাটক" ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে অভিনীত হইয়াছিল। মাইকেল মধুসূদন দত্তের শেষ-রচনা "মায়াকানন" ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দের ১৮ই এপ্রিল অভিনীত হয়। শুনা যায় মাইকেল "রিজিয়া" নাটকও রচনা করেন; কিন্তু অপ্রীতিকর হইবার ভয়ে আর উহা অভিনীত বা প্রচারিত হয় নাই। মাইকেল মধুসূদন ও দীনবন্ধুবাবু অনেক প্রহসনও রচনা করিয়া গিয়াছেন। মহারাজা স্যার যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর রচিত "চক্ষু-দান" প্রহসন তৎপ্রতিষ্ঠিত পাথুরিয়াঘাটা বঙ্গনাট্যালয়ে বিদ্যাসুন্দরের সহিত অভিনীত হয়। বঙ্গে স্থায়ী নাট্যশালা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নাট্য-সাহিত্যেরও বৃদ্ধি হইতে থাকে। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের "অশ্রুমতী", "সরোজিনী" প্রভৃতি ঐতিহাসিক নাটক বেঙ্গল-থিএটারে অভিনীত হয়। এই সময় নাট্য-সাহিত্যজগতে দুইজন প্রতিভাশালী কবির আবির্ভাব হয়; নাট্যাচার্য্য গিরীশচন্দ্র ও কবিবর রাজকৃষ্ণ রায়। ইঁহারা উভয়েই অদম্য উৎসাহভরে ও নিত্য নূতন উপচারে বাণীর সেবা করিয়া নাট্য-সাহিত্যের অশেষ শ্রীবৃদ্ধি ও কল্যাণসাধন করিয়া গিয়াছেন। সর্ব্বত্র সুপরিচিত বলিয়া ইঁহাদের গ্রন্থের নামোল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। রাজকৃষ্ণ রায়ের ভক্তিরসাত্মক "প্রহ্লাদ-চরিত্র" ও গিরীশচন্দ্রের "চৈতন্য-লীলা" ধর্ম্মরাজ্যে এক নূতন যুগ অবতারণ করে। ইঁহাদের সময় অমৃতলাল বসুও নাট্যকার বলিয়া পরিচিত হন, কবিবর রাজকৃষ্ণ রায়ের অকালমৃত্যুর পর মনীষী

নাট্যকার ক্ষীরোদপ্রসাদ "ফুলশয্যা" হাতে লইয়া নাট্য-সাহিত্য-জগতে আবির্ভূত হন। ফুলশয্যা অভিনয়ের পরেই ক্ষীরোদপ্রসাদ উদীয়মান নাট্যকবি বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিলেন।

"আলিবাবা" ক্ষীরোদপ্রসাদের যশঃ-সৌরভ চতুর্দ্দিকে বিক্ষেপ করে। নাট্য-সাহিত্য-জগতে "প্রতাপাদিত্য" ক্ষীরোদপ্রসাদের প্রতাপ ও অদম্য স্বদেশপ্রেম ঘোষণা করে। নাট্যশালার প্রতিযোগিতা ও প্রতিদ্বন্দ্বীতার সময় অনেক হঠাৎ কবি আবির্ভূত হইয়া নাট্য-সাহিত্যক্ষেত্র আবর্জ্জনা-পূর্ণ করিয়া ফেলে। এই দুর্দ্দশার দিনে বীণাপাণি তাঁহার একনিষ্ঠ সাধক স্বদেশপ্রেমিক কবি দ্বিজেন্দ্রলালকে নাট্য-সাহিত্যের প্রাণ-প্রতিষ্ঠার আদেশ করেন। বাণীর আশীর্ব্বাদ শিরে ধারণ করিয়া রসিককবি দ্বিজেন্দ্রলাল রাজপুতকুলপ্রদীপ, বীরকেশরী প্রতাপসিংহকে নাট্যজগতে আবির্ভূত করেন। বাঙ্গলার "প্রতাপ" যেমন ক্ষীরোদপ্রসাদের, রাজপুতানার "প্রতাপ"ও তেমন দ্বিজেন্দ্রলালের দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ ঘোষণা করে। একই সময়ে দুই "প্রতাপের" আবির্ভাবে নাট্যসাহিত্যে যেন মণি-কাঞ্চনের সংযোগ হইল। দুই প্রতাপের প্রতাপে সুজলা-সুফলা-বঙ্গভূমি টলমল করিয়া উঠিল; নাট্য-সাহিত্যের সেই একটানা একঘেয়ে স্রোত হঠাৎ ফিরিয়া গেল। বৃদ্ধকবি গিরীশচন্দ্রও পুরাণ এবং সমাজ লইয়া চুপ করিয়া থাকিতে পারিলেন না, তিনিও ইঁহাদের সঙ্গে সম্মিলিত হইলেন। পরস্পর প্রতিযোগিতা ও প্রতিদ্বন্দ্বীতার ফলে নাট্য-সাহিত্য বহুরত্নালঙ্কার লাভ করিল। গিরীশচন্দ্রের সিরাজউদ্দৌলা, মীরকাসম, ক্ষীরোদপ্রসাদের রঞ্জাবতী, চাঁদবিবি, রঘুবীর, পদ্মিনী, ও পলাশীর প্রায়শ্চিত্ত এবং দ্বিজেন্দ্রলালের দুর্গাদাস, সাজাহান, নুরজাহান, চন্দ্রগুপ্ত ও মেবারপতন প্রতিযোগীতার অমৃতময় ফল।

বর্ত্তমান প্রবন্ধে দ্বিজেন্দ্রলালের সহিতই আমাদের সম্পর্ক। অতএব

আমরা তাঁহার নাট্যসাহিত্যসম্বন্ধে অতি সংক্ষেপে দুই একটি কথা বলিবার চেষ্টা করিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিব। নাটক লিখিবার পূর্ব্বে বিষয়-নির্ব্বাচন করা নাট্যকারদিগের প্রথম ও প্রধান কাজ। এইকাজে দ্বিজেন্দ্র-লাল গভীর গবেষণা ও বহুদর্শীতার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। তাঁহার প্রত্যেক নাটকই সমাজ ও সময়ের উপযোগী হইয়া রচিত হইয়াছিল। চরিত্রগঠনে তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন; পাষাণী, প্রতাপসিংহ, দুর্গাদাস, সাজাহান ও নূরজাহান তার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত রাজপুতকুলগৌরব প্রতাপের চরিত্র কি মহান! কি মধুরতাময়! স্বদেশের স্বাধীনতা, স্বজাতির মান-মর্য্যাদা ও বংশ-গৌরব রক্ষার জন্য এরূপ অপূর্ব্ব কষ্ট-সহিষ্ণুতা, অমানুষিক আত্মত্যাগ ও কঠোরকর্ত্তব্য পরায়ণতা মান-চরিত্রে সম্ভব হয় কি? কবি অতিসুন্দরভাবে এই সমস্তগুণ পরিস্ফুট করিয়া প্রতাপের দেবচরিত্র অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন। [illegible]শীকে তিনি আদর্শ রাজপুতরমণী করিয়া অঙ্কিত করিয়াছেন। স্ব[illegible]র স্বাধীনতা-সূর্য্য অস্তমিত প্রায়, জাতীয় জীবন পতনোন্মুখ। আর স্বামী [illegible]না স্তবগীতি-পূর্ণ কবিতা লিখিয়া মোগল-সম্রাটের চাটুকারিতায় নিমগ্ন [illegible]জপুত-ললনা সহ্য করিতে পারিবে কেন? পতিকে জাগাইবার জন্য, [illegible] প্রমে মাতাই-বার জন্য বীরাঙ্গনার হৃদয় নৃত্য করিয়া উঠিল, স[illegible]ব চুপ করিয়া থাকিতে পারিলেন না; পতিকে বলিতে লাগিলেন "[illegible]দি কবিতা, তবে এমন কবিতা লেখো যার ভাবে বিদ্যুৎ, ভাষায় গর্জ্জন। এমন কবিতা লেখো যার গম্ভীর সঙ্গীত বিরাট-বন্যার মত আর্য্যাবর্ত্ত [illegible] পড়ে; এমন কবিতা লেখো, যা পড়ে ভাই ভাইয়ের জন্য কাঁদে, মনু[illegible]মনুষ্যত্বের জন্য কাঁদে; এমন কবিতা লেখো যাতে অন্যায়ের হাত থেকে রাজদণ্ড খসে পড়ে, অত্যাচারের মাথা থেকে মুকুট ভেঙ্গে পড়ে, অধর্ম্ম নীচে থেকে সিংহাসন নেমে যায়। গাও দেখি সেই গান, নাথ! একবার প্রাণ ভরে

শুনি।" কি আবেগময় ভাব! কি মর্ম্মভেদী ভাষা! পৃথ্বীরাজ গাহিয়াছিলেন সেই গান—সতীর দেহত্যাগের পর। ইহার পর দুর্গাদাস। কবি ভূমিকায় লিখিয়াছেন "দুর্গাদাস-চরিত্র দেবদুর্লভ, স্বর্ণপটে আঁকিয়া রাখিবার জিনিস।" রাখিয়াছেনও তিনি স্বর্ণপটে আঁকিয়া। কি ঘটনা-বৈচিত্রে, কি চরিত্র মাধুর্য্যে, কি রস-প্রাচুর্য্যে দুর্গাদাস কবির অপূর্ব্ব সৃষ্টি। রাঠোরবীর দুর্গাদাস পরম স্বদেশভক্ত, কঠোর কর্ত্তব্যনিষ্ঠ, অপূর্ব্ব আত্মত্যাগী,—সংযমী ও অতি উদারস্বভাবসম্পন্ন। বিজাতি বা বিজিত বলিয়া তাঁর ঘৃণা নাই, মনের সঙ্কীর্ণতা নাই। সেই জন্যই তিনি দিল্লীর খাঁর প্রশ্নোত্তরে বলিতে পারিয়াছিলেন; "আমার চেয়েও উন্নত চরিত্র দেখতে চাও যদি নিজের চরিত্রের সম্মুখে দর্পণ ধর। আরও দেখ্‌তে পেতে দিল্লীর যদি আজ কাশিম এখানে থাকতো।" ভাবের কি মহত্ত্ব! হৃদয়ের কি উদারতা!

আশ্রিত-রক্ষণে দুর্গাদাসের অবারিত দ্বার। ঔরঙ্গজেব-পুত্র আকবর দুহিতা রাজিয়া সহ দুর্গাদাসের আশ্রয় প্রার্থনা করিলে সমবেত সামন্তগণ আশ্রয়দানে অমত প্রকাশ করেন। দুর্গাদাস বলিয়া উঠিলেন "সামন্তগণ! ইচ্ছা-হয় আমাকে পরিত্যাগ কর, আমি আশ্রিতকে পরিত্যাগ করিব না!" "সুরা পরিত্যাগ কর, নারীজাতির সম্মান কর" এই কথায় কবি দুর্গাদাসের নীতিপরায়ণতা প্রকাশ করিয়াছেন। দুর্গাদাস সংযমী, গুল্‌নেয়ারের প্রেম প্রত্যাখ্যান তার প্রকৃষ্ট নিদর্শন। অকৃতজ্ঞ অজিৎ সিংহের মূর্খতায় দেশত্যাগ করিয়া দুর্গাদাস ত্যাগীর পরিচয় দিয়াছেন। সেইজন্য আমরাও কবির সঙ্গে সমস্বরে বলি "রাজপুতজাতির মধ্যে সেরা রাজপুত দুর্গাদাস।" মুসলমান-চরিত্রের মধ্যে দিল্লীর খাঁ বীর, কর্ত্তব্য-পরায়ণ, প্রভুভক্ত, উদার ও গুণগ্রাহী। কাশিম সরল, কর্ত্তব্যনিষ্ঠ ও প্রভুভক্ত। যশোবন্ত সিংহের বিধবা পত্নীর চরিত্রে দানব-দলনী শক্তির

বিকাশ করিয়া কবি মহামায়া নামের সার্থকতা রক্ষা করিয়াছেন। মহামায়া সতী-ধর্ম্মের জলন্ত মূর্ত্তি ধারণ করিয়া মাড়োবারবাসীগণকে স্বদেশপ্রেমে উত্তেজিত করিতেছেন। "মাইজীর জয়" গানে দিগ্‌দিগন্ত নিনাদিত করিবার জন্য সুপ্তপ্রজাগণকে জাগরিত করিতেছেন। ওজস্বিনী ভাষায় মায়ের সেই মর্ম্মস্পর্শী ডাকে সন্তানগণ নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিল না, দলে দলে মায়ের অনুবর্ত্তী হইল। আর কত উল্লেখ করিব? কবি প্রত্যেক গ্রন্থের প্রত্যেক চরিত্রই যথাযথভাবে পরিস্ফুট করিয়াছেন। গ্রন্থ সমালোচনা বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে, আর সেই ক্ষমতাও আমাদের নাই।

গ্রন্থেই কবির চরিত্র প্রতিফলিত হয়। এই গ্রন্থদ্বয় হইতেই আমরা কবির পরিচয় প্রাপ্ত হইয়াছি, জানিতে পারিয়াছি দ্বিজেন্দ্রলাল হিন্দু, অস্থিতে-অস্থিতে, গ্রন্থিতে-গ্রন্থিতে হিন্দু, দ্বিজেন্দ্রলাল স্বদেশবৎসল, মাতৃভক্তি তাঁর মেদমজ্জাগত ছিল। হিন্দুর গৌরব-প্রকাশে তাঁর পরম আনন্দ আর দুর্দ্দশায় তিনি মর্ম্মাহত হইতেন। দ্বিজেন্দ্রলাল গুণগ্রাহী ছিলেন। তাঁহার মনে সঙ্কীর্ণতা ছিল না। চরিত্র-অঙ্কনে তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। সাজাহানের চরিত্রগুলি জীবন্ত, কবির অঙ্ক-নিপুণতার প্রকৃষ্ট পরিচায়ক। বাণীর পূজায় বসিয়া তিনি কমলার দিকে দৃষ্টিপাত করেন নাই।

প্রহসন রচনায়ও তিনি অতিশয় কৃতীত্ব ও সুরুচির পরিচয় প্রদান করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার প্রহসন ব্যক্তিগত ব্যঙ্গোক্তিদোষে দুষ্ট নহে; কোন প্রকার নীচতা বা অশ্লীলতা তাহাতে স্থান পায় নাই। হাসি-কান্নার সংমিশ্রণে তিনি নিতান্ত কৃতীত্ব দেখাইয়া গিয়াছেন। হাসির গান, দেশের গান প্রভৃতি গীতি-কবিতা "যাবচ্চন্দ্র দিবাকর" কবির যশোগীতি কীর্ত্তন করিবে।

নাট্য-সাহিত্যের নিতান্ত দুর্দ্দিন বলিয়াই মনীষী কবি দ্বিজেন্দ্রলাল

অসময়ে মহাপ্রস্থান করিলেন। যাও কবি সেই স্থানে, যে স্থানে মধুসূদন, দীনবন্ধু তোমাকে যাইতে ইঙ্গিত করিয়াছেন; যাও কবি সেই স্থানে, যেখানে রাজকৃষ্ণ, মনোমোহন ও গিরীশচন্দ্র আছেন। ঐ দেখ সাহিত্য-সম্রাট্ বঙ্কিমচন্দ্র তোমার জন্য স্বর্ণ-আসনের ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছেন। যাও কবি, জননীর ক্রোড়ে চিরশান্তি লাভ কর। স্বর্গে বিজয়-দুন্দুভি বাজিয়া উঠুক, অমৃতে অমৃত যোগ হউক।

শ্রীরাজেন্দ্রলাল চক্রবর্ত্তী।

মৈথিল-কবি বিদ্যাপতি

বিখ্যাত মৈথিল-কবি বিদ্যাপতি বঙ্গ ও বিহারের প্রত্যেক ঘরে সুপরিচিত। বিদ্যাপতির নাম বা কবিতার বিষয় না জানে এমন বাঙ্গালী বা বেহারী নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। মিথিলাবাসী ব্রাহ্মণ হইলেও বঙ্গদেশবাসীরা তাঁহাকে বাঙ্গালী বলিয়া দাবী করিতে ছাড়েন না। তাঁহার কবিতাবলী বঙ্গদেশে এত সুদীর্ঘ কাল হইতে প্রচলিত হইয়া আসিতেছে যে, বহুকাল পর্য্যন্ত বাঙ্গালীরা এমন কি ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ তাঁহাকে বাঙ্গালী বলিয়া স্থির করিয়া বসিয়াছিলেন।

তৎকালে সম্ভবতঃ বঙ্গদেশীয় ভাষার সহিত মৈথিলভাষার অধিক পার্থক্য ছিল না। সেই সময়ে বহু বাঙ্গালী বিদ্যার্থী বিবিধ শাস্ত্রজ্ঞ বিশেষতঃ ন্যায়শাস্ত্র-পারদর্শী বিবুধমণ্ডলী পরিশোভিতা মিথিলাদেশে গমনাগমন করিতেন। বিদ্যাপতির সুললিত পদাবলীর মাধুর্য্যে মোহিত হইয়া উক্ত

বিদ্যার্থিগণ অন্যান্য শাস্ত্র-জ্ঞানের সহিত বিদ্যাপতির কবিতাবলীও মিথিলা হইতে আনিয়া বঙ্গদেশে প্রচারিত করেন। পরবর্ত্তীকালে বঙ্গদেশে শ্রীচৈতন্যদেবের ভক্তিরসপ্রধান ধর্ম্মের প্রাবল্য হইলে রাধাকৃষ্ণের প্রেম-রসাত্মক বিদ্যাপতির পদাবলীও বঙ্গদেশে সমধিক প্রচারিত হয়। কালবশে বঙ্গদেশ-প্রচলিত বিদ্যাপতির কবিতাগুলির ভাষাও ক্রমশঃ রূপান্তরিত হইয়া অনেকটা বঙ্গভাষার আকার ধারণ করে। বঙ্গদেশে প্রচলিত বিদ্যাপতির কবিতাবলী কিরূপ ক্রমশঃ বঙ্গভাষাপন্ন হইয়া পড়িয়াছে তাহা প্রদর্শন জন্য নিম্নে কতিপয় পদাবলী উদ্ধৃত হইল। :—

শুনলো রাজার ঝি।
তোরে কহিতে আসিয়াছি ॥
কানু হেন ধন পরাণে বধিলি।
এ কাজ করিলি কি ?
বেলি অবসান কালে।
গিয়াছিলি নাকি জলে ॥
তাহারে দেখিয়া মুচকি হাসিয়া
ধরিলি সখির গলে।
দেখায়্যা বদন-চাঁদে
তারে ফেলিয়া বিষম ফাঁদে
তুহু ত্বরিতে আওলি লখিতে নারিলি
ওই ওই করি কাঁদে ॥
তাকে হৃদয় দরশি যোরি
মন করিলি চোরি।
বিদ্যাপতি কহ শুনহি সুন্দরি
কানু জিয়াবি কি করি ॥

যেখানে সতত বৈসে রসিক মুরারি।
সেখানে লিখিহ মোর নাম দুই চারি॥
মোর অঙ্গের আভরণ দিহ পিয়া ঠাম।
জনম অবধি মোর এই পরিণাম॥
নিজ গণ গণইতে লিহে মোর নাম।
পিয়া মোর বিদগধ বিহি ভেল বাম॥
নিচয় মরিব আমি সে কানু উদেশে।
অবসর জানি কিছু মাগিও সন্দেশে॥
দিনে একবার পহু লিহে মোর নাম।
অরুণ দুলহ করে দিহে জল দান॥
বিদ্যাপতি কহে শুন বরনারী।
ধৈরজ ধর চিতে মিলব মুরারি॥
মরিব মরিব সখি নিচয় মরিব।
কানু হেন গুণনিধি কারে দিয়ে যাব॥
তোমরা যতেক সখি থেক মঝু সঙ্গে।
মরণকালে কৃষ্ণনাম লিখ মঝু অঙ্গে॥
ললিতা প্রাণের সহি মন্ত্র দিয়ো কানে।
মরা দেহ দেহপরে যেন কৃষ্ণনাম শুনে॥
না পোড়াইও রাধা অঙ্গ না ভাসায়ো জলে।
মরিলে তুলিয়া রেখো তমালের ডালে॥
সোইত তমাল তরু কৃষ্ণবর্ণ হয়।
অবিরত তনু মোর তাহে জনু রয়॥
কবহু সো পিয়া যদি আসে বৃন্দাবনে।
পরাণ পায়ব হম পিয়া দরশনে॥

পুনঃ যদি চাঁদমুখ দেখনে না পাব।
বিরহ আনল মাহ তনু তেয়াগিব।
ভণয়ে বিদ্যাপতি শুন বরনারী
ধৈরজ ধর চিতে মিলব মুরারি॥

এইরূপ বিদ্যাপতির ভণিতাযুক্ত অনেক কবিতা বঙ্গদেশে পাওয়া যায়, যাহার ভাষা অনেকটা বাঙ্গালার ন্যায় হইয়া পড়িয়াছে। এই ভাষা হইতে বিদ্যাপতির অধিকাংশ পদাবলীর বিশেষতঃ মিথিলায় ও বেহারে প্রচলিত বিদ্যাপতির পদাবলীর ভাষার অনেকটা বিভিন্নতা দৃষ্ট হয়। বাহুল্য-ভয়ে অধিক উদ্ধৃত করিলাম না। এই সমস্ত পদাবলীর মধ্যে সমস্তগুলি বেহার-অঞ্চলে সংগৃহীত পদাবলীর মধ্যে পাওয়া যায় না। এই কারণে অনুমান হয় যে, অনেক বঙ্গদেশীয় কবিও স্বীয় কবিতায় বিদ্যাপতির নামে চালাইয়া গিয়াছেন। এই প্রকার বঙ্গভাষায়রচিত বিদ্যাপতির ভণিতাযুক্ত ও বিদ্যা-পতির রচিত বঙ্গভাষায় রূপান্তরিত কবিতাবলীব ভাষার সহিত বঙ্গভাষার সাদৃশ্য দর্শনে বাঙ্গালীরা বিদ্যাপতিকে বঙ্গদেশীয় কবি বলিয়া অনুমান করেন। এই অনুমান ক্রমে দৃঢ় বিশ্বাসে পরিণত হয়।

৺রামগতি ন্যায়রত্ন "বঙ্গভাষা ও সহিত্যবিষয়ক প্রস্তাব"গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, বিদ্যাপতি বীরভূমের নিকট কোনও স্থানে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন ও শিবসিংহ বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া বা বীরভূম জেলার মধ্যে কোনও স্থানের পরাক্রান্ত জমিদার ছিলেন এবং বিদ্যাপতি এই জমিদারের আশ্রয় থাকিয়া কবিতাদি রচনা করেন। অপর এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন যে, শিবসিংহ লক্ষ্মীনারায়ণের শাসনকালে বঙ্গদেশে বিদ্যাপতি বঙ্গভাষায় বহু কবিতা রচনা করেন। আর একজন লিখিয়াছেন যে, যশোহর জিলান্তর্গত ভুশুঁটগ্রামনিবাসী ভবানন্দ রায়ের বিদ্যাপতি নামক এক পুত্র ছিল। ইঁহার প্রকৃত নাম বসন্ত রায় ছিল, কবিতাতে ইনি নিজকে বিদ্যাপতি নামে

পরিচিত করিতেন। ইহা তাঁহার উপাধি ছিল।১ কেহ কেহ এমন মত প্রকাশ করিয়াছেন যে বিদ্যাপতি নামধেয় কোনও ব্যক্তি ছিল না। রায়-গুণাকর, কবিকঙ্কণ প্রভৃতির ন্যায় বিদ্যাপতি একটি উপাধি এবং একাধিক ব্যক্তি এই উপাধি ধারণ করিয়াছিলেন।২

প্রথমতঃ ৺রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় প্রমাণিত করেন যে বিদ্যাপতি মিথিলার রাজা শিবসিংহের সভায় বিদ্যমান ছিলেন ও বিস্ফিগ্রামে তাঁহার জন্ম হইয়াছিল ও এই বিস্ফিগ্রাম শিবসিংহ বিদ্যাপতিকে দান করেন।৩ ৺রমেশচন্দ্রদত্ত প্রভৃতিও রাজকৃষ্ণ বাবুর মত সমর্থন করেন। তৎপরে সুপ্রসিদ্ধ গ্রীয়ারসন সাহেব বিদ্যাপতির অনেক পদাবলী মিথিলা হইতে সংগৃহীত করিয়া প্রকাশিত করেন। মিথিলার রাজা শিবসিংহ বিদ্যা-পতিকে যে তাম্রশাসন দ্বারা বিস্ফিগ্রাম দান করেন গ্রীয়ারসন সাহেব তাহা সমস্ত প্রকাশিত করেন।৪ তিনি পঞ্জী হইতে সংগ্রহ করিয়া বিদ্যাপতির সাময়িক মিথিলা-রাজবংশের সম্পূর্ণ তালিকা প্রকাশিত করেন।৫ এইরূপে বিদ্যাপতিসংক্রান্ত প্রকৃত ঐতিহাসিক তথ্য ক্রমে প্রকাশিত হইয়া পড়ে। কিন্তু এইরূপ বিদ্যাপতি-সংক্রান্ত প্রকৃত তথ্য প্রকাশিত হইলেও কেহ কেহ বিদ্যাপতির বাঙ্গালীত্ব প্রতিপাদনের চেষ্টায় বিরত হন নাই।৬

১। সোমপ্রকাশ ১০ই পৌষ সন ১২৭৯ সাল।

২। "I would suggest the possibility of there having been more than one Bidyapati and that the word is not a proper name but a title like Gunakar or Kabiranjan" John Beams.

৩। বঙ্গদর্শন ৪র্থ ভাগ ১৮৭৫ সাল।

৪। Proceedings of the Asiatic Society of Bengal for 1875 p. 143

৫। Indian Antiquary 1885. vol. xix. p. 196.

৬। কৈলাশচন্দ্র ঘোষ প্রণীত "বঙ্গসাহিত্য" ৩১-৩৩ পৃষ্ঠা।

বিদ্যাপতি বিস্‌ফিগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। উক্ত বিস্‌ফিগ্রাম এখনও দ্বারভাঙ্গা জেলায় বর্ত্তমান। কিন্তু চারি পুরুষ হইতে তাঁহার বংশধরগণ উক্ত বিসফিগ্রাম পরিত্যাগ করিয়া দ্বারভাঙ্গার অন্তর্গত সৌরাট নামক গ্রামে আসিয়া বাস করিতেছেন। বিসফিগ্রাম দ্বারভাঙ্গার মধুবনী সবডিবিসনের অন্তর্গত বেণীপট্টি থানার অধীন জরৈল পরগণাতে কমলা নদীর তীরে অবস্থিত। এই গ্রামের একটি উচ্চস্থানকে লোকে বিদ্যাপতির ভিটে বলিয়া নির্দ্দেশ করে। এই গ্রামে অদ্য পর্য্যন্ত বিদ্যাপতির কুলদেব বিশ্বেশ্বরীর মন্দির ও তাঁহার পাঠশালার চিহ্ন বর্ত্তমান আছে। বিদ্যা-পতির ভিটের উপর একটি সুরঙ্গ আছে, তাহার অনেকটা বুজিয়া আসি-য়াছে। এই সুরঙ্গের মধ্যে বসিয়া তিনি নাকি ভগবৎ আরাধনায় মগ্ন থাকিতেন।

বিদ্যাপতির ঊর্দ্ধতন ৭ম পুরুষ বিষ্ণুঠাকুর প্রথমে বিসফিগ্রামে আসিয়া বাস করেন। ইনি সম্ভবতঃ রাজা নান্যদেবের সময় বিদ্যমান ছিলেন। বিষ্ণুঠাকুরের পৌত্র কর্ম্মাদিত্য মিথিলার রাজমন্ত্রী ছিলেন। পঞ্জীতে ইহাঁর নাম এইরূপ লিখিত আছে:—গড় বিসফিনিবাসী কর্ম্মাদিত্য ত্রিপাঠী। মিথিলায় তিলকেশ্বর নামক শিবমন্দিরে যে কীর্ত্তিশিলা পাওয়া গিয়াছে তাহাতে কর্ম্মাদিত্যের নাম উৎকীর্ণ আছে।[৭] ইহাঁর পুত্র দেবাদিত্য (মতান্তরে শিবাদিত্য) সান্ধিবিগ্রহিক ছিলেন। ইহার পুত্র প্রসিদ্ধ মৈথিল-স্মার্ত্ত পণ্ডিত বীরেশ্বর ঠাকুর। ইনি বীরেশ্বর-পদ্ধতি, ছান্দোগ-দশকর্ম্মপদ্ধতি প্রভৃতি স্মৃতিগ্রন্থ প্রণয়ন করেন। মৈথিল ব্রাহ্মণগণ অদ্যাপি ইহাঁর গ্রন্থানুসারে দশকর্ম্মাদি সম্পাদন করিয়া থাকেন। ইহার

৭। এই শিলালিপি ২১৩ লসং অর্থাৎ ১৩২০ খৃষ্টাব্দে উৎকীর্ণ হয় যথা:—"অব্দে নেত্রশশাঙ্কপক্ষেহগিতে শ্রীলক্ষ্মণক্ষ্মাপতে"।

ভ্রাতা ধীরেশ্বর ঠাকুরও একজন বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন।[৮] বীরেশ্বরের পুত্র প্রসিদ্ধ স্মার্ত্ত-পণ্ডিত চণ্ডেশ্বর রাজা হরিসিংহদেবের মন্ত্রী ছিলেন। ধীরেশ্বরের পুত্র জয়দেবঠাকুর বিদ্যাপতির পিতামহ ছিলেন। ইনি একজন পরমযোগী ছিলেন। ইঁহার পুত্র গণপতিঠাকুর বিদ্যাপতির পিতা ছিলেন। ইনি কামেশ্বর ঠাকুরবংশীয় রাজা গণেশ্বরের সভাপণ্ডিত ছিলেন। কথিত আছে ইনি পুত্রলাভার্থ কপিলেশ্বর মহাদেবকে অর্চ্চনা করিয়া বিদ্যাপতিকে পুত্ররূপে লাভ করেন। মিথিলায় অদ্যাপি কপিলেশ্বর মহাদেবের মন্দির বর্ত্তমান আছে। ইনি "গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী" নামক এক গ্রন্থ রচনা করেন। ইঁহার মাতার নাম হাঁসিনিদেবী।

বিদ্যাপতি কোন্ সময়ে জন্মগ্রহণ করেন তাহা ঠিক জানিতে পারা যায় না। তবে তাঁহার সহিত সম্বন্ধযুক্ত কতকগুলি ঐতিহাসিক ঘটনার তারিখ জানিতে পারা গিয়াছে। সেই সমস্ত ঘটনার তারিখের উপর নির্ভর করিয়া অনেকে বিদ্যাপতির জন্ম ও মৃত্যুকাল স্থির করিয়াছেন। কিন্তু সকল স্থলেই বিদ্যাপতির জন্ম ও মৃত্যুর সময়-নির্ণয় সন্তোষজনক হয় নাই। যেহেতু এইরূপ কাল-নির্ণয়ে কোনও স্থলে অতি অপরিণত বয়সে অসাধারণ কবিত্ব কোনও স্থলে অতি বৃদ্ধবয়সে অতি শ্রমসাধ্য কার্য্যাদি তাঁহার উপর আরোপিত হইয়াছে। এবং ইহা সমর্থনজন্য অনেক কষ্ট-কল্পনার আশ্রয় লইতে হইয়াছে।

৮। শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় লিখিয়াছেন যে, বীরেশ্বর রাজা কামেশ্বর ঠাকুরের সভাপণ্ডিত ছিলেন। কিন্তু বীরেশ্বরের পুত্র চণ্ডেশ্বর রাজা হরিসিংহদেবের মন্ত্রী ছিলেন ইহা আমরা চণ্ডেশ্বরের গ্রন্থ হইতে জানিতে পারিতেছি। অতএব চণ্ডেশ্বরের পূর্ব্ববর্ত্তী বীরেশ্বর হরিসিংহ দেবের পরবর্ত্তী রাজা কামেশ্বরের সভাপণ্ডিত ছিলেন, ইহা অসম্ভব না হইলেও সামঞ্জস্যহীন বোধ হইতেছে। "মৈথিল-কোকিল বিদ্যাপতি" রচয়িতা শ্রীযুক্ত ব্রজনন্দন সহায় মহাশয় লিখিয়াছেন যে, বীরেশ্বর নান্যদেববংশীয় রাজা শক্রসিংহ ও হরিসিংহদেবের মন্ত্রী ছিলেন। ইহা সঙ্গত হইতে পারে বটে।

বিদ্যাপতির কাল-নির্ণয়ের সহায়ক নিম্নলিখিত ঘটনা কয়টি জানিতে পারা যায় :—

১। বিদ্যাপতি রাজা গণেশ্বরের রাজসভায় পিতার সহিত যাতায়াত করিতেন। এই সময় তিনি বালক ছিলেন। গণেশ্বর ২৫২ লসংএ অর্থাৎ ১৩৫৯ খৃষ্টাব্দে নিহত হন।

২। এসিয়াটিক-সোসাইটির লাইব্রেরিতে একটি হস্তলিখিত পুস্তক পাওয়া গিয়াছে। এই পুস্তকটি বিদ্যাপতির আদেশে মিথিলার রাজধানী গজরথপুরে ২১১ লসং এ অর্থাৎ ১৩৯৮ খৃষ্টাব্দে লিখিত।৯

৩। রাজা শিবসিংহ বিদ্যাপতিকে ২৯৩ লসংএ ১৩২৯ শকে ১৪৫৫ সংবতে বিসফিগ্রাম দান করেন, ইহা উক্ত রাজপ্রদত্ত তাম্রশাসন হইতে জানা যায়।

৪। আমরা কামেশ্বর ঠাকুরবংশীয় রাজাদের বিষয় আলোচনা-কালে দেখিয়াছি যে, বিদ্যাপতি এই বংশীয় নিম্নলিখিত রাজা ও রাণীর রাজত্ব-কালে উপস্থিত ছিলেন :—

রাজা কীর্ত্তিসিংহ
„ দেবসিংহ
„ শিবসিংহ
রাণী লখিমাদেবী
রাজা পদ্মসিংহ
রাণী বিশ্বাসদেবী
রাজা নরসিংহ
„ ধীরসিংহ
„ ভৈরবসিংহ

৯। বিদ্যাপতি প্রণীত "কীর্ত্তিলতা"।

৫। রাজা ধীরসিংহ ৩২১ লসংএ বর্ত্তমান ছিলেন ও তাঁহার পরবর্ত্তী রাজা ভৈরবসিংহের সময় বিদ্যাপতি পরলোকগমন করেন।

৬। রাজা শিবসিংহ ২৯৩ লসংএ রাজা হন।১০ এবং ইহার ৩।৪ বৎসর পরেই অর্থাৎ ২৯৭ লসংএর মধ্যে দিল্লীর সম্রাটকর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া নিহত বা নিরুদ্দেশ হন। বিদ্যাপতির কবিতা পাঠে বোধ হয় যে, তিনি শিবসিংহের নিরুদ্দেশ হওয়ার পর ৩২ বৎসর জীবিত ছিলেন যথা :—

"সপন দেখল হম শিবসিংহ ভূপ।
বতিস বরষ পর সামর রূপ ॥
বহুত দেখল গুরুজন প্রাচীন।
আব ভেলহু হম আয়ুবিহীন ॥"

রাজা গণেশ্বরের মৃত্যুকালে যদি বিদ্যাপতির বয়স ৮ বৎসর হইয়াছিল ধরা যায়, তাহা হইলে বিদ্যাপতি ২৪৪ লসংএ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন ইহা বলা যাইতে পারে। রাজা শিবসিংহ ২৯৭ লসংএ নিরুদ্দিষ্ট হন। অতএব ২৯৭+৩২=৩২৯ বা ৩৩০ লসংএ বিদ্যাপতির মৃত্যু হইয়াছিল। ধীরসিংহ ৩২১ লসংএ বর্ত্তমান ছিলেন। তাঁহার পববর্ত্তী রাজা তদায় ভ্রাতা ভৈরবসিংহের ৯ বৎসর পরে ৩৩০ লসংএ রাজত্ব করা খুব স্বাভাবিক। ২৪৪ লসংএ বিদ্যাপতির জন্মকাল ধরিলে ৪৯ বৎসব বয়সে তিনি স্বীয় কবিত্বের পুরস্কারস্বরূপ রাজা শিবসিংহের নিকট হইতে বিসফিগ্রাম দান পাইয়া-

১০। "অনল রন্ধ্র করলক্খন নরবই সক্ক সমুদ্দ অগিনিসসী।
চৈত্ত কারি ছট্টি জেঠা মিলিও বারবেহপ্পই জাউলসী।
দেবসিংহ জং পুহমী ছট্টিঅ অদ্ধাসন সুররাঅসর।" বিদ্যাপতি

অর্থাৎ হে নগরবাসীগণ তোমাদের পূর্ব্ব রাজা দেবসিংহ এই ২৩৯ লক্ষণাব্দে চৈত্র মাসে কৃষ্ণপক্ষে জ্যেষ্ঠা নক্ষত্রে বৃহস্পতিবার স্বর্গে দেবরাজের সিংহাসনার্দ্ধভাগী হইয়াছেন। শিবসিংহ রাজা হইয়াছেন।

ছিলেন। এই ঘটনা ও ইহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে দিল্লীশ্বরের নিকট স্বীয় কবিত্ব-গুণে প্রতিপত্তি লাভ করিয়া শিবসিংহকে মুক্ত করিয়া আনা এই ঘটনা খুব স্বাভাবিক হইয়া পড়ে। এবং এই সমস্ত ঘটনা বিদ্যাপতির অপরিণত বয়সে সংঘটিত হইবার স্বাভাবিকতা দেখাইবার জন্য আয়াস স্বীকার করিতে হয় না। এই সমস্ত বিষয় পর্য্যালোচনা করিয়া এরূপ নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে, যে বিদ্যাপতি ২৪৪ লসং বা ১৩৫১ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করিয়া ৮৬ বৎসর বয়সে ৩৩০ লসংএ বা ১৪৩৭ খ্রীষ্টাব্দে পরলোকগমন করেন। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয় যে বিদ্যাপতির আনুমানিক জন্ম-কাল নির্দ্দেশ করিয়াছেন তাহা হইতে আমার নির্দ্দেশিত কালের বেশী পার্থক্য হইতেছে না।[১১]

সুবিখ্যাত নৈয়ায়িক পক্ষধরমিশ্রের খুল্লতাত হরিমিশ্রের নিকট বিদ্যাপতি বিদ্যাধ্যয়ন করিয়াছিলেন। পক্ষধরমিশ্র ইহার সহপাঠী ছিলেন। পক্ষধরমিশ্র ও বিদ্যাপতিসংক্রান্ত একটি গল্প প্রচলিত আছে তাহা এস্থলে উল্লিখিত হইল। বিদ্যাপতির এক অতিথিশালা ছিল। অতিথিদিগের ভোজন শেষ হইলে তিনি স্বয়ং যাইয়া তাঁহাদিগের সহিত আলাপ করিতেন। এক দিবস এই উদ্দেশ্যে বিদ্যাপতি অতিথিশালায় গেলে সমস্ত অতিথি দণ্ডায়মান হইল। কেবল একজন কৃশকায় অতিথি চিন্তামগ্ন হইয়া এক কোনে বসিয়া রহিল। বিদ্যাপতি বলিলেন :—"প্রাঘুণোঘুণবৎ কোণে সূক্ষ্মতায়োপলক্ষিতঃ।" অর্থাৎ গৃহ-কোণে অবস্থিত সূক্ষ্ম কীটবৎ অতিথি সূক্ষ্মতাবশতঃ লক্ষিত হইলেন না। উপবিষ্ট পুরুষ তৎক্ষণাৎ শ্লোকের অপরার্দ্ধ দ্বারা উত্তর দিলেন :—"নহি স্থূলধিয়াং পুংস সূক্ষ্মে দৃষ্টি প্রজায়তে।" অর্থাৎ স্থূলদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তির সূক্ষ্মদৃষ্টি গোচর

১১। "বিদ্যাপতি ঠাকুরের পদাবলী" ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

হয় না। তৎপরে বিদ্যাপতি পক্ষধরমিশ্রের পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে আদর করিয়া গৃহে লইয়া গেলেন।

বিদ্যাপতি বাল্যকাল হইতেই পিতার সহিত মিথিলারাজসভায় যাতায়াত করিতেন। আমরা প্রথমে তাঁহাকে রাজা কীর্ত্তিসিংহের সভাসদ-রূপে দেখিত পাই। তিনি কীর্ত্তিসিংহের পৈত্রিক রাজ্যলাভ জন্য দিল্লী-গমন ও প্রত্যাবর্ত্তন এবং রাজ্যলাভ প্রভৃতি বিষয় বর্ণনা করিয়া "কীর্ত্তিলতা" নামক গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি রাজা দেবসিংহের সভাতেও বর্ত্তমান ছিলেন। দেবসিংহের পুত্র শিবসিংহ তাঁহার সমবয়সী ছিলেন। উভয়ে উভয়ের গুণের বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। বিদ্যাপতি শিবসিংহের বিশেষ অনুরক্ত ছিলেন। কথিত আছে যে, শিবসিংহ দিল্লীতে করপ্রেরণ বন্ধ করেন ও তৎজ্জন্য দিল্লীশ্বর তাঁহাকে বন্দী করিয়া দিল্লীতে লইয়া আইসেন। বিদ্যাপতি প্রিয়-সুহৃদের বিরহে অত্যন্ত কাতর হইয়া তাঁহার উদ্ধার জন্য দিল্লী যাত্রা করেন ও স্বীয় কবিত্বগুণে দিল্লীশ্বরকে মুগ্ধ করিয়া শিব-সিংহকে উদ্ধার করিয়া লইয়া আইসেন। বিদ্যাপতির কবিতাবলীতে শিবসিংহ ও লখিমাদেবীর নামোল্লেখ যতবার দেখিতে পাওয়া যায়, ততবার আর কোনও রাজা বা রাণীরই নাম পাওয়া যায় না। ইহা হইতে অনুমান করা যাইতে পারে যে, শিবসিংহ ও লখিমাদেবীর সময়েই তাঁহার কবিত্ব-শক্তি সবিশেষ বিকশিত হইয়াছিল। এই সময় তাঁহার কবিত্বের যশোভাতি এতদূর বিস্তৃতিলাভ করিয়াছিল যে, শিবসিংহ তাঁহাকে "নবজয়দেব" উপাধি দান করিয়াছিলেন।[১২] শিবসিংহ সিংহাসনারোহণ করিয়াই কবিত্ব ও সৌহার্দ্দের পুরস্কারস্বরূপ বিদ্যাপতিকে বিসফিগ্রাম দান করেন। এই

১২। "নবজয়দেব মহারাজ পণ্ডিতঠক্কুর শ্রীবিদ্যাপতিভ্যঃ"—শিবসিংহপ্রদত্ত তাম্র-শাসন।

গ্রাম এত সুবিস্তৃত ছিল যে, এতদ্‌সম্বন্ধে এইরূপ প্রবাদ মিথিলায় প্রচলিত আছে :—

"অমিয়া সৈ হর বিস্‌ফি বহে।
তেও বিসফি পড়লে রহে॥"

অদ্যাবধি বিদ্যাপতির বংশধরেরা এই গ্রাম ভোগ করিয়া আসিতেছেন।১৩

রাজ শিবসিংহ দিল্লীশ্বরকর্ত্তৃক তৃতীয় বার আক্রান্ত হইবার পূর্ব্বে স্বীয়, পুরমহিলাদিগকে বিদ্যাপতিসহ নেপালের নিকটবর্ত্তী রাজ বনৌলী নামক স্থানে পাঠাইয়া দেন। বিদ্যাপতি এই স্থানে দ্রোণবংশীয় রাজা পুরাদিত্যের সভায় কিছুকাল অবস্থান করেন। তিনি রাজা পুরাদিত্যের আদেশে ২৯৯ লসংএ লিখনাবলী নামক এক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। এই স্থানে তিনি সমস্ত ভাগবতগ্রন্থ স্বহস্তে লিখিয়া ৩০৯ লসংএ সমাপ্ত করেন।১৪ বিদ্যাপতির স্বহস্তলিখিত ভাগবতগ্রন্থ অদ্যাপি তরৌণী গ্রামে বর্ত্তমান আছে। কিছুকাল পরে তিনি পুনরায় মিথিলায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া রাণী লখিমাদেবী, রাজা পদ্মসিংহ, রাণী বিশ্বাস দেবী, রাজা নরসিংহ, ভৈববসিংহ ও বীরসিংহের রাজ-সভা সুশোভিত করেন।

বিদ্যাপতির পুত্রের নাম হরপতি ঠাকুর ও পুত্রবধূর নাম চন্দ্রকলা

১৩। এক্ষণে এই গ্রামের জন্য তাঁহারা বৃটিশ গভর্ণমেণ্টকে কর দিয়া থাকেন।

১৪। "মৈথিল-কোকিল বিদ্যাপতি" প্রণেতা শ্রীযুক্ত ব্রজনন্দন সহায় মহাশয় লিখিয়াছেন, এই ভাগবতগ্রন্থ ৩৪৯ লসংএ লিখিত হইয়াছিল। আমরা পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি যে, ৩৩০ লসংএ বিদ্যাপতি পরলোকগমন করেন। পক্ষান্তরে বিদ্যাপতি ৩৪৯ লসংএ জীবিত থাকিলেও এত বৃদ্ধবয়সে এইরূপ শ্রমসাধ্য কার্য্য করা অতি অস্বাভাবিক বলিয়া বোধ হয়। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয় লিখিয়াছেন যে, বিদ্যাপতি ৩০৯ লসংএ ভাগবত গ্রন্থ লিখিয়া সমাপ্ত করেন।

ছিল। ইনি বিদুষী রমণী ছিলেন। ইঁহার রচিত কএকটি পদ লোচন নামক কবির সঙ্কলিত "রাগতরঙ্গিণী" নামক গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়। বিদ্যাপতির পত্নীর নাম মন্দাকিনী ও কন্যার নাম দুলহি বা দুর্লভা ছিল; ইহা তাহার কোনও কোনও কবিতা হইতে জানিতে পারা যায়।

পদকল্পতরু গ্রন্থের দুইটি কবিতা পাঠে জানা যায় যে, সুপ্রসিদ্ধ বঙ্গীয় বৈষ্ণবকবি চণ্ডীদাসের সহিত বিদ্যাপতির সাক্ষাৎ হইয়াছিল এবং উভয়ে বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। কেহ কেহ ইহাকে কবিকল্পনা বলিয়া অনুমান করিয়াছেন। কিন্তু বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের সাক্ষাৎ-কারের যথার্থতা-সম্বন্ধে সন্দিহান হইবার বিশেষ কোন কারণ দেখা যায় না। বীরভূমের অন্তর্গত নান্নুর গ্রামে খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীর শেষভাগে চণ্ডীদাস জন্মগ্রহণ করেন। কাজেই তিনি বিদ্যাপতির সমসাময়িক ছিলেন। উভয়েই কবি ও কৃষ্ণপ্রেমানুরাগী। এমত অবস্থায় যে উভয়ে পরস্পরের গুণের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পরস্পরের সহিত সাক্ষাৎ করিবেন তাহা কিছুমাত্র বিচিত্র নহে। চৈতন্যদেবের অনুচর অদ্বৈত প্রভুর তীর্থ-ভ্রমণকালে মিথিলায় বিদ্যাপতির সহিত সাক্ষাৎ হয়।

বিদ্যাপতি আনুমানিক ৩৩০ লসং এ অর্থাৎ ১৪৩৭ খৃষ্টাব্দে ৮৬ বৎসর বয়সে রাজা ভৈরবসিংহের রাজত্বকালে কার্ত্তিক শুক্লত্রয়োদশী তিথিতে গঙ্গাতীরে পরলোকগমন করেন।[১] কথিত আছে যে, বিদ্যাপতির চিত-

১। "বিদ্যাপতিক আয়ু অবসান,
কার্ত্তিক ধবল ত্রয়োদশী জান।"

২। বিদ্যাপতির মৃত্যু-সম্বন্ধে এক অলৌকিক গল্প প্রচলিত আছে। কথিত আছে যে তাঁর অন্তিমকাল নিকটবর্ত্তী জানিতে পারিয়া বিদ্যাপতি গঙ্গাতীরাভিমুখে প্রস্থান করেন। যখন গঙ্গাতীর পঁহুছিতে ২ ক্রোশ বাকি আছে তখন তিনি বলিলেন যে, আমি

ভূমি ভেদ করিয়া এক শিবলিঙ্গের আবির্ভাব হয়। B. N. W. Ry. ষ্টেশন দলসিংসরাইএর নিকটবর্ত্তী মলকলিপুরে অবস্থিত একটি শিব-মন্দিরকে স্থানীয় লোকেরা বিদ্যাপতির চিতাধিষ্ঠিত শিবলিঙ্গের উপর নির্ম্মিত মন্দির বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকে।

মৈথিলিভাষায় রচিত পদাবলী ব্যতীত বিদ্যাপতি কতিপয় সংস্কৃত গ্রন্থ রচনা করেন। এই গ্রন্থগুলি প্রায় অপ্রাপ্য বা বিরল প্রাপ্য। এই গ্রন্থগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় এইস্থলে প্রদত্ত হইল।

১। কীর্ত্তিলতা—এই গ্রন্থ রাজা কীর্ত্তিসিংহের সময় রচিত হয়। ইহাতে রাজা কীর্ত্তিসিংহের পৈত্রিকরাজ্যপ্রাপ্তির জন্য দিল্লী গমন ও পৈত্রিকরাজ্যলাভ প্রভৃতি বিষয় বর্ণিত আছে। এই গ্রন্থ মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় নেপাল-মহারাজের লাইব্রেরিতে দেখিতে পান এবং সেখান হইতে নকল করাইয়া আনান। শ্রীনগরের রাজা ৺কমলানন্দ সিংহ মহাশয় ইহার পাঁচটি শ্লোক "সরস্বতী" পত্রিকায় প্রকাশিত করেন। এই গ্রন্থের ভাষা বিশুদ্ধ সংস্কৃত নয়। ইহা কতক সংস্কৃত ও কতক প্রাকৃত-ভাষায় লিখিত। বিদ্যাপতি এই ভাষাকে অবহট্টভাষা নামে অভিহিত করিয়াছেন।

২। পুরুষ-পরীক্ষা—এই গ্রন্থ রাজা শিবসিংহের আদেশে সংস্কৃত ভাষায় রচিত হয়। ইহাতে কথাচ্ছলে ধর্ম্ম এবং রাজনীতি শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে। ইহাতে ৪৮টি উপাখ্যান আছে। পুরুষনামধারী সকলেই যে পুরুষ নহে; প্রকৃত পুরুষের পরীক্ষা কি, উপাখ্যানচ্ছলে ইহাতে তাহাই

মাতা ভাগীরথীর ক্রোড়লাভ জন্য এতদূর আসিলাম, তিনি কি সন্তানকে ক্রোড়ে লইবার জন্ত এতটুকু পথ আসিবেন না। এই বলিয়া তিনি ঐ স্থানেই অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। রাত্রির মধ্যেই গঙ্গা ত্রিধারা হইয়া উক্ত স্থানে প্রবাহিত হইতে লাগিল। বিদ্যাপতি গঙ্গায় স্তব করিতে করিতে উক্ত স্থানে দেহত্যাগ করিলেন।

বিবৃত হইয়াছে। ইহাতে শৃঙ্গাররসও আছে। এই গ্রন্থের তৃতীয় শ্লোকে কবি লিখিয়াছেন :—

শিশূনাং সিদ্ধ্যর্থং নয় পরিচিতে নূতনধিয়াং
মুদে পৌরস্ত্রীণাং মনসিজকলাকৌতুক যুষাম্।
নিদেশাবিশঙ্কং সপদি শিবসিংহ ক্ষিতিপতেঃ
কথানাং প্রস্তাবং বিরচয়তি বিদ্যাপতি কবিঃ ॥৩॥

অর্থাৎ অপরিণতবুদ্ধি শিশুদিগের নৈতিক শিক্ষার জন্য ও পৌর-স্ত্রীদিগের জন্য রাজা শিবসিংহের আদেশে কবি বিদ্যাপতি নিঃশঙ্কিতচিত্তে এই সমস্ত গল্প রচনা করিতে আরম্ভ করিলেন। ফোর্টউইলিয়ম কলেজের বঙ্গভাষার অধ্যাপক হরপ্রসাদ রায় ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে এই গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ করেন। এই বঙ্গানুবাদ উক্ত কলেজে পড়ান হইত।

৩। লিখনাবলী—বিদ্যাপতি যখন দ্রোণবংশীয় রাজা পুরাদিত্যের রাজসভায় রাজবনৌলিগ্রামে বাস করিতেন, সেই সময়ে ২৯৯ লসং এ উক্ত রাজার আদেশে এই গ্রন্থ রচনা করেন। ইহাতে তৎকাল প্রচলিত পত্র-লিখনী-প্রণালী লিখিত আছে।

৪। শৈবসর্ব্বস্বসার—রাণী বিশ্বাস দেবীর আজ্ঞায় এই গ্রন্থ রচিত হয়। ইহাতে রাণী লখিমাদেবী ব্যতীত ভবসিংহ হইতে আরম্ভ করিয়া বিশ্বাসদেবী পর্য্যন্ত মিথিলা-রাজবংশের দানশীলতা, দেবভক্তি ও বীরত্বাদি যশোবর্ণনকরা হইয়াছে। ইহাতে রাজ-কুলদেবতা মহাদেবের পূজা-অর্চ্চনার পদ্ধতিও লিখিত আছে।

৫। গঙ্গা-বাক্যাবলী—এই গ্রন্থও রাণী বিশ্বাসদেবীর আদেশে রচিত। এই গ্রন্থের শেষে এইরূপ শ্লোক আছে :—

"কিয়ন্নিবন্ধমালোক্য শ্রীবিদ্যাপতি সূরিণা
গঙ্গাবাক্যাবলীদেব্যা প্রমাণৈর্বিমলীকৃতা

৬। বিভাগসার—এই গ্রন্থ রাজা নরসিংহের সময় রচিত। ইহা দায়াধিকারসম্বন্ধীয় স্মৃতি গ্রন্থ। ইহাতে লিখিত আছে :—

রাজ্ঞো ভবেশাদ্ধরিসিংহ আসীৎ।
তৎস্বসুনা দর্পনারায়ণেন
রাজ্ঞো নিযুক্তোঽত্র বিভাগসারং
বিদ্যাপতি রাতনোতি।

৭। গয়া-পতন।—এই গ্রন্থ রাজা নরসিংহের পত্নী ধীরমতি দেবীর আদেশে রচিত হয়।

৮। দানবাক্যাবলী—এই গ্রন্থ পূর্ব্বোক্ত রাজ্ঞী ধীরমতিদেবীর আদেশে রচিত হয়।

৯। দুর্গাভক্তি-তরঙ্গিণী—এই গ্রন্থ রাজা ভৈরবসিংহের আদেশে রচিত হয়।১ ইহা গদ্যে ও পদ্যে রচিত। ইহাতে দুর্গাপূজাপ্রণালী বিবৃত আছে। অদ্যাপি মিথিলায় এই গ্রন্থানুসারে দুর্গোৎসব হইয়া থাকে। প্রসিদ্ধ বঙ্গদেশীয় স্মার্ত্ত রঘুনন্দন এই গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন।

বিদ্যাপতি অনেকগুলি সংস্কৃত গ্রন্থ প্রণয়ন করিলেও মৈথিলীভাষায় রচিত কবিতাবলীর জন্যই তিনি সমধিক খ্যাতিলাভ করিয়াছেন। 'কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এই কবিতাবলীর কোনও প্রাচীন সংগ্রহ-গ্রন্থ মিথিলায় পাওয়া যায় না। তদ্দেশে বিদ্যাপতির কবিতাবলী লোকের মুখে মুখে আবৃত্তি দ্বারা স্বীয় অস্তিত্ব রক্ষা করিয়া আসিতেছে। বরং বঙ্গদেশীয় পদকল্পতরু, পদামৃত-সমুদ্র প্রভৃতি বৈষ্ণব-পদাবলীসংগ্রহ গ্রন্থ প্রভৃতিতে বিদ্যাপতির অনেক পদাবলী সংগৃহীত আছে। বঙ্গদেশে বিদ্যাপতির পদাবলী যেরূপ বিকৃতিপ্রাপ্ত হইয়াছে, তদ্রূপ লিখিত না

১। এতাসম্বন্ধে কেহ কেহ মতান্তর প্রকাশ করিয়াছেন।

থাকায় মিথিলাতেও বিদ্যাপতির পদাবলী যে অবিকৃত অবস্থায় আছে তাহা বলা যায় না। লোকমুখে ক্রমে সেখানেও পরিবর্ত্তন হওয়ার সম্ভাবনা। দেখা গিয়াছে যে, একই কবিতা দুই জন মিথিলাতেই সংগ্রহ করিয়াছেন অথচ উভয়ের মধ্যে মিল নাই।

বর্ত্তমানকালে গ্রিয়ারসন সাহেব প্রথমে মিথিলা হইতে বিদ্যাপতির অনেক পদাবলী সংগ্রহ করিয়া ইংরাজি অনুবাদসহ প্রকাশ করেন। তৎপরে হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব বিচারপতি শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র মহাশয় বিদ্যাপতির পদাবলী সংগ্রহ করিয়া প্রকাশিত করেন।

পরলোকগত কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ মহাশয় বঙ্গদেশ প্রচলিত পদাবলী সংগ্রহ করিয়া প্রকাশিত করেন। সম্প্রতি সাহিত্য-পরিষদ হইতে শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয় বিদ্যাপতির পদাবলীর এক সুবিস্তৃত সংগ্রহ গ্রন্থ প্রকাশিত করিয়াছেন। বেহারের উকিল শ্রীযুক্ত ব্রজনন্দন সহায় নাগরি-প্রচারিণী-সভা হইতে পাণ্ডিত্যপূর্ণ মিথিলার অনেক ঐতিহাসিক-তত্ত্ব ও বিদ্যাপতির জীবনীসহ "মৈথিল-কোকিল বিদ্যাপতি" নামে বিদ্যাপতির পদাবলী সংগ্রহ করিয়া প্রকাশিত করিয়াছেন।

চারি পুরুষ হইতে বিদ্যাপতির বংশধরগণ বিসফিগ্রাম পরিত্যাগ করিয়া দ্বারভাঙ্গা জেলার অন্তর্গত সৌরাঠ নামক গ্রামে আসিয়া বাস করিতেছেন। বিদ্যাপতির দ্বাদশ, ত্রয়োদশ পুরুষ অধস্তন বংশধরগণ বর্ত্তমান সময়ে উক্ত গ্রামে বাস করিতেছেন।

শ্রীপ্রমথনাথ মিশ্র।

মালদহের কবি ও গায়কগণ

বঙ্গদেশে লোকসাহিত্য, সঙ্গীতসাহিত্য প্রভৃতিতে অশিক্ষিতপটুত্বের বিশেষ নিদর্শন পাওয়া যায়। কত মেঠো কবির গানে কেমন মাধুর্য্য, কেমন ভক্তির উচ্ছ্বাস, সমাজের কেমন পরিপূর্ণ চিত্র আমরা পাইয়া থাকি। লোকের মুখে মুখে সেগুলি ফিরিয়া থাকে। শিক্ষার গুণে সেগুলি পরিমার্জ্জিত না হইলেও, তাহাদের আদর বড় কম নহে। স্বভাব-কবিত্ব তাহাদের মধ্যে যথেষ্ট।

আমাদের দেশের পাঁচালী, কীর্ত্তন, বাউল, ভাটিয়াল গান যাঁহারা শুনিয়াছেন, তাঁহারাই তাহাদের ভাব-মাধুর্য্যে মুগ্ধ হইয়াছেন। মালদহের গম্ভীরা-গানও এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। বিশেষতঃ ইহার সুর যাঁহারা এক-বার শুনিয়াছেন, তাঁহারা কিছুতেই ভুলিতে পারিবেন না—তাহার মাধুর্য্য এতই বেশী। সুরও এক রকম নহে। নানা রকম। আমরা সেই সুর গুলিকে কোন্ রাগ-রাগিণীতে ফেলিব, ঠিক করিতে না পারিয়া "গম্ভীরার সুর" নামে প্রচার করিলাম। কিন্তু কেবল সুরই গম্ভীরা-গানের বিশেষত্ব নহে। গানের বিষয় এবং অভিনয়-ব্যাপারও বড় চমৎকার। যাঁহারা অভিনয় করেন, তাঁহাদের নৃত্য-গীতের ভঙ্গিমা এত সুন্দর যে বর্ত্তমান বঙ্গ-রঙ্গমঞ্চে তাঁহাদের দোসর খুঁজিয়া পাওয়া কঠিন, এ কথা বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

সকলের নাচ এবং গান গাহিবার প্রণালীও এক রকম নহে। প্রত্যেকেই নিজের নিজের কল্পনা অনুসারে নৃত্যের ভঙ্গিমা উদ্ভাবন করেন—সে নৃত্য বড় সহজ নহে। তালে তালে নানা রকমে পা ফেলিবার কায়দা বড়ই কঠিন। কিন্তু এত অবলীলাক্রমে তাহা সাধিত হয় যে

দেখিলে অবাক্ না হইয়া থাকা যায় না। বাঙ্গালীর থিয়েটারে এখন বিলাতী বা পার্শী-ধরণের নাচ সুরু হইয়াছে। কিন্তু সে নাচ যদি মনোরম হয়, তবে বাঙ্গালীর এই সহজ-সুন্দর গ্রাম্যনৃত্য—এই নিজেদের কত প্রাচীন ঘরের জিনিষ, ইহাকে কিছুতেই উপেক্ষা করা যায় না।

তার পর গান গাহিতে গাহিতে গান ছাড়িয়া দিয়া কথাবার্ত্তা বা রং-তামাসা করা, এবং হঠাৎ তাল না কাটিয়া গান ধরা বড়ই সুন্দর। বর্ত্তমান রঙ্গমঞ্চে এ প্রথা খুবই দৃষ্ট হয়। কিন্তু কত কাল হইতে মালদহে এই গম্ভীরার বোলবাই গানে তাহা অনুষ্ঠিত হইয়া আসিতেছে, ঠিক করা কঠিন। দেখিলেই মনে হয়, অভিনেতারা বুঝি থিয়েটার দেখিয়া এই সব অনুকরণ করিয়াছে। কিন্তু এমন দূরতম পল্লীবাসী অশিক্ষিত লোকের মধ্যে এই অভিনয়-প্রথার প্রচলন আছে, যাহারা থিয়েটারের নাম পর্য্যন্ত শুনে নাই। অতি প্রাচীন ব্যক্তিরাও এই প্রথার অস্তিত্বের কথা জানাইয়া থাকেন। অতএব ইহা যে সুপ্রাচীন, সে বিষয়ে সন্দেহ করা অসঙ্গত।

গম্ভীরা-গানের আর একটি বিশেষত্ব—ইহা সর্ব্ববিষয়ক। ইহাতে দেশের ধর্ম্ম-কর্ম্ম, সমাজ-সংসার, শিক্ষা, অর্থ, শিল্প-কৃষি, ব্যবসা-বাণিজ্য প্রভৃতি সমস্ত বিষয় লইয়াই আলোচনা হইয়া থাকে। তাই গম্ভীরা-গানে রামপ্রসাদের ভক্তিরস, বাউলের দেহতত্ত্ব, কবিবর দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের রসিকতা, কৃষক কবি বার্ণসের নবযুগ-প্রবর্ত্তনের কবিত্বধারা সকলই পরিলক্ষিত হয়।

আমরা পাঠকগণকে একে একে এই গানগুলি ও তাহাদের রচয়িতাদিগের জীবনী-সম্বন্ধে পরিচয় দিব। তবে জীবনী-সম্বন্ধে কিছু বলিতে গেলেই ইহাদের জীবিকা-উপার্জ্জনের কথাও বলিতে হইবে। কিন্তু পাঠকবৃন্দের নিকটে অনুরোধ তাঁহারা যেন জীবিকানির্ব্বাহ-প্রণালীর মাপকাঠিতে

ইহাঁদের কবিত্ব বিচার না করেন। দেশের নাড়ীর সঙ্গে যাঁহারা জড়িত, যাঁহারা দেশের প্রকৃত অধিবাসী, তাঁহারা প্রাণের ভাষায় দেশসম্বন্ধে কিছু জ্ঞাপন করিলে তাহাও আমাদের বিশেষ অনুধাবনযোগ্য। ইহাঁদের রচনায় উচ্চ সাহিত্যের ভাষা না থাকিলেও ভাব আছে, তাহাই আমাদিগকে উপভোগ করিতে হইবে।

ইতিমধ্যে আমরা নিম্নলিখিত ব্যক্তিবৃন্দের জীবনী ও গান সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি—

১। ৺ধনকৃষ্ণ অধিকারী, চণ্ডীপুর।
২। ৺কৃষ্ণদাস দাস, আইহো, মোচিয়া।
৩। ৺কেশবচন্দ্র দাস গুরজী, মকদুমপুর।
৪। ৺ডাক্তার ঠাকুরদাস দাস, মকদুমপুর।
৫। শ্রীযুক্ত গোষ্ঠবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়, গিলাবাড়ী।
৬। শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র দাস, মহেশপুর।
৭। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কিশোরীকান্ত চৌধুরী, পুরাটুলী।
৮। শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র দাস, মকদুমপুর।
৯। কবিরাজ শ্রীযুক্ত মৃত্যুঞ্জয় হালদার, টাঁপাজানি।
১০। মহম্মদ সুফী, ফুলবাড়ী।
১১। শ্রীযুক্ত হরিমোহন কুণ্ডু, সাহাপুর।
১২। শ্রীযুক্ত গদাধর দাস, গণিপুর।
১৩। শ্রীযুক্ত রাধামাধব দাস, গণিপুর।
১৪। কবিরাজ শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র গুপ্ত কাব্যরত্ন, আইহো মোচিয়া।
১৫। পণ্ডিত আবদুল জব্বর, মেজেমপুর কালিয়াচক।
১৬। শ্রীযুক্ত শ্রীনিবাস দাস, কাশিমপুর ভোলাহাট।
১৭। শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ মুখোপাধ্যায়, কোতয়ালী।

১৮। শ্রীযুক্ত ললিতচন্দ্র দাস, কোতয়ালী

১৯। শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র সাহা আলিনগর, কালিয়াচক।

২০। শ্রীযুক্ত শশিভূষণ নন্দী, নিমাসরাই।

উল্লিখিত ব্যক্তিবৃন্দের মধ্যে আমরা অদ্য কয়েকজন মাত্র লোকের পরিচয় দিতেছি। বাবান্তরে অন্যান্য সকলের বিষয় লেখা যাইবে।

মহম্মদ সুফী

ইহাঁর বাসস্থান—ইংরেজ-বাজারের নিকট ফুলবাড়ী। বয়স ২১।২২ বৎসরের বেশী নহে। জেলাস্কুলের পঞ্চম শ্রেণী পর্য্যন্ত ইহাঁর বিদ্যা। ইনি এখন দুই একটি ছেলের শিক্ষকতা এবং পোষ্টাফিসের পিয়নগিরি করিয়া জীবন কাটাইতেছেন। কিন্তু ভগবান ইহাঁকে যে কবিত্বশক্তি দিয়াছেন তাহা কিছুতেই অবজ্ঞেয় নহে। ইহাঁর কবিত্ব বাস্তবিকই মনোরম—বাস্তবিকই তাহা অনায়াসলব্ধ সাহিত্যসম্পদ। ইহাঁর বর্ণনা-বিষয় বর্ণনা-ভঙ্গী "ঘরোয়া" উপমাগুলি অনুধাবন করিলেই ইহাঁর চিন্তাশীলতা এবং অনুসন্ধান-তৎপরতা বুঝা যায়। বস্তুবর্ণনে এবং বিষয়-পরিকল্পনায় ইহাঁর কৃতিত্ব অসাধারণ। ইহাঁর রচনার কিছু নমুনা দিতেছি।

মালদহ রেল-ষ্টেশনের নিকটে কলিশন হয়, তদুপলক্ষে নিম্নের গানটি রচিত। একজন সাজিয়াছিল কলিশনে আঘাতপ্রাপ্ত যাত্রী। সে তাহার দুঃখের কাহিনী বন্ধুকে জানাইতেছে—

গম্ভীরার সুর

রেলে চাপিব না আর সাফ

বাপরে বাপ—।

এমন কর‍্যা কি এসিষ্ট্যান্ট-মাষ্টার লেন টেলিগ্রাফ!

১। নয়টার সময় ছাড়ে ডাউন প্যাসেঞ্জার ট্রেন,
ছটা সাত মিনিটে এল মালদা ষ্টেশন (রে)
লাইন-ক্লিয়ার সাইন কর‍্যা, দিলেন গার্ড
গাড়ী ছাড়্যা, ডিষ্ট্যাণ্ট-সিগন্যালের কাছে,
প্রায় আপট্রেনটি পৌছে, তখন বেগতিক
দেখ্যা গাড়া থাক্যা মারলেন ড্রাইভার লাফ।

২। কি বলব রে দাদা দুঃখের কথা হামি তোরে
এঞ্জিনের এক লোহা ছুট্যা হ্যাঢ়া গেল পুড়ে (রে)
পুড়ে যাওয়ায় মরি লাজে
কয়েকদিন থাক্যা যাইনি কাজে
দেখ্যা হাসেন কত ডাক্তার-বাবু, উকিল
কবিরাজ, মোক্তাব ; এই দেখ ঘরের পয়সা দিয়া
রেলুয়াক, হ্যাঢ়ায় আনলাম ছাপ —।

৩। রেলে রেলে ঘর্ষণ দেখ্যা, বাবু গিয়া দৌড়্যা,
ডি, টি, এসের কাছে খবর দিতে বসলেন তারে (রে)
বোল উঠাতে টকা টবে, হাত বাবুর থর থর করে,
সাহেবকে দিতে এ সংবাদ, কয়েকটা ফারম্ হ'ল
বাদ, তখন ভালকজবাব মত বাবুর গায়ে
আ'ল কাঁপ—।

৪। খবর পায়্যা জেলার সাহেব এলেন তাড়াতাড়ি
তদন্তে জানিতে পারলেন উণ্টিল মালগাড়ী (রে)
সাহেব তখন জিজ্ঞাসিলেন
কেন এরূপ হ'ল বলেন

(বাবুর) মুখে ধান দিলে হয় খৈ
এখন হ'ল হৈ চৈ
রেলওয়ার একশ এক ধাবায় বাবুর ঘটবে কি যে পাপ—॥
ন্যাড়া—পাছা রেলুয়াক—রেলওয়েকে।

কলিশন ঘটনাটির অবিকল বর্ণনা এবং রেল-বাবুর অবস্থা কল্পনা বড়ই কৌতুকপ্রদ। কবি স্কট উচ্চ-সাহিত্যের ভাষায় যাহা করিয়াছেন, এই অশিক্ষিত কবিও তাঁহার গ্রাম্য-ভাষায় তাহাই করিতে চেষ্টা পাইয়াছেন।

করোনেশন-উপলক্ষে কয়েকজন খালাস-প্রাপ্ত কয়েদির গান :—

গম্ভারার সুব

করোনেশনে মোরা খালাস পেলেম ভাই,
প্রাণ ভরে' সমস্বরে রাজার যশ গাই।

১। মোদের মহারাজা যিনি, ইংলণ্ডে বাস করেন, তিনি,
দেখিতে তাহারে কভু নাহি পাই মোরা ভাই,
পঞ্চম জর্জ্জ নামটি তাহার এই শুনিতে পাই।

২। প্রজারা সুখে থাকে যা'তে, পা'ন সোহাগা
এনে সাথে, কাটা বঙ্গের অঙ্গ এঁটে রাখলেন,
সাবেক রায়।*

৩। লর্ড হার্ডিঞ্জের পরামর্শে,
শান্তি এল ভারতবর্ষে,
ধন্য দয়ার-সাগর এমন সংসারেতে নাই।

৪। এডুকেশন-ডিপার্টমেণ্টে, জয়ধ্বনি উঠে উচ্চ কণ্ঠে,
শিক্ষার তরে ভারতবাসী অর্দ্ধ কোটি পায় (টাকা)।

* সোহাগা পাইন দিয়া যেমন অলঙ্কার জোড়া দেওয়া হয়, সদাশয় সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জ সেইরূপ দ্বিধাবিভক্ত বঙ্গকে এক করিয়াছেন।

৫। শোন ভাই আজ সবাই মিলি, প্রাণভরে' বাহু তুলি,
রাজা-রাণীর জয়-ঘোষণা করি সবে আয়।

৬। চল ভাই আপন আপন দেশে,
ভোগ করলাম জেল কর্ম্মদোষে,
এমন পথে চলব না আর কাণমলা সবে খাই।

(কয়েদীরা কোন্ কোন্ অপরাধে কোন্ কোন্ জেলে ছিল, তাহার পরিচয়)

গম্ভীরায় সুর

প্রথম কয়েদী—প্রথমে ছিলাম আমি কলিকাতা আলিপুরে,
দ্বিতীয়— ঢাকা রাজসাহী রঙ্গপুর এলাম্ ঘুরে,
তৃতীয়—জানি তিনটি সহর, দিল্লী, লক্ষ্ণৌ, লাহোর,
চতুর্থ—আমি মালদা ভিন্ন অন্য জানি না জেলা
চারিজন একত্রে—জেলের বিবরণ সবাই বলেক খুল্যা (এখন)
প্রথম—সখের সাহেবের গাড়ী চুরিতে ধরা পড়ি,
দ্বিতীয়—গণি মিঞার বাড়ী ঢাকাতে ডাকাতী করি
তৃতীয়—গিয়ে সাহেব হাত্তা, চুরি শিকারী-কুত্তা,
আর (মেমের) বিলাতী জুতা,
চতুর্থ—বাবুর হাতী চুরি, ধরা পড়ি গঙ্গার কূলে।
চারিজন—জেলের বিবরণ ইত্যাদি।

(জেলে কয়েদীরা কে কি পরিশ্রম করিয়াছে, তাহার বিবৃতি)

প্রথম—ফুলকপি গাজর মূলা, জল যোগাতাম দুবেলা,
দ্বিতীয়—পীড়তাম সরষার ঘানি ও বড় বিষম ঠেলা,
তৃতীয়—আমার কাযটি ফাঁকা, টানতাম জেল-দারোগার পাখা।

চতুর্থ—আমি ছিলাম সর্দ্দার বি, সি করেদার দলে।

চারিজন একত্রে—জেলের বিবরণ সবাই বলেক খুল্যা।

এইরূপে এক একটি পালাহিসাবে গানগুলি রচিত হয়। কবির আরও দুইটি পালার গান নিয়ে না উঠাইয়া থাকিতে পারিলাম না! এই দুইটি পালায় তিনি যে ভাব নিম্নশ্রেণীদিগের মধ্যে প্রচার করিয়াছেন, তাহাতে শুধু নিম্নশ্রেণী নহে, আমাদের উচ্চশিক্ষিত যুবকদলও বহু বিষয় শিখিতে পাইবেন।

প্রথম পালাটি কুতুবপুর বোলবাই-সমিতি দ্বারা গীত। শ্রীমান অমর নাথ মণ্ডল ও শ্রীমান মদনমোহন মণ্ডল উক্ত সমিতির মধ্যে শ্রেষ্ঠ গায়ক ও নর্ত্তক। দ্বিতীয় পালাটি ইংরেজ-বাজার বোলবাই সমিতির গীত।

প্রথম পালার বিষয়—অধুনা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া এবং চাকরী করাই আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য হইয়াছে। কিন্তু দেশের অন্নাভাব, বস্ত্রাভাব প্রভৃতি মোচন করিবার জন্য কেহই অগ্রসর হইতেছেন না। আমরা শিক্ষার অর্থই এখন পরীক্ষায় পাশ করা বুঝিয়া লইয়াছি এবং পাশ করিয়া চাকরী ও বিলাসিতায় উৎসন্ন যাইতে বসিয়াছি। একজন চাষা গানে ও কথায় একজন চাকরীপ্রার্থী গ্র্যাজুয়েটের কাছে খেদ করিয়া এই সব বলাতে গ্র্যাজুয়েটের মন ফিরিল ও তাঁহার দেখাদেখি পরীক্ষামোহমুগ্ধ আর একজন বাবুরও চৈতন্য হইল।

দ্বিতীয় পালার বিষয়—কয়েকজন ছাত্র নানা রকম বিদ্যাশিক্ষার জন্য বিদেশে গেল। তারপর ফিরিয়া আসিয়া সেই সব বিদ্যা নিজের দেশবাসীকে শিক্ষা দিতে নিযুক্ত হইল। তাহাদের সকলেই সাহেবী হাবভাব পোষাক-পরিচ্ছদ সমস্ত ত্যাগ করিয়া কেহ লাঙ্গল কাঁধে কৃষকের সহিত, মাকু হাতে তাঁতীর সহিত মিলিয়া-মিশিয়া কাজ করিতে আরম্ভ করিয়া দিল।

প্রথম পালা

কুতুবপুর বোলবাই-সমিতি

(দেশের বর্ত্তমান অবস্থা বর্ণ)

(শিবের বন্দনা)

গম্ভীরার সুর

কি কলি হে দশা দৈন্য, (শিব)

দ্যাশের লোকে পায় না অন্ন ॥

হায় কি যে পস্তানার কথা সায়েস্তা খাঁর

আনল (শিব-হে)

তখন গরীব দুঃখী আছিল সুখী টাকায় আট

মনের ভাও চা'লে হে—

কুঠৈ গ্যালো সেই সুখের দিন,

হ'নু দিনে দিনে দীনের অধীন,

এখন আট সের ভাও ছুটে না,

দু'ব্যালা প্যাটে ভাত জুটে না,

(তোর) নন্দী, ভৃঙ্গী, বুঢ়া দামড়া

কি দিয়া পূজবো কহেক হামরা হে।

বছর বছর আস্‌ছিস ক্যান্ দ্যাশ লক্ষীছাড়া শস্তশূন্য।

২। লক্ষীছাড়া কলি যদি, দ্যাশে রাখ্‌লি না ক্যান্

মা সরস্বতী (শিবহে)

তাকেও গাঁজার ধুয়াঁৎ উড়ালি তোর এমনি

পাগ্‌লা মতি হে—

মা সরস্বতী অভাবে এই দ্যাশে

লোক বোকা হ'য়া আছে ব'সে

চোখ দেখ্‌না এক্‌না খুল্যা
ভোলা গেলি কি তুঁই ভুল্যা (এই স্থাশ্‌)
ত্রিশ কোটী লোকে ত তোকে
ববাবম ববাবম ক'হ্যা ডাকে'হে
আজ তাঘ্‌রে ভুল্যা সাগর পারের লোক
গুলাক কল্লি গণ্য মান্য।

৩। যে স্থাশেতে সওয়া পহর ব'র্ষা ছিল সোনা (শিবহে)
আজ সেই স্থাশের লোকগুলাকে পিস্থিয়্যা
দিলি তানা হে—
হায়রে সেই কুরুক্ষেত্র
রাখলি না তার চিহ্ন মাত্র
কত কীৰ্ত্তি কল্লি টুকরা
কহিতে উঠে প্রাণ ডু'কর্যা
আদিনা, পাণ্ডুয়া, গৌড়, রামকেলী,
এ সব নগর সমৃদ্ধিশালা হে
সেই সব নগর কল্লি কিহে বাঘ-ভালুকের বাস অরণ্য।

৪। স্থকা কহে মা লক্ষ্মী সরস্বতী গেলে, তাতো নাই
হামাদের ক্ষতি (ভাইরে)
কিন্তু এই বুঢা ছাড়্যা পালালে, হামাদের বাড্‌ডা
হ'বে ছুর্গতিরে—
যতই ভাবি সবই ভুল
এই আদম হামাদের আদি মূল,
ভক্তিডোরে বান্ধেক ক'স্যা,
দেখিস যায় না যেন খ'স্যা,

স্নেহবাৎসল্য যদি না থা'কৃত
খাঁটী বুঢ়া বিলাতে পালাত (ভাই)
হামাদের ভালবাসে, তাইত আসে,
বছর বছর খা'তে পরমান্ন।

ক'লির—কলি, কুণ্ঠে—কোথায়, ধুয়াং—ধুঁয়াতে, তাঘবে—তাদেরে, লোক গুলাক—লোকগুলাকে, পহর—প্রহর, পিহিয়্যা—পরাইয়া, ত্যানা—ন্যাকড়া, একনা—একটু।

শিবের বন্দনার মধ্যে দেশের জন্য কি মর্ম্মন্তুদ বেদনা! রবি বাবু প্রমুখ বহু কবি দেশের জন্য কাঁদিয়াছেন। কিন্তু ভগবানকে ডাকিতে যাইয়া দেশের দুর্দ্দশায় কাহারও এমন বাষ্পবিজড়িত কণ্ঠ শুনিতে পাই নাই। একজন ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী বলিতেছেন, আমাদের লক্ষ্মী গিয়াছেন, আমাদের সরস্বতী গিয়াছেন, কিন্তু তবুও এই "বুঢ়া" এই মঙ্গল এখনও আমাদিগকে ছাড়েন নাই।"—কি সুন্দর কথা—কি আশার বাণী। আশা করি পাঠকবৃন্দ বন্দনাটি একটু তলাইয়া দেখিবেন।

চাষা ও একজন গ্র্যাজুয়েটের প্রবেশ

চাষার গীত

গম্ভীরার সুর

আহে বাবু হমু কাবু কেমনে হে জান, কহেক কেমনে হে জান, বাচবে কেমনে হে জান? আট সেরের ভাও লাগাছে চাউল চারিদিকেই টান।

১। তোরা এ সব চাল ছাড়্যা (বাবুগিরি চাল ছাড়্যা)
নিজে যদি হাল ধর্যা, আবাদ করতি অনুর্ব্বরা
থাকত দ্যাশের মান, সে—না কোচম্যান ছাঁট্যা,
টেড়ী কাট্যা, লম্বা কোঁচান (ধরলি)।

২। উত্তিম চাঁদ সাক বড় করছিস, হামাঘরে তোখে
মারছিস, বাজে কায়ে তেল উঠাছিস, খাছিস
চুরুট পান, দ্যাখ স্থাশের দশা হল খোসা,
এমনি কি অজ্ঞান ? (তোরা)

৩। করি হামরা এ মিনতি, স্থাশের কাযে দে মতি,
রাবণ-রাজার রাজনীতি নাই কি তোদের জ্ঞান ?
যায় সময় চল্যা বাহু তুল্যা ধর ধর্ম্মনিশান (উড়া)।

কোচম্যান ছাঁট্যা—গাড়োয়ানের মত চুল ছাঁটিয়া ; কোঁচান—কোঁচা ; উত্তিমচাঁদ সাকে—(উত্তিমচাঁদ মালদহের একজন প্রসিদ্ধ মদ-বিক্রেতা)

চাষার গান ও তাহার কথাবার্ত্তায় জ্ঞানপ্রাপ্ত গ্র্যাজুয়েটের গান—

গম্ভীরার সুর

ঝক্‌মারাগ্‌গে বি এ এম এ পাশ,
করব নিজেই জমি চায।
দানা বিনা দেশের লোকে করছে হায় হুতাশ ।

১। সায়েস্তা খাঁর আমলে
টাকায় আট মণের ভাও চা'লে
তিন পয়সার চা'লে একটা লোক খেত গোটা মাস।

২। সেই সুখের দিন গিয়েছে উড়ে (এখন) মরছি
পেটের আগুণে পুড়ে। বাপ-দাদার হাল তাঁত
ছেড়ে হ'ল সর্ব্বনাশ।

৩। নাই গৌড়ের উচ্চচূড়া ভেঙ্গে এসব হল গুঁড়া
খালি ভিটায় ইটা প'ড়ে আছে চারি পাশ।

৪। বুক ফাটছে হায়রে সেনবংশ
কেমনে হল এ সব ধ্বংস
গৌড়ের ভাঙা অংশে হল চামচিকারই বাস।
ঝক্‌মারাগ্‌গে—ঝক্‌মারি হৌক গিয়ে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাপাশলোভী একটি যুবকের প্রবেশ। গ্রাজুয়েটের মতিপরিবর্ত্তন অবলোকন করিয়া এবং তাঁহার সহিত আলোচনাকরতঃ নিজের রুচি ফিরান ও মাকু লইয়া নিম্নের গানটি ধরেন।

গম্ভীরার সুর

ঝক্‌মারাগ্‌গে এফ এ বি এ আমিও আজ
তাঁত নিয়ে কাপড় বুনব ভাই।

১। বুদ্ধির দোষে খেলে পাশা ;
হারিয়াছি ধন নাই এক মাসা ;
হব না আর ভাক্ত ; *
ধ'রে এবার মাকু ;
বসব তাত-গাড়ায়। †

২। বিলাসিতা করে ত্যাজ্য শিখব শিল্প-জ্ঞান-বাণিজ্য
পলু পোষা মাটী হ'য়ে দিনে দিনে গেনু ব'য়ে"
উন্নতি আর নাই (পলুর)

কতগুলি চাষা প্রবেশ করিয়া বাবুদের এই পরিবর্ত্তন দেখিয়া গান ধরে—

গম্ভীরার সুর

বাবুরা হাল তাঁত ধর‍্যাছে দেখ্যা যা ভাই তোরা, ভাঙা চীনাবাসন কখনু থুথুৎ লাগে যোরা ?

* ভাক্ত—হতবুদ্ধি; † গাড়া—গর্ত

১। পারবে কি জাগাতে বঙ্গ? হবে বুঝি (এদের)
প্রতিজ্ঞাভঙ্গ, পচা দড়িৎ বাঁধছে মাতঙ্গ; গুলির
সূতাৎ ঘোড়া।

২। স্থাশ যে জাগাতে আ'ল ওরা পারবে কি খা'তে
ভাদই-বোরা? বিলাতী নক্সাপাড় ছাড়্যা,
পিন্দবে মোটা কোরা (দেশী কোরা)?

কখনু—কখনও, থুথুৎ—থুথুতে, দড়িৎ—দড়িতে সূতাৎ—সূতায়
ভাদই-বোরা—মোটা ধান্যবিশেষ।

চাষারা এই সন্দেহ প্রকাশ করিলে বাবুরা বলেন "আমরা আর বড়াই করিব না এবার কার্য্যে কতদূর কি করিতে পারি দেখা যা'ক।"

দ্বিতীয় পালা

বিদেশযাত্রীদের এক এক করিয়া গান ধরিয়া প্রবেশ।

গম্ভীরার সুর

প্রথম—আমি শিখবার লাগি আমেরিকা যাব
দ্বিতীয়—মনের আরমান মিটাতে আমি জার্ম্মান পালাব
তৃতীয়—আমার উঠল ঝাঁপান যাব জাপান
চতুর্থ—আমার বাসনা যাব বিলাতে কে কে যাবি ভাই, আয়
আমার সাথে।
সকলে—ভাই করে সুশিক্ষা দিয়ে পরীক্ষা আসব ঘুরে দেশেতে।
(কে কি শিক্ষা করিবে তাহার পরিচয়)
প্রথম—শিখব কৃষিবিদ্যা বেশী করে ভাই;
দ্বিতীয়—শিল্প শিখে অন্ন দিয়ে আসব এ বাংলায়।
তৃতীয়—আমার আশা শিখব পশু পোষা

চতুর্থ—আমি যাব ব্যারিষ্টার হতে কে কে যাবি ভাই আয়
আমার সাথে।

সকলে—ভাই করে সুশিক্ষা—ইত্যাদি।

(শিক্ষার্থীদিগের আত্মপরিচয়)

প্রথম—আমার নাম নবীন—বাড়ী কালিয়াচকে

দ্বিতীয়—ধীরেন বলে ডাকে ইংরেজ-বাজারের লোকে

তৃতীয়—আমার প্রবোধ নাম জন্ম জামালপুর,

চতুর্থ—খবিরুদ্দিন নাম; ধাম কান্সাটাতে; কে কে যাবি ভাই
আয় আমার সাথে।

সকলে—ভাই করে' সুশিক্ষা—ইত্যাদি।

আরমান—সাধ; ঝাঁপান—ঝোঁক।

জননী জন্মভূমির প্রবেশ ও গীত

যাও—যাও পুন আসিয়ো।

জননী জনমভূমির দুঃখ বৎস নাশিয়ো।

১। যা বলি তা রেখে মনে পালন ক'রো প্রাণপণে
দেখ কুসঙ্গীদের সনে কভু নাহি মিশিয়ো।

২। কি ছিল তোরা এদেশে দাঁড়িয়েছিস ভিক্ষুকের
বেশে, আর কি হবে অবশেষে ভেবো দিবা নিশিও।

৩। (প্রথমের প্রতি)—ত্রিশ কোটি প্রাণ সমস্বরে
হা অন্ন হা অন্ন করে, অনুর্ব্বরা ভূমি নিজ করে
ধরে' লাঙ্গল চষিয়ো।

৪। (দ্বিতীয়ের প্রতি)—পিপীলিকা ক্ষুদ্র জাতি; পরিশ্রমে দৃঢ়মতি,
লক্ষ্য করে, তাদের প্রতি, শিক্ষামূলে বসিয়ো।

৫। (তৃতীয়ের প্রতি)—হয়ে আমরেশম ব্যবসা মাটী, গৌড়ের অবনতি খাঁটি, কিসে হয় এর উন্নতি পরিপাটী, শিখ জ্ঞান-বিজ্ঞান রাশিও।

৬। (চতুর্থের প্রতি)—বিদ্যাসাগর রামমোহন রায়, তাঁরা ত হয় তোদেরই ভাই,

কি কষ্টে বিদ্যাশিক্ষা পায়, জানে সর্ব্বদেশীয়।

৭। ভবে বিদ্যারত্ন মহাধন, লভে যেন সর্ব্বজন,
এই ধন যাদের নাহি জ্ঞান, তাদের প্রতি শাসিয়ো।

৮। জাগরে জাগরে বঙ্গ, কর কুম্ভকর্ণের নিদ্রাভঙ্গ,
দেখ দেখ জাপানী, ইঙ্গ, তাদের গুণে পশিয়ো।

সকলের নিষ্ক্রামণ।—বিদেশ হইতে শিক্ষাপ্রাপ্ত যুবকগণের পুনঃ-প্রবেশ ও গীত।

গম্ভীরার সুর

সকলে—

আমরা শিক্ষা করে, এলাম ঘুরে, সবাই দেশেতে;
দিব জীবন দেশের লাগি ক্ষতি নাইক তাতে, (ভাইরে)।

১। করে' মুষ্টিভিক্ষা দ্বারে দ্বারে গিয়াছিনু সাগর-পারে,
এই দেশের উন্নতি-তরে মিলে এক সাথে (ভাইরে)।

২। শিখেছি জ্ঞান-বিজ্ঞানরাশি, পশু পোষা আর শিল্প-কৃষি,
সে সব শিক্ষা দিব ভারতবাসীকে ধ'রে নিজ হাতে (ভাইরে)।

৩। আজ এক বৃটের দুই দা'ল* মিলে, জ্ঞানের বাতী দিব জেলে;
নয় ত শিক্ষাভাবে সোণার বাঙলা যায় অধঃপাতে (ভাইরে)।

প্রত্যেকের সাহেবী-পোষাক পরিবর্ত্তন ও দেশীবেশ গ্রহণ।

* এক বৃটের দুই দাইল—এক ভারতমাতার দুই সন্তান—হিন্দু ও মুসলমান।

গীত

গম্ভীরার সুর

এতে নাই আমাদের কোনই লাজ
ধর ভাই দেশের কাজ।
হেলাতে হয় কার্য্য নষ্ট তাই স্পষ্ট কথা কহি আজ।

১। পরব দেশের মোটা কাপড়, করব না আর হাঁপর ফাঁপর, ছাড়ব হাট প্যাণ্ট বুট কলার, ধরব না আর সাহেব-সাজ।

২। ইতিহাসে এই প্রমাণ পাই, বাঙ্গালী মাটী হয়েছে জুতায়, সোণার বঙ্গ বিলাসিতায়, হারিয়েছেন নবাব সিরাজ।

৩। দেখে শিখ এই তালবইর বাসা, কারিগিরি কেমন খাসা, তার চেয়ে কি আমরা চাষা ধিক্ তবে মানব-সমাজ!

৪। বাণিজ্যে বসতি লক্ষ্মী, খনপত ভিখু তার আছে সাক্ষী, তাদের ঐ পথ দেখাদেখি বাণিজ্যে চালা জাহাজ।

৫। মালদাহ আছিল আট হাজার তাঁত, গরীব দুঃখী সবাই পেত ভাত, সেই মালদাতে আজ ঢুকে কাভাত, উজ্জ্বল সোণার গৌড়রাজ।

৬। শুন ভাই মালদার উন্নতির আশে, বেড়াতেন ঘুরে দেশ বিদেশে নাম রাধেশ বাবু কংগ্রেসে গিয়েছিলেন যিনি মান্দ্রাজ!

৭। মহম্মদ সুফীর এই উক্তি, মায়ের পদে রেখে ভক্তি কর্ম্মক্ষেত্রে দেখা শক্তি করছেন মা বঙ্গে বিরাজ।

তালবই—বাবুই পাখী; কাভাত—দুর্ভিক্ষ।

উল্লিখিত গানগুলির রচনা ও ভাবুকতার বিষয় বেশী কিছু না বলিলেও চলে। পাঠক তাহার বিচার করিবেন!

শ্রীযুক্ত হরিমোহন কুণ্ডু

ইহার নিবাস ইংরেজবাজারের অপর পার সাহাপুরে। বয়স অনুমান

পঞ্চাশ বৎসরের কিঞ্চিদধিক; বাঙ্গালা ভাষায় ইহার বেশ জ্ঞান আছে। ইংরাজী বেশী কিছু জানেন না। আশৈশব ইনি সঙ্গীতপ্রিয়। নানা রকম রাগ-রাগিণী ও তাল-মানে ইহার অধিকার আছে। শুনা যায় ইহার নিজের একটা কবির দল ছিল, তাহাতে ইনি উপস্থিত মত গান বাঁধিয়া বাদ-প্রতিবাদ করিতেন। ইনি এখন ইংরেজবাজারের প্রসিদ্ধ জমিদার গোঁসাঞী প্রতাপচন্দ্র গিরি মহাশয়ের কাছারীতে দেওয়ানী কার্য্য করিতেছেন।

ইহার রচিত শিবের বন্দনাগুলি সাধক-প্রবর রামপ্রসাদের গানের সঙ্গে মিশাইয়া দিলে ধরিবার উপায় নাই। একবার ইনি মহাদেবকে তাঁতী সাজাইয়াছিলেন—সে গানটি ভাবুকতার চরম দৃষ্টান্ত। আমরা নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিলাম।

(ওহে হর)—

তুমি এই ভবেতে তাঁতবুনা কায
খুব ভালই জান,
ব্রহ্মাণ্ডের একদিক হতে ফেলে মাকু
আর দিকেতে টান।

১। এ বিশ্ব বিশ শ'য়ের তানা,
গাঁথিতাছে বিস্ময়-সানা,
হর-রকমের হরেক বানা
নিত্য নূতন আন।

২। সৃষ্টি করে' মায়ার নরদ,
তাহে জড়িয়া দারা পুত্র গরদ,
ঝাঁপ উঠায়ে পরদ পরদ
আচ্ছা বুঁটা বুন।

সৃষ্টিস্থিতি প্রলয় করা,
তোমার পক্ষে মশরা জড়া,
পাপীগণকে পেলাম করা

কাযেধৃতরা খুম।

৪। এমনি তুমি তাঁতের তাঁতী, (তোমার)
ব্রহ্মা বিষ্ণু সাঁতের সাঁতী,
ফুলকী বা'ছে পাতি পাতি

মৃত্যু দপ্তি হান।

৫। তোমার আদ্যাশক্তি চরকা লাটা
ত্রিগুণ সূতা কাটনাকাটা,
হরিমোহন বলে তানা ছাঁটা

এতই করাও কেন।

তানা—সূতা; সানা—ছিদ্র; যাহার মধ্য দিয়া সূতা প্রবেশ করে; বানা—সরু খিল; লরদ—গোল একখানা লম্বা কাষ্ঠখণ্ড যাহাতে কাপড় বা সূতা জড়ায়; ঝাঁপ—যাহার উপর পা দিয়া চাপ দেওয়া হয়; মশরা জড়া—ছিন্ন সূতাকে জোড় দেওয়ার নাম; পেলাম করা—মোলায়েম করা; সাঁতের সাঁতী—সাথের সাথী; ফুলকী—উদ্বৃত্ত সূতা; বাছে—বাছিয়া; দপ্তি—সানার উপর ও নীচের কাঠ; লাটা—লাটাই, যাহাতে সূতা জড়ানো থাকে।

যাঁহারা তাঁতের কায জানেন, তাঁহারা গানটি ভাল বুঝিবেন। এই সব কল্পনায় কবির কোনই কষ্ট নাই। গ্রামের নীচশ্রেণীদিগের সহিত তাঁহার বিশেষ যোগ আছে, তিনি তাহাদিগের ঘরের লোক, তাহাদের ব্যবসা-বাণিজ্য প্রভৃতি বিষয় তাঁহার চোখের সম্মুখে সকল সময় ভাসিতে

থাকে। সেই জন্য গান লিখিবার সময় ভাবের জন্য তাঁহাকে ঘর্ম্মাক্ত হইতে হয় না।

তাঁহার তাঁতী শিবকে পাঠক দেখিলেন, এখন তাঁহার চাষী শিবকে একবার দেখুন—

তুমি হয়ে চাষী কাশীবাসী কেন কাশীশ্বর
কর্ম্মক্ষেত্র এ ব্রহ্মাণ্ড ক্ষেত্র তব হর।

১। (লয়ে) মদন রতির লাঙ্গল ঈশ
বিষম বেগে জগদীশ
ঘুরাও নিরন্তর।

২। মন আত্মা দুই বলদে বেঁধে;
কর্ম্ম-জুয়াল চাপিয়ে কাঁধে
মায়ারজ্জু নাসায় ছেঁদে
কতই বা আর তাড়;

৩। সুখ-দুঃখ দুই শক্ত জোতা
সেই জুয়ালে আছে যোতা
(পাছাতে) আশা-লাঠির দিচ্ছ গুঁতা
ওহে দিগম্বর।

৪। সৃষ্টি হতে লয় পর্য্যন্ত
চাষের কি হবে না অন্ত
কিঞ্চিৎও কি হও না ক্লান্ত
ওহে গঙ্গাধর;

৫। ব্রহ্মা যিনি বিষ্ণুর কুমার
বীজ বুনানি মজুর তোমার
কতই যে বীজ হয় না শুমার
ওহে বিশ্বেশ্বর।

তুমি বীজ বুনাতে ব্রহ্মায় ভোগাও
বিষ্ণু দ্বারা ফসল যোগাও (নিজে বসে)
টুমরু তালে ডুমরু বাজাও
ঝুমরুতে গান কর।

৭। তব ক্ষেত্র এ ত্রিসংসার
দিনে দিনে হচ্ছে অসার
হরিমোহন বলে ও সারাৎসার
সান বিতরণ কর।

কবির ভাবুকতা এবং ভাবপ্রকাশের অদ্ভুত ক্ষমতায় আমাদিগকে বিস্মিত হইতে হয়। সাধকপ্রবর রামপ্রসাদ গাহিয়াছিলেন "মন তুমি কৃষি কাজ জান না, এমন মানব-জমি রইল পতিত আবাদ করলে ফলত সোণা।" কবি হরিমোহন মনকে চাষী না করিয়া শিবকেই চাষী সাজাইয়াছেন—তাঁহার এ বিষয়ে কৃতিত্ব আছে তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

তাঁহার অন্যান্য গান সম্বন্ধে আমরা পরে আলোচনা করিব।

শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র দাস

ইহাঁর বাসস্থান ইংরেজবাজারের দক্ষিণ মহেশপুর গ্রামে। বয়স ২৮।২৯ বৎসরের বেশী নহে। ইহাঁর বিদ্যাশিক্ষা ছাত্রবৃত্তি শ্রেণী পর্য্যন্ত। ইনি বেশ মেধাবী কিন্তু অবস্থা-বিপর্য্যয়ে ইহাঁকে অল্প বয়সেই বিদ্যালয় ছাড়িয়া অর্থোপার্জ্জনের অন্বেষণে ব্যতিব্যস্ত হইতে হইয়াছে। ইনি এখন ইংরেজবাজারের একজন মহাজনের দোকানের হিসাবরক্ষকের কার্য্য করিতেছেন। ইহাঁর সম্বন্ধে একটা আশ্চর্য্য কথা এই যে আজ পর্য্যন্ত ইহাঁকে কেহ কখন রুষ্ট হইতে দেখে নাই।

ইনি জন্মগত কবিত্বশক্তিসম্পন্ন। ইঁহার সুললিত শব্দযোজনা, অনুপ্রাসের সুমধুর ঝঙ্কার, মাধুর্য্যময়ী কল্পনা, ভাবুকতা সত্যসত্যই বড় মর্ম্মস্পর্শী। ইনিই সর্ব্বপ্রথম শিবের বন্দনায় জাতীয় রোদন আনয়ন করিয়াছেন। গত চৈত্র মাসের "গৃহস্থে" শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী ঘোষ মহাশয় ইঁহার কয়েকটি গানসম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। তন্মধ্যে "হামরা বছর বছর তোকে পূজিয়া"—গানটি জাতীয়-রোদনের দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করিতেছি। তারপর ইনি দেশ ও সমাজসম্বন্ধে কতখানি ভাবেন নিম্নের গানগুলিতে তাহা স্পষ্ট বুঝা যায়।

গ্রামোফোনে আমাদের কি অনিষ্ট করিতেছে একটু শুনুন—

গম্ভীরার সুর

এখান হতে পালিয়ে চল সবাই,
যমন ঘুরছে পিছে পিছে কলে ভরবে ভাই।

১। লালচাঁদ বড়াল আদি করে, বড় বড় ভাইকে ধরে,'
রেখেছে ভাই বন্ধ করে' কলেতে ভরে,'
আবার রেখেছে এক মাগীক ধরে,'
তার নাম গহরজান বাই।

২। সেতারের ঝন্‌ঝনি, বেহালার কুন্‌কুনি,
মন্দিরার টুন্‌টুনি স্পষ্ট শুনা যায়।
কেমন কন্‌সার্টপার্টি, তবলার চাঁটা,
কলেতে বাজায়।

৩। যাত্রা-থিয়েটার-কীর্ত্তনাঙ্গ, সকলকেই করেছে
সাঙ্গ, কলের মধ্যে সবাই বন্ধ কাউকেও ছাড়ে
নাই, (কেবল) বাকীর মধ্যে আছে যারা
গম্ভীরা গায়!

৪। (কলের) চেহারা দেখে পিলাই কাঁপে,
লিয়ে বেড়ায় চুপে-চাপে, একলা দোকলা
পেলে তাকে ছাড়াছাড়ি নাই ; আমাদের কেও
ধরবার জন্য গম্ভীরা বেড়ায়।

৫। ধন-দৌলত টাকাকড়ি, ঘুড়ি-ঘোড়া ঘর-বাড়ী,
কলেতে গিয়েছে সব বাকী কিছু নাই !
এখন কলের গানে মাতিয়ে প্রাণে ন্যাংটা
করতে চায় !

৬। সুশিক্ষিত মহাত্মারা, কলের গানে আত্মহারা
বিলাসপুরণে তারা কলের গান আনায়,
ঘরের পয়সা যায় ভাই খস্তা, দিশা কর তাই।

৭। দাস গোপালে ভেবে বলে কলের গান চলিত হলে
দেশের বিদ্যা গানবাদ্য যাবে ভাই ভুলে,
(এখন) দেশের মাল সব হচ্ছে পয়মাল,
সামাল করা চাই।

উক্ত গানটি মালদহ সাহিত্য-সম্মিলনে গীত হইয়াছিল। দুইজন গম্ভীরাওয়ালা এবং একজন গ্রামোফোনওয়ালা সাহেব সাজে। সাহেবকে দেখিয়া গম্ভীরাওয়ালাদ্বয় এমন ভীত-ত্রস্তভাবে গান ও অভিনয় করিয়াছিল যে, দর্শকবৃন্দ মুগ্ধ না হইয়া থাকিতে পারেন নাই। গানটিতে আমাদের ভাবিবার বিষয় যথেষ্ট আছে।

বিধবা-বিবাহ : সম্বন্ধে শিক্ষিত দেশবাসী অনেক যুক্তি-তর্ক শুনিয়াছেন। অনেক পণ্ডিত স্মৃতিশাস্ত্র মথিত করিয়াছেন। কিন্তু অশিক্ষিত একজন কবির হৃদয়ের যুক্তি—শাস্ত্রের যুক্তি নহে !—একবার শুনুন,—

(বিধবা-বিবাহের একজন স্বপক্ষ, আর একজন বিপক্ষ,

এতদুভয়ের মধ্যে বাদ-প্রতিবাদ)

গম্ভীরার সুর

স্বপক্ষ—জাতি কুল গেল মোদের বিধবাদের
বিবাহ না দিয়ে রে।
মুখ তুলে, চোখ তুলে, দেখ
কত বি, এ দিচ্ছে বিয়ে রে।

বিপক্ষ—হল মতিগতির অধোগতি দুনিয়ার
কাগজ পড়্যা রে,
অসম্ভব কি সম্ভব—এ সব অধর্ম্মেই যায়
লক্ষ্মীছাড়্যা রে।

স্ব—এসব মনের ভুল ভাই মনের গোল,
জ্ঞান থাকতে সেজেছ পাগল,
অশিক্ষিতের দলেই কেবল এই গণ্ডগোল
ছাড়েক এ দুর্ম্মতি যাস্‌নে ভাকিয়া রে।

বি—মূর্খের সঙ্গে তর্ক মিছে
আগেই দৌড়ে দেখে না পিছে
খালি তুষে পাহার কচ্‌কচি সার হাণ্টাম্ আছে
(একটু) মাথা খেলিয়ে দেখেক তলিয়ে রে।

স্ব—যেমন পাকলে ফল খসে' পড়ে
তালিম হলেও ঐ রোগ ধরে
জাতি ধর্ম্ম কর্ম্মাকর্ম্ম কাণ্ডজ্ঞান ছাড়ে
(তখন যায়) মূলটা ছাড়্যা উল্টা গয়্যা রে।

বি—সাহেবদের লেখা লেখে সাহেবদের দেখা দেখে
মুনি-ঋষির সব পুঁথিকে দিয়াছিস ফেঁকে
(জানি তুই) কত জ্ঞানী বিশেষ কর‍্যারে।

স্ব—ভেবে দেখ বিধবারা সর্ব্ব সুখে হয়ে হারা
কুশাসনের হুতাশনে জীয়ন্তে মরা ;
তাদের মুখ পানে দেখ চেয়ে রে।

বি—বৈধব্য-যন্ত্রণা যার পূর্ব্বজন্মের আছে ধার
শোধিবারে এ সংসারে জন্ম বিধবার
কেবল ভোগাভোগি দেহ ধর‍্যা রে।

স্ব—স্ত্রী মরিলে সুখের তরে পুরুষ কেন বিয়ে করে
রাঁড়ী হয়্যা থাকবে সহ্যা নারী কার ডরে
এ কোন্ দেশী ধর্ম্ম দেখ ভাবিয়ে রে।

বি—একবার অন্যে সমর্পিয়ে
আবার কেমনে দিবে বিয়ে
হবে ধর্ম্মনাশী নরকবাসী পরলোক গিয়ে
পুরুষ চিরস্বাধীন দেখ স্মর‍্যা রে।

স্ব—জীবভরা এই ধরা রচয়িতার এমনি ধারা
পুরুষ প্রকৃতি এরা তিলেক নয় ছাড়া
কেমনে বিধবারা বাঁধবে হিয়ে রে।

বি—মানুষ হয়ে নীচ-আচার
এই বুঝি পণ্ডিতের বিচার
এটা ছ্যাড়া ওটা ধর‍্যা পশু-ব্যবহার
(তাহ'লে) সতীধর্ম্ম যাবে উচ্ছন্নরে।

স্ব—সেদিন কি আর কাছে ভাই
(এখন) ভ্রূণ-হত্যার সীমা নাই
(এখন) ইজ্জত ঢাকা বংশ রাখা
সব দিক দেখা চাই
ঘুচবে লুকাচুরি পরকে নিয়ে রে।

বি—হবে ভালবাসা দোকানদারী
সংসারের সুখ ছাড়বে বাড়ী
মৃত স্বামীর বিষয় নিয়ে হবে মারামারি
আগে আইন গোলা বদলা লড়্যারে।

স্ব—ও সব গোলমাল থাকবে না ভাই
আগে এমত চালান চাই
বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বলিহারি যাই
আর বাঁচলে ক'দিন যেত চালি রে।

বি—সাগরের বিদ্যা সাগরে থাক
চোখের দেখা চোখ খুলে দেখ
অনুরাগী জাত-বৈরাগীর সমাজের ধাক
এমনি যাবে গর‍্যা ঐ পথ ধর‍্যা রে।

স্ব—লোক দেখা সমাজের সতী
সমাজের অধোগতি (হচ্ছে)
নিতি নিতি দুর্নীতি প্রবল অতি
(তাই বলি) হিত-হেতু দিতে বিয়ে রে।

বি—একে কুমারীদের বিয়ের দায়ে
খাচ্ছে খোলা গুদরি গায়ে (শেষে)

রাঁড়ী বিহা চল্লে মরতে হবে বিষ খা'য়ে
আরও ব্যভিচার আসবে দোর‍্যা রে।

(একজন মীমাংসক সাধুর প্রবেশ ও গীত)

গম্ভীরার সুর

জেদাজেদী ছাড়েক তোরা গোড়া খুজে চা।
রাঁড়ী বিহা চল্লে ভাল মুস্কিল জান বাঁচা।

১। কত সধবা বিধবার হালে জ্বলে ইন্দ্রিয়-জঞ্জালে
সুখী হবে কি না স্বামী কিন্যা বিচার কর বাছা।

২। সাধু পথ থাকতে পরে কেন যাবে কুপথ ধরে
শিখাও ব্রহ্মচর্য্য মানুষ করে' দোনো কুল বাঁচা।

৩। পড়াও ঋষিদের শাস্ত্র-পুরাণ নীতিজ্ঞানের পাবে
সন্ধান, শিখিয়ে পরসেবা গরীব গোরার কায
কামে নাচা।

৪। কাযে ব্যস্ত থাকলে মতি (হবে) পুত্রস্নেহ
সবার প্রতি, গড়িয়ে না ধাঁচা।

৫। তখন ইন্দ্রিয়জয় আপনি হবে হাণ্টামু লুকাচুরি
ঘুচে যাবে, দাস গোপালে বলে ভেবে সকলে চল
কাছা।

খালি তুষে পাহার—খালি তুষকে পেষণ করিতে; হাণ্টামু—মিথ্যা তর্ক; উল্টা গর‍্যারে—উল্টা গড়িয়া যায়; সহ্যা—সহিয়া; আইন গোলা—আইনগুলা; ধাক—পন্থা গর‍্যা—খারাপ হইয়া; বিহা—বিয়ে। কিন্যা—কিনিয়া; ধাঁচা—ধরণ।

পূর্ব্বোদ্ধৃত গানটিতে বিধবাদিগকে সমাজের হিতসাধনে নিযুক্ত

রাখিয়া তাহাদিগের ব্রহ্মচর্য্য ও শাস্ত্রাদি-আলোচনার ব্যবস্থা করিবার কথা আছে। বিধবারা পরসেবায় লাগিলে সমাজের কত বড় একটা কল্যাণ-শক্তি বাড়িয়া যায় সুধীজন সে কথা বিচার করিবেন। ফলকথা গানটিকে আমরা হাসিয়া উড়াইতে পারি না। কবির সাধু ইঙ্গিত অনেক সুফল প্রসব করিতে পারে।

গোপাল বাবুর বোলবাই-সমিতির গায়ক ও নর্ত্তকদিগের মধ্যে শ্রীযুক্ত রমণীকান্ত দাসের নাম উল্লেখযোগ্য। ইহার নৃত্য মৌলিকতাপূর্ণ—বড়ই বর্ণনীয়। নৃত্যের সঙ্গে সমস্তটা অঙ্গের নানারূপ ভঙ্গীও বিশেষ কৌতুক-প্রদ। ইহার ন্যায় এক পায়ের উপর নানারকম অনায়াসনৃত্য-মাধুর্য্য কোনও থিয়েটার বা যাত্রায় উপভোগ করিয়াছি বলিয়াও মনে হয় না! রাজধানী হইতে বহুদূরে নিভৃত এক পল্লী-ক্রোড়ে নিতান্ত অখ্যাতভাবে আমাদের একজন অশিক্ষিত বাঙ্গালী এমন নৃত্যবিদ্ নৃত্যবিষয়ে এমন উদ্ভাবিনীশক্তিসম্পন্ন কেমন করিয়া হইতে পারে ভাবিলেও আশ্চর্য্য বোধ করি। এটা কি গৌড়ীয় সভ্যতার ফল?

শ্রীকুমুদনাথ লাহিড়ী।

ময়মনসিংহের নিরক্ষর কবি

বাঙ্গালার প্রাচীন কবিদিগের মধ্যে চণ্ডীদাস, কৃত্তিবাস এবং কাশী-দাসই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন বলিয়া পরিগৃহীত হইয়াছেন। পশ্চিমবঙ্গ যখন এই সকল কবিদিগের কলকণ্ঠে মুখরিত হইয়া উঠিয়াছিল, ময়মনসিংহের সীমান্তপ্রদেশে সেই সময় বা তাহার কিছু পূর্ব্ব হইতে নারায়ণদেবের

সুমধুর কবিতায় তরঙ্গায়িত হইতেছিল। তাহার পর চণ্ডীর অনুবাদক রূপনারায়ণ ঘোষ, অন্ধকবি ভবানীদাস, মহাভারত-রচয়িতা রামেশ্বর নন্দী, ক্রিয়াযোগসার-রচয়িতা অনন্ত দত্ত, কবি কৃষ্ণদাস, ভারতীমঙ্গল রচয়িতা রাজা রাজসিংহ, পদ্মাপুরাণ-রচয়িতা দ্বিজ বংশীদাস, ভাস্কর-পরাভব-রচয়িতা গঙ্গানারায়ণ, জগন্নাথদাস, দুর্গাপুরাণ-রচয়িতা মুক্তারাম নাগ, "দারা-শেকোর" বঙ্গানুবাদক সদানন্দ মুন্সী, চণ্ডীকাব্য-রচয়িতা রামানন্দ গুপ্ত প্রভৃতি প্রাদুর্ভূত হইয়া বঙ্গসাহিত্যের অশেষ উন্নতি ও ময়মনসিংহ জেলাকে গৌরবান্বিত করিয়া গিয়াছেন। যে সকল কবির কথা উল্লেখ করিলাম, ইঁহারা সকলেই রীতিমত লেখাপড়া জানিতেন। অদ্যকার প্রবন্ধে যে কবির কথা উল্লেখ করিব, ঐ কবি নিরক্ষর! নিরক্ষর যে কবি হইতে পারে, ইঁহার জন্মের পূর্ব্বে এই ধারণা কাহারই ছিল না, এবং থাকিতেও পারে না। "নিরক্ষর কবি" কথাই অসম্ভব বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয়, ইঁহার রচিত কবিতা লিখিয়া না রাখায় ভাল ভাল কবিতাগুলি বিলুপ্ত হইয়াছে! একবার অনেক দিন হইল, বর্ত্তমান প্রবন্ধোক্ত রামুসরকার তাঁহার রচিত ভাল ভাল কবিতাগুলি লিখাইয়া রাখার প্রস্তাব রামগতি সরকারের নিকট করিয়াছিলেন, তদুত্তরে রামগতি সরকার বলিলেন, "কুম্ভকারের হাঁড়ির দুঃখ কি", যখন প্রয়োজন হইবে তখনই কবিতা রচনা করিতে পারিবেন, লিখিবার প্রয়োজন কি। এই ভ্রমে পড়িয়া রামু সরকার তাঁহার রচিত কবিতাগুলি লিখাইয়া রাখেন নাই। এখন এ বৃদ্ধবয়সে ভাল ভাল কবিতাগুলি বিস্মৃত হইয়া গিয়াছেন, যে ২।১টি বলিতে পারিয়াছেন, প্রবন্ধের শেষে উল্লেখ করা গেল।

জেলা ময়মনসিংহ পরগণে হোসেনসাহীর অন্তর্গত নান্দাইল থানার এলাকাধীন আউটপাড়া গ্রামে ১২৪৮ সনের মাঘমাসে মঙ্গলবারে শ্রীরাম-চন্দ্র মালী (রামুসরকার) জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম ৺রাম-

প্রসাদ মালী, মাতার নাম রামমণি দাসী। উক্ত আউটপাড়া গ্রামে একটি কবির দল ছিল। তাঁহার বয়স যখন ৮।৯ বৎসর; তখন ঐ দলে গিয়া গান শুনিতেন, সন্ধ্যাকালে সকল রাখাল বালকসহ একত্রিত হইয়া ঐ সকল ছড়া-পাঁচালীর আলোচনা করিতেন। ইঁহার স্মৃতিশক্তি এত প্রবল ছিল যে, যাহা একবার শুনিতেন তাহাই অভ্যস্ত হইত। ইঁহার এরূপ স্মৃতিশক্তি দেখিয়া আউটপাড়ানিবাসী স্বর্গীয় অমরচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয় ইঁহাকে নিজ বাড়ীতে আনাইয়া কবির গান ও ছড়া-পাঁচালী রচনার উপদেশ দিতে লাগিলেন এবং মহাভারত, রামায়ণ, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি পুরাণের প্রস্তাব-গুলি মুখে-মুখে শিক্ষা দিতে লাগিলেন, এবং অক্ষরে অক্ষরে কিরূপে মিল হয়, তাহাও মুখে মুখে শিক্ষা দিলেন। এইরূপ শিক্ষাতেই কিছু দিনের মধ্যে তাঁহার অদ্ভুত রচনা-শক্তি জন্মিল। পাঠকগণের কৌতূহল-চরিতার্থের জন্য তাঁহার রচিত ভক্তি-সঙ্গীত একটি ও ঈশ্বর-বন্দনা প্রভৃতি নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম—

হরি ব'লে ডাক'রে আমার মন।

এল' নিকটে শমন তুমি কার আশায় বসিয়ে র'য়েছ,
তোমার গণার দিন যে দিনে দিনে গত হ'ল তাকি টের পেয়েছ॥

যাবে যদি ভব-পারে বল কৃষ্ণ হরে হরে
কেন ভ্রান্তে পড়ে ভুলিয়ে রয়েছ
ঠেকে ভবের ফান্দে রামু কান্দে
ভক্তি-ধনে মন বঞ্চিত হয়েছ
এ দেহ থাকতে চেতন হরি বল মন
জীবনের ভরসা আর কি
যখন এসে শমন দিবে দরশন
তখন ঘোর হবে দুই আঁখি

যার জন্য খাট বেগারী তারা সব রবে পড়ি
একা পলাবে প্রাণ-পাখী
তোমার ভবের কামাই ভবে রবে,
মন তোমায় দিবেই বা কি নিবেই বা কি।
আমি মূর্খ নিতান্ত ভ্রান্তে হই অশান্ত
শ্রীকান্ত জানি না কখন
সদায় করি দুশ্চিন্তে চিন্তামণি করি চিন্তে
নিশ্চিন্ত মন থাকে না কখন
যার করিলে চিন্তে দূরে যাবে সকল চিন্তে
চিন্তামণি চিন্তার কারণ
কে পারে তাঁহারে চিন্‌তে যে চিন্‌তে সে চিন্‌তে
আমার জন্ম গেল চিন্‌তে চিন্‌তে, চিন্‌তে পারিনে কখন।
মুক্তিকর্ত্তা জনার্দ্দন এধন-বিনে আর কি ধন
ত্রিজগতের মোক্ষ ধন চিন্তা কল্লে সে চরণ—
মোক্ষধামে হয় গমন।
ত্রিজগতের তারণ-কারণ যিনি হন কারণের কারণ
ক এতে কৃষ্ণনাম লিখন আমি তা জানিনে কখন।
উদ্দেশ্যেতে নিবেদন করি প্রভু-জনার্দ্দন
বিপত্তে মধুসূদন যা কর এখন ॥

ঈশ্বর-বন্দনা

হে প্রভু জনার্দ্দন উদ্দেশ্যে করি নিবেদন
শ্রীচরণ পাবার আশার আশে
পাপাশ্রিতে মতিচ্ছন্ন ভক্তি হয় না সে জন্য
মোক্ষ-চরণ পাব আর কিসে

আমি মূর্খ ভক্তিহীনে পাবার আশা হয় না মনে
যদি তোমার দয়াগুণে পাই আমি দীনহীনে
কে আছে তুমি বিনে এ তিন ভুবনে
পাপী-তাপী কত জনে উদ্ধারিলে নিজগুণে
কিঞ্চিৎ করুণা গুণে দয়া কর এ অধীনে
তুমি কৃষ্ণ ব্রজের বনমালী
আমি তোমার হইত ভক্ত
যেদিন হবে জীবনমুক্ত
কইয়ো মুক্ত বলে রামুমালী

গুরু-বন্দনা

গুরু-কৃষ্ণ-বৈষ্ণব তিনে এক দেহ
জীব উদ্ধারিতে ভবে আর নাই কেহ
সেই গুরুতে ভক্তি হয় না, আমার আমার করি
কেবা আমার আমি বা কার জান্তে নয়কো পারি
কিসে হব অন্তে মুক্তি ভব-পারে নাই কো যুক্তি
গুরু-মুখে আছে উক্তি কর্ণে দিলেন নাম
সে নাম ভজিলে পরে যাওয়া হবে ভবপারে
শুদ্ধ হইবে পরিণাম।
অখণ্ড মণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরং
তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।
অনুবাদ কবি বাদে পড়েছি ঘোর বিপদে
তব পদে নিলাম শরণ॥
বিগত ১২৬৯ সনে শিবপুর গ্রামে বিখ্যাত পণ্ডিত স্বর্গীয় তারাকান্ত

ন্যায়রত্ন মহাশয়ের টোলে শ্রীপঞ্চমী-উৎসব উপলক্ষে প্রথম চণ্ডী ঘোষ সরকারের সহিত রামু সরকারের কবির গান হয়। চণ্ডী ঘোষ প্রশ্ন করিলেন—ব্রহ্মার পঞ্চমুণ্ড ছিল, একমুণ্ড বিলুপ্ত হইল কেন? তদুত্তরে রামু সরকার বলিলেন :—

শিব হইলেন পঞ্চানন ব্রহ্মা হইলেন পঞ্চানন
এই বলে পঞ্চানন করিলে ভাবনা
সমান সমান হলে এই যে ভূমণ্ডলে বর্ণিবে যে
সমান তুলনা।
আমার সমান ত্রিসংসারে এমন কে হইতে পারে
এই বলে ব্রহ্মারে বলিলেন পঞ্চানন
আমার বাক্য ধর এক বয়ান ত্যাগ কর
বলিলেন তখন॥
ব্রহ্মা বলেন ত্রিপুরারি তোমার বাক্য ধরি
বয়ান কেন ত্যাগ করি এ বাক্য বলনা কথন
তাতেই শিব রাগের ভরে এক মুণ্ড ছেদন করে
কপালী নাম শিবের সেই কারণ॥

রামু সরকার পাবনা জেলানিবাসী বড়হরি সরকার, কৃষ্ণনগরনিবাসী চণ্ডীগোপাল সরকার, বিক্রমপুরনিবাসী ভৈরব মজুমদার, রামকানাই শীল, বরিশালনিবাসী মথুর সরকার, বিধুভূষণ সরকার, ফরিদপুরনিবাসী মহিম শীল, মহেশ চক্রবর্ত্তী, ত্রিপুরানিবাসী কানাইনাথ, ভগবান দাস, শ্রীহট্টনিবাসী গোলক মুন্সী, ময়মনসিংহের শ্রীযুক্ত বিজয়নারায়ণ আচার্য্য রামগতি শীল প্রভৃতি প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ কবির সরকারগণের সহিত কবি গান করিয়া জয়লাভ করিয়াছেন। এখন অত্যন্ত প্রাচীন হইয়াছেন, এখনও গান করিয়া থাকেন, ঐ ব্যবসা দ্বারা তালুকাদিও করিয়াছেন।

শ্যামু সরকারের দুই বিবাহ—১ম পক্ষের পুত্র হরনাথ, বয়স ২৭।২৮ বৎসর। সে পৈতৃক-ব্যবসা আরম্ভ করিয়াছে। আশা করি হরনাথ পিতৃ-গৌরব রক্ষা করিতে সমর্থ হইবে। দ্বিতীয় পক্ষের পুত্র ৪টি; ১ম অখিলচন্দ্র, দ্বিতীয় জলধর, তৃতীয় ভগবান, চতুর্থ ঠাকুরদাস, ইহারা স্কুলে পড়িতেছে।

শ্রীযোগেন্দ্রচন্দ্র বিদ্যাভূষণ।

বাঙ্গালা ভাষা ও জাতীয় সাহিত্য।

জাতীয় সাহিত্য দ্বারাই জীবন গঠিত হয়। এজন্য জাতীয় উন্নতি-সাধানার্থ জাতীয় সাহিত্যের উন্নতিসাধন অত্যাবশ্যক। মৎ-প্রণীত সামাজিক ইতিহাসে আমি দেখাইয়াছি যে বাঙ্গালা ভাষা নিতান্ত আধুনিক নহে। কিন্তু পূর্ব্বে বাঙ্গলা ভাষা কোন জাতির ধর্ম্মভাষা বা রাজভাষা ছিল না। বাঙ্গালী হিন্দুদের উচ্চ-শিক্ষা সংস্কৃত ভাষায় হইত এবং মুসলমানদের উচ্চশিক্ষা পারসী ভাষায় হইত। কেবল সাধারণ কথোপকথনে ও লিখন-পঠনে বাঙ্গালা ভাষা ব্যবহৃত হইত। এইজন্য তখন বাঙ্গালা ভাষার কোন উন্নতি হয় নাই। বাঙ্গালা দেশে বিদ্বান্ বুদ্ধিমান্ লোকের অভাব ছিল না। কিন্তু তৎকালীন বিজ্ঞলোকেরা বাঙ্গলা ভাষাকে কেবল সংস্কৃত ও পারসী ভাষার অনুচর জ্ঞান করিতেন। তজ্জন্য বাঙ্গলা ভাষায় কেহ কোন গ্রন্থাদি রচনা করিতেন না। সুতরাং বাঙ্গলা সাহিত্যের সত্তা মাত্র ছিল না।

বঙ্গীয় দশম শতাব্দীতে সহজিয়া ও বৈষ্ণব-সম্প্রদায় উপচিত হইল। তাহাদের অধিকাংশ লোকই সংস্কৃত ও পারসী জানিত না। তাহারা আপনাদের গান, সংকীর্ত্তন ও ধর্ম্মগ্রন্থসমূহ বাঙ্গালা ভাষায় রচনা করিয়া-

ছিল। ইহাই বাঙ্গলাভাষার প্রথম উন্নতি। তাহার পর ঘনরামের শ্রীধর্ম্মমঙ্গল, মুকুন্দরামের কবিকঙ্কণ চণ্ডী, কৃত্তিবাসের রামায়ণ, কালিদাসের কালিকাবিলাস, ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল, কাশীরাম দাসের মহাভারত প্রভৃতি বড় বড় কাব্যগ্রন্থ সমূহ বাঙ্গলাভাষায় রচিত হইয়াছিল। হিন্দুরা গদ্য রচনা করা কাপুরুষের কার্য্য জ্ঞান করিতেন, তজ্জন্য কোন গদ্য গ্রন্থ বাঙ্গলা ভাষায় ছিল না। বাঙ্গলাভাষায় কোন ব্যাকরণও ছিলনা।

ইংরেজী ১৮৩৫ সালে তৎকালীন বড়লাট লর্ড উইলিয়াম বেণ্টিঙ্ক সাহেব বাহাদুর গবর্ণমেণ্টের বিচারালয়সমূহে পারসীর পরিবর্ত্তে বাঙ্গালাভাষা প্রচলিত করিতে আদেশ দিয়াছিলেন। তাহাই বাঙ্গালাভাষার উন্নতির দ্বিতীয় সোপান। তখন আদালতে যে প্রকার বাঙ্গালা ভাষা ব্যবহৃত হইত, তাহা পারসী, বাঙ্গলা এবং সংস্কৃত সংমিশ্রিত ছিল। কেবল বাঙ্গালা বর্ণমালায় লিখিত হইত মাত্র। কিন্তু তাহাকে ঠিক বাঙ্গলা ভাষা বলা যায় না এবং তাহাতে শুদ্ধাশুদ্ধবিচার কিছুমাত্র ছিল না। সেই সময়ে বাঙ্গলা অক্ষরের ছাপাখানা প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়। সেই অবস্থাতেই বাঙ্গলা সংবাদ পত্র প্রথম মুদ্রিত হইতে আরম্ভ হয়। সেই সময়েই রামমোহন রায় এবং গৌরীকান্ত ভট্টাচার্য্য এক খানি ব্যাকরণ মুদ্রিত করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহা নিতান্ত অসম্পূর্ণ ও বিশৃঙ্খল ছিল। জনসমাজে তাহা সমাদৃত হয় নাই।

ইংরেজী ১৮৫৮ সালে বঙ্গীয় প্রথম ছোট লাট হোলিডে সাহেব সাময়িক বড়লাট ক্যানিং সাহেবের সম্মতিসূত্রে গ্রাম্যিক বঙ্গবিদ্যালয় সমূহে গবর্ণমেণ্টের সাহায্য দিবার বিধান করিয়াছিলেন। সেই সমস্ত বিদ্যালয়ের শিক্ষক যোগাইবার জন্য প্রধান প্রধান নগরে নর্ম্মাল স্কুল স্থাপন করিয়াছিলেন এবং বাঙ্গালা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রদিগকে মাসিক ৫৲ টাকা

করিয়া ছাত্রবৃত্তি দিতে আদেশ করিয়াছিলেন। ইহাই বাঙ্গলাভাষার উন্নতির তৃতীয় সোপান এবং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সোপান। সেই ১৮৫৮ সালে আমি যখন গ্রামিক বঙ্গবিদ্যালয়ে প্রবেশ করিলাম, তখন মদনমোহন তর্কালঙ্কারপ্রণীত শিশুশিক্ষা, এবং ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর কর্ত্তৃক অনূদিত বেতাল পঞ্চবিংশতি এইমাত্র গদ্যগ্রন্থ বাঙ্গলা ভাষায় ছিল। আর পাদরী কীথ সাহেব ইংরেজী লেনিজ গ্রামারের অনুকরণে একখানি বাঙ্গলা ব্যাকরণ রচনা করিয়াছিলেন। তাহাই আমার প্রথম পাঠ্য হইয়াছিল। এই সকল পুস্তক যত কেন তুচ্ছ না হউক, তাহাই ভাবী গ্রন্থকারদের পথ-প্রদর্শক হইয়াছিল।

আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, বাঙ্গালাদেশে বিদ্বান্ বুদ্ধিমান্ লোকের অভাব ছিলনা। কিন্তু তাঁহারা বাঙ্গলা ভাষার উন্নতি সাধনে উদাসীন ছিলেন। যখন গ্রামে গ্রামে বাঙ্গলা স্কুল স্থাপিত হইতে লাগিল তখন দেশীয় অনুরাগিগণ বাঙ্গালা ভাষাকে জাতীয় ভাষা বলিয়া বুঝিলেন এবং তাহার পুষ্টিসাধনে অনুরাগী হইলেন। শ্যামাচরণ চট্টোপাধ্যায় এবং ব্রজ-কিশোর গুপ্ত রীতিমত বাঙ্গলা ব্যাকরণ প্রকটিত করিলেন। অসম্পূর্ণ হইলেও তাহাই বাঙ্গালা ভাষার আদি ব্যাকরণ। তাহার পর গোবিন্দ রায় এবং লোহারাম শিরোরত্ন উৎকৃষ্টতর ব্যাকরণ রচনা করিয়াছিলেন। তাহার পর ক্রমেই সমধিক শ্রেষ্ঠতর ব্যাকরণসমূহ প্রকাশিত হইতে লাগিল। এদিকে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এবং অক্ষয়কুমার দত্ত ইংরেজী পুস্তকের অনুসরণে বহুসংখ্যক গদ্য গ্রন্থ বাঙ্গালা ভাষায় রচনা করিয়া পাঠ্য পুস্তকের অভাব বিদূরিত করিলেন। বিদ্যাসাগর সুপণ্ডিত ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার রচিত গ্রন্থাবলী তত উৎকৃষ্ট হয় নাই। অক্ষয়কুমার দত্ত কেবল সামান্যরূপ লেখাপড়া জানিতেন অথচ তদ্রচিত গ্রন্থনিচয় বাঙ্গালা ভাষার আদর্শ গদ্য রচনা। এইরূপ বহু দৃষ্টান্ত দ্বারা জানা যায় যে, রচনা-

শক্তি একটি পৃথক গুণ। বিদ্যা পরিমাণসহ উক্ত গুণের কোন অনুপাত নাই।

বঙ্গবিদ্যালয় স্থাপনের পর গদ্য, পদ্য, গান, নাটক রাশি রাশি প্রতি-বৎসর প্রকাশিত হইতেছে। প্যারীচাঁদ মিত্র ও বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় উপন্যাস লিখিয়া বাঙ্গলা ভাষার পুরাতন রচনাপ্রণালী পরিবর্ত্তন করিয়া ফেলিয়াছেন। ইতিহাস, ভুগোল, আদিগণিত, বীজগণিত এবং রেখাগণিতও বাঙ্গালা ভাষায় মুদ্রিত হইয়াছে।

বিগত পঞ্চাশ বৎসর মধ্যে বহুতর সংস্কৃত, ইংরেজী, পারসী পুস্তক বাঙ্গালা ভাষায় অনূদিত হইয়াছে। বিদেশীয় ভাষার অনুকরণে, অনুসরণেও বহুপুস্তক হইয়াছে এবং সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রভাবে নূতন পুস্তকও অনেক হইয়াছে। সংবাদ পত্র, নাট্যাভিনয়, ব্রাহ্মসমাজ, যাত্রাগান দ্বারাও বঙ্গ-ভাষার যথেষ্ট পুষ্টি হইয়াছে। এখন পারসী ভাষা হইতে বাঙ্গালাভাষা শ্রেষ্ঠ বই অপকৃষ্ট নহে। নিম্নলিখিত কয়েকটি গুরুতর বিঘ্ন না ঘটিলে বাঙ্গালা ভাষার উৎকর্ষ এত বেশি হইত যে, কোন ভাষা হইতেই বঙ্গভাষা হীনতর গণ্য হইত না: সেই বিঘ্নগুলির প্রতি সভাস্থ লোকেব মনোযোগ আকর্ষণ করাই আমার প্রধান উদ্দেশ্য।

(১) বাঙ্গলা ভাষার উন্নতির প্রধান প্রতিবন্ধক ইংরেজী ভাষার অত্যধিক চর্চ্চা। যখন অল্প পরিমাণ লোক ইংরেজী পণ্ডিত তখন যে কেহ প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইত, সেই গবর্ণমেণ্টের চাকরী অনায়াসে পাইত এবং জনসমাজে বিদ্বান্ লোক বলিয়া গণ্য হইত। সেই লোভে প্রলোভিত হইয়া বহু লোক আপনাপন পুত্রদিগকে ইংরাজী পড়াইতে আরম্ভ করিল। গ্রামে গ্রামে ইংরাজী স্কুল হইল এবং কলেজের সংখ্যাও চতুর্গুণ হইয়াছে। লক্ষ লক্ষ বালক ইংরাজী পড়িতেছে—"সর্ব্বমত্যন্তং গর্হিতং" এই প্রসিদ্ধ বাক্যের অবশ্যম্ভাবী ফল ফলিয়াছে; অতি মহমে

অমৃতের পরিবর্ত্তে বিষ উঠিতে আরম্ভ হইয়াছে। বালকেরা বর্ণপরিচয় শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গেই ইংরেজী বর্ণমালা শিখিতে আরম্ভ করে আর সুদীর্ঘ কাল সেই বিজাতীয়, বিদেশীয় ভাষা পড়িতে পড়িতে তাহাদের দেহ এবং মন ক্লিষ্ট ও দুর্ব্বল হয়। প্রচুর ধনক্ষয়ে তাহারা নিঃসম্বল দরিদ্র হয়। তাহারা অলস, বিলাসী এবং স্বার্থপরায়ণ হয়। অথচ অনেকেরই কোনরূপ উপার্জ্জন হয় না।

ইংরাজীভাষা ইংরাজদের জাতিভাষা। তাহা শিখিতে তাহাদের অর্থব্যয়, পরিশ্রম এবং শারীরিক কষ্টও অতি কম হয়। তাহারা লেখা-পড়া শিখিয়া সাংসারিক নানাবিধ কার্য্যে লিপ্ত হয়। তাহারা ধোপা, নাপিত, কামার, কুমাররূপে কাজ করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে পারে। কিন্তু আমাদের দেশীয় কোন বালক ইংরাজী পড়িয়া কেবল লেখাপড়ার চাকরী, ওকালতী, মোক্তারী বা ডাক্তারী করিতে পারে, তদ্ভিন্ন অন্য কোন ব্যবসা করিতে পারে না। এত বেশী লোকের মধ্যে অনেকেরই চাকরী যোটে না। আবার উকীল, মোক্তার, ডাক্তার এত বেশী হইয়াছে যে, ঐ ঐ ব্যবসায়ীর অনেকেরই জীবিকানির্ব্বাহের সদুপায় হয় না। বাঙ্গালী পরিচারক অপ্রাপ্য, পাচক অপ্রাপ্য, ধোবা, নাপিত প্রভৃতি ব্যবসায়ীর সংখ্যা আবশ্যক অপেক্ষা অনেক কম। অথচ কেরাণীগণের উমেদার অসংখ্য। সাধারণ পরিচারক ও মুটিয়া-মজুরে যাহা উপার্জ্জন করে, উপাধিধারী ভিন্ন নিম্নতর ইংরাজীনবিশ তত টাকা উপার্জ্জন করিতে পারে না। সাধারণ চাকর একটু কষ্ট দেখিলেই চাকরী ছাড়িয়া দেয়। কিন্তু বিদ্বান্ চাকর বহুকষ্ট ও অপমান সহ্য করিয়া থাকে তবু চাকরী ছাড়িতে পারে, না। ইংরাজী শিক্ষার বাহুল্যে বাঙ্গালা সাহিত্যের এবং বাঙ্গালী সমাজের যে গুরুতর অপকার হইতেছে তাহা গবর্ণমেণ্ট এবং বিজ্ঞ লোকেরা প্রায়ই সকলেই অনুভব করিতেছেন সুতরাং তাহার অধিক লেখা অনাবশ্যক।

এই সমস্ত দেখিয়া শুনিয়াও কেন লোকে নিজ নিজ সন্তানগণকে ইংরাজী পড়ায়, তাহার কারণ অনুসন্ধানে জানা যায় যে, আজকাল ইংরাজী না জানিলে কোন উচ্চপদ পাওয়া যায় না; গবর্ণমেণ্টের চাকরী, ওকালতী, মোক্তারী, ডাক্তারী করিতে হইলে ইংরাজী ভাষা জানা আবশ্যক। জমিদার, মহাজনগণও ইংরেজীনবিশ কর্ম্মচারী চাহেন। যখন ইংরাজী না পড়িলে কোনই উন্নতির আশা নাই তখন প্রত্যেক ব্যক্তিই আশা-বিমোহিত হইয়া সর্ব্বস্ব ব্যয় করিয়া বালকগণকে ইংরাজী পড়াইতে থাকে। গবর্ণমেণ্ট কাহাকেও নিষেধ করিতে পারেন না এবং করেন না। কেবল ছাত্র কমাইবার জন্য শিক্ষার ব্যয় বৃদ্ধি করিয়াছেন। কিন্তু তাহাতে পাঠার্থী কম হয় নাই বরং দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে; পরন্তু পাঠের ব্যয় বৃদ্ধি হওয়ায় ছাত্রদের অভিভাবকদিগের কষ্ট বর্দ্ধিত হইয়াছে। অথচ অনেকেই বহুব্যয়ে বহু কষ্টে সুদীর্ঘ কাল ইংরাজী পড়িয়া শেষে দেখিতে পায় যে, তাহার পঠদ্দশায় মাসিক যে ব্যয় হইয়াছে, তত টাকা তাহার মাসিক উপার্জ্জন হয় না। তখন অতসীফুলের সহ ইংরাজী-শিক্ষার তুলনা করিয়া বলিতে হয় যে—

"সুবর্ণং সদৃশং পুষ্পং ফলে রত্নং ভবিষ্যতি
আশয়া রোপিতং বৃক্ষং পশ্চাৎ ঝনঝনায়তে!"

একজন নামজাদা বিলাতফেরতা বাবু তর্ক করেন যে, কেবল অর্থোপার্জ্জনই বিদ্যা-শিক্ষার উদ্দেশ্য নহে বরং জ্ঞানলাভই প্রধান উদ্দেশ্য। তিনি ইংরাজী খুব ভাল জানেন অথচ বাঙ্গলা ভাষায় নিতান্ত অর্ব্বাচীন। তাঁহার তর্কের সদুত্তর এই যে, ইংরাজী ভাষায় যে শাস্ত্র পড়িলে যে পরিমাণ জ্ঞানলাভ হয়, জাতীয়ভাষায় তাহা পাঠ করিলে তদপেক্ষা অধিক ভিন্ন অল্প জ্ঞান লাভ হয় না বরং অল্প ব্যয়ে অল্প কালে বিনা কষ্টে সমধিক বিজ্ঞতা জন্মে শ্রোতৃবর্গ মনে করিবেন না যে আমি ইংরাজী শিক্ষার বিরোধী। আমার

অভিপ্রায় এইমাত্র যে, অতি অল্প সংখ্যক লোক ইংরেজী পড়ুক। তাহারা সহজেই ভাল উপার্জ্জন করিতে পারিবে এবং তাহাদের দ্বারা দেশের উপকার হইতে পারিবে; ইংরাজী শিক্ষিত দরিদ্র লোকদ্বারা অনেক কুকার্য্য অনুষ্ঠিত হইতেছে এখানে তাহার সম্পূর্ণ বর্ণনা অনাবশ্যক। কলিকাতায় কতিপয় বিএ, এম্‌এ, উপাধিধারী মিঠাইদোকান, সেলাইএর দোকান এবং ছুতারা-দোকান করিয়াছেন। এ সমস্ত কার্য্যের জন্য এত ব্যয় ও পরিশ্রম করিয়া ইংরেজী পড়িবার আবশ্যক কি? এখন ইংরাজী শিক্ষিত লোকের সংখ্যা অতিশয় বেশী হওয়াতে যে, দেশের বিবিধ প্রকার অনিষ্ট হইতেছে ইহা প্রায় সর্ব্ববাদীস্বীকৃত। সেই অনিষ্ট নিবারণ জন্য গবর্ণমেণ্ট যে ব্যয় করিয়াছেন তাহাতে কুফল ভিন্ন সুফল কিছুই নাই। যাবৎ বাঙ্গালা পড়িলে লোকে উচ্চপদ না পাইবে ততদিন ইংরাজী পাঠার্থীর সংখ্যা কম হইবে না। যদি গবর্ণমেণ্ট নিয়ম করেন যে, বাঙ্গলা ভাষায় সুবিজ্ঞ লোকের সর্ব্বপ্রকার উচ্চপদই লাভ হইতে পারিবে আর ইংরাজী উপাধিধারীদিগের সমাদর ও দাবী বাঙ্গালা উপাধিধারীদের অপেক্ষা কিছুমাত্র বেশী হইবে না। তাহা হইলেই ইংরাজী পড়ার আকর্ষণ কমিয়া যাইবে। আর পল্লীগ্রামের ইংরাজী বিদ্যালয় হইতে কোন ছাত্রকে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার্থী বলিয়া গ্রহণ করা যাইবে না। তাহা হইলেই ইংরাজী-চর্চ্চা সংক্ষিপ্ত হইবে এবং বাঙ্গালাভাষা ও সাহিত্যের যথেষ্ট উন্নতি হইবে।

এখন সমস্ত উচ্চ শিক্ষা ইংরাজীতে হয়; স্থানে স্থানে সংস্কৃতেও কিছু হয়। বাঙ্গালাভাষায় কোন উচ্চশিক্ষা হয় না। সেইজন্য বাঙ্গালাভাষায় উচ্চ শাস্ত্রাদি পাঠ্য গ্রন্থ রচিত হয় না, যদি হয় তবে তাহা অনাদরে বিলুপ্ত হয়। আমার বন্ধু বরদাকান্ত মিত্র আক্ষেপ করিয়া লিখিয়াছেন যে, বাঙ্গালাভাষায় উচ্চ শ্রেণীর পুস্তক রচনা করা জ্ঞানকৃত মহাপাপ। উহা কেহ মূল্য দিয়া ক্রয় করিয়া পড়ে না এমন কি বিনামূল্যে দিয়া অনুরোধ

করিলেও কেহ তাহা পড়িতে চায় না। কারণ যাহারা অশিক্ষিত উচ্চ সাহিত্যাদি তাহাদের বোধগম্য হয় না। শিক্ষিত বিদ্বান্ লোকেরা বাঙ্গালা পুথি পড়া অপমানকর বোধ করেন। তাহারা ইংরাজী কিম্বা সংস্কৃত পড়ে কদাচ বাঙ্গালা পড়ে না"। সুতরাং উচ্চ শ্রেণীর বাঙ্গলা গ্রন্থের পাঠক নাই"। তাঁহার এই বাক্যের যাথার্থ্য আমি বিলক্ষণ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি; যাবৎ বাঙ্গালা ভাষায় উচ্চ শিক্ষা না হইবে তবেৎ এই দোষের শান্তি হইবে না। অনেকে আপত্তি করিতে পারেন যে, বাঙ্গালা ভাষায় উচ্চ শাস্ত্র শিক্ষার উপযুক্ত পুস্তক নাই, তাহাতে উচ্চশিক্ষা অসম্ভব। তাহার সহজ উত্তর এই যে, প্রয়োজন না থাকাতেই তাদৃশ গ্রন্থ তৈয়ারী হয় নাই; বাঙ্গালীর মধ্যে বিদ্বান্ বুদ্ধিমান্ লোকের অভাব নাই; যে প্রকার গ্রন্থ যখন আবশ্যক হইবে তখনই তাহা প্রকটিত হইতে পারিবে। তখন বাঙ্গালীরা অতি অল্প পরিশ্রমে, অল্প ব্যয়ে, অল্পকালে বিদ্বান্ হইতে পারিবে এবং বাঙ্গালা ভাষাব ও সাহিত্যের সমীচীন উন্নতি হইতে পারিবে।

ইংলণ্ডে যতদিন লাটিন ভাষায় উচ্চ শিক্ষা হইত ততদিন তাহাদের বিশেষ উন্নতি হয় নাই। জাতীয় ভাষায় উচ্চ শিক্ষা আরম্ভ হওয়া অবধি জাতীয় ভাষা এবং জাতীয় ভাবের সমুন্নতি হইয়াছে। জাপানীরা ইংরাজী ভাষায় মার্কিন দেশে উচ্চ শিক্ষা পাইয়া স্বদেশে জাতীয় ভাষায় তাহা শিক্ষা দিয়া অতি শীঘ্র সমস্ত বিষয়ে মহোন্নতি লাভ করিয়াছে। অতএব যাহাতে ইংরাজীর চর্চ্চা কম হইয়া জাতীয় ভাষার প্রসার হয়, তদর্থে চেষ্টা করা বাঙ্গালীর একান্ত কর্ত্তব্য। নতুবা সভা করিয়া সুদীর্ঘ বক্তৃতা করিয়া কোন উপকার হইবে না।

(২) বাঙ্গালা সাহিত্যের সমুন্নতির দ্বিতীয় প্রতিবন্ধক বুঝিয়াছি জমিদারদিগের দারিদ্র্য-দশা। বুনিয়াদি বড়-মানুষের সকলেরই কতকগুলি

সৎক্রিয়া পুরুষানুক্রমে চলিয়া আসিতেছে। তাহা তাহারা ত্যাগ করিতে পারেন না। পূর্ব্বে সেই সকল কার্য্যে যত টাকা ব্যয় হইত এখন সমস্ত দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি হওয়ায় সেই ব্যাপারের ব্যয় চতুর্গুণ হইয়াছে। জমিদারগণের ব্যয় যেরূপ বৃদ্ধি হইয়াছে আয় তদনুপাতে বৃদ্ধি হয় নাই। শস্যের মূল্য বৃদ্ধিহেতু জমা-বৃদ্ধির বিধান আইনে আছে বটে, কিন্তু আইন ও আদালতের কূটনীতিতে তাহা কার্য্যে পরিণত হয় না। কাজেই জমিদারগণের অবস্থা মন্দ। যাহাদের বাণিজ্য, মহাজনী প্রভৃতি প্রধান ব্যবসায় তৎসঙ্গে সঙ্গে জমিদারী আছে তাহাদেরই অবস্থা ভাল। নতুবা জমিদারীই যাহাদের একমাত্র ব্যবসায় তাহাদের কাহারো অবস্থা স্বচ্ছল নহে। বরং অনেকেই ঋণগ্রস্ত। বনিয়াদি জমিদারেরা প্রায় সকলেই বিদ্যোৎসাহী ছিলেন এবং বিদ্বানের আদর করিতেন। এখনও তাঁহারাই জাতীয় বিদ্যার উন্নতি চেষ্টা করেন বটে কিন্তু অর্থের অনাটনহেতু প্রচুর সাহায্য করিতে পারেন না। অপর বিদ্যোৎসাহী মধ্যে উকীল ও মোক্তারগণ এখনও সর্ব্বাগ্রবর্ত্তী। কিন্তু তাঁহাদেরও অবস্থা তত ভাল নহে। আমি সমস্ত বাঙ্গালাদেশ ঘুরিয়া দেখিলাম যে, কেবল দুই শ্রেণী লোকের উন্নতি আর সকলেরই অবস্থার অবনতি হইয়াছে। কর্ষক লোকদের অবস্থা পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক ভাল হইতেছে বটে, কিন্তু তাহারা এখনও মূর্খ ও দরিদ্র। তাহাদের দ্বারা বিদ্যোন্নতির কোন সাহায্য হইতে পারে না। আর বাণিজ্য-ব্যবসায়ী লোকদের মহোন্নতি হইতেছে। সেই বণিক মধ্যে হিন্দুস্থানী বণিকই অধিক। প্রত্যেক সহরে, বন্দরে, হাটে-বাজারে এমন কি অধিকাংশ পল্লীগ্রামে হিন্দুস্থানীর দোকান আছে। বাঙ্গালাদেশে তাহাদিগকে খোট্টা বা কাঁইয়া বলে। তাহারা অনেকে জমিদারী, তালুকদারী খরিদ করিয়া বড়লোক হইয়া বসিয়াছে। কিন্তু তাহারা সকলেই মূর্খ। বিদ্যার উন্নতি ও জাতীয় উন্নতি

কাহাকে বলে তাহা তাহারা বুঝে না এবং সেই উদ্দেশ্যে কোন ব্যয় বা পরিশ্রম করে না। বাঙ্গালী শেঠ-মহাজনেরাও অনেকেই বাণিজ্য দ্বারা বড় হইয়াছে এবং হইতেছে। কিন্তু তাহারাও মূর্খ। বিদ্যার উন্নতি ও জাতীয় উন্নতি কাহাকে বলে তাহা তাহাদের বোধগম্যই হয় না। সুতরাং তদ্বিষয়ে তাহাদের দ্বারাও কোন সাহায্য হইতে পারে না। মূর্খ কর্ষক ও বণিকদিগকে গবর্ণমেণ্ট ও রাজপুরুষেরা উৎসাহ দিলে তাহারা আর্থিক-সাহায্য করিতে পারে, নতুবা তাহাদের সাহায্য আশা করা যায় না।

৩। বাঙ্গালা সাহিত্যের তৃতীয় বিঘ্ন অর্ব্বাচীন ধনীদের উপাধি-লিপ্সা। গবর্ণমেণ্ট যে সকল লোকদিগকে রাজভক্ত বা সদাশয় বলিয়া জ্ঞান করেন, তাহাদিগকে সম্মানসূচক উপাধি দিয়া থাকেন। সময়ে সময়ে সেই উপাধি যোগ্যপাত্রে দেওয়া হয় না। যেমন একটি লোকের একবিঘা জমিও নাই, সে ভাড়াটিয়া বাড়াতে বাস করে। সে গবর্ণমেণ্টের কিম্বা কোন উচ্চপদস্থ রাজপুরুষের চাটুকারী করিল, অমনি সে "রাজা-বাহাদুর" উপাধি পাইল। একজন বণিক যৎকিঞ্চিৎ জমিদারী খরিদ করিয়াছিল। সে যাবজ্জীবন কৃপণতা করিয়া পঞ্চাশ হাজার টাকা জোটাইয়া দান করিল, অমনি তাহার 'রাজা' বা 'মহারাজা' উপাধি হইল। ঐ সকল উপাধিদ্বারা কোন সম্পত্তি বা ক্ষমতা বৃদ্ধি হয় না। গবর্ণমেণ্টে উপাধিধারীর বাহ্যিক কিছু সম্মান হয় বটে কিন্তু সেই সম্মান রক্ষা করিতে তাহাদের বিস্তর ব্যয়-বাহুল্য হয়। দেশীয় লোকেরা কেহ সেই উপাধি উল্লেখ করে না বরং উপহাস করিয়া থাকে। দেশের বিদ্বান্ লোকেরা ঐ সকল উপাধিগুলিকে কেহ ব্যাধিবিশেষ, কেহ জেলবিশেষ, কেহ বা ক্লীবের বিবাহ বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। কিন্তু অনেক অদূরদর্শী ধনীর পক্ষে ঐ সকল উপাধি মারাত্মক ব্যাধিবিশেষ

হইয়া উঠিয়াছে। তাহারা সর্ব্বপ্রকার সদ্ব্যয় ত্যাগ করিয়া যাহা সঞ্চয় করে তাহা সমস্ত এবং ঋণ করিয়া যাহা আনিতে পারে তাহা সমস্ত কোন রাজপুরুষের হস্তে সদ্ব্যয়ের জন্য ন্যস্ত করিয়া উপাধি লাভের চেষ্টা করে। তাহারা যদি কখন একটি পয়সা দান করে অমনি একটাকা খরচ করিয়া কোন প্রসিদ্ধ সংবাদপত্রে তারযোগে নিজ দাতৃত্ব-সংবাদ পাঠায়। এরূপ ব্যয়ে তাহারা নিতান্ত নিঃস্ব হইয়া পড়ে। স্বদেশের মঙ্গলার্থ অর্থব্যয় করিতে তাহাদের সামর্থ্য থাকে না এবং ইচ্ছাও থাকে না। এবিষয়ে গবর্ণমেণ্টের দোষ নাই এবং অদূরদর্শী ধনীদের স্বকল্পিত অলীক বিশ্বাসই উক্ত দোষের মূল। প্রত্যক্ষ দেখা যায় যে, লালগোলার রাজা কেবল দেশীয় নিয়মে সদ্ব্যয় করিয়া গবর্ণমেণ্ট হইতে উপাধি ও সম্মান লাভ করিয়াছেন; কাশীমবাজারের মহারাজ স্বদেশের শিল্প সাহিত্যাদির উন্নতিকর কার্য্যে একান্ত ব্রতী থাকিয়াও গবর্ণমেণ্টে বিলক্ষণ সম্মানিত আছেন। তাহাতে অনুমান হয় যে, উপাধি-লালায়িত ধনীগণ স্বদেশীয় লোকের এবং ভাষার উন্নতিকল্পে অর্থব্যয় ও পরিশ্রম করিলেও গুণগ্রাহী গবর্ণমেণ্টকর্ত্তৃক সর্ব্বপ্রকার উপাধি ও সম্মান প্রাপ্ত হইতে পারেন।

৪। বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রচার হওয়ার চতুর্থ প্রতিবন্ধক মুসলমান-বিচ্ছেদ। বাঙ্গালাদেশের মধ্যে রাজসাহী, ঢাকা এবং চট্টগ্রাম বিভাগে হিন্দু অপেক্ষা মুসলমানের সংখ্যাই বেশী। প্রেসিডেন্সি ও বর্দ্ধমান বিভাগে মুসলমানের সংখ্যা হিন্দু অপেক্ষা কিছু কম। সমস্ত বাঙ্গালাদেশ ধরিয়া গণনা করিলে হিন্দু-মুসলমানের সংখ্যা প্রায় সমান। এজন্য হিন্দু-মুসলমানের ঐক্যবাক্যে স্বদেশের এবং জাতীয় ভাষার উন্নতির চেষ্টা করিলেই সহজে সুফল হইতে পারে।

বাঙ্গালী মুসলমানেরা বাঙ্গালা সাহিত্যে বিতৃষ্ণ হইয়া পারসী পড়িতেছে। অথচ তাহাতে তাহাদের ক্ষতি ভিন্ন লাভ কিছুই নাই।

বাঙ্গলাভাবাই তাহাদের মাতৃভাষা। তাহাদের সমস্ত কথাবার্ত্তা ও. বৈষয়িক কাজকর্ম্ম বাঙ্গালা ভাবায় হয়। পারশী তাহাদের ধর্ম্মভাষা নহে। তাহাদের ধর্ম্মভাষা আরবী প্রায় কেহই পড়ে না। মুসলমান নবাব ও বাদশাহগণ পারসীভাষী ছিলেন। তজ্জন্য মুসলমান রাজত্বকালে পারসী রাজভাষা ছিল। এইজন্য সেই সময়ে হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান সকলেই পারসী শিখিত। এখন পারসী বাঙ্গালী মুসলমানদের ধর্ম্মভাষা, রাজভাষা বা জাতীয়ভাষা নহে তবে তাহা পড়িয়া অযথা সময় নষ্ট করা নিষ্প্রয়োজন। তাহাদের জাতীয় ভাষা বাঙ্গালা পড়াই বিহিত। সাধ্য হইলে রাজভাষা ইংরেজী এবং ধর্ম্মভাষা আরবী পড়া উচিত বটে। তুরুষ্ক, মিশর, মোরক্কো দেশীয় মুসলমান-রাজ্যসমূহে কেহ পারসী পড়ে না। ফলতঃ মুসলমান ধর্ম্মেরসহ পারসীর কোনই সম্বন্ধ নাই। অতএব বঙ্গীয় মুসলমানদের পারসী ছাড়িয়া যথাসাধ্য বঙ্গভাষার উন্নতির চেষ্টা করাই সর্ব্বথা কর্ত্তব্য।

শ্রীদুর্গাচন্দ্র সাম্যাল।

বৈদিক-সাহিত্য।*

খ্রীষ্টান বাইবেলকে, মুসলমান কোরাণকে, হিন্দু বেদকে অপৌরুষেয় মনে করেন, পৃথিবীর অধিকাংশ মানবই এই গ্রন্থগুলির অনুশাসনে পরিচালিত হইতেছে। বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে আমরা কেবল বেদশাস্ত্রেরই আলোচনা করিব।

'বেদ' প্রধানতঃ দুই প্রকার :—(১) ক্৯প্ত ও (২) কল্প্য। হিন্দু-সাহিত্যে দেখিতে পাই :—

"যা তু স্মৃতি প্রত্যক্ষতঃ প্রতিপদ্যতে সা ক্৯প্তা।"

আর "যা তু সদাচারাভ্যাং অনুমীয়তে সা কল্প্যা।"

অর্থাৎ যাহা প্রত্যক্ষ প্রতিপন্ন হইতেছে তাহা 'ক্৯প্ত' শ্রুতি, আর স্মৃতি ও সদাচার-বলে যাহা কল্পনা করিয়া লইতে হয়, তাহা 'কল্প্য' শ্রুতি। সরল-হৃদয় আর্য্যগণ প্রকৃতির বৈচিত্র্য সন্দর্শনে মুগ্ধ হইয়া যে সকল স্তব-স্তুতি গাহিয়া গিয়াছেন তাহাই ক্৯প্ত, ইহা ঋগাদি চারি ভাগে বিভক্ত। আর কল্প্যশ্রুতি সাময়িক কল্পনামাত্র, মানবের আচার-ব্যবহার কালে-কালে পরিবর্ত্তিত হইয়া আসিতেছে। এই পরিবর্ত্তন অনুসারে সামাজিক অনুশাসন-পদ্ধতিও পরিবর্ত্তিত হইয়া গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ থাকিত। ইহারই ফলে আজও আমরা হিন্দুসাহিত্যে সত্য ত্রেতাদি বিভিন্ন যুগের বিভিন্ন প্রকার আচার-ব্যবহারের উল্লেখ ও উদাহরণ পাই। সময়-বিশেষে এক এক প্রকার কল্পনা করিয়া লইতে হইত বলিয়া ইহার নাম কল্প্য শ্রুতি।

'ক্৯প্ত শ্রুতি' মন্ত্র-ভেদানুসারে ত্রিবিধ ঋক্, যজুঃ ও সাম মন্ত্র। পাদ

* উত্তরবঙ্গ সাহিত্য-সম্মিলনের দিনাজপুর অধিবেশনে পঠিত হইবার জন্য লিখিত।

ছন্দে রচিত মন্ত্রের নাম "ঋক্", গদ্য ছন্দে রচিত মন্ত্রের নাম "যজুঃ" এবং ছন্দোবদ্ধ গেয় মন্ত্রের নাম "সাম"। এই কৃ১প্ত" শ্রুতি গ্রন্থভেদানুসারে আবার চতুর্ব্বিধ যথা,—ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্ব্ববেদ। ঋগ্বেদে পদ্যমন্ত্র, সামবেদে ছন্দোবদ্ধ গেয় মন্ত্র, যজুর্ব্বেদে গদ্য মন্ত্র ও অথর্ব্ববেদে পূর্ব্বোক্ত বেদত্রয়ের মিশ্রিত মন্ত্র-সমষ্টি।

'কৃ১প্ত-শ্রুতি' আবার কর্ম্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড ভেদে দ্বিবিধ। পূর্ব্বোক্ত বেদ চতুষ্টয়ের সমস্ত সংহিতা ও ব্রাহ্মণ সমূহের কোন কোন অংশ কর্ম্মকাণ্ড, আর উপনিষৎগুলি জ্ঞানকাণ্ডের অন্তর্গত।

কর্ম্মকাণ্ড 'মন্ত্র' ও 'ব্রাহ্মণ' ভেদে দ্বিবিধ। যে সকল বাক্যে যজ্ঞীয় অনুষ্ঠানের বর্ণনার সহিত কোন দেবতাবিশেষকে উপলক্ষ্য করা হয় তাহা মন্ত্র, আর যে সকল গদ্যগ্রন্থে কোন মন্ত্র কি কার্য্যে প্রযুক্ত ইহার উল্লেখ আছে, অথবা মন্ত্রসমূহের বিশেষ ব্যাখ্যা করা হইয়াছে, তাহাই ব্রাহ্মণ। এই ব্রাহ্মণ ভাগ আবার 'বিধি' ও 'অর্থবাদ' ভেদে দ্বিবিধ। ব্রাহ্মণসমূহের যে অংশে যজ্ঞীয় মন্ত্রের বিনিয়োগ সহ, যজ্ঞ-নির্ব্বাহের প্রণালী লিখিত আছে, তাহা 'বিধি' আর মন্ত্রসমূহের ব্যাখ্যাবিশিষ্ট অংশের নাম 'অর্থবাদ'।

'বিধি' আবার দুই প্রকার—'অজ্ঞাতজ্ঞাপক' ও 'অপ্রবৃত্ত প্রবর্ত্তক'। আর্য্য-কালে যে সকল যজ্ঞের বিলোপ ঘটিয়াছিল, যাহাতে সেই সকল যজ্ঞের বিধান বর্ণিত আছে, তাহা 'অজ্ঞাত-জ্ঞাপক'; আর, পরবর্ত্তী-কালে যে সকল নব নব যজ্ঞের আবিষ্কার হইয়াছে তাহা অপ্রবৃত্ত-প্রবর্ত্তক।

এই গেল বৈদিক-সাহিত্যের মোটামোটি কথা, পূর্ব্বেই বলিয়াছি গ্রন্থভেদানুসারে বেদ চারি প্রকার, এখন তাহারই আলোচনা প্রয়োজনীয় হইয়া পড়িয়াছে। প্রথমতঃ যজুর্ব্বেদ, যজুর্ব্বেদ প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত—'শুক্ল' ও 'কৃষ্ণ'। তৈত্তিরীয়-সংহিতার অপর নাম কৃষ্ণ-যজুর্ব্বেদ

সংহিতা, নব্য পণ্ডিতগণের মতে ইহা অপেক্ষাকৃত প্রাচীন। 'চরণ ব্যূহ' মতে কৃষ্ণ-যজুর্ব্বেদের ৮৬ শাখা, আর গতগুলির মতে ১০০ শাখা আছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় আজকাল ১২টি শাখা ও ১৩টি উপশাখার বেশী পাওয়া যায় না। বারটি শাখা যথা:—(১) চরক, (২) আহ্বারক, (৩) 'কঠ' বা 'কাঠক', (৪) প্রাচ্যকঠ, (৫) কাপিষ্ঠ কঠ, (৬) চারায়ণীয়, (৭) বারতন্তবীয়, (৮) শ্বেত, (৯) শ্বেততর (১০) ঔপমন্যব, (১১) পাতাণ্ডিনেয়, (১২) মৈত্রায়নীয়। এই বারটি শাখার প্রশাখা-সমষ্টি ত্রয়োদশ—'চরক' শাখার প্রশাখা দুইটি—'ঔখ্য' ও 'খাণ্ডীকায়, খাণ্ডীকীয় প্রশাখার উপশাখা পাঁচটি—'শাট্টায়নী, 'হিরিণ্য-কেশী' 'বৌধায়নী', 'সত্যাষাঢ়ী' ও 'আপস্তম্ব'। মৈত্রায়নীয় শাখার প্রশাখা ছয়টি—'মানব' 'বারাহ' 'ছাগলেয়' 'হারিদ্রবীয়' 'দুন্দুভ' ও 'শ্যামায়নীয়'। মন্ত্রভাগ ও ব্রাহ্মণভাগবিশিষ্ট কৃষ্ণ-যজুর্ব্বেদে অষ্টাদশ সহস্র যজুর্মন্ত্র আছে। ইহার মন্ত্রভাগ তৈত্তিরীয় সংহিতায় সাতটি অষ্টক ও প্রত্যেক অষ্টকে সাত আটটি করিয়া অধ্যায় আছে। অধ্যায়গুলির অপর নাম 'প্রশ্ন' এবং অষ্টকগুলির অপর নাম প্রপাঠক। ইহার প্রত্যেক অধ্যায় অনেকগুলি অনুবাকে বিভক্ত, এই গ্রন্থে সাত শত অনুবাক আছে। ইহাতে কোনও মানব ঋষির নাম পাওয়া যায় না। প্রজাপতি সোম প্রভৃতি বৈদিক দেবগণই ইহার ঋষি। এই গ্রন্থে নৃমেধ, পিতৃমেধ, অশ্বমেধ, অগ্নিষ্টোম, জ্যোতিঃষ্টোম, রাজসূয় ও অতিরাত্র প্রভৃতি যজ্ঞের বিবরণ দৃষ্ট হয়। এই গেল কৃষ্ণ-যজুর্ব্বেদের কর্ম্মকাণ্ডের কথা, ইহার জ্ঞানকাণ্ডে তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ, তৈত্তিরীয় আরণ্যক, তৈত্তিরীয় উপনিষৎ প্রভৃতি এবং মৈত্রায়নীয় শাখার মৈত্রায়নীয় উপনিষৎ, কঠ শাখার কঠোপনিষৎ, শ্বেতাশ্বতর উপনিষৎ, নারায়ণোপনিষৎ এবং বারুণি উপনিষৎ প্রভৃতি।

শুক্ল-যজুর্ব্বেদের অপর নাম 'বাজসনেয়ী-সংহিতা'। যোগীশ্বর 'যাজ্ঞবল্ক্য'

ইহার ঋষি। ইহাতে ১৯০০ শত এবং ইহার ব্রাহ্মণে ৭৬০০ শত যজুর্মন্ত্র আছে। শুক্ল-যজুর্ব্বেদের ১৫টি শাখা:—(১) কাণ্ব, (২) মাধ্যন্দিন, (৩) জাবাল, (৪) শাকেয়, (৫) বুধেয়, (৬) তাপনীয়, (৭) কাপীল, (৮) পৌণ্ড্রবৎস, (৯) আচটিক, (১০) পরমাবটিক, (১১) বৈনেয়, (১২) পারাশরীয়, (১৩) বৌধেয়, (১৪) গালব ও (১৫) ঔধেয়। বাজসনেয়ী-সংহিতা চত্বারিংশ অধ্যায়ে এবং ২৮৬ টি অনুবাকে বিভক্ত। ইহাতে অনেক শ্লোক মন্ত্র পাওয়া যায়। 'দশ পৌর্ণমাস' 'পিতৃপিণ্ডিযজ্ঞ' 'অগ্নিষ্টোম' 'বাজপেয়' 'রাজসূয়' 'অগ্নিহোত্র', 'চাতুর্ম্মাস্য' 'ষোড়শী' 'অগ্নিচয়ন' 'চয়ক সৌত্রামণি' 'অশ্বমেধ' 'পিতৃমেধ' 'সর্ব্বমেধ' 'পুরুষমেধ' প্রভৃতি যজ্ঞের বিবরণে এই গ্রন্থের কলেবর পরিপূর্ণ। এই পাঠে বৈদিক যুগের আচার-ব্যবহারাদি অনেক জানা যায়।

বিখ্যাত 'শতপথ-ব্রাহ্মণ' শুক্ল-যজুর্ব্বেদের 'মাধ্যন্দিন' শাখার অন্তর্গত। ইহা দুই ভাগে বিভক্ত, প্রথম ভাগে ১০টি কাণ্ড ও দ্বিতীয় ভাগে ৪টি কাণ্ড, প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগে প্রায় সাড়ে সাত হাজার কাণ্ডিকা আছে। বিখ্যাত বৃহদারণ্যক উপনিষৎ ইহার চতুর্দ্দশ কাণ্ডের অন্তর্গত।

এই গেল যজুর্ব্বেদের কথা, এখন 'সামবেদ সম্বন্ধে বলিতেছি, পুরাণ-মতে সামবেদের সহস্র শাখা ছিল, ইন্দ্রের বজ্রাঘাতে সকলগুলিই বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে, কেবল মাত্র পাঁচটি শাখা অবশিষ্ট আছে। যথা—'রাণায়ণী', 'শাট্যমুগ্র', 'কাপোল', 'মহাকাপোল', 'কৌথুম', 'লাঙ্গলিক', ও 'শার্দ্দূলীয়',। এই শাখাগুলির মধ্যে কেবলমাত্র 'কৌথুম' শাখার ছয়টি প্রশাখা পাওয়া যায়—'আসুরায়ন', 'বাতায়ন', 'নৈগেয়', 'প্রাচানযোগ্য', 'প্রাঞ্জলীয়' ও 'বৈনধৃত'।

সামবেদের মন্ত্র-পরিমাণ 'চরণব্যূহ' মতে ৮০১৪, যথা—

"অষ্টৌসাম সহস্রাণি সামানি চ চতুর্দ্দশ"।

কিন্তু সামবেদের বর্ত্তমান সংস্করণের মন্ত্র পরিমাণ এতদপেক্ষা অনেক কম।

সামবেদ প্রধানতঃ পূর্ব্ব ও উত্তর এই দুই ভাগে বিভক্ত; পূর্ব্ব-সংহিতা ছয়টি প্রপাঠকে বিভক্ত, ইহার অপর নাম 'ছন্দ-আর্চ্চিক', ইহা ছান্দোগ্য পুরোহিতগণের অবশ্য পাঠ্য। এই অংশকেই তান-লয়সংযুক্ত স্বর-প্রক্রিয়া অনুসারে সপ্তদশ অধ্যায়ে বিভক্ত করিয়া 'গ্রামগেয়গণ' নামে আখ্যাত করা হইয়াছে। সামবেদীয় উদ্‌গাতৃগণ ইহাই গান করিতেন, ইহাকেই সপ্তদশ সাম বলে। সামবেদের উত্তর ভাগের নাম 'উত্তরার্চ্চিক' বা আরণ্যগণ। বঙ্গদেশে সামবেদের কৌথুমী শাখা ব্যতীত অপর কোনও শাখার প্রচলন নাই। এই গেল সামবেদের সংহিতা বা মন্ত্রভাগের কথা। ইহার ব্রাহ্মণ ভাগে নয় খানি প্রধান গ্রন্থ আছে, যথা—'আর্ষেয়' 'দেবতাধ্যায়' 'বংশ' 'সামবিধান' 'অদ্ভুতব্রাহ্মণ' 'ষড়্‌বিংশ-ব্রাহ্মণ' 'পঞ্চবিংশ-ব্রাহ্মণ' 'তাণ্ড্য-মহাব্রাহ্মণ' এবং 'সংহিতোপনিষৎ-ব্রাহ্মণ'।

সামবেদের প্রধান উপনিষৎ দুই খানি—ছান্দোগ্য এবং কেন, নাতি-পরিপূর্ণ ছান্দোগ্য উপনিষদে আটটি প্রপাঠক আছে। পঞ্চম প্রপাঠকের আত্মবিষয়ক ও ব্রহ্মবিষয়ক তর্ক ও সিদ্ধান্ত অতি মনোরম। কেনোপনিষৎ চারি কাণ্ডে সম্পূর্ণ এবং ধর্ম্মতত্ত্বালোচনায় ইহার কলেবর পরিপূর্ণ। সামবেদের সংহিতা ও মন্ত্রভাগের প্রধান ভাষ্যকার সায়ণাচার্য্য। ইহার ভাষ্যের নাম বেদার্থ প্রকাশ।

অতঃপর অথর্ব্ববেদের কথা বলিব, 'চরণব্যূহ' মতে অথর্ব্ববেদের মন্ত্র-পরিমাণ ১২৩০০ শত। যথা—

"দ্বাদশানাং সহস্রাণি মন্ত্রণাং ত্রিশতাণি চ"

কিন্তু আজকাল কেবলমাত্র ৭০০০টি মন্ত্র পাওয়া যায়, বাকী ৫৩০০

মন্ত্র বিলুপ্ত। অথর্ব্ববেদ ৯ ভাগে বিভক্ত। যথা (১) পৌপ্পল পাদ, (২) শৌনকীয়, (৩) দামোদ, (৪) তোত্তায়ন, (৫) ব্রহ্মপালাশ, (৬) জায়ল, (৭) চারণবিদ্যা, (৮) দেবদর্শী; (৯) কুনখা। অথর্ব্ববেদের বহুসংখ্যক শাখা ছিল, কিন্তু বর্ত্তমানে কেবলমাত্র শৌনকশাখা পাওয়া যায়। এই শৌনকশাখা বিংশতি কাণ্ডে বিভক্ত, প্রত্যেক কাণ্ড আবার কয়েকটি অনুবাকে, অনেকগুলি সূক্তে ও বহুসংখ্যক ঋকে বিভক্ত। ইহাতে শত্রুপীড়ন, আত্মরক্ষা ও বিপদ দূরীকরণ প্রভৃতি কার্য্যের জন্য বহুপ্রকার মন্ত্র ও ঔষধের ব্যবস্থা আছে। আমাদের বোধ হয়, তন্ত্রের ষট্‌কর্ম্ম (মারণ, বিদ্বেষণাদি) অথর্ব্ববেদ হইতে সঙ্কলিত হইয়া থাকিবে।

অথর্ব্ববেদের জ্ঞানকাণ্ডের অন্তর্গত অনেকগুলি উপনিষদ আছে, যোগতত্ত্ব, সন্ন্যাস, আরুণীয়, কণ্ঠশ্রুতি, পিণ্ড, আত্মা, নৃসিংহ-তাপনীয়, কেনেষিত, নারায়ণ, বৃহন্নারায়ণ, হংস, পরমহংস, আনন্দবল্লী, ভৃগুবল্লী, গরুড়, কালাগ্নিরুদ্র, রামতাপনীয়, কৈবল্য, জাবাল, মণ্ডুক, প্রশ্ন, ব্রহ্মবিদ্যা, ক্ষুরিকা, চুলিকা, গর্ভ, মহা, ব্রহ্ম, প্রাণাগ্নিহোত্র, মাণ্ডুক্য, নীলরুদ্র, অথর্ব্বশিরস, আশ্রম প্রভৃতি।

অতঃপর ঋগ্বেদের কথা বলিতে হইল, 'চরণব্যূহ' মতে ঋগ্বেদসংহিতায় দশ হাজার পাঁচ শত আশীটি ঋক্‌ আছে যথা ;—

"ঋচাং দশসহস্রাণি ঋচাং পঞ্চশতানি চ
ঋচামশীতিঃ পাদশ্চ তৎপারায়ণমুচ্যতে।"

কিন্তু বর্ত্তমানে ১০৩১৭ টি ঋক্‌ মাত্র পাওয়া যায়, 'শৌনকীয় প্রাতিমতে ঋগ্বেদের পাঁচটি শাখা, যথা—'আশ্বলায়ন', 'শাকল', 'বাস্কল', ও 'মাণ্ডুক'। ঋগ্বেদের উপশাখা অনেক, যথা,—'ঐতরেয়ী', ...য়ী', 'কৌষিতকী', 'মুদ্গল', 'গোকুল', 'বাৎস্য', 'শিশির',

প্রভৃতি। যে ঋষি বা আচার্য্য যে শাখার প্রবর্ত্তক তাঁহার নামানুসারে তৎপ্রবর্ত্তিত শাখার নামকরণ হইয়াছে। যেমন শাকল ঋষির প্রবর্ত্তিত শাখার নাম শাকল শাখা ইত্যাদি। বিষ্ণুপুরাণমতে মুদগল, গোকুল, বাৎস্য, শৈশির ও শিশির এই পাঁচটি শাখা শাকল-শাখার প্রশাখামাত্র; এবং এই পাঁচটি শাখার প্রবর্ত্তক ঋষি-পঞ্চক শাকলের শিষ্য। এতগুলি শাখা-প্রশাখার মধ্যে বর্ত্তমানে ঋগ্বেদের কেবলমাত্র শাকল শাখাটি বিদ্যমান আছে। যেমন দ্বৈপায়ন বেদবিভাগ করিয়া বেদব্যাস নামে খ্যাত হন, তেমনি 'শাকল' শাখাবিশেষের প্রবর্ত্তন করিয়া 'বেদমিত্র' নামে খ্যাত হন। ইনি বৈদিক-সাহিত্যের অধ্যয়ন-প্রণালী প্রবর্ত্তক। ঋগ্বেদীয় পুরোহিতগণের নাম বহ্বৃচ।

ঋগ্বেদ সংহিতায় ১০১৭টি সূক্ত, ২০০৬টি বর্গ, ৬৪টি অধ্যায়, ৮টি অষ্টক, ১০টি মণ্ডল এবং কিঞ্চিদধিক এক সহস্র অনুবাক আছে। কতকগুলি বেদমন্ত্রের সমষ্টির নাম সূক্ত; এক বিনিয়োগ-উদ্দেশ্যে এক ঋষি কর্ত্তৃক এক দেবতা-স্তোত্র-জ্ঞাপক যতগুলি মন্ত্র রচিত হইয়াছে তাহাই সূক্ত। সূক্ত আবার নানা প্রকার—মহাসূক্ত, মধ্যমসূক্ত, ও ক্ষুদ্রসূক্ত। শৌনক বলেন—

"দশার্কভ্যো অধিকং মহাসূক্তং বিদুর্বুধাঃ"

দশটি ঋকের অধিক ঋক্ যে সূক্তে আছে তাহা মহাসূক্ত। পাঁচের অধিক এবং দশের অনধিক ঋক্ এক সূক্তে থাকিলে তাহা মধ্যমসূক্ত, এবং পাঁচ বা তদূন সংখ্যক ঋক্ থাকিলে ক্ষুদ্রসূক্ত।

এই সকল সূক্ত আবার 'ঋষিসূক্ত', ছন্দসূক্ত' ও দেবতাসূক্ত ভেদে ত্রিবিধ, যথা—একজন ঋষির সঙ্কলিত যতগুলি সূক্ত একত্রে আছে, তাহা একটি ঋষিসূক্ত, একছন্দে রচিত যতগুলি সূক্ত একত্রে আছে, তাহা একটি ছন্দসূক্ত এবং যতগুলি একত্রিত সূক্তে এক দেবতার স্তোত্র

করা হইয়াছে, তাহা লইয়া একটি দেবতাসূক্ত। যাহা একটি ঋষিসূক্ত, স্থলবিশেষে তাহাই একটি ছন্দসূক্ত ও দেবতাসূক্ত উভয়ই হইতে পারে। যেমন—ঋগ্বেদের প্রথম অধ্যায়ের ৪র্থ হইতে ৯ম পর্য্যন্ত ৬টি ঋক এক মধুচ্ছন্দাঃ ঋষি-বিরচিত বলিয়া একটি ঋষিসূক্ত, ইহাতে এক ইন্দ্রদেবের স্তব করা হইয়াছে বলিয়া ইহা একটি দৈবতসূক্ত, আবার এক গায়ত্রীছন্দে রচিত বলিয়া এক ছন্দঃসূক্ত।

প্রত্যেক সূক্তেরই ঋষি, ছন্দঃ, দেবতা ও বিনিয়োগ আছে। এ সম্বন্ধে নিরুক্ত বলিতেছেন——

"যস্য বাক্যং স ঋষিঃ",
যা তেনোচ্যতে সা দেবতা।
যদক্ষর পরিমাণং তচ্ছন্দঃ।

এইরূপে বৈদিক-সাহিত্যসম্বন্ধে আমাদের কত কথা জানিবার রহিয়াছে।

শ্রীরমেশচন্দ্র সাহিত্য-সরস্বতী

ভারতীয় কলা-শিল্প।

The Gandhar or Peshwar Sculptures would be admitted by most persons competent to form an opinion to the best specimens of the plastic arts ever known to exist in India. Yet even these are only schools of the 2nd rate Roman art of the 3rd and 4th Centuries. In the Elaboration of minute intricate and often extremely pretty ornamentation on stone,

it is true the Indian artists are second to none. The stone cutters at Gandhar and at Amraoti display the same skill in drawing elaborate patterns and the same skill in executing them, which we now admire in the work of the modern carpet-weavers and Vase-makers. But in the expression of human passions and Emotions, Indian art has completely failed, except during the time when it was held in Graeco-Roman leading strings, and it has scarcely at any time essayed an attempt to give visible form to any divine ideal."

ভারতীয় শিল্পকলা সম্বন্ধে কোন ইউরোপীয় বিশেষজ্ঞ উপযোক্ত মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন এবং সাধারণতঃ ধরিতে গেলে ভারতীয় শিল্পকলা সম্বন্ধে ইহাই ইউরোপীয় পণ্ডিতদিগের মত। ইঁহাদের মতে ভাস্কর্য্য Sculpture চিত্রবিদ্যা painting ও সঙ্গীত এবং অন্যান্য সমস্ত বিষয়েই ভারত ইউরোপ অপেক্ষা অনেক হীন, এমন কি উভয়ের তুলনাই হইতে পারে না।

ভারতে এখন পর্য্যন্তও, যে সমস্ত বাস্তবিকই উচ্চ আদর্শের ভাস্কর্য্য (Sculpture) কিম্বা painting এর অস্তিত্ব আছে যাহার উৎকর্ষ বিষয়ে কেহই সন্দেহ করিতে প্রস্তুত নহেন—ইহাদের মতে সে সমস্তই গ্রীক অথবা ইউরোপীয় শিল্পী দ্বারা প্রস্তুত। তাজমহল ইঁহাদের মতে ইটালীয় শিল্পীর দ্বারা প্রস্তুত। কারণ ইহার ভিতরে দেওয়ালের গায়ে যেরূপ লতাপাতা অঙ্কিত আছে তৎ সদৃশ লতা-পাতা ইটালীয় কারিগরগণও অঙ্কিত করিয়াছেন। গান্ধার ও অমরাবতীর ভাস্কর্য্যই গ্রীক ও রোমান শিল্পের অনুকরণ। এ জন্য ইঁহাদের সৌন্দর্য্য অস্বীকার করিবার উপায় নাই। অজান্তা গুহার অত্যাশ্চর্য্য চিত্রাবলীও এই কারণে গ্রীক-প্রভাবের নিদর্শন। দ্বিতীয় পুলিকেশীর রাজ-সভায় (৬২৫ খ্রীঃ) পারস্য-

রাজার দূতের আগমনের এক সুন্দর চিত্র আছে। এই চিত্রকে উপলক্ষ্য করিয়া কোন ইউরোপীয় পণ্ডিত লিখিয়াছেন—"It proves or goes a long way towards proving that the Ajanta school of pictorial art was derived directly from Persia and ultimately from Greece."

উপরোক্ত যুক্তি অনুসরণ করিয়া সহস্র বৎসর পরে কোন ভারতবাসী পণ্ডিত সম্রাট ৫ম জর্জ্জের রাজ্যাভিষেকের চিত্রে ভারতীয় নৃপতিবৃন্দের মূর্ত্তি দেখিয়া যদি অনুমান করেন যে ইংলণ্ডের চিত্রবিদ্যা ভারতীয় প্রভাব-পূর্ণ, তবে সে অনুমান অযৌক্তিক হইবে না।

ভারতীয় স্থাপত্য-বিদ্যাসম্বন্ধে ইউরোপীয় পণ্ডিতদিগের ইহা অপেক্ষা কিঞ্চিৎ অনুকূল মত আছে। কোনও পণ্ডিত বলিতে বাধ্য হইয়াছেন "They designed like Titans and finished like jewellers" কিন্তু তথাপিও একটু দংশন করিতে ছাড়েন নাই। তাঁহাদের মত যে ভারতবাসীরা খিলানের নির্ম্মাণের কৌশল জানিতেন না। কারণ কোনও পুরাতন মন্দিরে খিলান নাই। কিন্তু ইহারা ভুলিয়া যান যে, ভারতবর্ষই ক্ষেত্রতত্ত্ব ও গণিতের জন্মস্থান। আজ পর্য্যন্তও যে দশমিক-প্রথার অঙ্কপাতের প্রণালী সমস্ত পৃথিবীতে প্রচলিত, তাহা এই ভারতবর্ষেই আবিষ্কৃত হইয়াছিল। কালক্রমে যদি রঙ্গপুর সহর পাটলীপুত্র ও পম্পের ন্যায় ভূপ্রোথিত হয় এবং ২০০০ বৎসর পরে যদি কোনও ব্যক্তি রঙ্গপুরের উপস্থিত কালেক্টরীর কাছারী খনন করিয়া বাহির করেন, তবে তিনি অনায়াসে অনুমান করিবেন যে, ইংরাজেরা খিলান তৈয়ার করিতে জানিতেন না। কারণ ঐ গৃহে খিলান নাই। মোটের উপর ভারতের যাহা কিছু ভাল তাহা সমস্তই বিদেশীয় এবং যাহা মন্দ তাহা আমাদের নিজস্ব।

কেহ কেহ বলিবেন যদি আমাদের শিল্প সত্যই ভাল হয় তবে ইউরোপীয়দিগের মতামতে ক্ষতি-বৃদ্ধি কি?

ক্ষতি-বৃদ্ধি পূর্ব্বে ছিল না, কিন্তু এখন যথেষ্ট ক্ষতি বৃদ্ধি আছে। সুকোমল লতার ন্যায় শিল্পও পরিচর্য্যা, যত্ন এবং আশ্রয়ের উপর নির্ভর করে। পূর্ব্বে রাজপ্রাসাদ, দেবালয়াদি প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে রাজানুগ্রহ ও লোকানুগ্রহের ভিত্তির উপর শিল্প দণ্ডায়মান ছিল। এখন অবস্থার সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন হইয়াছে। ইউরোপ এখন পৃথিবীর মধ্যে প্রবল। ইউরোপের বাজারে এখন পৃথিবীর পণ্যদ্রব্য যাচাই হয়। ইউরোপের যে মত আমাদেরও তাহাই।

ইউরোপ বলিতেছেন ভারতীয় শিল্প অতি কদর্য্য, এবং শিল্প-প্রদর্শনীতে ভারত-শিল্পকে স্থান দেন না, সুতরাং আমাদেরও ঐ মত এবং আমরাও আমাদের শিল্পকে দেশ হইতে একেবারে বিতাড়িত করিবার চেষ্টায় আছি। প্রচুর অর্থব্যয় করিয়া কলের পুতুল ও বিলাতি চিত্র আনিয়া আমাদের ঘর বোঝাই করিতেছি। আমাদের শিল্পীরাও আমাদের রুচি অনুসারে বিলাতি চিত্রের অনুকরণ করিয়া আমাদের শিল্পের প্রাণটুকু পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিতে বসিয়াছেন। জাতীয় শিল্পই জাতীয়ত্বের পরিণতি ও নিদর্শন। আমরা আমাদের জাতীয়ত্ব পর্য্যন্ত হারাইতে বসিয়াছি।

ইউরোপীয়দিগের ভারত-শিল্পসম্বন্ধে এই অবজ্ঞার প্রধান কারণ আমাদের আচার-ব্যবহার, সাহিত্য, দর্শন, ধর্ম্ম, ইত্যাদি বিষয়ে তাঁহাদের অনভিজ্ঞতা।

ইউরোপীয়গণ আমাদের শিল্পকে গ্রীস ও রোমের তুলাদণ্ড দ্বারা ওজন করিতে চান। কিন্তু ইউরোপীয় শিল্প ও আমাদের শিল্প সম্পূর্ণ বিভিন্ন ভিত্তির উপর স্থাপিত। সুতরাং একই তুলাদণ্ডের দ্বারা উভয়কে ওজন করিলে চলিবে কেন? এই দুই জাতির বিভিন্ন আচার, ব্যবহার রীতি, নীতি ইত্যাদির প্রতি লক্ষ্য করিলেই এই কথা স্পষ্টই বুঝা যাইবে।

একটি ইউরোপীয় উদ্যানে, প্রবেশ করিলে চারিদিকে নানা বর্ণের

বিচিত্র কুসুমরাজি স্তরে স্তরে প্রস্ফুটিত দেখিবে। দেখিয়া নয়ন মোহিত হইবে, কিন্তু প্রায় কোন ফুলেই গন্ধ নাই। আমাদের প্রবাদ-প্রসিদ্ধ শিমুল ফুলও হয়ত এই বাগানে স্থান পাইবার যোগ্য। বলিতে গেলে এই বাগানের মূলমন্ত্র বাহ্যিকরূপ।

অপর দিকে একটি ভারতীয় উদ্যানে প্রবেশ করুন। উদ্যান অর্থে আধুনিক বড়লোকদিগের প্রমোদ-উদ্যান নহে। গৃহস্থের প্রাঙ্গণ-সংলগ্ন উদ্যানের কথা বলিতেছি। এই উদ্যানে পুষ্পের বর্ণ-বিন্যাস ও বিচিত্রতা নাই। কিন্তু বেল, যুঁই, চামেলি, শেফালিকা ইত্যাদির সৌগন্ধে প্রাণ মোহিত করিবে। মধু ও গন্ধহীন পুষ্প এ উদ্যানে স্থান পায় না। কারণ তাহাতে দেবপূজা হয় না। কেবল পূজার উপযুক্ত পুষ্পই এ উদ্যানে স্থান পায়, তাহাতে বর্ণের বৈচিত্রতা থাকুক আর নাই থাকুক।

ইউরোপীয়দিগের আত্মীয়-বিয়োগ হইলে তাঁহারা কৃষ্ণ পরিচ্ছদ ধারণ করিয়া শোক-প্রকাশ করেন। শবদেহ সুশোভন শকটে করিয়া গোর-স্থানে লইয়া গিয়া সমাহিত করা হয়। বন্ধুবান্ধবেরা বাম হস্তে কাল ফিতা ধারণ করিয়া নীরবে শবের অনুগমন করিয়া অথবা আর্ত্ত পরিবাঁরের গৃহে কার্ড প্রেরণ করিয়া সহানুভূতি জ্ঞাপন করেন।

আমাদের আত্মীয়বিয়োগ ঘটিলে বন্ধুবান্ধবেরা শবদেহ স্কন্ধে বহন করিয়া শ্মশানে লইয়া যান। মৃত দেহ যথাশাস্ত্র দাহ করিয়া পঞ্চভূতে মিশাইয়া দেওয়া হয়। পরিজনবর্গ নগ্ন দেহে ও নগ্ন পদে শুক্ল পরিচ্ছদ পরিধানপূর্ব্বক ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া নির্দ্দিষ্ট কাল অতিবাহিত করেন এবং তদন্তে মৃতের আত্মার মুক্তিকল্পে যথাশাস্ত্র শ্রাদ্ধাদি সমাপন করিয়া ব্রহ্মচর্য্য ভঙ্গ করেন।

ইউরোপীয়েরা সপ্তাহের কোন নির্দ্দিষ্ট দিনে ও নির্দ্দিষ্ট সময়ে সমবেত হইয়া উৎকৃষ্ট পরিচ্ছদ ধারণ করিয়া এবং আহারান্তে স্নিগ্ধ হইয়া উপাসনা-

গৃহে যান। উপাসকদিগের মান-মর্য্যাদা অনুসারে আসন নির্দ্দিষ্ট থাকে এবং নত জানু হইবার সময়ে সুকোমল "কুশন" ব্যবহার করেন।

আমাদের উপাসনা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ধরণের। অনাহারে শুদ্ধবস্ত্র পরিধান-পূর্ব্বক শরীর ও মন শুচি হইয়া, নিবিষ্ট চিত্তে একাকী কুশাসনে বসিয়া উপাসনা করি। উপাসনা অন্তে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করি। আমাদের দেবালয়ে ধনি-দরিদ্রের প্রভেদ নাই। চিত্তশুদ্ধি আমাদের উপাসনার মূলমন্ত্র এবং চিত্ত-বৃত্তির নিরোধ সাফল্য।

ইউরোপীয়দিগের জগৎই বাস্তব (reality) এবং বর্ত্তমানই সব। মরণান্তে হয় অক্ষয় স্বর্গবাস না হয় অক্ষয় নরকবাস। আমাদের নিকট জগৎ মায়া মাত্র, অনাসক্ত ভাবে এবং ফল-প্রত্যাশা না করিয়া কার্য্য করাই আমাদের ধর্ম্ম। কর্ম্মফল পরজন্ম পর্য্যন্ত আমাদের অনুসরণ করে এবং পরম ব্রহ্মে বিলীন হওয়াই আমাদের চরম উদ্দেশ্য।

ইউরোপীয় শিল্পী ক্ষুৎপিপাসা নিবারণান্তর সম্মুখে model রাখিয়া চিত্র অঙ্কিত করেন।

আমাদের শিল্পী অনশনে সংযত চিত্তে ও নিবিষ্ট মনে তাঁহার শিল্পের প্রতিপাদ্য বিষয় ধ্যান করিয়া সেই ধ্যানলব্ধ ফল প্রস্তরে অথবা পটের উপর প্রতিফলিত করেন।

জাতীয় শিল্প, জাতীয় স্বভাব ও চিন্তার পরিণতি। ইউরোপ ও ভারতের জাতীয় স্বভাবের যখন এত বৈলক্ষণ্য তখন আমাদের শিল্প তাঁহাদের তুলনায় ওজন করিলে চলিবে কেন?

গঠন-পারিপাট্য ও বাহ্যিক সৌন্দর্য্যই ইউরোপীয় শিল্পের আদর্শ।

আধ্যাত্মিকতাই আমাদের শিল্পের প্রতিপাদ্য। প্রকৃতি ইউরোপীয়-দিগের নিকট প্রত্যক্ষ সত্য। প্রকৃতিকে অনুকরণ করাই ইউরোপীয় শিল্পের উদ্দেশ্য। মনঃসৌন্দর্য্যই গ্রীকদিগের নিকট স্বর্গীয় লক্ষণ। ইহারা

model সম্মুখে রাখিয়া এবং তাহা অনুকরণ করিয়া, দেবতার প্রতিমূর্ত্তি গঠন করিতেন। সুতরাং তাঁহাদের গঠিত দেবতা সকল সুন্দর মানবমাত্র।

আমাদের পক্ষে প্রকৃতি ও জগৎ বাস্তব নহে মায়া মাত্র। এই মায়ার পশ্চাতে যে বাস্তব (real) বস্তু আছে সেই মায়াময়কে সন্ধান করাই আমাদের শিল্পের কার্য্য। প্রকৃতিকে অনুকরণ করা আমাদের শিল্পের উদ্দেশ্য নহে। প্রকৃতির স্থানবিশেষ পরিস্ফুট করা, সেই স্থানে যে মহৎভাব লুক্কায়িত আছে, তাহা আবিষ্কার করা প্রকৃতির উপরের আচ্ছাদন সরাইয়া দিয়া তাহার অন্তর্নিহিত ভাবটি খুঁজিয়া বাহির করাই আমাদের শিল্পের উদ্দেশ্য।

গ্রীক শিল্পী দেবমূর্ত্তি গঠন করিতে হইলে যোদ্ধার পুরুষোচিত সৌন্দর্য্যকে আদর্শ করিতেন।

ভারতীয় শিল্পী ঐরূপ স্থলে সংযতচিত্ত ব্রহ্ম-অনুসন্ধিৎসু সত্ত্বগুণপ্রধান ক্ষীণতনু ব্রাহ্মণের ক্লেশপরায়ণ অবয়বকে আদর্শ করিবেন। রজোগুণ-ব্যঞ্জক মাংসপেশীসকল মুছিয়া ফেলিবেন এবং মূর্ত্তির মুখের ভাবের দ্বারা তাহার দেবত্ব পরিস্ফুট করিতে চেষ্টা করিবেন।

ইউরোপীয় শিল্প পার্থিব, বাস্তব এবং রজো ও তমোগুণসম্পন্ন। আমাদের শিল্প ধ্যানলভ্য, আধ্যাত্মিক ও সত্ত্বগুণসম্পন্ন। ইউরোপীয় শিল্পী কেবল শিল্পিমাত্র। আমাদের শিল্পী একাধারে কবি, দার্শনিক ও শিল্পী।

মানব-রূপ আমাদের সৌন্দর্য্যের চরম আদর্শ নহে। ভগবানের রূপই চরম আদর্শ; কিন্তু নিরাকার অব্যয়, সর্ব্বব্যাপী অসীম ভগবানের রূপ কল্পনা করা মনুষ্য-শক্তির অতীত। সেইজন্য আমাদের শিল্পীরা মনুষ্য-অবয়বে সূক্ষ্ম ও অনির্ব্বচনীয় ভাব যোগ করিয়া দেবতাগঠন করেন। মনুষ্য গঠন করিতে হইলে তাহাতেও কিছু আধ্যাত্মিক ভাব প্রবেশ করাইয়া

দেন। এইখানেই আমাদের শিল্পের বিশেষত্ব এবং এই হিসাবে আমাদের শিল্প গ্রীক ও রোমের শিল্প অপেক্ষা বহু উন্নত।

গ্রীক শিল্পীর গঠিত দেবতা Achilles, Jupiter প্রভৃতির সহিত বড়বুদুর ও লঙ্কা দ্বীপের বুদ্ধ-মূর্ত্তির তুলনা করুন। গ্রীক দেবতাদের গঠন-প্রণালী অতি সুন্দর, কিন্তু সৌন্দর্য্য ভিন্ন তাঁহাদের অন্য কিছু দেবত্ব নাই। তাঁহারা সৌন্দর্য্যশালী মানবমাত্র। অপর দিকে বুদ্ধ-মূর্ত্তির প্রশস্ত ললাট, অর্দ্ধমুদিত নয়ন, ধ্যান, অনাসক্তি ও পারলৌকিক চিন্তার পরিচায়ক। করুণ অধর মনোভাবে কাতরতা ও সহানুভূতিব্যঞ্জক। অধরের ঈষৎ হাসি ও হস্তের সঙ্কেত মনুষ্যকে আশ্বাস ও অভয়দান-তৎপর। এ মূর্ত্তির সহিত গ্রীক দেবতার তুলনাই হইতে পারে না। গ্রীক দেবতার প্রাণ নাই। এ মূর্ত্তিতে প্রাণ বর্ত্তমান। গ্রীক শিল্পে এরূপ দৃষ্টান্ত একটিও নাই। দুঃখের বিষয় আমাদের ঘরে এরূপ আদর্শ থাকিতে আমরা তাহা পরিত্যাগ করিয়া ইউরোপে আদর্শ খুঁজিতে যাই।

আমাদের শিল্পীরা দেব-দেবীর যে মূর্ত্তি কল্পনা করিয়াছেন তাহা মনুষ্য-কল্পনার চরম সীমাবর্ত্তিনী।

সরস্বতী, জ্ঞান, বিদ্যা ও সঙ্গীতের অধিষ্ঠাত্রী দেবী সুতরাং তিনি শুভ্রবর্ণা, শুভ্রবস্ত্রাবৃতা শ্বেত সরোজবাসিনী এবং বীণা ও পুস্তকধারিণী। শ্বেতবর্ণ ও শ্বেতপদ্ম পবিত্রতা ও যশঃ-সৌরভজ্ঞাপক। হিন্দু-সঙ্গীতের সর্ব্বোৎকৃষ্ট যন্ত্র বীণা সঙ্গীতশাস্ত্রের পরিচায়ক এবং পুস্তক বিদ্যা ও জ্ঞানের রূপক। বিদ্যা, জ্ঞান ও সঙ্গীত সতত নবীন, সুন্দর ও আনন্দদায়ক। সুতরাং সরস্বতী হাস্যময়ী, সুন্দরী ষোড়শী রমণী।

আধুনিক ইউরোপীয় শিল্পী এই মূর্ত্তির কল্পনা করিতে হইলে বোধ হয়, থিয়েটার হইতে কোন রমণীকে ভাড়া করিয়া আনিয়া পুস্তকাগারের ভিতর পিয়ানোর ধারে বসাইয়া ছবি তুলিতেন

মনুষ্য-কল্পনা কতদূর অগ্রসর হইতে পারে তাহা আমাদের সঙ্গীতের রাগ-রাগিণীর মূর্ত্তি দেখিলেই অনুমান হয়। সঙ্গীত শুনিবার জিনিষ; দেখিবার নহে, কিন্তু তথাপি আমাদের ঋষিরা ইহার শ্রেণী-বিভাগ করিয়াই ছাড়েন নাই। ইহাদের মূর্ত্তি-কল্পনা ও পরস্পরের সম্বন্ধ পর্য্যন্ত নির্ণয় করিয়াছেন। কোন রাগ গীত হইলে শ্রোতার মনে যে ভাবের উদয় হয়, তাহাকে সেইরূপ মূর্ত্তি দেওয়া হইয়াছে। ভৈরবী করুণ রাগিণী; সুতরাং তিনি শুক্লবসনা রোদনপরায়ণা অসাধারণ সৌন্দর্য্যশালিনী রমণী। আর একটি মূর্ত্তির প্রতি লক্ষ্য করুন, একথা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে। যে সময় কামান-বন্দুক ছিল না, সেই সময়ে ভগবানের শক্তির কল্পনা করিতে হইলে সিংহবাহিনী দশ হস্তে বিবিধ আয়ুধধারিণী, অজ্ঞান ও অরাতিরূপ অসুর নিধনকারিণী—ভক্তের প্রতি বরাভয়দায়িনী, জ্ঞান ও বিদ্যারূপিণী সরস্বতী, সম্পদরূপিণী লক্ষ্মী, বল ও শৌর্য্যরূপী কার্ত্তিক ও সিদ্ধিরূপী গণেশের জননী হাস্যময়ী দুর্গা-মূর্ত্তি ভিন্ন মনুষ্য-কল্পনায় আর কি হইতে পারে? শিল্প, কবিত্ব, দর্শন সমস্তই এই মূর্ত্তিতে একাধারে বর্ত্তমান। এই মূর্ত্তি জাতি ও ধর্ম্মনির্ব্বিশেষে সকলেরই সাধনার বস্তু।

ভারত-শিল্পাঙ্কিত দেব-দেবীদিগের হস্ত-পদাদির সংখ্যা ও শরীরের বর্ণ অস্বাভাবিক বলিয়া ইউরোপীয়গণ উপহাস করিয়া থাকেন। হস্তাদির সংখ্যা-বিষয়ে কৈফিয়ৎ উপরেই দেওয়া হইয়াছে। প্রয়োগেরও ঐ উদ্দেশ্য। অসীম পরমব্রহ্মের বর্ণ কল্পনা করিতে হইলে, অসীম নভোমণ্ডলের নীল-বর্ণ ব্যতীত অন্য কোন্ বর্ণ হইতে পারে?

আমাদের শিল্পীর প্রস্তুত মূর্ত্তির শরীরে মাংসপেশী ইত্যাদির অভাব দেখিয়া ইউরোপীয়েরা স্থির করিয়াছেন যে, ভারত-শিল্পীরা শারীরবিদ্যা জানিত না। আধুনিক কৃষ্ণনগরের শিল্পীর প্রস্তুত পুতুল অনেকে দেখিয়াছেন। সকলেই স্বীকার করেন যে, তাহাদের শারীরবিদ্যা জ্ঞান

আছে এবং ঐ সব পুতুল আদর করিয়া সাহেবরা কিনিয়া থাকেন। কিন্তু ঐ শিল্পীর প্রস্তুত দেবমূর্ত্তি সম্পূর্ণ বিভিন্ন বস্তু। পুতুল ইউরোপীয় প্রথায় স্বভাবের অনুকরণ। দেবমূর্ত্তি তাহা নহে। আমাদের আর একটি বিষয় ইউরোপীয়েরা মোটেই সহ্য করিতে পারেন না, সেটি আমাদের সভ্যতার প্রাচীনতা। এখন ক্রমেই আবিষ্কার হইতেছে যে, আমাদের সভ্যতা রোম ও গ্রীসের তুলনায় অত্যন্ত আধুনিক। চিরকাল শুনিয়া আসিতেছি যে, বিক্রমাদিত্য নামে এক বিদ্যোৎসাহী রাজা ৫৭ শতাব্দীতে ছিলেন, কিন্তু এখন কোন কোন ইউরোপীয় ঐতিহাসিক প্রমাণ করিতেছেন যে, বিক্রমাদিত্য নামে কোন রাজা ছিলেন না। কালিদাসকে আমরা বিক্রমাদিত্যের সমসাময়িক জানি, কিন্তু এখন প্রমাণ হইতেছে যে, তিনি ষষ্ঠ হইতে অষ্টম খৃষ্টাব্দীর লোক। কোন দিন শুনিব যে তিনি সিপাহী-বিদ্রোহের কিছু পূর্ব্বে ছিলেন, অথবা ছিলেনই না এবং শকুন্তলা জার্ম্মান পুস্তকের অনুবাদ মাত্র। এইরূপ বেদ, পুরাণ, মহাভারত ইত্যাদির কাল ক্রমেই অগ্রসর হইয়া আসিতেছে। সম্প্রতি Historian's History of the world মুদ্রিত হইয়াছে, তাহাতে পৃথিবীর সমস্ত জাতির ইতিহাস আছে। বিজ্ঞাপনে মুগ্ধ হইয়া প্রচুর অর্থব্যয় করিয়া একখানি ক্রয় করিলাম। দেখিলাম গ্রীক, রোম, ফ্রান্স, ইংলণ্ড প্রভৃতিকে অনেক পাতা স্থান দেওয়া হইয়াছে আর ভারতবর্ষ কুড়া-নৈবেদ্যের মধ্যে পড়িয়াছে। মোটে কয়েক পৃষ্ঠা, তাহারও অর্দ্ধেক ভারত-সভ্যতার আধুনিকত্ব প্রমাণের জন্য। ভারত-সভ্যতা আলেকজেণ্ডারের আগমনের পর উৎপন্ন, কারণ তাহার পূর্ব্বে গ্রীক ঐতিহাসিকেরা এ বিষয়ে কিছু লিখেন নাই। খৃষ্ট পূর্ব্ব ৩য় শতাব্দীর পূর্ব্বে ভারতবাসী ইষ্টক-প্রস্তরাদির দ্বারা গৃহ নির্ম্মাণ করিতে জানিতেন না, কারণ এরূপ কোন গৃহের নিদর্শন পাওয়া যায় না। অদ্ভুত যুক্তি, ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ প্রমাণা-

ভাবাৎ। আমরা বলি খৃষ্টপূর্ব্ব বহু সহস্র বৎসর পূর্ব্ব হইতে আমাদের সভ্যতা ও কলাবিদ্যা চলিয়া আসিতেছে।

প্রায় ৫ সহস্র বৎসর পূর্ব্বে কলিযুগোৎপত্তি হইয়াছে বলিয়া পঞ্জিকা-কারেরা নির্দ্ধারণ করেন এবং তাহার বহু পূর্ব্বে আমাদের সভ্যতার উৎপত্তি এই কথা আমরা বলি। ইউরোপ হাসিয়া বলেন, ঈশ্বর তখন পৃথিবীই সৃষ্টি করেন নাই।

প্রাচীন মিসর সম্বন্ধেও ইউরোপের এই ধারণা ছিল। কিন্তু এখন ক্রমে ক্রমে খৃঃ পূঃ ৬০০০ বৎসর পর্য্যন্ত মিসরের ইতিহাস গঠিত হইয়াছে। ভারতসম্বন্ধে আপত্তি "তোমাদের ইতিহাস নাই।"

আমাদের দেশের ইতিহাস আমাদের রাজার ইতিহাস। তাহা ভাট-মুখে থাকিত। তাঁহাদের কীর্ত্তিকলাপ এবং তাঁহাদের প্রস্তুত মন্দিরাদি ও তাঁহাদের ইতিহাস, যে বাড়ী কীর্ত্তিমান্ লোকপরম্পরায় তাঁহার নাম জাগাইয়া রাখিত। তাজমহল অপেক্ষা সাজাহানের আর কি উৎকৃষ্ট ইতিহাস হইতে পারে? তদ্রূপ বিপুল অর্থব্যয়ে ও পুরুষানুক্রমের চেষ্টায় প্রস্তুত স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্য-শিল্পের নিদর্শন এক একটি মন্দির কি সামান্য ইতিহাস? তখন কে জানিত যে, তাহার উপর দিয়া এত ঝড় বহিয়া যাইবে? কে জানিত যে এত স্থায়ী ইতিহাসও টিকিবে না?

আর আমাদের নিজের ইতিহাস? আমাদের নিত্য অনুষ্ঠেয় ধর্ম্ম-কর্ম্মে সপ্তপুরুষের নাম আবৃত্তি করিতে হয়। তাহার পূর্ব্বের ইতিহাস আমাদের ঘটক-মুখে। তাহার পূর্ব্বের ইতিহাস আমাদের সাহিত্য, দর্শন, ন্যায়, পুরাণ ও শিল্প। তাহারও পূর্ব্বের ইতিহাস আবশ্যক হইলে ভারদ্বাজ, আঙ্গিরস, বার্হস্পত্য, প্রবরস্য এই নশ্বর ও ক্ষণস্থায়ী জগতে, ইহার অধিক ইতিহাসে আমাদের আবশ্যক কি?

আর অন্য যে ইতিহাস আমাদের আছে তাহাই বা বিশ্বাস হয় কই?

কাশ্মীরের "রাজ-তরঙ্গিণী" আছে। নেপালের ইতিহাস আছে। শেষোক্ত ইতিহাস খৃঃ পূঃ ৩০০০ বৎসর হইতে ধারাবাহিকরূপে লিখিত। সুতরাং তাহা অবিশ্বাস্য।

খৃষ্টজন্মের বহুশতাব্দী পূর্ব্বে প্রাচীন মিসরের ইতিহাসে ভারতজাত পণ্য ও শিল্পদ্রব্যের উল্লেখ দেখা যায়। প্রাচীন ফিনিসীয়, গ্রীস ও রোমেও ভারতশিল্প আদরে গৃহীত হইত। কিন্তু ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা বলেন, এই বাণিজ্য-ব্যাপারে ভারত কেবল গৌণরূপে সম্পর্কিত ছিলেন। কারণ ভারতীয়েরা নাবিক ছিলেন না। এটা নেহাৎ গায়ের জোরের কথা। কালিদাসের "বাঙ্গাল নৌ সাধনান" কথাটি না হয় কাব্য বলিয়া উড়াইয়া দিলাম, কিন্তু যে ভারতের সেগুণ কাষ্ঠনির্ম্মিত অর্ণবপোত ২০০ বৎসর পূর্ব্বেও পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট পোত বলিয়া বিবেচিত হইত এবং ইউরোপ আগ্রহের সহিত ক্রয় করিতেন, যে ভারত সুদূর Java ও Cambodia উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছেন, যে ভারত চীন, জাপান প্রভৃতি দেশে ধর্ম্মের সহিত সভ্যতা ও শিল্প বিতরণ করিয়াছে সেই ভারতীয়েরা নাবিক ছিলেন না ইহা বড়ই আশ্চর্য্যের কথা।

ভারত-শিল্পের প্রাচীনত্বসম্বন্ধেও ইউরোপীয়দিগের এই মত। ২০০ খৃঃ পূর্ব্বের আগে ভারতে কোনরূপ শিল্প ছিল ইহা তাঁহারা স্বীকার করিতে চান না, কারণ তাহার কোন নিদর্শন নাই। ইঁহাদের মতে বড়বদুরের শিল্প ৭ম হইতে ১০ খৃষ্টাব্দের, কাম্বোডিয়ার শিল্প ৫ম খৃষ্টাব্দের, অজন্তার শিল্প ২য় খৃঃ পূঃ হইতে ৯ম খৃষ্টাব্দের এবং সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন বারহুত, Elephanta ও এলোরার শিল্প অশোকের সময়ের ২৫০ খৃঃ পূঃ। সুতরাং ইহার পূর্ব্বে ভারতে কোন শিল্প ছিল না।

বাৎসায়নকৃত কামসূত্র নামক গ্রন্থে প্রাচীন ভারতে চতুঃষষ্টিকলা-বিবরণ পাঠ করিলে জানা যায় যে, ঐ সময়ে ভারতে শিল্পের কত উন্নতি

হইয়াছিল। সঙ্গীত, বাদ্য, নৃত্য, সূচীকর্ম্ম, নাটকাভিনয়, খনিজ, অস্ত্রবিদ্যা, ভাস্করবিদ্যা, চিত্রবিদ্যা, ইন্দ্রজালবিদ্যা, উদ্যান-রচনা ইত্যাদি বহু বিষয়ের উল্লেখ ঐ গ্রন্থে দেখা যায়। এই গ্রন্থ খৃঃ পূঃ ৪র্থ শতাব্দীতে প্রণীত হইয়াছিল বলিয়া অনুমান হয়। সুতরাং তাহার বহুপূর্ব্ব হইতেই এই সমস্ত বিদ্যা ভারতে প্রচলিত ছিল। রামায়ণ, মহাভারত ও প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্য ও অন্যান্য গ্রন্থেও এই সমস্ত শিল্পের উল্লেখ দেখা যায়।

শুক্রাচার্য্যের শিল্পশাস্ত্রে তাম্রনির্ম্মিত শিল্পই স্থায়িত্ববিষয়ে সর্ব্বোৎকৃষ্ট। প্রস্তরখোদিত অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট। পটাঙ্কিত চিত্র তদপেক্ষাও অস্থায়ী এবং গৃহগাত্রাঙ্কিত চিত্র সর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন। এই সমস্ত শ্রেণীর শিল্পের মধ্যে কিঞ্চিৎ ঊর্দ্ধ ২০০০ বৎসরের দ্বিতীয় ও ও চতুর্থ শ্রেণীর শিল্পই এখনও বর্ত্তমান। কিন্তু প্রথম ও তৃতীয় শ্রেণীর পুরাতন শিল্প আমরা দেখিতে পাই না। ইহার কারণ কি? উক্ত শ্রেণীর প্রাচীন শিল্প গেল কোথায়? ভারতের ইতিহাসকে জিজ্ঞাসা করিলে বোধ হয় ইহার কিছু উত্তর পাওয়া যাইতে পারে। প্রসিদ্ধ সোমনাথের মন্দির যেখানে গিয়াছে, ইহারাও সেইখানে।

এই প্রবন্ধের প্রথমেই যে ইংরাজ-পণ্ডিতের মত উদ্ধৃত করা হইয়াছে, তিনি একটি মহা ভুল করিয়াছেন। তাঁহার মতে গ্রীক-প্রভাজাত গান্ধার-শিল্পই ভারতের সর্ব্বোৎকৃষ্ট খোদিত শিল্প। ইউরোপীয় আদর্শ অনুসারে ইহা সত্য হইতে পারে। কিন্তু আমাদের আদর্শ তাহা নহে। গান্ধার-শিল্পে, গঠন-পরিপাটা এবং অবয়বের সৌন্দর্য্য আছে সত্য, কিন্তু তাহাতে ভারতশিল্পের প্রাণ নাই। ইহা অপেক্ষা Elephanta, সাঞ্চি, ইলোরা ও Combodiaর শিল্প যথেষ্ট উন্নত। কিন্তু ভারতের সর্ব্বোৎকৃষ্ট শিল্পের অনুসন্ধান করিতে হইলে অজন্তা ও বরুবদুরে যাইতে হইবে। অজন্তা-শিল্পীদিগের কার্য্যকুশলতা ও পারদক্ষতা ইউরোপীয়েরাও অস্বীকার করিতে

পারেন না। অতি কঠিন ও দুরূহ বক্ররেখাসকল অতি দক্ষতার সহিত একটানে অঙ্কিত করা হইয়াছে। এখানকার শিল্পের সৌন্দর্য্য তাহাদের নিতান্ত সরলতা, মহৎভাব-ব্যঞ্জকতা ও আড়ম্বরশূন্যতা। মুসলমানগণের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে ভারতের খোদিত শিল্পের লোপ পাইল। কারণ এই শিল্প তাহাদের ধর্ম্মশাস্ত্রের বিরোধী। আকবরপ্রমুখ উদারস্বভাব মুসলমান নরপতিদিগের সময়ে চিত্রবিদ্যা কিঞ্চিৎ আশ্রয় পাইয়াছিল। কিন্তু মুসলমানদিগের আড়ম্বরপ্রিয়তার প্রতিধ্বনি শিল্পে গিয়া পৌঁছিল। তাহার ফলে অজন্তার সরলতা ও প্রভাবতার পরিকীর্ত্তিত চিত্রবিদ্যা সূক্ষ্ম কারুকার্য্য হইয়া উঠিল।

মুসলমানগণ খোদিতশিল্প নষ্ট করিয়াছেন বটে, কিন্তু সঙ্গীতশাস্ত্রকে আশ্রয় দিয়াছিলেন, এবং সেই ফলে এখনও সঙ্গীতের কিছু কিছু বর্ত্তমান আছে।

ইউরোপীয়দিগের স্বভাবের সহিত আমাদের স্বভাবের যতখানি প্রভেদ, এই উভয় জাতির সঙ্গীতেও ততখানি প্রভেদ। ইউরোপীয় ঐক্যতান-বাদনে Harmonyর অপূর্ব্ব সমাবেশ। কিন্তু আমাদের রাগরাগিণী melodyর পরাকাষ্ঠা এবং তাহা ইউরোপীয় সঙ্গীতে নাই। ইউরোপীয় সঙ্গীত যুদ্ধযাত্রী সৈনিকের উৎসাহদাতা।

আমাদের সঙ্গীত ধ্যানরত যোগীর সহায়কারী। ইউরোপীয় সঙ্গীত— আলোকমালামণ্ডিত ও মনুষ্য কোলাহলপূর্ণ ধনীর প্রাসাদ। আমাদের সঙ্গীত—নির্জ্জন তীরস্থ চন্দ্রালোক-উদ্ভাসিত দেবমন্দির। অধুনা আমরা ইউরোপীয় রুচি অনুসরণ করিয়া আমাদের এই অমূল্য সঙ্গীতকে ত্যাগ করিতে বসিয়াছি, এবং উৎসব-বাদ্যে সানাই, বীণা, কানেড়া, বাগেশ্রী ইত্যাদি উঠাইয়া দিয়া প্রচুর অর্থব্যয়পূর্ব্বক বিলাতী ব্যাণ্ড আনিয়া বর্ব্বরতার পরিচয় দিতেছি। এখন ধ্রুপদ আমাদের ভাল লাগে না।

থিয়েটারের গানই আমাদের প্রিয়। বীণা, সেতার, এস্‌রাজের পরিবর্ত্তে হারমোনিয়ম ও গ্রামোফোন আমাদের ঘরে ঘরে বর্ত্তমান। সৌভাগ্যক্রমে ইউরোপের দৃষ্টি এখন আমাদের সঙ্গীতের দিকে পড়িতেছে। ইউরোপে Certificate পাইলে বোধ হয়, আমাদের সঙ্গীতকে আমরা পুনরায় আদর করিব।

ইউরোপীয়দিগের অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে ভারতের চিত্রবিস্তার যেটুকু অবশেষ ছিল তাহাও যাইতে বসিয়াছে। ইউরোপীয় রুচির অনুসরণ করিয়া আমাদের শিল্পের প্রাণটুকু বাদ দিয়া তৎপরিবর্ত্তে তাহাতে বিলাতী চাকচিক্য ঢুকাইতেছি এবং ভূরি ভূরি অর্থব্যয় করিয়া প্রাণহীন চাকচিক্য-শালী ইউরোপীয় ছবি আনিয়া ঘর বোঝাই করিতেছি। ইউরোপীয় আদর্শের প্রভাব রবিবর্ম্মার চিত্র দেখিলেই অনুমিত হইবে। ইহার চিত্রে গঠন-পারিপাট্য-শারীরবিজ্ঞান ও বর্ণবিন্যাসের ছটা আছে—কিন্তু অজন্তা-শিল্পের প্রাণ ইহাতে নাই ; দৃষ্টান্তস্বরূপ ইহার চিত্রিত অশোকবনে সীতার সহিত অবনীন্দ্রনাথ অজিতকুমারের সীতার এবং ইহার চিত্রিত সমুদ্র-শাসন ও হরধনুভঙ্গের রামমূর্ত্তির সহিত নন্দলাল বসুর অহল্যা-উদ্ধারের রামের তুলনা করিলেই প্রতীয়মান হইবে। অজন্তাশিল্পের প্রাণ ও আধ্যাত্মিকতা ইহার চিত্রে নাই। ইহার চিত্রিত লক্ষ্মীকে পদ্মের উপর হইতে নামাইয়া আনিয়া অতিরিক্ত হাত দুইখানিকে ছাটিয়া দিলে নবাবপুরের সুন্দরী নর্ত্তকী বলিয়া পরিচয় দেওয়া যাইতে পারে।

আমাদের শিল্প পুনর্জ্জীবিত করিতে হইলে ইউরোপীয়দিগের কুসংস্কার দূর করিতে হইবে এবং তাঁহাদের মতানুসরণকারী আমাদের নিজের অজ্ঞতা দূর করিতে হইবে। হীরক ও কাচখণ্ডের প্রভেদ তাঁহাদিগকে বুঝাইয়া দিতে হইবে। দেশের লোকের রুচি মার্জ্জিত করিতে হইবে এবং বরবদুর ও অজন্তা হইতে শিল্পের প্রাণ সঞ্চয় করিতে হইবে। সম্প্রতি

অবনীন্দ্রনাথপ্রমুখ শিল্পিগণ যে ক্ষীণ আশার প্রদীপ জ্বালিয়াছেন, তাহা পোষণ করিতে এবং ঝটিকাঘাত হইতে রক্ষা করিতে হইবে।

শিল্প জাতীয় বস্তু, সুতরাং জাতীয় সহানুভূতি ও সমবেত চেষ্টা ভিন্ন ইহার সাফল্য নাই।

শ্রীভুজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

শ্রীচন্দ্র-দেবের নবাবিষ্কৃত তাম্রশাসন।

[রামপাল-লিপি]

প্রশস্তি-পরিচয়।

(বঙ্গের চন্দ্ররাজবংশের ও সেনরাজবংশের রাজধানী বিক্রমপুর-অঞ্চলে মধ্যযুগের বঙ্গেতিহাস-সঙ্কলনোপযোগী তথ্যানুসন্ধানের প্রয়োজন অনুভব করিয়া, বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতি আমাকে [বর্ত্তমান সালের গ্রীষ্মাবকাশে] পূর্ব্ববঙ্গে পরিভ্রমণ করিতে উপদেশ দান করিয়াছিলেন। সেই উপদেশ-ক্রমে আমি রাজসাহী হইতে জন্মভূমি ঢাকা নগরীতে আসিয়া, বিগত ২৯শে এপ্রিল [১৬ই বৈশাখ] তারিখে, কতিপয় বন্ধুসহ তথ্যানুসন্ধানে বহির্গত হই।) ঢাকা জেলার অন্তঃপাতী মুন্সিগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত পঞ্চসার-গ্রামনিবাসী শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও তদীয়ানুজ শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়দ্বয়ের নিকট শুনিতে পাই যে, সেই গ্রামনিবাসী "যদুনাথ বণিক্যের বাড়ীতে বহুবৎসর যাবৎ একখণ্ড তাম্র-শাসন যত্ন-সহকারে রক্ষিত

আবিষ্কার-কাহিনী।

হইতেছে,—এ পর্য্যন্ত কেহই তাহার পাঠোদ্ধার করিতে সমর্থ হন নাই”। (এই সন্ধান লাভ করিয়া, আমরা বণিক্য-বাড়ীতে গিয়া, বরেন্দ্রানুসন্ধান-সমিতির পক্ষ হইতে তাম্র-ফলকখানি ক্রয় করিয়া আনিয়াছি। যদুনাথের নিকট শুনিয়াছি যে, প্রায় ৭৫।৭৬ বৎসর পূর্ব্বে, ইতিহাস-প্রসিদ্ধ রামপাল-নামক স্থানে কোন এক মুসলমান মৃত্তিকাখনন করিবার সময় এই তাম্রপট্ট প্রাপ্ত হইয়া, যদুনাথের পিতা, স্বর্গীয় জগদ্বন্ধু বণিক্যকে প্রদান করিয়াছিল। জগদ্বন্ধু প্রায় ৪৫।৪৬ বৎসর ইহা নিজ-গৃহে সযত্নে রক্ষা করিয়া, পরলোক-প্রাপ্ত হইলে, তদীয় পুত্র যদুনাথ বিগত ৩০ বৎসর যাবৎ পিতৃদেবের উত্তরাধিকার-সূত্রে প্রাপ্ত এই তাম্র-শাসনখানি ভক্তি-ভাবে রক্ষা করিয়া আসিতেছিল।) ইহা এখন বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতি কর্ত্তৃক সযত্নে রক্ষিত হইতেছে।

বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতি আমার উপরে এই তাম্র-শাসনের পাঠোদ্ধারের ভার ন্যস্ত করায় মূল শাসন হইতে যেরূপভাবে পাঠোদ্ধার করিতে সমর্থ হইয়াছি, তাহাই বিদ্বৎ-সমাজের গোচরার্থ প্রকাশিত হইল। (কাল-প্রভাবে তাম্র-ফলকের কোনও অনিষ্ট না হইয়া থাকিলেও স্থানে স্থানে পাঠোদ্ধারে অত্যন্ত ক্লেশ পাইতে হইয়াছে। তাহার কারণ এই যে, [প্রায় ৩০ বৎসর পূর্ব্বে অক্ষর-পাঠের সুবিধা হইবে মনে করিয়া,] যদুনাথ তাম্র-দ্রাব অর্থাৎ (Nitric acid) প্রয়োগপূর্ব্বক তাম্র-ফলকের উভয়পার্শ্ব সংঘর্ষণ করিয়া কোন কোন স্থানের অক্ষর-বিলোপের সহায়তা করিয়াছিল।)

পাঠোদ্ধার-কাহিনী।

পাঠোদ্ধার-সাধন করিয়া, আমাকে ব্যাখ্যা-কার্য্যেও হস্তক্ষেপ করিতে হইয়াছে। (এই শাসনে রাজ-বংশ-বিবৃতি-বিজ্ঞাপক আটটি শ্লোক আছে। ফরিদপুর জেলার অন্তঃপাতী ইদিলপুর-নিবাসী কোনও জমীদারের গৃহে অদ্যাপি একখানি তাম্র-শাসন অপঠিত অবস্থায় বর্ত্তমান আছে। স্বর্গীয়

গঙ্গামোহন লস্কর এম, এ, তাহার যে, সংক্ষিপ্ত বিবরণ রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা "ঢাকা-রিভিউ" পত্রিকায় [১৯১২ সালের অক্টোবর সংখ্যায়] শ্রীযুক্ত জে, টি, র‍্যাঙ্কিন সাহেব মহোদয় কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। লস্কর মহাশয়ের ক্ষুদ্র টীকাকার প্রবন্ধ-পাঠে জানা গিয়াছে যে, তিনি ইদিলপুরের তাম্র-শাসনখানির ছাপ-মাত্রই আনিতে পারিয়াছিলেন; মূল ফলকখণ্ড সত্ত্বাধিকারীর নিকট হইতে কোন প্রকারেই হস্ত-গত করিতে পারেন নাই।

ব্যাখ্যা-কাহিনী।

ইদিলপুরের-শাসনের প্রতিগ্রহীতা ও উৎসৃষ্ট ভূমি পৃথক্। এই উভয় শাসনের লিপি-পংক্তিও সম-সংখ্যক নহে। শ্লোকাবলী যদি উভয়ত্র একরূপ হয়, তাহা হইলে স্বর্গীয় গঙ্গামোহন ইদিলপুর-শাসনের শ্লোক-মর্ম্ম নিজ প্রবন্ধে যে ভাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহা সর্ব্বাংশে শুদ্ধ হয় নাই। দানাদেশ-কারী রাজার নামোদ্ধারেও তাঁহার কিঞ্চিৎ প্রমাদ পরিলক্ষিত হইবে। তিনি "শ্রীচন্দ্রদেবকে" "চন্দ্রদেব" বলিয়া লিখিয়া গিয়াছেন। বর্ত্তমান তাম্র-শাসনে রাজার নাম "শ্রীচন্দ্র" বলিয়া তিনবার উল্লিখিত আছে,—এবং রাজার পিতা "ত্রৈলোক্যচন্দ্র" পিতামহ "সুবর্ণচন্দ্র" ও প্রপিতামহ "পূর্ণচন্দ্রের, নামকরণ প্রণালীর আলোচনা করিলেই বুঝিতে পারা যায়,—রাজার নাম "চন্দ্রদেব" না হইয়া, অন্য কোনও শব্দ উপপদরূপে লইয়াই গঠিত হইয়া থাকিবে। এই তাম্রশাসনে যে সকল রাজপাদোপজীবির নামোল্লেখ আছে, তাহাদের অধিকাংশের নিয়োগ "ভোজবর্ম্ম-দেবের বেলাব-লিপি" * "বল্লাল সেনদেবের নবাবিষ্কৃত তাম্র-শাসন" † শীর্ষক প্রবন্ধ-দ্বয়ে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। বঙ্গরাজগণের প্রদত্ত তাম্র শাসনে উল্লিখিত অন্যান্য রাজকর্ম্মচারিগণের নামের সহিত তিনটি নূতন নামও পাওয়া গিয়াছে;—তন্মধ্যে "মণ্ডল-পতি" ও "সর্ব্বাধিকৃত" শব্দ-

* সাহিত্য—শ্রাবণ ও ভাদ্র সংখ্যা। ১৩১৯ বঙ্গাব্দ

† সাহিত্য—অগ্রহায়ণ সংখ্যা। ১৩১৮ সন

দ্বয় "মহামাণ্ডলিক ঈশ্বর ঘোষের" * এবং "হরিবর্ম্ম-দেবের তাম্রশাসনেও † দেখিতে পাওয়া গিয়াছে, এবং "শৌল্কিল" শব্দটিও পাল-পৃথ্বীপালগণের তাম্র-শাসনে পরিদৃষ্ট হইয়াছে। যে স্থানে ভূমি উৎসৃষ্ট হইয়াছে বলিয়া তাম্র-শাসনে উল্লিখিত আছে, সেই স্থানটির কোন সন্ধান লাভ করিতে পারি নাই; এবং প্রতিগ্রহীতার কোনও বংশধর অদ্যাপি বিদ্যমান আছেন কি না, তাহাও অবগত হইতে পারি নাই। ব্যাখ্যা-কার্য্যে যেখানে অন্যান্য শাসনাদির সাহায্য লইয়াছি, তাহা যথাস্থানে উল্লিখিত হইয়াছে।

এই তাম্র-শাসনের আয়তন ৯½ X ৮ ইঞ্চ। ইহার শীর্ষদেশে [মধ্য-স্থলে] একটি রাজ-মুদ্রা সংযুক্ত হয়। তন্মধ্যে "শ্রী-শ্রীচন্দ্র দেবঃ" এই নামটি উৎকীর্ণ রহিয়াছে। রাজার নামের উপর বৌদ্ধ-মত-বিজ্ঞাপক "ধর্ম্ম-চক্র-মুদ্রা"; ধর্ম্মচক্রের উভয় পার্শ্বে সমাসীন দুইটি মৃগ-মূর্ত্তি। রাজার নামের নিম্নভাগে, [মধ্যস্থলে] অর্দ্ধচন্দ্র-চিহ্ন;—তাহার উভয়-পার্শ্বে ও নিম্নভাগে ফুল-পাতার সাজ। এই রাজবংশ চন্দ্রবংশীয় ছিল বলিয়াই, রাজকীয় মুদ্রার অর্দ্ধচন্দ্রমূর্ত্তির লাঞ্ছনসংযুক্ত হইয়া থাকিবে। বলা বাহুল্য, পাল-রাজগণের তাম্র-শাসনেও উভয় পার্শ্বে মৃগ মূর্ত্তি-লাঞ্ছিত এই প্রকার "ধর্ম্ম-চক্র-মুদ্রা" সংযুক্ত আছে। এই তাম্র-শাসনে প্রথম পৃষ্ঠায় ২৮ পংক্তিতে এবং দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় ১২ পংক্তিতে পদ্য-গদ্য-ময় সংস্কৃত-ভাষা-রচিত দান-লিপি উৎকীর্ণ আছে। প্রথম পৃষ্ঠায় ১৩ পংক্তি পর্য্যন্ত আটটি শ্লোকে রাজ-কবি নিজ প্রভুর বংশ-বর্ণনা করিয়াছেন;—তৎপর ৩৪ পংক্তি পর্য্যন্ত লিপির গদ্যাংশ, এবং সর্ব্বশেষে ধর্ম্মানুশংসী শ্লোক-পঞ্চক।) তাম্র-শাসন-সম্পাদনসম্বন্ধে যাজ্ঞবল্ক্য-সংহিতায় যে শাস্ত্রীয়

লিপি-পরিচয়:

* সাহিত্য—বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা। ১৩২০ বঙ্গাব্দ।

† "বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস"—দ্বিতীয় ভাগ, ২১৫ পৃষ্ঠা।

প্রমাণ উল্লিখিত আছে, তাহা হইতে জানা যায় যে,—রাজা [স্ব-হস্ত-কাল-সম্পন্নং শাসনং কারয়েৎ স্থিরম্"] তাম্র-শাসনে নিজ স্বাক্ষর ও সন-তারিখ সংযুক্ত করিবেন;—কিন্তু, এই তাম্র-শাসনে সন-তারিখ সন্নিবিষ্ট হয় নাই, এবং রাজার কিংবা তাঁহার কোন প্রধান কর্ম্মচারীর স্বাক্ষরও ইহাতে সংযুক্ত দেখা যায় না। লিপিকরের ও শিল্পীর নামোল্লেখের অভাবও পরিদৃষ্ট হইতেছে। (যে অক্ষরে এই তাম্র শাসন উৎকীর্ণ হইয়াছে, তাহা দ্বাদশ-শতাব্দীর প্রথম ভাগের বঙ্গাক্ষর বলিয়া প্রতিভাত হয়। সুকৌশলে উৎকীর্ণ হইলেও, স্থানে স্থানে লিপিকরের বা শিল্পীর অসাবধানতায় কিছু কিছু ভ্রম-প্রমাদ সংঘটিত হইয়াছে। সেইগুলি যথাস্থানে প্রশস্তি-পাঠের পাদ-টীকায় প্রদর্শিত হইয়াছে।) [৪র্থ, ২১, ৩১, পংক্তি] কোন কোন স্থানে অবগ্রহ-চিহ্ন ব্যবহৃত হইয়াছে, কোন কোন স্থানে হয় নাই [১ম, ৭ম ; ৩০শ পংক্তি] রেফ-সংযোগে ব, হ প্রভৃতি কতিপয় বর্ণ ভিন্ন প্রায় অনেক ব্যঞ্জন-বর্ণেরই দ্বিত্ব সাধিত হইয়াছে। (এই তাম্র-শাসন রামপাল-নামক স্থানে আবিষ্কৃত হইয়াছিল বলিয়া, ইহা "রামপাল-লিপি" নামে অভিহিত হইল।)

বিক্রমপুরসমাবাসিত-জয়স্কন্ধাবার হইতে, ধর্ম্মচক্র-মুদ্রা-সংযুক্ত এই তাম্রশাসন সম্পাদিত করাইয়া চন্দ্রবংশীয় পরম-সৌগত, মহারাজাধিরাজ—শ্রীমত্ত্রৈলোক্যচন্দ্র দেব—পাদানুধ্যাত, পরমেশ্বর, পরম ভট্টারক, মহারাজাধিরাজ শ্রীমান্ শ্রীচন্দ্রদেব [১৫—১৬ পংক্তি], বরাহ গুপ্তের প্রপৌত্র, বরাহ গুপ্তের পৌত্র, সুমঙ্গল গুপ্তের পুত্র, শান্তি-বারিক পীতবাস গুপ্ত-শর্ম্মাকে, [ভগবান্ বুদ্ধ-ভট্টারককে উদ্দেশ করিয়া] মাতা পিতার ও নিজের পুণ্য ও যশোবৃদ্ধির নিমিত্ত [১৬—২১ পংক্তি], সমস্ত রাজ-পাদোপজীবী ও অন্যান্য প্রজাবর্গকে বিজ্ঞাপিত করিয়া, যাবচ্চন্দ্রসূর্য্য ও ক্ষিতি-সমকাল

লিপি-বিবরণ। পর্য্যন্ত, যথাবিধি উদক-স্পর্শ পূর্ব্বক, পৌণ্ড্র-ভুক্তির

অন্তঃপাতী নাব্য-মণ্ডল-স্থিত নেহকাষ্ঠি গ্রামে পাটক-পরিমিত ভূমিদান করিয়াছিলেন।

এই নবাবিষ্কৃত তাম্র-শাসন হইতে আমরা কি কি ঐতিহাসিক তথ্য প্রাপ্ত হইতে পারি, তাহার কিঞ্চিৎ বিচার আবশ্যক। লিপি-প্রারম্ভে [প্রথম শ্লোকে] রাজ-কবি, বুদ্ধ-ধর্ম্ম-সংঘং—এই "ত্রিরত্নের"—উল্লেখ করিয়া, রাজবংশের বৌদ্ধমতানুরক্তির পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। বংশ-বিবৃতি-বিজ্ঞাপক দ্বিতীয় শ্লোকে উল্লিখিত হইয়াছে যে,—চন্দ্রবংশে পূর্ণচন্দ্র নামক কোন সুপুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়া, পৃথিবীতে খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। চন্দ্রবংশে জন্ম বলিয়া এই অভিনব রাজবংশীয়গণ ক্ষত্রিয় ছিলেন,—এইরূপ অনুমান করা যাইতে পারে। পূর্ণচন্দ্র কোনও স্থানের রাজা ছিলেন বলিয়া উল্লেখ নাই ; তিনি একজন বীরমাত্র ছিলেন ; ইহাই দ্বিতীয় শ্লোকের আভাস। তৃতীয় ও চতুর্থ শ্লোকে পূর্ণচন্দ্রের পুত্র সুবর্ণ-চন্দ্রের উৎপত্তি ও নামকরণকাহিনী সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে। পঞ্চম শ্লোকে কিছু ঐতিহাসিক তথ্যের সন্ধান প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে। সুবর্ণচন্দ্রের পুত্র অশেষ গুণ-বিভূষিত বলিয়া ত্রৈলোক্যে ত্রৈলোক্যচন্দ্রনামে বিদিত হইয়াছিলেন। তিনি "হরিকেল"—রাজলক্ষ্মীর আধার-রূপে চন্দ্র-দ্বীপে 'নৃপতি' হইয়াছিলেন। এই 'হরিকেল' শব্দটি বঙ্গ-দেশেরই নামান্তর। "বঙ্গাস্তু হরিকেলীয়াঃ" হেমচন্দ্রের এই বাক্যই ইহার প্রমাণ। বর্ত্তমান খুলনা, বাখরগঞ্জ ও ফরিদপুরের অংশ-বিশেষ লইয়াই সেকালের 'চন্দ্র-দ্বীপ' দক্ষিণে সাগর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এই স্থানই আবার পরবর্ত্তীকালে [মোগল-সাম্রাজ্যে] বাকলা-চন্দ্রদ্বীপ নামেও কথিত হইয়াছিল। 'দিগ্বিজয়-প্রকাশ-বিবৃতি" নামক গ্রন্থে বাকলা-চন্দ্রদ্বীপের ভৌগোলিক বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। চন্দ্রদ্বীপের কুলীন কায়স্থ বলিয়া এক শ্রেণীর কায়স্থ এখনও কৌলীন্য-মর্য্যাদা লাভ করিতেছেন। ষষ্ঠ ও সপ্তম শ্লোকে চন্দ্রদ্বীপাধিপতি

ত্রৈলোক্যচন্দ্রের শ্রীকাঞ্চনা-নাম্নী পত্নীর গর্ভে রাজযোগ-মুহূর্ত্তে শ্রীচন্দ্রের জন্ম-বৃত্তান্ত বিবৃত হইয়াছে। ত্রৈলোক্যচন্দ্রের ভার্য্যাকে রাজকবি 'প্রিয়া' মাত্র বলিয়াই নিরস্ত হইয়াছেন, 'মহিষী' বলেন নাই। এই কারণে এবং ত্রৈলোক্যচন্দ্রের 'নৃপতি' মাত্র উপাধি দর্শনে, মনে হয়,—তিনি কোন প্রবল-পরাক্রমশালী রাজাধিরাজের সামন্ত-শ্রেণীভুক্ত হইয়া, 'নৃপতি' উপাধি লইয়াই চন্দ্রদ্বীপ—শাসন করিতেছিলেন। তাঁহারা পুনঃ শ্রীচন্দ্র ভবিষ্যতে 'রাজা' হইবেন, ইহাই জ্যোতিষিকগণ তাঁহার জন্মসময়ে সূচিত করিয়াছিলেন। অষ্টম শ্লোকেও আমরা কিছু ঐতিহাসিক তথ্যের সন্ধান প্রাপ্ত হইতে পারি। এই শ্রীচন্দ্র সতত বিবুধ-মণ্ডলে পরিবেষ্টিত থাকিয়া, এবং দেশকে একচ্ছত্রাধিপত্যে বিভূষিত করিয়া, অরাতি-কুলকে কারা-নিবদ্ধ করিয়া, আর যশে দিঙ্মুখ সৌরভযুক্ত করিয়াছিলেন। বৌদ্ধ শ্রীচন্দ্র বিক্রমপুর স্থিত রাজধানী হইতে ব্রাহ্মণকে ভূমিদান করিয়াছিলেন। সর্ব্ববর্ণের উন্নতিতেই দেশের উন্নতি,—সে কালের রাজগণ ইহা বুঝিতেন, নচেৎ বৌদ্ধ-নরপতি শ্রীচন্দ্র ব্রাহ্মণকে ভূমিদান করিবেন কেন? বিক্রম-পুরের শ্রীচন্দ্রের রাজধানী ছিল, ইহাতে তিনি বঙ্গপতি ছিলেন এই কথা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে। বিক্রমপুরে শ্রীচন্দ্র মহারাজের বৌদ্ধ-নরপতি বলিয়া প্রতিভাত। শ্রীচন্দ্রের পর তাঁহার বংশধর কেহ বঙ্গ-রাজ ছিলেন কি না তাহা বর্ত্তমান অবস্থায় | অন্য কোন প্রমাণ না থাকায় | নিঃসঙ্কোচে বলা যায় না।

এখন জিজ্ঞাস্য কোন্ সময়ে, কিরূপ ঘটনা-চক্রে, ত্রৈলোক্যচন্দ্র চন্দ্র-দ্বীপে 'নৃপতি' হইয়াছিলেন, কোন্ সময়ে কিরূপ ঘটনা-চক্রে তৎপুত্র শ্রীচন্দ্র বঙ্গে রাজ্য-স্থাপন করিয়া বিক্রমপুর হইতে শাসন-দণ্ড পরিচালনা করিয়া-ছিলেন, এবং কোন্ সময়ে, কিরূপ ঘটনা-চক্রেই বা এই অভিনব চন্দ্রবংশীয় বৌদ্ধনরপতির [বা নরপতিগণের ?] রাজ্য-পতন সংঘটিত হইয়াছিল ?—

এই সকল প্রশ্ন ঐতিহাসিক সমস্যার আধার। লিপি-কাল বিচার ও সম-সাময়িক অন্যান্য ঘটনার সমালোচনা করিয়া এই সমস্যার যথাযোগ্য মীমাংসা করা যাইতে পারে না। অক্ষর-হিসাবে এই লিপির স্থান দ্বাদশ-শতাব্দীর প্রথমভাগে। এই শাসনের 'ত', 'ন' ও 'ম' বর্ম্মবংশীয় ভোজ-বর্ম্মদেবের বেলাব-লিপি ও হরিবর্ম্মদেবের মন্ত্রী ভট্ট-ভবদেবের প্রশস্তির 'ত', 'ন' ও 'ম' এর অনুরূপ। কিন্তু আলোচ্য শাসনে 'প' এবং 'য' কিছু বেশী আধুনিক। 'র' বিজয়সেনদেবের দেবপাড়া-লিপির অনুরূপ। বেলাব-লিপিতে ও ভট্ট-ভবদেবের ভুবনেশ্বর প্রশস্তিতে অবগ্রহ-চিহ্ন আদৌ ব্যবহৃত হয় নাই। কিন্তু শ্রীচন্দ্রের শাসনে কোন কোন স্থানে অবগ্রহ-চিহ্ন ব্যবহৃত হইয়াছে, কোন কোন স্থানে হয় নাই। এই সমস্ত কারণে এই লিপির কাল যেন বর্ম্মরাজগণের লিপিকালের অব্যবহিত পরে, এবং সেন-রাজগণের লিপিকালের অব্যবহিত পূর্ব্বে নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে, অর্থাৎ সেনরাজ বিজয়সেনদেবের বিক্রমপুর অধিকারের পূর্ব্বে এবং বর্ম্ম-রাজ হরিবর্ম্মদেবের পুত্রের রাজ্যনাশের পরেই, কোনও সুযোগে চন্দ্র-দ্বীপাধিপতি ত্রৈলোক্যচন্দ্রের পুত্র শ্রীচন্দ্র বিক্রমপুরে স্বাতন্ত্র্য অবলম্বনপূর্ব্বক কিছুকালের জন্য এক অভিনব বৌদ্ধরাজ্য সংস্থাপিত করিতে সমর্থ হইয়া-ছিলেন। বিক্রমপুরে যে সমস্ত বৌদ্ধমূর্ত্তি আবিষ্কৃত হইতেছে তাহা মধ্য-যুগের এই কালেরই পরিচয় প্রদান করে। গত বৎসর বেলাব-লিপির সাহায্যে আমরা বিক্রমপুরের বর্ম্মরাজগণের অভ্যুত্থানের কথা কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়া দেখাইয়াছি যে, ভোজবর্ম্মদেব এবং তৎপরবর্ত্তী বর্ম্মরাজ-গণ শেষ-পাল-রাজগণের সময়েই বিক্রমপুর হইতে বঙ্গে রাজ্য-শাসন করিতেন। এদিকে দ্বাদশ-শতাব্দীর প্রথম ভাগে রামপালদেবের তনু-ত্যাগের পর তৎপুত্র* কুমারপাল-দেব বরেন্দ্রভূমিতে [রামাবতী-নগর

* গৌড়-রাজমালা ৫১-৫৩ পৃষ্ঠা।

হইতে] রাজ্যশাসন করিতেছিলেন। কুমারপালদেবের সময় হইতেই পাল সাম্রাজ্যের বন্ধন বিঘটিত হইয়া আসিতেছিল। কুমারপালদেবের প্রধান সহায় ছিলেন তাঁহার সচিব ও সেনাপতি বৈদ্যদেব। এই সময়ে রাজ্যে বিদ্রোহ উপস্থিত হইলে, বৈদ্যদেবই "অনুত্তর-বঙ্গে" অর্থাৎ দক্ষিণ বঙ্গে, নৌ-বল লইয়া বিদ্রোহ-দমনে সমর্থ হইয়াছিলেন, এই ঐতিহাসিক তথ্য আমরা তদীয় [কমৌলিতে প্রাপ্ত] † তাম্রশাসনে উল্লিখিত দেখিতে পাই। বৈদ্যদেবকর্তৃক এই দক্ষিণ বঙ্গের বিদ্রোহ-বহ্নি নির্ব্বাপিত হইলেই হয়ত পালরাজ সর্ব্বগুণ-বিমণ্ডিত বৌদ্ধ ত্রৈলোক্যচন্দ্রকে উপযুক্ত পাত্র মনে করিয়া, চন্দ্রদ্বীপের সামন্তরূপে নিযুক্ত করিয়া 'নৃপতি' উপাধিতে বিভূষিত করিয়া থাকিবেন। এই বিদ্রোহ সময়েই হয়ত চন্দ্রদ্বীপ বঙ্গ-রাজ্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছিল; এবং এই সময় হইতেই হয়ত বর্ম্মরাজগণের দুর্দ্দিন উপস্থিত হইয়া থাকিবে। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, রাজকবি ত্রৈলোক্যচন্দ্রকে হরিকেল (বঙ্গ) রাজলক্ষ্মীর আধার বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। এই সময়েই ভট্ট-ভবদেব-মন্ত্র নিয়ন্ত্রিত হরিবর্ম্মা বা তদাত্মজ [অজ্ঞাত নামা রাজার] অধিকার হইতে বঙ্গ-রাজ্যের অন্তর্গত চন্দ্রদ্বীপ হস্তচ্যুত হইয়াছে। তৎপর বৈদ্যদেব যেমন ‡ কামরূপে তিগ্যদেবকে সিংহাসন-ভ্রষ্ট করিয়া স্বাতন্ত্র্যাবলম্বন করিয়াছিলেন, সেইরূপ বোধ হয়, পালরাজগণের ও বর্ম্মরাজগণের দুর্ব্বলাবস্থা অবলোকন করিয়া, ত্রৈলোক্য-চন্দ্র-পুত্র শ্রীচন্দ্র ও বর্ম্মবংশীয় শেষ নরপতিকে কোন কারণে সিংহাসন-ভ্রষ্ট করিয়া, স্বয়ং 'পরমেশ্বর-ভট্টারক মহারাজাধিরাজ' উপাধি গ্রহণ করিয়া বঙ্গে সার্ব্বভৌম নরপতি সাজিয়া বসিয়াছিলেন। অথবা বর্ম্মরাজ্য অন্য কোনও কারণে উন্মূলিত হইলে, শ্রীচন্দ্রই বঙ্গে একচ্ছত্রাধিপত্য বিস্তৃত

---

† গৌড়-লেখমালা ১৩০ পৃষ্ঠা।

‡ গৌড়লেখমালা ১৩১ পৃষ্ঠা।

করিয়া ও শত্রুকুলকে কারানিবদ্ধ করিয়া, বিক্রমপুর হইতে শাসন পরিচালনা করিয়াছিলেন। আলোচ্য শাসনের অষ্টম শ্লোকে এইরূপ ঐতিহাসিক তথ্য ইঙ্গিতে সূচিত হইয়া থাকিবে। অপরদিকে এই সময়েই বিজয়সেন পাল-সাম্রাজ্যের দুরবস্থা ও দুর্ব্বলতা দেখিয়া, বরেন্দ্রীতে রাজ্য পাতিবার উপক্রম করিতেছিলেন; এবং পরে এই বিজয়সেন কর্ত্তৃকই হয়ত বৌদ্ধ-শ্রীচন্দ্রের সংস্থাপিত রাজ্যের বিনাশ সাধিত হইয়া থাকিবে। বিজয়সেন যে বিক্রমপুরের রাজধানী হইতে দানাদেশ করিয়াছিলেন, এই সংবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্‌. এ, মহাশয় এক প্রবন্ধে প্রকাশিত করিয়াছিলেন। লিপিখানি বিজয়সেনদেবের একত্রিংশদ্বর্ষীয় লিপি বলিয়া শুনিতে পাওয়া যাইতেছে।

সংক্ষেপে বলা যাইতে পারে যে, যখন বরেন্দ্রীতে কুমার-পালদেব এবং বঙ্গে হরিবর্ম্মদেব ও তদীয় পুত্র সিংহাসনারূঢ় ছিলেন, এবং বিজয়সেন গৌড়ে রাজ্য-স্থাপনের সুযোগ অন্বেষণ করিতেছিলেন ও কুমার পালদেবের দক্ষিণ-বাহুরূপী প্রধান সচিব বৈদ্যদেব তিগ্মদেবকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া কামরূপে স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করিয়াছিলেন, তখনই চন্দ্রদ্বীপ নৃপতি ত্রৈলোক্যচন্দ্রের পুত্র শ্রীচন্দ্রও বর্ম্মরাজকে বিতাড়িত করিয়া অথবা অন্য কারণে বর্ম্মরাজের নাশ ঘটিলে পর, বঙ্গে স্বাতন্ত্র্যাবলম্বনপূর্ব্বক বিক্রমপুর-রাজধানী হইতে দেশ-শাসন করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। এই সিদ্ধান্ত সর্ব্বাংশসমর্থিত হইবে কি না তাহা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে না। যতদিন অনুকূল ও প্রবল প্রমাণ না প্রাপ্ত হওয়া যাইবে, তত দিন এই ভাবের অনুমান-মূলক সিদ্ধান্ত প্রচারিত না করিয়া উপায় নাই। পরবর্ত্তী প্রমাণের বলে পূর্ব্ববর্ত্তী এইরূপ সিদ্ধান্ত-নিচয় পরিবর্ত্তিত হইতেছে ও হইবেই।

শ্রীরাধাগোবিন্দ বসাক।

প্রবাসী শ্রাবণ সংখ্যা ১৩১৯ বঙ্গাব্দ।

বাণগড়

সে অনেক দিনের কথা। তখন আমার ১৮ বৎসর বয়স। আমি এই দিনাজপুর সহরেই বাস করিতাম। ঐতিহাসিক গবেষণার একটা প্রবল ইচ্ছা সেই সময় হইতেই আমার মনে জাগিয়াছিল। আমি তখন হইতেই প্রাচীনকালের ইতিহাস সম্বন্ধে আলোচনা করিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম। বাণগড়ের কথা এই সময় প্রথম আমার কর্ণগোচর হয়। তখন অনুসন্ধানে জানিতে পারিয়াছিলাম, দিনাজপুরের মাননীয় বর্ত্তমান শ্রীল শ্রীযুক্ত মহারাজা বাহাদুরের পূর্ব্বপুরুষ রাজা রামনাথ রায় বাহাদুর একটি কন্যাদায়গ্রস্ত ব্রাহ্মণের নিকট, সর্ব্বপ্রথম, এই বাড়ীতে বহু অর্থ থাকা শুনিতে পাইয়াছিলেন এবং সেই অর্থ যে তাঁহার প্রাপ্য, তাহাও সেই ব্রাহ্মণ বলিয়াছিলেন। তাহার পরে তিনি বাণগড় খনন করাইয়াছিলেন। শুনিতে পাওয়া যায়, রাজা-বাহাদুর ঐ স্থানে অনেক অর্থ পাইয়াছিলেন— আর পাইয়াছিলেন কতকগুলি প্রস্তর। এখনও তাহা রাজবাড়ীতে আছে। প্রস্তরগুলি দেখিতে বড়ই ইচ্ছা হইল। রাজবাড়ীতে গিয়া দেখিলাম। দুইটি প্রস্তরের কথা আজ পর্য্যন্ত ভুলিতে পারি নাই। একটি রাজবাড়ীর অভ্যন্তরস্থিত একটি দ্বারে সংলগ্ন চৌকাট। "চৌকাট" শুনিয়া কেহ মনে করিবেন না যে, ইহা কাষ্ঠনির্ম্মিত। চৌকাটটি প্রস্তরনির্ম্মিত। অন্য নাম না পাইয়া, "কাঁটালের আমসত্বের" ন্যায়, চৌকাট শব্দই ব্যবহার করিলাম। এরূপ কারুকার্য্যময় প্রস্তরের চৌকাট আমি আর দেখি নাই। তার পর গোটা বত্রিশটি বৎসর স্রোতের মত এই জীবনের উপর দিয়া বহিয়া গিয়াছে, এ পর্য্যন্ত ঐরূপ শিল্প-নৈপুণ্যের পরিচয় আর পাই নাই। সুতরাং উহাকে শিল্প-নৈপুণ্যের পরাকাষ্ঠা বলিতে পারি।

আমি দক্ষিণ-বরেন্দ্রবাসী। আমার বাসস্থান হইতে উত্তর বরেন্দ্রস্থিত বাণগড় বহুদূরে অবস্থিত হইলেও আমি আমার দেশের জিনিষ বলিয়া দাবী করিতে পারি। এমন শিল্পীও একদিন বরেন্দ্র দেশে ছিল, যাহার তুলনা পৃথিবীর কোথায়ও মিলে না। এ কথা মনে হইলে, এই শুষ্ক রক্ত-বর্ণ মৃত্তিকাবিশিষ্ট অহল্যাদেবীর কনিষ্ঠাভগিনী বরেন্দ্রে বাস করিয়াও মন আনন্দরসে আপ্লুত হয়। জীবন চিরস্থায়ী নহে, কিন্তু কীর্ত্তি চিরস্থায়ী না হইলেও বহুদিন-বহুযুগ স্থায়ী। তাই ৯৫০ বৎসর পূর্ব্বের এই কীর্ত্তি আজিও নয়ন ভরিয়া দেখিতে পাইতেছি। আমি কালের অনন্ত ক্রোড়ে আশ্রয় গ্রহণ করিলেও আমার কত অধস্তন পুরুষ ইহা দেখিতে পাইবে।

দ্বিতীয়টি বাগানে রক্ষিত "প্রস্তরস্তম্ভ"। তাহাতে দেবনাগবাক্ষরে খোদিত একটি লিপি দেখিয়াছিলাম, কিন্তু তখন পড়িতে পারিয়াছিলাম না। শুনিয়াছিলাম—ম্যাজিষ্টেট ওয়েষ্টমেকট সাহেব ইহার পাঠোদ্ধার করিয়াছেন। সে পাঠ আমি তখন পাই নাই, পাইবার চেষ্টাও করি নাই। তখন এই পর্য্যন্ত জানিতে পারিয়াছিলাম যে, "বাণ নামক অসুর রাজা এই গড় নিম্মাণ করিয়াছিলেন। এখানেই শ্রীকৃষ্ণের পৌত্রের সহিত বাণরাজ কন্যা উষার বিবাহ হইয়াছিল। স্তম্ভটিতে যে লিপি লিখিত আছে তাহার অর্থ এই—

"আনন্দে বিদ্যাধরগণ স্বর্গলোকে যাঁহার দুর্দ্দমনীয় শত্রুসৈন্য দমনে দক্ষতা এবং দানকালে যাচকের গুণগ্রাহীতার বিষয় গান করিতেছেন, কাম্বোজান্বয়জ সেই গৌড়পতি কুঞ্জর-ঘটা (৮৮৮) বর্ষে ইন্দু মৌলির (শিবের) এই পৃথিবীর ভূষণ মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন১।"

এই বাণগড়ের বিষয় আলোচনা করিতে বসিয়া বাণরাজার যে ইতি-হাস পাইয়াছি, অদ্য তাহাই আপনাদিগকে শুনাইব।

---

১) গৌড়রাজমালা ৩৫ পৃষ্ঠা।

(১) রাজসাহী সহরের পশ্চিমে দক্ষিণবরেন্দ্রের অন্তর্গত খেতুরের নিকট দেওপাড়া গ্রামে প্রদ্যুম্নেশ্বরের মন্দিরের চিহ্ন ও পত্তম সহর নামক একটি দীঘি আছে। বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতির মতে ইহা সেনবংশীয় রাজা বিজয়সেনের কীর্ত্তি। প্রদ্যুম্নেশ্বরমন্দিরে যে প্রস্তরলিপি সংলগ্ন ছিল, তাহা হইতেও জানা যায়, সেই মন্দির বিজয়সেন কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছে।

অনুসন্ধান-সমিতির বহুপূর্ব্বে লিখিত প্রাচীন বারেন্দ্রকুল-পঞ্জিকায় লিখিত আছে, "ববিন্দা নামক স্থানে (রাজসাহীর পশ্চিমে) প্রদ্যুম্ন নামক ব্যক্তির নামানুসারে প্রদ্যুম্নেশ্বর নামধেয় হরিহরমূর্ত্তি স্থাপিত ও বরেন্দ্রশূর কর্ত্তৃক তদীয় শাসিত দেশ বরেন্দ্র আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে।" ২

বারেন্দ্র-কুল-পঞ্জিকায় শূরবংশীয় তিনজন রাজার নাম পাওয়া যায়—ধরাশূরের পুত্র প্রদ্যুম্নশূর ও বরেন্দ্রশূর এবং প্রদ্যুম্নশূরের পুত্র অনুশূর। রাঢ়ীয় কুলপঞ্জিকায় ধরাশূর ও তৎপুত্র রণশূরের নাম আছে, ইঁহাদের নাম নাই। ইহাতে বুঝা যায় যে, ইঁহারা কেবল বরেন্দ্রেই রাজত্ব করিয়াছেন, রাঢ় দেশের সহিত ইঁহাদের কোন সম্পর্ক ছিল না। আজকাল কুলপঞ্জিকার প্রমাণ গ্রাহ্যযোগ্য নহে বলিয়া অনেকেই মত প্রকাশ করিয়াছেন, তজ্জন্য আমরা কুলপঞ্জিকার প্রমাণ গ্রহণ না করিয়া আলোচনা করিব।

(২) দেওপাড়ার পত্তমসহর দীঘির প্রকৃত নাম প্রদ্যুম্নসরঃ বা প্রদ্যুম্ন সরোবর। কালে অশিক্ষিত লোকের মুখে "পত্তমসহর" হইয়া গিয়াছে। প্রদ্যুম্নেশ্বর বিগ্রহ স্থাপন ও প্রদ্যুম্ন সরোবর খনন একজনেরই কীর্ত্তি, তাহাতে সন্দেহ নাই। এই দুই কীর্ত্তি বিজয়সেন অপেক্ষা প্রদ্যুম্ন নামক কোন ব্যক্তির স্থাপিত বলিয়া ধরিলে নিতান্ত অসঙ্গত হয় না।

---

(২) বিশ্বকোষ "বারেন্দ্র শব্দ"।

বিজয় সেনের স্থাপিত হইলে "বিজয়েশ্বর" বা "হরিহর" নাম হইত, দীঘির নাম বিজয় সরোবর হইত। অনুসন্ধান সমিতির মতে এই দেওপাড়া হইতে ৭ মাইল দূরে বিজয়নগর নামক স্থানে বিজয়সেনের রাজধানী ছিল। সুতরাং স্বীয় রাজধানীতে এই প্রকাণ্ড মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া বিগ্রহ স্থাপন ও দীর্ঘিকা খনন না করিয়া ৭ মাইল দূরে বিজয় সেন এই কীর্ত্তি কেন স্থাপন করিয়াছিলেন তাহা ভাবিয়া দেখিলে স্পষ্টই বুঝা যায়, ইহা তাঁহার নিজ কীর্ত্তি নহে। প্রদ্যুম্নেশ্বর মূর্ত্তি অপর কর্তৃক এই স্থানে যে মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহা বিজয়সেনের সময় ভগ্ন বা জীর্ণ হইয়াছিল, বিজয়সেন সুবৃহৎ প্রস্তরমন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া তন্মধ্যে ঐ মূর্ত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন। অতএব প্রদ্যুম্ন নামক ব্যক্তির অস্তিত্ব যদি এই চিহ্নদ্বারা ধরা যায় তবে তাহা নিশ্চয়ই বিজ্ঞানবিরুদ্ধ হইবে না।

এক্ষণে বারেন্দ্র-কুলপঞ্জিকানুসারে আমরা এই প্রদ্যুম্নকে প্রদ্যুম্নশূর বলিয়া ধরিতে পারি। ইনিই বরেন্দ্রদেশে রাজত্ব স্থাপন করিয়াছিলেন। ইঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতার নাম বরেন্দ্রশূর এবং পুত্রের নাম অনুশূর।

তিব্বতদেশীয় পর্য্যটক লামা তারানাথের (ইনি বাঙ্গালী) ইতিহাস এক্ষণে বিজ্ঞানসম্মত প্রমাণ স্বরূপে গ্রাহ্য হইয়াছে। ইহাতে ১৮ জন পাল-রাজার নাম আছে, তন্মধ্যে বাণপাল একজন। আইন আকবরীতে ১০ জন পালরাজার নাম আছে, তাহাতে বাণপাল নাম নাই। তাম্রশাসনে আমরা ১৮ জন রাজার নাম পাইয়াছি, তন্মধ্যে "বাণপাল" নাম নাই। তারানাথের মতে বাণপাল পুনর্ভবানদী তীরে দেবকোটে রাজত্ব করিতেন। সুতরাং এই বাণপালই বাণগড়নির্ম্মাতা কাম্বোজান্বয়জ গৌড়পতি তাহাতে সন্দেহ নাই। অসুরগণ শিবের ভক্ত। বাণপালও শিবের ভক্ত ছিলেন, তাই তাঁহার নাম বাণাসুর বলে। ৮৮৮ শক বা ৯৬৬ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে তিনি বঙ্গদেশ জয় করিয়াছিলেন।

পুরাণে লিখিত আছে—"শ্রীকৃষ্ণের পৌত্র, প্রদ্যুম্নের পুত্র অনিরুদ্ধকে স্বপ্নে দেখিয়া বাণরাজকন্যা উষা তৎপ্রতি আসক্ত হইয়াছিলেন। সখী চিত্রলেখা অনেক সুন্দর পুরুষের চিত্র অঙ্কিত করিয়া দেখাইল। তন্মধ্যে অনিরুদ্ধের চিত্র দেখিয়া উষা তাঁহাকে চিনিতে পারিলেন। চিত্রলেখা যেরূপেই হউক, গোপনে অনিরুদ্ধকে আনিয়া দিলেন। অনিরুদ্ধ উষার সঙ্গে অন্তঃপুরে গোপনে বাস করিতেছে শুনিয়া বাণরাজা তাঁহাকে কারা-বদ্ধ করিলেন। কৃষ্ণ, বলরাম, প্রদ্যুম্ন প্রভৃতি বাণপুরীতে আসিয়া তাঁহার সহিত যুদ্ধকরতঃ অনিরুদ্ধকে উদ্ধার করিলেন। উষার সহিত তাঁহার বিবাহ হইল।"

লোকে এই বাণগড়কেই সেই বাণরাজার পুরী বলে। কেহ কেহ আসামের অন্তর্গত তেজপুরকেও বাণপুরী বলেন। বরেন্দ্রদেশের এই বাণগড় যে সে বাণপুরী নহে, তাহা নিশ্চয়।

রাজেন্দ্র চোলের শিলালিপিতে রণশূরের নাম আছে। ১০২০ খৃষ্টাব্দে রাজেন্দ্র চোলের নিকট রণশূর পরাজিত হইয়াছিলেন। সুতরাং ১০২০—৬৬=৫৪ বৎসর পূর্ব্বে যে রণশূরের পিতা বা রণশূর রাজত্ব করিতেন তাহাতে সন্দেহ নাই। সুতরাং রণশূরের ভ্রাতা প্রদ্যুম্নশূর যে সে সময় ছিলেন এবং তিনি যে বাণরাজার সমসাময়িক তাহাতেও সন্দেহ হইতে পারে না।

প্রদ্যুম্নশূরের পুত্র অনুশূরের প্রকৃত নাম অনিরুদ্ধশূর। প্রদ্যুম্নশূর, অনিরুদ্ধশূর এবং বাণরাজার নাম একসঙ্গে এক সময়ে দেখিয়া স্পষ্টই বুঝা যায় যে, এই সময় উষাহরণ পালার পুনরভিনয় উত্তরবরেন্দ্রে হইয়াছিল। অনিরুদ্ধ হয়ত উষার সৌন্দর্য্য-বৃত্তান্ত লোকমুখে শুনিয়া বাণরাজপুরীতে আসিয়াছিলেন। উষা তাঁহাকে দেখিয়া সখির সাহায্যে অন্তঃপুরে লইয়া গিয়া গোপনে রাখিয়াছিলেন। উষার পিতা বাণ এই ঘটনা অবগত

হইয়া অনিরুদ্ধকে কারাবদ্ধ করেন। প্রত্যুম্নশূর এই সংবাদ পাইয়া সৈন্য-সামন্তসহ পুত্রকে উদ্ধারার্থ বরেন্দ্রদেশে আগমন করেন। প্রত্যুম্নশূরের কনিষ্ঠ ভ্রাতা এই যুদ্ধে সেনাপতি ছিলেন। তাঁহার বাহুবলে বাণরাজা পরাজিত হইয়াছিলেন এবং উষার সহিত অনিরুদ্ধের বিবাহ হইয়াছিল। প্রত্যুম্নশূর যুদ্ধের পরে জ্যেষ্ঠভ্রাতার অস্তিত্ব হেতু দেশে না গিয়া দক্ষিণ-বরেন্দ্র অধিকারকরতঃ তথায় রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন। প্রত্যুম্ন-শূরের কনিষ্ঠ ভ্রাতা এই উপলক্ষে বরেন্দ্রশূব নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন।

শ্রীবিনোদবিহারী রায়।

দিনাজপুরের কতিপয় ঐতিহাসিক স্থানের বিবরণ।

বর্ত্তমান জেলা দিনাজপুর পূবাকালেব অপেক্ষা এখন অনেক খর্ব্বাকৃতি হইয়াছে। ইংরেজ-শাসনের প্রথমাবস্থায় ও মোসলমান রাজত্বের সময় সমগ্র আধুনিক মালদহ জেলা এই দিনাজপুরের সামিল ছিল। পালরাজ-গণের উন্নতির চরম সীমার সময় দিনাজপুরের আয়তন কত বৃহৎ ছিল তাহা জানিবার কোনও উপায় নাই। সেনরাজগণের তাম্রশাসনে যে পৌণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্তির উল্লেখ পাওয়া যায় তাহার সীমা সমগ্র রাজসাহী বিভাগ ও ঢাকা জেলার কতকাংশ ইহার অন্তর্গত ছিল বলিয়া বুঝিতে পারা যায়। পালরাজগণের রাজধানী কোথায় ছিল, তাহার বা কি নাম ছিল, সে কথার উত্তর আজ পর্য্যন্ত ইতিহাস দিতে সমর্থ হন নাই। সেন-

রাজগণ যে গৌড়ে প্রথম রাজধানী স্থাপন করিয়া কীর্ত্তিকলাপে সমগ্র আর্য্যসমাজে গৌড়ের নাম ও গৌরব প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, ঐতিহাসিকগণ একথা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করেন। রাজা আদিশূর এই ভূমিতে রাজত্ব করিয়া বৌদ্ধপ্লাবিত হিন্দুধর্ম্ম রক্ষা করিবার জন্য পাঁচজন বেদপারগ ব্রাহ্মণ ও পাঁচজন কায়স্থ কান্যকুব্জ হইতে আনয়ন করিয়াছিলেন বলিয়া এতদ্দেশীয় ব্রাহ্মণকায়স্থগণের কুলপঞ্জিকায় লিখিত আছে এবং ব্রাহ্মণগণের মুখে মুখে আবহমানকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। ব্রাহ্মণগণ "গৌড়ে" আগমন করিয়াছিলেন। তাঁহারা সুরসরিৎবিধোত মনোজ্ঞ গৌড়ে আসিয়াছিলেন বলিয়া কুলপঞ্জিকাকারগণ লিখিয়া গিয়াছেন। এই গৌড় একটি দেশ বা নগর, সে কথা কেহই বলেন নাই। বৃহৎ সংহিতাকার জ্যোতিষ কার্য্যসৌকর্য্যার্থে ভারতবর্ষকে যে কয়েকটি ভাগে বা দেশে বিভক্ত করিয়াছেন, তাহার মধ্যে "গৌড়" একটি। তিনি "গৌড়" অর্থে একজাতীয় লোক ধরিয়া তাহাদের অধ্যুষিত দেশের নাম গৌড় বলিয়াছেন। পালরাজগণ আপনাদিগকে "গৌড়েশ্বর" বলিয়া অভিহিত করিতেন। পরবর্ত্তী সেনরাজগণের উপাধিও কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তনের সহিত গৌড়েশ্বরই ছিল। অধ্যাপক ব্লক্‌ম্যান সাহেবের মত মোসলমানেরা লক্ষৌতি নামে যে প্রদেশ অধিকার করেন তাহাই বৃহৎসংহিতার "গোড়"। কুলপঞ্জিকাকারগণ "বসুকর্ম্মাঙ্গিকে শকে গৌড়ে বিপ্রাঃ সমাগতাঃ" বলিয়া বঙ্গে ব্রাহ্মণাগমনের কাল নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তাহা হইলে ধরিতে হইবে ৬৬৮ শকে অর্থাৎ ৭৪৬ খৃষ্টাব্দে রাজা আদিশূর গৌড়ে রাজত্ব করিতেছিলেন। পালবংশের প্রতিষ্ঠাতা ভূপাল বা গোপাল সমগ্র প্রজাশক্তির দ্বারা মনোনীত হইয়া রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র ধর্ম্মপালের সময় হইতে পালরাজশক্তি দিগ্বিজয়াদি করিয়া রাজ্য বৃদ্ধি করিতে আরম্ভ করে। রাজা ধর্ম্মপাল ধর্ম্মযুদ্ধে বিধর্ম্মীর হস্তে

নিহত হন বলিয়া তাম্রশাসনে জানা যায়। কুলপঞ্জিকাকারগণ আদিশূর কি ভাবে রাজা হন, তাহার আভাসও ব্রাহ্মণ-আগমনের সঙ্গে সঙ্গে এই ভাবে দিয়াছেন।—

তত্রাদিশূরং শূরবংশসিংহঃ বিজিত্বা বৌদ্ধং নৃপালবংশং।
সশাস গৌড়ং দিতিজান্ বিজিত যথা ইন্দ্রস্ত্রিদিবান্ সশাস॥

ইহা হইতে বোধ বা অনুমান হয় যে, আদিশূর বৌদ্ধরাজা ধর্ম্মপালকে পরাজয় করিয়া গৌড়ে শূরবংশের সিংহাসন স্থাপন করিয়াছিলেন। আজও লোকে গঙ্গারামপুর থানার নিকটে একটি বৃহৎ জঙ্গল দেখাইয়া বলিয়া থাকে এখানে আদিশূরের বাড়ী ছিল। মালদহ জেলার মধ্যেও এই প্রকার জনপ্রবাদে আর একটি স্থানও পাওয়া যায়। আদিশূরের কোনও তাম্রশাসন পাওয়া যায় নাই। কোনও সমসাময়িক কবিও তাঁহার কাব্যে আদিশূরের কোনও কথা লিখিয়া যান নাই ইত্যাদি বৈজ্ঞানিকভাবে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া ঐতিহাসিকগণ আদিশূরের অস্তিত্ব উড়াইয়া দিয়া ঠাকুর মার রূপকথা বলিয়া প্রমাণ করিতেছেন। আমরা কুলপঞ্জিকা অনুসন্ধান করিয়া আরও দেখিয়াছি, আদিশূর আনীত পঞ্চব্রাহ্মণের মধ্যে ভট্ট-নারায়ণের পুত্র "আদিগাঁঞি ওঝা রাজা ধর্ম্মপালের নিকট হইতে ধামসার" গ্রাম শাসন প্রাপ্ত হন। সেইজন্য ব্রাহ্মণগণ তাঁহাকে আদিগাঁঞি বলিয়া অভিহিত করেন। তাঁহার পূর্ব্বে কোনও ব্রাহ্মণ আর শাসন গ্রহণ করিয়াছিলেন না। আদিশূর ও ধর্ম্মপাল সমসাময়িক রাজা ছিলেন। আজ পর্য্যন্ত ঐতিহাসিকগণ পালরাজগণের সময় একবাক্যে স্থির করিতে পারেন নাই। তবে সকলেই বলেন রাজা ধর্ম্মপাল ৭১৫—৭৪৫ খৃষ্টাব্দের মধ্যে রাজত্ব করিতেছিলেন। ঐতিহাসিকগণের এই সময়ের সহিত কুল-পঞ্জিকারগণের কোনও বিরোধ দেখা যায় না। প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় কায়স্থ-পত্রিকায় নানা যুক্তি ও প্রমাণ দ্বারা

পৌণ্ড্রবর্দ্ধনরাজ জয়ন্তকেই আদিশূর বলিয়া স্থির করিয়াছেন। কোনও কোনও ঐতিহাসিক, চৈনিক ভ্রমণকারী হৌয়েন্‌সঙ্গ তাঁহার উত্তরবঙ্গ ভ্রমণবৃত্তান্তে রাজমহল বা কঙ্কজল হইতে পৌণ্ড্রবর্দ্ধন পর্য্যন্ত ভূভাগে কোনও রাজার নাম না করায়, অনুমান করেন যে, এ প্রদেশে সে সময়ে কোনও রাজা ছিল না। কামরূপরাজকুমার ভাস্করবর্ম্মা একমাত্র রাজা ছিলেন। কুলপঞ্জিকায় সপ্তজন শূররাজের নাম পাওয়া যায়। এই বংশের শেষ রাজা রণশূর রাজা রাজেন্দ্রচোলের তিরুমলয়গিরিলিপি হইতে জানা যায় রাঢ়-দেশের রাজা রণশূরকে তিনি পরাজয় করেন। ঐতিহাসিকগণ রাজেন্দ্র চোলের এই বঙ্গদেশ আক্রমণকাল ১০১২-১৩ খৃষ্টাব্দ স্থির করিয়াছেন। দাক্ষিণাত্য হইতে এই সময় সেনরাজগণের আদিপুরুষ বীরসেন বঙ্গে আগমন করিয়া উত্তরবঙ্গে আপনার আধিপত্য স্থাপন করিয়া সেনরাজ-গণের রাজত্বের সূচনা করেন। শূররাজগণ এই সময় হইতে আপনাদের আধিপত্য হইতে বিচ্যুত হইয়াছিলেন। উদীয়মান পাল ও সেনরাজশক্তির নিকট পরাজিত হইয়া শূররাজগণ রাজলক্ষ্মীভ্রষ্ট হইয়া ঝাড়খণ্ডের জঙ্গলে বিলয়প্রাপ্ত হইয়াছেন।

দিনাজপুরের প্রাচীন কীর্ত্তি অনেক আছে। তন্মধ্যে বাণনগর পৌরাণিক স্মৃতিবিজড়িত। প্রবাদ এই যে, এখানে বাণরাজার বাড়ী ছিল। কেহ কেহ এই কথার প্রতিবাদ করিয়া বলিয়া থাকেন, বাণরাজার বাড়ী "শোণিতপুরে" ছিল। শোণিতপুর আধুনিক তেজপুরের নাম। তেজ-পুর আসাম প্রদেশে। উষা অনিরুদ্ধের নাম হিন্দুর নিকট পরিচিত। উষাদেবী বাণরাজার কন্যা। অনিরুদ্ধ শ্রীকৃষ্ণের পৌত্র। বাণরাজার অমতে উষাদেবী অনিরুদ্ধকে বিবাহ করেন। উষাদেবীর গৃহে অনিরুদ্ধকে পাইয়া বাণরাজা বন্দী করেন। দেবর্ষি নারদ এই সংবাদ দ্বারকায় শ্রীকৃষ্ণকে দেন। শ্রীকৃষ্ণ উষা ও অনিরুদ্ধকে দ্বারকায় পাঠাইয়া দেওয়ার

জন্য অনুরোধ করেন। বাণাসুর সে কথায় কর্ণপাত করে না। ফলে উভয়পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধ বাধিয়া যায়। বাণরাজা শৈব ছিলেন। তাঁহার সাহায্যকল্পে সদাশিব স্বয়ং সমরে অবতীর্ণ হন। মহাদেব "শিব-জ্বরের" সৃষ্টি করিয়া কৃষ্ণ সৈন্যের মধ্যে মহামারী উপস্থিত করেন। শ্রীকৃষ্ণও কালাজ্বরের সৃষ্টি করিয়া শিবরক্ষিত বাণসৈন্যের ধ্বংস সাধন করিতে প্রবৃত্ত হন। এই ভাবে যুদ্ধ চলিয়া বাণ রাজার পরাজয় হয়। শ্রীকৃষ্ণ উষা ও অনিরুদ্ধকে লইয়া স্বদেশে প্রস্থান করেন। ইহাই ত্রেতাযুগের বিষ্ণু-পুরাণের কাহিনী। ইহার মধ্যে আমরা কালাজ্বরের উৎপত্তি কথা পাই-তেছি। এই জ্বর এক সময়ে সমগ্র উত্তরবঙ্গের ধ্বংস সাধন করিয়া এখন আসামে সংহার মূর্ত্তি ধরিয়া বিরাজমান আছে।

যে গ্রামে বাণনগর বা গড় অবস্থিত, তাহা রাজীবপুর মৌজার অন্ত-র্গত। দিনাজপুর হইতে গঙ্গারামপুর থানাভিমুখে একটি রাস্তা গিয়াছে। এই রাস্তা ধরিয়া ১৫ মাইল দক্ষিণ দিকে যাইলে "বাণরাজার বাড়ী" পাওয়া যায়। শিবখাড়ী নামে একটি ক্ষুদ্র নালা এখান হইতে পুনর্ভবা নদীর সহিত মিলিত আছে। প্রাকৃতিক দৃশ্যের বিচার করিলে এই নালাটিকে পুনর্ভবা নদীর পুরাতন খাদ বলিয়া বিশ্বাস হয়। এই নালার উপর কাষ্ঠ-নির্ম্মিত সেতু আছে। এই কাষ্ঠ-সেতুর বাম পার্শ্বে একটি মন্দির দেখিতে পাওয়া যায়। মন্দিরটি বিরূপাক্ষশিবের নামে অভিহিত। জনশ্রুতিতে জানিতে পারা যায় যে, রাজা রামনাথ এই মন্দির প্রতিষ্ঠিত করিয়া এখানে শিবস্থাপন করেন। মন্দিরে এখন আর শিবলিঙ্গ নাই। কেবলমাত্র গৌরীপাঠ থাকায় বুঝিতে পারা যায়, লিঙ্গের উপরিভাগ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। কি প্রকারে এই লিঙ্গটি ভাঙ্গিয়া গেল তাহা কেহ বলিতে পারে না। এই মন্দিরের সেবাকার্য্যের জন্য দিনাজপুররাজ তিন শত টাকা বার্ষিক আয়ের নিষ্কর ভূমি দান করিয়াছেন। এখানে বুকানন (Buchanann) প্রস্তর-

নির্ম্মিত বৃষাদি পাইয়া দিনাজপুরে প্রেরণ করেন। তাহা অদ্যাবধি রঙ্গপুর কালেক্টরীর প্রাঙ্গণে অনাদৃতাবস্থায় পড়িয়া আছে। এই মন্দিরের পশ্চাতে কিছু দূরে মোসলমানদিগের একটি দরগা আছে : দরগার চিহ্নমাত্র এখন কেবল দেখিতে পাওয়া যায়। এই দরগার কিছু পশ্চাতে মুলশাহের দরগা। এই দরগার দক্ষিণে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দুইটি পুকুর আছে। নাম "অমৃতকুণ্ড" ও "লবণ কুণ্ড"। এই সমস্ত দেখিয়া অনুমান হয় এখানে হিন্দু দেব-দেবীর মন্দির ছিল। মোসলমান বিজয়ের পর হিন্দু মন্দির ভগ্ন হইয়া তাহার স্থানে মোসলমান দরগা বা মসজেদ নির্ম্মাণ হইয়াছিল। ধর্ম্মপ্রাণ দিনাজপুররাজ বহু শতাব্দীর পর আবার ধর্ম্মের উন্নতিকল্পে এই স্থানে বিরূপাক্ষের মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দিয়া অতীত গৌরবের স্মৃতি রক্ষা করিয়াছেন।

একটি বড় পুকুরের ধারে বহুস্থান ব্যাপিয়া একটি জঙ্গলাকীর্ণ স্তূপ আছে এই স্তূপ বহু অট্টালিকার ধ্বংসাবশেষ বলিয়া বোধ হয়। লোকে এই বিশাল অরণ্যানীসঙ্কুল স্তূপ দেখাইয়া বলিয়া থাকে এইখানে বাণরাজার বাড়ী ছিল। ইহার চতুর্দ্দিকে আজও পরিখা-চিহ্ন বিদ্যমান আছে। উত্তর-দিকে যে পরিখা বা গড়খাই আছে তাহাতে এখনও জল থাকে। পুনর্ভবা নদীর পূর্ব্বতীরে এই রাজবাড়ী অবস্থিত। নদীর পশ্চিমতীরে রাজবাড়ী তুল্য উচ্চ অপর একটি স্তূপ আছে। লোকে এই ধ্বংসাবশিষ্ট মৃত্তিকাবৃত ইষ্টকরাশি দেখাইয়া বলিয়া থাকে, ইহাই উষাদেবীর বাড়ী। উষা দেবীর বাড়ীর কিছু দূরে নারায়ণপুর গ্রাম। এই গ্রামেও আর একটি ধ্বংসাবশিষ্ট বাড়ীর চিহ্ন আছে। এই বাড়ীর চারিদিকের দেওয়াল আজও দাঁড়াইয়া থাকিয়া অতীতের সাক্ষ্য দিতেছে। ইষ্টারণ ইণ্ডিয়া নামক গ্রন্থের দ্বিতীয় ভাগে বুকানন বলিয়াছেন যে, এই দালানের গঠন-প্রণালী সুলতান গিয়াস-উদ্দীনের কবরের মত। ইহার প্রস্তর আদি বাণ নগরের ধ্বংসাবশেষ

হইতে আনীত বলিয়া অনুমান হয়। এই বাড়ীর নিকটেই পীর বাহাউদ্দীনের আস্তানা। পীরের আস্তানার ছাদ নাই। পীর সাহেবের "আস্তানা" নারায়ণপুরের অট্টালিকার মাল-মসলা দিয়া প্রস্তুত হইয়াছিল।

বাণ নগরের গড়ের মধ্যে বহুকাল হইল একখানি তাম্রশাসন পাওয়া গিয়াছে। তাম্রশাসনখানি অনেক দিন পর্য্যন্ত একজন জমিদারের নিকট ছিল। শিক্ষা বিভাগের ৺গিরিধারী বসু মহাশয় ইহার একটি ছাপ লইয়া আসিয়াটিক সোসাইটীতে পাঠাইয়া দেন। আসিয়াটিক সোসাইটীর পত্রিকায় তাহা প্রকাশিত হইয়াছিল। তাম্রশাসনখানিতে বিগ্রহপালের পুত্র প্রথম মহীপাল দেব গঙ্গাস্নান করিয়া ব্রাহ্মণকে ভূমি দান করিয়াছেন। এই তাম্রশাসনখানিতে বিলাসপুর জয়স্কন্ধাবার হইতে পৌণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্তির অন্তঃপাতী ভূমি দান করা হইয়াছে।

বাণ রাজার গড় হইতে দিনাজপুর রাজবাড়ীতে একটি পাথরের স্তম্ভ লইয়া যাওয়া হইয়াছে। রাজবাড়ীর বহিরঙ্গনের বাগানের মধ্যে স্তম্ভটি প্রোথিত আছে। স্তম্ভটির গাত্রে খোদিত লিপি আছে। কাম্বোজবংশীয় কোন নরপতি শিব-মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া স্তম্ভগাত্রে সেই কথা লিখিয়া রাখিয়াছেন। এই নরপতি আপনার নাম গোপন রাখিয়া "গৌড়পতি" বলিয়া আত্মপরিচয় মাত্র দিয়াছেন। গন্ধর্ব্বগণ যে বংশের যশো-গৌরব গান করিয়া থাকে, যিনি অরিন্দম, যাঁহার নিকট অর্থী ... গণও বিফল মনোরথ হয় না, সেই রাজা বিশ্ব-সৌন্দর্য্য এই মন্দির ৮৮৮ সংবতে নির্ম্মাণ করিয়া দেবাদিদেব মহাদেবের নামে উৎসর্গ করিয়া আত্মবংশের ও নিজের গুণানুকীর্ত্তন করিয়াছেন। "কুঞ্জরঘটা বর্ষেণ" বলিয়া সময় দেওয়া আছে। কুঞ্জর অর্থে দিগ্‌হস্তী অর্থাৎ ৮, আর ঘট অর্থে তিন ধরিয়া পণ্ডিতগণ ৮৮৮ ধরিয়া লইয়াছেন। সংবৎ খৃষ্টাব্দের ৫৭ বৎসর পূর্ব্বে মহারাজ বিক্রমাদিত্য কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। এই হিসাবানুযায়ী ৮৩১ খৃষ্টাব্দে কাম্বোজাধিপ

এই গৌড়পতি বর্ত্তমান ছিলেন। মহামতি ওয়েষ্ট মেকটের মতে কাম্বোজ দেশ আধুনিক গাজনী প্রদেশের উত্তরে অবস্থিত। গাজনী আফগানিস্থানের একটি প্রদেশ। দেবপাল দেবের এক তাম্রশাসন হইতে জানিতে পারা যায় যে, তিনি কাম্বোজদেশ জয় করিয়াছিলেন। সেকালে কাম্বোজদেশীয় অশ্বের বড় খ্যাতি ছিল। রামায়ণ-পাঠে অবগত হওয়া যায়, রাজা দশরথের কাম্বোজ দেশীয় অনেক অশ্ব ছিল। কাম্বোজ দেশ পুরাণ প্রসিদ্ধ। এই দেশ হইতে পালরাজগণ কি বঙ্গদেশে আসিয়া আপন আধিপত্য স্থাপন করিয়াছিলেন? ইতিহাস আজ এ কথার উত্তর দিতে অসমর্থ। আধুনিক ঐতিহাসিকের মধ্যে কেহ কেহ বলেন এই কাম্বোজান্বয় দ্বারা বঙ্গে মাহিষ্য-আধিপত্য সূচিত হইয়াছে। মাহিষ্য নরপতির নাম আজ পর্যান্ত একটিও আমরা উত্তরবঙ্গে খুঁজিয়া পাই নাই। ক্ষত্রিয় পিতা বৈশ্যা মাতার সন্তান মাহিষ্য জাতি বলিয়া অভিহিত। আধুনিক কৈবর্ত্ত জাতি লোক-গণনায় বা আদম-সুমারীতে "মাহিষ্য" বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিলেন এবং তাহারা এখন আপনাদিগকে মাহিষ্য বলিয়াই পরিচয় দিয়া থাকেন। মহাভারত পাঠে জানা যায় যে, ধৃতরাষ্ট্রাত্মজ বৈশ্যাপুত্র যুযুৎসু পাণ্ডবগণের মহাপ্রস্থানের পর পরীক্ষিতের রক্ষক ও রাজ্যপালক হইয়াছিলেন কিন্তু কোথায়ও তাহাকে মাহিষ্য বলিয়া মহাভারতকার উল্লেখ করেন নাই। মহামতি হাণ্টার সাহেব (W. W. Hu) তমলুকের কৈবর্ত্ত-নরপতি সম্বন্ধে নিম্নলিখিত মত প্রকটিত করিয়াছেন ;—

"The earliest Kings of Tamlook belonged to the peacock dynasty, and were Kshatriya by caste. The last of this line died childless ; At his death the throne was usurped by a powerful aboriginal chief named Katu Bhuiya who was the founder of the line of kaibartas or "Fisher Kings" of Tamlook. Kaibarta

kings are originally considered to be descendants of the aboriginal Bhuiyas......the present kaibarta Raja is the 25th in descent from the founder [Imperial Gazeteer of India Vol IX, page 425.]

এই প্রছন্ন কাম্বোজরাজ অনার্য্যসম্ভূত বলিয়া কি আপনার নাম গোপন রাখিয়াছেন অথবা বৌদ্ধ নরপতি কোনও পালরাজা শিব মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া আপন ধর্ম্মমতের বিরোধী বলিয়া আপন নাম প্রকাশ করেন নাই। এ প্রশ্নের মীমাংসা এখন হওয়া সুকঠিন।

বাণ নগরের অতি নিকটে মোসলমান সুলতানগণের আদি রাজধানী দেবকোট অবস্থিত। দেবকোট গঙ্গারামপুর থানা হইতেও বেশী দূরে নহে। দেবকোট বলিয়া এখন আর কোনও গ্রাম নাই। প্রাচীন কীর্ত্তির স্মৃতি এখন দেবকোট পরগণার নামে জড়িত আছে। বঙ্গবিজেতা বকতিয়ার খিলিজি দেবকোটে রাজধানী স্থাপন করিয়া বসবাস করিয়াছিলেন। এখান হইতে আলিমেচের প্রদর্শিত পথে বিপুল বাহিনী লইয়া মহম্মদ বকতিয়ার খিলিজি কামরূপ বিজয়-উদ্দেশ্যে বহির্গত হইয়াছিলেন। কামরূপ বিজয়ে হতাশ হইয়া মহম্মদ বকতিয়ার খিলিজি অশেষ দুর্গতি ভোগ করিয়া দেব-কোটে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। এখানে বকতিয়ার যখন রোগশয্যায় ম্রিয়মাণ, সেই সময়ে আলিমর্দ্দন খিলিজীর শাণিত তরবারীর আঘাতে তাঁহার জীবনের শেষ হয়। মহম্মদ বকতিয়ার খিলিজির প্রতিনিধি শেরাণ মহম্মদ বকতিয়ারের এই হত্যা-ব্যাপারের প্রতিশোধ লইয়া আলিমর্দ্দন খিলিজীকে হত করেন। শেরাণ বঙ্গের সুলতান হইয়া আপনার স্বাধীনতা প্রচার করেন। সুলতান আলতামাস তখন দিল্লীশ্বর। শেরাণকে দমন করিবার জন্য তিনি হিসামউদ্দীনকে প্রেরণ করেন। হিসামউদ্দীন শেরাণকে পরাজয় করিয়া আপন আধিপত্য বঙ্গে প্রতিষ্ঠিত করেন। শেরাণ এই সংঘর্ষে নিহত

হইয়াছিলেন। হিসামউদ্দীন বঙ্গে প্রতিষ্ঠিত হইয়া আপনার স্বাধীনতা প্রচার করেন। তিনি সুলতান গিয়াসউদ্দীন নাম গ্রহণ করিয়া স্বীয় নামে "দেব-কোট" হইতে মুদ্রা প্রচার করেন। সুলতান গিয়াসউদ্দীনের মুদ্রার পূর্ব্বে বঙ্গে আর কোনও মুদ্রা টাঁকশাল হইতে বাহির হয় নাই। সুতরাং "দেব-কোট"ই বাঙ্গালার প্রথম টাঁকশাল বলিতে হইবে।

দেবকোটে সর্ব্ব প্রথম মোসলমান মসজেদ নির্ম্মিত হইয়াছিল। এখান-কার ধ্বংসাবশেষগুলি বিশেষ করিয়া পর্য্যবেক্ষণ করিলে স্পষ্ট প্রতীতি হয়, রাজধানা প্রতিষ্ঠিত হইলে যে ভাবে নগর স্থাপন করিতে হয়, তাহার কিছুরই অভাব ছিল না। ওয়েষ্টমেকট সাহেব বাহাদুর এখান হইতে নিম্নলিখিত প্রস্তর-লিপিগুলি সংগ্রহ করিয়াছিলেন :—

১।	সুলতান কৈকুশ শাহের	সময়ের	একখানা	৬৯৭ হি:
২।	" সেকন্দর শাহের	"	"	৭৬৫ হি:
৩।	" মুজাফর শাহের	"	"	৮৯৬ হি:
৪।	" হোশেন শাহের	"	"	৯১৮ হি:

কালীকান্ত রায় নামক একজন শিক্ষা-বিভাগের কর্ম্মচারী মৌলানা আতার কবর হইতে এক খানি প্রস্তর-লিপি লইয়া যান। সেখানির আর আজ পর্য্যন্ত সন্ধান হয় নাই।

দেবকোটের নিকটেই দমদমা গ্রাম। দমদমা পুনর্ভবা নদীর তীরে। মোসলমান-বিজয়ের পর এখানে একটি দুর্গ নির্ম্মিত হইয়া সেনা-নিবাস স্থাপিত হইয়াছিল। দমদমা বাণগড় হইতে অতি নিকটে অবস্থিত। এখানকার দুর্গাদির ধ্বংসাবশেষ দেখিলে প্রতীতি হয়, মোসলমান সেনা-নিবাস অতি দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া এখানে ছিল। দমদমায় সেনাপতি জাফর খাঁ সুলতান কৈকুশের সময় ১২৯৭ খৃষ্টাব্দে একটি মসজেদ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।

দেওতলা গ্রাম—দিনাজপুর-মালদহ রাস্তার ধারে অবস্থিত। দেবকোট বা বাণনগর হইতে বড় বেশী দূরে নহে। এখানে একটি পুরাতন মসজেদ-গাত্রে বাবা আদম শাহের নামাঙ্কিত সুলতান বাবরক শাহের রাজত্ব-কালের ৮৬৫ হিঃ সনের এক প্রস্তর-লিপি আছে। এখানকার প্রকৃত নাম "দেবস্থল"। এখানে বহু হিন্দু-মন্দিরাদি ও দেবমূর্ত্তি ছিল। মন্দির-গুলি বিজয়ী মোসলমান কর্ত্তৃক বিলুপ্ত হইয়া মসজেদ-আকারে পরিণত হইয়াছিল। দেবমূর্ত্তিগুলি আসনভ্রষ্ট ও অঙ্গাদির বিকার প্রাপ্ত হইয়া লোক-চক্ষুর অন্তরালে গিয়াছে। এই স্থান এক বিষ্ণু-মন্দিরের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। অনেক প্রত্নতত্ত্ববিদের বর্ণনায় বিষ্ণু-মূর্ত্তির সম্বন্ধে অনেক কথা জানিতে পারা যায়। হিন্দুধর্ম্মের অতীত গৌরব হৃদয়ে ধরিয়া জঙ্গলাকীর্ণ হইয়া দিনাজপুর-মালদহের অর্দ্ধ-পথে সরকারী রাস্তার ধারে পড়িয়া আছে। দেবকোট, দমদমা, দেবস্থল, বাণগড়েরই ভিন্ন ভিন্নাংশের নাম মাত্র। বাণগড়েই রাজধানী স্থাপন করিয়া মোসলমান সুলতান বা শাসনকর্ত্তাগণ শাসনদণ্ড পরিচালনা করিয়াছিলেন। এমন অবস্থায় বোধ হয়, সে সময়েও বাণগড়ের সমৃদ্ধি ছিল এবং দুর্গ-প্রাকারাদি সুদৃঢ় অবস্থায় থাকায় নবাগত বিজয়িগণও আত্মরক্ষার উৎকৃষ্ট স্থান বিবেচনায় এইখানে থাকিয়া ভিন্ন ভিন্ন স্থানে আপতিত হইয়া রাজ্য বৃদ্ধি করিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। পুনর্ভবা নদীর বাম তীরে বাণগড় দুই মাইল ভূমি জুড়িয়া পতিত আছে। দিনাজপুর হইতে মালদহ পর্য্যন্ত যে পথ গিয়াছে, তাহার ১৬ মাইল হইতে আরম্ভ হইয়া ১৮ মাইল পর্য্যন্ত পথ ব্যাপিয়া বাণগড়ের ধ্বংসাবশেষ জঙ্গলে পরিণত হইয়া আছে। সুলতান গিয়াসউদ্দীন এখানে ১২০৮ হইতে ১২২৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। গিয়াসউদ্দীন এখান হইতে গৌড় পর্য্যন্ত একটি শাহী পথ এরূপভাবে নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন যে, বর্ষার সময় বন্যার জলপ্লাবন হইতে দেশরক্ষার প্রকৃষ্ট উপায় বা "সেতু-

বন্ধ” হইয়াছিল। ঐতিহাসিকগণ মুক্তকণ্ঠে গিয়াসউদ্দীনের এই কার্য্যের প্রশংসা করিয়াছেন। দেবকোটের ধ্বংসাবশেষের বর্ত্তমান আয়তন প্রায় অর্দ্ধ মাইল হইবে। দেবকোটের উত্তরের দুর্গ-প্রাকারাদির পশ্চিমে একটি মস্‌জেদের ধ্বংসাবশেষ আছে। এই মস্‌জেদ নির্ম্মাতার নাম প্রবাদে সা বোখারী বলিয়া জানা যায়। একটি পুরাতন দেব-মন্দির ভঙ্গ করিয়া তাহার উপর এই মসজেদ নির্ম্মিত হইয়াছে। পুনর্ভবা নদীর অপর তীরে বাহাউদ্দীন পীরের দরগা আছে। ১৭ মাইল স্তম্ভ হইতে একটি রাস্তা দুইটি বিশাল দার্ঘিকা পর্য্যন্ত গিয়াছে। দীঘি দুইটির নাম কালাদীঘি ও ধলদীঘি। কালাদীঘি এক মাইল দীর্ঘে ও প্রস্থে পোয়া মাইল হইবে। কথিত আছে কালা রাণী নামে বাণবাজার এক রাণী ছিলেন। তিনি এই দীঘি খনন করাইয়াছিলেন বলিয়া আজও লোকে কালা-দীঘি বলিয়া থাকে। দীর্ঘ-প্রস্থে দীঘি দুইটিই সমান হইবে। দমদমা হইতে এই দীঘিদ্বয়ের দূরত্ব এক মাইল হইবে। “ধল” দীঘির পাহাড়ের উপর পবিত্রাত্মা মৌলানা আতার মসজেদ আছে। মৌলানা আতার সময় নিরূপণ করা কঠিন। তবে এই মাত্র বলা যাইতে পারে যে, এই সাধুপুরুষ সুলতান সেকন্দার শাহের সময়ে জীবিত ছিলেন। সেকন্দার শাহের এক-খানা প্রস্তর-লিপিতে জানিতে পারা যায় যে, মৌলানা আতা মসজেদ আরম্ভ করিয়া সুসম্পন্ন করিতে পারেন নাই। সুলতান সেকন্দার শাহ ১৩৬৮ খৃষ্টাব্দে মস্‌জেদটি সমাপ্ত করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ এই মসজেদটি মৌলানা আতার সমাধি-মন্দির। এই মসজেদের অপর পার্শ্বে একটি কবর আজও দেখিতে পাওয়া যায়। এই মসজেদের দেওয়াল প্রস্থে চারি হাত হইবে। মসজেদের মধ্যের দেওয়াল-গাত্রে হাতী ঘোড়ার চিত্র খোদিত আছে। এখান হইতে তিন মাইল দক্ষিণে গঙ্গারামপুর গ্রাম। এখানেই পূর্ব্বে গঙ্গারামপুর থানা ছিল।

পত্নীতলা এখন একটি পুলিশের থানা। পুরাকালে ইহার আশে-পাশে নানা সমৃদ্ধিশালী গ্রাম ছিল। বৌদ্ধ পালরাজগণের পুরাতন কীর্ত্তি এখানে অনুসন্ধান করিলে যথেষ্ট পাওয়া যায়। বর্ত্তমান পুলিশ-ষ্টেসনের নিকট দিনাজপুরের ম্যাজিষ্ট্রেট ওয়েষ্টমেকট সাহেব বাহাদুর একটি প্রস্তরনির্ম্মিত বৌদ্ধ-চৈত্য প্রাপ্ত হইয়া দিনাজপুর সদরে আনয়ন করিয়াছিলেন। তাহার পর আর সে চৈত্যটির কোনও সন্ধান পাওয়া যাইতেছে না। প্রাচীন কীর্ত্তির স্মৃতি-চিহ্নগুলি এই প্রকারে অপসারিত হইয়া ঐতিহাসিক চিহ্নগুলি ক্রমশঃ বিলুপ্ত হইতেছে।

এই থানার অন্তর্গত "বাদাল" গ্রামে ইষ্ট-ইণ্ডিয়া-কোম্পানীর একটি বাণিজ্য-কুঠি ছিল। এই কুঠিগুলির সেকালের নাম ছিল "আড়ঙ্গ" বা আড়ং। এখনও লোকে যেখানে বহু লোকের সমাবেশ হয় অথবা খরিদ-বিক্রয়ের জন্য বহু জিনিষপত্রের আমদানী হইয়া থাকে, তাহাকে মেলা বা আড়ং বলিয়া থাকে। ১৭৪৪ খৃষ্টাব্দে ইষ্ট-ইণ্ডিয়া-কোম্পানীর আড়ঙ্গে যে সকল টাকা-কড়ি পাঠানর হিসাব-পত্র দেখা যায়, তাহাতে বাদালের কুঠিতে একবার আড়াই লক্ষ টাকা পাঠানর কথা লেখা আছে (Vide Long's selection page 240).। বাদাল সে সময়ে রেশমের কারবার জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। এখন যেমন বাদালে যাইতে হইলে বড়ই বিপদে পড়িতে হয়, সে সময় আত্রাই ও যমুনা নদী দিয়া নৌকাপথে যাতায়াত ও বাণিজ্যাদির সুবিধা ছিল। এখানে ঐতিহাসিক ও ভাষাবিদ্ উইলকিন্স সাহেব ফ্যাক্টার বা সিবিলিয়ানরূপে বহুদিন কুঠীর অধ্যক্ষ ছিলেন। তাঁহার অবস্থিতির সময়ে বাদাল একটি নগর ছিল। এখন জঙ্গলাকীর্ণ হইয়া ভগ্ন স্তূপরাশিরূপে পতিত আছে। উইলকিন্স সাহেব মঙ্গলবাড়ীর হাটের নিকট একটি বিলের ধারে রামগুরব মিশ্রের গরুড়-স্তম্ভলিপি আবিষ্কার করিয়া আসিয়াটিক্ সোসাইটির পত্রিকায়

প্রথমভাগে প্রকাশ করেন। উইলকিন্স সাহেব যখন স্তম্ভটি দেখিতে পাইয়াছিলেন, সে সময়ে স্তম্ভটির উপরিভাগ হইতে তক্ষকনাগসহ গরুড়-মূর্ত্তি ভাঙ্গিয়া পড়িয়া স্তম্ভটি একটা মৃত নারিকেল বৃক্ষের মত দাঁড়াইয়া-ছিল। রামগুরব মিশ্র নারায়ণপালের প্রধান অমাত্য ছিলেন। শাণ্ডিল্য-বংশসম্ভূত ভট্টগুরব মিশ্র এই স্তম্ভের গাত্রে ২৮টি সংস্কৃত শ্লোকে আত্ম-বংশের গুণকীর্ত্তনপ্রসঙ্গে পালরাজ ধর্ম্মপাল, দেবপাল, সুরপাল ও নারায়ণপাল দেবের নানা চরিত্র-কথা প্রকটিত করিয়া গিয়াছেন। এই গরুড়-স্তম্ভের দক্ষিণে একটা বড় জঙ্গল আছে। লোকে এই জঙ্গলমধ্যে "দেওয়ান বাড়ী" ছিল বলিয়া প্রকাশ করে। স্তম্ভের অতি নিকটে এক মন্দির মধ্যে হরগৌরীর প্রতিমা আছে। হরগৌরী "শাম্ভবী কায়া" ভিন্ন আর কিছুই নহে। এই শ্রীমূর্ত্তির এখনও সেবা-পূজা হইয়া থাকে। পূজার ভোগের বরাদ্দ মাত্র সোয়া সের চাউল। একজন মোসলমান এই সেবা-পূজার অধ্যক্ষ। স্তম্ভের নিকট দেওয়ান-বাড়ী থাকায় আমাদের বিশ্বাস এখানে রামগুরব মিশ্রের ভদ্রাসন বাড়ী ছিল। এই দেওয়ান বাড়ীর জঙ্গলের মধ্যে দীর্ঘিকা, পুষ্করিণী ও পুরাতন অট্টালিকার ধ্বংসাবশেষ এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। মন্ত্রী কথার প্রচলিত শব্দ দেওয়ান, আধুনিক "মেনেজার" শব্দবাচক। মন্ত্রীর বাড়ীই দেওয়ান-বাড়ী হইয়াছে বলিয়া আমাদের অনুমান। দেওয়ান-বাড়ীর আরও কিছু দূরে দক্ষিণ দিকে "ধুবইলের মাঠ"। এই প্রান্তর মধ্যে বহু সরোবর ও ভগ্নাবশেষ দেবমন্দির বর্ত্তমান আছে। ধুবইল অতিক্রম করিলে একটি গ্রাম পাওয়া যায়। সে গ্রামের নাম শিবপুর। এই শিবপুর গ্রামের মধ্যে একটি পিপুল বৃক্ষের মূলে গজারূঢ়া দশভূজা মূর্ত্তি আছেন। আমরা সিংহবাহিনী দশভূজা মূর্ত্তিই দেখিয়াছি। গজারূঢ়া দশভূজা-মূর্ত্তি এখানে এই নূতন দেখিয়াছিলাম। দশভূজা-মূর্ত্তির নিকটেই

জঙ্গলে কারুকার্য্যসমন্বিত একখানা সূর্য্যমূর্ত্তি পতিত আছে। প্রতি বৎসর বাসন্তী পূজার সময় শিবপুরে এই গজারূঢ়া দশভুজার পূজা উপলক্ষে একটি মেলা বসিয়া থাকে। মেলার জন্যই শিবপুর এখন জনসমাজে পরিচিত।

যমুনা নদীর তীরে রামগুরব মিশ্রের গরুড়-স্তম্ভের চারি ক্রোশ দক্ষিণ-পশ্চিমে বৌদ্ধধর্ম্মের স্মৃতি-স্তম্ভস্বরূপ যোগীভবন অবস্থিত। রেভেনিউ-সারভের মানচিত্রে যোগীস্তম্ভ বলিয়া লেখা আছে। ইহার নিকটে আত্রাই নদীর পুরাতন খাদ ঘুকশা বিলের ধারে প্রাচীনকালে যে একটি সমৃদ্ধিশালী জনপদ বিদ্যমান ছিল তাহার চিহ্ন আছে। আত্রাই নদীর কুক্ষিগত হওয়া আরম্ভ হইলে লোকে বোধ হয় এই স্থান ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছে। এই যোগীস্তম্ভে একটি প্রবাদ আছে যে, সুরঙ্গ পথে এই ভবন বগুড়া জেলার যোগীভবনের সঙ্গে সংযুক্ত আছে। যোগী-ভবন এখন "কাণ-ফাঁড়া" যোগী জাতির অধিকারে। ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে যেমন পৈতা না হইলে এক পংক্তিতে ভোজন করিতে পারে না, এই যুগীদের মধ্যেও "কাণ-ফাঁড়া" না হইলে পংক্তি-ভোজনে অধিকার হয় না। যোগী-স্তম্ভটি ৪ হাত দীর্ঘ-প্রস্থে হইবে। স্তম্ভের মধ্যে অর্দ্ধলুপ্ত একটি শিবলিঙ্গ আছে। এরূপ লিঙ্গ সচরাচর কোথায়ও দেখিতে পাওয়া যায় না। ব্রহ্মলিঙ্গমূর্ত্তি পঞ্চমুখ কিন্তু এখানে চতুর্ম্মুখ আছে। মন্দিরের প্রবেশ-দ্বারে উভয়দিকে বেদির উপর তুলসী ও ত্রিশূল আছে। মন্দিরের বাহিরে একখানা বিষ্ণুমূর্ত্তি পড়িয়া আছে। অর্দ্ধশায়িতাবস্থায় পাষাণ-নির্ম্মিত রমণীমূর্ত্তির পার্শ্বে একটি শিশু খেলা করিতেছে। মূর্ত্তিটি ভগ্ন। এই প্রকার একটি মূর্ত্তি আমরা বগুড়া কশবায় দেখিয়াছিলাম। এখানে যমুনাদেবীর একটি মন্দির আছে। মন্দিরটি একটি ভগ্ন স্তূপের উপর নির্ম্মিত। এই ভগ্ন স্তূপের নাম দেবপালরাজার "সমাধি ভবন"।

লোকে এই স্থানকে দেবপাল রাজার রাজধানী বলিয়া থাকে। বৈশাখ মাসের শুক্লপক্ষে এই স্থানে দেবপাল রাজার নামে পূজা হইয়া থাকে।

যোগীভবনের যোগীরা অতিথিপরায়ণ। দেবসম্পত্তি অতি সামান্য মাত্র। যোগীদের মুখে জানা যায় যে, এই গুম্ফমধ্যে গোরক্ষনাথ তপস্যা করিয়া সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। তাহারা বলে স্তম্ভের মধ্যে তাঁহার আসনস্থান বর্ত্তমান আছে। সিদ্ধ গোরক্ষনাথের শিষ্য বলিয়া যোগীগণ দাবী করিয়া থাকেন। এই যোগীগণ সাধারণে "যুগী" বলিয়া অভিহিত। যমুনাদেবীকে স্থানীয় লোকে বিমলাদেবী বলিয়া থাকে। এই দেবী দেবপাল রাজার কন্যা। তাঁহার দেবত্বপ্রাপ্তির কোনও প্রবাদ আমরা সংগ্রহ করিতে পারি নাই। বিমলাদেবীর যথাবিমত পূজার্চ্চনা হইয়া থাকে।

যোগী গুম্ফের দুই ক্রোশ দক্ষিণে একটি প্রাচীন জনপদের ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। এই গ্রামের নাম "অমরী" বা "আমাই"। গ্রামখানি পূর্ব্ব-পশ্চিমে একমাইল দীর্ঘ হইবে। গ্রামে বড় পুরাতন পুষ্করিণী আছে। এখানে কারুকার্য্যখচিত বহুপ্রকার ইষ্টক ও ভগ্ন দেবমূর্ত্তি এখানে-ওখানে পড়িয়া আছে। স্থানীয় লোকদিগকে জিজ্ঞাসাবাদে কোনও প্রকার প্রবাদবাক্য প্রচলিত থাকা জানিতে পারা যায় নাই।

বৃন্দাবন গ্রাম—অমরীর এক ক্রোশ উত্তর-পশ্চিমে। এই গ্রামও অতি প্রাচীন। এখানে একটি পিপুল গাছের তলায় অনেকগুলি ভগ্ন দেবমূর্ত্তি ও কারুকার্য্যখচিত ইষ্টকাদি স্তূপাকারে পড়িয়া আছে। এই ভগ্নমূর্ত্তিরাশি আলোড়িত করিয়া আমরা একখানা নাতিদীর্ঘ নাতিহ্রস্ব প্রস্তর-ফলকে আটটি স্ত্রীমূর্ত্তি খোদিত দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়াছিলাম। নিকটে একজন বৃদ্ধ দাঁড়াইয়া আমাদের কার্য্যকলাপ দেখিতে-

ছিলেন। আমরা মূর্ত্তিখানি কি জিজ্ঞাসায় আমাদিগকে বৃদ্ধ বলিলেন, "অষ্টসখীর মূর্ত্তি" এই বৃন্দাবন গ্রামে পূজা হইত বলিয়া গ্রামের নাম বৃন্দাবন। দুরন্ত কালাপাহাড়ের আক্রমণে যে সকল দেবমূর্ত্তি অস্পৃশ্য হইয়াছিল, তাহাই এখানে স্তূপাকারে পড়িয়া আছে।" আমরা "বৃন্দাবনের" সম্বন্ধে আর কোন ও জনপ্রবাদ জানিতে পারি নাই।

কাদীপুর গ্রামের নিকট শিবতলা নামে এক স্থান আছে। এখানে একটি বিরাট পিপুল গাছের শিকড়ের সহিত দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ হইয়া একখানা বিষ্ণুমূর্ত্তি আছে। মূর্ত্তিখানি প্রায় সোয়া দুই হাত উচ্চ হইবে। পাদদেশে দেবনাগরঅক্ষরে কি লেখা আছে। আমরা তাহার শেষ দুইটি কথা মাত্র পাঠ করিতে পারিয়াছিলাম "মাধবায় নমঃ নমঃ।" এই গ্রামে চৈত্র মাসের শুক্লা-দশমীর দিন প্রতিবৎসর একটি মেলা বসিয়া থাকে।

আত্রাইনদীর তীরে "ঘাটনগর" নামে একটি পুরাতন গ্রাম আছে। ঘাটনগর পত্নীতলা থানা হইতে দক্ষিণ-পশ্চিম ছয় ক্রোশ দূরে হইবে। প্রাচীন কীর্ত্তির ধ্বংসাবশেষ এখানে যথেষ্ট আছে। এখন কেবল কারুকার্য্যসমন্বিত ইষ্টকাদি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্তাবস্থায় পড়িয়া আছে দেখা যায়। এখানে একটি মোসলমানসমাধি-মন্দির আছে। সমাধিব ছাদ নাই, কেবল প্রাচীরমাত্র অতি জীর্ণাবস্থায় খাড়া আছে। মন্দিরের মালমসল্লা পুরাতন হিন্দু-মন্দির হইতে সংগৃহীত বলিয়া বোধ হয়। প্রাচীন মোসল-মানদিগকে জিজ্ঞাসা করায় তাহারা বলে যে, এইটি শেরাণের "কবর"। ইতিহাসপ্রসিদ্ধ বকতিয়ার খিলিজীর সেনাপতি "শেরাণ" কি এইস্থানে সমাধিপ্রাপ্ত হইয়া জগতের শেষ দিনের জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। ইতিহাস পাঠে অবগত হওয়া যায়, শেরাণের কবর উত্তরবঙ্গে আছে, কিন্তু দুঃখের বিষয় আজ পর্য্যন্ত তাহার স্থান নির্ণয় হইল না। এই সমাধির

নিকটে ছোট বড় অনেকগুলি পুষ্করিণী আছে। সেগুলি উত্তর-দক্ষিণে লম্বা বলিয়া হিন্দু-কীর্ত্তির নিদর্শন নিঃসন্দেহে ঠিক করিতে পারা যায়। শেরাণের সমাধির দক্ষিণ একক্রোশ দূরে একটি জমিদারী কাছারী আছে। কাছারী ঘরের দেওয়ালের সহিত একখণ্ড দীর্ঘ প্রস্তরে তিনটি দেবমূর্ত্তি উৎকীর্ণ আছে। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও সূর্য্য বলিয়া প্রতীতি জন্মে। প্রাচীনকালে হিন্দু ত্রিমূর্ত্তি ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও সূর্য্য ছিলেন। দেবাদিদেব মহাদেব জোর করিয়া সূর্য্যকে তাড়াইয়া দিয়া তাঁহার স্থানে আপনি অধিষ্ঠান হইয়াছেন। কাছারীতে রজনীযোগে বিদেশী অপরিচিত ভদ্রলোকের স্থান হয় না। অতিথি-সৎকার তো অতি দূরের কথা। ঘাটনগর এই স্থানের নাম কেন যে হইল, অনেক অনুসন্ধানে আমরা জানিতে পারি নাই।

রেণেলের মানচিত্রের ১১৯ পৃষ্ঠায় দেখিতে পাওয়া যায়, ঘাটনগরের ৪ ক্রোশ উত্তর "দীবার" গ্রাম। এই গ্রামে একটি বড় দীঘি আছে। ব্লকম্যান সাহেব তাঁহার বিবরণে লিখিয়াছেন—ধীবর নামে কোনও এক রাজা সহস্র বৎসর পূর্ব্বে এই দীঘিকা খোদিত করিয়াছিলেন, দেবপালের নামই ধীবর হইয়াছে কিনা বলা যায় না। এই দীঘির মধ্যে একটি স্তম্ভ আছে। জল হইতে স্তম্ভটি আটহস্ত উচ্চ হইবে। দীঘিকার জলও সাত হাত হইবে। ধরিতে গেলে মোট ১৫ হাত স্তম্ভটি দীর্ঘ হইবে। স্তম্ভটির গাত্রে কোনও খোদিতলিপি নাই। জলের ভিতর পাদদেশে আছে কিনা বলা যায় না। আজ পর্য্যন্ত কেহই স্তম্ভটির মূলদেশ দেখিবার চেষ্টা করেন নাই। পুরাতত্ত্ব-বিদ্‌গণ অনুমান করেন যে, ইহা একটি অশোকস্তম্ভ। দীঘির পাহাড় ও বকচরাদি পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখিলে স্পষ্ট অনুমান হয়, দীঘিটি বেশী দিনের হইলেও অশোকের সময়ের নহে। স্থানীয় লোকেও

এই জল মগ্ন স্তম্ভের সম্বন্ধে কোনও কথা বলিতে পারে না। ক্যানিংহাম ও বুকাননও এই স্তম্ভসম্বন্ধে কোনও মতামত প্রকাশ করিতে পারেন নাই। মনে বড়ই কৌতুহল হয়, এই স্তম্ভের পাদমূলে কি ঐতিহাসিক তত্ত্ব নিহিত আছে? বাঙ্গালার দুর্ভাগ্য এমন একটি ঐতিহাসিক চিহ্নের বিশ্লেষণ করিবার কাহারও আগ্রহ নাই। সামান্য ব্যয়ে একটা জল শোষণ করা এঞ্জিন বা চানাকল বসাইতে পারিলে একার্য্য অতি সহজে সুসম্পন্ন হইতে পারে।

মহীপাল দীঘি দিনাজপুর হইতে ১৫ মাইল দূরে মালদহ-দিনাজপুর পথের নিকট অবস্থিত। পালরাজ মহীপাল এই দীঘি খনন করাইয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার নামে দীঘির নাম হইয়াছে। প্রবাদ যে ব্রহ্মহত্যা পাপ হইতে উদ্ধার প্রাপ্তির মানসে পালরাজ এই সাগরতুল্য জলাশয় খনন করান। মহীপাল দীঘির সন্নিকটেই মহীপুর ও মহীগ্রাম নামে দুইটি গ্রামের অস্তিত্ব থাকিয়া আজও মহীপালের নাম অতীতের বিস্মৃতি হইতে রক্ষা করিতেছে। যে পরগণার মধ্যে মহীপাল দীঘি অবস্থিত, তাহার নাম "মহীনগর"। সম্ভবতঃ এই মহীনগরই রাজা মহীপালের রাজধানী ছিল।

মহীপাল দীঘির সন্নিকটে টমাস্ নামে একজন ইংরেজ বণিক একটি বাণিজ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন। মালদহের ইষ্ট-ইণ্ডিয়া-কোম্পানীর কুঠীর অধ্যক্ষ জর্জ উডনী টমাসকে ১৭৯৩ সনে নীলের কারবারের জন্য এখানে প্রেরণ করেন। টমাস সাহেব চিকিৎসাব্যবসায়ী ও খৃষ্ট-ধর্ম্ম-প্রচারক ছিলেন। এখানে থাকিয়া তিনি ধর্ম্ম-প্রচারকের কার্য্য ও রোগীদিগকে নীরোগ করিবার চেষ্টাই করিয়াছেন। টমাস সাহেবের নীলকুঠির ধ্বংসাবশেষ এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। ফারনেনডেস বলিয়া একজন পর্টুগিজ বণিক এই অঞ্চলে ছিলেন। তিনি

কেরী ও টমাস সাহেবের প্রচার-কার্য্যে সর্ব্ব প্রকার সাহায্য করিতেন। এখানে জনপ্রবাদে জানিতে পারা যায় যে, পালরাজ মহীপালের স্থিরপাল ও বসন্তপাল নামে দুইটি পুত্র ছিল। বৌদ্ধ-বাবাণসী জগৎসিংহের স্তূপের মধ্যে প্রাপ্ত খোদিত লিপি হইতে জানিতে পাবা যায় যে, মহারাজ মহীপাল আটটি পবিত্র স্থানের ধ্বংসাবশেষ হইতে প্রস্তর সংগ্রহ করিয়া এই গন্ধ কুঠী নির্ম্মাণ করেন। এই কার্য্য ১০৮৩ সংবতে ১১ পৌষ বসন্তপালের অনুজ স্থিরপাল কর্ত্তৃক শেষ হইয়াছিল।

"কৃতবন্তৌ চ নবীনাং অষ্ট মহাস্থান শৈলগন্ধকুটীং।
এতাঃ শ্রীস্থিরপাল বসন্তপালানুজং শ্রীমান্॥"

এই লিপি হইতে স্পষ্ট প্রমাণ হইতেছে, বসন্তপাল ও স্থিরপাল ১০৮৩ সংবতে বর্ত্তমান ছিলেন। পালরাজগণেব বংশাবলী আজ পর্য্যন্ত যতদূর লিখিত হইয়াছে, তাহাতে বসন্তপাল ও স্থিরপালেব নাম মহীপালের পুত্র বলিয়া স্থান পায় নাই।

মহীপাল দীঘির দুই ক্রোশ পূর্ব্বভাগে আমগাছী গ্রাম। পরগণা সুলতানপুরের মধ্যে আমগাছী মৌজা। ১৮০৬ খৃঃ আমগাছীব একটি স্তূপেব নিকটে একজন কৃষকের হল-তাড়নায় একখানা তাম্রশাসন আবিষ্কার হয়। শাসনখানি বিগ্রহপালদেবের। রাজমহিষী মহাভারত শ্রবণ করিয়া পাঠক ব্রাহ্মণকে ভূমিদান করিতেছেন। প্রসঙ্গক্রমে পাল-রাজগণের বংশাবলীও প্রকীর্ত্তিত হইয়াছে।

দিনাজপুর হইতে ৩৬ মাইল দক্ষিণে যাইলে আতাপুর গ্রাম পাওয়া যায়; এই গ্রাম মৌলানা "আতার" নামে হইয়াছে বলিয়া অনুমান হয়। এখানে জঙ্গলাকীর্ণ বহুদূর ব্যাপিয়া একটি ভগ্ন স্তূপ আছে। লোকে এখানে উষাপালের বাড়ী ছিল বলিয়া দেখাইয়া থাকে। আজ পর্য্যন্ত পাল নরপতিদিগের নামের তালিকার মধ্যে এই উষাপালের

নাম স্থান পায় নাই। শাহ নিমাই ফকীরের সমাধি এখানে বর্ত্তমান আছে। উষাপালের বাড়ী ভাঙ্গিয়া ইষ্টক-প্রস্তরাদি আনিয়া এই ফকির সাহেবের সমাধি-মন্দির প্রস্তুত হইয়াছিল। সমাধি-স্তম্ভের একটির গাত্রে চারিটি ব্যাঘ্রমূর্ত্তি অঙ্কিত আছে।

বাদালাকুঠীর এক ক্রোশ দক্ষিণে বহুস্থান ব্যাপিয়া একটি স্তূপ জঙ্গলাকীর্ণাবস্থায় আছে। লোকে বলে, এখানে চন্দ্রপাল ও মহীপাল রাজার বাড়ী ছিল। চন্দ্রপাল কে? তাহার সম্বন্ধে আজ পর্য্যন্ত কিছু জানিতে পারা যায় নাই। চন্দ্রপাল যে পালবংশীয় কোনও নরপতি ছিলেন তাহারও প্রমাণ নাই। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনেকগুলি স্তূপ আছে, সে গুলির সম্বন্ধে কোনও জনশ্রুতি আমরা অবগত হইতে পারি নাই।

গঙ্গারামপুরের ধলদীঘির মেলা প্রসিদ্ধ। এখানে প্রতি সন মাঘ মাসে একটি মেলা বসে। পুরাতন কাগজ পত্রানুসন্ধানে জানা যায়, ১৫১২ খৃষ্টাব্দে মুজাফরাবাদের উজির ও ফিরোজাবাদের কোটাল বাহাদুর কর্ত্তৃক ধল-দীঘির মেলা স্থাপিত হইয়াছিল। ফিরোজাবাদে প্রথম টাঁকশাল স্থাপিত হইয়াছিল। ফিরোজাবাদ আধুনিক পাণ্ডুয়ার নাম। সুলতান তৃতীয় ফিরোজ শাহের আক্রমণের পর এই নগরের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। মুজাফরবাদ আধুনিক সুবর্ণগ্রামের নিকট অবস্থিত ছিল। এখানেও টাঁকশাল ছিল।

পতিরাম থানার অনতিদূরে একটি প্রকাণ্ড দীঘি আছে। লোক-প্রবাদে জানা যায়, এই দীঘি পালবংশীয় নরপতি উষাপাল খনন করাইয়া প্রতিষ্ঠা করেন। প্রতিষ্ঠাকালে বটেশ্বর ভট্ট নামক জনৈক ব্রাহ্মণকে দান করেন। এখন এই দীঘির জল বেশ নির্ম্মল আছে। পার্শ্ববর্ত্তী জনপদের বিশেষ উপকার সাধিত হইতেছে।

গঙ্গারামপুর থানার প্রধান পুরাকীর্ত্তি "তপন দীঘি"। সাধারণ

লোকে এই দীঘিটি সেনরাজ-কীর্ত্তি বলিয়া প্রকাশ করিয়া থাকে। মুরশিদাবাদের সাগর-দীঘি, দিনাজপুরের মহীপাল দীঘি আয়তনে তপন-দীঘি হইতে অনেক ছোট। সংস্কারাভাবে এই বিরাট দীর্ঘিকা জঙ্গলাকীর্ণ হইয়া ক্রমশঃ শুকাইয়া যাইতেছে। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে এখানে অপর একটি পুকুর খননকালে একখানা তাম্রশাসন পাওয়া যায়। তাম্রশাসন খানি সেনরাজ লক্ষ্মণ সেনদেবের প্রদত্ত ভূমিদানপত্র। তাম্রশাসনখানি তপন দীঘির তাম্রশাসন বলিয়া পরিচিত। ইহার পাঠোদ্ধার পণ্ডিতকুলচূড়ামণি ৺মহেশচন্দ্র তর্কচূড়ামণি করেন এবং উকিল ৺গোপালচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় ইহার ইংরাজী তরজমা করিয়া এসিয়াটিক সোসাইটীর পত্রিকায় প্রকাশ করেন। এই তাম্রশাসন পাঠে জানিতে পারা যায় যে, সেনরাজগণ হিন্দু হইলেও বুদ্ধবিহারা দেবতা-নিচয়ের প্রতি ভক্তিহীন ছিলেন না। এই তপন দীঘির শাসনে সেনরাজ লক্ষণ সেন "বিল্লহিষ্টী" গ্রাম ব্রাহ্মণকে দান করেন। এই বিল্লহিষ্টী যে কোথায় তাহার ঠিকানা হয় নাই, তাহার অস্তিত্ব আছে কিনা জানিবার উপায় নাই। গৌড়াগত পঞ্চ ব্রাহ্মণের আদিশূর-প্রদত্ত পঞ্চ গ্রামেরও কোনও অস্তিত্ব আজ কাল নাই। দেশের নাম, গ্রামের নাম, নদ-নদীর নাম প্রাকৃতিক পরিবর্ত্তনে সময়ের শাসনে নবভাবে কোথায়ও গঠিত হইয়াছে, কোথাও বা একবারে বিলুপ্ত হইয়াছে। সুতরাং প্রাচীন কালের কথা এখন বলা বিষম সমস্যার ব্যাপার।

দিনাজপুর ও পূর্ণিয়া জেলার সীমান্তবর্ত্তীস্থানে নাগর নদীর কূলে "তাজপুর" গ্রাম। নাগর নদী বগুড়া জেলার মধ্যে করতোয়ানদীর সঙ্গে সম্মিলিত হইয়াছে। পলাশীর যুদ্ধের পর ইংরেজ-শাসন প্রতিষ্ঠার সময়ে ইষ্ট-ইণ্ডিয়া-কোম্পানী এখানে একটি সুদৃঢ় দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। এখনও দুর্গটির ভগ্নাবশেষ বর্ত্তমান থাকিয়া অতীতের স্মৃতি-

রক্ষা করিতেছে। এখানে কোম্পানীর অনেকগুলি সৈন্য রাজ্যরক্ষা ও উত্তরবঙ্গের জমিদারগণের নিকট কর আদায়ের জন্য অবস্থিতি করিত।

দিনাজপুরের প্রসিদ্ধ মেলা মেকমর্দ্দন রাণীসঙ্কুল থানার অন্তর্গত ভবানীপুর গ্রামে অবস্থিত। ঠাকুর গাঁ মহকুমার অধীন রাণীসঙ্কুল থানা নাগর নদীর তীরে। মেকমর্দ্দনের মত মেলা বাঙ্গালায় আর ছিল না। যে বৎসর বঙ্গদেশে প্লেগ দেখা দিয়াছিল, সেই অবধি মেক-মর্দ্দন মেলা দেশরক্ষার জন্য সরকার বাহাদুর ভাঙ্গিয়া দিয়াছিলেন। এই মেলা চৈত্র মাসের শেষ সপ্তাহে আরম্ভ হইয়া বৈশাখ মাসের ১০।১৫ দিন পর্য্যন্ত থাকিত। ভূটান, নেপাল, পূর্ণিয়া, বারাণসী, পাটনা, ও বঙ্গদেশের সকল জেলা হইতে ব্যবসায়ীগণ নানাবিধ পণ্যদ্রব্য লইয়া এই মেলায় আগমন করিত। হাতী, ঘোড়া ও গবাদি বহুতর পশ্বাদির আমদানী হইত। এই মেলায় ৩০০০ হাজার ঘোড়া, ৩০০০০ ত্রিশহাজার গবাদি বিক্রয় হইত। বহুলক্ষ টাকার জিনিসপত্র বিক্রয় করিয়া মহাজনেরা লাভবান হইতেন। এখানে মেকমর্দ্দন শাহের সমাধি বা দরগা আছে। দরগায় ছিন্নি না দেওয়া পর্য্যন্ত ব্যবসায়ীরা দোকান পাতিতে পারিতেন না।

পার্ব্বতীপুর রেল-ষ্টেসনের উত্তরে পার্ব্বতীপুর বন্দরের নিকট পার্ব্বতীর "পাঠ" আছে। প্রবাদ যে, পার্ব্বতী এখানে তপস্যা করিয়া দেবাদিদেব মহাদেবকে স্বামীরূপে প্রাপ্ত হন। পার্ব্বতীপুরের তিন ক্রোশ উত্তরে করতোয়া নদীর ধারে একটি বৃহৎ স্তূপ আছে। মহা-স্থানের শিলাদেবীর ঘাটের ন্যায় নদীবক্ষ হইতে অনেকটা স্থান বাঁধিয়া উঠান আছে। এই বাঁধা স্থানে আজও ইষ্টকনির্ম্মিত সোপানাবলী দেখিতে পাওয়া যায়। প্রবাদ, এখানে "হিরা-জিরা" নামে দুইভগ্নী রাজ-বেশ্যার বাড়ী ছিল। উত্তরবঙ্গের আদি গীতি গোপীচন্দ্র রাজার গীতে

পাওয়া যায় যে, এখানে রাজা গোপীচন্দ্র বেশ্যা হিবার কুহকে আবদ্ধ হইয়া অতি হেয়ভাবে দিনযাপন করিতেছিলেন। পরে তাঁহার গুরু "হাড়াসিদ্ধা" তাঁহাকে এখান হইতে উদ্ধার করিয়া লইয়া যান। রাজা গোপীচন্দ্রের মাতার নাম ময়নাবতী। এই ময়নামতীর সহিত রাজা ধর্ম্মপালের রাজ্য লইয়া বিবাদ হইয়া ঘোরতর সংগ্রাম হইয়াছিল। যুদ্ধ তিস্তা নদীর তীরে সংঘটিত হয়। সেই যুদ্ধে রাজা ধর্ম্মপালের পতন হয়। রাজা ধর্ম্মপালের গড় ও রাণী ময়নামতীর গড় দেওনাই নদীর তীরে রঙ্গপুর জেলার জলঢাকা থানার অন্তর্গত ধর্ম্মপাল ও আটিবাড়ী গ্রামে আজও বর্ত্তমান আছে। রাজা গোপীচন্দ্র বাইশদণ্ডের রাজা অর্থাৎ বাইশদণ্ড কাল মধ্যে যত দূর পথ হাঁটিয়া যাইতে পারা যায়, সেই পরিমাণ ভূখণ্ডের রাজা ছিলেন। পাৰ্ব্বতীপুরের তিন ক্রোশ উত্তর-পূর্ব্বে একটা গড়ের মত প্রায় একক্রোশ ব্যাপিয়া অঙ্গজঙ্গলাবৃত স্থান আছে। এই স্থানকে লোকে কাচকপুর বলে। মহাভারতের বিরাট রাজার শ্যালক কীচকের সহিত এই স্থান সংযুক্ত করিবার মানসে লোকে ইহাকে কাচক রাজার বাড়ী ছিল বলিয়া থাকে। কীচক বলিয়া কোনও রাজা থাকুক বা না থাকুক আমরা "কীচক" নামে এক পরস্ব-লুণ্ঠনকারী দস্যু-জাতির সন্ধান পাইয়াছি। এই জাতি এখন আর রঙ্গপুর-দিনাজপুরের মধ্যে বসবাস করে না। পূর্ণিয়া জেলার মধ্যে এখন কাচকেরা আছে। অল্প দিন হইল, দস্যুতা আদি অপরাধ করার জন্য এই জাতির অধিকাংশ লোক বিচার-আদালত কর্ত্তৃক নির্ব্বাসিত হইয়া দ্বীপান্তরে গিয়াছে। সম্ভবতঃ এই দস্যু-জাতির পূর্ব্ব-বাস এখানে ছিল। ইংরাজ-শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত হইলে এই প্রদেশ হইতে দস্যু-ভয় প্রশমিত হইলে দস্যুগণ এই অঞ্চল ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে। কীচকপুর এখন একবারে জনশূন্য। ইহার এক ক্রোশের মধ্যে লোকের বসবাস নাই। বিশাল

প্রান্তর মধ্যে পূর্ণিয়া, দিনাজপুর, রঙ্গপুর পথ-মধ্যে কীচকগণ নির্ভয়ে বাস করিয়া পথিকের সর্ব্বনাশ করিত। লোকে সন্ধ্যার পর এখানে আসিতে বা থাকিতে বড় ভয় পাইয়া থাকে। একটা পুরাতন পুকুরের পার্শ্বে একটি ভগ্ন মন্দির এখনও বর্ত্তমান আছে। লোকে বলে এখানে কীচকের "কালী" ছিল। কালিকাদেবীর নরবলি দিয়া পূজা হইত। ইতস্ততঃ অনুসন্ধান করিয়া আমরা কীচকের কালিকামূর্ত্তির কোনও সন্ধান পাই নাই। এই কীচকপুর এখন উত্তরবঙ্গ-রেলপথের ধারে পড়িয়াছে। রেল-গাড়ীতে বসিয়া বসিয়া এই স্থান বেশ দেখা যাইতে পারে।

দিনাজপুর জেলার ঘোড়াঘাট একটি প্রাচীন প্রসিদ্ধ স্থান। জনশ্রুতি প্রকাশ করে যে, এখানে বিরাট রাজার অশ্বশালা ছিল। অশ্বগণ করতোয়া নদীর যে ঘাটে জলপান করিত, তাহার নাম ঘোড়াঘাট। ইহার অনতি-দুরে বিরাট রাজার বাড়ী। তাহার ভগ্নাবশেষ এখনও বর্ত্তমান আছে। সে স্থানের নামও "রাজা বিরাট"। বিরাটে বৈশাখ মাস ব্যাপিয়া একটি মেলা বসিয়া থাকে। এখানে করতোয়া নদী রঙ্গপুর, দিনাজপুর জেলার সীমারূপে প্রবাহিত। সুলতান নশরৎ খাঁর সময়ে ঘোড়াঘাট রাজা নীলাম্বরের রাজ্যভুক্ত ছিল। এই নীলাম্বরের রঙ্গপুর জেলার মধ্যে করতোয়া তটে একটি সুদৃঢ় দুর্গ ছিল। দুর্গের নাম ছিল "কাঁটাদুয়ার"। নীলাম্বর আসাম-কামতাপুরের শেষ রাজা। আসামের সীমায় রঙ্গমতীতে মোগল-পাঠান রাজত্বকালে একটি সেনানিবাস ছিল। সেই সেনানিবাস রাঙ্গামাটী হইতে উঠাইয়া আনিয়া ঘোড়াঘাটে স্থাপন করা হয়। দুইটি প্রবল শক্তির এক স্থানে উপস্থিতিতে পরস্পর সংঘর্ষ বাধে। সুলতান মহম্মদ শাহের রাজত্বকালে এই পরিবর্ত্তন হইয়াছিল। শাহ ইশমাইল গাজি যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া ছলনাপূর্ব্বক কাঁটা-দুয়ার দুর্গ অধিকার করেন। কিন্তু শেষ যুদ্ধে বিজয়ী হইয়াও নিজে হত হইয়া সহিদ হইয়াছিলেন। ঘোড়া-

ঘাটের এক পুরাতন জীর্ণ মসজেদের নিকট একখানা শিলালিপি পাওয়া গিয়াছিল। তাহার পাঠ-উদ্ধারে জানা গিয়াছিল যে, মহম্মদ সাহের পুত্র মহম্মদ হোসেন তাহার পুত্র জয়নুদ্দীন ১১৫৩ হিঃ ঘোড়াঘাটের ফৌজদার ছিলেন। তিনি মসজেদ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। ১১৫৩ হিঃ সন বাঙ্গালা ১১৬৩ সালের সমান। পলাশী-যুদ্ধের এক বৎসর পূর্ব্বে অর্থাৎ ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দে জয়নুদ্দীন এই মসজেদ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। মোগল-সাম্রাজ্যের অধিকারে ঘোড়াঘাট একটি সরকার। আইন-ই-আকবরীতে ঘোড়াঘাট সরকারের আয় প্রায় পঁচিশ লক্ষ টাকা নির্দ্দিষ্ট আছে। এই সরকার হইতে অশ্বারোহী ও পদাতিক পঁচিশ হাজার সৈন্য যুদ্ধকালে সরবরাহ করার কথা লেখা যায়। আইন-ই-আকবরী ঘোড়াঘাটের "লটকন্" ফলের বড় প্রশংসা করিয়াছেন। এখনও ঘোড়াঘাটে "লটকন্ পাওয়া যায়। সম্রাট জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে ঘোড়াঘাট হইতে যাবতীয় রাজস্ব-বিভাগ উঠাইয়া ঢাকা বা জাহাঙ্গীরনগরে লইয়া যাওয়া হয়। তদবধি ঘোড়াঘাটের অবনতি আরম্ভ হয়। ইষ্ট-ইণ্ডিয়া-কোম্পানীর রাজত্বের প্রথমাবস্থায় এখানে একজন কালেক্‌টার নিযুক্ত হইতেন। এখন ঘোড়াঘাট একটি প্রাচীন নগরের ধ্বংসাবশেষ মাত্র। বাণিজ্যস্থান বলিয়া উত্তরবঙ্গে এখনও প্রসিদ্ধি আছে। ঘোড়াঘাটের দুই ক্রোশ দক্ষিণে "সুবা মসজেদ" গ্রাম। এখানে একটি দাদির তীরে এক মসজেদ আছে। মসজেদটি যে কতকালের তাহা কেহ বলিতে পারে না। মস্‌-জেদ-গাত্রে কোনও শিলালিপি নাই। এখানে চতুষ্কোণ ৯ নয় হাত দীর্ঘে ও ৫ পাঁচ হাত প্রস্থে এবং এক হাত পুরু বিরাট একখণ্ড পাথর পড়িয়া আছে। কি প্রকারে যে এই প্রস্তর এখানে আসিল তাহা ঠিক করা সুকঠিন। হিলি ও রঙ্গপুরের পথে এই মসজেদ। নিকটে কোনও নদী নাই। দুই ক্রোশ উত্তর-দক্ষিণে করতোয়া ও তুলসীগঙ্গা নামে

নদী আছে। তুলসীগঙ্গা বর্ত্তমানে একটি সামান্য নালায় পরিণত হইয়াছে।

হেমতাবাদ এক্ষণে দিনাজপুর জেলার একটি পুলিশ-আউট-পোষ্ট। আউট-পোষ্টের অনতিদূরে একটি পুরাতন ইষ্টকের পাহাড় আছে। এই পাহাড়তুল্য স্তূপটি দেখাইয়া স্থানীয় লোকে বলে, এখানে রাজা মহেশের রাজধানী ছিল। এই স্তূপের উপর একটি মোসলমান সমাধি-মন্দির আছে। স্থানীয় লোকে বলে যে, এইটি পীর বজরউদ্দীনের কবর। বজরউদ্দীনের কবরের ছাদ ভাঙ্গিয়া পড়িয়া গিয়াছে। দেওয়ালের কতকাংশ এখনও খাড়া আছে। দরজার কপাট এখনও আছে। নানাবিধ হিন্দু-কারুকার্য্য এই কপাটে অঙ্কিত আছে। হিন্দুর ত্রিমূর্ত্তি এখনও দেখিয়া বুঝিতে পারা যায়। সম্ভবতঃ রাজা মহেশ মোসলমানকর্ত্তৃক আক্রান্ত এবং রাজ্য ও প্রাণ হারাইলে তাঁহারই প্রাসাদের উপর পীর-সাহেবের সমাধি-মন্দির গঠিত হইয়াছিল। বজরউদ্দীন সম্ভবতঃ রাজার সহিত সমরে "সহিদ" হইয়াছিলেন। সুলতান হোসেন শাহের রাজত্ব-কাল ইতিহাসে পাঠ করিলে দেখা যায়, তিনি "কামাচল" রাজ্য জয় করিয়াছিলেন। এই কামাচল রাজা মহেশের রাজ্য বলিয়া ঐতিহাসিকগণ অনুমান করেন।

ম্যাজিষ্ট্রেট ওয়েষ্টমেকট সাহেব দিনাজপুর অবস্থিতিকালে হেমতাবাদ হইতে ১২ মাইল দক্ষিণ-পূর্ব্বে একটি পুরাতন সুদৃঢ় দুর্গের ভগ্নাবশেষ বা স্তূপ দেখিয়া অনুমান করেন ইহাই "একডালা দুর্গ।" ঐতিহাসিকগণ আজ পর্য্যন্ত ইতিহাসপ্রসিদ্ধ এই "একডালার" অবস্থিতির কোনও সন্ধান পান নাই। ঐতিহাসিকগণ ওয়েষ্টমেকটের এই আবিষ্কার আজ পর্য্যন্ত কেহ গ্রহণ করেন নাই।

বংশীহারী থানার অন্তর্গত টাঙ্গন নদীর তীরে "মদন-বাটী" নামে

গ্রাম। মদন-বাটীর নাম বাঙ্গালা সাহিত্যে বা ইতিহাসে আজ পর্য্যন্ত স্থান পায় নাই। এখানে পুণ্যাত্মা জর্জ্জ উডনী সাহেবের সাহায্যে খৃষ্ট-ধর্ম্ম-প্রচারক কেরী সাহেব নালের কুঠিয়ালরূপে ব্যাপটিষ্ট-মিশনের কার্য্য আরম্ভ করেন। ক্রমে তাঁহার পশার-প্রতিপত্তি বাড়িয়া গেল। মহামতি কেরী মদনবাটীতে একটি বাঙ্গালা ছাপাখানা স্থাপন করেন। এই ছাপাখানা ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে খোলা হইয়াছিল। ১৭৯৩ খৃঃ বাঙ্গালার চির-স্মরণীয়। এই সনে মহাত্মা কর্ণওয়ালিশ বাঙ্গালায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করেন। দেবীসিংহের অমানুষিক অত্যাচারে অত্যাচারিত হইয়া উত্তর-বঙ্গের সম্মিলিত প্রজাশক্তি ইজারা-প্রথার প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হইয়া রাজদ্রোহ বহ্নিতে ঝাঁপ দিয়া এই সনে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রাপ্ত হইয়াছিল। মহাত্মা কেরী এখানে সর্ব্বপ্রথম বাইবেলের বঙ্গানুবাদ করিয়া মণিলিখিত সুসমাচার বিনামূল্যে বিতরণ করেন এবং সর্ব্বপ্রথম বাঙ্গালা সংবাদপত্র (খৃষ্ট-ধর্ম্ম-সংক্রান্ত) বঙ্গদেশে প্রচারিত হয়। "শ্রীরামপুরদর্পণ" সর্ব্ব-প্রথম বাঙ্গালা সংবাদপত্র নহে। ১৮১৮ সনে শ্রীরামপুরদর্পণ প্রচার হয় এবং ১৭৯৩ সনে কেরী সাহেবের "মদনবাটী" হইতে সংবাদপত্র প্রচারিত হয়। এই কেরী সাহেবই শ্রীরামপুর মিশনরী কেরী সাহেব কি না আমরা তাহা অবধারণ করিতে পারি নাই। তবে এই কথা উত্তর বঙ্গের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ হইবার উপযুক্ত।

পুণ্যাত্মা জর্জ্জ উডনী সাহেব মালদহে কোম্পানীর অধ্যক্ষ ছিলেন। গোলাম হোসেন তাহারই আশ্রয়ে থাকিয়া "রিয়াজ-উস-সালাতিন" প্রণয়ন করিয়া তাহার নাম অমর করিয়া রাখিয়াছেন। যতদিন রিয়াজ-উস-সালাতীনের বঙ্গানুবাদ থাকিবে, ততদিন বাঙ্গালা এই উডনী সাহেবের নাম ভুলিতে পারিবে না। গোলাম হোসেন তাঁহার গ্রন্থরচনায় উডনী সাহেবের যে প্রশংসা করিয়াছেন, তাঁহার কার্য্যকলাপ দেখিলে তাহা ঠিক

হইয়াছে বলিতে হইবে। জর্জ্জ উডনী বঙ্গদেশেই নশ্বর দেহত্যাগ করিয়া অমরধামে চলিয়া গিয়াছেন। বেঙ্গল অবিটুয়ারী (Bengal obituary) নামক গ্রন্থে উডনী সাহেবের নিম্নলিখিত স্মৃতি-চিহ্ন লেখা আছে :—

"This marble is dedicated by the trustees of the Old church to the memory of George Udny. Esqr, late of the Hon'ble Company's Bengal Civil service, and many a year member of this congregation, whose exertions in the cause of religion generally, and in the circulation of Holy scriptures particularly, will have entitled him to this token of grateful remembrance.

He died in Calcutta, October 24, A D 1830 in the 70th year of his age."

গোলাম হোসেন ১২০২ সনে পারস্যভাষায় রিয়াজ-উস-সালাতিন শেষ করেন। বৎসরাঙ্ক দ্বারা গ্রন্থের নাম হইয়াছে। জৈদপুরনিবাসী উপাধি "ছলিম"। ইহা ভিন্ন অপর আর কোনও পরিচয় উত্তরকালের লোকের জন্য রাখিয়া যান নাই। "জৈদপুরী" কথায় ঐতিহাসিকগণ গোলাম হোসেনকে অযোধ্যায় লইয়া গিয়াছেন। গোলাম হোসেন আপন বংশ মর্য্যাদার অনেক কথাই লিখিয়াছেন। কিন্তু তিনি যে বাঙ্গালী নহেন এমন কথা কোথায়ও বলেন নাই। এই জৈদপুর গ্রাম পূর্ব্বে হেমতাবাদ বিভাগে দিনাজপুর জেলার অন্তর্ভুক্ত ছিল। এখন মালদহ জেলার সামিল হইয়াছে। পাণ্ডুয়ার অতি নিকটেই জৈদপুর গ্রাম এখনও বর্ত্তমান আছে। গোলাম হোসেন বিষয়-কর্ম্ম-উপলক্ষে মালদহেই বাস করিতেন। মালদহ সহর মধ্যে চক-কোরবাণ-আলী নামক স্থানে তাঁহার সমাধি কিয়ামতের জন্য নীরবে অপেক্ষা করিতেছে। ১৮১৭ খৃঃ অব্দে গোলাম হোসেন বাঙ্গালী

নামের চিরকলঙ্ক অপনয়ন করিয়া অমর-ধামে চলিয়া গিয়াছেন। "রিয়াজ-উস-সালাতিনের" অনুকরণে ষ্টুয়ার্ট সাহেব তাঁহার বাঙ্গালার ইতিহাস লিখিয়া অক্ষয় কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। এখন আমরা বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে কোনও কথা উঠিলে ষ্টুয়ার্ট সাহেবের দোহাই দিয়া থাকি। কিন্তু গোলাম হোসেনের কথা একবারও বলি না। রিয়াজ-উস্-সালাতিন বাঙ্গালা ১৩১২ সনে ময়মনসিংহ-টাঙ্গাইল হইতে শ্রীযুক্ত রামপ্রাণ গুপ্ত মহাশয় ঐতিহাসিক উত্তর-বঙ্গের গৌরব পূজনীয় শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয়ের সম্পাদকতায় শেষ করিয়া যশস্বী হইয়াছেন।

চিহিল কাজির কবর গোপালগঞ্জ গ্রামের মধ্যে অবস্থিত। দিনাজপুর হইতে দারজিলিং অভিমুখে যে পথ গিয়াছে, সেই পথে চারি মাইল মাত্র যাইলেই চিহিল কাজির কবর দেখিতে পাওয়া যায়। রাস্তার পশ্চিম পার্শ্বে সামান্য দূরে হাঁটিয়া গেলেই সমগ্র সমাধি-মন্দিরটি দেখিতে পাওয়া যায়। এই পীরের সমাধি-মন্দির ৩৭ হাত দীর্ঘে হইবে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, পীর সাহেবের শরীরের দীর্ঘতানুসারেই সমাধি গঠিত হইয়াছিল। এই সমাধি-মন্দিরে একখানা প্রস্তর-লিপি আছে। বারুরের ফৌজদার পীর সাহেবের এই সমাধি-মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন। বারুর একটি পরগণার নাম। দিনাজপুর ও পূর্ণিয়ার সীমা জুড়িয়া এই পরগণা এখন পূর্ণিয়ার জেলার সামিল আছে। সুলতান বারবক শাহের রাজত্ব-কালে এই সমাধি-মন্দির ৮৬৫ হিজিরী সনে নির্ম্মিত হইয়াছিল। সমাধি-মন্দিরের গাত্রলিপি আজ পর্য্যন্ত কেহ পাঠ করিতে পারেন নাই। বুকানন হ্যামিল্টন প্রস্তর-লিপির ছাপ লইয়াছিলেন বলিয়া মার্টিনের ইষ্টার্ণ ইণ্ডিয়াতে লিখিত আছে। গোপালগঞ্জের হিন্দু দেব-দেবীর মন্দির ভগ্ন করিয়া পীর সাহেবের সমাধি-মন্দির প্রস্তুত হইয়াছিল। পীর সাহেবের কবরের দক্ষিণদিকের পথের পার্শ্বে ভগ্ন শিবলিঙ্গের গৌরী-

পাঠ আজও সংলগ্ন আছে। গোপালগঞ্জের শিবমন্দিরের প্রস্তর আদি ভাঙ্গিয়া আনিয়া ছাঁটিয়া ছুঁটিয়া মসজেদে লাগান হইয়াছে, তাহা খিলানের অবস্থা বিশেষ করিয়া পর্য্যবেক্ষণ করিলেই যে কেহ বুঝিতে পারিবেন। পীর সাহেবদের দরগা বা মসজেদ যেখানে যেখানে প্রসিদ্ধ হিন্দু দেব-মন্দির ছিল, সেইখানেই হিন্দুধর্ম্মের চিহ্নগুলি বিলুপ্ত করিয়া ইসলাম-ধর্ম্মের পতাকাস্বরূপ মসজেদ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। গোপালগঞ্জে যে কোন্ কোন্ দেব-দেবীর মন্দির ছিল তাহা স্তূপের ইষ্টক ও প্রস্তররাশি দেখিয়া স্থির করা সুকঠিন ব্যাপার। পীর সাহেবের কবরখানার একজন মাতোয়ালী আছেন। তাঁহাকে জিজ্ঞাসাবাদে কোনও কথা জানিতে পারা যায় নাই। অজ্ঞতাবশতঃই হউক আর ইচ্ছা করিয়াই হউক মাতোয়ালী আমাদিগকে কোনও কথা বলেন নাই। মসজেদের আয় বা কত, ব্যয়ই বা কি ওয়াক্‌ফের বিধানই বা কি আমরা অনেক চেষ্টায় কিছু জানিতে পারি নাই। গোপালগঞ্জ দিনাজপুর সহরের অতি নিকটে অবস্থিত হইলেও সহরের বড় কেহ এখানে আসেন না। গোপালগঞ্জ এখন অতীতের অন্ধকারে ডুবিয়া আছে।

গছাহার একটি ক্ষুদ্র গ্রাম। দিনাজপুর জেলায় অবস্থিত হইলেও ইহার অবস্থিতি রঙ্গপুর জেলার সৈদপুর থানার নিকটে। গছাহারে নাটোর-রাজবংশের এক শাখা আসিয়া ভদ্রাসন স্থাপন করেন। রঘু-নন্দনের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র দেবীপ্রসাদ নাটোররাজ সংসারে স্থান না পাইয়া অন্যত্র যাইতে বাধ্য হন। দেবীপ্রসাদের বংশধরগণ "মুস্তফি" আখ্যায় এখন গছাহারে বসবাস করিতেছেন। এখানে দ্বাদশটি শিব মন্দিরবেষ্টিত এক ভবানীর মন্দির আছে। মন্দির-গাত্রে যে, ইষ্টকলিপি আছে, তাহা পাঠে জানিতে পারা যায় যে ১৬৬২ শকে অর্থাৎ ১৭৪০ খৃষ্টাব্দে সপুত্র রামশরণ বক্সী ইষ্টদেব সদাশিবের প্রীতির জন্য এই

মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। মন্দিরটিতে নানাবিধ কারুকার্য্য থাকিলেও সংস্কারাভাবে এখন খসিয়া পড়িতে আরম্ভ করিয়াছে।

কান্তনগর দিনাজপুর রাজার অতুল কীর্ত্তি। পুরাকালে এখানে বিরাটরাজার বাড়ী ছিল। সেই বিরাটরাজের রাজপ্রাসাদের ধ্বংসাবশেষের উপর ৺কান্তজীর মন্দির ঢেঁপ নদীর তটে নির্ম্মিত হইয়াছে। বিরাটদুর্গের ধ্বংসাবশেষ এখনও শ্রীমন্দিরের সন্নিকটে জঙ্গলাকীর্ণ হইয়া আছে। ঢেঁপ নদীর অপর পারে "সনকার হাট"। এখানে পুরাকালে চাঁদ সদাগরের স্ত্রী "সনকা" ক্রয়বিক্রয় করিত। বেহুলার চরিত্র-মাহাত্ম্যে চাঁদ সদাগরের বাড়ী যেখানে সেখানে খুঁজিলে পাওয়া যায়। কান্তজী এখানকার লোকের নিকট প্রত্যক্ষ দেবতা। প্রতি বৎসর ঝুলন সময়ে কান্তজী দিনাজপুর রাজবাড়ী আগমন করেন। সেই উপলক্ষে মেলা হইয়া থাকে। রঙ্গপুর, দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি, কুচবিহার, বগুড়া, রাজসাহী, মালদহ জেলা হইতে বহু লোক কান্তজীকে দেখিতে আগমন করিয়া থাকে। এই সময় রাজবাড়ীতে মহামহোৎসব হইয়া থাকে। কান্তনগরের মন্দির বঙ্গবিশ্রুত। প্রবাদ এই যে, রাজা প্রাণনাথ গঙ্গা-যমুনার সঙ্গমে পবিত্র তীর্থ প্রয়াগে স্বপ্নাদিষ্ট হইয়া কান্তজীর শ্রীবিগ্রহ প্রাপ্ত হইয়া দিনাজপুর আনয়ন করেন এবং দেবাদেশে কান্তনগরে সেই বিগ্রহ স্থাপিত করিয়া সেবা করিতে আরম্ভ করেন। রাজা প্রাণনাথ কান্তজীর মন্দির আরম্ভ করেন কিন্তু মন্দির সমাপ্ত হইবার পূর্ব্বেই তাঁহাকে ইহধাম পরিত্যাগ করিতে হয়। ১৭০৪ খৃষ্টাব্দে মন্দিরগঠন-কার্য্য আরম্ভ হইয়া রাজা রামনাথের রাজত্বকালে ১৭৪০ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মাণ-কার্য্য শেষ হয়। রাজা রামনাথ মন্দির-গাত্রে যে খোদিত লিপি রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা পাঠে ১৩৭৪ শকও বুঝা যাইতে পারে যথা ;—

শাকে কোজি কালক্ষিতি পরিগণিতে
ভূমিপ প্রাণনাথঃ।
প্রাসাদঞ্চেতি রম্যং সুরচিত
নবরত্নাখ্যমস্মিন্নকার্ষীৎ ॥
রুক্মিণ্যাকান্ত তুষ্টে সমুদিত মনসা
রমানাথেন রাজ্ঞা।
দত্ত কান্তায় কান্তস্য তু নিজ নগরে
তাত সংকল্পসিদ্ধৈ ॥

দিনাজপুর নাম কেন হইল, ইহা লইয়া ঐতিহাসিকগণের মধ্যে মত-ভেদ আছে। কেহ বলেন রাজা গণেশের উপপত্নী পুত্র দিনরাজশার নামে দিনাজপুর নাম হইয়াছে। কেহ বলেন, দনৌজা নামে এক রাজা ছিলেন, তাঁহার স্থাপিত রাজধানীর নাম দিনাজপুব। ওয়েষ্টমেকট বলেন, বর্ত্তমান রাজভবন যেখানে আছে, ঐ স্থানের প্রকৃত নাম দিনাজ ছিল। দিনাজ নামে এক ব্যক্তি জঙ্গল পরিস্কার কবিয়া এখানে গ্রাম বসাইলে স্থানের নাম "দিনাজপুর" হইয়াছে। দিল্লীর সিংহাসনে যে সময়ে সম্রাটরূপে সুলতান ইব্রাহিমলোডি সমাসীন, গৌড়ে যখন সুলতান সমসুদ্দীন রাজদণ্ড পরিচালনা করিতেছিলেন, সেই সময়ে রাজা গণেশ নামে এক হিন্দু রাজা দিনাজপুরে স্বাধীনতার ধ্বজা উড়াইয়া স্বাধীন হিন্দুরাজত্ব স্থাপন করেন। গণেশ ও কংস এই দুই নাম লইয়া সুধী-সমাজে গোলযোগ আছে। কেহ বলেন পারস্যভাষার কাফ্ ও গাফ্ দুই অক্ষরে বড় গোলযোগ হইয়া থাকে। সেইজন্য কংস, গন্স হইয়াছে। বঙ্গভাষায়ও গণেশ রাজা বলিয়া আমরা ঈশান নাগরের অদ্বৈত-বাল্য-লীলাসূত্র দেখিতে পাই :—

"নৃসিংহ সন্ততি বলে লোকে যারে গায় ॥

সেই নরসিংহ নারিয়াল বলি খ্যাতি।
সিদ্ধ শ্রোত্রিয়াখ্যা আর ওঝার সন্ততি॥
যাহার মন্ত্রণা বলে শ্রীগণেশ রাজা।
গৌড়ীয় বাদসা মারি গৌড়ে হ'ল রাজা॥

[অদ্বৈত-বাল্যলীলাসূত্র]

রাজা গণেশের মন্ত্রী নরসিংহ নাড়িয়াল ছিলেন। এই নরসিংহ অদ্বৈত মহাপ্রভুর পিতামহ। বারেন্দ্রব্রাহ্মণ-সমাজে এই নরসিংহ এক মহা উৎপাতের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। একদিন কোন সামাজিক নিমন্ত্রণে ব্রাহ্মণগণ নরসিংহের জন্য অপেক্ষা না করিয়া ভোজনে উপবেশন করেন। নরসিংহ ব্রাহ্মণগণকে কারণ জিজ্ঞাসায় তাঁহারা বলেন যে, তিনি সর্ব্বাপেক্ষা অতি নিকৃষ্ট ব্রাহ্মণ। সুতরাং তাঁহাদের নিকট তিনি সম্মানের পাত্র নহেন জন্য কেহই তাঁহার আগমন অপেক্ষা করেন নাই। নরসিংহ এই অপমানে মর্ম্মাহত হইয়া সামাজিক সম্মানের জন্য সে স্থান হইতে প্রস্থান করেন। সেই সময়ে বারেন্দ্রসমাজের শ্রেষ্ঠ কুলীন মধুমৈত্র ছিলেন। নরসিংহ কৌশলে মধুমৈত্রের সহিত আপন দুহিতার বিবাহ দেন। তৎসূত্রে মধুমৈত্রের সহিত তাঁহার পুত্রগণের বিবাদ হইয়া বারেন্দ্র-সমাজে কাপের সৃষ্টি হয়। রাজা কংস "কাপ" কুলীনের এই বিবাদ মীমাংসা করিয়া দেন। তাহেরপুরের রাজা কংসনারায়ণ অষ্টাদশ শতাব্দীর লোক। তাঁহার এক কন্যার সহিত নাটোররাজ কালুকুমারের বিবাহ হইয়াছিল। সুতরাং ঐতিহাসিক হিন্দুরাজা কংস তাহেরপুররাজ কংস-নারায়ণ নহেন। এ সম্বন্ধে Blochmann তাঁহার contribution to the History and Geography of Bengal নামক প্রবন্ধে নিম্নলিখিত মতামত প্রকাশ করিয়াছেন :—

Raja Kans lived just a hundred years before Chai-

tanya. Raja Kans styled Raja of Bhaturia and Raja Gonesh Raja of Dinajpur. But Bhaturia does not include Dinajpur, for perganah Bhaturia lies far to the south of Dinajpur District, in Rajshahye proper, between Amrool and Bogra. But the name Bhaturia is also used in very entensive sense, and signifies northern Rajshahye proper. It thus formed the part of Barendra, whilst Dinajpur with the northern Districts formed the old division of Nivriti. Now the Barendra Brahmans say that their social clasification was made by one Raja Kansnarayan of Tahirpur in Rajshahye, and as Tahirpur belongs to Bhaturia there is just a possibility that the statement of the Barendra Brahmans may give us a clue and help us to identify the historical Raja Kans. Rajshahi only refers to the Raja who was the "Sha". we know however he did not issue coins in his own name. Posthumous coins in the name of Azam Sha, during whose reign Raja Kans rose to influence, and coins in the name of Barid Sha, the latter was issued in the years 812 and 816. A. H."

আইন-ই-আকবরীতে ভাটুরিয়া পরগণার নাম নাই। প্রাচীন কোনও পুঁথি-পাঁজিতে বা মানচিত্রে ভাটুরিয়ার উল্লেখও দেখা যায় না। কেবল মাত্র রেণেল সাহেবের ১৭৭৮ খৃষ্টাব্দের মানচিত্রে ভাটুরিয়া পরগণার অবস্থিতি দৃষ্ট হয়। রেণেল সাহেব ভাটুরিয়ার পশ্চিম সীমা মহানন্দা ও পুনর্ভবা নদী, দক্ষিণ সীমা পদ্মানদী, পূর্ব্বসীমা করতোয়া নদী এবং উত্তর সীমা দিনাজপুর ও ঘোড়াঘাট বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। আত্রাই নদীর উভয় তীরের যাবতীয় প্রদেশগুলি ব্যাপিয়া ভাটুরিয়ার আয়তন ছিল।

তবকত-ই-আকবরী গ্রন্থে রাজা কংসের রাজত্বের উল্লেখ আছে। রাজা কংস সাত বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। রিয়াজ-উস-সালাতিন কংসের নামই করিয়াছেন। মহামতি ওয়েষ্টমেকট রাজা কংস ও গণেশ একই ব্যক্তি বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। সম্ভবতঃ রাজা কংস দিনাজপুরে রাজধানী স্থাপন করায় এই গোলযোগ হইয়াছে।

নিজ দিনাজপুরে তান্ত্রিক বৌদ্ধমতের চিহ্ন এখনও আছে। কালী-তলায় মশান-কালীর মন্দিরে আজও ডোমপণ্ডিত মশান কালার পূজা করিয়া থাকে। এখন এখানকার পুরোহিত জনৈক হাড়িজাতীয় লোক। সাধারণ উপাস্য-দেবতা-মন্দিরের পুরোহিত "হাড়ি" বঙ্গের আর কোনও স্থানে আছে কিনা আমরা অবগত নহি। দিনাজপুরের মহিষমর্দ্দিনীর মন্দির বহুকালের পুরাতন শক্তিমন্দির। এই মন্দির রাজা বৈদ্যনাথের মহিষী সংস্কার করিয়া দিয়াছিলেন। তাহার পর আর এ মন্দিরে রাজ-দৃষ্টি পতিত হয় নাই। অনন্তশায়ী বিষ্ণুমূর্ত্তি, মহিষমর্দ্দিনী মূর্ত্তি ও বাসুকীর মন্দির পূজা হইয়া থাকে। মন্দির-প্রাঙ্গণে মহিষারূঢ় যমের মূর্ত্তি ও বরুণ-দেবের মূর্ত্তি অযত্নে পড়িয়া আছে। মহিষমর্দ্দিনীর পূজার ব্যয়াদি দিনাজ-পুররাজ বহন করিয়া থাকেন।

সম্রাট আকবরশাহের রাজত্বকালে বিষ্ণুদত্ত নামে জনৈক উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থ প্রাদেশিক কাননগো হইয়া আসিয়া দিনাজপুরে বাস করেন। বিষ্ণুদত্তের পর তাঁহার বংশীয় শ্রীমন্ত চৌধুরী সম্রাট সাহজাহানের রাজত্ব-কালে সুজার অনুগ্রহভাজন হইয়া দিনাজপুরের জমিদারী বন্দোবস্ত করিয়া লন। শ্রীমন্তের দৌহিত্রবংশীয়েরাই এখন তাঁহার উত্তরাধিকারী। মুরশীদকুলীর বন্দোবস্তের সময়ে এই বংশের রামনাথ বর্ত্তমান ছিলেন। ৮৯ পরগণায় দিনাজপুর জমিদারী; ৮৯ পরগণা ৪৬২৯৬৪ টাকা রাজস্বে বন্দোবস্ত হয়।

ইদ্রাকপুর বা বর্দ্ধনকুঠীর জমিদারীর সাতআনা অংশ দিনাজপুরের রাজত্বের সামিল হইয়াছে। বারেন্দ্র-কায়স্থ-ঢাকুর গ্রন্থে পাওয়া যায় :—

তৎপরে কহি এক দেব পরিপাটী।
আর্য্যবর মণ্ডল বাস কৈল বর্দ্ধনকুটী॥
তার পাত্র ভগবান করিয়া চাতুরী।
রাজা ভগবান হৈতে নিল জমিদারী॥
যবে মানসিংহ রাজা বাঙ্গলাতে আইল।
নয় আনা সাত আনা ভূমি বণ্টন করিল॥

এই ঢাকুরের বর্ণনানুসারে বুঝিতে পারা যায় যে, বর্দ্ধনকুঠীরাজ ভগবানের পাত্রের (মন্ত্রীর) নাম ভগবান ছিল। এই ভগবান চাতুরী করিয়া ভগবানের যাবতীয় জমিদারী আত্মসাৎ করিয়াছিলেন। রাজা মানসিংহ যে সময়ে বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তা হইয়া আসিয়াছিলেন, সেই সময়ে তিনি নয় আনা ও সাত আনা অংশে উভয় ভগবানের মধ্যে জমিদারী বিভাগ করিয়া দিয়াছিলেন। রঙ্গপুরের কালেক্টার গুড্‌ল্যাড্‌ সাহেব বর্দ্ধনকুঠীর জমিদারের যে ইতিহাস লিখিয়া গবর্ণমেণ্টে পাঠান, তাহাতেও ঢাকুরের কথাই সপ্রমাণ হইয়াছে। দেওয়ান ভগবানের কৃত এক বিষ্ণু-মন্দিরের ইষ্টকলিপির নিম্নলিখিত প্রশস্তি দ্বারায় তাঁহার সময় নিরূপণ করা যাইতে পারা যায়। রামপুর গ্রামে রঙ্গপুর জেলার পলাশবাড়ীর থানার মধ্যে এই বিষ্ণু-মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ আজও বিদ্যমান আছে :—

গুণাক্ষি-শরচন্দ্রেণ যুতে শাকে ভবচ্ছিদে।
ভবাব্ধি ভীতো ভগবান দদৌ শ্রীবিষ্ণবেমঠম্॥

১৫২৩ শকে ভগবান শ্রীবিষ্ণুর এই মঠ নির্ম্মাণ করেন। এই অঙ্ক হইতে আমরা ১৬০১ খৃষ্টাব্দ পাইতেছি। ভগবানের পুত্র হরিরাম। শ্রীমন্তদত্তের কন্যা লীলাবতীর সহিত হরিরামের বিবাহ হয়। হরিরামের

পুত্র রাজা শুকদেব। শ্রীমন্ত চৌধুরী অপুত্রক মরিয়া গেলে তাঁহার দৌহিত্র শুকদেব তাঁহার পরিত্যক্ত বিষয়ের উত্তরাধিকারী হইলে বর্দ্ধনকুঠীর সাত আনা সম্পত্তি দিনাজপুরের সহিত মিশিয়া যায়। মহারাজ গিরিজানাথ রায়বাহাদুর বিষ্ণুদত্ত হইতে অধস্তন একাদশ পুরুষ ব্যবধান। (Vide Golden Book of India Lethbirdge) রাজা প্রাণনাথ দিনাজপুর জমিদারীর আয়তন বৃদ্ধি করিয়াছিলেন, ঠাকুরগাঁ মহকুমার উত্তরে একজন রাজা ছিলেন। তাঁহার রাজধানী দুর্গাপুর নামক গ্রামে ছিল। রাজা প্রাণনাথ যুদ্ধে তাঁহাকে পরাজয় করিয়া তাঁহার জমিদারী দিনাজপুরের রাজ্যভুক্ত করিয়া লন। রাজা প্রাণনাথের সময় দুইজন কবি একত্রে "পদ্মাপুরাণ" কাব্য রচনা করেন। কবিদ্বয়ের নাম জগজ্জীবন ঘোষাল ও দ্বিজ কালিদাস। কবিদ্বয় নিম্নলিখিত ভাবে আত্মপরিচয় রাখিয়া গিয়াছেন :—

চৌধুরী অনুপরায়, সর্ব্বদেশে জয় গায়,
জয়ানন্দ দ্বিজের নন্দন।
তারপুত্র ঘনশ্যাম, তারপুত্র অমুরাম,
বিরচিল জগত জীবন ॥

(২)

ঘোষাল-ব্রাহ্মণ বাটী, কোচআ মোড়াত বাড়ী,
প্রাণনাথ নরপতি দেশে।
বন্দিয়া মনসা পায়, জগত-জীবন গায়,
পুরাণ সমাপ্ত তার শেষে ॥

(৩)

গোলকনাথের পদ-পঙ্কজ স্মরণে।
মনসা মঙ্গল দ্বিজ কালিদাস ভণে ॥

কবি কালিদাসের "কালীবিলাস" নামে একখানি কাব্য আছে। কাব্যখানির নাম "দেবী-যুদ্ধ" বলিলেই সহজে বুঝিতে পারা যায়। আজ পর্য্যন্ত গোলকনাথের কোনও সন্ধান করিতে আমরা পারি নাই।

রাজা প্রাণনাথের পর রাজা রামনাথ রাজা হন। রাজস্ব-বিষয়ে রঙ্গপুরের ফৌজদার সৈয়দ মহম্মদ খাঁর সহিত তাঁহার মনোমালিন্য হওয়ায় ফৌজদার দিনাজপুর রাজধানী আক্রমণ করেন। অর্দ্ধপথে রাজসৈন্য ও ফৌজদারসৈন্যের সংঘর্ষ হয়। রাজা রামনাথ মহাবীরত্বের সহিত স্বয়ং সৈন্য পরিচালনা করেন। যুদ্ধে কাহারও জয়পরাজয় হয় না। ফৌজদার অবশেষে রাজা রামনাথের সহিত আপোষে সকল বিবাদ নিষ্পত্তি করিয়া চলিয়া যান। এই বিবাদের ফলে রাজস্বসম্বন্ধে রঙ্গপুরের সহিত দিনাজপুরের সকল সম্বন্ধ বিয়োজিত হয়। রাজা রামনাথ নবাব সরকারে পাঁচ লক্ষ টাকা নজর দিয়া তাঁহার নাম জারি করিয়াছিলেন। রাজা রামনাথ দিল্লী হইতে রাজত্বের সনন্দ পাইয়াছিলেন। রাজা রামনাথের পর বৈদ্যনাথ রাজা হন। তিনি বড়ই স্বধর্ম্মপালক ছিলেন। দিনাজপুর জেলার মধ্যে বহু দেব-মন্দিরের সংস্কার করাইয়াছিলেন। রাজা বৈদ্যনাথের পর রাজা রাধানাথ রাজা হন। তাঁহার নাবালককালে রাজমাতা রাজ কার্য্য পরিচালনা করিতেন। এই সময় ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর পক্ষ হইতে দেবীসিং দিনাজপুর রাজার দেওয়ান ও অভিভাবক নিযুক্ত হইয়া পূর্ণিয়া হইতে আইসেন। পরে দেবীসিংহই রঙ্গপুর দিনাজপুর রাজস্বের ইজারদার হইয়া নিজ অত্যাচারকাহিনীতে বার্কের বাগ্মিতায় অমর হইয়া গিয়াছেন। রাজা রাধানাথ প্রাপ্তবয়স্ক হইলে যখন শুনিলেন যে, দেবীসিংহের যাবতীয় অত্যাচারের জন্য গবর্ণর হেষ্টিংস মহোদয় বিলাতে নির্জ্জিত হইতেছেন, তখন তিনি কালেক্‌টারের হাত দিয়া তাঁহার নির্দ্দোষিতার প্রমাণ রঙ্গপুর দিনাজপুরের যাবতীয়

জমিদারের দস্তখতযুক্ত এক দরখাস্ত বিলাতে প্রেরণকরেন। রাধানাথের পর হইতেই দিনাজপুর রাজের রাজশক্তি খর্ব্ব হইয়া যায়। রাজা গোবিন্দনাথ ও তৎপুত্র তারকনাথ কেবল মাত্র নামে রাজা ছিলেন। দিল্লীর দরবারে পুরাতন রাজ সনন্দ প্রভৃতি তলপ হইলে রাজবাড়া হইতে বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী সেগুলি লইয়া নৌকাপথে রওনা হয়। পথে নবদ্বীপের নিকট নৌকাডুবি হওয়ায় সেগুলি নষ্ট হইয়া যায়। তারকনাথের পর মহারাজা বাহাদুর গিরিজানাথ উত্তর বঙ্গের প্রাচীন রাজাসনে উপবিষ্ট হইয়া দিনাজপুর রাজসম্মান অক্ষুণ্ণ রাখিয়া প্রতিপত্তি স্থাপন করিয়াছেন।

দিনাজপুর রাজবংশের অপর শাখা "রায় সাহেব" নামে খ্যাত। হরিরামের অপর ভ্রাতার নাম হরিনারায়ণ ছিল। শুধু হরিরাম শ্রীমন্ত দত্ত চৌধুরীর কন্যার পাণিগ্রহণে দিনাজপুর বাস করিলে হরিনারায়ণও ঐ সঙ্গে দিনাজপুর আইসেন। হরিনারায়ণের পৌত্র রামকান্ত হইতে রায়সাহেব বংশের উৎপত্তি। রামকান্ত অসাধারণ কর্ম্মনিষ্ঠ লোক ছিলেন, এবং কার্য্যকুশলতায় অনেক জমিদারী অর্জ্জন করেন। প্রবাদ যে, এক সময় পরমবৈষ্ণব কাশীনাথ মহন্ত তাঁহার অন্তিমদশায় শিষ্য রামকান্তকে তাঁহার যাবতীয় দেবসম্পত্তি দান করিতে চাহিলে রামকান্ত প্রত্যাখ্যান করেন। কাশীনাথের সমাধি রাজবাড়ীর দেবমন্দিরে অবস্থিত আছে এবং এখনও তাহার পূজা ও ভোগ হইয়া থাকে। পরমবৈষ্ণব রামকান্ত দেবসেবা-কার্য্য গ্রহণ না করায় শ্রীমন্ত দত্ত চৌধুরী তাহা গ্রহণ করিয়াছিলেন। রায় রাধাগোবিন্দ রায়সাহেব পরমবৈষ্ণব ও সাধু বলিয়া সর্ব্বত্র পরিচিত।

শ্রীকালীকান্ত বিশ্বাস।

দিনাজপুরের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

ভূমিকা

প্রত্যেক জাতিরই একটি ইতিহাসাতীত অবস্থা আছে। এই যুগের বিবরণ কেবলমাত্র প্রবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। প্রবাদ কেবলমাত্র কল্পিত উপকথা নহে; ইহার ভিতর নিশ্চয়ই কিয়ৎপরিমাণে সত্যের অংশ আছে। বাগাড়ম্বিত অসংবদ্ধ প্রবাদ হইতে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে ঐতিহাসিক প্রণালীতে সূক্ষ্ম বিচার দ্বারা সত্যকথা আবিষ্কার করা প্রত্যেক ইতিহাস লেখকেরই কর্ত্তব্য কার্য্য। দিনাজপুর সম্বন্ধে যে সব প্রবাদ প্রচলিত আছে, তাহার সত্যাসত্যতা সম্যগ্‌ভাবে নির্দ্ধারণ করিতে পারি নাই।

এই প্রবন্ধ কোন মৌলিকতার দাবী করে না। পুস্তকাদি পাঠ করিয়া যাহা সত্য বলিয়া হৃদয়ঙ্গম করিয়াছি, তাহাই সহজ ভাষায় লিপি-বদ্ধ করিতে চেষ্টা করিয়াছি।

সূচনা

কোন সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক বলিয়াছেন—"মুসলমান শাসন প্রবর্ত্তিত হইবার পূর্ব্বকালবর্ত্তী বরেন্দ্র মণ্ডলের ইতিহাসের মধ্যেই সমগ্র বঙ্গবাসীর ইতিহাসে মূল সূত্রের সন্ধান লাভের আশা করা যাইতে পারে।" দিনাজপুর এই প্রাচীন বরেন্দ্র-ভূমির একটি প্রধান অংশ; সুতরাং দিনাজপুরের ইতিহাস সমগ্র বাঙ্গালার ইতিহাসের সহিত দৃঢ়ভাবে সংবদ্ধ। এই দিনাজপুর প্রাচীন হিন্দু স্থপতিবিদ্যার কেন্দ্রভূমি ছিল। আমরা মালদহের হিন্দু ও মুসলমান রাজগণের কীর্ত্তির ধ্বংসাবশেষ দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হই; কিন্তু ইহা আমাদিগের স্মরণ রাখা উচিত যে মাল-দহের অনেক কীর্ত্তিরত্ন দিনাজপুরের বাণনগরের প্রস্তরাবলী দ্বারা

নির্ম্মিত। সুতরাং স্থপতিবিদ্যার দিক্ হইতেও দিনাজপুরের ইতিহাস বঙ্গবাসীর কৌতূহল-জনক।

ইতিহাসের তিনটি যুগ

ঐতিহাসিক উপাদানের প্রামাণ্য ও অপ্রামাণ্য অনুসারে প্রত্যেক জাতির ইতিহাসকে তিনভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। ইতিহাসের প্রথম ও সর্ব্বনিম্ন অবস্থা পৌরাণিক-যুগ। এই যুগের ইতিহাস শুধু অপ্রমাণিত প্রবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। দ্বিতীয় অবস্থাকে আমরা অর্দ্ধ ঐতিহাসিক-যুগ নামে অভিহিত করিতে পারি। এই যুগের ইতিহাসের প্রধান উপাদান প্রবাদ বাক্য ও তৎসমর্থক স্মৃতিস্তম্ভ, উৎকীর্ণ প্রস্তর-লিপি ও তাম্রশাসন। তৃতীয় অবস্থাতে আমরা প্রকৃত ইতিহাস প্রাপ্ত হই। এই সাধারণ নিয়মানুসারে আমরা দিনাজপুরের ইতিহাসকে বিভক্ত করিতে চেষ্টা করিয়াছি।

প্রথম অধ্যায়

পৌরাণিক-যুগ

এই যুগের ইতিহাস আলোচনা করিতে গেলে আমাদিগকে শুধু অপ্রমাণিত প্রবাদ-বাক্য ও উপকথার উপর নির্ভর করিতে হইবে। দিনাজপুরে একটি কিংবদন্তী প্রচলিত আছে যে, এই জেলা পূর্ব্বে ভগবান বিষ্ণুর ষষ্ঠাবতার পরশুরামের রাজ্যান্তর্গত ছিল। বগুড়া জেলার মহাস্থানে এই পরশুরামের রাজধানী প্রতিষ্ঠিত ছিল। তাহার পর দিনাজপুরের প্রাচীনত্ব প্রমাণের জন্য কিংবদন্তী, স্রোতস্বতী করতোয়ার উপর তর্পণঘাটকে (নবাবগঞ্জ থানার অধীন) বাল্মীকির নিত্য-নৈমিত্তিক ধর্ম্ম কার্য্য ও অবগাহনের স্থান বলিয়া

পরশুরাম

নির্দ্দেশ করিয়াছে; ইহার নিকটবর্ত্তী সীতাকোট্ নামে পরিচিত একটি ইষ্টকের স্তূপকে রাম কর্ত্তৃক নির্ব্বাসন-কালে সীতাদেবীর বাসস্থান বলিয়া নির্দ্দেশ করা হয়।

বাল্মীকি

তাহার পর আমরা শৈব বলিরাজার সম্বন্ধে অনেক কথা শুনিতে পাই। বিষ্ণুর অষ্টমাবতার কৃষ্ণের সহিত এই বলিরাজার পুত্র সহস্রবাহু মহাপরাক্রান্ত বাণরাজার এক মহাযুদ্ধ হইয়াছিল, ইহা সকলেই জানেন। ইহা কথিত হইয়া থাকে যে, যুদ্ধের সময় এই জেলা সর্ব্বপ্রথম শিবজ্বর বা ম্যালেরিয়া দ্বারা আক্রান্ত হয়। বর্ত্তমান গঙ্গারামপুর থানা এই বাণরাজার কীর্ত্তির ধ্বংসাবশেষ দ্বারা পরিপূর্ণ। পুনর্ভবা নদীর পূর্ব্বতীরস্থ বাণনগর নামক স্থানে একটি নগরের ও তৎসন্নিহিত রাজ-প্রাসাদের ভগ্নাবশেষ দেখা যায়। কথিত আছে, এই বাণ নগরেই পরাক্রমশালী মহাবীর বাণ বাস করিতেন। বাণ-নগরে অমৃতকুণ্ড ও জীবৎকুণ্ড নামে দুইটি দীর্ঘিকা দেখিতে পাওয়া যায়। এই দীর্ঘিকা দুইটি শিব তাঁহার প্রধান উপাসক বাণকে দান করিয়াছিলেন। কথিত আছে, পূর্ব্বে ইহাদের জলের জীবনী শক্তি বৃদ্ধি ও অমরত্ব প্রদান করিবার ক্ষমতা ছিল। গঙ্গারামপুর থানার দক্ষিণে দ্বিতীয় ও ষষ্ঠ মাইলের মধ্যে যথাক্রমে কালদীঘি ও তপনদীঘি নামক দুইটি দীঘি দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথম দীর্ঘিকাটি বাণরাজ-মহিষী কালরাণী কর্ত্তৃক ও দ্বিতীয়টি স্বয়ং বাণরাজের আজ্ঞানুসারে খনিত হইয়াছিল। এই বাণরাজার কীর্ত্তি-কলাপের ভগ্নাবশেষ নবাবগঞ্জ থানায় অদ্যাপিও দেখিতে পাওয়া যায়। প্রবাদ আছে, তপন-দীঘির পূর্ব্বে করদাহ নামক একটি স্থানে কৃষ্ণ কর্ত্তৃক কর্ত্তিত বাণ-রাজার ৯৯৮টি বাহু দাহ করা হয়।

বাণরাজ

যদিও বর্ত্তমান প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ জয়পুর রাজ্যের সন্নিহিত স্থানকে মৎস্য-

দেশ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন, তথাপি দিনাজপুর মৎস্যদেশ নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। দিনাজপুর মৎস্যরাজ বিরাটরাজের উত্তর গো-গৃহ বলিয়া অভিহিত হয়। আজও কান্তনগরে বিরাটরাজ-নির্ম্মিত দুর্গের ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়।

বিরাটরাজ

প্রবাদ আছে, এইস্থানে বিরাটরাজা স্বীয় গো-রক্ষার্থ এই দুর্গ ও ঘোড়াঘাটের নিকট অশ্বরক্ষার্থ আর একটি দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। ঘোড়াঘাট থানার ৯ মাইল দক্ষিণ পশ্চিমে বিরাটের রাজ-প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়। মধ্যম পাণ্ডব মহাবীর ভীম এই দেশে পদার্পণ করিয়াছিলেন বলিয়া একটি প্রবাদ অতিশয় প্রবল আছে। তাহার প্রমাণ-স্বরূপ স্থানীয় লোক সকল বর্ত্তমান পার্ব্বতীপুরের সন্নিহিত একটি স্থানে কতকগুলি কৃষি-কার্য্যের অস্ত্রকে ভীমের অস্ত্র বলিয়া উল্লেখ করে। কান্তনগরের নিকট বীরগঞ্জের পূর্ব্বদিকে শোক্কানামক স্থানে চাঁদ-সদাগরের বাসস্থান ছিল বলিয়া একটি প্রবাদ আছে।

মধ্যম পাণ্ডব ভীম

চাঁদ-সদাগর

দ্বিতীয় অধ্যায়

মধ্য-যুগ—খৃঃ ৪র্থ শতাব্দী হইতে নবম শতাব্দী।

গুপ্তরাজগণ ও তৎকাল-পরবর্ত্তী নৃপতিগণ।

গুপ্ত-রাজগণের সময় হইতেই বঙ্গের ইতিহাসের মধ্য-যুগ আরম্ভ হয়। কিন্তু এই গুপ্ত-রাজগণের কোন কীর্ত্তির ধ্বংসাবশেষ আমরা বরেন্দ্র-ভূমিতে দেখিতে পাই না। তাঁহাদিগের দিগ্বিজয়ের বিবরণ রক্ষার্থ উৎকীর্ণ প্রস্তরলিপি হইতে উক্ত রাজগণ কর্তৃক বঙ্গদেশ অধিকারের কথা জানিতে পারি। ৩২০ খৃষ্টাব্দে মগধে এক মহাসাম্রাজ্য স্থাপিত হইয়াছিল। চন্দ্রগুপ্ত এই সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা। তৎপুত্র সমুদ্রগুপ্ত স্বীয় ভুজবলে বঙ্গভূমি

অধিকার করেন। "সমতট (বঙ্গ) ব্যতীত পুণ্ড্র ও রাঢ় প্রভৃতি বাঙ্গালার অপরাপর অংশ সম্ভবতঃ খাস গুপ্তরাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল।"

সমুদ্রগুপ্ত

ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যভাগে যশোধর্ম্ম বিষ্ণুবর্দ্ধন হূনগণকে পরাভূত করিয়া অতিশয় পরাক্রমশালী হন। সম্ভবতঃ এই যশোধর্ম্মন গুপ্ত-রাজগণের করদ-রাজ ছিলেন। কিন্তু তিনি স্বীয় বীর্য্যবলে "ব্রহ্মপুত্র (লৌহিত্য) নদের উপকণ্ঠ হইতে আরম্ভ করিয়া কলিঙ্গ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ভূভাগ" জয় করিয়াছিলেন। এই সকল স্থান জয় করিবার নিমিত্ত তাঁহাকে নিশ্চয়ই বরেন্দ্র ভূমিতে সৈন্য পরিচালনা করিতে হইয়াছিল। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এই রাজগণের সময় বরেন্দ্র ভূমির কোন বিশেষ বিবরণ পাই না। ৭৮৪ খৃষ্টাব্দের পর গুর্জ্জরের প্রতিহার-বংশীয় রাজা বৎস-রাজ বঙ্গদেশ অধিকার করেন। এই বৎস-রাজের পরবর্ত্তী পাল রাজগণের সময় হইতেই আমরা সমগ্র বরেন্দ্র ভূমির অনেক বিবরণ জানিতে পারি (১)।

যশোধর্ম্ম বিষ্ণুবর্দ্ধন
ষষ্ঠ শতাব্দী

তৃতীয় অধ্যায়

পালরাজত্ব—সম্ভবতঃ নবম শতাব্দী হইতে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ।

পাল নরপতিগণ।

পালবংশের প্রতিষ্ঠাতা মহারাজ শ্রীগোপালদেব কয়েকটি স্বাধীন নর-পতিকে পরাস্ত করিয়া বঙ্গের একচ্ছত্র-অধিপতি হন। এই পালরাজগণ যে বঙ্গের অধিবাসী, তাহাদের জন্মভূমি যে এই বঙ্গদেশ, তাহা আধুনিক ঐতিহাসিকগণ স্থির করিয়া-

শ্রীগোপালদেব

---

(১) আইনী-আকবরীতে লিখিত আছে, পাল নরপতিগণ আদিশূর রাজবংশের ও বল্লাল সেনের রাজবংশের মধ্যবর্ত্তী সময়ে বঙ্গদেশ শাসন করেন।

ছেন। দিনাজপুর জেলায় পত্নীতলা থানার অধীনে মঙ্গলবাড়ী নামক স্থানের নিকট একটি প্রস্তর স্তম্ভে পাল নরপতিগণের বংশ-বিবরণ পাওয়া যায়। এই স্তম্ভটি প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের নিকট "বাদল-স্তম্ভ" বলিয়া পরিচিত। ইহা নিকটস্থ গ্রামবাসিগণের নিকট ভীমের পান্টী নামে বিখ্যাত। ইহাতে শূরপাল, নারায়ণপাল ও দেবীপাল প্রভৃতি পালবংশের প্রধান নরপতিগণের নাম বিশেষ ভাবে উল্লিখিত দেখা যায়। কিন্তু আজ-কাল বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতির অক্লান্ত পরিশ্রমে ও যত্নে আমরা আরও অনেক পাল নরপতিগণের বিবরণ পাইয়াছি। ইহার জন্য ঐ সমিতি বঙ্গবাসীর বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র।

মহাবীর শ্রীগোপালের মৃত্যুর পর তদীয় পুত্র ধর্ম্মপাল পিতৃ-সিংহাসনে আরোহণ করিয়া সার্ব্বভৌম পদ লাভের জন্য যত্ন করেন। ধর্ম্মপালের পুত্র দেবপাল পিতৃ-সিংহাসনে আরোহণ করিয়া পিতা-পিতামহের কীর্ত্তি অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন। মহারাজ দেবপাল দেবের অধীনেই তাঁহার "বিজয়-সেনানা জেলায় লঙ্কা" জয় করিয়াছিল (১)। দেবপাল দেবের ন্যায় মহাপরাক্রান্ত নরপতির পক্ষে প্রাগ্‌জ্যোতিষপতি ও উৎকলপতিকে পরাজয় করা খুব সহজই হইয়াছিল। দেবপালের পর যথাক্রমে বিগ্রহপাল, নারায়ণপাল প্রভৃতি পালবংশীয় রাজন্যবর্গ গৌড়মণ্ডল শাসন করিয়াছিলেন। এই পালবংশের নৃপতিগণের মধ্যে মহারাজ শ্রীমহীপালদেবের নামই দিনাজপুরের সহিত বিশেষভাবে জড়িত। "শ্রীমহীপালদেব বাহুবলে যুদ্ধে সকল বিপক্ষকে নিপাতিত করিয়া অনধিকারী কর্তৃক বিলুপ্ত পিতৃ-রাজ্যের উদ্ধার সাধন করিয়া ভূপালগণের মস্তকে চরণ স্থাপন করিয়াছিলেন।" মহীপালের পূর্ব্বে তাঁহার পিতা দ্বিতীয় বিগ্রহপাল

ধর্ম্মপাল

দেবপাল

(১) Taylor's History of India—p. 65.

"কাম্বোজবংশীয় গৌড়পতি" দ্বারা রাজ্য ভ্রষ্ট হইয়াছিলেন। দিনাজপুর এই শেষোক্ত নরপতির লীলাভূমি। এই কাম্বোজ-দেশটি কোথায়, তাহা লইয়া মতভেদ থাকিলেও গৌড়রাজমালা-লেখক শ্রদ্ধেয় রমাপ্রসাদ চন্দ মহাশয় ফরাসী পণ্ডিত ফুসেব মত সমর্থন করিয়া কাম্বোজদেশকে তিব্বতদেশের নামান্তর মাত্র বলিয়াছেন। এই কাম্বোজরাজ ৮৮৮ শকাব্দে (৯৬৬ খৃঃ) একটি শিব-মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। এই মন্দিরের একটি প্রস্তর-স্তম্ভ বর্ত্তমান দিনাজপুরাধিপতির উদ্যানে রক্ষিত হইয়াছে। এই স্তম্ভেই কাম্বোজ-রাজের শিব-মন্দিব নির্ম্মাণের কথা উল্লিখিত আছে। "বরেন্দ্রদেশ (বিশেষতঃ দিনাজপুর) কাম্বোজরাজেব পদানত হইয়াছিল, ইহা নিঃসন্দেহে মনে কবা যাইতে পারে। কারণ, বরেন্দ্রের কেন্দ্র-স্থলেই—দিনাজপুরের অন্তর্গত বাণ-নগরেই তাহাব কীর্ত্তি-চিহ্ন পাওয়া গিয়াছে; এবং ববেন্দ্র দেশের অনেকস্থানে যে কতক পরিমাণে তিব্বতীয় বা মোঙ্গলীয় আকাবের কোচ, পলিয়া, রাজবংশী প্রভৃতি "অৰ্দ্ধ হিন্দু" জাতি দেখা যায়, ইহারা গৌড়পতিব অনুচবগণেব বংশধর বলিয়াই মনে হয়।" কাম্বোজদেশীয় নরপতিগণেব হস্ত হইতে পিতৃ-বাজ্য উদ্ধার করা মহীপালের প্রধান কীর্ত্তি। কোন্ খৃষ্টাব্দ হইতে মহীপাল বাজ্যপালন করেন, এই সম্বন্ধে ঐতিহাসিকগণেব মতানৈক্য দেখা যায়। Dinajpur District Gazetteer প্রণেতা সিভিলিয়ান Mr. F. W. Strong ৮৫৬ খৃষ্টাব্দ মহীপালের রাজত্বকাল বলিয়া স্থির করিয়াছেন। কিন্তু গৌড়রাজমালা লেখক মহীপালকে প্রসিদ্ধ বিগ্রহ ভগ্নকারী সুলতানমামুদের সম-সাময়িক বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তাঁহার মতে মহীপালের রাজত্বকাল ৯৮০ হইতে ১০৩২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত। Mr. Strongএর পক্ষে প্রধান সাক্ষী নালন্দায় প্রাপ্ত উৎকীর্ণ প্রস্তর-

কাম্বোজরাজ

মহীপাল

লিপি। শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ মহাশয় ১০২৬ খৃষ্টাব্দের সারনাথে প্রাপ্ত প্রস্তরলিপি হইতে মহীপালের রাজত্বকাল স্থির করিয়াছেন। ঐতিহাসিক Hamiltonও শেষোক্ত মত সমর্থন করিয়াছেন। এখন এ বিষয়ে কি মীমাংসা হইতে পারে তাহা সুধীগণ স্থির করিবেন। রাজা মহীপাল প্রথমে অতি দুর্দ্ধর্ষ ও পরাক্রান্ত নৃপতি ছিলেন। মৌর্য্যরাজ অশোকের জীবনের সহিত তাঁহার জীবনের অনেক সাদৃশ্য দেখা যায়। পূর্ব্ব-জীবনে কলিঙ্গ জয় ও পিতৃরাজ্যের উদ্ধার সাধন করিবার সময় নব-শোণিত দেখিয়া তাঁহার মনে বৈরাগ্যের ভাব উদিত হয়। সেই সময় তিনি যুদ্ধ-বিগ্রহ পরিত্যাগ করিয়া পরহিতকর কার্য্যে ব্রতী হইলেন। শ্রীমহীপালদেবের কীর্ত্তি-কলাপ দিনাজপুর জেলার দক্ষিণ-পশ্চিমদিকে বেশী দেখা যায়। এই জেলার বংশীহারি থানার অন্তর্গত "মহীপালদীঘি" ও মুর্শিদাবাদ জেলার "সাগরদীঘি" মহারাজ মহীপাল দ্বারা খনিত হইয়াছিল; দিনাজপুর জেলার অন্তর্গত "মহী-সন্তোষ", বগুড়া জেলার "মহীপুর" ও মুর্শিদাবাদ জেলার "মহীপাল"—এই তিনটি সুবৃহৎ নগরের ধ্বংসাবশেষ মহীপালের নামের সহিত জড়িত রহিয়াছে। মহীপাল নিজ রাজ্যান্তর্গত বারাণসী-ধামে ঈশান (শিব) ও চিত্র-ঘণ্টার (দুর্গা) মন্দিরাদি প্রতিষ্ঠা করাইয়াছিলেন। বারাণসীধামকে সৌধ মালায় সজ্জিত করিতে গিয়া এমন তন্ময় হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, বিগ্রহভগ্নকারী রাক্ষস সুলতানমামুদের হস্তহইতে অন্যান্য তীর্থ-ক্ষেত্রের কীর্ত্তি-রত্নের রক্ষার্থ কোন চেষ্টা করিবারও তাঁহার অবসর ছিল না। তাঁহার এইরূপ অত্যধিক শান্তিপ্রিয়তাই পাল-রাজ্যের, তথা ভারতবর্ষের হিন্দু-রাজ্যের অধঃপতনের মূল বলা যাইতে পারে।

মহীপালের পর যথাক্রমে তাঁহার পুত্র নয়পাল ও পৌত্র তৃতীয় বিগ্রহ-পাল ও প্রপৌত্র দ্বিতীয় মহীপাল গৌড়মণ্ডলের অধিপতি হন। এই শেষোক্ত নরপতি দ্বিতীয় মহীপাল সিংহাসন লাভ করিয়া কুকার্য্যে রত

হইয়াছিলেন। তিনি তাঁহার অনুজদ্বয়কে (শূরপাল ও রামপালকে) লৌহশৃঙ্খলে বদ্ধ করিয়া কারাগারে নিক্ষেপ করেন।

দ্বিতীয় মহীপাল

দ্বিতীয় মহীপালের অত্যাচারে প্রজাগণ বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। প্রজাগণ কৈবর্ত্তপতি দিব্বোক বা দিব্যককে অধিনায়ক করিয়া মহীপালকে নিধন করতঃ কৈবর্ত্তরাজকে গৌড়মণ্ডলের রাজা বলিয়া ঘোষণা করিল। দুরাচার দ্বিতীয় মহীপালের কনিষ্ঠ ভ্রাতা পূর্ব্বকথিত রামপাল এই দিব্যকের বংশধরকে পরাজিত করিয়া স্বীয় পিতৃসিংহাসনের উদ্ধার সাধন করেন। প্রজাবিদ্রোহের অবসানে রামপাল "রামাবতী" নামে এক নূতন নগর নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। এই "রামাবতী" নগরটি কোথায় তাহা লইয়া প্রত্নতত্ত্ব-বিদ্‌গণের মধ্যে মতদ্বৈধ দেখা যায়। প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু "রামাবতীকে" দিনাজপুর জেলার একটি স্থান বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। রামপালের পর হইতে পালরাজ্যের অধঃপতন আরম্ভ হয়।

রামপাল

পালবংশের শেষ নৃপতি মদনপালকে তাহার ভ্রষ্টা পত্নী মন্ত্রীর সহযোগে বিষপ্রয়োগে হত্যা করিয়াছিলেন। এই মদনপালের শূরসেন নামক একজন সেনাপতি ছিলেন। শূরসেন মদনপালের রাণীকে ও তাহার উপপতিকে অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া গৌড়মণ্ডলের রাজা হন। এই শূরসেন হইতেই সেন রাজবংশের উৎপত্তি। কথিত আছে, পালরাজগণের অন্যান্য বংশধরগণ সেনরাজ কর্ত্তৃক বিতাড়িত হইয়া কামরূপাভিমুখে প্রস্থান করেন।

মদনপাল

চতুর্থ অধ্যায়

সেন-রাজবংশ।

সেন রাজ্য গৌড়, বরেন্দ্র, বঙ্গ, বগ্‌ড়ি, রাঢ় এবং মিথিলা এই ছয়টি প্রদেশে বিভক্ত ছিল। সেনরাজগণের প্রতাপ এই দিনাজপুর জেলায়

বহুকাল স্থায়ী হয় নাই, ইহা সহজেই অনুমিত হইতে পারে। সেনরাজগণের রাজ্যের বিস্তৃতি বরেন্দ্রভূমির উত্তরে খুব অল্প দূরই হইয়াছিল। কারণ তৎসময়ে দমদমা নামক স্থানে মুসলমানগণের একটি সেনানিবাস প্রতিষ্ঠিত ছিল। সুতরাং এই জেলায় সেনরাজগণের কীর্ত্তি-চিহ্ন দেখিতে না পাওয়া আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। পূর্ব্বকথিত দমদমা গ্রামটি দিনাজপুরের দক্ষিণে পুনর্ভবা নদীর উপর অবস্থিত।

পঞ্চম অধ্যায়

মুসলমান-রাজত্ব—আফগান নরপতিগণ।

বক্তিয়ার খিলিজি লক্ষ্মণসেনের রাজধানী নবদ্বীপ ধ্বংস করিয়া গৌড়ে তাঁহার রাজধানী স্থাপন করিলেন। বক্তিয়ার খিলিজির পরে প্রায় ১৫০ শত বৎসর কাল পর্য্যন্ত গৌড়ের মুসলমান নবাবগণ কেবলমাত্র দিল্লীর বাদশাহের রাজপ্রতিনিধি ছিলেন। কিন্তু রাজধানী দিল্লী হইতে বঙ্গদেশ বহুদূরে অবস্থিত বলিয়া আলাউদ্দীন নামক এক নবাব স্বাধীন ভাবে রাজত্ব করিতে আরম্ভ করিলেন। মুসলমান নবাবগণের মধ্যে বাদসাহকে কর দিতে তিনি সর্ব্বপ্রথমে অস্বীকার করেন। নবাব আলাউদ্দিন ১৩৪০ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৩৪২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিলে পর তাঁহার উত্তরাধিকারী নবাব সামসুদ্দিন দিল্লীর বাদসাহ ফিরোজসাহ তোগলক কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া ঘোড়াঘাটে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। তাহার পর বাদসাহের সহিত নবাবের সন্ধিস্থাপন হইলে, বাদসাহ দিল্লীতে ফিরিয়া যান।

বক্তিয়ার খিলিজি

সামসুদ্দীন

যদিও পাঠানগণের আগমনে একচ্ছত্র-হিন্দু-সাম্রাজ্য বঙ্গদেশ হইতে কিছুকালের জন্য তিরোহিত হইল, তথাপি হিন্দুগণের বাহুবল তখনও

ক্ষীণ হয় নাই ; তখনও বাঙ্গালী "ভেতো বাঙ্গালী" বলিয়া জন-সমাজে পরিচিত ছিল না। তৎকালে হিন্দুগণের বুদ্ধিতেই মুসলমান নবাবগণ পরিচালিত হইতেন। বাঙ্গালী বীরগণ তখনও পাঠান সেনার উৎকৃষ্ট অধিনায়ক বলিয়া সম্মানিত হইতেন। তাঁহাদিগের বাহুবলের উপরেই নবাবগণ সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিতেন। রাজা কংসরাম, সুবুদ্ধি খাঁ ইঁহারা মুসলমান নবাবগণের দক্ষিণহস্ত স্বরূপ ছিলেন। কিন্তু চতুর্দ্দশ শতাব্দীর শেষভাগে হিন্দুনরপতিগণ এতই প্রবল পরাক্রান্ত হইয়া উঠিলেন যে, তাঁহারা রাজা গণেশের অধিনায়কত্বে নবাব সামসুদ্দিনকে পরাজিত করিয়া রাজা গণেশকে গৌড়ের সিংহাসনে বসাইলেন। আবার হিন্দু-রাজত্ব কিছুকালের জন্য প্রতিষ্ঠিত হইল। রাজা গণেশ সম্বন্ধে ঐতিহাসিকগণের মতদ্বৈধ দেখা যায়। Hamilton ও Westmacott প্রভৃতি ইংরেজ ঐতিহাসিকগণ গণেশকে "দিনাজের রাজা" বলিয়াছেন। ইঁহাদিগের মতে রাজা গণেশ দিনাজপুর রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। কিন্তু অন্যান্য ঐতিহাসিকগণের মতে গণেশ একটাকিয়ার জমীদার বা রাজা ছিলেন।[১] Stewart সাহেব রাজা গণেশকে ভাতুড়িয়ার জমীদার বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। Elphinstone তাঁহাকে Kans নামে অভিহিত করিয়াছেন। বর্ত্তমান সময়ে রাজা গণেশ কি জাতি এবং কোন দেশের রাজা ছিলেন, তাহা লইয়া একটা আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে। এই আলোচনা শেষ না হইলে আমরা এ সম্বন্ধে কিছু বলিতে অসমর্থ। রাজা গণেশ হিন্দু ও মুসলমান উভয় জাতিরই প্রিয়পাত্র ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর শব দেহ লইয়া হিন্দু ও মুসলমানগণের মধ্যে ঝগড়া হইবার উপক্রম হয়। হিন্দুগণ তাঁহার শব দাহন ও মুসলমানগণ তাঁহার শব

রাজা গণেশ

(১) শ্রীযুক্ত দুর্গাচন্দ্র সান্যাল।

গোর দিতে চাহিয়াছিলেন।২ রাজা গণেশ পরলোক গমন করিলে তৎপুত্র যদু কোন মুসলমানীর প্রতি আসক্ত হইয়া মুসলমান ধর্ম্ম অবলম্বনপূর্ব্বক জেলালুদ্দীন নাম গ্রহণ করেন। জেলালুদ্দীন গণেশের পুত্র কিনা, তদ্বিষয়ে অনেকে সন্দেহ প্রকাশ করেন; কারণ এইরূপ শুনা যায় যে, রাজা গণেশ জেলালুদ্দিনকে পরাস্ত করিয়া কারাগারে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। অনেকের মতে জেলালুদ্দিন অতিশয় অত্যাচারী নবাব ছিলেন, কারণ তিনি বলপূর্ব্বক দিনাজপুরের প্রায় সকল হিন্দুকে মুসলমানধর্ম্ম গ্রহণ করিতে বাধ্য করিয়াছিলেন। কেবল মাত্র যাহারা প্রাণ লইয়া কামরূপে পলায়ন করেন, তাহাদিগেরই ধর্ম্ম রক্ষা হইয়াছিল। জেলালুদ্দিনের পর হইতে হোসেনসাহ পর্য্যন্ত মুসলমান নবাবগণের আমলে দিনাজপুরের কোন বিশেষ বিবরণ পাওয়া যায় না।

জেলালুদ্দীন

নবাব হোসেনসাহের রাজত্বকালে দিনাজপুর জেলার হিন্দুনরপতিগণ স্ব স্ব স্বাতন্ত্র্য রক্ষার ও পূর্ব্বগৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিবার নিমিত্ত যথোচিত কার্য্যশক্তি প্রয়োগ করিয়াছিলেন। তাঁহারা উত্তর-পূর্ব্বদিক্-স্থিত পরাক্রান্ত শত্রুদিগের হস্ত হইতে রক্ষা পাইবার নিমিত্ত দমদমা ও ঘোড়াঘাটের সেনানিবাসগুলি সৈন্যসমাবেশ দ্বারা সুদৃঢ় করিয়াছিলেন। বাদসাহ হোসেন সাহ হেমতাবাদের নিকটস্থ মহেশ রাজা নামক এইরূপ একটি হিন্দু নরপতিকে দমন করিবার নিমিত্ত দমদমা হইতে ঘোড়াঘাট পর্য্যন্ত সৈন্য পরিচালনোপযোগী একটি রাস্তা নির্ম্মাণ করেন। এই রাস্তার ভগ্নাবশেষ বর্ত্তমান ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের রাস্তার

হোসেনসাহ

---

(২) Stewart's History of Bengal.

[Stewart সাহেব গণেশকে Kanis নামে অভিহিত করিয়াছেন।]

(Imperial Gazetteer এ লিখিত আছে যে, রাজা গণেশও বহুর ন্যায় মুসলমান ধর্ম্ম অবলম্বন করেন)

ভিত্তিস্বরূপ। হেমতাবাদ থানার নিকট মহেশ রাজার রাজপ্রাসাদের ভগ্নাবশেষ এখনও দেখা যায়।

তৎকালীন মুসলমান নরপতিগণ অত্যন্ত ধর্ম্মোন্মাদী ছিলেন। তাঁহারা মুসলমান পীরগণের অত্যন্ত অনুগত ছিলেন। এই জেলার প্রত্যেক অংশে মুসলমান পীরগণের কবর বা স্মৃতিস্তম্ভ দেখিতে পাওয়া যায়। স্মৃতিস্তম্ভগুলি প্রায়ই হিন্দু মন্দিরের ভগ্নাবশেষের উপর নির্ম্মিত। ইহার কারণ সহজেই অনুমিত হইতে পারে। তৎকালীন মুসলমান নবাবগণ তাঁহাদের প্রচলিত প্রথানুসারে হিন্দুমন্দিরাদি ধ্বংসপূর্ব্বক তাহার উপর পীরের কবর বা স্মৃতিস্তম্ভ নির্ম্মাণ করাইতেন। এখন পর্য্যন্ত এই স্মৃতি-স্তম্ভগুলি মুসলমানগণ দ্বারা অতি সমাদরে পূজিত হইয়া থাকে। এই সকল স্মৃতিস্তম্ভের মধ্যে পীর বজরুদ্দিনের কবরই সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। এই কবরটি হেমতাবাদের নিকট অবস্থিত। ইহাকে দেখিলেই সহজেই মনে হয় যে, ইহা কোন হিন্দু রাজপ্রাসাদের ইষ্টকাদি দ্বারা প্রস্তুত হইয়াছে। সম্ভবতঃ পূর্ব্বোক্ত হিন্দু নরপতি মহেশের রাজপ্রাসাদের সরঞ্জামাদি লইয়া এই সমাধি-স্তম্ভ নির্ম্মিত হইয়াছে। প্রবাদ আছে, রাজা মহেশকে রাজ্যচ্যুত করিবার নিমিত্ত এই পীর বজরুদ্দিন অনেক সাহায্য করিয়াছিলেন। এই কবর হইতে অনতিদূরে অবস্থিত একটি চতুঃকোণ বিশিষ্ট সূচাগ্র স্তম্ভ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা হোসেন সাহের তক্ত বা সিংহাসন বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। হোসেন সাহের তক্তকে এরূপ স্থানে প্রতিষ্ঠিত দেখিয়া আমরা সহজেই বলিতে পারি যে, নবাব রাজা মহেশকে পরাজিত করিয়া সিংহাসনচ্যুত করেন; এবং বিজয়স্তম্ভস্বরূপ এই পীড়ামিড্‌টি নির্ম্মাণ করেন।

১৪৯৮ খৃষ্টাব্দে রঙ্গপুরের খেনবংশীয় নীলাম্বররাজ গৌড়-বাদসাহ হোসেন সাহের সৈন্যকর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া পার্ব্বত্যপ্রদেশে পলায়ন

করেন। এই খেনরাজের সাম্রাজ্য দিনাজপুরে ঘোড়াঘাট পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

পূর্ব্বেই বলা বর্ত্তমান হইয়াছে গঙ্গারামপুর থানার অধীনে দমদমায় মুসলমানগণের একটি সেনানিবাস ছিল। এই দমদমার নিকট "ধল-দীঘি" নামে একটি সুন্দর দীঘি দেখিতে পাওয়া যায়। এই দীঘিটি বোধ হয় সেনানিবাসের সৈন্যদিগের ব্যবহারের জন্য খনিত হইয়াছিল। এই দীঘির উত্তরদিকে মোল্লা আতাউদ্দীনের একটি দর্গা ও তৎসন্নিহিত একটি মসজেদ্ দেখা যায়। মসজেদগাত্রে একটি উৎকীর্ণ-লিপি হইতে আমরা জানিতে পারি যে, ইহা মোল্লা আতাউদ্দীনের পূর্ব্বে পূর্ব্বোক্ত সেনা-নিবাসের অধ্যক্ষ ওয়াজিত উপাধিধারী একব্যক্তি দ্বারা নির্ম্মিত হইয়া-ছিল। তৎপর মসজেদের পার্শ্বের দেওয়ালের আর একটি প্রস্তরলিপি হইতে জানিতে পারি যে, ইহা ফতে সা কর্ত্তৃক আতাউদ্দীনের উপাসনা স্থানরূপে নির্ম্মিত হইয়াছিল। হোসেন সাহের পরবর্ত্তী পাঠান নবাব-গণের রাজত্বকালে দিনাজপুরের ইতিহাস সম্বন্ধে আমরা সম্পূর্ণ অজ্ঞ।

ষষ্ঠ অধ্যায়

মোগল-রাজত্ব

১৫২৬ খৃষ্টাব্দে বাবর ইব্রাহিম লোদিকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া দিল্লীর সম্রাট হন। বাবরের পুত্র হুমায়ুনের রাজত্বকালে বাঙ্গালার ইতিহাসের বিশেষ ঘটনা সম্রাট হুমায়ুন কর্ত্তৃক নবাব সেরখাঁকে আক্রমণ। সেরসাহ হুমায়ুনকে পরাস্ত করিয়া তাঁহাকে ভারতবর্ষ হইতে বিদূরিত করতঃ দিল্লীতে আবার পাঠান সাম্রাজ্য স্থাপন করেন। সেরশাহ ও তাঁহার বংশধরগণ ১৫৭৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত স্বাধীনভাবে রাজত্ব করেন। কিন্তু বঙ্গের নবাব দাউদ খাঁর সময় হইতে আবার ভাগ্যলক্ষ্মী পাঠানরাজগণের প্রতি বিমুখ

হন। দাউদ খাঁ সম্রাট আকবরের মোগলসৈন্য কর্ত্তৃক গৌড় হইতে বিতাড়িত হইয়া সুন্দরবনাভিমুখে পলায়ন করেন। এই সময় হইতে দিনাজপুরের ইতিহাস বর্ত্তমান রাজবংশের ইতিহাসের সহিত বিশেষভাবে জড়িত। বঙ্গের স্বাধীনতাসূর্য্য সম্পূর্ণরূপে অস্তমিত হইবার উপক্রমকালে, পাঠান নরপতিগণের উচ্ছেদ ও মোগলগণের উদয় সময় বঙ্গের অধিকাংশ প্রদেশ প্রবলপরাক্রান্ত দ্বাদশ ভৌমিক নরপতিগণ কর্ত্তৃক শাসিত হইয়াছিল। সেই দ্বাদশ নরপতির রাজ্যবিভাগানুসারে পুরাকালে কখনও কখনও সমগ্র বঙ্গদেশ বারোভাটি বাঙ্গালা নামে অভিহিত হইত। দিনাজপুর এই দ্বাদশ নরপতিগণের মধ্যে এক নরপতির লীলাভূমি, এবং এই নরপতি দিনাজপুর-রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। যদিও আকবরের সময় হইতে আমরা দিনাজপুর রাজবংশের সঠিকবৃত্তান্ত জানিতে পারি, তথাপি ঐ রাজবংশ স্থাপন সম্বন্ধে আমরা বিভিন্ন মত দেখিতে পাই। Westmacott প্রমুখ ইংরেজ ঐতিহাসিকগণের দিনাজপুরে রাজবংশ স্থাপন সম্বন্ধে নিম্নলিখিত মত দেখা যায়। ১৬০০ খৃষ্টাব্দে সম্রাট আকবর সমগ্র সাম্রাজ্যকে ১৫টি সুবায় বিভক্ত করিয়া সেলিমকে বঙ্গদেশের সুবাদার নিযুক্ত করেন। সুবা বাঙ্গালাকে আবার ২৪টি সরকারে বিভক্ত করা হয়। ইহার মধ্যে ছয়টি সরকারের কতকাংশ দিনাজপুর জেলায় অন্তর্গত। আকবরের এই বন্দোবস্তের সময় দিনাজপুর ও মালদহের অনেকাংশ জনৈক জমিদারের অধীনে ছিল। সম্ভবতঃ এই জমিদারটি পূর্ব্বোক্ত রাজা গণেশের বংশধর ছিলেন। ঐতিহাসিক বুকানন তাঁহাকে কাশী নামে অভিহিত করিয়াছেন[১]। কিন্তু এই জমিদারের নাম অতলবিস্মৃতির গর্ভে বিলীন হইয়া গিয়াছে। তাঁহার সমাধি মন্দির এখনও রাজবাটীর মন্দির-দ্বারে

দিনাজপুর-রাজবংশ

(১) Dr. Francis Buchanan Hamilton's Dinajpur District p, 25.

প্রদর্শিত হইয়া থাকে, এবং লোকগণ এই সমাধি-মন্দির রীতিমতভাবে দধি, দুগ্ধ, কলা ও কাপড় দ্বারা সাদরে পূজা করে। তিনি অতি ধর্ম্মাত্মা ব্যক্তি ছিলেন বলিয়া মোহন্ত বা ব্রহ্মচারী নামে অভিহিত হইতেন। মহাত্মা কাশী পরলোক গমন করিলে তৎশিষ্য শ্রীমন্ত দত্ত চৌধুরী নামক একটি কায়স্থ রাজগদি প্রাপ্ত হন। এই শ্রীমন্ত দত্তের একটি পুত্র ও একটি কন্যা ছিল। কিন্তু পুত্রের অপুত্রকাবস্থায় মৃত্যু হওয়াতে তাহাতে তাহার দৌহিত্র শুকদেব রায় জমিদারী প্রাপ্ত হন। এই শুকদেবের বংশধর বর্ত্তমান মহারাজ গিরিজানাথ।

দিনাজপুর রাজবংশের উৎপত্তি

দিনাজপুর-রাজবংশ-স্থাপন সম্বন্ধে আর একটি প্রবাদ প্রচলিত আছে১। এই প্রবাদের কোন ঐতিহাসিক মূল্য নাই বলিলেও চলে। ইহাতে কেবল মাত্র কল্পনা-শক্তির পরাকাষ্ঠা দেখিতে পাই। এই বিবরণানুসারে রঙ্গপুর-স্থিত বর্ত্তমান বর্দ্ধনকুঠী জমিদারের পূর্ব্ব-পুরুষের সহিত দিনাজপুর রাজ-বংশের প্রতিষ্ঠাতার মনিব ও ভৃত্য সম্বন্ধ। দেবকী-নন্দন ঘোষ নামক একজন উত্তররাঢ়ী কুলীন-কায়স্থ এই বর্দ্ধনকুঠীর কর্ম্মচারী ছিলেন। তাঁহার পুত্র হরিরাম নামান্তরে দিনরাজ ঘোষ সম্রাট্ গণেশনারায়ণের অতি প্রিয় পাত্র ছিলেন। গণেশনারায়ণের মৃত্যুর পর তিনি তৎপুত্র যদুনারায়ণের পেশকার পদে উন্নীত হইলেন। কিন্তু যদু মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করাতে দিনরাজ কর্ম্মে ইস্তাফা দিলেন। যদু তাঁহার কর্ম্মচারীর গুণ-গ্রাম জানিয়া তাঁহাকে উত্তর বাঙ্গালার নবাবী দিলেন। দিনরাজ যেখানে গিয়া বাস করিতেছিলেন, তাহার নাম "দিনাজপুর" হইয়াছিল। উত্তর বাঙ্গালায় লোকে শব্দের আদ্যে"র"কার উচ্চারণ

---

(১) শ্রীযুক্ত দুর্গাচন্দ্র সান্যাল।

করে না। এই জন্য তাহারা এই স্থানকে "দিনা-আজপুর" বলিত। দিনরাজের মৃত্যুর পর তৎপুত্র শুকদেব রায় রাজা হন।

যদিও দিনাজপুর-রাজবংশ-স্থাপন সম্বন্ধে উপরোক্ত দুইটি বিভিন্ন মত দেখা যায়, তথাপি আমরা নিম্নলিখিত আর একটি বিবরণকে অতীব প্রামাণ্য ও সত্য বলিয়া গ্রহণ করিব। (ক) এই মতের সহিত ওয়েষ্টমেকট সাহেব প্রদত্ত বিবরণের অনেক সাদৃশ্য দেখা যায়। এই মতানুসারে দিনাজপুর-রাজ-বংশের স্থাপয়িতা রাজা শুকদেব রায়ের ঊর্দ্ধতন পিতৃ-পুরুষগণ অযোধ্যানিবাসী ছিলেন। এই রাজ-বংশের বীজপুরুষ সোমেশ্বর ঘোষ অযোধ্যা হইতে মুর্শিদাবাদ জেলার মহান গ্রামে বাস স্থাপন করেন। সোমেশ্বর ঘোষ হইতে রাজা শুকদেব অধস্তন চতুর্বিংশতি পুরুষ। রাজা শ্রীমন্ত দত্ত শুকদেবের মাতামহ বঙ্গের কানুনগো। শ্রীমন্ত দত্ত (বিষ্ণুদত্তের পুত্র), অতি পুণ্যাত্মা এক ব্রহ্মচারীর শিষ্য ছিলেন। এই শ্রীমন্ত দত্তের কন্যার সহিত সোমেশ্বর ঘোষ বংশজ দেবকীনন্দন ঘোষের পুত্র হরিরাম ঘোষের উদ্বাহ-ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। বিবাহের পর হরিরাম নিজ পিতৃভূমি পরিত্যাগ করিয়া দিনাজপুরে বসবাস আরম্ভ করেন। এই হরিরাম ঘোষের ঔরসে শ্রীমন্ত দত্তের কন্যার গর্ভে রাজা শুকদেব ও বিশ্বনাথ ঘোষ জন্ম গ্রহণ করেন।

শ্রীমন্ত দত্ত চৌধুরী উপরোক্ত সন্ন্যাসীর উপদেশ মত প্রজাপালন করিতে লাগিলেন। তিনি তৎকালীন বাঙ্গালার সুবাদার সাহাজাদা সাহসুজাকে নিজ গুণপনা দ্বারা আকৃষ্ট করিয়া অতীব প্রতিপত্তি লাভ করেন। শ্রীমন্ত দত্তের পরলোক হইলে তৎপুত্র হরিশ্চন্দ্র পিতৃ-সম্পত্তি

(ক) মহামহোপাধ্যায়কল্প ৺মহেশচন্দ্র তর্কচূড়ামণি প্রণীত "দিনাজপুর রাজ-বংশম্" হইতে গৃহীত।

প্রাপ্ত হইয়া স্বীয় ভাগিনেয় শুকদেবের প্রতি সেই সম্পত্তি পরিচালনার ভার প্রদান করেন। হরিশ্চন্দ্র অপুত্রকাবস্থায় পরলোক গমন করিলে শুকদেব সেই সম্পত্তি প্রাপ্ত হন।

শুকদেব

শুকদেব প্রজানুরঞ্জন দ্বারা রাজোপাধি প্রাপ্ত হইলে তাঁহাকে সকলেই শুকদেব রায় বলিত। তিনি স্বয়ং প্রজাদের বিচার করিতেন বলিয়া প্রজারা কাজীর নিকট বিচারার্থী না হইয়া তাহারই নিকট বিচারপ্রার্থী হইত। রাজা শুকদেবের প্রথমা পত্নীরগর্ভে রামদেব ও জয়দেব নামে দুই পুত্র এবং দ্বিতীয়া পত্নীর গর্ভে বীর প্রাণনাথ জন্মগ্রহণ করেন। রাজা শুকদেব অতীব কৃতিত্বের সহিত ৩৭ বৎসর কাল রাজত্ব করিয়া ১৬৮১ খৃষ্টাব্দে (১০৮৮ সালে, ১৬০৩ শকাব্দে) পরলোক গমন করেন। তৎকালীন পাষাণ-প্রতিবিম্ব-চুম্বিত জলা শুকসাগর ও অন্যান্য কীর্তিবহু সকল আজও তাঁহার স্মৃতি বক্ষে ধারণ করিয়া আছে।

রাজা শুকদেবের পর তজ্জ্যেষ্ঠপুত্র রামদেব রায় পিতৃসিংহাসনে আরূঢ় হইয়া তাঁহার তৃতীয় বৎসরে পরলোক গমন করেন। তৎপর তদীয় ভ্রাতা জয়দেব মাত্র তিন বৎসর কাল পিতৃসিংহাসনে অধিষ্ঠিত থাকিয়া ইহলোক পরিত্যাগ করেন। রামদেব ও জয়দেবের রাজত্ব কালে ঘোড়াঘাট পরগণান্তর্গত ভূসম্পত্তি দিনাজপুর রাজের অধীনে আইসে। এই সম্পত্তি প্রাপ্তির সহিত পরবর্ত্তী রাজা প্রাণনাথ রায়ের জীবনের ঘটনাবলি অতি দৃঢ়ভাবে সম্বদ্ধ।

রামদেব ও জয়দেব

ঘোড়াঘাটের তৎকালীন শাসনকর্ত্তা রাঘবেন্দ্র অতীব প্রজাপীড়ক ছিলেন। ইহার উপর তিনি নবাব সরকারে বাঞ্ছিত ভাবে রাজস্ব প্রেরণ করিতে অক্ষম হওয়ায় তাঁহার প্রতি তৎকালীন বঙ্গের সুবাদার আজিম উসান অতীব বিরাগ-ভাজন হইয়া ঘোড়াঘাট পরগণা দিনাজপুর-রাজ্যান্তর্গত করিতে ইচ্ছা করেন। ১৬৮৭ খৃষ্টাব্দে রাজা জয়দেবের মৃত্যুর পর তদীয়

কনিষ্ঠ ভ্রাতা রাজা প্রাণনাথ রাজগদী প্রাপ্ত হন। দিনাজপুরের রাজবংশ তাঁহাদিগের কৃতিত্বের জন্য পূর্ব্ব হইতেই সুবাদারের শুভদৃষ্টিতে থাকায় রাজা প্রাণনাথ ঘোড়াঘাট পরগণার ॥/০ নয় আনা অংশ প্রাপ্ত হইলেন। ১৭০৪, ১৭১৩, ১৭২২ খৃষ্টাব্দের তিনটি তাম্রশাসন দ্বারা আমরা রাজা প্রাণনাথের রাজত্ব-কাল নির্ণয় করিতে পারি। রাজা প্রাণনাথ স্বকীয় ভুজবলে প্রায় স্বাধীন-ভাবে রাজত্ব করিতেন। কিন্তু রাজস্ব দান সম্বন্ধে তাঁহাকে মোগলের বশ্যতা স্বীকার করিতে হইত। ইনি প্রবল প্রতাপের সহিত ৩১ বৎসর কাল রাজত্ব করেন। ইনি বীরত্বে তৎকালীন হিন্দু নরপতি-গণের মধ্যে অগ্রগণ্য ছিলেন। রাজ্যপ্রাপ্তির কয়েক বৎসর পর প্রাণ-নাথ স্বীয় বাহুবলে রাজ্যের কলেবর বৃদ্ধি করিতে স্বীয় কার্য্যশক্তি প্রয়োগ করেন। এইরূপে তিনি মালিগাঁও পরগণা অধিকার করেন। এই পরগণা বংশীহারী থানার পূর্ব্বাংশ ও মালদহ জেলার অনেক বিস্তীর্ণ ভূভাগ লইয়া গঠিত ছিল। ইহা ব্যতীত রাজা প্রাণনাথ নিজ জমিদারীর চতুঃসীমাস্থ ১২ বারটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জমিদারী অতি পরাক্রমের সহিত আক্রমণ করিয়া নিজ রাজ্যান্তর্ভুক্ত করেন। তাঁহার কীর্ত্তি-চিহ্নের ধ্বংসাবশেষ এখনও দিনাজপুরের অনেক স্থানে বর্ত্তমান। দিনাজপুর সহরের ১২ মাইল দক্ষিণে মুর্শিদাবাদ রাস্তার পার্শ্বে তিনি "প্রাণসাগর" নামক একটি বৃহৎ দীর্ঘিকা খনন করান। এই দীঘি এখনও জলজ উদ্ভিদ কিম্বা বন-জঙ্গল দ্বারা আবৃত হয় নাই।

রাজা প্রাণনাথ

রাজা প্রাণনাথের সর্ব্বাপেক্ষা অতুলনীয় কীর্ত্তি কান্তনগরের মন্দির। এই মন্দির তৎকালীন হিন্দুস্থপতি বিদ্যার একটি প্রকৃষ্ট নিদর্শন। এই মন্দিরে রাধাকৃষ্ণ মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত। প্রবাদ আছে, এই মূর্ত্তি দুইটি রাজা প্রাণনাথ শ্রীবৃন্দাবনে পুণ্য

কান্তমন্দির

সলিলা যমুনায় প্রাপ্ত হন। (১) প্রাণনাথের ঘোড়াঘাট পরগণার ॥/০ আনা লাভের পর ঐ সম্পত্তির ভূতপূর্ব্ব অধিকারী রাঘবেন্দ্র ও তাঁহার শত্রুগণ দিল্লীর দরবারে বাদসাহ আলমগির সকাশে অভিযোগ করাতে তিনি সম্রাট কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া দিল্লী অভিমুখে গমন করেন। পথি-মধ্যে তিনি শ্রীকৃষ্ণের বাল্য লীলাভূমি ও তাঁহার যৌবনের প্রেমাভিনয়ের স্থান শ্রীবৃন্দাবন ধামে কয়েকদিবসের জন্য অবস্থান করিতে লাগিলেন। প্রবাদ স্বপ্নেতে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া তিনি প্রত্যুষে তর্পণ করিবার নিমিত্ত যমুনা-জলে অবতরণ কালে রুক্মিণী ও তাঁহার কান্ত কৃষ্ণের মূর্ত্তি প্রাপ্ত হইলেন। তৎপর দিল্লীতে সম্রাটকে সন্তুষ্ট করিয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করতঃ দিনাজপুরের মন্দিরে মূর্ত্তি দুইটি স্থাপন করিলেন। কিন্তু একদা রাত্রিকালে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ রাজা প্রাণনাথকে তাঁহার প্রিয়সখা অর্জ্জুনের লীলাভূমি বিরাট-রাজ্যের উত্তর গো-গৃহে মূর্ত্তি দুইটি প্রতিষ্ঠা করিতে আদেশ দেন। স্বপ্নাদেশানুসারে প্রাণনাথ ১৭০৪ খৃষ্টাব্দে কান্তনগরে একটি সুদৃশ্য মন্দির নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু এই মন্দিরে বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা তাঁহার জীবদ্দশাতে হয় নাই। রাজা প্রাণনাথের পুত্র রামনাথ বিগ্রহ দুইটিকে এই মন্দির উৎসর্গ করেন। এই মন্দিরের নয়টি বৃহৎ-চূড়া ছিল বলিয়া ইহা "নবরত্ন" নামে অভিহিত হয়। কিন্তু ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের বৃহৎ ভূমিকম্পে এই নয়টি শৃঙ্গ ভূমিসাৎ হওয়ায় ইহা অনেকটা শ্রীহীন হইয়া পড়িয়াছে। পূর্ব্বে নব-চূড়-যুক্ত অভ্রভেদ-চুম্বি কান্ত-মন্দিরকে দেখিলে মনে হইত যেন স্বয়ং বিশ্বকর্ম্মা নিভৃতে একটি স্বর্গীয় বিমান নির্ম্মাণ করিয়া লোক-চক্ষুর অন্তরালে বঙ্গ-প্রদেশে স্থাপিত করিয়াছেন। Buchanan Hamilton এই মন্দির দেখিয়া বলিয়াছেন—"The temple is by far the finest that

(১) কেহ কেহ বলেন এই মূর্ত্তি দুইটি বাগনগর হইতে আনীত হইয়াছে।

I have seen in Bengal." ভিত্তি ব্যতীত মন্দিরের অন্যান্য কোন অংশ নির্ম্মাণ করিতে কোন প্রস্তর ব্যবহৃত হয় নাই। মন্দিরের ভিত্তিটি ভীমকায় প্রস্তর-খণ্ড দ্বারা নির্ম্মিত। মন্দির-গাত্রে মহাভারত ও রামায়ণের ঘটনাবলির ছবি ব্যতীত ও প্রাত্যহিক সামান্য জীবনের ঘটনাবলির চিত্রও খোদিত হইয়াছে। এই চিত্রগুলির কতকগুলি ভিন্ন প্রায় সবই বুঝিয়া উঠিতে পারা যায় না। Mr. Fergusson এই মন্দির সম্বন্ধে বলেন,—

"In execution they (i. e. the curvings) display an immeasurable inferiority to the curvings on the old temples in Orissa or Mysore, but for richness of general effect and prodigality of labour this temple may be fairly allowed to compete with some of the earlier examples."

বাণনগর হইতে আনীত প্রস্তরাবলি দ্বারা এই মন্দিরের অনেক অংশ নির্ম্মিত হইয়াছে। প্রাণনাথের আর একটি কীর্ত্তি রাজবাটীর সন্নিকটে এক বৃহৎ দীর্ঘিকা খনন। দীর্ঘিকা খননের পর তিনি রামদেব ও জয়দেবের মাতা দ্বারা উৎসর্গ করান। এই জন্য এই দীঘির নাম মাতা-সাগর হইয়াছে।

রাজা রামনাথ

রাজা প্রাণনাথের কোন পুত্র না থাকায় তিনি রামনাথ নামক এক আত্মীয় বালককে দত্তক গ্রহণ করেন। রাজা প্রাণনাথ মানবলীলা সম্বরণ করিলে উক্ত রামনাথ ১৭১৯ খৃষ্টাব্দে রাজগদী প্রাপ্ত হন। ১৭৪৫ ও ১৭৫৪ খৃষ্টাব্দের দুইটি তাম্র-শাসন দ্বারা তাঁহার রাজত্বকাল নির্ণয় করা যায়। তদানীন্তন সুবাদার মুর্শিদকুলী খাঁ রাজা রামনাথের নিকট যথাকালে কর ও যথেষ্ট উপ-ঢৌকন প্রাপ্ত হইয়া রাজা রামনাথকে যুদ্ধোপযোগী বহু কামান ও অন্যান্য

অস্ত্রাদি প্রদান করেন। রাজা রামনাথ তাঁহার পিতা অপেক্ষাও অতীব প্রবল পরাক্রান্ত নরপতি ছিলেন। তৎকালীন সালবাড়ী পরগণার ভূস্বামী নবাব সরকারে রাজস্ব প্রেরণ না করাতে, বাঙ্গালার তদানীন্তন সুবাদার মুর্শিদকুলী তাহার প্রতি কুপিত হইয়া রাজা রামনাথকে সালবাড়ী পরগণা অধিকার করিবার আদেশ দেন। এই সম্পত্তি অধিকার বিষয়ে রাজা রামনাথের ধীশক্তির প্রাশস্ত্য বুঝা যায়। আবার এই বুদ্ধিশক্তির সহিত তাঁহার বাহুবলের এক অপূর্ব্ব সংযোগ হইয়াছিল। কথিত আছে, এই সালবাড়ী পরগণার ভূস্বামীর রক্ষাকর্ত্রী স্বরূপ কালিকা ও চামুণ্ডা বিগ্রহ ঐ জমিদারের বাটীতে প্রতিষ্ঠিত ছিল। এই বিগ্রহদ্বয় তাহার বাটীতে থাকিলে কেহ ভূস্বামীর অনিষ্টসাধনে সক্ষম হইত না। রাজা রামনাথ এই বিগ্রহদ্বয় স্বগৃহে আনয়নার্থে একটি চতুর ব্রাহ্মণ নিযুক্ত করিলেন। ব্রাহ্মণ এই চৌর্য্যবৃত্তিতে সফল হওয়ায় রামনাথের সহিত ভূস্বামীর ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত হয়। ইহাতে সালবাড়ীর ভূস্বামীর পরাজয় হয়। ভূস্বামী তাহার হৃতগৌরব উদ্ধার মানসে দ্বিতীয় বার রাজা রামনাথকে আক্রমণ করেন। এই যুদ্ধেও উক্ত ভূস্বামী পরাজিত হওয়াতে উক্ত পরগণা রামনাথের রাজ্যান্তর্গত হয়।[১] রাজা রামনাথ সালবাড়ী পরগণা অধিকার করিয়া বঙ্গের সুবাদারের নিকট রাজস্ব ও উপঢৌকন প্রেরণ করায় সুবাদার কর্ত্তৃক করনাই পরগণা রামনাথকে প্রসাদস্বরূপ প্রদত্ত হইল। ক্রমে রাজা রামনাথের কীর্ত্তিকাহিনী সুদূর দিল্লী নগরে বাদশাহের কর্ণে পৌঁছিল। ১৬৬৭ শকাব্দে রামনাথ ভারতের প্রধান প্রধান তীর্থস্থল দর্শন করিয়া সম্রাটের সাক্ষাৎমানসে দিল্লীতে উপস্থিত হইলেন। ভারতসম্রাট রাজা রামনাথকে অতীব আদর ও সম্মান

(১) Mr. Strong ভ্রম করিয়া গোবিন্দনগরের জমিদারী অধিকারের কথা উল্লেখ করিয়াছেন।

সৎকারে অভ্যর্থনা করিয়া দিল্লীর দরবারে মহারাজ উপাধি ও মাহি, মুরাতব প্রভৃতি বহু খেল্লাৎ দানে তাঁহাকে ভূষিত করিলেন। তিনি সম্রাট-কর্তৃক দৃঢ় দুর্গরচনার এবং সৈন্য ও অস্ত্রাদি রক্ষার আজ্ঞাপ্রাপ্ত হইয়া শ্রীবৃন্দাবনধামে গমন করিলেন, তথায় একটি গোপাল মূর্ত্তি ক্রয় করিয়া নিজ রাজধানীতে পুনরাগমন করেন। রাজা রামনাথ প্রবাস হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া গোপালগঞ্জের সুবিখ্যাত পচিশরত্ন মন্দির নির্ম্মাণ আরম্ভ করান। এই সময়ে বঙ্গে বর্গীর উপদ্রব আরম্ভ হইলে রামনাথ নিজ, প্রাসাদাদি দুর্ভেদ্য প্রাকার ও পরিখায় পরিবেষ্টিত করেন। এখনও স্থানে স্থানে তাহার ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়। তৎকালে রাজা রামনাথের বীরত্বকাহিনী এতদূর বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল যে, এই বর্গীদিগের ভয়ে অনেক ভদ্রলোক পদ্মা ও গঙ্গার দক্ষিণ পার হইতে বসবাস উঠাইয়া দিনাজপুর রাজ্যমধ্যে বাস স্থাপন করেন। কিন্তু সুখের বিষয় বর্গীগণ দিনাজপুরের কোন অনিষ্ট সাধনে সক্ষম হয় নাই। দুর্দ্ধর্ষ বর্গীগণ বঙ্গের বহু-স্থান লুণ্ঠন করাতে বাদশাহের বহু ক্ষতিসাধন হওয়ায়, সেই ক্ষতিপূরণার্থ বাদশাহ সমস্ত জমিদারদিগের উপর মাগন বসান। রাজা রামনাথ সর্ব্বাগ্রে বহু অর্থ চাঁদা দিয়া দিল্লীদরবারে প্রতিপত্তি লাভ করেন।

রাজা রামনাথ ১৬৭৬ শকাব্দে গোপালগঞ্জে প্রাণগোপাল নামক গোপালজীউকে স্থাপন করিয়া সুবিখ্যাত পচিশরত্ন মন্দির দান করেন। তাহার পর ঐ মন্দির অপবিত্র হওয়ায় তৎসমীপে পঞ্চরত্ন-মন্দির নির্ম্মিত হয়। এইরূপে রাজা রামনাথ অনেক কীর্ত্তি-স্থাপন করিয়া বহুপুণ্য ও প্রশংসা অর্জ্জন করেন। দিনাজপুর-রাজবংশ দানশীলতার জন্য সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। তাঁহাদিগের দানশৌণ্ডতার বিবরণ পাঠ করিলে ঐ সকল কেবল কল্পিত উপকথা বলিয়া মনে হয়। কিন্তু প্রকৃত-পক্ষে ঐসব কেবল মাত্র কল্পিত কাহিনী নহে, উহা জলন্ত সত্য।

এই বংশের দানশীল নরপতিগণের মধ্যে রাজা রামনাথই সর্ব্বাপেক্ষা অগ্রণী। তিনি দেবসেবা, ব্রাহ্মণসেবা ও মানবজাতির সেবায় প্রভূত দান করেন। তাঁহার দানশীলতার উপমা ভারতের সমগ্র রাজন্যবর্গের ইতিহাসে অল্পই দেখা যায়। তাহার লোক-হিতৈষণার ইচ্ছা এতই প্রবল ছিল যে, তিনি দিনাজপুর সহরের ৪ মাইল দক্ষিণে রামসাগর নামে তালবৃক্ষ-শোভিত এক মহতী দীর্ঘিকা খনন করাইয়া তাহার তীরে তুইদণ্ড কল্পতরু-ব্রত গ্রহণ করতঃ সমস্ত রাষ্ট্র, ভূসম্পত্তি ও অসংখ্য দ্রব্য দান করেন। রাষ্ট্রগ্রহীতা মন্ত্রী হরিশ্চন্দ্ররায়ের পুনঃ পুনঃ প্রার্থনাতে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের ব্যবস্থানুসারে মূল্য দ্বারা পুনর্ব্বার রাষ্ট্রগ্রহণ করেন।

রাজা রামনাথ

রাজা রামনাথের মনে বৈরাগ্যের উদয় হওয়ায় যৎকালে তিনি সমস্ত বিষয়-বৈভব দান করেন তৎকালে অর্থগৃধ্নু রঙ্গপুরের ফৌজদার তাঁহার রাজধানী আক্রমণ করেন। (১) নাজিম সৈয়দ আহম্মদ মুর্শিদাবাদ হইতে প্রচুর সৈন্য সংগ্রহ পূর্ব্বক দিনাজপুরের ধনাগার লুণ্ঠন করেন। রামনাথ গোবিন্দনগরে পলায়ন করিয়া স্ত্রীপুত্র ও আত্মরক্ষা করেন। (১) ফৌজদার বহু অর্থ লুণ্ঠন করিয়া স্বরাজ্যে প্রত্যাগমন করিলে পর গঙ্গাস্নান গমনের ছলে রাজা রামনাথ নিজ বালক পুত্রদ্বয় সহ মুর্শিদাবাদে গমন করিয়া তদানীন্তন বাঙ্গালার সুবাদার সুজাউদ্দিনের নিকট ফৌজদারের অত্যাচার কাহিনী বর্ণনা পূর্ব্বক তাহার শাসন প্রার্থনা করেন। পাপিষ্ঠ ফৌজদারকে ধৃত করিবার নিমিত্ত সুজাউদ্দিন রামনাথকে এক দল সৈন্য প্রদান করেন। সেই সৈন্য গ্রহণ পূর্ব্বক দিনাজপুরে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া আরও প্রচুর সৈন্য সংগ্রহ করিয়া ফৌজদারের বিরুদ্ধে অভিযান করেন।

---

(১) Stewart সাহেবের মতে এই সময় কোচবিহাররাজ ও সৈয়দ আহম্মদ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া পার্ব্বত্য প্রদেশে পলায়ন করেন—History of Bengal p. 490.

এইরূপে ক্রমে ফৌজদারের সহিত রাজা রামনাথের এক ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত হয়। যুদ্ধে নৃশংস ফৌজদারকে জীবদ্দশায় ধৃত করিতে না পারায় রামনাথ তাহার শিরশ্ছেদন করেন। ফৌজদার হত হইলে রামনাথ তাঁহার অধিকৃত পাঁচটি পরগণা নিজ রাজ্যান্তর্গত করেন। এইরূপে রাজা রামনাথ ফৌজদারকে দমন করিয়া সুবাদার সমীপে বহু দ্রব্যাদি উপহার প্রদান করেন। রাজা রামনাথের শেষ জীবন বেশ শান্তি ও সুখে কাটিয়াছিল। "দিনাজপুর রাজকুলের মধ্যে রাজা রামনাথ সর্ব্বাপেক্ষা কৃতী, কীর্ত্তিমান ও সৌভাগ্যবান পুরুষ ছিলেন।" তাঁহার পরামর্শ-দাতা অগণ্য গুণশালী মন্ত্রী হরিশ্চন্দ্র রায়ের সাহায্যে রামনাথ ঐ সকল গুণের অধিকারী হন। রাজা রামনাথের সময় তদানীন্তন বঙ্গ সুবাদারের দেওয়ান রঘুনন্দন রায় রায়াঁর ভ্রাতা নাটোর-রাজ রামজীবন রায়ের নিজ কন্যার বিবাহে বাঙ্গালার সমস্ত রাজগণ নিমন্ত্রিত হন। এই বিবাহে দিনাজপুর-রাজ রামনাথ ব্যতীত বর্দ্ধমান-রাজ, নদীয়া-রাজ, প্রভৃতি বঙ্গের আর আর নৃপতিগণ উপস্থিত ছিলেন। দিনাজপুর রাজ স্বয়ং এই বিবাহে না গিয়া তাঁহার মন্ত্রী হরিশ্চন্দ্র রায়কে নাটোর প্রেরণ করেন। হরিশ্চন্দ্র নাটোরে গমন করিয়া প্রথমে অনাদৃত হওয়াতে পরে নিজ বুদ্ধি-কৌশলে অত্যন্ত সমাদৃত ও প্রশংসিত হন। তৎপর হরিশ্চন্দ্র নাটোর-রাজের সহিত দিনাজপুর-রাজের ভ্রাতৃ-সম্বন্ধ স্থাপন করান। অদ্যাপি দুই রাজবংশের মধ্যে সেই ভ্রাতৃ-সম্বন্ধ চলিয়া আসিতেছে। রাজা রামনাথ সুকৃতির সহিত ৪২ বৎসর-কাল রাজত্ব করিয়া ১৬৮২ শকাব্দে মানবলীলা সম্বরণ করেন। মহাপ্রাণ রামনাথের ধর্ম্ম ও বীরত্ব-কাহিনী ভারতের ইতিহাসে জ্বলন্ত অক্ষরে লিখিত থাকিবে।

রাজা রামনাথ পৃথিবীতে অতুলনীয় কীর্ত্তি রাখিয়া ইহলোক ত্যাগ করিলে পর তাঁহার কৃষ্ণনাথ, বৈদ্যনাথ, ও কান্তনাথ এই তিন পুত্র

পরস্পর হিংসাযুক্ত হওয়ায় জ্যেষ্ঠ পুত্র কৃষ্ণনাথ পিতার শ্রাদ্ধাদি সম্পন্ন করিয়া রাজ্য প্রাপ্তির ইচ্ছায় দিল্লী গমন করেন। দিল্লীর দরবারে মহারাজ উপাধি ও রাজ্য প্রাপ্তির সনন্দ লইয়া যৎকালে তিনি মাতৃ-ভূমিতে প্রত্যাগমন করিতেছিলেন, সেই সময়ে তিনি দিনাজপুরের অন্তর্গত করদাহের বাড়ীতে আসিয়াই জ্বরে প্রাণত্যাগ করেন। তাঁহার

বৈদ্যনাথ

মৃত্যুর পর রামনাথের তৃতীয় পুত্র বৈদ্যনাথ সমুদায় রাজ্য অধিকার করেন। এই বৈদ্যনাথের রাজ্য-প্রাপ্তির সময় মীরকাশীম বাঙ্গালার নবাব হইয়া মুর্শিদাবাদ ত্যাগ করতঃ মুঙ্গেরে স্বীয় রাজধানী স্থাপন করেন। মীরকাশীম বঙ্গের সুবাদার হইয়াই বাঙ্গালার রাজা ও জমিদারগণের রাজস্ব বৃদ্ধির আজ্ঞা দেন। এইরূপে রাজা বৈদ্যনাথের প্রতিও রাজস্ব দেওয়ার আজ্ঞা প্রচারিত হইল। কিন্তু বৈদ্যনাথ বর্দ্ধিত রাজস্ব দিতে অস্বীকার করায় মীর-কাশীম তাঁহাকে বৃটীশ-পক্ষপাতী ও নিজ বিরোধী জ্ঞান করিয়া ছল পূর্ব্বক দেখা করার প্রয়োজন প্রকাশ করতঃ মুঙ্গেরে আহ্বান করেন। রাজা বৈদ্যনাথ মীরকাশীমের কূটনীতি বুঝিতে না পারিয়া মুঙ্গেরে উপস্থিত হইলে মীরকাশীম তাঁহাকে মুঙ্গেরের দুর্গে অবরুদ্ধ করিলেন। বৈদ্যনাথ স্বীয় বিপদ-বার্ত্তা গূঢ় পুরুষ দ্বারা স্বীয় অগ্রজ-পুত্র কান্তনাথের নিকট প্রেরণ করেন। কান্তনাথ কিন্তু উহা রাজ্যপ্রাপ্তির সুযোগ বোধ করিয়া বৈদ্যনাথের সঞ্চিত অর্থ গ্রহণ পূর্ব্বক বৃটীশদিগের নিকট খালিসা দপ্তরে রাজ্যপ্রাপ্তির সনন্দ প্রার্থনা করেন। এই সময় মীরকাশীম বৃটীশ-দিগকে পদচ্যুত করিবার অভিপ্রায়ে অযোধ্যা-নবাবের সাহায্য লইতে মুঙ্গের হইতে অযোধ্যায় গমন করেন। এই অবকাশে রাজা বৈদ্যনাথ দুর্গপালকে অর্থ দ্বারা বশীভূত করিয়া মুঙ্গের দুর্গ হইতে পলায়ন করিয়া স্বীয় মাতৃভূমিতে প্রত্যাবৃত্ত হন। তিনি কান্তনাথের দুরভিসন্ধি জানিতে

পাবিয়া খালিসা দপ্তরে নিজ জীবিতাবস্থা জানাইয়া পুনর্ব্বার রাজ্যভার গ্রহণ করেন। ইহার পর রাজা বৈদ্যনাথ কান্তনাথকে পৃথগন্ন করিয়া দেন। তাহার পর বৈদ্যনাথ খ্যাতনামা পিতৃ-পিতামহের ন্যায় একটি দীঘি খনন করিতে ইচ্ছা করিলেন। কিন্তু তৎকালে বাঙ্গালা দেশে ভয়ানক দুর্ভিক্ষ হওয়াতে দীঘি দেওয়া স্থগিত রহিল। ইহার কয়েক বৎসর পর বৈদ্যনাথ স্বীয় ইচ্ছানুসারে দীর্ঘিকা খনন আরম্ভ করাইলেন। দীর্ঘিকা খনিত হইলে উহা তিনি স্বয়ং উৎসর্গ না করিয়া নিজ পত্নী রাণী সরস্বতী বা আনন্দময়ীর দ্বারা উৎসর্গ করাইয়াছিলেন। তাহাই সেই দীঘির নাম আনন্দ-সাগর হইয়াছে। তৎপরে রাজা বৈদ্যনাথ সেই আনন্দসাগরের তটের নিকট হইতে দুইটি খাল খনন করাইয়া মাতা-সাগরের পূর্ব্বদিক পর্য্যন্ত আনিয়াছিলেন। সেই খাল দুইটির নাম রামদাঁড়া। এই রামদাঁড়ার ধ্বংসাবশেষ এখনও কাউগাও হইতে দিনাজপুর আসিতে পথিকের নয়ন গোচর হয়।১

রাজা বৈদ্যনাথের কোন ঔরস সন্তান না থাকায় তিনি ১৬৯৮ শকাব্দে এক জ্ঞাতি পুত্রকে দত্তক লইয়া তাহার নাম রাধানাথ রাখেন। রাজা বৈদ্যনাথ ১৯ বৎসর কাল সুকীর্ত্তির সহিত রাজত্ব করিয়া ১৭০১ শকাব্দের চৈত্র মাসে গঙ্গাতীরে দেহরক্ষা করেন।

সপ্তম অধ্যায়

বৃটীশ-রাজত্ব।

১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী পদলাভ করেন। সমগ্র বঙ্গদেশের রাজস্ব আদায়ের ভার

---

(১) Buchanan Hamilton এর মতানুসারে এই রামদাঁড়া রাধানাথের রাজত্বকালে রাজা বৈদ্যনাথের শ্যালক রামকীরামের আদেশে খনিত হইয়াছিল। (Hamilton's Dinajpur District P. 29.)

দিল্লীর বাদসাহের নিকট প্রাপ্ত হইয়া ঐ কোম্পানী দিনাজপুরে একজন ইংরেজ কলেক্টর নিযুক্ত করিলেন। এই সময় হইতেই দিনাজপুর রাজবংশের আর্থিক অবস্থার অধঃপতন হইতে আরম্ভ করিল। পূর্ব্বে রাজা রামনাথের সময় দিনাজপুর-রাজ-সম্পত্তির আয় ৫০ লক্ষ টাকা ছিল। আর আধুনিক মহারাজের আয় ৩৷০ লক্ষ টাকা মাত্র। যখন সমস্ত জিনিষ সস্তা ছিল, সে সময় কুচবিহারের মহারাজের রাজস্ব দিনাজপুর হইতেও অনেক কম ছিল; সেই সময় দিনাজপুর-রাজ বাঙ্গালা দেশের সর্ব্বপ্রধান জমিদার বলিয়া পরিগণিত হইতেন। কিন্তু রাজা রাধানাথের সময় হইতেই দিনাজপুর রাজসম্পত্তির ধ্বংস আরম্ভ হয়।

১৭৭৯ খৃষ্টাব্দে রাজা বৈদ্যনাথ পরলোক গমন করিলে তদীয় নাবালক পুত্র রাধানাথ রাজ-গদী প্রাপ্ত হন। কিন্তু বৈদ্যনাথের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা কান্তনাথের ও বৈদ্যনাথের দত্তক পুত্র রাধানাথের সহিত উত্তরাধিকারিত্ব লইয়া বিবাদ উপস্থিত হয়। রাজা বৈদ্যনাথ কান্তনাথের প্রতি তাদৃশ সন্তুষ্ট না থাকাতে রাধানাথকে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করেন। ইহাদিগের মধ্যে

রাজা রাধানাথ

বিবাদ উপস্থিত হওয়ায় সকাউন্সিল গভর্ণর জেনারেলের উপর বিবাদ মীমাংসার ভার অর্পিত হয়। গভর্ণর জেনারেল ওয়ারেণ হেষ্টিংস দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দের পরামর্শানুসারে কিশোর বয়স্ক রাধানাথকে উত্তরাধিকারী নির্ব্বাচন করিয়া একখানি সনদ প্রদান করেন। কিন্তু রাধানাথকে সম্পত্তি দিবার পূর্ব্বে দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ হেষ্টিংস সাহেবের নাম করিয়া নাবালক পক্ষীয়গণের নিকট ৪ চারি লক্ষ টাকা দাবী করিলেন; এই চারি লক্ষ টাকা না দিলে রাধানাথের জমীদারী প্রাপ্তি লইয়া বিশেষ গোলযোগ ঘটিবে ইহাও তাঁহাদিগকে বলিয়া দেওয়াতে অগত্যা তাঁহারা দেওয়ানকে টাকা দিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। বলা বাহুল্য, এই সব হেষ্টিংস ও তৎপ্রিয়পাত্র গঙ্গাগোবিন্দের ষড়যন্ত্রানু-

সারেষ্ট হইয়াছিল। নাবালক রাধানাথের নিকট চারি লক্ষ টাকা গ্রহণ করা হেষ্টিংস সাহেবের এক ভীষণ কলঙ্ক। হেষ্টিংসের পক্ষে এরূপ বিচার বিক্রয় প্রথা অনুসরণ করা যে অতীব নিন্দনীয় ও হেয় কার্য্য হইয়াছে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু সুখের বিষয় এই চারি লক্ষ টাকার মধ্যে দুই লক্ষ টাকা কোম্পানার কার্য্যে প্রদত্ত হয়, আর বাকী দুই লক্ষ টাকা স্বয়ং হেষ্টিংস ও তাহার প্রিয়পাত্র আত্মসাৎ করেন। অপ্রাপ্ত বয়স্ক রাধানাথকে সম্পত্তি প্রদান করিয়া গভর্ণর জেনারেল হেষ্টিংস দিনাজপুর রাজসম্পত্তি গভর্ণমেণ্টের তত্ত্বাবধানে রাখিবার নিমিত্ত নরপিশাচ দেবীসিংহকে দিনাজপুরের দেওয়ান নিযুক্ত করিলেন।

দেবীসিংহ

১৭৮১ ও ১৭৮২ এই দুই বৎসরে নরপিশাচ দেবী-সিংহের অত্যাচারে দিনাজপুর মহাশ্মশানে পরিণত হয়। দেবীসিংহের অত্যাচার কাহিনী শ্রবণ করিলে আজিও অনেক কোমলহৃদয়া মহিলা মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়েন। তাহার অত্যাচারের বিবরণ পাঠ করিলে কল্পিত গল্প বলিয়া মনে হয়; কিন্তু এ সব জলন্ত সত্য। দেবীসিংহের নাম শুনিলে এখনও উত্তর-বঙ্গবাসী ভয়ে শিহরিয়া উঠে। “সমগ্র মানব জাতির ইতিহাসে এরূপ পাশবিক অত্যাচারের দৃষ্টান্ত অধিক নাই বলিয়াই আমাদিগের বিশ্বাস। মানুষ হইয়া মানুষের প্রতি এরূপ পৈশাচিক ব্যবহার সম্ভবপর কিনা তাহা আমরা স্থির করিয়া উঠিতে পারি না। কল্পনা সে চিত্র আঁকিতে গেলে আপনিই ভীত ও চকিত হইয়া উঠে।” তাই বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছেন “পৃথিবীর ওপারে ওয়েষ্টমিনিষ্টার হলে দাড়াইয়া এড্মণ্ড বার্ক দেবীসিংহকে অমর করিয়া গিয়াছেন। পর্ব্বতোৎগীর্ণ অগ্নি-শিখাবৎ জ্বালাময় বাক্যস্রোতে বার্ক দেবীসিংহের দুর্ব্বিষহ অত্যাচার অনন্ত-কাল সমীপে পাঠাইয়াছেন। তাঁহার নিজ মুখে সে দৈববাণীতুল্য বাক্য-পরম্পরা শুনিয়া শোকে অনেক স্ত্রীলোক মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িয়াছিলেন।

আজিও শত বৎসর পরে সেই বক্তৃতা পড়িতে গেলে শরীর রোমাঞ্চিত ও হৃদয় উন্মত্ত হয়।

দিনাজপুরের সদর খাজানা অন্যান্য জেলার সদর খাজানা হইতে অনেক বেশী। এই জেলায় শতকরা ৫০৲ টাকা রাজস্ব দিতে হয়। দেবীসিংহই এই রাজস্বের উচ্চহারের প্রবর্ত্তক। দেবীসিংহের দেওয়ানীর পর তাঁহারই জমাদাবী সংক্রান্ত কাগজ পত্র দৃষ্টে পরবর্ত্তী কলেক্টরগণ দিনাজপুরের রাজস্ব নির্দ্ধারণের হার বাঁধিয়া দেন। কিন্তু এ সম্বন্ধে আর একটি মতও প্রচলিত দেখা যায়। এই মতানুসারে দেবীসিংহের পরবর্ত্তী কলেক্টর মিঃ হ্যাচের কার্য্য-কুশলতায় দিনাজপুরের রাজস্বের উচ্চহার নির্দ্দিষ্ট হয়। ইংরেজ শাসনের প্রথম প্রবর্ত্তন হইবার সময় এতদ্দেশীয় কর্ম্মচারিগণ প্রজার জমি সম্বন্ধে কোনও সঠিক খবর ইংরেজ রাজ সমক্ষে উপস্থিত করিতেন না। কিন্তু স্বয়ং মিঃ হ্যাচ্ প্রত্যেক কার্য্য পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরিদর্শন করিতেন বলিয়া তিনি রাজস্বের এরূপ উচ্চহার নির্দ্দিষ্ট করিতে পারিয়াছিলেন।

দেবীসিংহ মাসিক এক হাজার টাকা বেতনে নাবালক রাজার দেওয়ান নিযুক্ত হইলেন। দেওয়ানী-পদ লাভ করিয়া দেবীসিংহ প্রত্যেক বিভাগে নিজের মনোমত কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিয়া দিনাজপুর সংসারের সমস্ত পুরাতন কর্ম্মচারীকে পদচ্যুত করিলেন। এই সময় তদীয় মিত্র রঙ্গপুরের তদানীন্তন কলেক্টর গুড্‌ল্যাড্ সাহেবের সহিত পরামর্শ করিয়া রাধানাথের মাসিক বৃত্তি ১৬০০ ষোল শত টাকা হইতে ৬০০৲ ছয় শত টাকা করিয়া দিলেন। এক হাজার টাকা মাসহারা কমিয়া যাওয়াতে রাধানাথের কিরূপ কষ্ট উপস্থিত হইল তাহা সহজেই অনুমিত হইতে পারে। দেওয়ানী পদলাভের পর বৎসর দেবীসিংহ রঙ্গপুর, দিনাজপুর ও ইদ্রাক্‌পুর এই প্রদেশ ত্রয়ের

দেবীসিংহ

ইজারা বন্দোবস্ত করিয়া লয়েন। তৎকালে যে ব্যক্তি যে প্রদেশের দেওয়ান নিযুক্ত হইতেন তাহাকে সেই প্রদেশের ইজারা দেওয়া হইত না। কিন্তু দেবীসিংহ দেওয়ান হইয়াও দিনাজপুর প্রদেশের ইজারা গ্রহণ করেন। দেবীসিংহ ইজারা লইয়া দিনাজপুরে পৈশাচিক লীলার অভিনয় আরম্ভ করিলেন। ত্রিগুণ ও চতুর্গুণ হারে রাজস্ব দিতে অক্ষম হওয়ায় ভূস্বামিগণ শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়া কারাগারে প্রেরিত হইল। রাজস্ব অনাদায়ের জন্য তাহাদিগের সম্পত্তি অল্প মূল্যে বিক্রীত হইতে লাগিল। বলা বাহুল্য দেবীসিংহ সেই সব সম্পত্তি কল্পিত নামে ক্রয় করিয়া লইলেন। এই সময় দিনাজপুর ও রঙ্গপুর প্রদেশে অনেক স্ত্রী জমীদার থাকায় তাঁহাদিগের উপর অমানুষিক অত্যাচার হইতে লাগিল। দেবীসিংহ তাঁহাদিগের অন্দরে স্ত্রী পদাতিক পাঠাইয়া বলপূর্ব্বক তাঁহাদিগের ধন, রত্ন ও অলঙ্কারাদি ক্রোক করিয়া লইতেন। তাহার পর অত্যাচার-স্রোত কৃষকগণ ও মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকগণের উপর দিয়া প্রবাহিত হইতে লাগিল। পিতা-পুত্রকে একসঙ্গে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া কণ্টকযুক্ত বিল্বের ডাল দ্বারা বেত্রাঘাত করা হইত। দেবীসিংহের নিযুক্ত কর্ম্মচারিগণ দ্বারা অসূর্য্যম্পশ্যা মহিলা-গণের পবিত্রতা হরণ তৎকালে কোন দূষণীয় কার্য্য বলিয়া পরিগণিত হইল না। কুলবধূগণকে সাধারণের সমক্ষে উলঙ্গিনী করিয়া দেবীসিংহের পৈশাচিক চরগণ অবিরত বেত্রাঘাত করিত। দেবীসিংহের অত্যাচার বর্ণনা করিতে গেলে হৃদয় কাঁপিয়া উঠে। "মহামতি বার্ক ইংলণ্ডের মহা-সমিতির নিকট সেই অত্যাচার কাহিনী বর্ণনা করিতে করিতে এরূপ অস্থির হইয়া উঠিয়াছিলেন যে, আর অধিক দূর অগ্রসর হইতে পারেন নাই।"

দেবীসিংহের অত্যাচারে রঙ্গপুর প্রদেশের প্রজাগণ বিদ্রোহী হইয়া দিনাজপুরের প্রজাদিগকে তাহাদের সহিত যোগ দিবার জন্য আহ্বান

করে। অবশেষে গভর্ণমেণ্টসৈন্যের সহিত পাটগ্রাম নামক স্থানে প্রজাগণের ভীষণ যুদ্ধ বাধিল। তাহাতে প্রজাগণ পরাস্ত হইয়া দলে দলে কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইল। এত অত্যাচার করিয়াও দেবীসিংহের কোন শাস্তি হইল না। তিনি তাঁহার প্রিয়বন্ধু তৎকালীন নাজিম মহম্মদ রেজা খাঁর বিচারে নির্দ্দোষী বলিয়া নিষ্কৃতি পাইলেন। প্রজাগণের প্রতি এইরূপ অত্যাচার ও উৎপীড়ন ও নিজের সম্ভ্রম নষ্টের আশঙ্কা দেখিয়া কোমলহৃদয়া রাণী সরস্বতীর মনে বিদ্রোহ ভাব জাগাইয়া তুলিল। কিন্তু এই বিদ্রোহ ভাব কার্য্যে পরিণত হয় নাই।

রাজা দেবীসিংহের পর দিনাজপুরের রাজস্ব আদায়ের ভার রাণী সরস্বতীর সহোদর জানকীরামের উপর ন্যস্ত হয়। ১৭৮৬ খৃষ্টাব্দে জানকী-রাম অত্যাচার জর্জ্জরিত প্রজাগণের নিকট হইতে রাজস্ব সংগ্রহ করিতে না পারায় তাঁহাকে মাত্র তিন দিন বেশী সময় দেওয়া হইল। কিন্তু ইহাতেও তিনি অসমর্থ হওয়ায় তাঁহাকে একরূপ বন্দীভাবে কলিকাতায় লইয়া যাওয়া আছে। কথিত আছে, তিনি কলিকাতায় ঋণের দায়ে এতদ্দেশীয় বারাণসী ঘোষ নামক একটি বণিক দ্বারা কারাগারে প্রেরিত হন। ১৭৯০ খৃষ্টাব্দে তিনি সেই স্থানেই দেহত্যাগ করেন।

১৭৯২ খৃষ্টাব্দে রাজা রাধানাথ স্বয়ং সম্পত্তি পরিচালনার ক্ষমতা প্রাপ্ত হন। ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে রাজ-সম্পত্তির Managing Collector Board of Revenueতে চলিয়া গেলে মিঃ জন ইলিয়েট্ তাহার স্থানে নিযুক্ত হন। রাজা রাধানাথ এই সময় মিঃ হ্যাচ্ নিযুক্ত কর্ম্মচারিগণকে বরখাস্ত করিয়া গভর্ণমেণ্টের বিরাগভাজন [illegible]র প্রিয় কর্ম্মচারিগণকে নিযুক্ত করায় তিনি ইংরেজের বিষ-দৃষ্টিতে পতিত হন। ১৭৯৪ খৃষ্টাব্দে বড়লাট স্থির করিলেন যে, রাজা রাধানাথকে সম্পত্তি পরিচালনের ভার দেওয়া হইবে না। তাহার পর

রাজা রাধানাথ

ঐ সময়ে মিঃ ইলিয়ট রাজা রাধানাথের নামাঙ্কিত শীল মোহর রাজবাটী হইতে লইয়া গিয়া কলেক্টরের ট্রেজারীতে বন্ধ করিয়া রাখিলেন। রাজ্য পরিচালনের ভার রামকান্ত রায়ের উপর পতিত হইল।

১৭৯৬ খৃষ্টাব্দে রাজা রাধানাথ পুনরায় নিজ সম্পত্তি প্রাপ্ত হইলেন। কিন্তু ১৭৯৭ খৃষ্টাব্দে রাজস্ব বাকী পড়াতে বোর্ড অব রেভেনিউএর আজ্ঞানুসারে দিনাজপুর রাজ-সম্পত্তির কতকাংশ বিক্রয় করিয়া দেওয়া হয়। এইরূপে দিনাজপুর-রাজ্যের অধঃপতন আরম্ভ হইল। ১৭৯৭ খৃষ্টাব্দের পরবর্তী কয়েক বৎসর পূর্ব্ববৎ সদর খাজানা বাকী পড়ায় পুনর্ব্বার রাজ-সম্পত্তির অনেকাংশ বিক্রয় করা হইল। কিন্তু এই সময়ে রাজা রাধানাথ নীরবে বসিয়া ছিলেন না। তিনি তাঁহার সম্পত্তি রক্ষার্থ যথোচিত চেষ্টা করিয়াছিলেন। রাধানাথের মাতা রাণী সরস্বতী ও সহধর্ম্মিণী রাণী ত্রিপুরা-সুন্দরী কল্পিত নামে সম্পত্তি ক্রয় করিতে আরম্ভ করিলেন। ক্রমে অবস্থা এরূপ শোচনীয় হইয়া উঠিল যে ১৮০০ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে রাজা তাঁহার নিজবাটীতে উত্তমর্ণগণের ভয়ে বন্দীভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ইংরেজ-রাজ কর্ত্তৃক এইরূপ অপমানিত হইয়া ১৮০১ খৃষ্টাব্দে মাত্র ২৪ বৎসর বয়সে রাজা রাধানাথ মানবলীলা সম্বরণ করিলেন। রাজা রাধানাথ কিরূপ প্রকৃতির লোক ছিলেন, তাহা আমাদিগের পক্ষে বুঝা ভার। যে হেষ্টিংস তাহাদের সর্ব্বনাশের ত্রুটি করেন নাই, সেই হেষ্টিংসের সুবিচারের কথা তিনিও কোন সময়ে উল্লেখ করিয়াছিলেন। হেষ্টিংস কর্ত্তৃক এতদূর অপমানিত হইয়াও এই রাধানাথই অবশেষে হেষ্টিংস সাহেবের প্রশংসা করিয়া লিখিয়া পাঠাইয়া ছিলেন।*

* ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে নীলকরগণের অত্যাচারের সময় Mr Carey এই জেলায় মদনবাটি নামক স্থানে মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন করেন। ইহাই বঙ্গদেশে সর্ব্বপ্রথম

ইতিপূর্ব্বে বহুকালের পুরাতন দিনাজপুর-রাজসম্পত্তির কিরূপে ধ্বংস সাধিত হয় তাহা আমরা দেখাইয়াছি। যে রাজবংশের পূর্ব্ব-ইতিহাস গৌরবমণ্ডিত, যে রাজবংশে প্রাণনাথ ও রামনাথের ন্যায় মহাপ্রাণ ব্যক্তিগণ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন; যাঁহারা বহুকাল বঙ্গদেশে দানশীল নরপতি বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন, তাঁহাদিগের এই বৃহৎ সম্পত্তির ধ্বংস-সাধন যে অতীব নিষ্ঠুরতার কাজ হইয়াছে, ইহা দ্বিধাশূন্য ভাবে বলা যাইতে পারে। এত বড় একটি রাজসম্পত্তি ইংরেজরাজের ভয়ের কারণ ছিল বলিয়াই বোধ হয়, ইংরেজ গভর্ণমেণ্ট উহার উচ্ছেদসাধনে তৎপর ছিলেন।(১)

দিনাজপুর রাজসম্পত্তি-ধ্বংসের পর বঙ্গের সর্ব্বসাধারণের মনোযোগ আকর্ষক কোন ঘটনা ঘটে নাই। ১৮০১ খৃষ্টাব্দে রাজা রাধানাথের অপুত্রকাবস্থায় মৃত্যু হওয়াতে রাণী ত্রিপুরাসুন্দরী গোবিন্দনাথ নামক একটি বালককে দত্তক গ্রহণ করিলেন। ১৮১৭ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮৪১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজা গোবিন্দনাথ নির্ব্বিঘ্নে রাজ্য-পালন করেন। রাজা গোবিন্দনাথ অতীব কার্য্য-কুশলী জমিদার ছিলেন। তিনি তাঁহার পিতার হৃতসম্পত্তি সকল পুনরুদ্ধারের নিমিত্ত যথেষ্ট চেষ্টা করেন এবং তাঁহার চেষ্টা অনেকটা সফল হইয়াছিল।

রাজা গোবিন্দনাথ

মুদ্রাযন্ত্র। এই যন্ত্র সাহায্যে কেরী ও তাহার সহচরগণ একখানি ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় পত্রিকা প্রচার করিতে আরম্ভ করেন।

১ "Opinions may differ as to the expediency of breaking up this large and ancient estate, but there can be no question that the poli cy of the government. however legal, was unduly harsh. ... ... that such a large possession as that of the Ra ja of Dinajpur was a Standing menace to Government..........."
(F. W. Strong-Dinajpur. p. 27)

রাজা গোবিন্দনাথ পরলোকগমন করিলে তদীয় কনিষ্ঠ পুত্র তারকনাথ রাজগদী প্রাপ্ত হন। তাঁহার রাজত্বকালে, ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে বঙ্গদেশে সিপাহীবিদ্রোহ আরম্ভ হয়। যখন ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান নগরগুলি নরহত্যা, স্ত্রী ও শিশুহত্যার পৈশাচিক অভিনয়ের কেন্দ্রস্থল ছিল। তখন দিনাজপুরবাসিগণ নির্ব্বিবাদে শান্তি ও সুখভোগ করিতেছিল। সিপাহী বিদ্রোহের সম্বন্ধে দিনাজপুরে বেশ একটি মজার গল্প প্রচলিত আছে। যখন জল্‌-পাইগুড়ি হইতে বিদ্রোহী সিপাহীগণ দিনাজপুরের ধনাগার লুণ্ঠন-মানসে বীরগঞ্জ পর্য্যন্ত পৌঁছে, তখন তাহারা কয়েকটি তামাসা প্রিয় কৃষককে সহরের রাস্তা দেখাইয়া দিতে বলে। তাহারা সিপাহীগণকে রাস্তা দেখাইয়া বলিল যে, দিনাজপুরের একদল ইংরেজসৈন্য তাহাদিগের আগমন-বৃত্তান্ত জানিতে পারিয়া আক্রমণ করিতে আসিতেছে। সিপাহী-গণ ইহাতে ভীত হইয়া মালদহাভিমুখে পলায়ন করে। কিন্তু প্রকৃত-পক্ষে দিনাজপুরে তখন কোন সৈন্য ছিল না।

রাজা তারকনাথ

রাজা তারকনাথ ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে অপুত্রকাবস্থায় পরলোকগমন করেন। তারকনাথের মৃত্যুর পর তৎপত্নী রাণী শ্যামমোহিনী গিরিজানাথ নামক এক বালককে দত্তক গ্রহণ করেন। এই গিরিজা-নাথই বর্ত্তমান দিনাজপুরাধিপতি। পূর্ব্বেই বলি-য়াছি, দিনাজপুর রাজবংশ বহুকাল হইতেই পরহিতৈষণা ও দয়ার্দ্র চিত্ততার জন্য বিখ্যাত। এই রাজবংশের পূর্ব্বপুরুষগণই লোকহিতার্থে তাঁহা-দিগের রাজ্যমধ্যে বৃহৎ বৃহৎ দীঘি খনন করান। ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে যখন সমস্ত বঙ্গে দুর্ভিক্ষের ভেরী বাজিয়া উঠিল, যখন বঙ্গদেশের স্ত্রী-পুরুষ ও শিশুগণ অন্নক্লিষ্ট হইয়া প্রাণত্যাগ করিতে লাগিল, সেই সময় দুর্ভিক্ষ-প্রপীড়িত প্রজাগণের কষ্টনিবারণার্থে রাণী শ্যামমোহিনী

মহারাণী শ্যামমোহিনী

গভর্ণমেণ্টের হস্তে প্রচুর অর্থ প্রদান করেন। গভর্ণমেণ্ট এই সৎকার্য্যের জন্য তাঁহাকেও মহারাণী 'উপাধি-ভূষণে' সজ্জিত করিলেন। বর্ত্তমান মহারাজ শ্রীল শ্রীযুক্ত গিরিজানাথ রাজগদী প্রাপ্ত হইবার কিছুকাল পরে গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে মহারাজ উপাধি প্রদান করেন। কিন্তু তখন দিনাজপুররাজের পক্ষ হইতে এই আপত্তি উত্থাপন করা হয় যে, এই উপাধি তাঁহাদিগের নিকট নূতন নহে; দিল্লীর বাদশাহ রাজা বৈদ্যনাথকে এই উপাধি প্রদান করেন। আবার এদিকে কলেক্টরের নিকট জমিদারী-সংক্রান্ত পুরাতন কাগজপত্রে শুধু রাজা উপাধি দেখিতে পাওয়া যায়। সিপাহী-বিদ্রোহের পর গভর্ণর জেনারেল লর্ড লরেন্স রাজবংশের নবাব প্রদত্ত পুরাতন উপাধিগুলি পুনর্জ্জীবিত-মানসে রাজবংশের ফরমানসকল দেখিতে চান। প্রধান কর্ম্মচারীসহ ফরমানগুলি নৌকাযোগে কলিকাতায় প্রেরণ করা হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে নবদ্বীপের নিকট নৌকাগুলি ঝটিকাক্রান্ত হইয়া যাত্রীগণ ও ফরমানসহ গঙ্গাবক্ষে নিমজ্জিত হয়। ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে ইংরেজ গভর্ণমেণ্ট রাজভক্তির জন্য বিদ্যোৎসাহী, সাহিত্যানুরাগী, বিনয়ী, পরহিতৈষী, গিরিজানাথকে মহারাজা বাহাদুর উপাধিতে ভূষিত করেন। এই সময়ে গভর্ণমেণ্ট মহারাজা বাহাদুরকে ১০০ একশত সশস্ত্র সৈন্য রাখিবার অধিকার প্রদান করেন। মহারাজা বাহাদুরের ঔরসজাত পুত্র না থাকায় তিনি জগদীশনাথ নামক এক বালককে দত্তক গ্রহণ করেন। গভর্ণমেণ্ট বাহাদুর রাজপুত্র জগদীশনাথকে মহারাজ-কুমার উপাধি প্রদান করেন।

মহারাজা গিরিজানাথ

১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের প্রবল ভূমিকম্পে কারুকার্য্যময় কান্তমন্দিরের নয়টি অত্যুচ্চ শৃঙ্গ স্খলিত হইয়া পড়ে। মহারাজ গিরিজানাথ অপরিমিত অর্থব্যয়ে জীর্ণ মন্দিরের সংস্কারসাধন করিয়া একদিকে যেমন পূর্ব্বপুরুষের

গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন, অপরদিকে সেইরূপ ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দুর ধর্ম্ম-সাধনের সহায়তা করিয়া ধর্ম্মপ্রাণতার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। নানাপ্রকারে বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতির সাহায্য করিয়া তিনি দেশের ও দশের ধন্যবাদার্হ হইয়া উঠিয়াছেন। ভগবানের অব্যর্থ আশীর্ব্বাদ তাঁহার রক্ষা-কবচ হউক। প্রজাগণের লক্ষ কণ্ঠোত্থিত আকুল প্রার্থনায় তাঁহার জীবন সুদীর্ঘ ও শান্তিময় হোক। দিনাজপুরের ইতিহাসে তাঁহার মহিমা-প্রোজ্জ্বল-চরিত্র স্বর্ণাক্ষরে মুদ্রিত হইয়া থাকুক। কবির কণ্ঠে কণ্ঠ মিলাইয়া ভক্ত প্রজাগণ গাহিয়া উঠুক—

"শ্রীমান্ ভূবলয়ং স এব গিরিজানাথো বহত্যাত্মনা।
মন্যে পুণ্যযশোধনানি চিন্ময়াদেবোঽপি ভূতিঃ সমম্॥"

দিনাজপুর-রাজবংশাবলী
সোমেশ্বর ঘোষ
দেবকীনন্দন ঘোষ
উনবিংশতি পুরুষ পর
হরিরাম ঘোষ
রাজা শুকদেব রায়
বিশ্বনাথ রায়
বাজা রামদেব রায়
রাজা জয়দেব রায়
রাজা প্রাণনাথ রায়
মহারাজ রামনাথ রায়
মহারাজ কৃষ্ণনাথ রায়
রূপনাথ রায়
মহারাজ বৈদ্যনাথ রায়
কুমার কান্তনাথ রায়
মহারাজ রাধানাথ রায়
মহারাজ গোবিন্দনাথ রায়
ত্রৈলোক্যনাথ রায়
মহারাজ তারকনাথ রায়
মহারাজ শ্রীযুক্ত গিরিজানাথ রায় বাহাদুর
মহারাজ-কুমার শ্রীযুক্ত জগদীশনাথ রায়

প্রমাণ-পঞ্জি

1. Dr. Francis Buchanan Hamilton—A Geographical, Statistical and Historical description of the district of Dinajpur.

2. F. W. Strong—Dinajpur (Eastern Bengal District Gazetters)

3. J. Vas—Rangpore ... ...

4. Elphinstone's History of India—Edited by E. B. Cowell M. A,

5. Major Stewart—History of Bengal.

6. R. C. Dutt—History of India.

7. Revised List of Ancient Monuments in Bengal—1886.

8. E. Burke's impeachment of Warren Hastings.

9. The Dawn and Dawn Society's Magazine—1906.

11. দিনাজপুর রাজবংশম্—৺মহেশচন্দ্র তর্কচূড়ামণি।

12. গৌড়রাজমালা—শ্রীরমাপ্রসাদ চন্দ।

13. বাঙ্গালার সামাজিক ইতিহাস—শ্রীদুর্গাচন্দ্র সান্যাল।

14. রাজা সীতারাম—শ্রীযুক্ত যদুনাথ ভট্টাচার্য্য।

15. দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ—চণ্ডীচরণ সেন।

16. মহারাজ প্রতাপাদিত্য—শ্রীযুক্ত সত্যচরণ শাস্ত্রী।

17. মুর্শিদাবাদ-কাহিনী—শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায়।

18. M. Taylor—History of India.

20. Imperial Gazetter—(New edition).

21. H. R. Nevill—Benares District Gazetteer.

শ্রীপ্রফুল্লকুমার সেনগুপ্ত

প্রাচীন কয়েকটা বালুর ঘাটের পরিচয়

বালুরঘাট মহকুমার ৩ মাইল দক্ষিণ-পূর্ব্বে এখানে বর্ত্তমানে পাশাপাশি অবস্থিত চতুর্দ্দিক প্রাচীর বেষ্টিত প্রধান দুইটি সমাধি দৃষ্ট হয়। উহার পার্শ্বে কতকগুলি ছোট ছোট সমাধি চিহ্নও দৃষ্ট হয়।

মাইসন্তোষ

প্রাচীর-গাত্রে একখানি ছোট প্রস্তর গ্রথিত আছে, তাহাতে (সম্ভবতঃ) আরবি ভাষায় কয়েক লাইন খোদিত আছে। স্থানায় কোন মৌলবীই উহার পাঠ উদ্ধার করিতে পারেন নাই। গত পূর্ব্বসনে কুমার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায় ও শ্রদ্ধেয় ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় প্রভৃতি বালুরঘাটে স্থানীয় প্রত্নতত্ত্বের অনুসন্ধানে আসিয়া উহার পাঠোদ্ধারের জন্য প্রতিলিপি লইয়া যান, পাঠোদ্ধার হইয়াছে কি না আমাদের জানা নাই। ঐ প্রাচীরগাত্রে একখানা খোদিত ইষ্টক দেখা যায়। তাহাতে উহা কোন প্রাচীন হিন্দুমন্দির হইতে সংগৃহীত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। উহার নিকটেই ইষ্টক ও প্রস্তরের বিস্তৃত ভগ্নাবশেষ আছে। ঐ প্রস্তরের মধ্যে কতকগুলি Basalt Stone। উহা বঙ্গদেশে Rajmahal Hills এ ও ভারতবর্ষের মধ্যে মধ্যভারত ভিন্ন অন্যত্র পাওয়া যায় না বিশেষজ্ঞেরা এরূপ বলেন। ইহাতে অনুমান হয়, উহা কোন প্রবল প্রতিপত্তিশালী হিন্দুরাজার বাড়ী ছিল। উপরের লিখিত ইষ্টকখণ্ড সম্ভবতঃ তথা হইতে গৃহীত হইয়া থাকিবে। কারণ সমাধির প্রাচীরের গঠন দেখিয়া উহা বিশেষ প্রাচীন বলিয়া অনুমান হয় না।

কিম্বদন্তী এইরূপ যে, মাই ও তাঁহার কন্যা সন্তোষ এই দুইজন সাধুপ্রকৃতির স্ত্রীলোকের ঐ দুই কবর এবং তাঁহাদের নামানুসারেই

স্থানের নাম মাইসন্তোষ। এক্ষণে মুসলমান এক ফকীর ঐ কবরের তত্ত্বাবধান করেন। হিন্দুমুসলমান নিজ নিজ মঙ্গলার্থ ঐ স্থানে সিন্নি দেয়। ফকীরের বহু পীরপাল ভূমি আছে।

তবকাতে নাসিরী নামকগ্রন্থে মাকিদা ও মনতোষের নিকট পাঠানেরা আপনাদের মধ্যে বিবাদ করেন। খল্‌জি সামন্ত আজ্জউদ্দীন মহম্মদ শিরাণ দেবকোট অধিকারের চেষ্টায় কামারক্রমীর সহিত যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া কোচবিহারের দিকে পলায়নপথে একজন মুসলমান সরদারের তরবারির আঘাতে নিহত হন। শ্রীযুক্ত পণ্ডিত রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী মহাশয় তাঁহার গৌড়ের ইতিহাসে বলেন যে, সন্তোষে তিনি সমাহিত হন। তিনি মাকিদা বর্ত্তমান পরগণা মসিদা দেবকোটের (অর্থাৎ গঙ্গারামপুর থানার অন্তর্গত বর্ত্তমান দমদমা গ্রামের) দক্ষিণ পূর্ব্ব এবং মনতোষ দেবকোটের দক্ষিণ-পূর্ব্ব সন্তোষকে বলেন।

মাই-সন্তোষও বর্ত্তমান সন্তোষ পরগণার অন্তর্গত বটে, মহম্মদশিরাণের সমাধি এ অঞ্চলে কোথায় আছে তাহা জানা যায় নাই, তবে মাইসন্তোষের পূর্ব্বোল্লিখিত দরগায় যেরূপভাবে সমান আসনে পাশাপাশি দুইজনের সমাধি দেখা যায়, তাহাতে উহা প্রকৃষ্টতর প্রমাণাভাবে শিরাণের সমাধি বলিয়া মনে করা যায় না।

বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতির সম্পাদক শ্রদ্ধেয় রমাপ্রসাদ বাবু তদীয় গৌড়-রাজমালা নামক গ্রন্থে মাই-সন্তোষের অট্টালিকায় ধ্বংসাবশেষ পালবংশীয় মহীপাল রাজার প্রাদেশিক রাজবাড়ীর ধ্বংসাবশেষ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ আছে কিনা গ্রন্থে তাহার উল্লেখ নাই। পরিখার চিহ্ন, Basalt প্রস্তরের বিশাল স্তূপ এবং বহুবিস্তৃত ইষ্টকচিহ্ন দ্বারা উহা যে কোন পরাক্রমশালী রাজার আবাসস্থান ছিল তাহা নিঃসন্দেহে অনুমান করা যায়।

মাই-সন্তোষেরই নিকটে, আত্রাই নদীর অপর পার্শ্বে অনুমান এক ক্রোশ পশ্চিমে আগরাহুগুণের বিশাল স্তূপ, ইহা দেখিতে একটা ক্ষুদ্র পাহাড় বলিয়া মনে হয়, উপরিভাগ একণে মৃত্তিকাবরিত এবং তাহার উপরে অনেক গাছও জন্মিয়াছে। বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতির পক্ষে দিঘাপতিয়ার কুমার বাহাদুর প্রভৃতি বালুরঘাট শুভাগমন করিলে তাঁহারা উহার স্থানে স্থানে খনন করায় বৃহৎ ইষ্টকের ভিত্তি আদি প্রকাশ পাইয়াছে। তাহাতে এবং অন্যান্য নিদর্শন অবলম্বনে উহা হিন্দু-ভাস্কর্য্যের অপেক্ষাকৃত অতীত যুগের কোন সমৃদ্ধ নগরের ভগ্নাবশেষ বলিয়া তাঁহারা অনুমান করিয়াছেন। বহুবিস্তৃত ইষ্টকচিহ্নে তাহা সূচিত হয়, ঐ স্থানের এক বৃক্ষতলে অনেকগুলি প্রস্তরমূর্ত্তি অযত্নে পড়িয়াছিল, তন্মধ্যে বরাহ, নবগ্রহ প্রভৃতি কয়েকখানি মূর্ত্তি তাঁহারা রাজসাহী লইয়া গিয়াছেন এবং একখানি বাসুদেবমূর্ত্তি সংগৃহীত হইয়া বালুরঘাটের ফৌজদারী আদালতের সম্মুখে একবৃক্ষতলে রক্ষিত হইয়াছে। স্থানীয় লোকে উহাকে হাড়ীরাজার বাড়ী বলিয়া নির্দ্দেশ করে।

আগরাহুগুণ

বালুরঘাটের দক্ষিণ-পূর্ব্বে প্রায় ৬।৭ ক্রোশ দূরে অবস্থিত, এই স্থানটির অবস্থা ও প্রাচীন চিহ্নাদি দর্শনে বোধ হয় যে, এই স্থানে প্রতাপশালী কোন সমৃদ্ধ রাজার আবাসস্থান ছিল। মধ্যে মধ্যে স্তূপাকার ইষ্টকরাশি, বড় বড় পুষ্করিণী ভগ্ন-ইষ্টক-প্রাচীর এবং গ্রামটির মধ্য দিয়া পূর্ব্বপশ্চিমে সুদীর্ঘ একটি পাকা রাজপথ আজও দৃষ্ট হয়। অনেকস্থান খনন করিয়া ইটের গাথুনী, দালানের ভিত্তি প্রভৃতি চিহ্ন দৃষ্ট হয়।

আমাইড়

এই গ্রামের পশ্চিম অংশে একটি অত্যুচ্চ ইষ্টকময়স্থান আছে, এই উচ্চ স্থানটির আকৃতি গোলাকার, উপর দিক ক্রমশঃ মোচার

অগ্রভাগের ন্যায় সরু হইয়া উঠিয়াছে, এই স্থানটির উত্তর পার্শ্ব দিয়া পূর্ব্বদিকে পূর্ব্বোক্ত প্রশস্ত রাজপথটি অনেকদূর পর্য্যন্ত গিয়াছে, এই উচ্চ স্থানটিকে স্থানীয় লোকে জঙ্গিল পীরসাহের দরগা বলে।

এই দরগার পশ্চিম দিকে অল্প দূরে কালীসাগর নামে বড় একটা দীঘি আছে। এই দীঘির দক্ষিণপাড়ে একটি কালীমূর্ত্তি স্থাপিত আছে, প্রতি বৎসর ধুমধামের সহিত দেবীর পূজা হইয়া থাকে।

জগদ্দল

বালুরঘাট হইতে ৩।৪ ক্রোশ পূর্ব্ব-দক্ষিণ। এই স্থানে প্রাচীন অট্টালিকার ধ্বংসাবশেষ আছে। নিকটেই আলতা-দীঘি নামে প্রায় অর্দ্ধ মাইল লম্বা এক দীঘি আছে। এই জগদ্দলেই কি অধুনা প্রখ্যাত জাগদ্দল বিহার ছিল? এবং নিকটস্থ আমাইড় কি "জনকভূ" উদ্ধারকর্ত্তা রামপাল দেবের প্রতিষ্ঠিত রামাবতী-নগর? বিশেষজ্ঞেরা ইহার বিচার করিবেন।

যোগীর গুফা বা যোগীর ঘোপা

বালুরঘাটে ৭ ক্রোশ দক্ষিণ-পূর্ব্ব আমাইডেরই সংলগ্ন। ইহার অপর নাম বিশালদহ, এইখানে পশ্চিমদেশীয় কাণফাটা সন্ন্যাসীদের একটি আশ্রম আছে। ইহারা গোরক্ষনাথের সেবা করেন, উহার বর্ত্তমান সেবাইত শ্রীযুক্ত বালকাইনাথ মোহন্ত, তাঁহার দিনাজপুর জেলায় রাণীশঙ্কলে ও বগুড়া জেলায় যোগী-ভবনে আরও দুটি আশ্রম আছে, ইনি আজকাল রাণীসঙ্কলেই থাকেন, বিশালদহে তদীয় শিষ্য হাঁচাইনাথ মোহন্ত থাকেন, ঐ স্থানে মাটীর নীচে একটি কক্ষ বা গুহা আছে, তথায় বৌদ্ধ চৈত্য আছে। উপরে অনেক ভগ্ন মন্দির ও বিগ্রহ আছে, উহাই পূজিত হয়। ঐ গুহা রাজকুমারী বিমলাদেবীর তপস্যা-স্থান বলে। তাঁহার নাকি গোরক্ষনাথ দেবের সহিত বিবাহ হয়, অনুসন্ধানে কোন প্রাচীন দলিল পাওয়া যায় নাই।

বালুরঘাট মহকুমার অনুমান ৮ ক্রোশ পূর্ব্ব-দক্ষিণ কোণে বাদালে

সুপ্রসিদ্ধ গুরব মিশ্রের গরুড়স্তম্ভ, বহুবার বহু স্থানে ইহার বিষয়ে
বাদাল আলোচনা ও পাঠোদ্ধার হইয়াছে, তাই সে বিষয়ে
লিখিবার কিছু নাই। তবে বোধ হয়, ইহা বলা
অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে, এই সম্মিলনের সম্পাদক মহাশয়ের জ্যেষ্ঠতাত হর-
চন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় ইহার এক পাঠোদ্ধার করেন এবং ইংরাজী অনুবাদ ও
টীকাসহ ১৮৭৪ খৃঃ এসিয়াটিক্ সোসাইটীর পত্রিকায় তাহা প্রকাশিত হয়।

ইহার উপরের অনেকাংশ ভাঙ্গিয়া ইহাকে হ্রস্ব করিয়াছে এবং (বোধ হয়) বজ্রাঘাতে খণ্ডিত প্রস্তরাংশ লোপ হইয়াছে, সৌভাগ্যক্রমে যে পার্শ্বে লিপি খোদিত আছে, স্তম্ভের সে পার্শ্ব এখনও কিঞ্চিৎ হেলিয়া দণ্ডায়মান থাকিয়া প্রাচীন কীর্ত্তিগাথা রক্ষা করিতেছে, এই স্তম্ভের পাদদেশ কিছু ইষ্টক দিয়া বাধান হইয়াছে কিন্তু দিনাজপুরের গৌরব এই প্রাচীনকীর্ত্তি-কালের প্রভাব হইতে রক্ষা করিতে হইলে ইহার সুরক্ষণ বিষয়ে সমধিক যত্ন প্রয়োজন। এই স্তম্ভই সাধারণতঃ "ভীমের লাঠী" বলিয়া উক্ত হয়।

এই স্তম্ভের উত্তরপার্শ্বে এক উচ্চ ভূখণ্ডে চারিদিকে প্রাচীন মন্দিরাদির ধ্বংসাবশেষ মধ্যে হরগৌরীমূর্ত্তি, এক নবনির্ম্মিত ইষ্টকগৃহে রক্ষিত ও পূজিত হইতেছে, নিকটেই এই বিগ্রহ প্রকটকারী সন্ন্যাসীর তপস্যার স্থান বলিয়া একটি বৃক্ষ পূজারীরা দেখাইয়া থাকে। প্রবাদ, তিনি ৺কামাখ্যাদেবীর নিকট যুগলমূর্ত্তি দর্শনাকাঙ্খায় বিস্তর তপস্যা করেন, তাঁহার তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া দেবী বর্ত্তমান স্থানে দর্শন দিবেন বলিয়া স্বপ্নাদেশ করেন, তদনুসারে তিনি এই স্থানে আসিয়া ঐ বৃক্ষতলে ঘোর তপস্যা করিলে দেবী প্রসন্ন হইয়া যুগল মূর্ত্তিতে দর্শন দেন এবং এই মূর্ত্তি জঙ্গলমধ্য হইতে দেবাদেশে অনুসন্ধান করিয়া তিনিই বাহির করেন, ক্রমে এই সংবাদ চতুর্দ্দিকে লোকমুখে প্রচারিত হইলে অনেকেই তাঁহার শিষ্য হয়। নিজ মনোভিলাষ পূর্ণ হওয়ায় নিকটস্থ কোন প্রতাপশালী রাজা ঐ সন্ন্যাসীকে

বিস্তৃত ভূসম্পত্তি দান করিতে চান, তিনি দানগ্রহণে অস্বীকার করেন শেষে তাঁহার নির্ব্বন্ধাতিশয্যে বাধ্য হইয়া কিছু জমা ধার্য্যে লইতে স্বীকৃত হন। বর্ত্তমান হরগৌরীর নিত্য পূজা আদির ব্যয় অধুনা কাশীবাসী ভবানী কুমার ভট্টাচার্য্য মহাশয়েরা বহন করেন। নিকটস্থ প্রসিদ্ধ হাটও তাঁহাদেরই। মঙ্গলবারে হয় বলিয়া উহার নাম মঙ্গলবারী হাট। এতদ্দেশে উক্ত ভট্টাচার্য্য মহাশয়দের যে ভূসম্পত্তি আছে উহাই উপরোল্লিখিত সম্পত্তি বলিয়া নির্দ্দেশিত হয়। ভট্টাচার্য্য মহাশয়েরা নাকি উপরোক্ত সন্ন্যাসীর শিষ্য-বংশ।

ধুরইল

এই বাদালের প্রায় ২॥০ ক্রোশ পশ্চিম দিকে, ধুরইলের রাজবাটীর ধ্বংসাবশেষ, সেখানে বহু বৃহৎ দীর্ঘিকা আছে, স্থানীয় লোক এখনও দেওয়ানবাড়ী, রাজবাড়ী, অন্দরমহল, পশুশালা, আমলাদের আবাসগৃহ প্রভৃতি দেখাইয়া দেয়, বহু বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড লইয়া এই সমস্ত ধ্বংসাবশেষ ও দীর্ঘিকাদি যেরূপভাবে আছে, তাহাতে ধুরইল যে কালে একটি বিশেষ সমৃদ্ধ নগর ও প্রতাপশালী রাজার আবাসস্থান ছিল তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই, প্রায় একশত বৎসর পূর্ব্বে ধুরইলের রাজার ভূমি দানপত্র এখনও নিকটবর্ত্তী স্থানে দেখিতে পাওয়া গিয়াছে [রাজবাটীর ইষ্টকাদির কিছু নিদর্শন প্রদর্শিত হইবে]

দীবইর

বালুরঘাটের প্রায় ৭।৮ ক্রোশ দক্ষিণ-পশ্চিমে দীবইর গ্রামে প্রসিদ্ধ দীবইর দীঘি—উহা লম্বায় অনুমান অর্দ্ধ মাইল ও প্রস্থে কিছু ন্যূন হইবে, উহার চতুর্দ্দিকের পাহাড়ের গাত্রে ও নিম্নে প্রায় শতাধিক ছোট পুষ্করিণী খনিত আছে, দীঘির মধ্যস্থলে এক অষ্টকোণ সুউচ্চ স্তম্ভ এখনও এক প্রকার অক্ষুণ্ণভাবে দণ্ডায়মান থাকিয়া প্রাচীন কীর্ত্তি-পরাক্রম ও গৌরব-গাথা প্রচার করিতেছে, লোকে ইহাকে দীবইয়ের দীঘির "জাইট" বলে।

১৩১৫ সালে যখন বৃষ্টি-অভাবে ইহার জল অনেকটা শুকাইয়া যায়, তখনও কোন কিছু খোদিত লেখা দেখা যায় নাই। বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতির গৌড়রাজমালায় ইহার এক প্রতিকৃতি দৃষ্ট হয় এবং তাহা কৈবর্ত্ত-রাজের জয়স্তম্ভ বলিয়া লেখা হইয়াছে। কিন্তু পুস্তকে তদ্বিষয়ে কিছু লেখা নাই। দীঘির উত্তরের ও পূর্ব্বের পাহাড়ের নিকটে ও চতুর্দ্দিকে নানা স্থানে ভগ্নপ্রাসাদের চিহ্ন ও ইষ্টকরাশি আছে।

এই দীবইয়ের প্রায় (২) দুই ক্রোশ দক্ষিণে ঘাটনগর, বর্ত্তমানে ঐ গ্রামে মহাদেবপুর, বলিহার ও দিনাজপুরের মহারাজার কাছারী আছে।

ঘাট-নগর

এইখানেও দীবইয়ের ন্যায় এক বহু বিস্তৃত দীর্ঘিকা আছে, তাহারও পাহাড়ে ও নিকটে প্রায় ঐরূপ বহু ছোট ছোট পুষ্করিণী দৃষ্ট হয়। বহুদূর পর্য্যন্ত যেরূপ ইষ্টকের স্তূপ ভগ্নপ্রাচীর ও চতুর্দ্দিকে ইষ্টক বিক্ষিপ্ত দেখা যায় তাহাতে যে পূর্ব্বে ইহা একটি প্রসিদ্ধ নগর ছিল এরূপ অনুমান করা যায়। উপরোক্ত দীঘিকে ছয়ঘাটীর দীঘি বলে।

বালুরঘাট মহকুমার পশ্চিম ভাগে তপন গ্রামে সুপ্রসিদ্ধ তপনদীঘি, কালদীঘি, ধলদীঘি, কাদমা দীঘি। পশ্চিমে করদস্থা পরগণা ও নিকটেই প্রসিদ্ধ বাণগড়, উষাগড় এবং পরগণে দেবীকোট বা দেবকোট। "বখ্‌-তিয়ার আপন রাজ্য দুই ভাগে বিভক্ত করেন, বাগড়ীর কিয়দংশ ও বরেন্দ্র লইয়া একভাগ, দিনাজপুর জেলায় দেবকোট ইহার রাজধানী ছিল, এই দেবকোটই প্রাচীন কোটিবর্ষবিষয়"।

"দেবকোট বর্ত্তমান দিনাজপুরের দক্ষিণ দিকে পুনর্ভবার বাম শাখার তীরে দমদমা নামক স্থান; [রজনী চক্রবর্ত্তীর গৌড়ের ইতিহাস ২য় খণ্ড ৫৬৭ পৃষ্ঠা]

পশ্চিমাংশের উপরোক্ত দীঘি ও প্রাচীন স্থানাদির বিষয় সম্প্রতি অন্ন-

বিস্তর আলোচনা হইয়াছে ও হইতেছে। এজন্য বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া হইল না, প্রত্ন-তত্ত্বের আলোচনায় শক্তি নাই। এই ক্ষুদ্র পরিচয় দ্বারা বিশেষজ্ঞদিগকে উপযুক্ত কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইবার জন্য সাদরে আহ্বান করিতেছি। যথাসম্ভব পরিচর্য্যা দ্বারা তাঁহাদের কার্য্যের কিঞ্চিন্মাত্র সহায়তা করিবার সুযোগ পাইলেও আমাদিগকে ধন্য জ্ঞান করিব।

শ্রীনলিনীকান্ত চক্রবর্ত্তী।

রঙ্গপুরে প্রাপ্ত বিষ্ণুমূর্ত্তি

মাননীয় সভাপতি মহাশয়, ও সভ্যগণ,—

আমি অদ্য আপনাদিগের নিকট মৎসংগৃহীত তিনটি প্রস্তর ও একটি ধাতুনির্ম্মিত মূর্ত্তি-বিষয়ে ক্ষুদ্র প্রবন্ধ পাঠ করিতে উদ্যত হইয়াছি, মূর্ত্তি কয়েকটি রঙ্গপুর জেলার গাইবাধা মহকুমায় গোবিন্দগঞ্জ থানার ভিতরে পাইয়াছিলাম। রঙ্গপুর জেলার গোবিন্দগঞ্জ থানা দিনাজপুর ও বগুড়া জেলায় দোসীমানার নিকট এবং এখানে অনেক পুরাতন ভগ্নাবশেষ আছে। আমি বর্ত্তমান প্রবন্ধে ঐ গুলির কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব। দিনাজপুর জেলার ঘোড়াঘাট নামক স্থান সকলের নিকটেই পরিচিত আছে। ঐ স্থান মোগলদিগের শাসন কালে আমাদের দেশের অন্যতম রাজধানী ছিল বলিয়া খ্যাতি আছে। জাহাঙ্গীর বাদশাহ ঐ রাজধানী ঢাকায় স্থানান্তরিত করেন। ঘোড়াঘাট করতোয়া নদীর উপকূলে অবস্থিত। গোবিন্দগঞ্জ থানার পার্শ্ববর্ত্তী দিনাজপুর জেলার সরেমসজেদ নামক প্রাচীন মসজেদ গোবিন্দগঞ্জ থানার সীমানা

হইতে অধিক দূরবর্ত্তী নহে। বগুড়া জেলার মহাস্থান নামক প্রাচীন রাজবাড়ীর ধ্বংসাবশেষও গোবিন্দগঞ্জ থানার সীমানা হইতে অধিক দূরবর্ত্তী নহে। গোবিন্দগঞ্জ থানা আয়তনে খুব বড়। ঐ থানা এবং উহার সংলগ্ন রঙ্গপুর, বগুড়া ও দিনাজপুর জেলার অংশ "খিয়ার" নামে খ্যাত। খিয়ার শব্দের অর্থ ক্ষীরাভ অর্থাৎ ক্ষীরের আভার ন্যায়। খিয়ারে বহুল পরিমাণে চাউল জন্মে এবং তথায় বহুদূর বিস্তৃত বৃক্ষ-লতাহীন বিশাল প্রান্তর, লালবর্ণের মৃত্তিকা ও অনেক সুবৃহৎ অপরিষ্কার জলাশয় দেখা যায়। গোবিন্দগঞ্জ পূর্ব্বে বগুড়াজেলার অন্তর্গত ছিল—১৮৭১ সালে ইহা রঙ্গপুর জেলার সামিল হয়। গোবিন্দগঞ্জ থানার প্রান্তদেশে বগুড়ার সীমানার কোলে বিরাট নামে একটি স্থান আছে। সেখানে প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসে একটী সুবৃহৎ মেলা হয় এবং অনেক হিন্দু বহুদূরদেশ হইতে সেই মেলায় মিলিত হয়।

চৈত্র মাসের ত্রয়োদশী হইতে সপ্তমী পর্য্যন্ত মহাস্থানের মেলা, অষ্টমীতে ব্রহ্মপুত্রের স্নান, তারপর বিরাটের মেলা। বিরাট মেলার বিশেষত্ব আছে, এখানে বৈশাখ মাসের প্রতি রবিবারে হিন্দু-নরনারী এবং মুসলমানও পুষ্করিণীতে অবগাহন করিয়া করলা সিদ্ধ ও আতপ চাউলের ভাত বিনা তৈল-লবণে আহার করেন। মেলার অর্দ্ধাংশের জমিদার দিনাজপুর জেলার নবাবগঞ্জ থানার কড়াইবাড়ী গ্রামের শ্রীযুক্ত নাজির মহম্মদ চৌধুরী ও অপর অর্দ্ধাংশের জমিদার বর্দ্ধনকুঠীর শ্রীযুক্ত চন্দ্রকিশোর রায়। প্রথমোক্ত জমিদারের অংশ কোর্টের হাতে। বর্দ্ধনকুঠীর রাজবাটী হইতে মদনমোহন ও গোপীনাথ বিগ্রহ মেলায় আনিয়া বৈশাখ মাস ভোর রাখা হয় এবং ঐ বিগ্রহকে সমাগত হিন্দু-মুসলমান পূজা দেয়। মেলাটি পরগণা আলিগাঁওএর অন্তর্গত। সুদূর মণিপুর, কাছাড়, কটকপুরী, এবং মৈমনসিং, কুচবিহার, নদীয়া, রাজসাহী, পাবনা, দিনাজ-

পুর, বগুড়া, মুক্তাগাছা হইতে হিন্দু-নরনারী এই মেলায় আগমন করেন। ২২।২৩ বৎসর পূর্ব্বে ভীষণ শার্দ্দূলসমাকুল অরণ্যে মেলার স্থান আবৃত ছিল। তখন দিবসে মেলা হইত এবং রাত্রিকালে এখানে কেহ বাস করিতে সাহস করিত না। অধুনা মাত্র কয়েকটি সুস্বাদু ফলবিশিষ্ট ক্ষিরি-গাছ, ২টি প্রাচীন খুব বৃহৎ অশ্বত্থ-গাছ ও কয়েকটি ছোট গাছ ভিন্ন মেলার স্থানে অন্য গাছ-পালা কিছুই নাই এবং বহুদূর বিস্তৃত পরিষ্কার প্রান্তরের ভিতর বিরাট নামক স্থান অবস্থিত। ক্ষিরিগাছ রঙ্গপুর জেলায় আর কোথাও নাই। ইহার ফল মেলার সময়ে পাকে এবং খাইতে অতি মধুর। স্থানীয় কিম্বদন্তী এইরূপ যে, এই গাছ বিরাটরাজার বাটীর চিহ্ন। আরও কিম্বদন্তী আছে যে, রাত্রিতে মধ্যে মধ্যে মেলার স্থানে বাদ্য শুনা যায় এবং ঐ স্থানের ভাঙ্গা হাঁড়ী কোথায় কে লইয়া যায়, তাহা মানুষে জানিতে পারে না। কথিত আছে যে, শাকাহারের শ্রীরক্ষা-তুল্যা সরকার রাত্রিতে মেলার স্থানে শ্রীকৃষ্ণ দশন করিয়াছিলেন।

বিরাটে মহাভারতের বিরাট রাজার রাজপ্রাসাদ ছিল বলিয়া জন-প্রবাদ আছে। বিরাট রাজার নামানুকরণে স্থানের নাম খ্যাত। রাজপ্রাসাদের ইষ্টক-নির্ম্মিত গৃহাদি মৃত্তিকাচ্ছাদিত উচ্চ স্তূপরূপে অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে এবং তাহাদের চতুষ্পার্শ্বে গড় আছে। স্থানীয় লোকের নিকট জানা যায়, ঐ স্তূপ পূর্ব্বে উচ্চতর ছিল এবং ক্রমশঃ বসিয়া যাইতেছে। নিকটে অনেক পুষ্করিণী ও একখানি বৃহদাকার পাথর পড়িয়া আছে। ঐ রাজপ্রাসাদের অভ্যন্তরে একটি পুষ্করিণীব ভিতর জনৈক সাঁওতাল ধাতুনির্ম্মিত মূর্ত্তিটি পাইয়াছিল এবং উক্ত বিরাট গ্রামের ১½ মাইল ব্যবধানে রাজহার নামক স্থানে প্রস্তরমূর্ত্তিত্রয় এক পুরাতন বৃক্ষতলে আমি পাইয়াছিলাম। মূর্ত্তিগুলি সব বিষ্ণুমূর্ত্তি।

মিষ্টার কে, সি, দে রঙ্গপুর আসার পূর্ব্বে মিষ্টার টিন্ডালের শাসন-

কালে ১৯১০ সালের নবেম্বর মাসে গোবিন্দগঞ্জ থানার অন্তর্গত নওয়াজাবাদ নামক স্থানে জনৈক সাঁওতাল ভূমিকর্ষণকালে ধাতুনির্ম্মিত পাঁচটি পুরাতন বিষ্ণুমূর্ত্তি পাইয়াছিল। তাহার কতক এক্ষণে কলিকাতা এসিয়াটিক্ মিউজিয়মে রক্ষিত আছে। নওয়াজাবাদ বর্ত্তমান প্রবন্ধ-লিখিত রামপুরার সংলগ্ন। আমি যে মূর্ত্তি সংগ্রহ করিয়াছি তাহা ঐ মূর্ত্তিগুলির অনুরূপ। আমি যে প্রস্তরমূর্ত্তি সংগ্রহ করিয়াছি তাহার একটীতে কতকগুলি অক্ষর খোদিত আছে। বিরাটের তিন মাইল ব্যবধানে পূর্ব্ব-দক্ষিণদিকে বাণেশ্বর গ্রামে বাণেশ্বর নামে শিবলিঙ্গ আছে। কথিত আছে, ঐ শিবলিঙ্গের নিকট শমীবৃক্ষ ছিল। এবং তাহাতে অর্জ্জুন বাণ রাখিয়াছিলেন। বিরাটের অধিবাসী দানশীল ৬২ বৎসর বয়স্ক শ্রীনরোত্তম দাস মোহন্ত (যিনি বিনাব্যয়ে যাত্রীদের থাকিবার ও আহারের স্থান দেন) আমাকে বলিয়াছেন যে, শিমূলগাছের ন্যায় কিন্তু সাদা ফুলযুক্ত শমীবৃক্ষ তিনি বাণেশ্বর শিবলিঙ্গের নিকট দেখিয়াছেন। ঐ গাছ এখন আর নাই। বিরাটের চারি মাইল ব্যবধানে পূর্ব্বদিকে দানিতলা নামক স্থানে সুবৃহৎ হাট বসে। এখানে অর্জ্জুন ভূগর্ভে বাণ মারিয়া জল বাহির করিয়া দ্রৌপদীকে খাওইয়াছিলেন বলিয়া প্রবাদ আছে; এবং একটি কূয়ার ন্যায় স্থান যাত্রীগণকে দেখান হয়। বিরাট নামক স্থানের কয়েক মাইল ব্যবধানে বগুড়া জেলার ভিতর কীচক নামক স্থান আছে। তাহার অল্প দূরে প্রাচীন রাজবাড়ীর ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়। কথিত আছে যে, কীচক নামক স্থানে কীচক রাজাকে দাহ করা হয় এবং কয়েক মাইল ব্যবধানে কীচক রাজার বাটী ছিল।

কীচকের নিকট দিয়া ভীমের জাঙ্গাল অর্থাৎ উচ্চমৃত্তিকা প্রাচীর বগুড়া পর্য্যন্ত আসিয়াছে। স্থানীয় কিম্বদন্তী এইরূপ যে, মহাভারতের বিরাট রাজার প্রাসাদ বিরাট নামক স্থানে ছিল। তাঁহার অশ্বশালা

ঘোড়াঘাট নামক স্থানে এবং গোশালা র ঙ্গ র জেলার গোঘাট নামব স্থানে ছিল। মকর-সংক্রান্তির দিন বগুড়ার লোক নিজ নিজ গরুসকল ছাড়িয়া দেয়। কথিত আছে, বিরাট রাজার আমলে এই প্রথা প্রচলিত ছিল। কোনও সময়ে ঐ রাজা করতোয়া নদীতে স্নান করিতে আসেন এবং নদীতীরে স্বকীয় ও অমাত্যগণের বাসস্থান নির্ম্মাণ করাইয়া একটি নগরের প্রতিষ্ঠা করেন। গোবিন্দগঞ্জের নিকটবর্ত্তী রামপুরা নামক সাঁওতাল-পল্লীতে ঐ নগরের ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়। কথিত আছে, বহুপূর্ব্বে করতোয়া নদী রামপুরার নিম্নভাগে প্রবাহিতা ছিল। বর্ত্তমানে আমি তাহার চিহ্ন দেখিয়াছি। রামপুরার ধ্বংসাবশেষের ভিতর যজ্ঞাহুতি দিবার একটী স্থান আছে। একটি গোলাকৃতি ক্ষুদ্র শুষ্ক পুষ্করিণীর চতুর্দ্দিকে খুব উচ্চ ইষ্টকনির্ম্মিত প্রাচীর—ঐ শুষ্ক পুষ্করিণীর ভিতর ইষ্টকনির্ম্মিত আহুতি দিবার বেদী ছিল। ঐ বেদী এক্ষণে জঙ্গলে আবৃত। আমি সাঁওতাল সঙ্গে লইয়া ঐ বেদীর স্থান জঙ্গল কাটিয়া পরিষ্কার করাইয়াছিলাম; কিন্তু তাহার ভিতর কিছু পাই নাই। বর্ত্তমান করতোয়া নদী ঐ স্থান হইতে খুব বেশী দূর নহে। মৎসংগৃহীত ধাতুমূর্ত্তিটির মধ্যস্থলে বিষ্ণুমূর্ত্তি, তাঁহার দুই অধঃহস্ত ভগ্ন, দক্ষিণ ঊর্দ্ধহস্তে গদা, বাম ঊর্দ্ধহস্তে চক্র। তাঁহার মস্তকে কিরীট, দুই কর্ণে কুণ্ডল, বক্ষে কৌস্তুভমণি, আজানুলম্বিত কটিবাস, [illegible] বনমালা, নাভিদেশলম্বী যজ্ঞোপবীত। পদ্মহস্তা শ্রী ও বীণাহস্তা সরস্বতী যথাক্রমে দক্ষিণে ও বামভাগে দণ্ডায়মানা। ইহারা উভয়েই কবরীভূষিতা। বিষ্ণুমূর্ত্তি, শ্রী ও সরস্বতীমূর্ত্তি প্রত্যেকেই এক একটি পৃথক্ পদ্মাসনে দণ্ডায়মান। ইহাদের তলদেশে গরুড়-মূর্ত্তি এবং তাহার তলে উপাসকের মূর্ত্তি। সমুদায় মূর্ত্তিটি উচ্চে ১১″, প্রস্থে ৬৷০″। মূর্ত্তিটির পশ্চাতে চাল ছিল বুঝা যায়, কিন্তু তাহা জাল দিয়া পুনঃপুনঃ পুষ্করিণী অনুসন্ধান করিয়া আমি পাই নাই।

মূর্ত্তিটি ওজনে ১৷৷৵ (৯০ তোলার মাপে)। একণে জিজ্ঞাস্য এই যে, মূর্ত্তিটি পুরাণোক্ত কোন্ শ্রেণীর বিষ্ণু? আমি যতদূর স্থির করিয়াছি, তাহাতে ইহা অগ্নিপুরাণ, পদ্মপুরাণ ও সিদ্ধার্থসংহিতা অনুসারে ত্রিবিক্রম বা উপেন্দ্রশ্রেণীভুক্ত। দুই হস্ত ভগ্ন হওয়ায় ইহার অধিক বলা যায় না। প্রস্তরমূর্ত্তিগুলির সবিশেষ আলোচনা আমি করিতে চাহি না, কারণ সেরূপ মূর্ত্তি দুষ্প্রাপ্য নহে। তবে একটি মূর্ত্তির নীচে যে কয়েকটি অক্ষর খোদিত আছে, তাহার ব্যাখ্যা এখনও করিতে পারি নাই, সম্ভবতঃ তাহা বিষ্ণুর নামমাত্র। মূর্ত্তি-বিবরণ ও প্রাপ্তিসম্বন্ধে এই স্থানে উপসংহার করিয়া মূর্ত্তির কালনির্ণয়ের আলোচনা করিব। প্রাচীন ধাতুমূর্ত্তিতে কোনও অক্ষর খোদিত না থাকায়, তাহার কাল-নির্ণয় কেবল আনুমানিক মাত্র। এস্থলে প্রথম কথা এই যে, বিরাট নামক স্থানের সহিত মহাভারতীয় বিরাট রাজার কোনও সম্বন্ধ ছিল কিনা? কারণ যদি আমরা জানিতে পারি যে, মহাভারতীয় বিরাট রাজার প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষের ভিতর ধাতুমূর্ত্তিটি পাওয়া গিয়াছে, তবে তাহার কাল-নির্ণয়ে কথঞ্চিৎ সুবিধা হয়। মনুসংহিতা (২য় অধ্যায়), মহাভারত (সভাপর্ব্ব ও বিরাটপর্ব্ব) হইতে পণ্ডিতগণ নির্ণয় করিয়াছেন যে, মথুরার নিকটবর্ত্তী জয়পুর রাজ্যের অন্তর্গত "বৈরাট" ও "মাচারী" নামক স্থানে প্রাচীন বিরাট রাজ্য ও মৎস্যদেশ ছিল। বিশ্বকোষ হইতে জানা যায় যে, উক্ত বৈরাটসহর দিল্লী হইতে ১০৫ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিম ও জয়পুর রাজধানী হইতে ৪১ মাইল উত্তরে এবং বৈরাট হইতে ৩২ মাইল পূর্ব্বে ও মথুরা হইতে ৬৪ মাইল পশ্চিমে (মাছেরী) "মাচড়ি" নামক প্রাচীন গ্রাম। সুতরাং মহাভারতীয় বিরাট রাজার সহিত রঙ্গপুর জেলার বিরাট নামক স্থানের কোনও সম্বন্ধ নাই বলিয়া অনুমান করা যায়। বিরাট নামক স্থানের দ্বাদশ মাইল ব্যবধানে বগুড়া জেলায় মহা-

স্থান নামে যে প্রাচীন রাজবাড়ীর ধ্বংসাবশেষ আছে, তাহা প্রাচীন পৌণ্ড্র রাজ্যের রাজধানী পৌণ্ড্রবর্দ্ধন নগরীর সহিত অভিন্ন বলিয়া পণ্ডিতগণ অনুমান করেন। স্বর্গীয় পণ্ডিত রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয় বলেন যে, পৌণ্ড্ররাজ্য ব্রহ্মপুত্র নামক একটি বিশাল নদকর্ত্তৃক কামরূপ রাজ্য হইতে পৃথক্ ছিল। খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে সুপ্রসিদ্ধ চীনদেশীয় পরিব্রাজক হিউ-এন্‌থ্ সঙ্গ পৌণ্ড্রবর্দ্ধন হইতে একটি বিশাল নদী অতিক্রম করিয়া কামরূপ রাজ্যে গমন করেন।

করতোয়া-মাহাত্ম্যে উল্লেখ আছে যে, করতোয়া নদী পৌণ্ড্রদেশে প্রবাহিতা ছিল। মিষ্টার বেভারিজ, মেজর রেণেল ও মিষ্টার বুকানন্ হ্যামিণ্টন করতোয়া নদীকে একটি বিশাল নদী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ইহা হইতে বোধ হয়, কামরূপ ও পৌণ্ড্রবর্দ্ধন রাজ্যের দোসীমানা এককালে করতোয়া নদী ছিল। মিষ্টার গেট্ কর্ত্তৃক আসামের ইতিহাসে উল্লিখিত হইয়াছে যে, রঙ্গপুর জেলা কামরূপ রাজ্যের অন্তর্গত ছিল এবং করতোয়া নদী উক্ত রাজ্যের পশ্চিম সীমানাস্বরূপ ছিল। বগুড়া জেলার মহাস্থান এখনও করতোয়া নদী তীরে অবস্থিত। মিষ্টার ফ্রানসিস্ বুকানন্ ১৮০৭ খৃষ্টাব্দে লিখিয়াছেন যে, কলিযুগের প্রারম্ভে করতোয়া নদী ভগদত্ত ও বিরাট রাজ উভয়ের রাজ্যের দোসীমানা স্বরূপ ছিল। মহাভারত হইতে জানা যায় যে, ভগদত্ত কামরূপ বা প্রাগ্‌জ্যোতিষের রাজা ছিলেন এবং দুর্য্যোধনের সমসাময়িক। বুকানন্ সাহেব কোন্ বিরাট রাজার উল্লেখ করিয়াছেন তাহা বুঝা যায় না। তবে আমরা ধরিয়া লইতে পারি যে, বিরাট নামক স্থান পৌণ্ড্ররাজ্যভুক্ত ছিল। ঐ স্থান করতোয়া নদীর পশ্চিম পার্শ্বে বরাবরই অবস্থিত বলিয়া আমি অনুমান করি। স্থানের অবস্থা দেখিয়া আমার এইরূপ ধারণাই জন্মিয়াছে। পৌণ্ড্র রাজ্য পালবংশীয় নরপতিগণ কর্ত্তৃক বিজিত হয় এবং তাঁহারা কাম-

রূপও জয় করেন। তাঁহারা বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। পালবংশ ধ্বংস হইলে সেনবংশীয় তিনজন রাজা ক্রমান্বয়ে কামরূপের সিংহাসন আরোহণ করেন। তৎপর মুসলমানগণ খৃষ্টীয় ১৪৯৮ সালে কামরূপরাজ্য অধিকার করে। মুসলমান-বিজয়ের পূর্ব্বে ও বৌদ্ধরাজ্য ধ্বংস হওয়ার পর হিন্দুগণ শঙ্করাচার্য্যের মতানুযায়ী বিষ্ণুমূর্ত্তি গড়িয়া পূজা করিতে থাকেন। ঐ সময়ে বিষ্ণুপূজার সবিশেষ প্রচলন হয়। মুসলমানেরা বিষ্ণুমূর্ত্তির নাক কাটিয়া বা হস্তপদাদি ভাঙ্গিয়া পূজার অযোগ্য করিয়া দেয়। মুসলমানের ভয়ে হিন্দুগণ মাটির ভিতর বা পুষ্করিণীর মধ্যে প্রতিমা লুকাইয়া রাখিতেন। এই সকল বিষয় হইতে আমি অনুমান করি যে, খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ বা চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে মৎসংগৃহীত ধাতুমূর্ত্তিটি পৌণ্ড্রাজ্যের কোনও হিন্দু-রাজার গৃহে বিরাজমান ছিল। মিষ্টার টিনৃডালের শাসনকালে যে পাঁচটী মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছিল, তাহাও ঐ রাজার গৃহে ছিল বলিয়া আমি অনুমান করি। পৌণ্ড্রাজ্যের অপর নাম বরেন্দ্র-রাজ্য। প্রবন্ধের উপসংহারে ঘোড়াঘাট ও তাহার নিকটে যে প্রাচীন ভগ্নাবশেষ অদ্যাপি দেখা যায়, সে বিষয়ে কিছু আলোচনা করিব।

ঘোড়াঘাট নামক যে গ্রাম এক্ষণে সর্ব্বসাধারণের নিকট পরিচিত, তাহার পূর্ব্বে চতুর্দ্দিক পরিখা ও তৎপর উচ্চ প্রাচীরবেষ্টিত জঙ্গলাকীর্ণ স্থান প্রাচীন ঘোড়াঘাট সহরের ধ্বংসাবশেষ। ইহার ভিতর সুন্দর রাস্তা, উৎকৃষ্ট কলমের আম্রগাছ আছে। নদীতীরে দুইপ্রান্তে দুইটি কেল্লার স্থান আছে। অট্টালিকার মধ্যে কেবল একটি প্রাচীন ভগ্ন মস্‌জেদ ও তৎসংলগ্ন বহু পুরাতন খুব বৃহৎ একটি ইঁদারা আছে। ঘোড়াঘাট হইতে ৫ মাইল ব্যবধানে হিলি যাইবার রাস্তার ধারে একটি খুব প্রাচীন মস্‌জেদ্ আছে। ইহার দেওয়ালে ইটের উপর অনেক প্রকার সুন্দর সুন্দর কাজ করা এবং তন্মধ্যে কতকগুলি খুব বড় পাথর আস্ত বসান আছে।

এই মস্‌জেদ্ মুসলমানদের খুব পবিত্র স্থান। হিলির কালীবাড়ী খুব প্রাচীন স্থান। মন্দিরটি জীর্ণ হইয়াছে, ইহার গায়ে ইটের উপর নানা-প্রকার কারুকার্য্য আছে। মন্দিরের নিকট একটি প্রাচীন পুষ্করিণীর তটদেশ খনন করায় ইষ্টকনির্ম্মিত সুবৃহৎ সোপান বাহির হইয়া পড়িয়াছে। হিলির রেলষ্টেশনের নিকট রাস্তার ধারে একটি ভগ্নপ্রস্তরমূর্ত্তি আছে। তাহাতে বাসুদেব ও লক্ষ্মী উভয়েই পাশাপাশি দণ্ডায়মান। বাসুদেব লক্ষ্মীর পাশাপাশি মূর্ত্তিযুক্ত প্রস্তর আমি আর দেখি নাই।

শ্রীঅবনীচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

ঐতিহাসিক প্রবন্ধ

[প্রাচীন বঙ্গসাহিত্য অবলম্বনে বঙ্গের বণিক-জাতির ইতিহাস ও জাতীয় ইতিহাস সঙ্কলনের কিঞ্চিৎ আভাস]

যদি বঙ্গের ব্রাহ্মণজাতি মিথিলা, কনোজ প্রভৃতি দেশ হইতে আগত হইয়া থাকেন, যদি বঙ্গের কায়স্থজাতি দ্বারবঙ্গ দিয়াই বঙ্গে প্রবেশ করিয়া থাকেন, যদি বঙ্গের বৈদ্যজাতি বাঙ্গালার সেন রাজগণেরই বংশধর হন, তবে বঙ্গের বণিকসম্প্রদায় এ দেশের আগন্তুক বা আদিম প্রশ্নের মীমাংসার দাবীও উঠিতে পারে। নেটিভ বলিয়া পরিগণিত হওয়া শুধু ভারতে নহে চিরকালই সকল দেশেই নিন্দার কথা। প্রাচীন ও আধুনিক এই দুই শ্রেণী-বিভাগ সকল দেশের অধিবাসীই সর্ব্বদা আপনাদের মধ্যে

করিয়া থাকেন এবং প্রাচীনত্ব অপেক্ষা আধুনিকত্বের প্রতিই অধিকাংশের আসক্তি দেখা যায়। প্রকৃত পক্ষেও একটু চিন্তা করিলেই বুঝা যায় মানুষের এই স্বাভাবিক আসক্তি একেবারে ভিত্তিহীন নহে বা শুধু ভাব-মূলক নহে। মানুষ অতি-দীর্ঘকাল স্থানবিশেষে আবদ্ধ থাকিলে খর্ব্বতা যেন তাহাকে সর্ব্বদিক হইতেই আক্রমণ করে। তাই যে দেশবিশেষ বা সমাজবিশেষে যাহাকে যখন উচ্চতাভিমুখী দেখা যায়, তাহার আধুনিকত্বই যেন মানবজাতির পরিক্রম বিধি অনুযায়ী ও সঙ্গত বলিয়া বোধ হয়। বাঙ্গালার ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থজাতি হিন্দুদের মধ্যে যদি এদেশের প্রতিপন্ন জাতি হন, তবে এদেশের বণিক-জাতিও নিতান্ত অপ্রতিপন্ন নহেন। তাঁহাদের উচ্চতা এবং বিস্তৃতিও সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এ কথাও কেহ অস্বীকার করিতে পারেন না; কিন্তু হিন্দুসমাজে তাঁহাদের কিছু হেয়তা আছে তাহাও দৃষ্ট হয়।

তাহা হইলে বঙ্গীয় বণিকজাতির বিষয় আলোচনা করিতে গেলে দুইটী প্রশ্ন উঠে। প্রথম, বঙ্গীয় বণিকজাতি এ দেশের আদিম অধিবাসী বা আগন্তুক? দ্বিতীয়, হিন্দুসমাজে এই সম্প্রদায়ের যে হেয়তা দৃষ্ট হয় তাহার হেতু কি?

জাতিতত্ত্ব আলোচনা বা বিচার করিতে গেলে আজকাল এ দেশে যে প্রথা প্রচলিত হইয়া পড়িতেছে অর্থাৎ শাস্ত্রীয় পৌরাণিক বচন উদ্ধৃত করিবার যে নিয়ম প্রবর্ত্তিত হইতেছে, তৎসম্বন্ধে আমি প্রথমেই বলিতে বাধ্য হইতেছি তেমন দুঃসাহস আমার নাই; কারণ একে ত শাস্ত্ররূপ শৈলে আরোহণ করিবার ক্ষমতাই আমার নাই এবং যদিও শাস্ত্রীয় বচনেই উক্ত আছে 'শনৈঃ শনৈঃ পর্ব্বত লঙ্ঘনং' আমার তেমন ধৈর্য্যও নাই। কিন্তু কথা এই যে, আমার বিশ্বাস শাস্ত্ররূপ শৈল সর্ব্বদাই এমন কুজ্ঝটিকায় আবৃত আছে যে, যাঁহারা কোনও ক্রমে তথায় উপস্থিত হইতে পারিয়াছেন,

তাঁহারও দৃষ্টিশক্তিরহিত হইয়া রত্নভ্রমে যাহা কিছু নিকটে পান, তাহা দর্শনের অভাবে শুধু হাতের জোরেই সংগ্রহ করিয়া ফেলেন; কারণ এই শ্রেণীর পাহাড়ীবাবাগণ মধ্যে মধ্যে আমাদের নিকট তাঁহাদের শ্রমসাধ্য, কষ্টলব্ধ যে সকল সংগ্রহসম্ভার আনিয়া উপস্থিত করেন আমরা খুঁজিয়া দেখি তাহার মধ্যে মূল্যহীন, অকিঞ্চিৎকর নুড়ি শিলাখণ্ডই অধিক, মূল্যবান্ প্রস্তর অতি অল্পই থাকে। সুতরাং শাস্ত্রীয় পন্থা আদৌ পরিত্যাগ করিতে আমি বাধ্য। শিক্ষিত সমাজের নিকট শাস্ত্রীয় অশ্রদ্ধা-প্রকাশ মূঢ়তা হইতে পারে, কিন্তু তাৎকালিক একমাত্র শিক্ষিত কতিপয় সংস্কৃতজ্ঞ বঙ্গীয় জাতিতত্ত্ব বিষয়ে স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতার সহিত লিপি-চালন করিয়া শিক্ষার গৌরব রক্ষা করিতে সমর্থ ছিলেন কিম্বা উদরের দায়ে হস্ত বিক্রয় করিয়া স্থলবিশেষে তুষ্ট যন্ত্রের ন্যায়, কোথায়ও বা বলী-বর্দ্দের তুষ্টি-সাধনোপযোগী কণ্ডুয়ন দন্তের ন্যায় লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন কিনা এ বিচারের ভার আধুনিক সংস্কৃতজ্ঞের উপরই ন্যস্ত করিলাম।

এ মোটা কথা সকলেই বুঝিতে পারেন, তৎকালে সংস্কৃতজ্ঞের সংখ্যা অতি অল্প ছিল; ভিন্ন ভিন্ন স্থলে তাঁহারা ভিন্ন ভিন্ন প্রতিপালক নরপতি দেশপালগণের আশ্রয়ে বাস করিতেন; সংস্কৃতজ্ঞগণের একটা বিশেষ সমাজ তখনও হইয়া উঠে নাই বা হইলেও তাহার কোন শক্তি বা বলাধান তখনও হয় নাই। শিক্ষিতগণ বিক্ষিপ্ত অসম্বদ্ধ অবস্থায় বাস করিতেন। এরূপ ক্ষেত্রে তাঁহাদের প্রতিপালক বা আশ্রয়দাতাগণ তাঁহাদিগকে মুদ্রা-যন্ত্রের ন্যায় ইচ্ছানুরূপ ব্যবহার করিতেন ইহা অতি সহজবোধ্য; প্রবৃত্তি থাকিলেও স্বাধীনতা রক্ষা করা সম্ভব ছিল না। মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা লোপ শুধু এই যুগের কলঙ্ক নহে। সকল যুগেই এই পাপ মনুষ্যের স্বাধীন চিন্তার বড় একটি অন্তরায়। তাৎকালিক দেশপালগণ কর্তৃক রাজকীয় আবশ্যকতা বা ঈর্ষামূলে প্রতিদ্বন্দ্বী জাতির বিরুদ্ধে তাহাদের কাল্পনিক

হেয়তাসূচক কথা সংস্কৃতজ্ঞকর্ত্তৃক লিপিবদ্ধ করান অতি স্বাভাবিক এবং তাহা বহুস্থলে ঘটিয়াছে; কিম্বা নিজেদের জাতিগত হেয়তা থাকিলেও দেশপালগণ তাহা গোপন করাইয়া সংস্কৃতজ্ঞকর্ত্তৃক নিজেদের উচ্চতা যথা কেহ সূর্য্যবংশসম্ভূত, কেহ চন্দ্রবংশ সম্ভূত, কেহ অগ্নিকুলসম্ভূত ইত্যাদি কাল্পনিক অসত্য কথা লিপিবদ্ধ করানও অতি স্বাভাবিক এবং তাহাও বহু স্থলে ঘটিয়াছে। জাতিতত্ত্ব বিষয়ে সংস্কৃত-বচনের অনুসন্ধানে ব্যাপৃত হইবার এই আশঙ্কা। বরং আমার ধারণা, বঙ্গীয় বা ভারতীয় যে কোন জাতির বিবরণ একবার সংস্কৃত-কণ্টকে কণ্টকিত, তাহার জাতীয় তথ্য উদ্ধারের আশা দুরাশা।

ভারতীয় বা বঙ্গীয় যে কোন জাতি নিজেদের ঐতিহাসিক তথ্য-নির্ব্বাচনে যতটা পরিমাণে পৌরাণিক সংস্কৃত বচনের উপরে নির্ভর করিবেন তাঁহাদের সত্য-দর্শন তত দূরবর্ত্তী এবং তাঁহাদের চেষ্টা তত বৃথা ও হাস্যাস্পদ। আমি নিজে কায়স্থ হইলেও আমার বলিতে মস্তক অবনত হয় যে, যমরাজ-সেরেস্তার মুন্সী বা নিকাশনবিস চিত্রগুপ্তের বংশধর। কায়স্থসভার ধনভাণ্ডারের নাম চিত্রগুপ্তভাণ্ডার দেখিয়া ক্ষোভে লজ্জায় মন অবসন্ন হয়। ইহা একদিকে যেমন চিন্তাহীনতার পরিচয়, অপরদিকে তেমনি শ্রমকুণ্ঠতার লজ্জাস্কর দৃষ্টান্ত। আলস্য-পরায়ণের ক্ষণিক উত্তেজনাজাত ক্ষিপ্রকারিতার সহিত পৌরাণিক ভাণ্ডারে প্রবেশকরতঃ সংস্কৃত-বচন সংগ্রহ করিয়া আনিয়া জাতীয় তথ্য উদ্ধার করিলাম, ঐ গৌরব বৃথা, তাহাতে আত্মতৃপ্তি হয় না বরং আত্ম-বঞ্চনা হয়। যদি তথ্য-উদ্ধার উদ্দেশ্য হয়, অক্লান্ত পরিশ্রমসহকারে, "রাগ-দ্বেষ"-বিবর্জ্জিত, নিরপেক্ষ, সত্যশীল বিচারকের ন্যায় অতীত, বর্ত্তমান সমস্ত অবস্থা পর্য্যালোচনা করিতে করিতে অগ্রসর হও, সর্ব্বদাই সত্যকে ধ্রুব লক্ষ্য রাখিতে হইবে, ভুল হয় ক্ষতি নাই, কিন্তু জ্ঞানতঃ অসত্যকে

উপাসনা করিও না, ঐতিহাসিকের পক্ষে তাহা মহাপাপ। পৃথিবীতে অসত্যই এখনো বড়, সত্য অতি ক্ষীণ। প্রকৃত বৈজ্ঞানিক, প্রকৃত ধার্ম্মিক, প্রকৃত রাজনৈতিক যেমন এই সত্যব্রত অবলম্বন করিয়া জগতে সত্যযুগ স্থাপনের দায়ীত্ব ও ভার স্কন্ধে লইয়াছেন। হে ঐতিহাসিক, তাহাতে তোমারও দায়ীত্ব বা ভার কাহারও অপেক্ষা ন্যূন নহে, এ বিশ্বাস এ জ্ঞান যেন তোমার সকল চেষ্টা, সকল শ্রম প্রয়াসের মূলমন্ত্র হয়।

এইরূপ ক্ষেত্রে জাতীয় তথ্যনির্ব্বাচনে পৌরাণিক সংস্কৃত বচনের অনুসন্ধান পরিত্যাগ করিতে আমি বাধ্য।

কিন্তু দীনা, সরলা, গ্রাম্য মাতৃভাষা ছলনা-চাতুরীর বহির্ভূত ছিলেন। তাঁহার প্রথম সন্তান গ্রাম্য কবিগণ অনুকরণপ্রবণ গগনবিহারী পাখীর ন্যায়ই গ্রাম্যবুলিগুলি অবিকল গাহিয়া গিয়াছেন; অপরিপক্ক শিক্ষানবিসের ন্যায়ই বটে, কিন্তু "যদ্দৃষ্টং তল্লিখিতং" ঠিক যথাযথরূপেই, নিজেদের মুন্সীয়ানা বা ভাস্করপটুতার কোন ব্যবহার না করিয়া তাঁহারা তাৎকালিক সামাজিক ছবি হুবহু অঙ্কিত রাখিয়া গিয়াছেন। মাতৃভাষার এই বিশুদ্ধ অপাপ-বিদ্ধ রত্নরাজিমধ্যে যে সত্যধন নিহিত আছে তাহার সদ্ব্যবহার করিলে তাৎকালিক সামাজিক চিত্র অনেকটা হস্তগত করা যায় এ বিষয়ে সন্দেহ নাই।

বণিক-সম্প্রদায়ের নায়কত্বপূর্ণ পদ্মাপুরাণ, চণ্ডী, শীতলামঙ্গল, সত্য-নারায়ণের পাঁচালী, শনির পাঁচালী প্রভৃতি গ্রন্থে এই সম্প্রদায়ের তথ্য উদ্ধারকল্পে অনেক সাহায্য করিতে পারে। এই সমস্ত গ্রন্থের লেখক এক নহে—বহু। শনি-সত্যনারায়ণের পাঁচালীর লেখক সংখ্যাতীত। এখানে একটি বিশেষ কথা মনে রাখিতে হইবে যে, ঐ সকল গ্রন্থগুলি যে সময়ে বাঙ্গালা দেশে লিখিত হয়, কিম্বা যে সমস্ত গ্রন্থকার, যথা—পদ্মাপুরাণের গ্রন্থকার বিজয়গুপ্ত, চণ্ডীর গ্রন্থকার কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম,

শীতলামঙ্গলের গ্রন্থকার দৈবকীনন্দন, ঐ সমস্ত গ্রন্থগুলির প্রসিদ্ধ লেখক বলিয়া খ্যাত, আছেন সেই সমস্ত গ্রন্থকারই যে ঐ সমস্ত উপাখ্যান প্রণয়ন করিয়াছিলেন তাহা নহে, কিম্বা তাঁহাদের নিকটবর্ত্তী কোন অতীত কালের উপাখ্যানই যে তাঁহারা লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন তাহাও নহে; ঐ সমস্ত গ্রন্থকারের বহুপূর্ব্ব হইতেই ঐ সমস্ত গীতি বঙ্গভাষায় চলিত ছিল।

বৈষ্ণবযুগে যে নবপ্রবাহ Renaisance দেশে আসিয়াছিল তাহারই প্ররোচনায় ঐ সমস্ত কবিগণ বৈষ্ণবযুগের পরবর্ত্তীকালে বঙ্গভাণ্ডারের বহু পুরাতনগুলি আপনাদের প্রতিভাদ্বারা প্রতিফলিত করিয়াছিলেন মাত্র। যেমন উদাহরণস্থলে বলা যাইতে পারে ইংরাজী সাহিত্যের কবি-চূড়ামণি Shakespearএর উপাখ্যানগুলির অধিকাংশ তাঁহার নিজস্ব নহে। বৈষ্ণব-সাহিত্যের বহুস্থলে তৎকাল প্রচলিত মনসা বা বিষহরির পূজা ও চণ্ডীপূজার উল্লেখ আছে, তাহাতেই স্পষ্ট বোধ হইবে ঐ উপাখ্যানগুলি পরবর্ত্তী কোন কবিরই নিজস্ব নহে, বৈষ্ণবযুগের বহুপূর্ব্ব হইতেই বিদ্যমান ছিল। চৈতন্য-ভাগবতের একস্থলে এইরূপ উল্লেখ আছে—

"মঙ্গল চণ্ডীর গীত করে জাগরণে।
দম্ভ করি বিষহরি পূজে কোন জনে।"

এখন ঐ গীতিগুলির জন্মকাল নির্দ্ধারণ করিবার প্রয়াস আবশ্যক, বটে, কিন্তু সম্পূর্ণরূপে কৃতকার্য্য হওয়া সম্ভবপর নহে। তবে বর্ত্তমান প্রবন্ধের উপযোগী মোটামুটি একটা ধারণা অবশ্যই করা যাইতে পারে। ঐ সমস্ত গীতিগুলির মধ্যে মনসার গীতি বা ভাসানই সর্ব্বপ্রাচীন। চণ্ডীর গীত তৎপরবর্ত্তী। শীতলা, সত্যনারায়ণ ও চণ্ডীর গীত আরও পরবর্ত্তী।

এই সমস্ত গীতি বা গ্রন্থগুলির সহিত বণিক সম্প্রদায়ের সম্বন্ধ কি? ইহাই প্রশ্ন। ইহাদের নায়ক সর্ব্বত্রই বণিক-সম্প্রদায়। অবশ্যই ইহাতে বণিকদিগের কৃতিত্ব বা প্রশংসার কীর্ত্তন নাই, তাঁহাদের নির্য্যাতনের কথাই অধিক, কিন্তু তাহাতেই বণিক-সমাজের তৎকালের অবস্থা ও বিবরণ, বহু পরিমাণে প্রতীয়মান হইবে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, বঙ্গের অন্য কোন জাতীয় সম্প্রদায় বঙ্গীয় গায়ক বা লেখকগণের এতদূর মনোযোগ আকর্ষণ করে নাই।

পূর্ব্বোক্ত গীতিগুলি তৎ তৎ ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের আদিগ্রন্থ, বাইবেল বা কোরাণস্বরূপ অভিহিত হইতে পারে। প্রত্যেকগুলির উপাখ্যানই কি ধর্ম্ম-প্রচারের মহাগীতি। পদ্মাপুরাণ বা মনসার ভাসান বঙ্গে মনসা দেবী অর্থাৎ সর্পপূজা, প্রবর্ত্তনেব মহাগ্রন্থ, চণ্ডীকাব্য, চণ্ডীরপূজা-প্রবর্ত্তনের মহাগ্রন্থ। শীতলামঙ্গল, সত্যনারায়ণর পাঁচালী, শনির পাঁচালী ইত্যাদিও তদ্রূপ। বঙ্গে এই সমস্ত ধর্ম্ম-প্রবাহ কখন আরব্ধ হয়, তাহাই অনুসন্ধান করিলে ঐ সকল গীতিগুলির জন্মকাল ও জন্মস্থান সম্বন্ধে অনেকটা ধারণা হইবে।

স্থলবিশেষে ব্যক্তিবিশেষ কর্তৃক ধর্ম্মভাব উদ্বুদ্ধ হইতে পারে, কিন্তু ঐ ভাব-প্রবাহের আকার ধারণ করিতে হইলে, পৃথিবীর ইতিহাসে ইহাই দেখা যায় যে, রাজকীয় ক্ষমতা তাহাতে বেগ প্রদান না করিলে ঐ প্রবাহ তেমন বলবৎ হয় না, দুই দিন পরেই লুপ্ত হইয়া যায় বা আদৌ প্রবাহের আকার ধারণ করে না।

উদাহরণস্থলে বঙ্গের বৈষ্ণবধর্ম্ম ও আধুনিক ব্রাহ্মধর্ম্মের উল্লেখ করা যাইতে পারে। উভয়টিই বৈদেশিকের রাজত্বকালে উদ্ভূত, উভয়েরই রাজক্ষমতা হইতে বহুদূরে আপনাকে অবস্থিত রাখিতে হইয়াছে, এবং উভয়ের পরিণতিও প্রায় একই প্রকারের। উভয়েরই সর্ব্বজনলাঞ্ছ

সত্ত্বেও স্বল্পজনতাই দৃষ্ট হয়। ভারতের উত্তর-পশ্চিম প্রান্তের নানকের মতও বহুকাল প্রবাহহীন ছিল পরে রাজক্ষমতার সহিত যুক্ত হইয়াই প্রবল আকার ধারণ করে।

রাজশক্তির সাহায্যে ধর্ম্মপ্রবাহের কি অবিরোধ গতি হয়, তাহার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত দিন ও দুনিয়ার মালিক মহম্মদের ইসলাম-ধর্ম্ম। ইহা অতি অল্পকাল মধ্যেই রাজবলে পুরাতন পৃথিবীর একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। রাজক্ষমতার অভাব হইলে ধর্ম্ম-প্রবাহের কি দুর্গতি হয়, তাহার শোচনীয় দৃষ্টান্ত ভারতের বৌদ্ধধর্ম্ম। গুপ্তরাজগণের তিরোভাবের সঙ্গে সঙ্গেই বৌদ্ধধর্ম্ম ভারত হইতে প্রায় বিচ্ছিন্ন হইয়াছে; যাহা কিছু অবশেষ আছে, তাহার সেই সাম্যনতা প্রচারক উন্নতভাবোদ্দীপক ক্ষমতাই নাই। তাহা সমানতার বিকার সামান্য পীপিলিকা, মক্ষিকা, পতঙ্গাদির প্রতি আসক্তিতে পরিণত হইয়াছে এবং স্থলবিশেষে হীনাঙ্গীয় পৌত্তলিকতায় পরিণত হইয়াছে।

বঙ্গের মনসা, চণ্ডী, শীতলা, সত্যনারায়ণ ইত্যাদি যেরূপ গৃহে গৃহে বদ্ধমূল, ঐ সমস্ত ধর্ম্মপ্রবাহ যেরূপ দীর্ঘকালব্যাপী ও বলবৎ তাহা দেখিয়া অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে, রাজক্ষমতা ঐ সমস্ত ধর্ম্মমতগুলিকে অতি বিশিষ্টভাবে বেগ প্রদান করিয়াছিল। এখন এই রাজক্ষমতা কোন যুগের তাহাই বিবেচ্য।

পশ্চিমাগত বর্ম্ম বা শূরবংশীয় বঙ্গীয় রাজগণ বৈদিক ধর্ম্ম-প্রচারের প্রয়াসী ছিলেন, সুতরাং তাঁহাদের সময়ে এরূপ কাণ্ড সম্ভবপর নহে। উত্তরাগত পালরাজগণ বৌদ্ধভাবাপন্ন ছিলেন, তাঁহাদের সময়েও এরূপ প্রত্যাশা করা যায় না। বঙ্গের শেষ হিন্দু রাজা সেনরাজগণ কি ঐ সমস্ত ধর্ম্মমতের প্রতিপোষক নহেন? ঐ সমস্তগুলি প্রত্যেকেই লৌকিকধর্ম্ম তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু রাজগণও জন-সাধারণের বহি-

ভূর্ত নহেন। তাঁহাদের প্রবৃত্তি ও সংস্কার অনুযায়ী হইলে যে কোন ধর্ম্মমত রাজসাহায্য হইতে বঞ্চিত থাকে না।

সেনরাজগণের পূর্ব্বপুরুষ দক্ষিণাগত বলিয়া প্রসিদ্ধ। বঙ্গের দক্ষিণ-দ্বার চিরকালই উন্মুক্ত ; ঐ মলয়মারুত নির্ব্বাচিত পথে ভাল মন্দ অনেক জিনিসই বঙ্গে প্রবেশ লাভ করিয়াছে। দক্ষিণী বৈষ্ণব স্রোত মাধবেন্দ্র-পুরীর মত মৃদঙ্গনাদে নৃত্য করিতে করিতে, মৃদু জোয়ারের জলের ন্যায় ছল ছল আঁখি জলে ভাসিয়া ভাসিয়া বঙ্গে প্রবেশ করে এবং ইহাই কালে চৈতন্যসাগরী হইয়া দেশ প্লাবিত করিয়াছিল বটে কিন্তু সেখানেও, পূর্ব্বেই বলিয়াছি, রাজসাহায্যভাবে তাই তাহা ক্রমে পঙ্কিল খাতে পরিণত হইয়াছে। ধর্ম্মপ্রবাহ ভিন্ন অন্যবিধ প্রবাহের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেও দেখিতে পাই, দক্ষিণী জোয়ারেই প্রথমে পর্ত্তুগীজ, ডচ্, ফরাসী এবং অবশেষে ইংরেজ এদেশে প্রবেশ করে। হে দক্ষিণ দ্বার! তোমার অপার উদারতার ফলে গৃহস্বামী বাঙ্গালীর ভাল মন্দর বিচার ভবিষ্যৎ বংশীয়েরাই করিতে পারিবে আমরা অক্ষম।

যাহা হউক, যে সেনরাজগণের কথা বলিতেছিলাম, তাঁহাদের ইতিহাস মোটামুটি এইরূপ। সেনরাজগণের পূর্ব্বপুরুষ দক্ষিণাগত ইহা বদ্ধমূল ধারণা। কিন্তু কত দক্ষিণ তাহা নির্দ্দিষ্ট করা সহজ নহে। দ্রাবিড়, কর্ণাট প্রভৃতি দেশে তাঁহাদের কোন ইতিহাস পাওয়া যায় নাই। বিশেষতঃ বিদেশে রাজ্যস্থাপন করিতে পারে এমন কোন বীরজাতি তথায় বাস করিত কিনা সন্দেহ। সম্ভবতঃ সুন্দরবন অঞ্চল যখন সমৃদ্ধ ছিল তখন সেইখানে সেনরাজগণের পূর্ব্বপুরুষ মস্তকোত্তোলন করেন। তথাকার তাৎকালিক চণ্ড প্রভৃতি দুর্দ্ধর্ষ জাতিদিগকে প্রতিদ্বন্দীতায় পরাহত করিয়া ক্রমশঃ সেনরাজগণের পূর্ব্বপুরুষগণ খ্যাতি লাভ করে এবং সুন্দরবন অঞ্চল যখন হঠাৎ আকস্মিক কারণে বিধ্বস্ত হয় তখন সেই দেশ পরিত্যাগ

করিতে বাধ্য হন। চণ্ডজাতি উত্তরাভিমুখী গতি অবলম্বন করে এবং সেনগণের পূর্ব্বপুরুষ দক্ষিণ পশ্চিম বঙ্গের দিকে অগ্রসর হয়। তাহারা দক্ষিণে কর্ণাট পর্য্যন্তও অগ্রসর হইয়াছিল। ঐতিহাসিক অনুসন্ধান এ পর্য্যন্ত যতদূর অগ্রসর হইয়াছে তাহাতে সেনগণের পূর্ব্ব পুরুষকে প্রথমে আমরা কর্ণাট রাজ্যে সৈনিক বা যোদ্ধৃপুরুষরূপে দেখিতে পাই। কর্ণাট রাজ্যের উপর লুণ্ঠনকারী দুর্ব্বৃত্তগণের প্রকোপ বৃদ্ধি হইলে কর্ণাটরাজ সেনরাজগণের পূর্ব্বপুরুষ সামন্ত সেনকে যোদ্ধৃপুরুষরূপে নিয়োগ করেন এবং সামন্ত সেন লুণ্ঠনকারীদিগকে দমন করেন। যথা,—

দুর্ব্বৃত্তানাময়মরিকুলাকীর্ণ কর্ণাট-লক্ষ্মী
লুণ্ঠাকানাং কদন মতনোত্তাদৃণেকাঙ্গবীরঃ।

সামন্ত সেন 'একাঙ্গবীর' ছিলেন অর্থাৎ সেনার এক অঙ্গ-অংশ, একাই চালনা কবিতে পারিতেন। উপরোক্ত শ্লোকের শেষ দুই চরণে কবি অতিশয়োক্তি দ্বারা বলিতেছেন 'তাই যমরাজ দক্ষিণ দিকে বসা মাংস প্রভৃতি প্রচুর খাদ্য দ্রব্য পাইয়া অদ্যাপিও পরিত্যাগ করেন নাই।' যথা,—

যস্মাদদ্যাপ্যবিহত বসা-মাংস-মেদঃ সুভিক্ষাং।
হৃষ্যৎ পৌরস্ত্যজতি ন দিশাং দক্ষিণাং প্রেতভর্ত্তা ॥

ইহা দ্বারা ইহাও সূচিত হইতেছে যে, সামন্ত সেনকে আর অধিক দক্ষিণে অগ্রসর হইতে হয় নাই, যমরাজের উপর ভার দিয়াই নিশ্চিন্ত ছিলেন। বোধ হয় এই সময়েই প্রথমে সেনরাজগণের পূর্ব্বপুরুষ "সেন" (সেনা শব্দের অপভ্রংশ) অর্থাৎ বীর (যথা, ভীমসেন বিক্রমসেন) উপাধি প্রাপ্ত হন। এইরূপ অবস্থা হইতেই সেনগণ ক্রমশঃ ক্ষমতাশালী হইতে থাকেন এবং রাজত্ব স্থাপন করিয়া ইতিহাসপ্রসিদ্ধ হইয়াছেন। কর্ণাটাদি অঞ্চল হইতে ক্রমশঃ বলাধানপূর্ব্বক উত্তরাভিমুখে অগ্রসর হইতে থাকেন। এই সত্যের সূত্র অবলম্বন করিয়াই পরবর্ত্তীকালে সেনগণের পূর্ব্বপুরুষ

বীরসেন নামক কোন দাক্ষিণাত্য ক্ষৌণীন্দ্র বা পৃথিবীপতিকে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। কিন্তু উক্ত বীরসেন অমূলক কাল্পনিক ব্যক্তি। বর্ত্তমানে বল্লাল-সেনের যে তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে, শ্রীযুক্ত তারকচন্দ্র রায় মহাশয় যাহার পাঠোদ্ধার করিয়া বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকায় ১৩১৭ সালের ৪র্থ সংখ্যায় প্রকাশিত করিয়া ঐতিহাসিক কুহেলিকা অনেকটা দূর করিয়াছেন, তাহাতে বল্লালসেনের পূর্ব্বপুরুষগণের নামের মধ্যে বীরসেনের উল্লেখ নাই। যদিও দেওপাড়ায় আবিষ্কৃত বিজয়সেনের খোদিত লিপিতে. বীরসেনের উল্লেখ আছে এবং ক্ষৌণীন্দ্র বলিয়াই পরিচয় আছে তাহা হইলেও বল্লালসেনের তাম্রশাসনখানিই বিশেষ প্রামাণ্য জিনিস। কারণ এখানি একখানি দানপত্র, রাজদপ্তরের দলিলের নকলতে ইহাতে যতদূর সম্ভব সত্য রক্ষা করা হইয়াছে, তাহাতে অসত্য বা কল্পনা ইহাতে বড় স্থান পায় নাই। এই সেনগণ ক্রমশঃ উত্তরাভিমুখী হইয়া "প্রৌঢ়া রাঢ়া" অর্থাৎ অপেক্ষাকৃত প্রাচীনতর রাঢ়দেশের মধ্য দিয়া ক্রমশঃ শক্তিসঞ্চার করতঃ পদ্মা ভাগীরথীর সঙ্গমস্থল অতিক্রম করিয়া বরেন্দ্রে আসিয়া উপস্থিত হন এবং এই সময়ে ও স্থানে বল্লালসেনের পিতা বিজয়সেন প্রথমে রাজত্ব স্থাপন করিতে সমর্থ হন। তৎপূর্ব্বে সেনগণ রাজ্য শাসন করেন নাই। প্রাগুক্ত তাম্রশাসনে বল্লালসেনের পূর্ব্বপুরুষ সামন্ত ও হেমন্ত সেনের নামোল্লেখ আছে, কিন্তু উক্ত সেনদ্বয় রাজোপাধিসূচক কোন বিশেষণে বিভূষিত নহেন। বিজয়সেনের নামের সঙ্গেই প্রথমে "অখিল পার্থিব চক্রবর্ত্তী পৃথ্বীপতি" বিশেষণ দেখিতে পাই। বিজয়সেনের পুত্র বল্লালসেন অবশ্যই রাজচক্রবর্ত্তী হইয়াছিলেন, এবং পালরাজগণের প্রতিপত্তি গ্রহণ করিয়া গৌড়রাজ্য অধিকার করেন।

সেনগণ কর্ত্তৃক প্রতিপত্তি স্থাপনের সময়ে বঙ্গের অন্যান্য অঞ্চলে শূর, বর্ম্ম ও পালবংশীয়েরা রাজ্যবিস্তার ও সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্মবিস্তারকল্পে

পরস্পর বিবাদকলহে লিপ্ত ছিলেন। শূর ও বর্ম্মবংশীয়েরা পুনরুত্থিত বেদসম্মত মতের এবং পাল-বংশীয়েরা বৌদ্ধমতের প্রচারে প্রয়াসী ছিলেন। এ ক্ষেত্রেও ব্রাহ্মণ নামধারী যাজকগণ বেদবিদ্বেষী বা বেদানুরক্ত বলিয়া কোন বাদবিচার করিবার অবসর পান নাই। কারণ মানুষ চিরকালই উদরানুরক্ত। রাষ্ট্রীয় কলহে পালরাজগণ বলবত্তর হইয়া উঠিলে দেশের অধিকাংশ ব্রাহ্মণই পালরাজগণের আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং পালরাজগণ কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট মত নিজেদের ভবিষ্যৎ চিন্তার সহিত খাপ খাওয়াইয়া তাৎকালিক ব্রাহ্মণগণ এ দেশে এক প্রকার কিম্ভূত-কিমাকার ধর্ম্ম-যাজন করিতেছিলেন, তাই বঙ্গের ভাগ্যে প্রকৃষ্ট বৌদ্ধধর্ম্মের দর্শন কখনই ঘটিতে পারে নাই; ধর্ম্মপূজা, শীতলাপূজা প্রভৃতি পূজাবহুল নিকৃষ্ট অঙ্গের বৌদ্ধধর্ম্মের হীন আভাস রাহুগ্রস্ত সূর্য্যালোকের ছায়ার ন্যায় বঙ্গের উপর দিয়া কোন সময়ে চলিয়া গিয়াছে মাত্র। এই সময়ে ব্রাহ্মণগণ পালে পালে এরূপভাবে পালরাজগণের হস্তগত হন যে শূর ও বর্ম্মবংশীয়েরা এদেশে খুব কম সংখ্যক ব্রাহ্মণই পাইতেন। উদরের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা উপস্থিত হইলেই (ধর্ম্মের) ভাণ ধরা পড়ে। হে উদর তোমার কি অনির্ব্বচনীয় মহিমা, তোমার গহ্বরেই ধর্ম্মস্য তত্বং নিহিত আছে। ঋষিগণ তোমার অনুসন্ধান না পাইয়া বৃথাই পর্ব্বত-গহ্বরে প্রবেশ করিয়াছিলেন। তুমিই সেই চক্ষুরাততং, তোমার আভ্যন্তরিক কার্য্য লোক-চক্ষুর বহির্ভূত।

এই অবস্থায় শূর বা বর্ম্মবংশীয় রাজগণ বিদেশ হইতে আগত ব্রাহ্মণদিগকে বহু প্রলোভন দিয়া নিজ রাজ্যে বাস করাইতেন। দেশ-বিদেশে এই প্রলোভনের কথা ছড়াইয়া পড়িলে এ দেশে ব্রাহ্মণগণের যে আগমন-প্রবাহ বা আমদানী আরম্ভ হয়, তাহাই বঙ্গে আদিশূর কর্ত্তৃক এ দেশে পঞ্চ ব্রাহ্মণ আনয়নের কাহিনীস্বরূপ প্রসিদ্ধ আছে ও শ্যামলবর্ম্মা কর্ত্তৃক 'বৈদিক ব্রাহ্মণ' আনয়নের কথার ন্যায় খ্যাত আছে।

আদিশূরকর্তৃক পঞ্চ ব্রাহ্মণ আনয়নের কাহিনী এক প্রকাণ্ড অমূলক সৃষ্টি। এই বদ্ধমূল প্রবাদ ইতিহাসরূপ মহীরুহের পরগাছার ন্যায় তাহারই গাত্রে জন্মগ্রহণ করিয়া, তাহারই রসে পরিবর্দ্ধিত হইয়া ক্রমশঃ শাখা প্রশাখা ও মূল বিস্তার করতঃ, ইতিহাসবটের পুরাতন ধূসর পত্রগুলি ঢাকিয়া ফেলিয়া নিজের হরিৎপত্রের সম্ভার যে জাঁকজমকে প্রসারিত করিয়া ফেলিয়াছে, তাহাতে ইহাকেই ঐতিহাসিক তথ্য বলিয়া ভ্রম হইবে, তাহা নিতান্ত অস্বাভাবিক নহে। তাই, অবশ্যই দুঃখের বিষয়, বঙ্গীয় অধিকাংশ লেখকই এই প্রবাদকে নির্ব্বিবাদে ঐতিহাসিক তথ্যরূপে গ্রহণ করিয়া আসিতেছেন এবং এই প্রকাণ্ড ভ্রমকে ভিত্তি করিয়া বহু প্রকাণ্ডতর ভ্রমাত্মক তথ্যের উৎপাদন করিতেছেন। সংস্কৃত অক্ষরে সংস্কৃত ভাষায় পুরাতন পুস্তকে (যথা কুলকারিকা প্রভৃতি গ্রন্থে) ইদং লিখিত আছে, এই মোহকৃচ্ছ্র অনুসন্ধায়ীর প্রয়াস-বিহ্বল দৃষ্টিকে অভিভূত করিবে তাহাতে আশ্চর্য্য কি ? বহু প্রয়াস ও পরিশ্রম স্বীকার করিয়া অতীতের অন্ধকারময় গহ্বর হইতে যে চাকচিক্যময় বস্তু সংগ্রহ করিতে পারিলাম, তাহাকে পৃথিবীতে সাধারণের নিকট বহুমূল্য রত্ন বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার ইচ্ছাই স্বাভাবিক। পুনরায় সেই রত্ন খাঁটি কি ঝুটা এত অনুসন্ধান করা অনুসন্ধান-ব্যাধি-গ্রস্ত ব্যক্তি ভিন্ন অন্যের সম্ভবে না। পরিশ্রান্ত ঐতিহাসিক এই খানেই স্থগিত হইয়া নিজের পরিশ্রমে সফলতার চিন্তায় ততোধিক সেই রত্নের স্ফুটিত ঔজ্জ্বল্যে নিজেই বিমুগ্ধ হইয়া আত্মহারা হইবেন সন্দেহ নাই; কিন্তু যথার্থ ঐতিহাসিক অক্লান্ত পরিশ্রমী, সত্য-সন্ধয়নী, নিরপেক্ষ ন্যায়-বিচারক, চিন্তাশীল এবং সর্ব্বোপরি অনধীয়, বুদ্ধিমান, দর্শনশক্তিশালী দার্শনিক ও নির্ভীক। এইরূপ প্রকৃত ঐতিহাসিক নিজের অনুসন্ধান-লব্ধ বস্তুকে পুনঃপুনঃ পরীক্ষা করিবেন তাহাতে ভুল নাই।

সামান্য একটু চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারি, ব্রাহ্মণ এমন কোন নিশ্চল

বা অস্থাবর বস্তু নহেন যে, তাঁহাকে বহন করিয়া স্থানান্তরে লইয়া যাইতে হয়। স্বতঃ-প্রবৃত্ত হইয়া তিনি কোথায়ও যাইতে পারেন না বা যান না। বিশেষতঃ ধন-ধান্যে ভরা বঙ্গে অন্যান্য সকলে অতিক্রতপদে প্রবেশ করিয়াছিলেন ; শুধু ব্রাহ্মণকেই স্কন্ধে করিয়া এদেশে আনিতে হইয়াছিল এ কথা বিশ্বাস করিবার পূর্ব্বে ব্রাহ্মণের অত্যাশ্চর্য্য তৎপরতায় অবিশ্বাস করিতে হয়। ব্রাহ্মণের তৎপরতা অতর্কিত ; এই তৎপরতার গুণেই ব্রাহ্মণ যুগে যুগে সুখে-স্বচ্ছন্দে হিন্দু-সমাজের চরম স্থান অধিকার করিয়া আছেন ; হিন্দু-সমাজের বহু ভাগ্য-বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে। কিন্তু ব্রাহ্মণের তৎপরতা ব্রাহ্মণকে চিরকাল স্বস্থানেই রক্ষা করিয়াছে ; তৎপরতাই ব্রাহ্মণের ব্রহ্মণ্য। বিজেতা বণিক ও অন্যান্য সম্প্রদায় দেশ-দেশান্তর কাশ্মীর কাম্বোজ দূরান্তর দেশ হইতে বঙ্গের নামে প্রলুব্ধ হইয়া বঙ্গে প্রবেশ করিলেন আর গৃহকোণের মিথিলা কনৌজনিবাসী ব্রাহ্মণগণ নিশ্চেষ্ট ছিলেন ইহা স্বীকার করিলে ব্রাহ্মণের ব্রহ্মণ্যের অবমাননা করা হয়। মিথিলা ও কনৌজনিবাসী ব্রাহ্মণগণ ত নিতান্ত অতৎপর নহেন, এখনো তাঁহাদিগকে দলে দলে বঙ্গে উপস্থিত হইতে দেখি। অবশ্যই ভাগ্য-বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে। পূর্ব্বে ভাগ্য-গুণে কেহ ভূমি দান পাইতেন, কিন্তু চিরদিন সমান যায় না। যদি ইঁহারা তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষের বৈদিক আচরণ অক্ষুণ্ণ রাখিয়াই অর্থাৎ কেহ বা অগ্নিহোত্রী কেহ বা দণ্ডধারী বেশে বঙ্গে উপস্থিত হন, তথাপি এখন মাথার ঘাম পায় ফেলিয়া অর্থ রোজগার করিতে হয় ; ভূমি-দান, বস্ত্র-দান সহজে আর মিলে না। এমন তৎপর সন্তানগণের পূর্ব্বপুরুষ নিতান্ত নিশ্চল। নিশ্চেষ্ট ছিলেন এ কথা বিশ্বাস করিতে পারি না।

প্রকৃষ্ট বা বিশিষ্ট প্রমাণের অভাবে কি ঐতিহাসিক, কি বৈজ্ঞানিক, সর্ব্বশ্রেণীর সত্যানুসন্ধিৎসুদিগকেই সম্ভবপর আনুমানিক তথ্যের

(theory)র আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। চিন্তাশীল অনুসন্ধান-জগতে অনুমান তথ্যের theoryর স্থান অতি উচ্চে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই উচ্চতাকে লক্ষ্য করিয়া নানা দিক্ হইতে নানা পন্থায় সেই তথ্য-শৈলে আরোহণ করিতে করিতে ভাস্বর জ্বলন্ত সত্যনাথ দেবের মন্দিরে উপস্থিত হওয়া যায়। আজ যদি চিন্তা-জগতের এই উন্নত উচ্চতাগুলিকে ভূমিসাৎ করতঃ সমতায় পরিণত করা যায়, তাহা হইলে মুহূর্ত্ত মধ্যে অজ্ঞান-বারিধির তরঙ্গ চিন্তাক্ষেত্রকে গ্রাস করিয়া ফেলিবে সন্দেহ নাই। মধ্যে মধ্যে চিন্তাগ্নি দ্বারা উৎক্ষিপ্ত হইয়া অনুমান ভূধরের অভ্যুদয় হয় বলিয়াই অজ্ঞান-বারিধি ক্রমশঃ দূরে সরিয়া যাইতেছে। মানব ক্রমশঃ জ্ঞান-উদ্যান বিস্তার করিয়াই সেই সমস্ত তথ্য-ভূধরগুলির শৃঙ্গ স্পর্শ করিবার চেষ্টা করিতেছে এবং যে দিন বিন্ধ্যগিরি হইতে হিমগিরির অত্যুঙ্গ শৃঙ্গ পর্য্যন্ত জ্ঞান-পুষ্পে শোভিত হইবে, যে দিন প্রকৃতই কবির প্রার্থনানুযায়ী—"ধবল শৃঙ্গে ফুটায়ে পদ্মরাগ" জ্ঞানদেবী ধন্যা হইবেন, সেই দিন মানবও ধন্য হইতে ধন্যতর হইবে। অনুমান-শৈল কল্পনার স্তূপ নহে, বাস্তব-চিন্তার দৃঢ় উচ্চতা।

ব্রাহ্মণ এদেশে আছেন সুতরাং এখানে আসিয়াছেন এ কথা অভ্রান্ত। কিন্তু (১) এক সময়ে কোন বিশেষ অনুষ্ঠানসহকারে তাঁহারা এ দেশে আসিয়াছেন। (২) কি বঙ্গীয় আমদানী-প্রবাহের স্রোতে পড়িয়া অবিরাম গতিতে এখানে আসিয়া জুটিয়াছিলেন। বঙ্গে ব্রাহ্মণ উপস্থিত হইবার এই দুইটী তথ্য বা theory হইতে পারে। অর্থাৎ আদিশূর কিংবা তদ্রূপ কোন রাজা কর্তৃক বহু সম্মান ও আদর সহ আহূত হইয়া পঞ্চ বা তদ্রূপ কোন সংখ্যক ব্রাহ্মণ বঙ্গে আসিয়া বঙ্গকে ধন্য করিয়াছিলেন এবং তৎপরে তাঁহাদের বংশধরগণ তাঁহাদের নাম স্মরণ করিয়া রাখিয়া এখনো তাঁহাদের নামেই পরিচিত হইতেছেন এই তথ্যই ঠিক ; কি কলম্বস যে বুদ্ধির বশবর্ত্তী হইয়া আমেরিকা আবিষ্কার করিয়াছিলেন, কিম্বা ভাস্কো

ডি গামা যে আকাঙ্ক্ষার প্রয়োচনায় ভারতের পথ আবিষ্কার করিয়াছিলেন, কিম্বা পর্টুগীজ, ডচ্, ডিনামার, ফরাসী, ইংরাজ প্রভৃতি মধুমক্ষিকাগণ যে অনুসন্ধানতৎপরতা-গুণে বঙ্গ-মধুকে খুঁজিয়া বাহির করিয়াছিলেন, মিথিলা কনৌজবাসী ব্রাহ্মণগণ সেই মধু-আহরণে রত হইয়াই একটি দুইটি করিয়া বা সময়ে সময়ে দলে দলে বঙ্গে আসিয়া জুটিয়াছিলেন এবং ক্রমশঃ মধুচক্র নির্ম্মাণকরতঃ বিক্ষিপ্ত অসম্বদ্ধ ছড়ান মধুমক্ষিকাগুলিকে একচক্রান্বিত করিয়া প্রকাণ্ড ব্রাহ্মণ-সমাজের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন—অর্থাৎ নিজের গরজেই সাধারণ মানব যেমন তৎপরতার আশ্রয়ে জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহের সুকরতা জন্য দেশ হইতে দেশান্তরে গিয়া উপস্থিত হয় ব্রাহ্মণও তদ্রূপ তৎপর ও উদ্যোগী হইয়াই বঙ্গে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের নামজাদা পাঁচটিকে হাতি ঘোড়া চড়াইয়া এ দেশে কেহ কস্মিন্কাল আনে নাই এবং পরে প্রাগুক্তরূপে আগত ব্রাহ্মণগণ আপনাদের মধ্যে বিবাহাদি নানারূপ সম্বন্ধে পরস্পরের সহিত সংশ্লিষ্ট হইয়া নিজেদের সমাজ-সৃষ্টির আবশ্যকতা বোধ করিয়া রাজ-শক্তি সাহায্যে যে ব্রাহ্মণ-সমাজ রচনা করেন তাহাতেই পূর্ব্বপুরুষগণকে কাল্পনিক গৌরবে মণ্ডিত করিবার উদ্দেশ্যে আদিশূর কর্ত্তৃক পঞ্চ ব্রাহ্মণ আনয়নের কাহিনী প্রণয়ন করিয়া মানুষের স্বাভাবিক আত্মপ্রসাদনরূপ প্রবৃত্তির তুষ্টিসাধনকরতঃ প্রথমে আত্ম-বঞ্চনা পরে সমগ্র বঙ্গীয় জন-সাধারণকে বঞ্চনা করিয়াছেন ও করিতেছেন—এই তথ্যই ঠিক; এই উভয়ের মধ্যে কোনটী সম্ভবপর তাহাই বিচার্য্য বিষয়।

এই উভয় তথ্যের বিচারে প্রবৃত্ত হইলে প্রথমে আদিশূর কর্ত্তৃক পঞ্চ ব্রাহ্মণ আনয়ন-কাহিনীর পক্ষে কি বলিবার আছে শুনা আবশ্যক। এ কাহিনী কোন শিলালিপি বা তাম্রশাসনে আবিষ্কৃত হয় নাই। এই কাহিনী নানা ব্রাহ্মণ-কুল-কারিকা কিম্বা কায়স্থকুল-পঞ্জিকায় লিপিবদ্ধ

আছে। ঘটকগণ-লিখিত গ্রন্থই একমাত্র প্রামাণ্য গ্রন্থ। যাহা হউক যাহা লেখা আছে তাহার প্রতি মনোযোগ দিলে দেখি ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থে যে সমস্ত বিবরণ আছে, সেগুলির কি সময় কি স্থান কি আগত ব্রাহ্মণ-গণের নাম কোন বিষয়েই একের সহিত অন্যের ঐক্য নাই। যথা বারেন্দ্র-কুলপঞ্জিকার মতে "শাকে বেদ-কলম্ব-ষট্‌ক-বিমিতে" অর্থাৎ ৬৫৪ শাকে ও বৈদিক কুলাচার্য্যদিগের মতে "বেদ বাণাঙ্ক শাকেতু" অর্থাৎ ৯৫৪ শাকে, দত্তবংশমালা মতে ৮০৪ শাকে, কায়স্থ-কৌস্তুভ মতে ৮১৭ শাকে, ক্ষিতীশবংশাবলী মতে ৯১৯ শাকে পঞ্চব্রাহ্মণকে বঙ্গে আনয়ন করা হয়। স্থানসম্বন্ধেও এইরূপ; কাহারও মতে পৌণ্ড্রনগরে, কাহারও মতে সুরসরিদ্-বিধৌত গৌড়নগরে এবং ঘটককারিকার মতে বিক্রমপুরে প্রথম পঞ্চ ব্রাহ্মণ উপস্থিত হন। নামসম্বন্ধেও তথৈব; রাঢ়ীয় মতে পঞ্চ ব্রাহ্মণের নাম যথাক্রমে ভট্টনারায়ণ, শ্রীহর্ষ, দক্ষ, ছান্দড় ও বেদগর্ভ; বারেন্দ্রমতে ইহাঁদের নাম যথাক্রমে ক্ষিতীশ, তিথিমেধা বা মেধাতিথি, বীতরাগ, সুধানিধি, সৌভরি; এই শেষোক্ত নামগুলি একেবারে ঔপন্যাসিক।

পূর্ব্বোক্ত শাকগুলির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেও বোধ হয়, তাৎকালিক লেখকগণ দশ অঙ্কের মধ্যে যে কয়েকটী অঙ্ককে শুভপ্রদ বলিয়া সম্মানিত করিতেন তাহাদেরই সাজান-গোছানের উপর ব্রাহ্মণ-আনয়নরূপ শুভ-ঘটনার কাল বা সময় নির্ভর করে। যথা 'বেদ' হিন্দুর সর্ব্বাগ্রগণ্য ও সর্ব্বশুভপ্রদ। তাই যতগুলি শাক পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে তন্মধ্যে একটী ব্যতীত সকল গুলিতেই অঙ্কস্ত বামাগতি হিসাবে সর্ব্বাগ্রে '৪' চারি এই অঙ্কই আছে। অপরগুলিও বিশেষ শুভপ্রদ; যথা—৮ বসু, ধন, ৫ বাণে বীরত্ব আছে, ৬ ঋতুগণ হিন্দুর দেবতা মধ্যেই গণ্য, '০' শূন্য এক সময়ে বঙ্গীয় ধর্ম্মাকাশে চন্দ্র-সূর্য্য অপেক্ষাও উচ্চতর আসন গ্রহণ করে; বঙ্গে

বৌদ্ধধর্ম্মের শেষাঙ্ক শূন্যপুরাণের উদয় হয় এবং শূন্য পূজিত চিহ্ন হয় এবং সেই সময় হইতেই ক্রমে বৌদ্ধধর্ম্মের ভাঙ্গা বাজারে হিন্দু দেবদেবিগণের হাট বসিয়াছে। একমাত্র ৯৯৯ শকে উপরি লিখিত লক্ষণগুলি নাই বটে, কিন্তু তাহাতে যে মোটা শুভ লক্ষণ আছে তাহা হিন্দুমাত্রেরই চোখ এড়াইতে পারে না। চক্ষু মুদিলেও হিন্দুকে নবগ্রহ শান্তি করিতে হয়, শ্রীবন্ত হিন্দুর পক্ষে নবগ্রহকে সর্ব্বদাই তুষ্টিতে রাখিতে হইবে। তাই ব্রাহ্মণ-আনয়নরূপ-শুভব্যাপারে নবগ্রহের তিনবার সমাহার করিয়া ৯৯৯ শাক উৎপন্ন করা হইয়াছে।

এই অবস্থায় প্রথম তথ্যটী অর্থাৎ আদিশূর কর্ত্তৃক পঞ্চ ব্রাহ্মণ আনয়ন শুধু-কাহিনী হওয়াই সম্ভবপর, ঐতিহাসিক ঘটনা হওয়া নিতান্ত অসম্ভব। প্রথম তথ্য অসম্ভব হইলে দ্বিতীয় তথ্যটী স্বতঃসিদ্ধ।

আমি আনন্দের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে, এই প্রবন্ধের এই অংশ লিখিবার পরে বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতি কর্ত্তৃক প্রকাশিত গৌড়রাজমালা গ্রন্থে আদিশূর বিষয়ক সিদ্ধান্ত দেখিতে গিয়াও এই একই সিদ্ধান্ত দেখিয়াছি। দার্শনিক-পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া 'রাজমালা' গ্রন্থকার এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। যাঁহারা ঐতিহাসিক তথ্য লইয়া বিচার করিয়াছেন তাঁহারা এইরূপ সিদ্ধান্তের মর্য্যাদা অবশ্যই বুঝিবেন এবং ইহাতে আস্থা স্থাপন করিবেন বিশ্বাস করি।

পাল, শূর ও বর্ম্মবংশীয়েরা যখন উত্তরবঙ্গে এইরূপ দ্বন্দ্বে লিপ্ত ছিলেন, দক্ষিণবঙ্গে তৎকালে সেনবংশীয়েরা ক্রমশঃ বলসঞ্চয় ও প্রতিপত্তি বিস্তার করিয়া আসিতেছিলেন। ইঁহারা পূর্ব্ববর্ত্তী সেনগণ। এই সেনগণ অমার্জ্জিত হইলেও উদ্যম, উৎসাহপূর্ণ এবং মজ্জাবীর্য্যসম্বলিত; পরবর্ত্তী সেনরাজবংশ কিঞ্চিৎ মার্জ্জিত হইলেও ক্রমশঃ মজ্জাহীন হইয়া পড়েন। পরবর্ত্তী সেনরাজগণের ইতিহাস এইরূপ। শূরবংশীয়েরা পালবংশীয়দের

প্রতাপে প্রতিহত প্রায় হইয়া আসিলে তাঁহারা দক্ষিণী সেনবংশীয়দিগকে আহ্বান করেন এবং একরূপ তাঁহাদের নিকট আত্মসমর্পণ করেন। এই ঐতিহাসিক ঘটনাই বঙ্গে সেনবংশ আদিশূরের দৌহিত্র সন্তান হইতে উদ্ভূত এইরূপ প্রবাদে পরিণত হইয়াছে এবং কুলজ্ঞগণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন যে, "জাত বল্লালসেন গুণি-গণিত স্তস্ত দৌহিত্রবংশে"। উভয় বংশ-মধ্যে সম্বন্ধস্থাপনও অসম্ভব নহে। এই সময়ে সেনরাজগণ নিজ শৌর্য্যবলেই দক্ষিণরাঢ় ও পূর্ব্ববঙ্গে রাজত্ব বিস্তার করেন এবং শূরবংশীয়দের পূর্ব্ব প্রতিভার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া ক্রমশঃ গৌড় পর্য্যন্ত অধিকার করেন এবং পালরাজগণকে সম্পূর্ণভাবে প্রতিহত করিতে সমর্থ হন। ইহাঁরাই পরবর্ত্তী সেনরাজগণ। ইহাঁরা ক্রমে শিক্ষিত ও মার্জ্জিত হন এবং ধর্ম্মপরিবর্ত্তন করিয়া শৈবধর্ম্ম অবলম্বন করেন। পরবর্ত্তী সেনরাজগণ অধিকাংশই শিবোপাসক। ইহাঁরা শূরবংশীয়দের নিকট তৎকালিক উত্তর ভারতীয় সভ্যতা শিক্ষা করেন এবং শূরবংশীয়দের আশ্রিত ব্রাহ্মণগণ ইহাঁদের আশ্রয় গ্রহণ করেন। শূরবংশীয়েরা বহু ব্রাহ্মণকে আশ্রয় দান করেন বটে এবং রাষ্ট্রীয় ও ধর্ম্মপ্রচার ব্যাপারে ব্রাহ্মণগণকে যন্ত্রস্বরূপ ব্যবহার করিতেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের রাজ্যের প্রসার তত বেশী না হওয়ায় এই যান্ত্রিকতার তত দরকার হয় নাই; সভ্যতাসম্পন্ন থাকা হেতু ব্রাহ্মণগণও একেবারে হস্তপুত্তলি করিতে পারেন নাই কিন্তু সেনগণ ব্রাহ্মণের হাতে পড়িয়া আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হন নাই; তাঁহাদের পূর্ব্ব বর্ব্বরতা ও সংস্কারের সুবিধা পাইয়া ব্রাহ্মণেরা সেনগণকে একেবারে ব্রাহ্মণসর্ব্বস্ব করিয়া ফেলেন। ফলে, অতি সত্বরেই শৌর্য্যবীর্য্যশালী সেনরাজগণ মজ্জাহীন হইয়া বঙ্গের হিন্দুরাজত্বকে অতলজলে জলাঞ্জলি দিয়া নিজেরাও কালপ্রবাহে ভাসিয়া বেড়াইতেছেন। শুধু বঙ্গে নহে ভারতের সর্ব্বত্রই হিন্দুরাজত্ব অবসানের এই একইরূপ ইতিহাস।

বারান্তরে এ বিষয়ে সাধ্যমত সম্যক্ সমালোচনা করিবার ইচ্ছা আছে। তবে এখানে ভারতীয় বিশেষের বঙ্গের জাতিবিশেষের হীনতার প্রসঙ্গ-ক্রমে এইটুকু বলা আবশ্যক মনে করি যে, উত্তর-ভারতের আর্য্যবিজেতা শকাদি জাতির রাজ্যারম্ভকালে রাষ্ট্রীয় আবশ্যকতার হেতুতেই কিন্তু অনেকটা সহজাত বুদ্ধিবশেই উক্ত রাজগণ কর্ত্তৃক তাহাদের শত্রুজাতি-দিগকে ও অন্তর্নিহিত শক্তিসম্পন্ন অসভ্য অথচ উন্মুখ জাতিদিগকে চির-নিষ্পেষিত করিয়া রাখিবার দুরভিসন্ধিতে বিজিতাবশেষ আর্য্যদিগের মধ্যে যাহারা সহজে বশ্যতা স্বীকার করে এবং ক্রমে পেশায় ব্রাহ্মণ হইয়া পড়ে, সেই ব্রাহ্মণ ও সেই ব্রাহ্মণের শিক্ষাযন্ত্রস্বরূপে ব্যবহৃত হইতে আরম্ভ হয়। এই দৃষ্টান্ত পরে সুবিধামত ভারতীয় বহু রাজগণই অনুসরণ করে। এই স্থলেই ভারতীয় জাতিভেদরূপ আলোক ও বায়ুর প্রবেশ দ্বার শূন্য-হর্ম্ম্যের ভিত্তি-স্থাপন। এই সুরম্য-হর্ম্ম্য সুদৃঢ় বাসগৃহের উদ্দেশ্যেই নির্ম্মিত হয় বটে কিন্তু বিধি-বিড়ম্বনায় ইহা দুর্ভেদ্য কারাগৃহে পরিণত হইয়াছে। ইহার বিষময় ফলে ভারতের ভবিষ্য-দেবতা রুদ্ধ হইয়া পড়িতে-ছেন বুঝিয়া, মহাপ্রাণ বুদ্ধধর্ম্মের আবির্ভাব হয় এবং সেই বুদ্ধ-আত্মাই কিছুকালের জন্য ভারতের রুদ্ধ দ্বার মুক্ত করেন, কিন্তু অহো দুর্ভাগ্য! পুনরায় সেই মুক্ত দ্বারে অর্গল পড়িয়াছে এবং পুনরায় বর্ব্বরতার অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে যান্ত্রিক ব্রাহ্মণগণের এক অভ্যুত্থান হয়, যাহা ইতিহাস-প্রসিদ্ধ শঙ্করের অভ্যুদয় নামে পরিচিত। ফলে ক্রমে মজ্জাহীনতা ও অন্তঃসারশূন্যতারূপ ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া অচিরে ভারতীয় রাজগণ আপনাদের প্রতিভার চিতাগ্নি প্রজ্বলিত করেন। এই চিতাগ্নির জ্যোতিঃ অনেক ঐতিহাসিকের চক্ষে গৌরব-বহ্নি বলিয়া ভ্রম জন্মাইয়াছে। দৃষ্টান্ত-স্থলে উত্তর-ভারতের সমুদ্রগুপ্ত, শ্রীহর্ষ, বিক্রমাদিত্য ও বঙ্গের বল্লালসেনের রাজত্ব-কালের প্রশংসায় কীর্ত্তনের উল্লেখ করা যায়। ঐতিহাসিকগণ

যে পরিমাণে এই রহস্যোদ্ঘাটন করিতে পারিবেন, ভারতবাসীও সেই পরিমাণে আপনার অতীত ইতিহাস সুতরাং ভবিষ্যৎ লক্ষ্য স্পষ্টতর দেখিতে পাইবে। যে সেনগণের কথা এ পর্য্যন্ত একটু বাহুল্য ভাবেই বলা হইল, তাঁহারা যখন সুন্দরবন অঞ্চলে ছিলেন তখনই তাঁহাদের সর্প-পূজা অভ্যস্ত ছিল। বঙ্গে পালরাজগণের খণ্ড ও বিচ্ছিন্ন রাজ্যগুলি ক্রমশঃ সেনরাজগণের হস্তগত হইতেছিল এবং তৎসঙ্গে তৎকালে বৌদ্ধ-প্রভাবও হ্রাস হইয়া আসিতেছিল। ব্রাহ্মণগণও যে কোন নবাগত বা নবোদ্ভূত শক্তিকে আশ্রয় করিয়া বৌদ্ধবল আহত করিবার চেষ্টায় ছিলেন, এই উদ্দেশ্য সহজবোধ্য। যাহা হউক, রাজশক্তি ও ব্রাহ্মণশক্তি মিলিত হইয়া গরল-ধারীকেও দেবতার আসনে স্থান দিল। শাসন ও শিক্ষার এই লজ্জাস্কর যোগ-সাধন মানুষের চোখে সকল সময়েই পড়ে।

অমার্জ্জিত সেনরাজগণ স্বধর্ম্ম ও স্ব-সংস্কারানুযায়ী বিষহরীর পূজাকে সাদরে গ্রহণ করিতে পারেন; ব্রাহ্মণগণ উদরের দায়ে বা প্রতিহিংসার পরিশোধের জন্য তাহা সমর্থন করিতে পারেন; কিন্তু তথায় যদি এমন কোন উচ্চজাতি বাস করেন, সাপের পূজা যাহাদের সংস্কার ও প্রবৃত্তির বিরুদ্ধ এবং সেই জাতির যদি এমন অর্থবল থাকে যে, পেটের দায় তাহাদিগকে ম্রিয়মাণ করিতে পারে না, কিম্বা প্রতিহিংসানল তাহাদের বুদ্ধি বিবেচনাকে দগ্ধ করিয়া ফেলে নাই, তবে তাহারা সহজে কেন সেই সর্প-পূজা গ্রহণ করিবে? এই অঞ্চলেই তৎকালে ব্যবসায়ী সওদাগর বণিক্‌জাতি বাস করিতেন, তাঁহাদের সংস্কার উচ্চতর ছিল, অর্থবলও যথেষ্ট ছিল। মনসার ভাসান বা পদ্মাপুরাণ গ্রন্থে তাঁহাদিগকেই নির্ব্বাচন করিয়া মনসা-পূজা গ্রহণে বাধ্য করাইবার উপাখ্যান বর্ণিত আছে। পদ্মাপুরাণের আখ্যায়িকা সকলেই জানেন। তবে চণ্ডীকাব্য, শীতলামঙ্গল, সত্যনারায়ণের পাঁচালী ইত্যাদির সহিত সাধারণত্ব প্রদর্শন জন্য আখ্যা-

ষ্ঠিকাটীর সামান্য অবতারণা করা আবশ্যক। এই সকলগুলিতে সদাগর বণিক্‌-জাতির প্রতি প্রকোপ। এই বণিক্‌-সম্প্রদায় শিবোপাসক ; কোন ক্রমেই মনসা, চণ্ডী, শুভচণ্ডী ওরফে শুবচনি, বা শীতলা, সত্যনারায়ণ ইত্যাদির পূজা গ্রহণ করিবেন না। পদ্মাপুরাণ, চণ্ডীকাব্য যদি মনসা-পূজা ও চণ্ডী-পূজার বাইবেল হয়, তবে চাঁদ সদাগর ও ধনপতি সদাগর প্রত্যেকটীর Satan স্বরূপ, সর্প ও চণ্ডীর Kingdom স্থাপন জন্যই তাহাদের নির্য্যাতন, প্রথমে নৌকাডুবি, ধন-সম্পত্তির বিনাশ, তৎপরে পুত্রনাশ, কারাবন্ধন ইত্যাদি। অবশেষে স্বর্গ-রাজ্যের আবির্ভাব ; সর্প ও চণ্ডীর পূজার প্রচার।

মনসার ভাসান প্রথমে কোথায় রচিত হয়, তৎসম্বন্ধে আরও প্রমাণ সংগ্রহ করিতে হইলে পদ্মাপুরাণের প্রথম লেখকগণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে হয়। পদ্মাপুরাণের গ্রন্থকার কর্ত্তৃক বহু কারণে মনসা-পূজা ক্রমে দেশময় ছড়াইয়া পড়ে, কিন্তু তন্মধ্যে ৩ জন প্রসিদ্ধ ও সর্ব্বপ্রাচীন। তাঁহাদের নাম যথাক্রমে কাণা হরিদত্ত, বিজয় গুপ্ত ও নারায়ণ দেব। কাণা হরিদত্ত কাল্পনিক লোক কিনা বলা যায় না, কিন্তু বিজয়গুপ্তের স্বদেশীয় বলিয়া বিজয়গুপ্ত অনেকটা আভাস দিয়াছেন। বিজয়গুপ্ত ও নারায়ণদেব কাল্পনিক ব্যক্তি নহেন। বিজয়গুপ্তের নিবাস আধুনিক বাখরগঞ্জ জেলার অন্তর্গত ফুলশ্রী ওরফে গৈলা গ্রাম। নারায়ণ দেবও পূর্ব্ব-দক্ষিণ বঙ্গনিবাসী ; ত্রিপুরা ও মৈমনসিংএর সন্ধিস্থল জোয়ানসাহি পরগণায় তাঁহার জন্মস্থান। এই প্রাচীন গ্রন্থকারগণের প্রতি লক্ষ্য করিলে ইহা অনুমিত হয় যে মনসার ভাসান তাঁহাদের অঞ্চলেই প্রথমে উদ্ভূত হয়। কারণ দেশের পাখীই দেশের বুলি ধরে। মনসার ভাসানের বিস্তৃতি এত হইয়াছিল যে, চাঁদ সদাগরের নিবাস বঙ্গের প্রত্যেক অঞ্চলেই এক একটি দাবী করে, কিন্তু মনসার ভাসানের উদ্ভব-স্থান লইয়া বিশেষ তর্ক থাকিতে

পারে না। প্রমাণের উপর নির্ভর করিলে সমুদ্র-সন্নিধ, নদীবহুল, সর্পসঙ্কুল সুন্দরবন ভাটি অঞ্চলেই তাহা নির্ণয় করিতে হয়। উত্তর ও পশ্চিমবঙ্গের পদ্মাপুরাণের কবিগণ নায়িকা বালিকা বেহুলাকে ভেলায় ভাসাইয়া ছয় মাস কাল নদী-বক্ষে, সমুদ্র-বক্ষে রাখিয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে কেহ জীবনে এক দিন কাল নদী বা ক্ষুদ্র তটিনী-বক্ষেও কখন যাপন করিয়াছেন কিনা কিম্বা করিতে সাহসী হইতেন কিনা সন্দেহ।

কেহ যদি সন্দেহ করেন, পদ্মাপুরাণের সদাগর জাতি ও প্রবন্ধোক্ত বেণে বা সাহ জাতি এক কিনা, তবে আমি বলিব তাঁহার সে সন্দেহ বৃথা, তাহা আদৌ ধারণার বিরুদ্ধ। যাহা হউক তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য পদ্মাপুরাণের একটী স্থলমাত্র উদ্ধৃত করা আবশ্যক মনে করি। যেস্থলে বেহুলার ভ্রাতাগণ কাঁদিতে কাঁদিতে তাঁহাকে ফিরাইবার চেষ্টা করিতেছেন,—

হরি সাধু বলে ভগ্নি মোর বাক্য ধর
সমুদ্রের কূলে তুমি লখিন্দরে গোড়
এইক্ষণ চল বেহুলা মুক্ত সাহের বাড়ী
খনি বদলে দিব কাঁচা পাটের সাড়ী
শঙ্খ বদলে দিব সুবর্ণের চুড়ি
সিন্দুর বদলে দিব ফাউগের গুড়ি।

এইস্থলে দুইটি বড় কথারই প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। প্রথম বেহুলার ভ্রাতাগণের আত্মীয় বিশেষ স্বজাতির নাম মুক্তসাহ সুতরাং সাহ, সদাগর বেণে একজাতি। কারণ চাঁদ সদাগরকে বহুস্থলে চাঁদ বেণেও বলা হইয়াছে যথা,—

"যদি মোর পূজা করিবে চাঁদ বেণে।
হেঁতালের বাড়িগাছি আগে ফেল টেনে॥"

দ্বিতীয়, সমুদ্রের কূলে এই সাহু, সদাগর বা বেণে জাতির নিবাস ছিল। লখিন্দরকে সৎকার করিয়া বেহুলাকে সেইরূপ কোন এক বাড়ীতে লইয়া যাইবার জন্য তাহার ভ্রাতারা চেষ্টা পাইয়াছিল। অতএব পদ্মাপুরাণ অবলম্বনে আমরা বণিক্-সম্প্রদায়কে প্রায় বঙ্গোপসাগরকূলেই পাই। চট্টগ্রামে ইহাদের উপনিবেশের প্রমাণের কথা পরে বলিব। তবে এখানে এই কথা বলিয়া রাখিব, এই সময়ে বণিক্‌সম্প্রদায় চট্টগ্রাম-অঞ্চলেও বাস করিতেন।

ইহার পরে এই বণিক্ সম্প্রদায়কে আমরা বঙ্গের কোন্ অঞ্চলে দেখিতে পাইব, তজ্জন্য দ্বিতীয় গ্রন্থ চণ্ডীকাব্যের প্রতি লক্ষ্য করিতে হইবে।

পদ্মাপুরাণেই আমরা পাইয়াছি, এই বণিক্-সম্প্রদায় জলবণিক্, স্থল-বণিক্ নহে; তাহারা সমুদ্রে মধুকর ডিঙ্গায় আরোহণ করিয়া বাণিজ্য করিতে যাইত। বাণিজ্যলক্ষ্মী ও রাজলক্ষ্মী পরস্পর সঙ্গিনী। যেখানে রাজশক্তি বিস্তৃত হয়, অপহরণ, দস্যুতাব ভয় সেখান হইতে ক্রমে দূর হয়, বাণিজ্যও ক্রমে সেই সকল স্থানে প্রসারিত হয়। দক্ষিণাগত রাজগণ ক্রমে উত্তর অঞ্চলে রাজ্য বিস্তৃতি করিতেছিলেন এবং এই বণিক্-সম্প্রদায়ও ক্রমে তাহাদের অনুগামী হয়। চণ্ডীর আখ্যায়িকাস্থল তাম্রলিপ্ত, মেদিনী-পুর ও গাঙ্গপ্রদেশ, ত্রিবেণীর চতুঃপার্শ্বস্থ সপ্তগ্রাম ও কলিকাতা অঞ্চল। মুকুন্দরামের পূর্ব্বকবি মাধবাচার্য্যের চণ্ডী মেদিনীপুর অঞ্চলে প্রচলিত ছিল এবং মুকুন্দরামের চণ্ডীতে ধনপতি সদাগর সিংহল গমনে ইন্দ্রাণী পরগণা, ললিতপুর, ভাউসিঙের ঘাট, মেটেরি অঞ্চল অতিক্রম করিয়া-ছিলেন। মাধবাচার্য্য স্বয়ং সপ্তগ্রামবাসী ছিলেন। মুকুন্দরাম বর্দ্ধমান জেলা নিবাসী ছিলেন। এই সমস্ত লেখকের নিবাস, গীতির আখ্যায়িকা-স্থল ইত্যাদির প্রতি লক্ষ্য করিলে এই বণিক্-সম্প্রদায়কে পরবর্ত্তীকালে আমরা তাম্রলিপ্ত ও সপ্তগ্রাম ত্রিবেণী অঞ্চলে দেখিতে পাই।

তৃতীয় গ্রন্থ শীতলামঙ্গলে বণিক্-সম্প্রদায়ের পরবর্ত্তীকাল ও স্থান নির্দ্দিষ্ট হয়। শিবোপাসক চন্দ্রকেতুর নিবাস বেহার ও বঙ্গের সঙ্গমস্থল, বসন্তরোগের প্রকোপস্থল উত্তর-গাঙ্গপ্রদেশ।

তৎপরে সেনরাজগণ ক্রমে যখন গৌড়ে প্রবেশপূর্ব্বক "সেন" উপাধি ধারণ করিয়া রাজত্ব করিতে থাকেন, সেখানেও এই বণিক্-সম্প্রদায় লক্ষ্মীর বরপুত্রের ন্যায় তাঁহাদের অনুসরণ করেন। এই বণিক্-সম্প্রদায় এখনও গৌড়প্রদেশ বর্ত্তমান মালদহ জেলায় বহু পরিমাণে বাস করিতেছেন এবং তাঁহারা আপনাদিগকে "বঙ্গদেশী" বলিয়া থাকেন। বোধ হয়, বেহারের উপকণ্ঠস্থ মালদহের গৌড়, বঙ্গদেশ হইতে তৎকালে বিশিষ্টরূপে বিভিন্ন ছিল, তাই আপনাদের পূর্ব্ব-নিবাসের পরিচয় অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য তথাকার আগন্তুক বণিক্-সম্প্রদায় আপনাদিগকে বঙ্গদেশী বলিয়া পরিচয় দিতেন।

ক্রমে এই বণিক্-সম্প্রদায়, প্রথমে সেনরাজগণের রাজ্যবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে, ও মুসলমান-রাজত্বকালে, ও পরে ওলন্দাজ, ইংরাজদিগের সময়েও প্রতি রাজধানী ও বাণিজ্য-প্রধান স্থানেই আপনাদের উপনিবেশ স্থাপন করেন এবং কালে বঙ্গময় ছড়াইয়া পড়িয়াছেন। এই কারণে সোনারগাঁ, বিক্রমপুর, ঢাকা, মুর্শিদাবাদ, কলিকাতা, হুগলী ইহাঁদের বিশেষ স্থান।

তবেই দেখা যাইতেছে, যে পথে বঙ্গে অন্যান্য বণিক্-সম্প্রদায় যথা পর্ত্তুগীজ, ডচ, ফরাসী, ইংরাজ বঙ্গে প্রবেশ করেন, এই বণিক্ বা বেণে জাতিও সেই পথেই বঙ্গে আসিয়াছিলেন। ইউরোপীয় বণিক্গণের ন্যায় ইহাঁদেরও অর্ণবপোত ছিল, বিশিষ্ট সমুদ্র-বাণিজ্যও ছিল। কিন্তু 'ভাগ্যং ফলতি সর্ব্বত্র'।

এই বণিক্-সম্প্রদায়ের বঙ্গে আগমন-বৃত্তান্তের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের

ধর্ম্মবৃত্তান্ত আলোচনা করিলে তাঁহারা যে বঙ্গের আগন্তুক একথা আরও স্পষ্টতর হইবে। পদ্মাপুরাণ ও চণ্ডীকাব্যেই তাঁহাদের ধর্ম্মবৃত্তান্ত, তাঁহাদের সংস্কার, আচার-ব্যবহার যথেষ্ট উল্লেখ আছে। উভয় গ্রন্থেই দেখা যায় ইঁহারা শিবোপাসক। পদ্মাপুরাণের সাত খানা মধুকর ডিঙ্গা সমুদ্রে মনসার কোপে নিমজ্জিত হইলেও চাঁদ কোনক্রমে ভেলায় চড়িয়া কূল পাইয়া শিবঠাকুরকেই স্মরণ করিতেছেন—

ভেলা চাপিয়া সাধু পাইলা গিয়া তট।
শিব শিব বলি সাতবার কবে গড়॥

এবং শিবের ভরসাতেই মনসাকে সংহার করিবার বুদ্ধি আঁটিতেছেন—

"যা করেন শিবশূল এবার পাইলে কূল
মনসার বধিব পরাণে।"

চণ্ডীকাব্যের ধনপতি সদাগরও কারারুদ্ধ হইয়াও চণ্ডীর পূজা গ্রহণ করিতে কিছুতেই স্বীকৃত নহেন, প্রাণ গেলেও তিনি শিবের অবমাননা করিতে পারিবেন না।

যদি বন্দিশালে মোর বাহিরায় প্রাণী।
মহেশ ঠাকুর বিনে অন্য নাহি জানি॥

যে কারণেই হউক মনসার পূজা তৎকালে বঙ্গে বিশেষ প্রচলিত হইলেও তাহা যে ইতরজনোচিত এবং ইতরের বাড়ীতেই যে মনসার বিশেষ আদর ছিল তাহার প্রমাণ পদ্মাপুরাণেই পাওয়া যায়। চাঁদ সদাগরের হেঁতালের (যষ্টির) বাড়ী, মধ্যে মধ্যে খাইয়া মনসাদেবী যে হাঁসপাতালে গিয়া চিকিৎসিত ও শুশ্রূষাপ্রাপ্ত হইতেন তাহার এইরূপ ভাবে বর্ণনা আছে—

"হেঁতালের বাড়ী দিলগো আগো তাতে ব্যথা পাইলাম বড়,
জালুয়া মণ্ডপে গিয়া কাকলী কৈলাম দড়।"

ধীবরাদি জাতির বাড়ীতেই মনসার বেশী খাতির ছিল। এই শ্রেণীর দগের বাড়ীতে মনসা ও চণ্ডীর যাজন করিয়া তাৎকালিক ব্রাহ্মণ-গণও বেশ লাভবান্ হইতেন। চৈতন্যভাগবতে তদ্বিষয়ে এইরূপ উল্লিখিত আছে,—

"দেখ এই চণ্ডী বিষহরীরে পূজিয়া,
কেনা ঘরে খায় পরে বসন পরিয়া।"

ইহা দ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হয়, বণিক্ আধুনিক বেণে জাতি, তৎকালে বঙ্গের সাধারণ ইতরজাতি অপেক্ষা বিশেষ ও উচ্চতর জাতি ছিলেন। বঙ্গের এই ইতর আদিম জাতির সহিত শুধু ধর্ম্মে নহে কোন বিষয়েই বণিক্‌গণের একত্ব ছিল না। আদিম জাতিগণের সহিত বিভিন্নতা বণিক্‌গণের আগন্তুকত্বই প্রতিপন্ন করে। বাণিজ্যকুশল বঙ্গ চিরকালই বিদেশী বণিক্‌কে আহ্বান করিয়াছে। কাহাকেও বঙ্গ আপনার করিয়া ফেলিয়াছে, কাহারও নিকট আপনাকে বিক্রীত করিয়াছে। যাহারা বিচ্ছিন্ন বা স্বতন্ত্র থাকিতে চেষ্টা করিয়াছে, তাহাদিগকে দূরে নিক্ষেপ করিয়াছে। আধুনিক মারওয়াড়ী বণিক্‌গণের সহিত তুলনা করিলে প্রবন্ধোক্ত বণিক্-সম্প্রদায়কে একভাবে বঙ্গের প্রাচীন মারওয়াড়ী বলা যাইতে পারে। বিশেষত্ব এই বণিক সম্প্রদায় বাঙ্গালী হইয়াছে, মারওয়াড়ী মারওয়াড়ীই আছেন। আজ বঙ্গে হিন্দুরাজত্ব বর্ত্তমান থাকিলে, বঙ্গ-সমাজের প্রবাহ স্রোতস্বান্ থাকিলে, মারওয়াড়ীগণ নিজেদের স্বাতন্ত্র্য অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিতেন কিনা সন্দেহ, বঙ্গসমাজ তাহাদিগকে নিজ অঙ্গীভূত করিয়া লইত।

বণিক্‌সম্প্রদায়ের ধর্ম্মালোচনা করিলে তাহাদের জাতীয় উচ্চতা, মানসিক বল, প্রকৃত মনুষ্যত্ব, যে কি পরিমাণে মনকে আঘাত করে, তাহা তাহাদের বর্ত্তমান সামাজিক হীনতার প্রতি শুধু লক্ষ্য রাখিলে

ধারণা করা আদৌ সম্ভব নহে। তাই একবার বঙ্গবাসীকে বাঙ্গলার বেণে বা শুঁড়ি জাতির প্রতি তাঁহার স্বাভাবিক অবজ্ঞা ক্ষণেকের জন্ত ভুলিতে অনুরোধ করি। পদ্মাপুরাণের ও চণ্ডীর আখ্যায়িকায় পুনরাবৃত্তি করিয়া বলিতে চাই, চাঁদ, ধনপতি ও শ্রীমন্তের স্থায় প্রকৃত মনুষ্যোচিত বীরহৃদয় বঙ্গীয় কোন্ উচ্চ জাতির মধ্যে কে কয়টি নির্দ্দেশ করিয়া দিতে পারেন? হিমাচলের গগনস্পর্শী উচ্চতার সম্মুখীন হইলে স্তম্ভিত হইয়া দণ্ডায়মান হই, কিন্তু চাঁদের সুমহৎ বীরত্বের সম্মুখীন হইলে, ভক্তিভরে মস্তক অবনত হইয়া আসে। শিবোপাসক চাঁদকে মনসার মন্ত্রে দীক্ষিত করিবার জন্য মনসা তাহাকে কোন্ নির্য্যাতনই না করিয়াছেন? সে নির্য্যাতন খানাতালাসা অথবা deportation শ্রেণীর নির্য্যাতন নহে। প্রথমে সর্ব্বস্বনাশ, একে একে সাতখানি বাণিজ্যসম্ভারসম্বলিত মধুকরকে জলমগ্ন করা, পরে একটি বা দুইটি নহে, ছয়টি পুত্রের বিনাশসাধন। কিন্তু চাঁদ অটল, তখনও হেঁতাল লইয়া মনসাকে তাড়া করেন। এত দুঃখেও শিবঠাকুর চাঁদের কোন উপকার করেন নাই বা বিপদের আসান দেন নাই, কিন্তু চাঁদ তজ্জন্য তিলমাত্র ক্ষুব্ধ নহে। চাঁদ জানিতেন তাঁহার উপাস্য দেবত্ব পার্থিব মিত্র বা শত্রুর ন্যায় ব্যবহার করিতে পারেন না। মনসার দেবত্ব দেশে যতই বদ্ধমূল হোক না কেন, চাঁদ তাঁহাকে তাঁহার চরিত্র দেখিয়া পার্থিব অন্যান্য শত্রুর ন্যায়ই জ্ঞান করেন, তাই মনসার ব্যঙ্গ শুনিয়া চাঁদ তাঁহাকে সম্মুখ সমরে আহ্বান করিতেছেন—

"মনেতে ভাবিছ কাণি অস্তরীক্ষে রৈয়া।
সাহস যদ্যপি থাকে কহ আগু হৈয়া॥"

এত করিয়াও চাঁদ যখন নমিত হইল না, মনসা অনন্যোপায় হইয়া স্বর্গের দেবতা-গোষ্ঠীর নিকট আপনার অসামর্থ্য জ্ঞাপন করিলেন। দেবতাগণ চিন্তিত হইলে মর্ত্ত্যে বঙ্গে এমন আর দুই চারিটি মানুষ জন্মগ্রহণ

করিলে, তেত্রিশ কোটির উপায় কি হইবে। দেবতাগণ বুদ্ধি আঁটিলেন। মর্ত্ত্যে বেহুলার আবির্ভাব হইল। আমার সন্দেহ হয়, দেবতাগণের অভিসন্ধির ফলেই স্বর্গের কোন অপ্সরী, মর্ত্ত্যে বেহুলারূপ ধারণ করিয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন কিনা? কিন্তু চাঁদের অবশ্যই সে সন্দেহ হয় নাই। বেহুলাকে উপযুক্ত শ্বশুরের উপযুক্ত পুত্রবধূ বলিয়াই চাঁদ বুঝিয়াছিলেন। দেবগণ নিঃশব্দে, দুর্লক্ষ্যে, স্নেহাবরিত বেহুলারূপিণী সহানুভূতির অস্ত্র দ্বারা চাঁদের বীর-তন্ত্রী ছিন্ন করিতে অবশেষে সমর্থ হইয়াছিলেন। শেষ অস্ত্র *sympathy* সহানুভূতির আক্রমণ হইতে আপনাকে রক্ষা করিতে পারে এমন বীর যেমন হৃদয়ের তেমনি বুদ্ধির বীর হওয়া আবশ্যক।

দেবগণ বুদ্ধি স্থির করিয়া মনসাকে পুনরায় চাঁদের শেষ পুত্র লখিন্দরের বিনাশ সাধন করিতে বলিলেন। লখিন্দরের গলিত শব লইয়া বেহুলা জলে ভাসিল। ক্রমে বেহুলার ভেলা স্বর্গের ঘাটে পৌঁছিল। দেবগণ বেহুলার নৃত্য-গীত শ্রবণে সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে পুরস্কার দিলেন, চাঁদেব সাত পুত্রের পুনর্জীবন। এই খানে দেবগণ আপনাদের মর্য্যাদা prestige রক্ষার উদ্দেশ্যে বেহুলাকে এক সর্ত্ত দিলেন। যদি বেহুলা মর্ত্ত্যে গিয়া তাহাব শ্বশুরকে মনসা-মন্ত্রে দীক্ষিত করিতে না পারে, তবে পুনরায় চাঁদের পুত্রগণ যমালয়ে ফিরিয়া আসিবে। বেহুলা স্বামী ও স্বামীর ভ্রাতাগণসহ শ্বশুরের নিকট উপস্থিত হইলেন। পাঠক, এখানে চাঁদ কি করিতে পারে? আমার বা আপনার একটি গরুর বাছুর হারাইলে তাহা ফিরিয়া পাইবার জন্য হরির লুট মানস করি। চাঁদের মৃত সাতপুত্র অযাচিত ভাবে ফিরিয়া আসিয়াছে, একটু দুর্ব্বলতা স্বীকার করিয়া তাহাদিগকে গৃহে রাখিয়া দিলে চাঁদকে কি একেবারে অমানুষ বলিবেন? ইহা অবশ্যই স্থূল-চক্ষে দেখিলে চাঁদের পরাজয়, কিন্তু এই পরাজয়, জয় কি পরাজয়—তাহা সেই বীর-রমণী বেহুলাই বুঝিয়াছিল, নতুবা বীর শ্বশুরকে মনসার

উদ্দেশ্যে অন্ততঃ বামহাতে দুইটি ফুল ফেলিয়া দিবার জন্য অনুরোধ করিত না। পুত্র-শোকাতুরা সনকার মর্ম্মভেদী ক্রন্দন চাঁদ তুচ্ছ করিয়াছিল, কিন্তু বীর, বীরের মর্ম্ম বুঝে, পুত্রবধূর কৃচ্ছ সাধনার সার্থকতাকে আপনার কৃতকার্য্যে অসার্থক করা, চাঁদ অপকার্য্য মনে করিয়াছিলেন, তাই নিজের একটু ন্যূনতা স্বীকার করিয়া "চেঙ্গমুড়ি"র মস্তকে মুখ ফিরাইয়া বাম-হস্তে কয়েকটি ফুল ফেলিয়া দিয়াছেন। কিন্তু তখনও মনসা চাঁদের নিকট-বর্ত্তিনী হইয়া পুষ্প গ্রহণ করা নিরাপদ মনে করেন নাই। চাঁদের হাতের লাঠি (হেঁতাল) খানি তখনো মনসার মনে ত্রাস উৎপাদন করিতে-ছিল; বেহুলাকে অনুরোধ করিয়া হাতের লাঠিখানি সরাইয়া মনসা তবে চাঁদের সম্মুখীন হন।

পদ্মাপুরাণের অন্যান্য অঙ্কেও চাঁদের মনুষ্যত্ব অসাধারণ। সফরের নৌকা জলমগ্ন হওয়ায় চাঁদ বিধ্বস্ত হইয়া, দীর্ঘ উপবাস ও ক্লান্তির পরে, বন্ধু-গৃহে খাইতে বসিয়াছেন। বন্ধু খাদ্য-দ্রব্য চাঁদের সম্মুখে দিয়াছেন, চাঁদ হাত বাড়াইয়া অন্নের গ্রাস তুলিতেছেন, এমন সময়ে বন্ধু চাঁদের দুঃখে কাতর হইয়া চাঁদকে মনসার সহিত বাদ ক্ষান্ত দিতে অনুনয় করিলেন; অমনি চাঁদের অন্তরাত্মা জ্বলিয়া উঠিল, বন্ধুর অন্ন-ব্যঞ্জনে পদাঘাত করিয়া ত্রস্তে বন্ধু-গৃহ ত্যাগ করিলেন, ক্ষোভের সহিত বলিয়া গেলেন, "বর্ব্বর ভাঁড়ায়ে খাও কাণি।" সত্যই এই সংসারে এই চাঁদ বন্ধুর ন্যায় বর্ব্বরের অভাব নাই বলিয়াই "কাণি" শ্রেণীর জ্ঞানশক্তি প্রতিপত্তি লাভ করে।

পদ্মাপুরাণের বণিক্ চাঁদের এইরূপ অলৌকিক বীরত্ব ও তেজস্বিতা। চণ্ডীর বণিক্ ধনপতি ও শ্রীমন্তের বীরত্ব অবশ্যই সম্পূর্ণ চাঁদের ন্যায় নহে। বর্ব্বর-উৎপীড়ন ও নির্য্যাতনের প্রকোপে সে তেজ অবশ্যই হ্রাস হইয়া আসিয়াছে। পাঁড়ুর ভেড়ার শৃঙ্গে ভাঙ্গে হীরার ধার। কিন্তু তাহাও অসাধারণ, অন্ততঃ উচ্চশ্রেণীর মনুষ্যের চরিত্রানুযায়ী।

চণ্ডীর ছলনায় শিবোপাসক ধনপতি সিংহলে যাবজ্জীবন কারারুদ্ধ হইলেন; সুবিধা বুঝিয়া কারাগারের যন্ত্রণাভোগের মধ্যেই চণ্ডী স্বপ্ন দেখাইয়া জানাইলেন, তাঁহার পূজা করিলে, "ধনপতির দুর্গতির অবসান হইবে"; কিন্তু ধনপতি তখনও অটল; উত্তর করিলেন,—

"যদি বন্দীশালে মোর বাহিরায় প্রাণী
মহেশ ঠাকুর বিনে অন্যে নাহি জানি।"

চাঁদের ন্যায় ধনপতিও উপাস্য দেবতা শিবের দ্বারা পার্থিব সুখ-সম্ভোগ বা বিপদ্ হইতে ত্রাণ পাইবার প্রত্যাশা করেন না। ইহা উচ্চাঙ্গের উপাসনা, উপাসক নিশ্চয়ই উচ্চ শ্রেণীর মানব। পদ্মাপুরাণের শিব মনসার হিসাবে অকর্মণ্য, উপাসনার অনুপযুক্ত দেবতা; চণ্ডী পুরাণে ততোধিক, শিব এখানে বেশীর ভাগ বদরাগী, শাপ-দান-প্রবণ। শিব-কর্ত্তৃক অভিশপ্ত ব্যক্তি চণ্ডীর কৃপায় ত্রাণ পায়।

শিব-পূজার জন্য ইন্দ্র যুবরাজ নীলাম্বরকে ফুল তুলিতে বলেন; রাজকুমারের তোলা ফুলের মধ্যে একটি পিপীলিকা ছিল। সেই পিপীলিকা শিবকে একটু কামড়াইলেই শিব চটিয়া নীলাম্বরকে শাপ দিলেন,—

"মোর সেবা ত্যজি ইচ্ছা কর অন্য সাধ
ত্বরিত চলহ মহী হও গিয়া ব্যাধ।"

পৃথিবীতে গিয়া ব্যাধ হও। নীলাম্বর চক্ষু মুদিলেন; স্বামীর সহমৃতা হইয়া নীলাম্বরের স্ত্রী ছায়াবতীও নীলাম্বরের সহিত মর্ত্ত্যে আসিয়া জন্মগ্রহণ করিলেন। তাহারাই চণ্ডীকাব্যের কালকেতু ও ফুল্লরা। শিবের অভিসম্পাতজনিত দুর্দ্দশাগ্রস্ত কালকেতু ও ফুল্লরা চণ্ডীপূজা গ্রহণ করিয়াই ঐহিক সুখ-সমৃদ্ধি যথেষ্ট ভোগ করিয়া স্বর্গে ফিরিয়া যায়। উভয় গ্রন্থেই শিবের এই নিন্দা ও তুচ্ছীকরণ,—চণ্ডীর মহিমা অপার, তৎকৃপায় গোধিকাহারী ব্যাধ রাজত্ব করিয়া স্বর্গে ফিরিয়া গেল, শাপভ্রষ্ট নীলাম্বর

শাপমুক্ত হইল। প্রকৃত পক্ষেও কালক্রমে বঙ্গে চণ্ডীদেবীর এত প্রাধান্য স্থাপিত হয় যে, ধর্ম্মরাজ্যে তাঁহার এক চোট পশার হইয়াছিল, বঙ্গগৃহের দেবগৃহখানি একেবারে 'চণ্ডীমণ্ডপে'ই পরিণত হয়।

ধনপতি এত দেখিয়া শুনিয়াও চণ্ডীকে তুচ্ছ করিতেছেন। ধনপতির পক্ষে ইহা ধর্ম্ম-রাজ্যের সিডিসনের অপরাধ। নির্য্যাতন ত যথেষ্ট হইয়াছে। বশে আনিবার অন্য কি উপায় হইতে পারে? পুনরায় দেবগণের মন্ত্রণা-সভা আহূত হইল। স্থির হইল, এবারে সহানুভূতির অস্ত্র-প্রয়োগ। দেবগণ এবারে বেশী সতর্ক হইয়াছিল। বেহুলা বালিকা হইলে দৃঢ়ব্রতা। মনসার কথা সব জানিয়া শুনিয়াও বিপদে পতিত হইয়াও স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া বেহুলা কখনো মনসার শরণাপন্ন হয় নাই। স্বীয় আয়াস দ্বারাই স্বামীর জীবন লাভ করিয়াছিল। দেবগণ বুঝিলেন এই স্বাবলম্বন-স্পৃহা শিক্ষার দোষ সুতরাং শিক্ষায় সংস্কার আবশ্যক। এজন্য বালক শ্রীমন্তের গর্ভধারিণীর প্রতিই প্রথমে নজর পড়িল। তাই শ্রীমন্তের মাতা খুল্লনা দেবধাম হইতেই প্রেরিতা হইলেন। অপ্সরী রত্নমালা তালভঙ্গদোষে লক্ষপতি বণিকের ঘরে খুল্লনা হইয়া জন্মগ্রহণ করিলেন। পাছে বালক 'ছিরা'—শ্রীমন্ত বিগড়াইয়া যায় এই আশঙ্কায় পিতা ধনপতিকে দূরে দূরে কখন গৌড়ে, কখন সিংহলে রাখা হইল। শ্রীমন্তের জন্মগ্রহণের সময়েও পিতা ধনপতি গৃহে উপস্থিত নাই। বণিক-সমাজের স্বাভাবিক নির্ভীকতায় পাছে বালকের মনে তেজাঙ্কুর জন্মে এই ভয়ে সেই বালক-হৃদয়েই এক বিষাঙ্কুর রোপিত হইল। প্রাথমিক primary শিক্ষাগারেই তাহাকে জানান হইল তুমি জারজ সন্তান, তোমার পিতৃত্বে মনুষ্যত্বের কোন দাবী নাই। এমন বিষ যে বালক-হৃদয়ে প্রবেশ করে, সেখানে স্বভাবোদ্গত অন্য অঙ্কুরগুলি পুড়িয়া ছাই হইয়া যায়। কিন্তু বণিক্-সমাজের কি মহত্ব, এরূপ অবস্থায় পড়িয়াও শ্রীমন্ত মনুষ্য-চরিত্রের

আভাস দিতে লাগিল। পুনরায় আর একমাত্রা বিষ-দানের ব্যবস্থা হইল। উচ্চশিক্ষা Collegiate educationএর সময় শ্রীমন্ত যখন স্বাধীন চিন্তার পরিচয় দিতে লাগিল, তখন অন্য কেহ নহে তাহার গুরু-দেবই তাহাকে তিরস্কার করিলেন, তুমি জারজ। তোমার কোন শিক্ষাই তোমাকে মনুষ্যের অধিকার দিতে পারিবে না। তোমার সকল চেষ্টাই বৃথা। বলিতে কি, আমার সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টিশক্তি ভবিষ্যতের কুজ্ঝটিকা যতদূর ভেদ করিতে সমর্থ, ততদূর পর্য্যন্ত তোমার মনুষ্যত্বের দাবীর ক্ষীণাদপি ক্ষীণ রশ্মিও আমার নয়নগোচর হয় না। আমি বলিতেও কুণ্ঠিত নই, আমার কর্ণে তোমার মনুষ্যত্বের দাবীর কথা উপকথা বা পৌরাণিকী কথা বলিয়াই মনে হয়। শ্রীমন্তের আর ধৈর্য্য থাকিল না। পিতার উদ্দেশ্যে গৃহত্যাগ করিল।

এই সময়ে চণ্ডী সুবিধা মনে করিলেন। পিতা ধনপতিকে যে পরীক্ষায় ফেলিয়া ব্যর্থ হইয়াছেন, মাতৃগর্ভ হইতে দুর্ব্বলীকৃত শ্রীমন্তের উপরেও সেই পরীক্ষা আরম্ভ হইল। পূর্ব্বের ন্যায় ছলনা করিয়া তাঁহাকে সিংহলের পথে লইয়া চলিলেন এবং পথে সমুদ্রের গভীর জলে এক পদ্ম-বনে এক প্রস্ফুটিত পদ্ম-ফুলের উপরে দণ্ডায়মানা দেবী এক হাতে এক হাতী উঠাইয়া গ্রাস করিতে উদ্যতা এরূপ এক অলৌকিক মূর্ত্তি দেখাই-লেন; দেবী রূপে উজ্জ্বল বরণী; হস্তিখাদিনী দেবী বালকের মস্তক-খাদিনী হইবার প্রত্যাশায় উল্লাসময়ী।

সিংহলে রাজসভায় উপস্থিত হইয়া শ্রীমন্ত এই অলৌকিক কমলে-কামিনীরূপ প্রচার করিল। শ্রীমন্তেরও পিতার ন্যায় চক্রে পড়িয়া প্রাণদণ্ডের আদেশ হইল। দক্ষিণ মশানে শ্রীমন্তকে মস্তকচ্ছেদনের জন্য আনিলে বালক প্রাণের দায়ে চণ্ডীর শরণাপন্ন হইল। দেবগণের অভি-সন্ধি সফল হইল। চণ্ডী হাঁপ ছাড়িলেন, নির্য্যাতন repression সফলিত

হইল দেখিয়া, অধিকার reformation অযাচিতভাবে দান করিলেন। দয়ার ভাণ্ড শ্রীমন্তের মস্তকে ঢালিয়া দিলেন। শ্রীমন্ত জীবন পাইল, রাজকন্যা পাইল, অর্দ্ধরাজ্য পাইল, সিংহলের ব্যবস্থাপক সভার বোধ হয় সদস্যও হইয়াছিল এবং পরে পিতার সহিত সাক্ষাৎ হইল। দেবগণ একেত্রেও স্নেহাবরিত সহানুভূতির অস্ত্রদ্বারাই বীর বণিক্‌কে পরাভব কবিলেন। কারানিহিত ধনপতি পুত্রের অনুরোধে নিজেও চণ্ডার পূজা গ্রহণ করিলেন। স্বর্গে দুন্দুভি বাজিয়া উঠিল; Rule Heavenia সঙ্গীত গীত হইল।

চণ্ডীর শেষ অঙ্কেও যুবক বণিকের উচ্চ-হৃদয়ের পরিচয় দেখিতে পাই। স্বাধিকারপ্রমত্তা রাজকুমারী সুশীলা স্বামীকে নিজ হস্তে পাইয়া, সিংহলের বর্ষব্যাপী সৌন্দর্য্য-সম্ভারের বিষয় জানাইয়া, একটী বৎসরকাল সিংহলে থাকিবার প্রার্থনা জানাইলেন। কিন্তু জননীর শ্রীচরণদর্শনাভিলাষী যুবক শ্রীমন্ত সে সুখের প্রলোভনে মত্ত হয় নাই, পিতাকে সঙ্গে লইয়া জননীর উদ্দেশ্যে ছুটিয়াছিল।

চণ্ডীকাব্যও বণিক্‌সম্প্রদায়েব এই উচ্চ মানসিকতা, সুতরাং উচ্চ জাতীয়তার পরিচয় প্রদান করে।

অবশ্যই একথা বলিতে চাই না, যে বণিক্‌জাতির মধ্যে চাঁদ সদাগর বা ধনপতি, কি শ্রীমন্ত প্রকৃতই জন্মগ্রহণ করিয়াছিল কিম্বা ঐ সমস্ত উপাখ্যান-গুলির বৃত্তান্ত সমুদয় ঠিক সত্য, কিন্তু সেগুলি যে সত্যের সুস্পষ্ট উজ্জ্বল আভাস তাহাতেও বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। রূপ, অবয়বের ছবি যেমন চিত্র বা ফটো রক্ষা করে, সমসাময়িক কাব্য-সাহিত্যও সেইরূপ মানব-চরিত্রের প্রতিকৃতি ধারণ করিতেছে। ভূধর-গাত্রের ক্ষীণ কঙ্কালচিহ্ন যেমন লুপ্ত ঐরাবতের পরিচয় দেয়, সাহিত্য-পটের লুপ্তপ্রায় হস্তলেখা অতীত যুগের মানবের সেইরূপ সুস্পষ্ট ইতিহাস। বর্ণনার আতিশয্যে বা

অলঙ্কারের চাকচিক্যে পুরাতন মানবের স্বরূপ একেবারে লুপ্ত হয় নাই, সকল ঐশ্বর্য্যের পশ্চাতে সে তাহার ব্যক্তিত্ব লইয়া সুস্পষ্ট দণ্ডায়মান আছে। "What is your first remark on turning over the great, stiff leaves of a folio, the yellow sheets of a manuscript,—a poem, a code of laws, a declaration of faith? This, you say, was not created alone. It is but a mould, like a fossil shell, an imprint, like one of those shapes embossed in stone by an animal which lived and perished. Under the shell there was an animal, and behind the document there was a man. Why do you study the shell, except to represent to yourself the animal? So do you study the document only in order to know the man." *Taine.*

বণিক্‌গণের শুধু শিবোপাসকত্বই ও শিবের প্রতি অটল আসক্তিই ভারতের হিসাবে তাহাদের উচ্চ জাতীয়তার বিশিষ্ট প্রমাণ সন্দেহ নাই। এইস্থলে হিন্দুধর্ম্মমণ্ডলে শিবের স্থান-নির্ণয়ের একটু প্রয়াস অপ্রাসঙ্গিক হইবে না—বরং আবশ্যকীয় মনে করি। পরবর্ত্তী নির্দ্ধারণেও এই প্রসঙ্গ অত্যাবশ্যক পরে দেখিতে পাইবেন।

অনেকের মতে যথা প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের বেদের রুদ্র-দেবতাই কালে শিবস্বরূপে ভারতে উপাসিত হইতে থাকেন (বিশ্বকোষ "শিব")। এই সিদ্ধান্ত ভ্রমাত্মক বলিয়াই বোধ হয়; শিবের তেজ-বীর্য্যের কিঞ্চিৎ আভাস বৈদিক রুদ্রদেবতায় পাওয়া যায় এবং কালে অভিধানে 'রুদ্র' ও 'শিব' একই অর্থে ব্যবহৃত হইতেছে বলিয়াই এইরূপ সিদ্ধান্ত যুক্তিসঙ্গত নয়। ঋগ্বেদে রুদ্র-দেবতা মরুৎগণের জনকস্বরূপে বর্ণিত। অগ্নিপ্রজ্বলিত করিলে চতুর্দ্দিক্ হইতে বায়ুপ্রবাহ আরব্ধ হয়, এই নৈসর্গিক ব্যাপার হইতেই যাজ্ঞিক অগ্নিশিখা বা রুদ্রের

সহিত মরুৎগণের পিতাপুত্র-সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছে। ঋগ্বেদের মরুৎ-স্তোত্রে সম্বন্ধ এইরূপে সূচিত আছে,—

"নিত্যং ন সূনুং মধু বিভ্রত উপ
ক্রীড়ংতি ক্রীড়া বিদথেষু ঘৃষ্বয়ঃ।
নক্ষংতি রুদ্রা অবসা নমস্বিনং
নমর্দংতি স্বতবসো হবিষ্কৃতং"॥

১মঃ ১৬৬ সূঃ ২ ঋক্।

ইহার পণ্ডিত মোক্ষমূলব কর্ত্তৃক ইংরাজী তর্জ্জমা এইরূপ,—

Like parents bringing sweet to their own son (নিত্যং সূনুং) the wild (ঘৃষ্বয়ঃ) (Marutas) play playfully (ক্রীড়ংতি ক্রীড়া) at the sacrifices. The Rudras reach the worshippers (নমস্বিনং) with their protection powerful by themselves they don't hurt the sacrificer (ন ক্ষংতি, ন মর্দংতি হবিষ্কৃতং)।

*আকাশস্থ মরুৎগণও যে একই রুদ্রতনয় মরুৎ, তাহা নিম্নলিখিত শ্লোকেও সূচিত হয়—

"প্র যে শুংভংতে জনয়ো ন সপ্তয়ো
যামন্রুদ্রস্য সূনবঃ সুদংসসঃ।
রোদসী হি মরুত শ্চক্রিরে বৃধে
মদংতি বীরা বিদথেষু ঘৃষ্বয়ঃ"॥

১মঃ ৮৫ সূঃ ১ ঋক্।

প্রযে শুংভংতে = Those who glance forth, like wives and yoke-fellows (জনয়ো ন সপ্তয়ো) they are the powerful Sons of Rudra (রুদ্রস্য সূনবঃ) on their way. The Marutas have heaven and earth to grow they the strong and the wild delight in sacrifices.—*Maxmuller.*

সুতরাং বৈদিক রুদ্রদেবতা এবং শিবের সহিত কোন সাদৃশ্যই নাই। হিন্দুর দেবদেবীগণের কোন বিশেষ ধারাবাহিক ইতিহাস নাই, তবে হিন্দুর পুরাণগুলির মধ্যে ঐতিহাসিক তথ্য অতি সংগোপনে লুক্কায়িত আছে। হিন্দু-পুরাণের প্রতি লক্ষ্য করিলে স্পষ্টই দেখিতে পাই, বৈদিক যাগযজ্ঞ প্রভৃতির সহিত প্রকাশ্যে বিরুদ্ধাচরণ "শিব" দেবতাই প্রথমে সূচনা করেন। দক্ষযজ্ঞ প্রথমে শিব ও শিবদূত দ্বারাই পণ্ড হয়। দক্ষ-যজ্ঞের পাণ্ডা বৈদিক ঋষিগণ, তাঁহারা শিবদূতগণের অত্যাচারেই অন্তর্হিত হন। অনেকে শিবের এইরূপ আচরণ দেখিয়া অর্থাৎ শিবকে বেদ-বিরোধী দেখিয়া 'শিব'কে একেবারে অনার্য্য দেবতা বলিয়া ফেলিয়াছেন। বর্ত্তমান রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় এই মত প্রকাশ করিয়াছেন। অবশ্যই অনার্য্য শব্দ ন+আর্য্য—অর্থাৎ আর্য্য ব্যতীত অন্য জাতীয় অর্থে ব্যবহৃত হইলে তাঁহার মত অসমীচীন নহে, কিন্তু অনার্য্য শব্দ সাধারণতঃ যে অর্থে ব্যবহৃত হয় অর্থাৎ ভারতীয় আদিম aboriginal জাতির অর্থে ব্যবহৃত হইলে অর্থাৎ 'শিব'কে ভারতীয় বর্ব্বর আদিম অসভ্য জাতির দেবতা বলিলে তাহার মতও ভ্রমাত্মক বলিয়াই বোধ হয়।

এইস্থলে কিঞ্চিৎ রাষ্ট্রীয় তথ্যের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে। আমি পূর্ব্বেও কিঞ্চিৎ আভাস দিয়াছি, পরেও দেখাইব, এবং এখনো বলিতেছি, কি ধর্ম্মজগৎ, কি চিন্তাজগৎ, কি মানব-সমাজ, কি মানবের শিক্ষা আচরণ অনুষ্ঠান সমস্ত বিষয়ের তথ্য ও সিদ্ধান্ত আদিম মূল তথ্য রাষ্ট্রীয় তথ্যের উপরে নির্ভর করে। পৃথিবীর যা কিছু পরিবর্ত্তন রাষ্ট্রীয় পরিবর্ত্তনেই তাহার সূচনা বা পরিণতি। Theodore Parkar বলেন Politics is the science of exigencies পৃথিবীর যা কিছু পরিবর্ত্তন রাষ্ট্রীয় তথ্যই তাহার রহস্যোদ্‌ঘাটন করিবে। বৈদিক দেবতাগোষ্ঠী, যাজ্ঞিক হবি ও আহুতি দ্বারা সদলবলে সুখে-স্বচ্ছন্দে আপনাদের উদর-

পূর্ত্তি করিয়া আসিতেছিলেন, হঠাৎ একা শিবের এমন কি সাধ্য যে তাঁহাদের মুখের গ্রাস কাড়িয়া নন। শিবের এই পারগতার মূল কারণ রাষ্ট্রীয় বল। যে দুর্দ্ধর্ব বিক্রমশালী শক Scythian জাতি ভারতের উত্তর-পশ্চিম প্রান্তস্থিত আর্য্য বা বৈদিক জাতিকে প্রহৃত করিয়া তথায় স্বাধিকার স্থাপন করেন, শিব সেই শকগণেরই উপাস্য দেবতা; যে শক-বংশীয়গণ পরে 'রাজপুত' নাম গ্রহণ করিয়া 'হর হর ব্যোম ব্যোম' শব্দে ভারতে দিগ্বিজয় করিয়াছিলেন, 'শিব' সেই শকগণের সহিতই ভারতে প্রথম প্রবেশ করেন; যে দেশের পাঠানগণ পরে উপর্য্যুপরি ভারত আক্রমণ করিয়া ভারতে বিজয়-বৈজয়ন্তী প্রোথিত করিয়াছিলেন, 'শিব' সেই আফগানিস্থান প্রভৃতি দেশেরই আদিম অধিবাসী। 'শিব' ভারতের আগন্তুক খাঁটি দেশী দেবতা নহেন। শিবের প্রবল প্রতাপ, সিন্ধু হইতে গঙ্গাসাগর, হিমালয় হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত সর্ব্বত্রই শিবময়। ইহার কারণ আর অন্য কিছু নহে, শক-সভ্যতা। আদিম আর্য্য-সভ্যতা ও নবোদ্ভূত দ্রাবিড়ী সভ্যতা এবং অপর আগন্তুক মোঙ্গলীয় সভ্যতার সহিত মিশ্রিত হইয়া যে বিরাট্ ভারতীয় সভ্যতার সৃজন করে, তাহাতে ধর্ম্মমণ্ডলে 'শিব'ই সর্ব্বোপরি প্রবল হন, কারণ তাঁহার উপাসক শকগণই প্রবলতম ছিল। শক-সভ্যতা প্রথমে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়াই আর্য্য-সভ্যতার পাণি-গ্রহণেচ্ছু হইয়া আর্য্যসভ্যতাকে আপন করিয়া লইবার চেষ্টা করে। নিরীহ, বিধ্বস্ত আর্য্যগণের পক্ষে শকগণের বীর্য্য অসহ্য বোধ হয়। তাই দক্ষরাজ-যজ্ঞে শিবের নিন্দা শুনিয়া আর্য্য-সভ্যতার দুহিতা দক্ষকন্যা সতী প্রাণত্যাগ করেন এবং কিছুকাল আর্য্য-সভ্যতা শকসভ্যতা হইতে পৃথক্ থাকে। পরে ভারতের উত্তরপূর্ব্ব প্রান্ত হইতে মোঙ্গলীয় সভ্যতা ও মোঙ্গলীয় বীর্য্য ভারতে প্রবেশ করিতে থাকে। তিব্বতীয়গণ কর্ত্তৃক উত্তর ভারতে রাজ্যস্থাপন ইতিহাসপ্রসিদ্ধ। শকসভ্যতা সহজে ইহার

সহিত মিলিত হইতে প্রস্তুত ছিলেন না। কিন্তু মোঙ্গলীয় সভ্যতার প্রবাহ উত্তর ভারতে অপ্রতিহত গতিতে প্রবেশ করে। কালে "কুর্য্যাদ্ হরস্যাপি পিণাকপাণেঃ ধৈর্য্যচ্যুতিং" মোঙ্গলীয় সভ্যতার এই প্রতিজ্ঞাই বলবৎ হয়। এই ক্ষেত্রেই ভারতীয় মহাকবিগণ ব্যাস, বাল্মীকি, শক ও মোঙ্গলীয় সভ্যতার সংমিশ্রণরূপ হর-পার্ব্বতীর বিবাহ কীর্ত্তন করিয়াছেন এবং পরে মহাকবি কালিদাসও হর-গৌরীর বিবাহ-কীর্ত্তন করিয়া ভারতে 'কুমার-সম্ভব' গাহিয়া গিয়াছেন। প্রকৃতই উত্তর ভারতের কুমারগণঃ তিনি কুমারগুপ্তই কি কুমার সিংহই হউন, এক কথায় উত্তর ভারতের শৌর্য্য, বীর্য্য শক ও মোঙ্গলীয় জাতির সংমিশ্রণজাত তাহাতে সন্দেহ নাই।

মধ্য ও দক্ষিণ-ভারতেও ক্রমে শকবিজয়ের সঙ্গে সঙ্গে শিবের আধিপত্য স্থাপন হয়। প্রাকৃতিক ঐশ্বর্য্যাপ্লুত, স্নেহমণ্ডিত, স্নিগ্ধ দক্ষিণ-ভারতে লক্ষ্মীশ্বর প্রেমিক বিষ্ণুদেবেরই আবির্ভাব হয়। দ্রাবিড়গণ অধিকাংশই বিষ্ণু-উপাসক, কিন্তু সেখানেও শিবোপাসক শকগণ বিজয়স্তম্ভ স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে বহু শিব-মন্দিরও স্থাপন করে। দুর্দ্ধর্ষ দ্রাবিড়ীগণ শকগণের একেবারে করায়ত্ত হয় নাই; শকগণের সহিত সমকক্ষতা রক্ষা করিতে তাহারা সমর্থ হইয়াছিল, তাই শিব ও বিষ্ণুর পরে আপোষ হইয়াছে। নানাবর্ণ ও জাতির লীলাক্ষেত্র ভারতের এক প্রধান বিশেষত্ব আপোষ-প্রবণতা; এক কর্ত্তৃক অন্যের সমূল উচ্ছেদ ভারতে অতি অল্প স্থানেই ঘটিয়াছে। তাই কালে ভারতীয় সমাজ বৈদিক, দ্রাবিড়ীয় ও শক-মঙ্গো-সভ্যতার আপোষ করিয়া এই তিন মহাবৃক্ষের ত্রিফলাকে গঙ্গা, যমুনা, সিন্ধু, কাবেরী, গোদাবরীর সলিলে সিক্তকরতঃ তাহারই রস-পানে আপনাদের দ্বন্দ্বজ বৈষম্য দূর করিবার ব্যবস্থা করিয়া লইয়াছে।

যদিও 'শিব' ভারতময়, তথাপি শিবোপাসনার পদ্ধতি সর্ব্বত্র একরূপ নয়। কোথায়ও 'শিব' কেবল মন্ত্রদ্বারা উপাসিত হন, কোথায় বা

নরাকার দেশে উপাসিত হন, কোথায় বা 'শিব' শিলাময় পুরাতন আর্য্য-গণের ন্যায় পুরাতন শকগণ শুধু মন্ত্রোপাসক ছিলেন অর্থাৎ কোনরূপ মূর্ত্তিপূজা না করিয়া মন্ত্রোচ্চারণেই বৈদিক প্রার্থনার ন্যায় শুধু প্রার্থনা দ্বারাই উপাস্য 'শিব'কে স্তুতি করিতেন। কিন্তু এই শ্রেণীর শিবোপাসনা এক্ষণে ভারতে বিরল; ভারতের উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে দৃষ্ট হয় এবং ভারতবহির্ভূত আফগানিস্থান ও বেলুচিস্থান অঞ্চলে যে সামান্য সংখ্যক হিন্দু আছেন, তাহাদের মধ্যেও দৃষ্ট হয়। কিন্তু ভারতের অন্যান্য অঞ্চলে অন্য প্রকার উপাসনার সহিত এই পদ্ধতি মিশিয়া গিয়াছে।

'শিবের' শিলাময় মূর্ত্তি কিঞ্চিৎ চিন্তার বিষয়। বর্ব্বরজাতি কর্ত্তৃক অধ্যুষিত মধ্য-ভারতে অতি ত্রস্ততার সহিত শৈবধর্ম্ম প্রচারের চেষ্টাতেই এই কাণ্ড ঘটিয়াছে। মধ্য-ভারতের বর্ব্বরগণ সাধারণতঃ প্রস্তর ও বৃক্ষাদির উপাসক। এখন তাহারা খৃষ্টধর্ম্ম অবলম্বন করিলেও তাহাদের সিন্দুর-রাগ-রঞ্জিত প্রস্তরখণ্ডের উপাসনা পরিত্যাগ করে নাই। খৃষ্টান হইয়াছে বলিয়াই তাহারা ধর্ম্মত্যাগী, বিধর্ম্মী বলিয়া আপনাদিগকে পরিচয় দিতে কুণ্ঠিত। শিলা ও বৃক্ষোপাসনা তাহাদের স্বাভাবিক স্বধর্ম্ম। তাই স্থলবিশেষে 'শীতলা' বা শিলাময় অন্য দেবতার উপাসনা খৃষ্টান হইলেও তাহারা ছাড়ে নাই। এইস্থলে অবশ্যই খৃষ্টানপাদরীগণ বর্ব্বর চরিত্রের উৎকট স্থিতিশীলতা দেখিয়া নির্ব্বাক্ থাকেন। নিতান্ত অধীর হইয়া যেন তেন প্রকারেণ কার্য্য-উদ্ধারের নীতি অবলম্বন করেন না। মহদনুষ্ঠানের উপযোগী মহাধৈর্য্যের সহিত, আপনাদের ধর্ম্মের মহত্ত্বের বিশ্বাস অটল রাখিয়া, প্রাকৃতিক গতির স্বাভাবিক শক্তির উপরে নির্ভর করেন, সময়ের সহকারিতায় বিশ্বাস করেন, নবদীক্ষিত বর্ব্বরদিগকে এরূপ শিক্ষা দেন না যে, ঐ প্রস্তরখণ্ডই তাহাদের যীশু বা পবিত্র ক্রস। কিন্তু দুর্ভাগ্য কি সৌভাগ্যের কথা বলা কঠিন, বৌদ্ধধর্ম্ম প্রহত-প্রয়াসী সুতরাং

ন্যস্তবাগীশ। প্রতিদ্বন্দ্বিতার তাড়নায় চক্ষুরোগগ্রস্ত সাধারণ শঙ্করনামাধ্যায়ী শৈবধর্ম্ম-প্রচারকগণ 'তথাস্তু' বলিয়া বর্ব্বরের শিলাখণ্ডকেই 'শিব' বলিয়া শিক্ষা দেন এবং 'শিব' বলিয়া গ্রহণ করেন। কাজ কিছু সহজ ও সংক্ষেপ করা হয় বটে, কিন্তু পরিণাম যে ক্রমেই বিপরীত হইতে থাকে তাহা অতি সহজবোধ্য। পরবর্ত্তী যুগে ভারতীয় ভাস্কর-পটুতার শ্রীবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব্ববর্ত্তী যুগের যে-কোন-প্রকারের প্রস্তরখণ্ড 'শিব' ক্রমশঃ একমূর্ত্তি শিব ও পরে মূর্ত্তিহীন নির্দ্ধারিত ক্রম-সূক্ষ্ম ও মসৃণ দেহ ধারণ করে এবং সময়ে কবিশ্রেণীর পুরোহিতের ভক্তি ও কল্পনার মহিমায় পরিষ্কার, পবিত্র পৌরুষ-চিহ্নের আকার ধারণ করিয়া বসিয়াছে।

শিবের নরাকৃতি পূর্ব্বোত্তর ভারতে আবদ্ধ। বারাণসী ইহার পীঠস্থান। এই খানেই হরগৌরী নরনারী মূর্ত্তিতে বিরাজিত, উত্তর-ভারতীয় কবিগণ এই খানেই অর্দ্ধ-নারীশ্বর মূর্ত্তি দর্শন করেন। ইহা তিব্বতীয় সাধুর কৃপা তাহাতে সন্দেহ নাই। তিব্বতীয়গণ কর্ত্তৃক উত্তর-ভারতে রাজ্য-বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে এদেশে মোঙ্গলীয় সভ্যতার প্রবাহ আগমন করে এবং তিব্বতীয় পুরোহিত ডালাই লামা সশরীরেই ভারতে অবতীর্ণ হন। প্রথমে হিমালয়ের পাদদেশে আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করিয়া ডালাই লামা গাঙ্গপ্রদেশ পর্য্যন্ত অগ্রসর হন। মূঢ়ের কল্পনাকে স্তম্ভিত করিবার উপযোগী পুরোহিতের ভড়ং ডালাই লামা স্বশরীরে সমুদয়ই একত্র করিয়াছিলেন; বাহন পার্ব্বতীয় অতিকায় বৃষ, কণ্ঠে পার্ব্বতীয় অজগর, হস্তে পার্ব্বতীয় মহিষের শৃঙ্গ-নির্ম্মিত শিঙ্গা, পরিধান পার্ব্বতীয় ব্যাঘ্রের চর্ম্ম—এ সমুদয়ই অজ্ঞ বর্ব্বর যজমান-হৃদয়কে অভিভূত করিতে বিশেষ ক্ষমতাশালী; সহজেই তাহারা ঈদৃশ ডালাই লামার নিকট মস্তক অবনত করিবে। ডালাই লামার তদুপরি কপালজোর, অদৃষ্টবলে খুঁৎটুকুও গুণেই পরিণত হইয়াছে—ডালাই লামার মার্জ্জার-শাবকোপম অর্দ্ধস্ফুট

মোঙ্গলীয় চক্ষু ভারতীয় কবিশ্রেণীর ভক্তের দ্বারা ধ্যান-স্তিমিত-লোচন-রূপে অথবা মূঢ়শ্রেণীর সাধকের দ্বারা ভাং ধুতুরা ইত্যাদি মাদকে ঈষন্মত্ততা-জনিত সঙ্কুচিত চক্ষু বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। ভারতীয় শিল্পিগণও মৃন্ময় ডালাই লামার গাত্রে জীবন্ত ডালাই লামার হরিদ্রাভ গৌর রং যতদূর সম্ভব অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে। এই মূর্ত্তিই কাশীর বিশ্বেশ্বর মূর্ত্তি। কনৌজ, কাশী-অঞ্চল, মিথিলা, বিহার প্রভৃতি গাঙ্গপ্রদেশে আধিপত্য স্থাপন করিয়া ত্রিলোচন ক্রমে বঙ্গে প্রবেশ লাভ করেন। বঙ্গবিজেতা তিব্বতীয় রাজগণ দ্বারাই ত্রিলোচন এদেশে প্রতিষ্ঠিত হন। দিনাজপুরের বাণগড়ে প্রাপ্ত দিনাজপুরের রাজপ্রাসাদের সম্মুখস্থ রাজোদ্যানে রক্ষিত একটি প্রস্তরস্তম্ভের পাদদেশে উৎকীর্ণ লিপিদ্বারা এই তথ্যই সমর্থিত হয়। উক্ত লিপির পাঠ এইরূপ,—

> "তুর্ব্বারারি-বরূথিনী-প্রমথনে দানে চ বিদ্যাধরৈঃ
> সানন্দং দিবি যস্য মার্গণগুণগ্রামগ্রহো গীয়তে।
> কাম্বোজান্বয়জেন গৌড়পতিনা তেনেন্দুমৌলেরয়ং
> প্রাসাদো নিরমায়ি কুঞ্জরঘটা বর্ষেণ ভূভূষণঃ ॥"

ইহা দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে কাম্বোজবংশোদ্ভব গৌড়পতি ইন্দুমৌলি অর্থাৎ শিবের মন্দির নির্ম্মাণ করেন। পণ্ডিতগণের মতে, বিশেষতঃ ফরাসী পণ্ডিত ফুসের মতে, কাম্বোজ অর্থে তিব্বত দেশ। সুতরাং ইন্দুমৌলি—ত্রিলোচন অর্থাৎ নরাকৃতি শিবপূজার পদ্ধতি গৌড়ে তিব্বতীয়গণ দ্বারা প্রারব্ধ ও প্রতিষ্ঠিত হয় সন্দেহ নাই।

কনৌজ, কাশী, মিথিলা, বিহার প্রভৃতি অঞ্চলে শিবপূজার বেশ আধিক্য থাকিলেও এ নরাকৃতি পূজা সেই সমস্ত অঞ্চল হইতে প্রায় লুপ্ত হইয়াছে। বঙ্গবিহারের সন্ধিস্থল মালদহ জেলা পর্য্যন্ত এই নরাকার শিবের বেশ প্রসার ছিল এবং এখনো এই মালদহ জেলাতেই গৌড়াগত

বণিক্‌গণ (যাহারা আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি তথায় "বঙ্গদেশী" নামে পরিচিত) নরাকার শিব অর্থাৎ হুবহু কাশীর বিশ্বেশ্বর মূর্ত্তির অনুরূপ ৩।৪ হস্ত পরিমিত দীর্ঘ মূর্ত্তি গঠন করিয়া পূজা করিয়া থাকেন। যদিও অধুনা এই গৌড়বণিক্‌গণ চৈতন্যধর্ম্মাবলম্বী, তথাপি চৈত্রসংক্রান্তি হইতে প্রায় দুই মাসাবধি কাল গম্ভীরা নামক অনুষ্ঠানে "শিবো হে" গানে প্রমত্ত হইয়া প্রাগুক্ত নরাকার শিবমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া পূজা করেন। মালদহের সর্ব্ব শ্রেণী হিন্দুগণই "গম্ভীরা" অনুষ্ঠানে যোগ দেন, কিন্তু তথাকার বণিক্‌গণের এই ব্যাপারে যোগদানই এই প্রবন্ধের বিশেষ লক্ষ্যের বিষয়। নরাকার শিবের সহিত মালদহে বণিক্‌গণের সাক্ষাৎ অবশ্যই একটু চিন্তার বিষয়। মালদহের চতুঃপার্শ্বস্থ কোন অঞ্চলেই নরাকৃতি শিবপূজা বর্ত্তমান নাই। মালদহেই অনুষ্ঠান আবদ্ধ। মালদহের বিশেষ অধিবাসী গৌড়ীয় বণিক্‌গণই এই বিশেষত্বের মীমাংসা করে। বণিক্‌গণ যখন বঙ্গে প্রবেশ করেন, তখন তাঁহারা নরাকারে শিবপূজা করিতেন না, ক্রমে যখন উত্তরে উঠিতে লাগিলেন, নির্য্যাতনের প্রকোপে যখন তাঁহাদের হৃদয়ের বল কমিয়া আসিতে লাগিল—যখন গৌড়ে বর্ত্তমান মালদহ-অঞ্চলে প্রবেশ করেন, এই স্থানেই নরাকার শিবের সঙ্গে তাঁহাদের সাক্ষাৎ হয়। এই শিব উত্তরাঞ্চলে কোচরাজবংশী জাতির মধ্যে বেশ প্রতিপত্তি স্থাপন করিয়া গৌড়মালদহ প্রদেশে শিবোপাসক বণিকের আগমন শুনিয়া গৌড়ে প্রবেশ করেন। বণিক্‌গণের তখন মনস্বিতা অনেক কমিয়া আসিয়াছে, নরাকারে শিবকে পাইয়া তাহারা তাঁহাকেই পাদ্যার্ঘ প্রদান করিল।

যাহা হউক, এই শিব ঠাকুর বঙ্গোপকণ্ঠস্থ মালদহ পর্য্যন্ত আপনার পসার বাড়াইতে সক্ষম হইয়াছিলেন, কিন্তু বঙ্গে প্রবেশ করিতে গিয়া তাঁহার নিতান্ত দুর্দ্দশা হয়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি বঙ্গে চণ্ডীরই আধিপত্য। দেব-দেবীগণও ঈর্ষাপরতন্ত্র। চণ্ডী শিবকে বঙ্গে উপস্থিত দেখিয়া তাঁহাকে

আক্রমণ করেন, যুদ্ধে শিবের লজ্জাকর পরাজয়। তালাই নামা সটান চীৎপাৎ, চণ্ডী বুকের উপরে দণ্ডায়মানা, ইহাই বঙ্গের কালিকা-মূর্তি। অবশ্যই পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ভারতের এক বিশেষত্ব—আপোষ, শিবের সঙ্গে চণ্ডীর পরে আপোষ হয়, শিবকে স্বামিত্বপদে বরণ করেন। বঙ্গকবিগণ চণ্ডীকে হিমালয়-দুহিতার স্থানে আনিয়া তাঁহাকে "শিবানী" করিয়াছেন।

শিবের এই দুরবস্থাও ভগবানের নিতান্ত অবিচার বলা যায় না, কারণ "শিব" উচ্চ শ্রেণীর দেবতা। তিনি নিম্ন শ্রেণীর দেবতার ন্যায় হীন পন্থা অবলম্বন করিয়া পসার বৃদ্ধির চেষ্টা করেন। নিম্নশ্রেণীর দেবদেবীগণ নরাকার ধারণ করিয়া বেশ প্রতিপত্তি স্থাপন করিতেছেন দেখিয়া 'শিব'ও তাহাতে প্রলুব্ধ হন, তাই বঙ্গে নরদেহ ধারণ করিয়া উপস্থিত হন। কিন্তু শিবের বোঝা উচিত ছিল হীনতা বা নীচতা, হীন বা নীচের সহায় হইয়াই সফলতা দিতে পারে। উচ্চের পক্ষে হীনতা বা নীচতা অবলম্বন লজ্জাকর পতনের কারণ হয়। বঙ্গে এই দুর্দ্দশাই ঘটিয়াছিল।

বণিক্-সম্প্রদায় যদি এ দেশের আগন্তুক হন, তবে কোথা হইতে আসিলেন এ প্রশ্ন স্বাভাবিক। নিঃসন্দেহে তাহার উত্তর দেওয়া সহজ নহে। ভারতের যে কোন্ স্থান হইতে তাঁহারা বঙ্গে আসেন, ভারত-মানচিত্রের ঠিক সেই স্থানে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করা সহজ নহে, তবে এতদ্বিষয়ে চেষ্টা করিতে অবশ্যই বাধা হইতে পারে না। এ বিষয়ে বিচার করিতে হইলে বঙ্গে প্রবেশকালীন এই বণিক্গণের কয়েকটী লক্ষণ স্মরণ রাখা আবশ্যক। প্রথমতঃ তাঁহারা শিবোপাসক, দ্বিতীয়তঃ তাঁহারা জল-বণিক্। এই দুই কারণ হইতে ধরা যাইতে পারে, তাঁহারা ভারতীয় কোন জল-বাণিজ্যপ্রধান শিব-ধর্ম্ম-সঙ্কুল স্থান হইতে আসেন। তেমন স্থান কোথায়? এ সম্বন্ধে পরিব্রাজকের ইতিহাসের প্রতি দৃষ্টি করিতে পারি। সুবিখ্যাত চীনদেশীয় পরিব্রাজক [illegible] শৈবগণের কীর্ত্তি-কলাপের

অনেক পরিচয় তদীয় তীর্থ-ভ্রমণ-গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। "তিনি ৬৪৫ খৃঃঅব্দে এ দেশ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন এবং কাশী, কান্যকুব্জ, করাচী, মালাবার, কান্দাহার প্রভৃতি বহুল স্থানে শিবমন্দির দেখিতে পান"—বিশ্বকোষ ৫৫৭ পৃষ্ঠা।

ভারতের পূর্ব্ব-উপকূলে বাণিজ্য-প্রধান অথচ শিব-প্রধান স্থান অতি অল্পসংখ্যকই, পশ্চিম উপকূলে তত বেশী নহে। পূর্ব্বোক্ত ভ্রমণ-বৃত্তান্তে দেখা যায়, আর্য্যাবর্ত্ত ও দক্ষিণাপথের সন্ধিস্থল করাচী ও গুজরাট প্রদেশে এইরূপ স্থান ছিল। গুজরাট অঞ্চলই বঙ্গের বণিক্-সম্প্রদায়ের আদি-স্থান হইতে পারে কিনা? এতৎসম্বন্ধে পদ্মাপুরাণ, চণ্ডীকাব্যে বিশেষ কোন উল্লেখ নাই। তবে চণ্ডীর এক স্থানে গুজরাটের যেরূপভাবে উল্লেখ আছে, তাহা উপরোক্ত মতেরই পোষণ করে। বঙ্গীয় কবি বঙ্গের চতুঃপার্শ্বস্থ দেশের নাম নিজেই জানিতে পারেন, কিন্তু দূরদেশ, যথা সিংহলাদি দেশের বৃত্তান্ত অবশ্যই বণিক্-সম্প্রদায়ের নিকট শুনিয়াছিলেন। গুজরাটের সম্বন্ধেও এইরূপ বলা যাইতে পারে অর্থাৎ গুজরাটের সম্বন্ধে বঙ্গীয় কবি এই বণিক্গণের নিকট শুনিতে পান। এই অবস্থায় বণিক্-গণের সহিত গুজরাটের ঘনিষ্ট সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। তবে এখানে কেহ বলিতে পারেন, এরূপ অবস্থায় গুজরাটের সহিত বণিক্গণের যদি কোন সম্বন্ধ সূচিত হইয়া থাকে, তাহা সিংহলের ন্যায়, তদপেক্ষা অধিক কেন হইবে?

অর্থাৎ যদি কোন অনুমান সম্ভব হয়, তাহা এই মাত্র যে, সিংহলের ন্যায় গুজরাটে বণিক্গণ বাণিজ্য করিতেন মাত্র, গুজরাট হইতে আসিয়া-ছিলেন এতদূর বুঝা যায় না। কিন্তু চণ্ডীতে সিংহলসম্বন্ধে যেরূপ ভাবে উল্লেখ আছে, গুজরাট সম্বন্ধে উল্লেখ সেরূপ নহে। সিংহলের প্রশংসাই দেখা যায়। সেখানকার রাজাও চণ্ডীর পূজা গ্রহণ করেন, কিন্তু গুজরাটের

প্রতি নিতান্ত অশ্রদ্ধা ও অবজ্ঞা। চণ্ডীর কৃপাপ্রাপ্ত কালকেতু গুজরাটের বনজঙ্গল কাটিয়া—"মহাবীর কাটে বন"—তথায় রাজ্য স্থাপন করেন। গুজরাট পূর্ব্বে জঙ্গলময় ছিল, পরে ব্যাধের রাজ্যে পরিণত হয়। চণ্ডীর কবির শুধু বণিক্‌গণের প্রতিই অবজ্ঞা নহে, সেই অবজ্ঞা তাহাদের পূর্ব্ব-নিবাস গুজরাট পর্য্যন্ত অগ্রসর করিয়াছে, এই অনুমান নিতান্ত অসঙ্গত নহে। ইহা অত্যন্ত স্বাভাবিক ও এরূপ উদাহরণ ভারতের অন্যান্য গ্রন্থেও পাওয়া যায়। এখানে একটি কথা বলা আবশ্যক। প্রাচীনতর চণ্ডীকাব্য অর্থাৎ কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম প্রণীত চণ্ডীকাব্যের পূর্ব্ববর্ত্তী কোন চণ্ডীকাব্যে গুজরাটপ্রসঙ্গ নাই। কবিকঙ্কণ প্রণীত চণ্ডীতেই প্রথম। এই অবস্থাটিও পূর্ব্বোক্ত অনুমান অর্থাৎ বঙ্গীয় বণিক্ গুজরাট হইতে আগত এই তথ্যকে বলবৎ করে। কারণ লোক-চরিত্র আলোচনা করিলে দেখা যায়, শত্রুর সহিত সমরে জয়লাভ করিলে জয়োৎফুল্ল হইয়া বিজয়ী অনেক সময় জয়পতাকা কল্পনার চক্ষে অনেক দূরে বহন করিয়া লইয়া গিয়া শত্রুর বাস্তুভিটায় প্রোথিত করিবার স্বপ্ন দেখে। বঙ্গীয় বণিক্‌গণের সহিত বঙ্গীয় দেবদেবীগণের প্রথম সমরে শুধু শত্রুদমনেরই চেষ্টা, তাই পদ্মাপুরাণ বা প্রাচীনতর চণ্ডীগুলিতে গুজরাটবিজয়ের কোন উল্লেখ নাই, পরে ক্রমে বণিক্‌দলনে উল্লাসিত হইয়া কবির মানস-চক্ষুও ঈর্ষা-রোগাক্রান্ত হইয়াছে, তাই বণিকের বাস্তুভূমি গুজরাটও কবির প্রকোপের হাত হইতে রক্ষা পায় নাই। সে গুজরাট আবার জঙ্গলাকীর্ণ, কারণ সেখানকার অধিবাসী বণিক্‌গণ সকলেইত বঙ্গে চলিয়া আসিয়াছে, সেখানে আর লোক কোথায়?

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ইহার অনুরূপ দৃষ্টান্ত ভারতের অন্যান্য গ্রন্থেও পাওয়া যায়, উদাহরণস্থলে শিখগ্রন্থ উল্লেখ করিতে পারি। শিখধর্ম্ম কিছু-কালের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় যখন ভারতের মুসলমানধর্ম্মকে কিঞ্চিৎ প্রতিহত

করিতে সমর্থ হইয়াছিল, তৎপরে শিখ-গুরুগণ, আনন্দের উল্লাসে কল্পনা-চক্ষুর বলে মক্কামদিনা-জয়ের প্রসঙ্গও গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেন। নানকের নাসিস্তনামা গ্রন্থে নানকও মদিনাপতি কেরনের সহিত কথোপকথনস্থলে এইরূপ লিখিত আছে—"আমি নানক দশম অবতাররূপে গুরুগোবিন্দ নাম ধারণ করিয়া জন্মগ্রহণ করিব এবং মক্কা, মদিনা দলন করিব, মুসলমানধর্ম্ম তথা হইতে তাড়াইয়া দিয়া শিখধর্ম্ম তথায় স্থাপিত হইবে, ইত্যাদি।" অবশ্যই শিখগ্রন্থের দম্ভ চণ্ডীকাব্যে নাই, কারণ তাহা অবস্থা ও ক্ষমতার উপরে নির্ভর করে। কালকেতুর ক্ষমতায় যতদূর কুলায়, সেইরূপ ভাবেই গুজরাটের উপর আক্রোশ সাধন করা হইয়াছে। সুতরাং পূর্ব্বোক্তভাবে কবিকঙ্কণের চণ্ডীতে গুজরাটের উল্লেখ হইতেও আমরা অনুমান করিতে পারি। গুজরাটই বঙ্গীয় বণিক্‌গণের প্রধানতঃ সাধারণ আদিস্থান।

এতদ্বিষয়ে আর একটি প্রমাণ পাওয়া যায়, তাহা আমার নিকট অতি বলবান্ বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু তদ্বিষয়ে সম্পূর্ণ অভিমত প্রকাশ করিতে আমি এক্ষণে সমর্থ নহি, তবে উল্লেখ করিতে পারি। গুজরাট ও বঙ্গদেশ যদিও ভারতের দুই বিভিন্ন প্রান্তে অবস্থিত, তথাপি গুজরাটী ও বঙ্গভাষার মধ্যে এত সাদৃশ্য আছে যে, ভারতের কোন দুই দূরবর্ত্তী ভিন্ন প্রদেশের ভাষায় এত ঐক্য দেখিতে পাওয়া যায় না। গুজরাট-ভ্রমণকারী বাঙ্গালী এ বিষয়ে বেশ সাক্ষ্য দিতে পারেন।

শুধু ভাষা নহে, আচার-ব্যবহার, পরিচ্ছদ ও [illegible] অনেক ঐক্য আছে। আধুনিক বলিয়া বণিক্ সম্প্রদায়ের আকার পরিচ্ছদে কোন বিশেষত্ব নাই, তাহা অন্যান্য বাঙ্গালীর ন্যায়ই হইয়া গিয়াছে। কিন্তু তাহাদের পরিচ্ছদাদি সম্বন্ধে ধারণা করিবার পূর্ব্বে তাহাদের পূর্ব্বাকৃতির চিত্র যে কোন্ স্থানে পাওয়া যায়, তাহা দেখা কর্ত্তব্য। আমি একস্থলে

লক্ষ্য করিয়াছি, এই বণিক্‌গণ, যখন বঙ্গে প্রথম চৈতন্যমত প্রচার হয়, তখন অনেকে সেই মতে দীক্ষিত হন। যে সব বাঙ্গালী তৎকালে চৈতন্য-মতকে সাদরে আলিঙ্গন করিয়াছিল, তন্মধ্যে বণিক্‌জাতি বিশিষ্টসম্প্রদায়। বর্ত্তমানের অধিকাংশ বঙ্গীয় বণিক্‌গণই চৈতন্যমতাবলম্বী। এই বণিক-সম্প্রদায় সেই সময়ে নগর-সঙ্কীর্ত্তনে যোগদানকরতঃ মৃদঙ্গ, করতাল বাজাইয়া চৈতন্যমত প্রচার করিতেন। চৈতন্য-সম্প্রদায়ের এক সংকীর্ত্তনের ছবি যাহা শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য ২য় সংস্করণ" ৩১৮ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত করিয়াছেন এবং যাহা বাঃ ১০৭৮ সালের লিখিত "চৈতন্যভাগবত" পুথির মলাটে প্রদত্ত চিত্রের প্রতিলিপি বলিয়া বর্ণিত আছে, তদ্দৃষ্টে দেখা যাইবে * * * * এই সময়ের বণিক্ বর্ত্তমান মারওয়াড়ীগণের ন্যায় উষ্ণীষধারী, গায়ে আঁটা আঙ্গরাখা পরিহিত। উহাই গুজরাটী ভদ্রসমাজের পরিচ্ছদ। সুতরাং পরিচ্ছদও বণিকগণকে গুজরাটাগত বলিয়া সাব্যস্ত করে।

*গুজরাটী ভাষা ও বঙ্গভাষার ঐক্যসম্বন্ধে এখন বেশী কথা বলিতে পারি না। তবে বঙ্গীয় বণিক্‌সমাজের ব্যবহৃত কতকগুলি শব্দের সহিত যে বিশেষ ঐক্য আছে তাহা দেখাইতে পারি। গুজরাটী শেঠ শব্দের অর্থ 'মহাশয়' বঙ্গের শেঠও মহাশয়সূচক। গুজরাটী 'সাহ' শব্দ হিন্দু ব্যবসায়িগণের উপাধি, বঙ্গেও তাহাই। বঙ্গের বণিকের সোনা গুজরাটী সোনুং, বঙ্গের তামা গুজরাটী তাম্বুং, বঙ্গের মণিমুক্তা গুজরাটী মণিমুক্তা, বঙ্গের বণিকের কড়ার করা, গুজরাটী কড়ার বুং ইত্যাদি। গুজরাটী ও বঙ্গভাষার ঐক্য অনুসন্ধানে একখানি গুজরাটী ভাষার অভিধান খুলিয়া দেখিয়াছি এক 'ক'—আরব্ধ শব্দগুলি মধ্যে সংস্কৃতমূলক বা সংস্কৃত সাধারণ বহু সদৃশশব্দ বাদেও বহু প্রাদেশিক শব্দ একরূপ, যথা—গুজরাটী 'কচ' বাঙ্গলায় 'কচায়ন', গুজরাটী 'কয়াশ' বাঙ্গলায় 'কাঁচা', গুজরাটী 'কজিও'

বাঙ্গলায় 'কাজিয়া', গুজরাটী 'কাপড়' বা 'কাপুড়', বাঙ্গলায় 'কাপড়'। গুজরাটী 'কঠারী' বাঙ্গলায় 'কাটারি' (অস্ত্র), গুজরাটী 'কহিবুং' বাঙ্গলায় কহিব। গুজরাটী 'কাক', 'কুতরো', 'কম্বল', 'কড়রু' বাঙ্গলা যথাক্রমে 'কাকা', 'কুত্তা', 'কম্বল', 'কড়া', গুজরাটী 'কামান' বাঙ্গলা 'কামানী', (বক্র arch) ইত্যাদি। যাহা হউক, ইহা অবশ্যই পর্য্যালোচনার বিষয়। যদি ইহা সত্য হয়, তবে বঙ্গভাষা ও বঙ্গজাতি বঙ্গীয় বণিক্‌সম্প্রদায়ের কাছে বিশেষ ঋণী।

বঙ্গীয় বণিক্‌গণ গুজরাট হইতে আগত সাব্যস্ত হইলে অর্থাৎ তাঁহারা কোন্ দেশীয় লোক নির্দ্ধারিত হইয়া গেলেও তাহারা কোন্ জাতীয় লোক এ প্রশ্নের উত্তর বাকী থাকে এবং এই প্রশ্নের উত্তর না দেওয়া পর্য্যন্ত বঙ্গীয় বণিকের ইতিহাস অসম্পূর্ণ। পূর্ব্বে প্রতিপন্ন হইয়াছে, বঙ্গীয় বণিক-গণ পূর্ব্বে শৈবধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। ভারতীয় শৈবধর্ম্মসম্বন্ধে পূর্ব্বে যে একটু দৃশ্যতঃ বাহুল্যরূপে আলোচনা হইয়াছে তাহার প্রত্যেক কথাগুলি এখন বিশেষ কাজে লাগিবে। সেই কথাগুলি দ্বারা প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছি, পুরাতন ভারতে শৈবধর্ম্ম ও শকসভ্যতা একার্থব্যঞ্জক। সুতরাং পুরাতন বঙ্গীয় বণিক্‌গণ শকসভ্যতার অন্তর্ভুক্ত ছিলেন ইহা আমরা নিরাপত্তিতে গ্রহণ করিতে পারি। কিন্তু ভারতের বহু জাতি শকসভ্যতা গ্রহণ করিয়াছিল, শুধু শকজাতি আপনাদের মধ্যেই ঐ সভ্যতা আবদ্ধ রাখেন নাই। তবে শকসভ্যতান্তর্ভুক্ত বঙ্গীয় বণিক্‌জাতি কোন্ জাতীয় লোক ছিলেন? তাঁহারা খোদ শকজাতীয় লোক কি শকেতর জাতীয় লোক ইহা এখন প্রশ্ন। রাজশ্রী ও লক্ষ্মীশ্রী দুই সহোদরা। রাজশ্রীর অধিকারিগণ শকজাতীয় ছিলেন, সুতরাং লক্ষ্মীশ্রীর অধিকারী বণিক্‌গণও শকজাতীয় ছিলেন; এরূপ সিদ্ধান্ত নিতান্ত অযৌক্তিক বা অসঙ্গত নহে। আর্য্য ও শকগণের সংঘর্ষে আর্য্যগণ প্রকৃত

হইলে অনেক বিজিত আর্য্য ব্যবসায়-বাণিজ্য বা কৃষিকার্য্য অবলম্বনপূর্ব্বক জীবিকানির্ব্বাহ করিতে আরম্ভ করে, সুতরাং এরূপ প্রশ্নও উঠিতে পারে যে বঙ্গীয় বণিক্‌গণ আর্য্যজাতির লোক কিনা? কিন্তু যে আর্য্যগণ জীবিকানির্ব্বাহের জন্য ব্যবসায়-বাণিজ্য অবলম্বন করিতে বাধ্য হইয়াছিল, তাহাদের উদ্যম-উৎসাহ, তৎপরতা এত অধিক ছিল যে, তাহারা ভারতের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে আসিয়া ব্যবসায়-বাণিজ্যে লিপ্ত হইবে, সেরূপ ক্ষমতাই বোধ হয় তাহাদের তৎকালে ছিল না। এই শ্রেণীর আর্য্যগণ পঞ্জাব, দিল্লী, এলাহাবাদ অঞ্চলেই আবদ্ধ আছে এবং সাধারণতঃ তাহারা আপনাদিগকে "ক্ষত্রি" বলিয়া পরিচয় দেয় এবং রাজপুত হইতে আপনাদিগকে বিভিন্ন রাখিয়াছে।

দ্বিতীয় কথা, বণিক্‌-সম্প্রদায়ের বর্ত্তমান সামাজিকহীনতার কারণ কি?

ভারতের হিন্দুগণের জাতিভেদতথ্য-সম্বন্ধে ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের একমত আছে, এদেশীয় পণ্ডিতগণের মধ্যেও ক্রমে তাহাই বলবৎ হইতেছে। এই মত অনুসারে জাতিভেদের মূল কারণ ভারতীয় হিন্দু-সমাজের কার্য্য-বিভাগ। দীর্ঘকাল এক কার্য্য-বিভাগ বা Trade guildএ আবদ্ধ থাকিয়া ক্রমে এক বিভাগ অন্য বিভাগ হইতে পৃথক্ হইয়া ভিন্ন ভিন্ন জাতিরূপে পরিণত হইয়াছে। অর্থাৎ ইহাদের মতে ভারতীয় হিন্দুগণ কোন এক রমণীয় প্রভাতে গাত্রোত্থান করিয়া আপন আপন হাঁড়ি ভাগ করিয়া লইল। একে অন্যের হাঁড়ি স্পর্শ করিবে না, কেহ বড় কেহ ছোট, কেহ প্রভু কেহ ভৃত্য, কেহ প্রণম্য কেহ অস্পৃশ্য। কিন্তু ইহা মনুষ্য-চরিত্রের অনুযায়ী নহে। কেহ হঠাৎ বিনা বাক্যব্যয়ে অথবা অন্যের নিকট হেয়তা স্বীকার করে না। কেহ বিনা ক্ষমতায় অপরের উপর হঠাৎ প্রভুত্ব-স্থাপন করিতেও সমর্থ হয় না। বহুদিন কার্য্য বা ব্যবসায় হিসাবে বিভাগ থাকিলেই তাহা হইতে জাতিভেদের ন্যায় এক

কঠোর প্রভেদ হঠাৎ উত্থিত হইতে পারে না। পৃথিবীতে সর্ব্বজাতিরই কার্য্য-হিসাবে বিভাগ আছে, কিন্তু সর্ব্বত্রই ভারতের ন্যায় জাতিভেদ হয় নাই। মানুষের সামাজিক ব্যাপারই হউক বা অন্য কোন প্রকার পরিবর্ত্তন-বিভাগই হউক, তাহা কোন বিশেষ ক্ষমতার বিনা প্রভাবে ও বিশেষ আবশ্যকের বিনা হেতুতে হয় নাই বা হইতে পারে না। এখন সেই বিশেষ ক্ষমতা কি? তাহা সর্ব্বত্রই রাজক্ষমতা এবং সেই বিশেষ আবশ্যকতা—রাষ্ট্রীয় আবশ্যকতা। ভারতে বা বঙ্গে এই দুই বৃহৎ কারণ ব্যতীত জাতিভেদ কিংবা জাতিবিশেষের উচ্চতা বা হীনতা সংঘটিত হয় নাই। মূলকারণ সর্ব্বত্রই রাষ্ট্রীয় আবশ্যকতা এবং রাজকায় ক্ষমতা। ভিন্ন ভিন্ন ব্যবসায় অবলম্বনই ভারতীয় জাতিভেদের মূলকারণ নির্দ্দেশ করা নিতান্ত অদূরদর্শিতা। জল-প্লাবনের পর জোয়ারে নৌকা হইতে অবতরণ করিয়া হঠাৎ ভিন্ন ভিন্ন প্রাণী বিভিন্ন আহার নির্ব্বাচন করিয়াছিল বলিয়াই অর্থাৎ সিংহ-ব্যাঘ্র মাংসাহার, গো, মহিষ, বানর ও ছাগাদি উদ্ভিজ্জাহার গ্রহণ করিয়াছিল বলিয়াই তাহারা সিংহ, ব্যাঘ্র, গো, মহিষ ইত্যাদি শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছে বলাতে যে কথা, ভারতীয় জাতি বিভিন্ন ব্যবসায় অবলম্বন করিয়াছিল বলিয়াই তাহারা বিভিন্ন জাতিতে পরিণত হইয়াছে বলাতে একই কথা। উভয়ই প্রত্যক্ষের কারণ অনুসন্ধান-ব্যাপারে প্রত্যক্ষকেই নির্দ্দেশ করে মাত্র। প্রাণীতত্ত্বের অনুসন্ধান-ব্যাপারে পণ্ডিতগণ যেমন আত্মস্থাপন, দুর্ব্বলের উপর বলীয়ানের স্বাধিকার, আত্মরক্ষা, পারিপার্শ্বিক শক্তি ও প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন, প্রভৃতি মূলকারণ নির্দ্দেশ করেন, ভারতীয় জাতিভেদেরও মূলকারণ ঐ সমস্তই সন্দেহ নাই। আত্মস্থাপন ও আত্মরক্ষার চেষ্টাই ভারতীয় জাতি-ভেদকে নিয়মিত করিয়া আসিতেছে। মানব-সমাজে আত্মস্থাপনই বলবৎ হইয়া রাজশক্তি নাম ধারণ করিয়াছে এবং সেই রাজশক্তিই ভারতে বা বঙ্গে জাতিভেদের

বিধাতা। বলীয়ানের স্বাধিকারক্ষুব্ধ আত্মরক্ষার চেষ্টাই মানব-সমাজে ভীরুতা, কাপুরুষতা, স্থলবিশেষে চতুরতা নামে অভিহিত হইয়াছে। এবং সেই চেষ্টাতেই কালে একদিকে কোমল, সুখান্বেষী, প্রিয়দর্শন, চিত্র-বিচিত্র পরিচ্ছদধারী, প্রাণীজগতের শশক, মৃগ, মেষ প্রভৃতির কিংবা অন্যদিকে ধূর্ত্ত, প্রবঞ্চক, কপট, প্রাণীজগতের শৃগাল, বানর, কাক প্রভৃতির ন্যায় জাতির অভ্যুদয় হইয়াছে ও হইতেছে। আবার পারিপার্শ্বিক শক্তিদ্বারা অভিভূত হইয়া, অবস্থার নিষ্পেষণে নিষ্পেষিত হইয়া প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের ফলে, আপনার উদর-চিন্তার ভার অপরের উপর ন্যস্ত করিয়া প্রাণীজগতের বলাবর্দ্দ, গর্দ্দভ ও অশ্বাদির ন্যায় জাতিরও সৃষ্টি হইয়াছে ও হইতেছে, এইরূপ কাণ্ড যে শুধু ভারতেই সংঘটিত হইয়াছে, ইউরোপে হয় নাই, তাহা নহে। তবে পার্থক্য এই যে, ইউরোপে যখন দুই প্রতিদ্বন্দ্বী জাতির মধ্যে সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছে, তখন জেতা সাধ্যমত তরবারি বা গোলাগুলির সাহায্যে বিজেতাকে সমূলে উচ্ছেদ সাধন করিয়াছে, বিজেতার অবশিষ্টগুলি গা ঢাকা দিয়া জেতার দলভুক্ত হইয়া রক্ষা পাইয়াছে। কিন্তু ভারতে জেতা বিজেতাকে প্রহত করিবার পরে তাহাদিগের সমূলে বিনাশ-সাধনের জন্য তৎপর হয় নাই। আইন-আমলে তাহাদিগকে কিছু খর্ব্ব করিয়া নিজ আয়ত্তাধীন বৃহৎ গণ্ডীর অন্তর্গত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গণ্ডীতে তাহাদের স্থান নির্দ্দেশকরতঃ সাধ্যমত খাটো করিয়া রাখিবার চেষ্টা করিয়াছিল। বিজেতাগণ অবস্থানুসারে উপস্থিত বিপদে কতক অধিকার পরিত্যাগ করিয়া জেতা-প্রদত্ত অনুগ্রহ গ্রহণ করিয়া সন্তুষ্ট ছিল। তাই ভারতে মানবের পুরাতন জাতিগুলির বংশধর এখনও অনেক বিদ্যমান আছে, কিন্তু ইউরোপে পুরাতন অপটু অসমর্থ জাতিগুলি প্রায়ই লোপ পাইয়াছে। পটুতা এবং সামর্থ্য ভিন্ন ইউরোপে কেহই টিকিতে পারে নাই। সেইজন্য ইউরোপ পটুতার খনি, ভারত

আ্যপোবের লীলাক্ষেত্র। এই বিভিন্নতার হেতু প্রাণীবিৎ পণ্ডিতেরা স্থির করিবেন, ঐতিহাসিকের কার্য্য নহে। বোধ হয়, আহারের পার্থক্য একটী বিশিষ্ট কারণ।

যতদিন হিন্দুসমাজে প্রবাহিনীর খরস্রোত চল্‌তি ছিল, হিন্দু-সমাজও ততদিন উঠ্‌তি-পড়্‌তির ক্ষেত্র ছিল। পদ্মার দুকূলের ন্যায় হিন্দু-সমাজ-ক্ষেত্র ভাঙ্গিত এবং গড়িত। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র কথাগুলি চারি-জাতির দৃঢ় সীমাবদ্ধ বিভাগ নহে, চারিটী নাম। আজ যে অজ্ঞাত পার্ব্বত্য-বর্ব্বর ছিল, কল্য সে শক্তি-সঞ্চয় করিয়া, রাজ্যস্থাপন করতঃ ক্ষত্রিয়। আজ যে রাজা, কাল সে রাজশ্রী-বিহীন হইয়া বাণিজ্য-অবলম্বনে বৈশ্য, কিংবা আজ যে বন-প্রান্তরবাসী পশুপালক ও কৃষক, কল্য সে অর্থ সঞ্চয় করিয়া বৈশ্য; আজ যে দেশ-নায়ক-দেশ-পালক-রাজসচিব, কল্য সে বিজেতার প্রকোপে পড়িয়া পুনঃপুনঃ বিধ্বস্ত হইয়া ক্রমশঃ স্থানচ্যুত হইয়া নিম্নগামী হইতে হইতে দোসাধ, শূদ্র। আজ যে আচার্য্য-পুরোহিত, কল্য সে বিরুদ্ধধর্ম্মাবলম্বী, নবোদ্ভূত রাজা ও প্রতিদ্বন্দ্বী পুরোহিতের প্রকোপে অস্পৃশ্য শূদ্রাদপি নিকৃষ্ট ডোম, মুচি; আজ যে পৌরোহিত্য-কার্য্যের সাহায্যকারী মাত্র কিংবা আজ যে চৈনিক বা তিব্বতীয় ব্রাহ্মণের বাড়ীতে এ্যাপ্রেন্টিসি বা শিক্ষানবিশী করে, কল্য সে কিঞ্চিৎ শিক্ষার বলে সামান্য পারিপাট্য এবং নিষ্ঠা অবলম্বন করিয়া ব্রাহ্মণ, এবং তাহারই সন্তানগণ পরবর্ত্তী বংশে পরম ভট্টারক। যুগে যুগে রাজশ্রী পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে এইরূপ তোলপাড় পরিবর্ত্তন হইত। ইহা হিন্দু-সমাজের জীবন্ত মূর্ত্তি। কিন্তু সে স্রোতস্বিনী এখন প্রবাহহীনা; মরাগাঙ্গের বোদা জলের মতন হিন্দু-সমাজ এখন নিশ্চল। বর্ত্তমান হিন্দু-সমাজে যে শ্রেণীবিভাগ দেখিতেছি, তাহা অন্য কিছু নয়। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের বা বঙ্গের শেষ হিন্দু রাজা হিন্দুসমাজকে যেরূপ ভাবে নির্ম্মাণ করিয়া যে স্থানে যে অবস্থায়

রাখিয়া গিয়াছেন হিন্দু সমাজ ঠিক সেই খানেই দাঁড়াইয়া কাহার অপেক্ষা করিতেছে জানি না। আর আমরা হিন্দু মনে করিতেছি, হিন্দুসমাজের বর্ত্তমান শ্রেণীবিভাগ সনাতন অনাদি কাল হইতেই বিদ্যমান আছে—ইহা অবশ্যই বুদ্ধির ভ্রম। বুদ্ধি একটু পরিষ্কার হইলেই এই ভ্রম যাইবে সন্দেহ নাই, সেটী বড় চিন্তার কথা নয়। কিন্তু পুনরায় মরা-গাঙ্গে বেগ প্রদান করিবে যে, সে কোথায়?

উভয়ই বর্ব্বরের কর্ণে একই রূপ শুনাইত। সমুদ্রগমন জাতিহানির কারণস্বরূপে নির্দ্দিষ্ট হইল। ভারতের জলবাণিজ্য ক্রমে ধ্বংস প্রাপ্ত হইল, বণিক্‌গণ প্রহৃত হইলেন। ভারতময় বণিক্‌সমাজের এই দুর্দ্দশা হইল। কিন্তু বঙ্গের বণিকের দুর্দ্দশার তুলনা ভারতের অন্যত্র খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। ভারতের কোথায়ও বণিক্ অনাচরণীয় নহে, কিন্তু বঙ্গে বণিক্‌জাতি অনাচরণীয় জাতি। তাহার বিশেষ কারণও আছে। অন্যান্য প্রদেশে কেবল ব্রাহ্মণমণ্ডলী বণিক্‌কে খর্ব্ব করিতে চেষ্টা করিত। কিন্তু বঙ্গে, পূর্ব্বেই দেখাইয়াছে বণিক্‌গণ দেশের দেব-দেবী আপামর সাধারণের আক্রোশভাজন হইয়াছিল। এই দুই কারণ একত্র হইলে, State এবং Church এই উভয়ের নিষ্পেষণে চূর্ণীকৃত ধূলির ন্যায় বঙ্গের বণিক্‌গণ সমাজে এখন হীনতাপ্রাপ্ত হইবেন, তাহাতে আশ্চর্য্য কি? বঙ্গ ভিন্ন ভারতের অন্য কোথায়ও এমন মণিকাঞ্চনের সংযোগ হয় নাই। তাই বঙ্গের বণিক্‌জাতি একেবারে অনাচরণীয় শুঁড়ি জাতিতে পরিণত হইয়াছেন। কোথায় মা মনসা, কোথায় মা চণ্ডী, কোথায় শনিঠাকুর তোমরা কি শেষে অন্ধ হইয়াছিলে? ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর কয়েকবার জাহাজ ডুবি করিয়া ইংরেজ বণিক্‌গণকে একেবারে শুঁড়ি জাতিতে পরিণত করিতে পারিলে সকল গোল চুকিয়া যাইত। ইহা নিতান্ত কৌতুকের কথা নহে, প্রকৃত পক্ষেই ইংরেজ এদেশে উচ্চতর ধর্ম্ম ও উচ্চতর সভ্যতা-

সহ প্রবেশ না করিলে তাঁহাদের অদৃষ্টে কোন অদৃশ্য পথ অনুসরণ করিতে হইত বলা যায় না। আণ্টুনি "ফিরিঙ্গী" "মাতঙ্গীর" ভজনা আরম্ভ করিয়াছিল। জনের (John) বৃষরাশি, ভাগ্যের জোর আছে তাই রক্ষা পাইয়াছে।

যদিও পুরাতন ভারতীয় বণিক্‌গণের জল-বাণিজ্যের কথা দেশী বিদেশী ইতিহাসে প্রসিদ্ধ, তথাপি বর্ত্তমান কালে তাহার চিহ্নমাত্র নাই। ভারতের জলবাণিজ্য একেবারে লুপ্ত হইয়াছে। এই দুর্ভাগ্যের জন্য আজ কাল বিদেশীয় বণিক্‌গণকেই সর্ব্বতোভাবে আমরা দায়ী করি। কিন্তু নিজের কপালে নিজে অগ্নি সংযোগ না করিলে, পরে মানবাদৃষ্টের ন্যায় প্রশস্ত উচ্চ ভূমির সকল খানির দগ্ধ সাধন করিতে পারে না। বণিক্‌সম্প্রদায়ের সহিত রাজসম্প্রদায়ের বিরোধ স্বাভাবিক; এক ক্ষমতা অন্য ক্ষমতাকে সহজে প্রতিষ্ঠাবান্ হইতে দেয় নাই। বর্ব্বর অপরিণামদর্শী রাজশাসনে কালে এই বিরোধ অবশ্যম্ভাবী। সভ্য, দূরদর্শী রাজশাসন সময়ে বণিক্ সম্প্রদায়ের সহিত রাজসম্প্রদায়ের অসদ্ভাব দূর হইয়া ক্রমশঃ সদ্ভাব স্থান হইয়া আসে এবং তাহা অতি মঙ্গলপ্রদ হয়। অসভ্য বর্ব্বর রাজশাসনকালে এই অসদ্ভাব যেমন দৃঢ় থাকে তাহা তেমনি অমঙ্গলপ্রদ হয়। এই বিরোধের মীমাংসা না হইলে ক্রমে দেশের সর্ব্বনাশ হয়।

শুধু বঙ্গে নহে, ভারতের সর্ব্বত্রই বৌদ্ধযুগের পরে এক শ্রেণীর বর্ব্বর হিন্দুরাজগণের অভ্যুদয় হইয়াছিল; তৎপূর্ব্বে বণিক্‌শক্তির প্রভাবও অত্যন্ত বৃদ্ধি হইয়াছিল এই শ্রেণীর হিন্দুরাজগণের সময় হইতে সর্ব্বত্রই বণিক্‌শক্তির সহিত বিরোধ উপস্থিত হয়। রাজগণের স্বাভাবিক আশঙ্কা হইত বণিকের অর্থবল কালে রাজক্ষমতাকে হ্রাস বা গ্রাস করিতে পারে। সহজে সৈন্যবল সংগ্রহ করা যায় এমন দিনে, Cheap militarismএর কালে, বণিকের এই আচরণ নিতান্ত অসম্ভব কাণ্ডও নহে। রাজগণ সর্ব্বদাই

মনে করিতেন, কখন বা "বণিকের মানদণ্ড দেখা দিবে রাজদণ্ডরূপে।" বিশেষতঃ বাণিজ্যকুশল বঙ্গে এই বিরোধ বা সংঘর্ষ অবশ্যম্ভাবী। মুসলমান যুগেও ইহার দৃষ্টান্ত আমরা দেখিয়াছি। যে রাজক্ষমতা হিন্দু বণিক্-দিগকে খর্ব্ব করিতে সমর্থ হইয়াছিল, মুসলমানযুগে সেই রাজশক্তি বণিক-শক্তির নিকট পরাভূত হইয়াছে, ইহা বিধাতার বিচার এবং আমি বিশ্বাস করি, আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণকর্ত্তৃক বণিকের প্রতি আচরণের যথেষ্ট উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত না করা পর্য্যন্ত আমাদের বিধাতা আমাদের প্রতি সম্পূর্ণ প্রসন্ন হইবেন না।

শুধু ভারতে নহে পৃথিবীর সর্ব্বত্রই ইউরোপাদি অঞ্চলেও রাজশক্তি ও বণিক্শক্তির এই সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছিল। যখন ইউরোপের অন্যান্ত দেশে এইরূপ সংঘর্ষ চলিতেছিল অর্থাৎ খৃঃ ষোড়শ শতাব্দীতে ইংলণ্ডের রাজশক্তি অবস্থার পরিবর্ত্তনে বণিক্শক্তির আনুকূল্য করিতে বাধ্য হয় এবং তাহার পুণ্যফলে ইউরোপের সমুদয় দেশকে ডিঙ্গাইয়া ইংলণ্ড অতি অল্পকাল মধ্যেই ধনে, মানে, জ্ঞানে, গৌরবে সর্ব্বোচ্চ আসন অধিকার করিয়াছিল এবং এই ইংলণ্ডই প্রথম মানবজাতিকে শিক্ষা দিয়াছে রাজশক্তি বণিক্শক্তির আনুকূল্য করিলে দেশের ধনসম্পদ, সুখসমৃদ্ধি কত দূর বৃদ্ধি হয়। তৎপূর্ব্বে সকল দেশেরই রাজশক্তি শুধু অভিজাত-শক্তির আনুকূল্য করিয়াই নিরাপদ সমশক্তি এবং বণিক্শক্তির সহিত প্রতিকূলতা করিত। কিন্তু এই ভ্রম ইদানীং পৃথিবীর সকল দেশ হইতে দূর হইয়াছে, যে দেশের হয় নাই তাহারা মাটিতে গড়াগড়ি যাইতেছে। সুতরাং বণিক্গণকে খর্ব্ব করিয়া রাখা রাজকীয় আবশ্যক ছিল। ব্রাহ্মণগণও রাজগণের ইঙ্গিতে লেখনী চালনা করিতে সর্ব্বদাই নিযুক্ত ছিলেন। ব্রাহ্মণের লেখনী এই যুগের মুদ্রাযন্ত্র, সুতরাং ব্রাহ্মণের কৃতিত্ব বা দায়িত্বের মাত্রা অধিক নহে। কিন্তু এই বর্ব্বর যুগেই সংস্কৃত অক্ষরের স্পর্শমণির

ক্ষমতা জন্মে; সংস্কৃতে যাহাই লিখিত হইত, দেশময় অশিক্ষিত অসভ্যগণের নিকট তাহার সহিত বেদমন্ত্রের কোন পার্থক্য থাকিত না।

আমার শেষ কথা, বন্ধুগণ, যখনই কোন জাতির সৌভাগ্যের দ্বার উদ্‌ঘাটিত হয়, ঠিক সেই সময়েই জ্ঞান, ধর্ম্ম, ধন, বিজ্ঞান, গৌরব, মোক্ষ তাহাদের নিকট যুগপৎ উপস্থিত হয় না। সর্ব্বপ্রথমে তাহারা তাহাদের জাতীয় ইতিহাসের প্রকৃত সত্য বুঝিবার চেষ্টা করে; মোহ, ভ্রান্তি, ভুল, মিথ্যার আচরণ ছিন্ন করিয়া ফেলে; জাতীয় শক্তির উৎস কোথায় লুক্কায়িত আছে, অনুসন্ধান করিয়া বাহির করে এবং সেই উৎসের উপরি-চাপা প্রস্তরের ভার টানিয়া দূরে নিক্ষেপ করি; নিজেদের মধ্যে নূতন সঞ্জীবনী শক্তি আনয়ন করে। কিন্তু তাহার সাহায্যে এই অপরূপ কাণ্ড সংঘটিত হয়। রাজশক্তি, আইনকানুনের শক্তি, গোলাগুলি, অসি তরবারির শক্তি এক্ষেত্রে নিতান্তই অনাবশ্যক। ভারতমাতার এক একটী অক্ষরের এক্ষেত্রে যে শক্তি আছে, পৃথিবীর সমুদয় রাজশক্তি একত্র হইলেও তাহার সমকক্ষ নয়। সাহিত্যচর্চ্চাই মৃত জাতির মধ্যে সঞ্জীবনীশক্তি আনয়নের প্রথম ও প্রকৃষ্ট পন্থা। সত্যানুসন্ধান ও সত্যস্থাপনই সাহিত্যচর্চ্চার প্রথম লক্ষ্য। এজন্য আমাদের বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতি সকলেরই নমস্য সন্দেহ নাই। এইরূপ অনুসন্ধানের ফলে ভ্রান্তিময় ঐতিহাসিক প্রহেলিকা দূর হইবে, দেশের সত্য মিথ্যার বিশাল কপটরচনাকে চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া মস্তকোত্তোলন করিবে। এই উপায়েই পৃথিবীর বহু জাতি উত্থিত হইয়াছে। উদাহরণস্থলে ইংরেজী সাহিত্যের ইতিহাস-লেখক ফরাসী Taineএর প্রথম বাক্য উদ্ধার করিতেছি—

History has been revolutionised, within a hundred years in Germany, within sixty years in France, and that by the study of their literatures.

It was perceived that a work of literature is not

a mere play of a imagination, a solitary caprice of a heated brain, but a transcript of contemporary manners, a type of a certain kind of mind. It was concluded that one might retrace, from the monuments of literature the style of man's feelings and thoughts for centuries back. The attempt was made and it succeded.

আমার সর্ব্বশেষ নিবেদন, বন্ধুগণ বঙ্গীয় সাহিত্য-আলোচনা করিতে গেলে বঙ্গীয়সমাজ, রাঢ়ীয় ভিন্ন ভিন্ন জাতির তথ্য ও ইতিহাসের আলোচনা অপরিহার্য্য। একের সহিত অপরটী এরূপভাবে সম্বদ্ধ যে, একটীকে ছাড়িয়া অপরটীর আলোচনা অসম্ভব। কিন্তু তাহাতে একটু বিপদ আছে, কেন না বঙ্গীয় সমাজ এবং বঙ্গীয় বিভিন্ন জাতি এখনও ইহাদের দেহে প্রাণ আছে, বর্ত্তমানে সেগুলি এখনও অতীতের কুক্ষিগত হয় নাই।

আপনি কিম্বা আপনারা কোন না কোন জাতির অন্তর্ভুক্ত। আপনার আমার জাত্যাভিমান থাকিতে পারে এবং তাহা অস্বাভাবিক নহে। জাত্যাভিমানের কোমল তন্ত্রী কোন বেদনা সহ্য করিতে পারে না তাহাও জানি। কিন্তু হে সাহিত্যিক, তোমাদের একটু উচ্চে উঠিতে হইবে, নতুবা তোমার সকল চেষ্টা বৃথা। তোমাকে নিরপেক্ষ বিচারকের উচ্চাসন গ্রহণ করিতে হইবে। ইহা কিছু দুরূহ, কিন্তু তাহা ক্রমে ক্রমে অভ্যাস করিতেই হইবে। 'ভূতার্থ কথনে'—ঐতিহাসিক তথ্য-উদ্ঘাটন ব্যাপারে, তোমাকে 'রাগদ্বেষ'-বিবর্জ্জিত হইতেই হইবে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, অনেকে এখনো সেরূপ নহেন। বর্ত্তমান বঙ্গীয় ঐতিহাসিক জগতের এই অবস্থা দেখিয়া বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতির কর্ণধার শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় দুঃখভারাক্রান্ত হৃদয়ে লিখিয়াছেন—

"ইতিহাসের উপাদান সঙ্কলিত না হইলে, ইতিহাস সঙ্কলিত হইতে

পারে না,—তাহা বহু ব্যয়সাধ্য, বহু শ্রমসাধ্য, বহু লোকসাধ্য ;—এ সকল কথা বঙ্গসাহিত্যে পুনঃপুনঃ উল্লিখিত হইয়াছে। কিন্তু ইহাকেই একমাত্র অন্তরায় বলিয়া নিশ্চিন্ত হইবার উপায় নাই। কিরূপ বিচার-পদ্ধতির আশ্রয় গ্রহণ করা কর্ত্তব্য, তদ্বিষয়েও সংকীর্ণতার অভাব নাই। ন্যায়নিষ্ঠ বিচারপতির ন্যায় নিয়ত সত্যোদ্ঘাটনের চেষ্টাই যে ইতিহাস-লেখকের প্রধান চেষ্টা, তাহা ভাল করিয়া আমাদের হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না। কবি কহ্লণ "রাজতরঙ্গিণীর" উপোদ্ঘাতে লিখিয়া গিয়াছেন—

শ্লাঘ্যং স এব গুণবান্ রাগদ্বেষবহিষ্কৃতা।
ভূতার্থ-কথনে যস্ত স্থেয়স্তেব সরস্বতী॥

আমাদের সাহিত্যে এই উপদেশবাক্য এখনও সম্যক্ মর্য্যাদালাভ করিতে পারে নাই। এখনও আমাদিগের ব্যক্তিগত, জাতিগত বা সম্প্রদায়গত অনুরাগ-বিরাগ, আমাদিগকে পূর্ব্ব হইতেই অনেক ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তের অনুকূল বা প্রতিকূল করিয়া রাখিয়াছে।"

বন্ধুগণ আমিও একবার আপনাদিগকে সানুনয়ে অনুরোধ করিতেছি, যাহার যে কোন অনুরাগ-বিরাগ থাকে সত্যদেবের চরণে নিবেদন করিয়া সাহিত্যিকের উচ্চ বেদিতে অধিষ্ঠিত হউন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি—সাহিত্যচর্চ্চা ভিন্ন দেশের গতি নাই, আপনাদিগের ভিন্ন দেশের অন্যের কাহারও প্রতি তাকাইবার আর নাই। নিজের দায়িত্ব পদ-মর্য্যাদা গৌরব বুঝিয়া প্রকৃত সাহিত্যিক হউন।

এই ক্ষুদ্র ভূতার্থ কথনে যদি কাহারও কোন কোমল তন্ত্রীতে আঘাত করিয়া থাকি, সত্যদেবের মহিমায় আমাকে ক্ষমা করুন। রাগ-দ্বেষ-বিবর্জ্জিত হইয়া আমার বক্তব্য বলিয়াছি, বিশ্বাস করিয়া আমার অপরাধ মার্জ্জনা করুন।

শ্রীযোগেশচন্দ্র দত্ত

তিনখানি পত্র

মুরাদের প্রতি অউরঙ্গজেব

ইতিহাসজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেই বিদিত আছেন যে, সম্রাট্ সাজাহানের চারি পুত্রের মধ্যে দারাসেকো সর্ব্বজ্যেষ্ঠ, সুজা মধ্যম, অউরঙ্গজেব তৃতীয়, এবং মুরাদবক্স সর্ব্বকনিষ্ঠ ছিলেন। ইঁহারা সকলেই সাজাহানের এক মহিষীর সন্তান। আগ্রার তাজ যাঁহার নাম চিরজীবিত করিয়া রাখিয়াছে, ইঁহারা সকলেই তাঁহার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন ও তাঁহারই অঙ্কে বর্দ্ধিত হন। ভারতের মোগলরাজবংশে কি অভিসম্পাৎ ছিল পিতৃভক্তি, অপত্য-স্নেহ, এবং সৌভ্রাত্রের দৃষ্টান্ত ইহাতে বিরল। জাহাঙ্গীর, সাজাহান, এবং অউরঙ্গজেব তিনজনেই পিতৃদ্রোহী ছিলেন; জাহাঙ্গীর আপন পুত্র খসরুকে ক্রমাগত নির্য্যাতন করিয়া এবং কারারুদ্ধ রাখিয়া হত্যাই করেন বলিতে হয়, এবং অউরঙ্গজেব তাঁহার পুত্রগণকে এত অবিশ্বাস করিতেন যে, বৃদ্ধাবস্থায় অন্তিম-ব্যাধির কালেও তিনি তাঁহাদের কাহাকে আপনার শয্যাপার্শ্বে উপস্থিত থাকিতে দেন নাই। শূরবংশীয় শেরসাহকর্ত্তৃক নানা যুদ্ধে পরাজিত হইয়া হুমায়ুন যখন বিশ্ব অন্ধকার দেখিতেছিলেন, তাঁহার ভ্রাতৃগণ তখন তাঁহাকে সাহায্য করা দূরে থাকুক, তাঁহার ঘোর বিপক্ষতাচরণই করিয়াছিলেন। কথিত আছে যে, রাজ্য হারাইয়া পারস্যাভিমুখে পলায়নকালে কান্দাহারে তাঁহার শিশুপুত্র আকবর পিতৃব্য মির্জ্জা অস্কেরির হস্তে পতিত হন। পিতৃব্য তাঁহাকে কামানের মুখে স্থাপিত করিয়া হুমায়ুনকে ভীত করিয়া কান্দাহার পরিত্যাগ করিতে বাধ্য করেন। জাহাঙ্গীরের পুত্রগণ ভ্রাতৃ-বিদ্বেষ-বিষে জর্জ্জরিত হইতেন। যুবরাজ

পরভেজ কনিষ্ঠ ভ্রাতা খুরমকে আগ্রা হইতে আরম্ভ করিয়া দক্ষিণাভিমুখে সমস্ত দাক্ষিণাত্যে এবং পূর্ব্বাভিমুখে কলিঙ্গ, বঙ্গ ও বেহারে ক্ষুধার্ত্ত শার্দ্দূলবৎ তাড়না করিয়াছিলেন; এবং অউরঙ্গজেব ভ্রাতা এবং ভ্রাতুষ্পুত্রের রক্তে পদপ্রক্ষালন করিয়া ময়ূরাসনে আরোহণ করেন। সর্ব্বত্রই যদি বংশানুক্রমে চরিত্রগঠন হইত, তবে আমি ভাবি যে, যে বাবর পুত্র হুমায়ুনের জীবনরক্ষার্থ তাঁহার রোগশয্যাপার্শ্বে আপন জীবন-বিনিময় করিয়াছিলেন, তাঁহার বংশধরগণের মধ্যে কেহ কেহ পুত্রদ্বেষী হইলেন কেন? এবং যে হুমায়ুন ভ্রাতৃবাৎসল্যবশতঃ পিতার সাম্রাজ্য অম্লানবদনে বিভক্ত করিয়াছিলেন তাঁহার উত্তরপুরুষগণ মধ্যে ভ্রাতৃ-শোণিত-পিপাসা এত প্রবল হইল কেন?

সে যাই হউক, আমি এই প্রবন্ধে অউরঙ্গজেব-মুরাদের জীবন-কাহিনার একটি স্মরণীয় পরিচ্ছেদ লিপিবদ্ধ করিব। প্রিয়তমা মহিষী মমতাজ-মহলের অকালমৃত্যুর পর হইতেই শোকে প্রৌঢ় সম্রাট্ সাজাহানের স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইয়াছিল; তথাপি তিনি অসাধারণ মানসিক তেজে দৈহিক দৌর্ব্বল্য উপেক্ষা করিয়া যথোচিত বিধানে রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিতেছিলেন। ক্রমে তাঁহার জীবনের ষষ্টিতমবর্ষ অতিক্রান্ত হইল; পরবর্ত্তী কয়েক বৎসরে তিনি আরও শোক পাইলেন; প্রিয়তম বন্ধু, ধীমান্ মন্ত্রী, ও চিরসহায় কুশল সেনানায়ক জাফরজঙ্গ, শাদুল্লা খাঁ এবং আলীমর্দ্দান তাঁহাকে ক্রমে ক্রমে পরিত্যাগ করিয়া অনন্তধামে প্রস্থান করিলেন। তখন সাজাহান বার্দ্ধক্যের করাল অঙ্গুলিস্পর্শ অনুভব করিতে লাগিলেন। তিনি ইতি-পূর্ব্বেই জ্যেষ্ঠপুত্র দারাকে উত্তরাধিকারী মনোনীত করিয়াছিলেন এবং অন্য তিন পুত্রকে রাজ্যের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশত্রয়ে শাসনকর্ত্তৃত্বে নিয়োজিত করিয়া তাঁহাকে নিজের পার্শ্বে রাখিয়াছিলেন। যখন খৃষ্টীয় ১৬৫৭ অব্দে তিনি পুনরায় পীড়িত হইয়া পড়িলেন, তখন তিনি আপন মন্ত্রিসভার

সদস্যগণকে আহ্বান করিয়া তাঁহাদের সমক্ষে দারাকে উত্তরাধিকারিত্বে বরণ করিলেন। দারা পিতৃবৎসল এবং প্রপিতামহ আকবরের ন্যায় ধর্ম্মতত্ত্বপিপাসু ও উদারচিত্ত ছিলেন। আরব্য, পারস্য, এবং সংস্কৃত ভাষায় তাঁহার পাণ্ডিত্য ছিল; এবং ধর্ম্মবিষয়ে কয়েকখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। একে তিনি পিতার জ্যেষ্ঠপুত্র, তাহাতে বহুগুণালঙ্কৃত; তাঁহার সিংহাসনলাভে তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতৃগণের ক্ষোভের কোনই কারণ ছিল না। তথাপি মোগলকুলাধিষ্ঠাত্রীর অভিসম্পাৎবশতঃ তাঁহারা জ্যেষ্ঠের প্রাপ্য রাজদণ্ড সমস্ত অধিকার করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইলেন। তখনও দারা রাজদণ্ড গ্রহণ করেন নাই, কেন না সাজাহান তখনো জীবিত। বাল্যকাল হইতেই অউরঙ্গজেব ও মুরাদ দারার ভয়ঙ্কর বিরোধী ছিলেন; ইঁহারা তাঁহাকে প্রাণের সহিত ঘৃণা করিতেন এবং সর্ব্বপ্রযত্নে তাঁহার অনিষ্ট-সাধনের চেষ্টা করিতেন। সুজা দারার তত আততায়ী ছিলেন না, তথাপি রাজ্য-লোভে তিনিও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন।

অউরঙ্গজেবের দারার প্রতি বিদ্বেষ বোধগম্য। তিনি নিজে সঙ্কীর্ণ-হৃদয় ধর্ম্মোন্মাদ মুসলমান ছিলেন। ধর্ম্মবিষয়ে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার উদারতাকে তিনি অবর্ণনীয় ঘৃণার চক্ষে দর্শন করিতেন। কিন্তু মুরাদের ভ্রাতৃবিদ্বেষের মূলে কেবল তাঁহার বিস্ময়কর আত্মম্ভরিতা ও অউরঙ্গজেবের প্ররোচনা। বহুদিন পূর্ব্ব হইতেই অউরঙ্গজেব, মুরাদ, ও সুজা ষড়যন্ত্র করিতেছিলেন এবং পরস্পরের মধ্যে পরস্পরের অভিপ্রায়-জ্ঞাপক সাঙ্কেতিক লিপি পরি-চালনের জন্য আপন আপন অধিকারে দলে দলে লিপি-বাহক নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তখন অউরঙ্গজেব দাক্ষিণাত্যে বর্হানপুরে, মুরাদ গুজরাটে এবং সুজা বাঙ্গালায়। গুজরাট ও বর্হানপুরের মধ্যে লিপিবাহকগণের গমনাগমন যেমন সহজসাধ্য ছিল, সেকালে এই দুইস্থান এবং বঙ্গদেশের

মধ্যে সেরূপ ছিল না। সেইজন্য অউরঙ্গজেব ও মুরাদের মধ্যে মন্ত্রণাই প্রথমে পরিপক্ক হইল; তখন তাঁহারা নিষ্প্রয়োজনবোধে সুজার সহায়তা-প্রাপ্তির চেষ্টা পরিত্যাগ করিলেন। সাজাহান অত্যন্ত পীড়িত হইয়া পড়িয়াছিলেন; সে কথা বিদ্যুদ্বেগে দেশময় রাষ্ট্র হইয়া পড়িয়াছিল। তিনি নীরোগ হইলেন; দারা সে সংবাদও রাজ্যের সর্ব্বত্র প্রেরণ করিলেন; সাজাহানের নাম ও মোহর অঙ্কিত আদেশোপদেশ লিপি-সকলও সর্ব্বত্র প্রেরিত হইল; তথাপি মুরাদ ও অউরঙ্গজেব আপনাদের অসদভিপ্রায়ের প্রতিকূল সে সংবাদ ইচ্ছা করিয়াও বিশ্বাস করিলেন না এবং আপনাদের অনুচর ও সহচরগণকেও বিশ্বাস করিতে দিলেন না। তাঁহারা সর্ব্বপ্রযত্নে প্রচার করিতে লাগিলেন যে, পিতার মৃত্যু হইয়াছে, কাফের দারা সিংহাসন অধিকার করিয়াছে। যে পর্য্যন্ত সে সিংহাসনে সুদৃঢ় হইয়া উপবেশন করিতে না পারিবে সে পর্য্যন্ত মৃত্যু-সংবাদ গোপন রাখিয়া আরোগ্যের মিথ্যা সংবাদে সকলকে ভুলাইতেছে।

সাজাহানের চারি পুত্র মধ্যে সর্ব্বকনিষ্ঠ মুরাদ সর্ব্বাপেক্ষা অবিমৃষ্যকারী ও নির্ব্বোধ ছিলেন। তিনি রাজ্যশাসন কার্য্যেও পারদর্শী ছিলেন না, এবং সর্ব্বদা বিলাস-স্রোতে ভাসমান থাকিতেন। যে যত অকর্ম্মণ্য হয়, গর্ব্বও তাহার তত অধিকমাত্রায় হইয়া থাকে। মুরাদেরও তাহাই হইয়াছিল। যুদ্ধক্ষেত্রে তাঁহার সাহস না ছিল তাহা নহে, বরং অসংসাহসই ছিল; কিন্তু সমর-পরিচালনার কূটরীতি ও কৌশল তাঁহার পরিজ্ঞাত ছিল না। তাঁহার নির্ব্বুদ্ধিতার প্রকৃষ্ট পরিচয় এই যে, অউরঙ্গজেবের সহিত মন্ত্রণা সমাপন ও তাঁহার সহিত মিলিত হইবার পূর্ব্বেই অধীশ্বর হইয়া তিনি স্বশাসনাধিকৃত গুজরাটের রাজধানী অহম্মদাবাদে মরুয়াজুদ্দিন নামধারণপূর্ব্বক রাজমুকুট পরিধান করিয়াছিলেন।

মুরাদ যেমন স্বল্পধী, বিলাসী, অলস ও আত্মম্ভরী ছিলেন, অউরঙ্গজেব

তেমনি সূচ্যগ্রতীক্ষ্ণবুদ্ধিশালী, ভোগাকাঙ্ক্ষা বিরহিত, কূটনীতিপরায়ণ, অক্লান্তকর্ম্মা এবং দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন। যদিও কনিষ্ঠভ্রাতা মুরাদের প্রতি মন্ত্রণাবস্থ কাল হইতেই অউরঙ্গজেব অত্যন্ত স্নেহের ভাণ করিয়া আসিতেছিলেন, তথাপি অল্পবুদ্ধিসত্ত্বেও মুরাদ এ কথা বুঝিয়াছিলেন যে, তিনি নিঃস্বার্থভাবে সমগ্র সাম্রাজ্যের সিংহাসনপ্রাপ্তি বা সাম্রাজ্যের অংশবিশেষ লাভ বিষয়ে তাঁহার সহায়তা করিবেন না। সেইজন্য তিনি ভ্রাতাকে বারম্বার অনুরোধ করিয়াছিলেন যে, উভয়ের মধ্যে একটি সর্ত্তপত্র লিখিত হউক, তাহাদ্বারা উভয়ে পরিষ্কার বুঝিতে পারিবেন কাহার কি উদ্দেশ্য, কাহার কত আশা, এবং আগামী মহাতাণ্ডবে কে কি তালে নৃত্য করিবেন। কোন কোন ইংরেজ-ঐতিহাসিক লিখিয়াছেন যে, অউরঙ্গজেব প্রথম হইতেই মুরাদকে বলিতেছিলেন যে, তিনি সংসারবিতৃষ্ণ, সমগ্র সাম্রাজ্য বা উহার খণ্ডবিশেষে তাঁহার কোনও আকাঙ্ক্ষা নাই; তদপেক্ষা পবিত্র ভূমি মক্কার কোন অজ্ঞাত কোণে ফকীর বেশে দিনযাপন করার লোভ তাঁহার সমধিক। তিনি অপধর্ম্মী, পৌত্তলিক দারাকে বিতাড়িত করিয়া হিন্দুস্থানে ধর্ম্মরাজ্য পুনঃসংস্থাপন করার একমাত্র উদ্দেশ্যেই স্বধর্ম্মপরায়ণ, পরমস্নেহভাজন মুরাদের সহিত মিলিত হইতেছেন। কিন্তু আমি যে প্রামাণ্য গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া এই বংসামান্য প্রবন্ধ রচনা করিতেছি, তাহাতে দেখিতে পাই যে, অউরঙ্গজেবের দারাকে অপসৃত করিয়া মুসলমানধর্ম্মের গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখার বাসনার ভাণ করা সত্য; কিন্তু তাঁহার ফকিরি গ্রহণ করিয়া মক্কায় কারবোলায় কোন নিভৃত কোণে জীবন অতিবাহিত করার অভিপ্রায় প্রকাশ করা সত্য নহে। তিনি একখানি দীর্ঘপত্রে মুরাদের নিকট আপনার অভিপ্রায় স্পষ্টতঃ প্রকাশ করার ভাণ করিয়াছিলেন। ঐ পত্র মুরাদের সহিত মিলিত হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে খৃষ্টীয় ১৬৫৮ অব্দের প্রথম ভাগে লিখিত

হইয়াছিল। আমি উহার অনুবাদ দিতেছি। কপটতার লীলা এই পত্রে যতদূর বিস্তৃত হইয়াছে এবং ভগবানের ও কোরাণের পবিত্র নামের সহিত মিথ্যা ও ছলনার বাক্য ইহাতে যেরূপ সংযুক্ত হইয়াছে, সেরূপ আর কোথায়ও হইয়াছে বলিয়া আমি জানি না। স্পেনের রাজা দ্বিতীয় ফিলিপসম্বন্ধে এরূপ একটি কথা প্রচলিত ছিল যে, তিনি এরূপ খলপ্রকৃতি ছিলেন যে, স্বয়ং খৃষ্টও যদি কার্য্যব্যপদেশে তাঁহার নিকটে আসিতেন তবে তিনি তাঁহাকেও বঞ্চনা না করিয়া ছাড়িতেন না। অউরঙ্গজেব সম্বন্ধেও অনুরূপ অভিমত প্রকাশ করা যাইতে পারে। এই প্রবন্ধের বিষয়ীভূত তাঁহার পত্রখানি এই :—

প্রাণাধিক প্রিয়-কনিষ্ঠ সহোদর যুবরাজ মুরাদবক্স,

দেখিতেছি যে পিতৃ-পরিত্যক্ত সাম্রাজ্যলাভের অভিপ্রায় বিশদরূপে প্রকটিত হইয়াছে এবং পয়গম্বরের পতাকাসমূহ লক্ষ্যাভিমুখে প্রসারিত হইয়াছে। এ ধর্ম্মযুদ্ধ জেহাদের বজ্রনির্ঘোষ দিগন্তে প্রতিধ্বনিত হউক। আমার অন্তর্নিহিত ঐকান্তিক বাসনা এই যে, ইস্‌লামের প্রিয় বসতি-ভূমি এই মোগল-সাম্রাজ্য হইতে অপধর্ম্ম ও পৌত্তলিকতার কণ্টক-তরু সমূলে উৎপাটন করিয়া ফেলি এবং এই অপধর্ম্ম ও পৌত্তলিকতার প্রধান পুরোহিত অবাচ্যনামা শয়তানের ধ্বংস-সাধন করিয়া সত্য-ধর্ম্মের মহিমা পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করি। অধর্ম্ম ও অপধর্ম্মের ধূলি তাহা হইলে আর জনগণের মনকে কলুষিত করিবে না, সাধু ফকিরগণের মুক্তাত্মা তাহা হইলে আর কাতরে বিলাপধ্বনি করিবে না, ইরাণ, তুরাণ, রুম ইত্যাদি জনপদবাসিগণ তাহা হইলে আর আমাদিগকে ঘৃণার চক্ষে অবলোকন করিবে না, হিন্দুস্থান শস্য ও সমৃদ্ধিপূর্ণ হইবে, প্রজাগণ রোগ-শোকের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিবে এবং স্বচ্ছন্দে সুখশান্তি উপভোগ করিবে।

তুমি আমার প্রাণপ্রিয় ভ্রাতা; তুমি এই পবিত্র মহদভিযানে আমার সহিত সম্মিলিত হইয়াছ এবং খোদাতাল্লার নামগ্রহণ ও কোরাণ স্পর্শ করিয়া বহু শপথপূর্ব্বক স্বীকৃত হইয়াছ যে বর্ত্তমানে ও ভবিষ্যতে, যুদ্ধক্ষেত্রে ও রাজপ্রাসাদে, দুর্ভাগ্য ও সৌভাগ্যে, সর্ব্বত্র ও সর্ব্বাবস্থায় তুমি আমার সহায় থাকিবে; এবং সনাতন ধর্ম্মের ও এই ধর্ম্মরাজ্যের পরম শত্রু নিপাত হইলেও তুমি চিরদিন আমার বন্ধু এবং আমার বন্ধুগণের বন্ধু এবং আমার শত্রুগণের শত্রু হইয়া আমার আনন্দবিধান করিবে; এবং তুমি তোমার স্বাধীন ইচ্ছায় নিজের ভোগের জন্য সাম্রাজ্যের যে যে অংশপ্রাপ্তি ও অধিকারের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছ তাহার অধিক আকাঙ্ক্ষা করিবে না ও লাভের চেষ্টা করিবে না। তোমার সরল হৃদয়ের অভিব্যক্তি আমাকে অত্যন্ত তুষ্ট করিয়াছে; তোমার আকাঙ্ক্ষা অতি ন্যায্য। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, তুমি ও আমি চিরদিন একচিত্ত থাকিব, একই অভিপ্রায় সাধনের জন্য আমাদের মিলিত শক্তি প্রযুক্ত হইবে; এবং তুমি কখনো তোমার কোন কার্য্যদ্বারা আমার অভিপ্রায় সাধনের প্রতিকূল হইবে না। আমাদের উভয়ের মঙ্গলপথ এক। আমি জানি তুমি সত্যপ্রতিজ্ঞ; তুমি এ পথ হইতে কখনো বিচলিত হইবে না। তোমার প্রতি আমার স্নেহ ও অনুগ্রহ ক্রমশঃই বর্দ্ধিত হইতে থাকিবে। তোমার লাভ ও ক্ষতিকে আমি আমার লাভ ও ক্ষতি বলিয়া মনে করিতেছি ও চিরকাল করিব। ঈশ্বর-পরিত্যক্ত ও কুকর্ম্মান্বিত এই দারাসেকো পৌত্তলিক হিন্দুর গোলাম, ভক্ত-বিশ্বাসীর শত্রু; ইহার বিনাশের পর তোমার প্রতি আমার কৃপা আরও বর্দ্ধিত হইবে। আমি নিরাবিল মনে তোমার নিকটে আমার অঙ্গীকার সততই পালন করিব; অর্থাৎ সাম্রাজ্য অধিগত হইলে তুমি পাঞ্জাব, কাশ্মীর ও সিন্ধুদেশ গ্রহণ করিয়া ঐ তিন প্রদেশের সম্মিলনে যে বিস্তৃত রাজ্য সংগঠিত হইবে তাহাতে একছত্র নৃপতি হইবে, তাহাতে

আমি বিন্দুমাত্রও আপত্তি করিব না ; বরং তোমার হস্তে ঐ রাজ্যরক্ষার জন্য প্রয়োজন হইলে আমি তোমার যথাসাধ্য সহায়তা করিব। তুমি তোমার রাজ্যে স্বাধীন নৃপতির ধ্বজা উত্তোলন করিবে, নিজনামাঙ্কিত মুদ্রা প্রচলন করিবে এবং নিজনামে খুৎবা প্রচারিত করিবে। অবশ্যম্ভাবী ধর্ম্মযুদ্ধে জয়লাভ করিলে আমাদের হস্তে ধনরত্নাদি যে সকল মূল্যবান্ বস্তু, দাস-দাসী, অশ্বগজাদি যেসকল জীব এবং যুদ্ধের যে সকল উপকরণ পতিত হইবে, তাহার একতৃতীয়াংশ তোমাকে দিব এবং অবশিষ্ট আমি গ্রহণ করিব। আমি কোরাণ-শরিফ শিরে ধারণ করিয়া এবং আল্লাতালা ও পয়গম্বরকে সাক্ষী করিয়া লিপিযোগে এই সকল অঙ্গীকার করিতেছি। পয়গম্বর যেমন খোদার প্রত্যাদেশে বিশ্বাস-স্থাপন করিয়াছিলেন, তুমিও তেমনি আমার এই প্রতিজ্ঞাপত্রে বিশ্বাস স্থাপন করিও। ধর্ম্মের কণ্টক ও গাজীর চক্ষুঃশূল পৌত্তলিক দারা বিনষ্ট হইলে এবং রাজ্য নিরাময় হইলেই তুমি তোমার স্বরাজ্যে সিংহাসন স্থাপিত করিও ; আমি আপত্তি করিব না এবং কাহাকেও আপত্তি করিতে দিব না। আমি অউবঙ্গাবাদ হইতে সবাহিনী যাত্রা করিয়া সত্বরেই নর্ম্মদা উত্তীর্ণ হইব ; তুমিও তোমার সৈন্যসামন্ত লইয়া অভিযান আরম্ভ করিও, যেন বড়মণ্ডলের নিকটবর্ত্তী কোন স্থানে আমরা মিলিত হইতে পারি।

অউরঙ্গজেব তাঁহার পুনপুনরুচ্চারিত অঙ্গীকার কতদূর রক্ষা করিয়াছিলেন এবং তাঁহার "প্রাণাধিক প্রিয়" কনিষ্ঠ ভ্রাতা মুরাদ তাহার অপরিসীম স্নেহের কি নিদর্শন পাইয়াছিলেন, তাহা ঐতিহাসিকগণ লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা আমার এ প্রবন্ধের বিষয়ীভূত নহে।

অউরঙ্গজেবের প্রতি রাজসিংহ

ভারতের মুসলমান-বিজেতৃগণ দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করিয়া তাঁহাদের প্রত্যেক হিন্দুপ্রজার নিকটে তাহার হিন্দুত্ব-নিবন্ধন যে কর আদায় করিতেন, তদ্দ্বারা হিন্দু-মুসলমানের মনোমালিন্য সঞ্জাবিত রাখিবার পন্থা প্রশস্ত হইয়াছিল। এই কর "জিজিয়া" নামে অভিহিত হইত। মহামতি আকবর দেখিয়াছিলেন যে, হিন্দুস্থানে হিন্দু অপেক্ষা মুসলমানই মুসলমানের অধিকতর অত্যাচরণ করিত। নানাজাতীয় উদ্ধত-চরিত্র মুসলমানে হিন্দুস্থান পরিপূর্ণ হইয়াছিল; তাহাদের মধ্যে সহানুভূতি বা একতাবন্ধন ছিল না, সকলেই স্বকার্য্য উদ্ধারের জন্য ব্যস্ত থাকিত; রাজ্য বা ক্ষমতালাভের জন্য জ্ঞাতিত্ব, সমধর্ম্মত্ব ইত্যাদি সমস্তই পদদলিত হইত। আকবর হিন্দুগণের সহিত সৌখ্য ও বৈবাহিকসম্বন্ধ সংস্থাপন করিয়া মোগল-সাম্রাজ্যের ভিত্তি সুদৃঢ় করিতে সচেষ্ট হইয়াছিলেন। তিনি নিজে রাজপুত কন্যা বিবাহ করিয়াছিলেন এবং পুত্র জাহাঙ্গীরকে রাজপুত-কন্যা বিবাহ করাইয়াছিলেন। তিনি রাজপুতগণকে উচ্চ রাজকার্য্যে নিয়োজিত করিয়াছিলেন এবং হিন্দু ও মুসলমানকে সম-দৃষ্টিতে দেখিতেন। তিনি হিন্দুবিদ্বেষাত্মক জিজিয়া কর উঠাইয়া দিয়া হিন্দু প্রজাগণের প্রীতি ও কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছিলেন। তাঁহার এই উদার-নীতির ফলে অম্বরপতি মানসিংহপ্রমুখ রাজপুতবীরগণ তাঁহার রাজ্য-বিস্তার ও রাজ্য-রক্ষার জন্য তুষারকিরীট ককেশস পর্ব্বত হইতে পূর্ব্বোপ-সাগরকূলস্থ আরাকান পর্য্যন্ত সর্ব্বদেশে রাজপুত-রক্তে ধরণী সিক্ত করিয়া-ছিলেন; ইহারই ফলে তিনি প্রবল পাঠানগণকে দমন করিয়া ভারতের একছত্রত্ব সাধন করিতে পারিয়াছিলেন এবং ইহারই ফলে তিনি তাঁহার বিশাল সাম্রাজ্য পুত্রপৌত্রাদিক্রমে অবিচ্ছিন্ন ভাবে ভোগ করিতে পারিয়া-

ছিলেন। জাহাঙ্গীর ও সাজাহান তাঁহার পদাঙ্কানুসরণ করিয়া তাঁহাদের হিন্দু-সামন্তগণের সাহায্যপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। অতএব তাঁহাদিগকে হুমায়ূনের ন্যায় সিংহাসনচ্যুত ও নির্ব্বাসিত হইতে হইয়াছিল না। অউরঙ্গজেব ভ্রাতৃ-শোণিতে লালসার তর্পণ করিয়া এবং পিতা ও ভগিনীকে কারারুদ্ধ করিয়া সিংহাসনে উপবেশন করিলেন এবং ভ্রাতুষ্পুত্রগণকে হত্যা করিয়া কথঞ্চিৎ নিরুদ্বেগ হইলেন। সিংহাসনের পথ নিষ্কণ্টক করিবার মানসে আর কেহ এতগুলি মহাপাপ সাধন করে নাই। তাঁহার পঙ্কিল হৃদয় সর্ব্বদাই উদ্বেগ-পূর্ণ থাকিত। তিনি প্রায়শ্চিত্তের আবশ্যকতা হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন—পাপীমাত্রেই করিয়া থাকে এবং অতি সঙ্কীর্ণ-হৃদয় ধর্ম্মোন্মাদের ন্যায় বিধর্ম্মিগণের প্রতি নানাবিধ অত্যাচার করিয়া আপনার বিবেক-বুদ্ধিকে প্রতারিত করিয়াছিলেন। তাঁহার অত্যাচারে হিন্দু-কৃষক ক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিয়াছিল; হিন্দু-শিল্পী কর্ম্মত্যাগ করিয়া অদৃশ্য হইয়াছিল; অতএব রাজকোষে অর্থাভাব হইয়াছিল। এদিকে তাঁহার অবিশ্রান্ত যুদ্ধবিগ্রহে রাশি রাশি অর্থের প্রয়োজন; ঐ অর্থ-সংগ্রহের জন্য তিনি জঘন্য জিজিয়া-কর পুনরায় স্থাপন করিয়াছিলেন। অউরঙ্গজেবের এই অতি দূষণীয় কার্য্যের প্রতিকূলে মিবারপতি বীর রাজসিংহ সম্রাট্‌কে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, কোন বিখ্যাত পাশ্চাত্য ঐতিহাসিক বলিয়াছেন যে, তাহার তুলনা পৃথিবীতে নাই। যে উচ্চ ধর্ম্মনীতি, যে লোকহিতৈষিণা, যে উদারতা এবং যে নির্ভীকতা এই লিপি-মুখে ব্যক্ত হইয়াছে, অন্য কোন ভাষায় লিখিত বাক্যে ইহার অধিক হয় নাই। সে চিরস্মরণীয় লিপিখানি এই—

পাতসাহ, ভগবানের অনন্ত মহিমা কীর্ত্তিত হউক এবং নির্ম্মল আকাশে প্রভাসিত সূর্য্যচন্দ্রমার ন্যায় আপনার বদান্যতার জ্যোতিঃ ধরণীতল পরিব্যাপ্ত হউক। আমি আপনার সান্নিধ্য-সুখে বঞ্চিত আছি, কিন্তু

তথাপি আমি আপনার হিতাকাঙ্ক্ষী এবং রাজভক্তজনোচিত সকল সম্মানার্হ কার্য্যে সর্ব্বদা তৎপর। ভারত-ভূমির স্বাধীন ও অধীন নৃপতি-বৃন্দ, সামন্ত ও জায়গীর-ভোগিগণ এবং ইরাণ, তুরাণ, রুম, চীন ইত্যাদি সর্ব্বদেশবাসিগণ এবং স্থলপথ ও জলপথচারী সর্ব্বাবস্থার লোকপুঞ্জের হিতার্থে আমার হৃদয়ের সকল প্রযত্ন নিয়োজিত, ইহা সকলের নিকটেই বিদিত আছে, আপনিও এ বিষয়ে সন্দেহযুক্ত হইবেন না। সম্প্রতি আমি একটি বিশেষ ঘটনার উল্লেখ করিব; ইহাতে হিন্দুস্থানের জনসাধারণের এবং আমাদের আপন হিত সম্পৃক্ত আছে। আমার পূর্ব্ব কার্য্যকলাপ স্মরণ করিয়া এবং আপনার নিজ হৃদয়ের মহত্ত্বদ্বারা প্রণোদিত হইয়া আপনি এ বিষয়ে ন্যায়সঙ্গত বিধান করিবেন এই প্রার্থনা করি।

শ্রুত হইলাম, এ অকিঞ্চন হিতাকাঙ্ক্ষীর সহিত যুদ্ধবিগ্রহে রাজকোষের বহুধন অপব্যয়িত হইয়াছে এবং ভাণ্ডার পুনর্বার পূর্ণ করিবার জন্য আপনি আপনার দরিদ্র হিন্দু-প্রজাগণের নিকট হইতে লুপ্ত জিজিয়া-কর পুনর্গ্রহণ করিবার আদেশ প্রচার করিয়াছেন। আমার বিনীত নিবেদন এই যে, আপনার স্বর্গারূঢ় প্রপিতামহ মহম্মদ জেলালুদ্দিন আকবর শাহ দ্বিপঞ্চাশৎ বর্ষকাল ন্যায়ানুমোদিত প্রণালীতে অথচ অপ্রতিহত প্রভাবে এ ভারত-সাম্রাজ্য প্রতিপালন ও শাসন করিয়াছিলেন; তাঁহার সিংহাসনের ছায়ায় সকল জাতীয় ও সকল ধর্ম্মাবলম্বী জনগণ সুখে ও স্বচ্ছন্দে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিত। সকলের প্রতিই তাঁহার সমান দৃষ্টি ও বাৎসল্য ছিল। কি ঈশা, কি মুশা, কি দাউদপন্থী, কি মহম্মদের সেবক, কি ব্রাহ্মণ, কি নিরীশ্বরবাদী নাস্তিক প্রত্যেকেই তাঁহার দ্বারা সমভাবে প্রতিপালিত হইত। এইজন্য তাঁহার প্রজাবর্গ তাহাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা, ভক্তি ও প্রেমপ্রদর্শনার্থ তাঁহাকে "জগদ্গুরু" অভিধান প্রদান করিয়াছিল। আপনার স্বর্গগত পিতামহ মহম্মদ নুরুদ্দিন

জাহাঙ্গীর তাঁহার পিতার পদাঙ্কানুসরণ করিয়াছিলেন এবং দ্বাবিংশতি বৎসর সমদর্শিতার সহিত সন্ততিবর্গ প্রতিপোষণ করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার মিত্রজনকে প্রেম ও বিশ্বাসদানে আপ্যায়িত করিতেন এবং কেবল শত্রুগণের বিরুদ্ধেই আপনার অমিত বাহুবল প্রয়োগ করিতেন। পুণ্য-লোকপ্রাপ্ত আপনার পিতা সাজাহানও দয়াশীলতা এবং ন্যায় ও ধর্ম্ম-পরায়ণতার জন্য জগতে কম খ্যাতিলাভ করিয়া যান নাই। তাঁহার দ্বাত্রিংশদ্বর্ষব্যাপী রাজত্বকালে সর্ব্বশ্রেণীস্থ প্রজাবর্গ পরমসুখে কালাতিপাত করিয়াছিল।

আপনার পিতৃপুরুষগণের মতিগতি এইরূপ ছিল; তাঁহারা ন্যায়-পথানুবর্ত্তী ছিলেন, সেইজন্য তাঁহাদের বাসনা সফল হইত, এবং সকল কার্য্যেই জয়শ্রী তাঁহাদের অঙ্কগতা হইতেন। তাঁহারা বহু শত্রু দমন করিয়াছিলেন, বহু পররাজ্য অধিকার করিয়াছিলেন। আপনার রাজত্বকালে বহু স্বায়ত্তপ্রদেশ পরকরতলগত হইয়াছে এবং আরও হইবে; কেননা রাজ্যে সুশাসন নাই, ন্যায়-বিচার নাই, প্রজা-স্নেহ নাই। কেবল দুর্ব্বলের সর্ব্বস্ব লুণ্ঠনে ও ধ্বংসসাধনে আপনার ও আপনার প্রতিনিধি-গণের শক্তি প্রযুক্ত হইতেছে। আপনার প্রজাবর্গ পদদলিত এবং প্রদেশসমূহ দারিদ্র-পীড়িত বা উৎসাদিত; আপনি আপজ্জালে বিজড়িত হইতেছেন। আপনি সুবিশাল সাম্রাজ্যের অধিপতি, যদি আপনারই কোষশূন্য, তবে সামন্তরাজগণ ও অন্যান্য পদস্থ ব্যক্তির অবস্থা সহজেই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন। আপনার সৈন্যগণ বেতন না পাইয়া মহা অসন্তুষ্ট হইয়াছে, এবং আপনার রাজ্যের বণিক্‌গণ বাণিজ্যাভাবে হাহাকার করিতেছে। মুসলমানগণ যেমন অসুখী ও দীনদশাপন্ন, হিন্দু-গণও তদ্রূপ। নিম্নশ্রেণীস্থ নরনারীকুল অন্নাভাবে বক্ষে করাঘাত করিয়া ধূল্যবলুণ্ঠিত হইতেছে।

অন্নাভাবে শীর্ণ, নির্ব্বিরোধী প্রজাকে উৎপীড়ন করিয়া যে নরপতি কর-সংগ্রহ করেন এবং উহা হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধুগণের নির্য্যাতনের নিমিত্ত নিয়োজিত করেন, সংসারে তাঁহার মর্য্যাদা কিরূপে রক্ষিত হইবে? শুনিতেছি যে, আপনি বিশাল রাষ্ট্রের অধিপতি হইয়াও নিঃস্ব তীর্থযাত্রী হিন্দুকে করের জন্য আক্রমণ করিতেছেন; আপনার প্রবল প্রতাপে যোগী ও সন্ন্যাসী, বৈরাগী ও ভিক্ষু, ব্রাহ্মণ ও বৌদ্ধ—কেহই কর প্রদান না করিয়া উদ্ধার পাইতেছে না; এবং আপনি পিতৃগণের পুণ্যখ্যাতি অতল জলে বিসর্জ্জন দিয়া ভিক্ষোপজীবিগণের প্রতিও বাহুবল প্রয়োগ করিতেছেন। যে সকল গ্রন্থ জগতে ধর্ম্মশাস্ত্র বলিয়া পূজিত, আপনার যদি সে সকলে শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস থাকে, তবে আপনি এ কথা অবশ্যই মান্য করিবেন যে, ভগবান্ যেমন মুসলমানের তেমনি হিন্দুর—কেবল মুসলমানের নহেন। মহম্মদপ্রদর্শিত পথাবলম্বিগণ এবং অন্যান্য ধর্ম্মাচারিগণ সকলেই এক পংক্তিতে তাঁহার চরণতলে উপবেশন করিয়া আছে। মনুষ্যকুলে শ্বেত-কৃষ্ণভেদ, জাতি-বর্ণ-ভেদ তাঁহারই অভিপ্রেত, তাঁহারই কার্য্য। তিনি সকলকেই সৃজন করিয়াছেন, পালন ও রক্ষা করিতেছেন। মসজিদে যে নেমাজের ধ্বনি উত্থিত হয় তাহাও যেখানে উপনীত হয়, হিন্দুর দেব-মন্দিরের ঘণ্টা ও মন্ত্রধ্বনিও সেইখানেই গমন করে। মসজিদে যিনি পূজিত হন, প্রতিমাপূর্ণ দেবমন্দিরেও তিনিই। যে অপর ধর্ম্মাবলম্বিগণের ধর্ম্ম ও রীতিনীতির প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করে ও তাহাদিগকে উৎপীড়ন করে সে ঈশ্বরেচ্ছার বিপরীত আচরণ করে। যেমন কোন এক ব্যক্তি কোন একখানি চিত্র বিনষ্ট করিলে উহার চিত্রকর তাহার প্রতি ক্রোধান্বিত হন, তেমনই আমাদের কাহাকেও অপর কেহ নিধন করিলে নিধনকারী জগৎ-স্রষ্টার কোপে পতিত হইয়া থাকে।

হিন্দুদিগকে এই করভারে নিপীড়িত করা ন্যায়ানুমোদিত নহে, ইহা

রাজনীতিসঙ্গতও নহে। ইহা দ্বারা হিন্দুধর্ম্মের অবমাননা করা হইতেছে এবং হিন্দু প্রজা নির্ধনীকৃত হইতেছে। অনুমান করি, ইস্‌লাম-ধর্ম্মের গৌরববর্দ্ধনার্থই আপনি জিজিয়াকর পুনঃ প্রচলন করিয়াছেন। আপনি যেমন আপনার ধর্ম্মের মুখ্য সংরক্ষণকর্ত্তা, তেমনি হিন্দুধর্ম্মের প্রধান সংরক্ষক অম্বরপতি জয়সিংহ। আপনি হিন্দুস্থানের সমস্ত হিন্দুর স্থলে তাঁহাকে করপ্রদানের আদেশ করুন; আমাকেও করিতে পারেন। আমি দুর্ব্বল; আমার নিকট হইতে কর গ্রহণ করিতে আপনার বিশেষ আয়াস না হইবারই কথা। ক্ষুদ্রপ্রাণ কৃষক ও বণিক্, নির্ব্বিরোধী যতি, সন্ন্যাসী, বৈরাগী প্রভৃতির প্রতি অত্যাচার করা আপনার ন্যায় প্রতাপান্বিত নরপতির শোভা পায় না। আমি বিস্মিত হইতেছি যে, আপনার বিচক্ষণ মন্ত্রিগণের মধ্যে কেহ আপনাকে এতদিনও এ বিষয়ে সৎ-পরামর্শ প্রদান করেন নাই।

স্যর্ ফিলিপ ফ্যান্সিসের প্রতি হেষ্টিংস্

মুসলমান রাজত্বের অবসানে এবং ইংরেজ রাজত্বের উন্মেষ সময়ে অমিততেজা হেষ্টিংস সাহেব বঙ্গে শাসনদণ্ড পরিচালন করিতেছিলেন। তাঁহার পূর্ব্বেই অনরেবল ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানি এ দেশের রাজস্ব সংগ্রহের ভারপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন; এবং দেশরক্ষার ভার বাতব্যাধিগ্রস্ত তথাকথিত নবাব মীরজাফর বাৎসরিক ৫৩ লক্ষ টাকা দক্ষিণাসহ ইংরেজের হস্তে দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন। হেষ্টিংস যখন গভর্ণর জেনারল নিযুক্ত হন, তখন মুর্শিদাবাদের রাজ-প্রাসাদ নীরব, অযোধ্যার নবাবের মন হইতে তখনো কোয়ার রণক্ষেত্রের বিভীষিকা তিরোহিত হয় নাই, এবং আকবর ও অউরঙ্গজেবের বংশধর সম্রাট্ দ্বিতীয় শাহআলম্ তখন উদরান্নের জন্য

ইংরেজের পেন্‌সনের উপর নির্ভর করিয়া থাকেন। হেষ্টিংস্ প্রথমে কেবলমাত্র বঙ্গের গভর্ণর ছিলেন ; ১৭৭৩ খৃষ্টাব্দের "রেগুলেটিং এ্যাক্ট" নামক ভারত-শাসন-পদ্ধতির প্রচলনের পর তিনি ভারতে সমগ্র ইংরেজাধিকারের গভর্ণর-জেনারল হন। তাঁহার সহায়তার জন্য একটি মন্ত্রণা-সভা গঠিত করিয়া দেওয়া হয়। ঐ মন্ত্রণা-সভার প্রথম নিয়োজিত সভ্য জেনারল ক্লেভারিং, কর্ণেল মনসুন, ফ্রান্সিস্, এবং বারোয়েল সকলেই অল্পাধিক পরিমাণে হেষ্টিংসের বিরোধী ও বিরুদ্ধাচারী ছিলেন। কি রাজকার্য্যে কি অপরাপর বিষয়ে হেষ্টিংস যাহা করিতেন বা করিতে চাহিতেন, ইঁহারা তাহার বিপরীতাচরণ করিতেন। অতএব তাঁহার মনে শান্তি ছিল না ; শাসনকার্য্যপরিচালনে সুখ ছিল না। নন্দকুমারের ফাঁসি, অযোধ্যার বেগমগণের প্রতি উৎপীড়ন, বারাণসীরাজ চৈৎসিংহকে দলন ইত্যাদি কয়েকটি কার্য্যে ইতিহাসে হেষ্টিংসের নৈতিক চরিত্রে অনপনেয় কলঙ্ক আরোপিত হইয়াছে ; কিন্তু তাঁহার চিত্তে যে দার্ঢ্য ছিল, স্বদেশ-হিতৈষিতা ছিল, অদম্য উৎসাহ ও অক্লান্ত শ্রমশীলতা ছিল, আপন মন্ত্রণা-সভায় পরম শত্রু সদস্যগণের দ্বারা পদে পদে বাধাপ্রাপ্ত ও অপমানিত হইয়াও তিনি যে কৌশলে বৃদ্ধিপ্রাপ্তে ভারতে ইংরেজ-শক্তির ও ইংরেজ-শাসনের বিস্ময়কর উন্নতিসাধন করিয়াছিলেন, যে অসামান্য সাহসে তিনি বহিঃশত্রুনিক্ষিপ্ত বিপজ্জাল ছিন্ন করিয়া আপনাকে বারবার মুক্ত করিয়াছিলেন এবং নানা বিপত্তিমধ্যেও যে ধৈর্য্য ও গাম্ভীর্য্যগুণে তিনি আপনার পদ-গৌরব রক্ষা করিয়াছিলেন, তাহার তুলনা নাই। তাঁহার সম্বন্ধে ভারত-গভর্ণমেণ্টের সরকারী পুস্তকাগারে এবং বিলাতের ইণ্ডিয়া-কৌন্সিলের দপ্তরখানায় যে সকল অতি গোপন-কাগজ-পত্র ফরেষ্ট সাহেব সম্প্রতি প্রকাশ করিয়াছেন, আমি তাহা মনোযোগ-পূর্ব্বক পাঠ করিয়া বুঝিয়াছি যে, তিনি পুরুষসিংহ ছিলেন। মানসিক

বীর্য্যে ও প্রাখর্য্যে তাঁহাকে ভারতের চন্দ্রগুপ্ত বা অউরঙ্গজেব এবং য়ুরোপের ফ্রেডারিক বা বিস্মার্কের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। সমধিক বিস্ময়ের বিষয় আরো এই যে, এই পুরুষসিংহ তরল উপন্যাসের নায়কের ন্যায় প্রেমাতুর ছিলেন। নেপোলিয়ন যেমন প্রলয়কর রণতাণ্ডবমধ্যে বজ্রবর্ষী কামানের উপর কাগজ পাতিয়া প্রেয়সী জোসেফাইনকে প্রেমপত্রিকা লিখিতেন, ইনিও তেমনি চিত্তবিক্ষেপকারী কঠোর কর্কশ রাজকার্য্যে নিমজ্জিত থাকিয়াও দূরগত পত্নী মেরিয়া এপোলোনিয়ার উদ্দেশ্যে বিরহবিধূর-হৃদয়ের প্রলাপপদ্য রচনা করিতেন। সমালোচক বলিয়াছেন যে, রস ও লালিত্যের হিসাবে সে সকল কবিতা অপদার্থ, কিন্তু আমি বলি যে, কর্ম্মক্লান্ত দেহে ও উদ্বেগক্লান্ত মানসে নিদ্রাকে অপসারিত করিয়া দুপ্রহর রাত্রিতে তাঁহার যে যতি ও ছন্দ মিলাইয়া পদ্য লিখিবার প্রবৃত্তি হইত এবং শক্তি থাকিত ইহাই অলোকসামান্য।

মন্ত্রণা-সভায় হেষ্টিংসের যে শত্রুগণের কথা বলিয়াছি, তন্মধ্যে ফ্র্যান্সিস্ অতি বিষম ছিলেন। হেষ্টিংসের বিদ্বেষে তাঁহার হৃদয় জর্জ্জরিত ছিল। এরূপ ঘোর বিদ্বেষ সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় না। তিনি অতি তীক্ষ্ণবুদ্ধি, বাক্য-রচনাপটু ও ক্ষমতাশালী ছিলেন। সকল শত্রু অপেক্ষা হেষ্টিংস ইহাকেই অধিক ভয় করিতেন। তিনি ইহাকে তুষ্ট করিতে ও ইহার মিত্রতালাভ করিতে অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হন নাই। হেষ্টিংসের সৌভাগ্যবশতঃ অল্পকাল মধ্যে ক্ল্যাভারিঙ্গের মৃত্যু হয় এবং ইহার কিছুকাল পরে হলোয়েল কি যেন কি ভাবিয়া হেষ্টিংসের পৃষ্ঠ-পোষণ করিতে থাকেন; তখন তাঁহার অবস্থা কিঞ্চিৎ পরিমাণে সহনীয় হইয়াছিল। ১৭৭৯ খৃষ্টাব্দে পুনার মহারাষ্ট্রীয়গণের সহিত বোম্বের ইংরেজ-কর্ম্মচারিগণ অদূরদর্শীর ন্যায় যুদ্ধ বাঁধাইয়া তাহাদের হস্তে যেরূপ অপদস্থ হন, তাহা ইতিহাসজ্ঞ জানেন। হেষ্টিংস সাহেব ইংরেজের

তরবারির অপমান সংবাদ পাইয়া, উহার মলিন-গৌরব উদ্ধারের জন্য আপন মন্ত্রণাসভার সম্মতি অনুসারেই যুদ্ধস্থলে সেনা ও সেনাপতি প্রেরণ করেন এবং কয়েক মাস যুদ্ধ চালাইতে থাকেন। ফ্র্যান্সিস্ কোন বিষয়েই অনেকক্ষণ তাঁহার সহিত একমত হইতে পারিতেন না; তাঁহার কার্য্যের ছিদ্রানুসন্ধান, তাঁহার দোষ উদ্ঘাটন করা, পদে পদে তাঁহাকে বাধা দেওয়া এবং তাঁহাকে অপদস্থ করা তাঁহার জীবনের ব্রত ছিল। অনতিবিলম্বে ফ্র্যান্সিস্ হেষ্টিংসের যুদ্ধ পরিচালন-পদ্ধতির ও কার্য্যের নানাপ্রকার বিরুদ্ধ সমালোচনা করিতে লাগিলেন। তিনি কোম্পানির অনেক অর্থ অসংযতভাবে ব্যয় করিতেছেন, তাঁহার অবলম্বিত রণ-পদ্ধতি সিদ্ধির অনুপযোগী, এ যুদ্ধ অন্যায় এবং ইহা দ্বারা কখনই কোম্পানির লাভ হইতে পারে না, মন্ত্রণা-গৃহে প্রতিদিন এইরূপ অভিমত প্রকাশ করিতে লাগিলেন এবং তাঁহার প্ররোচনায় সভা হইতে তাঁহার বারম্বার কৈফিয়ৎ তলব হইতে লাগিল। হেষ্টিংস অশ্রান্তভাবে মন্তব্যের পর মন্তব্য লিখিয়া, তর্কের পর তর্ক করিয়া, একমাত্র অন্যতম সদস্য ব্যারোয়েলের সাহায্যে আপনার মত ও কার্য্য সমর্থন করিতে লাগিলেন। মন্ত্রণা-সভায় অধিকাংশ সভ্যের মতে কর্ত্তব্য-নিরূপণ হইত. প্রায় প্রত্যেক মন্ত্রণাতেই এক পক্ষে ফ্র্যান্সিস্ ও মনসুন্ থাকিতেন, অপর পক্ষে হেষ্টিংস ও ব্যারোয়েল থাকিতেন; এইরূপে মতচতুষ্টয় সমভাগে বিভক্ত হইত; তাহাতে কোন সিদ্ধান্তেই উপনীত হওয়া যাইত না। কিন্তু মন্ত্রণা-সভার সভাপতিরূপে হেষ্টিংসের আর একটি অতিরিক্ত মত ছিল, তিনি তাহা নিজ পক্ষে অর্পণ করিয়া আপনার অভিপ্রায় সাধন করিয়া লইতেন। সর্ব্বদা এইরূপে কাজ করা নিরাপদও নহে, সুখের ও নহে; এরূপ অবস্থায় সিদ্ধিও সর্ব্বদা নিশ্চিত থাকে না। যদি কদাচিৎ ব্যারোয়েল অপর পক্ষের আনুকূল্যে অভিমত প্রকাশ করিতেন, তবেই হেষ্টিংসের

পরাজয় হইত; তবেই ফ্র্যান্সিস্ তাঁহাকে পেষণ করিতেন। এই দুই প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী দুই মল্লের ন্যায় রণাঙ্গনের দুই বিপরীত প্রান্তে পরস্পরকে আক্রমণ করিবার জন্য মুষিক-লোলুপ মার্জারের ন্যায় লম্ফনোদ্যত হইয়া থাকিতেন। গর্ব্ব উভয়েরই সমান ছিল; কেহ কাহারো নিকট মস্তক অবনত করিতেন না। তবে গভর্ণর-জেনরলের পদে অধিষ্ঠিত থাকায় কোম্পানির শুভাশুভের জন্য হেষ্টিংস সর্ব্বাধিক দায়ী ছিলেন; ফ্র্যান্সিসের অপেক্ষা তাঁহার স্বদেশ-প্রেমও অনেক পরিমাণে অধিক ছিল। পাছে তাঁহার জেদে বা তাঁহার বুদ্ধিভ্রমে বা তাঁহার কার্য্যদোষে ভারতে ইংরেজ-রাজ্য ও রাজশক্তির ন্যূনতা ঘটে, ফ্র্যান্সিসের সহিত উদ্দণ্ড কলহ করিতে করিতেও এ ভয় তাঁহাকে ব্যাকুল করিত। সেইজন্য যখন মহারাষ্ট্রীয়-গণের সহিত যুদ্ধ চলিতেছিল, তখন তিনি একদিন আপন গর্ব্ব গলাধঃ-করণপূর্ব্বক সহযোগী গৃহশত্রুর নিকট মস্তক অবনত করিয়া মৈত্রী ভিক্ষা করিলেন। ফ্র্যান্সিস্ও কপট সরলতার সহিত তাঁহাকে সর্ব্ববিষয়ে সমর্থন ও সহায়তা করিতে সম্মত হইলেন। ইহার কিছুদিন পূর্ব্বে ব্যারোয়েল স্বদেশে যাইবার জন্য বিদায় লইয়াছিলেন; তাঁহার জন্য জাহাজ দুই তিন মাস ঘাটে অপেক্ষা করিতেছিল; কিন্তু তিনি গেলে মন্ত্রণাসভায় একেবারেই অসহায় হইবেন এই ভাবনায় হেষ্টিংস্ তাঁহাকে যাইতে দেন নাই। এখন পরম শত্রুর সহিত মিত্রতা হইল; তিনি আর তাঁহার বিপক্ষতা করিবেন না, এই আশ্বাস পাইয়া হেষ্টিংস্ ব্যারোয়েলকে যাইতে দিলেন। কিন্তু যেই ব্যারোয়েলের তিরোধান, অমনি ফ্র্যান্সিসের স্বমূর্ত্তিধারণ। তিনি দ্বিগুণ উৎসাহে চিরবিদ্বেষভাজনের শত্রুতাসাধন করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন হেষ্টিংস্ তাঁহার চিরাভ্যস্ত ধৈর্য্য হারাইয়া ফ্র্যান্সিস্সম্বন্ধে তাঁহার মনের কথা স্পষ্টভাষায় লিপিবদ্ধ করিলেন এবং উহা মন্ত্রণাসভায় সর্ব্ব-সমক্ষে পাঠ করাইলেন। সে মন্তব্যলিপির অনুবাদ নিম্নে দিতেছি।

সভায় উহার পাঠ-সমাপনের পর সভাভঙ্গ হইলে রোষকষায়িত-লোচন ফ্র্যান্সিস্ হেষ্টিংস্‌কে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করিলেন ; ঘোর অভিমানী হেষ্টিংসও ঐ ভীষণ আমন্ত্রণ সস্নেহে গ্রহণ করিলেন। পরদিন ১৭ই অগষ্ট তারিখে প্রাতঃকালে যুদ্ধ হইল। হেষ্টিংসের গুলি তাঁহার প্রতিপক্ষের দেহ ভেদ করে ; কিন্তু তাহাতে তাঁহার মৃত্যু হয় না। তিনি প্রায় মাসেক কালে ক্ষতমুক্ত হইয়া পুনরায় আপন কার্য্যে রত হন। যদি ফ্র্যান্সিসের গুলি হেষ্টিংসের প্রাণবায়ু বিনির্গত করিত, তবে কে জানে, ভারতবর্ষের পরবর্ত্তী ইতিহাসে অন্য কোন সফল বৃত্তান্ত বর্ণিত হইত ?

লিপিখানি এই,—

মন্ত্রণা-সভার অন্যতম সদস্য, আমার স্বদেশবাসী সহযোগী স্যর্ ফিলিপ ফ্র্যান্সিসের ব্যবহার ও কার্য্য-কলাপ দেখিয়া, তাঁহার সহায়তা ও সহানুভূতি প্রাপ্তি বিষয়ে আমি নিরাশ হইয়াছি। আর আমার মনের ভাব গোপন করিবার প্রয়োজন কি ? আজ আমি উচ্চকণ্ঠে স্পষ্টভাষায়, এই মন্ত্রণাসভায় তাঁহার চরিত্রের ব্যাখ্যা করিব। মহারাষ্ট্রীয়গণের সহিত যুদ্ধে যে যুদ্ধপদ্ধতি অনুসৃত হইতেছে, তাহার এবং সমস্ত যুদ্ধ-ব্যাপারের বিরুদ্ধে তিনি যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে আমি ক্ষুব্ধ নহি, আমার ক্ষোভের কারণ, আমার প্রতি অভিমতে, প্রতিকার্য্যে তাঁহার প্রতিদিনের নানাপ্রণালী উদ্ভাবন করিয়া আমি একে একে সে সকলই এই সভার বিচারের জন্য ইহার সমক্ষে উপস্থিত করিয়াছি ; স্যর্ ফিলিপের প্রয়োচনায় তৎসমুদায় একে একে পরিত্যক্ত হইয়াছে। তিনি যখনই যে আপত্তি করিয়াছেন, আমি আমার পরবর্ত্তী প্রচেষ্টায় এমন পথ অবলম্বন করিয়াছি যে, তাহাতে ঐ আপত্তি আর তিষ্ঠিতে পারে নাই। তথাপি আমি তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিতে পারি নাই। ডিরেক্টরগণ আমাকে গভর্ণর-জেনারলের পদে আসীন করিয়াছেন, স্যর্ ফিলিপকে

মন্ত্রণা-সভার সদস্য করিয়াছেন ; অতএব আমারও অধিকার আছে যে, এই রাজ্য-সংক্রান্ত সমস্ত কাজে নেতৃত্ব গ্রহণ করি, এবং তাঁহার পক্ষে ইহাই কর্ত্তব্য-বুদ্ধির অনুমোদিত যে, তিনি আমার সাহায্য করেন ; প্রতি পদে আমার বিরুদ্ধাচরণ করা তাঁহার উচিত নহে। মহারাষ্ট্রীয় যুদ্ধ-সম্বন্ধে আমার এতগুলি বিপদ প্রকল্পনা, তাঁহার দৃষ্টি-গোচর হইয়াছে, তথাপি আমাকে বিরক্ত করিবার জন্য তিনি আবার আমার নিকট আমার সমস্ত অভিসন্ধি পুঙ্খানুপুঙ্খ ব্যাখ্যা-সহ জানিতে চাহিয়াছেন ; অনুগ্রহ করিয়া বলিয়াছেন যে, ঐ বিবরণ তাঁহার হস্তগত হইলে তিনি সরলচিত্তে উহার যথোচিত বিচার বিবেচনা করিবেন। বিচার-বিবেচনা তাঁহার প্রকৃত-অভিপ্রায় নহে, হইলে বহুদিন পূর্ব্বেই তিনি তাহা করিতে পারিতেন ; তাঁহার অভিপ্রায়-ছলে বিলম্ব করিয়া আমার অভিপ্রায়-সিদ্ধির পথে কণ্টক ন্যস্ত করা ও আমাকে অপদস্থ করা। কিছুকাল পূর্ব্বে তিনি আমাকে পদচ্যুত করিবার চেষ্টায় বিফল মনোরথ হইয়াছেন ; এখন আমার আরব্ধ কার্য্যের দুর্গতি করিয়া সেই সূত্রে সেই মনোরথ সিদ্ধ করিবেন। আমি তাঁহার সরলতায় বিশ্বাস করি না। সরলতা তাঁহার প্রকৃতি-বিরুদ্ধ। আমার কোন কার্য্যে ভারতে বৃটিশরাজ্যের ও বৃটিশ-গৌরবের উন্নতি হইলেও যদি উহাদ্বারা তৎসঙ্গে আমার কৃতিত্বের কিঞ্চিন্মাত্রও প্রশংসা হয়, তবে তিনি প্রাণপণে ঐ কার্য্যে বাধা দেন ও দিতেছেন। তাঁহার বাধা সত্ত্বেও যদি ঐ কার্য্য এতদূর অগ্রসর হয় যে, পশ্চাৎপদ হইবার আর উপায় না থাকে, কার্য্য চলিতে থাকে; তথাপিও তিনি কণ্টক-স্থাপনে শৈথিল্য করেন না, অক্লান্ত যত্নে বিরুদ্ধ ব্যবহার করিতেই থাকেন। আমাকে বিরক্ত, বিত্রস্ত, উন্মাদগ্রস্ত না করিলে তাঁহার মনে শান্তি হয় না। আমার প্রত্যেক আশা তাঁহার দ্বারা নৈরাশ্যে পরিণত এবং প্রত্যেক নিরাশা তাঁহার ব্যবহারে অধিকতর দুঃখদায়ক

হইয়া থাকে। আমার বিপক্ষে যাহার একটি কথাও বলিবার আছে, তাহার নিমিত্ত তাঁহার দ্বার সর্ব্বদাই উন্মুক্ত এবং তাঁহার সেই কথাটির ধ্বনি ও প্রতিধ্বনি তিনি সহস্র কর্ণে গ্রাস করেন। তিনি আমার সুখের মাত্রা লাঘব এবং দুঃখের ভার গুরুতর করিতে সতত যত্নশীল। তিনি একাগ্র চেষ্টায় বুঝাইতে চাহিতেছেন যে, আমারই দোষে আমাদের সেনাসমূহ সমরাঙ্গনে দলে দলে বিনষ্ট হইতেছে এবং অবশিষ্টেরা আহারাভাবে মৃত্যুমুখ; যে আমারই দোষে প্রতিবৎসর কোম্পানির আয়ের হ্রাস এবং ধনকোষের খর্ব্বতা সংঘটিত হইতেছে, এ সকল কথা সমস্তই মিথ্যা। তবে আমাকে ইহাও বলিতে হয় যে, আমাদের গৃহে এরূপ অনৈক্য থাকিলে, যাঁহারা রাজ্যের নেতা ও কর্ত্তা তাঁহাদের পরস্পরের মধ্যে এরূপ অহি-নকুলভাব আর কিছুদিন পোষিত হইলে রণক্ষেত্রে আমাদের চিরবিজয়ী সেনা বিজিত ও বিনষ্ট হইবে এবং তাহারা অনাহারে মরিবে, রাজ্যের আয় কমিয়া যাইবে ও ধনাগার শূন্য হইবে।

আমি শুর্ ফিলিপের প্রতি যে সকল কু-অভিপ্রায় আরোপ করিলাম, তিনি হয়তো সে সকল অস্বীকার করিবেন; কেন না, তিনি জানেন যে, অভিপ্রায়ের অকাট্য প্রমাণ দেওয়া কঠিন। তিনি হয়তো বলিবেন যে, তিনি কি অভিসন্ধিতে কি কাজ করিয়াছেন তাহা তিনি যেমন জানেন, তেমন আর কেহ জানিতে পারে না; অতএব আমার দ্বারা তাঁহার এ অভিসন্ধির ব্যাখ্যা আমার পক্ষে ধৃষ্টতা এবং অন্যায়; এবং প্রতিশোধ তুলিবার জন্য তিনি আমার অভিপ্রায়গুলির যথেচ্ছ বিশ্লেষণ করিতে পারেন। আমার পক্ষে আমার চিরদিনের চরিত্রই প্রধান সাক্ষ্য; উহাই আমার আত্মরক্ষার অবলম্বন। তবে আমার কু-অভিপ্রায়ের এমন কোন দৃষ্টান্ত যদি থাকে যাহা ফ্র্যান্সিস্ জানেন, আমি জানি না, তবে তিনি উহা স্বচ্ছন্দে এই সভায় প্রকাশ করিতে পারেন।

তিনি আমার সহিত মিত্রতার ভাণ করিয়া মধুর-বাক্যে কত আশ্বাস দিয়াছিলেন, সেই আশ্বাস-বাক্যে বিশ্বাস করিয়া আমি আমার একমাত্র সহায় ও হিতৈষী বন্ধু ব্যারোয়েলকে বিদায় দিই। আমি তাঁহার উপর কতদূর বিশ্বাস-স্থাপন করিয়াছিলাম আমার এই কার্য্যই তাহার বিশিষ্ট প্রমাণ। যদি তাঁহার বিন্দুমাত্রও আত্মসম্মানবোধ থাকিত, যে তাঁহাকে প্রত্যয় করিয়া তাঁহার সহায়তার আশায় অন্য আশ্রয় পরিত্যাগ করিয়াছে তাহার প্রতি সম্মানাভিমানীর কিরূপ অনুকম্পা করা উচিত সে বোধের লেশমাত্রও যদি তাঁহার থাকিত, তবে এই লিপি লিখিয়া আজ আমাকে আমার লেখনী কলঙ্কিত করিতে হইত না।

মন্ত্রণা-সভায় ফিলিপ ফ্র্যান্সিস্ যে অসচ্চরিত্র প্রকটন করিতেছেন, তাহা অন্যত্র অন্যান্য সকল বিষয়ে তাঁহার চরিত্রের অনুরূপ। উহার উপাদানে সত্য নাই, মহত্ব নাই—মানাস্পদ কিছুই নাই। আমার এই কথা অতি কঠোর। কিন্তু আমি স্থিরচিত্তে বিশেষ বিবেচনা করিয়া ইহা বলিলাম। ইহার চরিত্রের জঘন্যতা সংযতভাষায় প্রকাশ করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও ইহার কম বলা অসম্ভব হইল। ভবিষ্যত ঐতিহাসিককে সত্যজ্ঞাপনার্থে, আমার নিজের প্রতি সুবিচারার্থে, এবং ভারতবর্ষে ইংরেজের এই তরুণ রাজ্যের কল্যাণার্থে আমি ফিলিপ-ফ্র্যান্সিসের চরিত্রের দোষ এইরূপে উদ্ঘাটন করিলাম। দেশের আইন যে দোষের দণ্ডবিধান করিতে পারে না, লোকচক্ষুরসমক্ষে উদ্ঘাটন করিয়া তাহার কৌৎসিত্য প্রদর্শন করাই তাহার একমাত্র শাস্তি।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ নিয়োগী

ভারতে পর্ত্তুগীজ

ইতিহাসাতীত যুগ হইতেই য়ুরোপের সহিত ভারতের বাণিজ্য-বিনিময় অব্যাহত-ভাবে চলিয়া আসিতেছে,—ইহা বর্ত্তমান সময়ে একরূপ অবিসম্বাদিত সত্য এবং আধুনিক যুগের প্রায় সকল সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিকই ইহা নতমস্তকে স্বীকার করিয়া লইতে প্রস্তুত।

১৮৬১ খৃঃ অব্দে ইংলণ্ডের অন্তঃপাতী কোন গ্রামে একখানি তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হয়। উক্ত তাম্রশাসন পাঠে আমরা জানিতে পারি যে খৃঃ পূর্ব্ব প্রায় সার্দ্ধ-দ্বিসহস্র বৎসর পূর্ব্বে ভারতীয় বণিক্‌গণ বাণিজ্য-ব্যপদেশে ইংলণ্ডে গমনাগমন করিতেন (১)।

খৃষ্ট-জন্মের প্রায় দুইশত বৎসর পূর্ব্বে ভারতীয় নাবিকগণ ভারতীয় পণ্য-সম্ভার লইয়া জম্মাণদেশে গমনাগমন করিতেন,—ইহাও তদ্দেশবাসিগণেরই উক্তি (২)।

ইতিহাসাতীত যুগ হইতে ভারতীয় বণিক্‌গণ অন্যান্য পণ্য-সম্ভারের সহিত য়ুরোপের অতি প্রয়োজনীয় নীল লইয়া জলপথে পারস্য-উপসাগর উত্তীর্ণ হইয়া স্থলপথে য়ুরোপে গমন করিত,—বীকম্যান (Beckman) প্রভৃতি স্বনামধন্য ঐতিহাসিকবর্গ এ মতের পরিপোষক (৩)।

খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে কুশনবংশীয় নরপতি ক্যাড্‌ফাইসিস্ দ্বিতীয় (Kadphisis II) ব্যাক্‌ট্রিয়া প্রদেশে রাজত্ব করিতেছিলেন। তৎকালে

---

(১) Asiatic Researches.

(২) 'যবদ্বীপে হিন্দু' হিতবাদী, চৈত্র, ১৩১৯।

(৩) Johnston's translation of Beekman's History of Inventions and Discoveries.

উক্ত সাম্রাজ্য সিন্ধুনদের দক্ষিণতট হইতে পারস্যের পূর্ব্বপ্রান্ত পর্য্যন্ত প্রসারিত ছিল। রোম-সাম্রাজ্যও তখন পারস্যের পশ্চিমপ্রান্ত পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। কোন কোন লব্ধপ্রতিষ্ঠ ঐতিহাসিক মনে করেন, সাম্রাজ্য-দ্বয়ের এবম্প্রকার নৈকট্য উভয়ের মধ্যে বাণিজ্য-বিনিময় সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে সহায়তা করিয়াছিল।

এদেশ হইতে য়ুরোপে তখন নানাপ্রকার বেণেমস্‌লা, মূল্যবান্ প্রস্তর, নীল, কার্পাসসূত্র এবং অন্যান্য আবশ্যকীয় দ্রব্য প্রেরিত হইত।

এই সমস্ত অত্যাবশ্যকীয় সামগ্রী-সম্ভারের পরিবর্ত্তে আমাদের পূর্ব্ব-পুরুষগণ আনয়ন করিতেন শুধু মুদ্রা। ইহা হইতে কেহ কেহ অনুমান করেন যে, বর্ত্তমানকালে দারিদ্র্য-পীড়িত ভারতবর্ষ যেমন আপন আবশ্যকীয় দ্রব্যের নিমিত্ত বৈদেশিক বণিক্‌গণের মুখাপেক্ষী, প্রাচীন কালে য়ুরোপও সেইরূপ সর্ব্বপ্রকার প্রয়োজনীয় সামগ্রী-সম্ভারের জন্য 'নিলিখ-শরণা' ভারতভূমির মুখাপেক্ষী ছিল।

ফাহিয়ানের ভারত-ভ্রমণ পাঠে আমরা জানিতে পারি যে, ভারতীয় নাবিকগণ মিশর হইতে ভূমধ্যসাগর অতিক্রমপূর্ব্বক য়ুরোপেব নানা স্থানে বাণিজ্য করিত।

খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দী হইতে বাণিজ্যের প্রাচীন ধাবা একটু পরিবর্ত্তিত হইল। আমরা এই সময়ে আরবগণকে য়ুরোপ ও ভারতের মধ্যবর্ত্তী (Intermediate) হইয়া বাণিজ্য করিতে দেখিয়াছি।

প্রাগুক্ত শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতে আরব বণিক্‌গণ দলে-দলে আগমন করতঃ কালীকটে উপনিবেশ স্থাপন করিতে লাগিল। তাহাদের মধ্যে যে সম্প্রদায় বাণিজ্য-প্রতিযোগিতায় অপর সম্প্রদায়গুলিকে পরাভূত করিয়াছিল; সেই সম্প্রদায়ই সাধারণ্যে 'মপলাই' নামে অভিহিত হইত। ভবিষ্যতে এই মপলাইগণই সমস্ত দক্ষিণ-ভারতে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল।

আরবদিগের আগমনকালে কালীকট দক্ষিণ-ভারতের সর্ব্বপ্রধান বাণিজ্য-কেন্দ্র ছিল। তথায় নানাস্থান হইতে বাণিজ্যব্রত বণিক্-সম্প্রদায় আসিয়া বাস করিত। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য-সম্ভার কালীকটে আহৃত হইয়া জলপথে আফ্রিকা, য়ুরোপ প্রভৃতি মহাদেশে প্রেরিত হইত। পর্ত্তুগীজগণের উন্নতি-অবনতির লীলাক্ষেত্র কালীকট, আজিও কত শত বৎসরের পর, তাহাদের অবিনশ্বর স্মৃতি বক্ষে ধারণ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। তাহাদের শত অমানুষ অত্যাচারেও কালীকট আপনার অস্তিত্ব হারাইয়া ফেলে নাই!!

নীলনদীর মোহনাস্থিত আলেকজান্দ্রিয়া নগর তখন প্রাচ্য-প্রতীচ্য-বাণিজ্য-বিনিময়ের কেন্দ্রস্থল ছিল। এই স্থানে একদিকে যেমন য়ুরোপ হইতে তদ্দেশীয় পণ্য আনীত হইত; অন্যদিকেও সেইরূপ এদেশ হইতেও এতদ্দেশীয় পণ্য প্রেরিত হইত। মপলাইগণ কালীকট হইতে সুলভ মূল্যে এতদ্দেশীয় পণ্য ক্রয় করিয়া আলেকজান্দ্রিয়া নগরীতে পূর্ব্ব-য়ুরোপের নিকট তৎসমুদায় অধিকতর মূল্যে বিক্রয় করিত। পূর্ব্ব-য়ুরোপের বণিক্‌গণ আলেকজান্দ্রিয়া নগরীতে যে সমুদায় দ্রব্য বিক্রয় করিতে আনয়ন করিত, মপলাইগণ কর্ত্তৃক তাহা কালীকটে আনীত হইয়া ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে প্রেরিত হইত।

এই যুগে কালীকট হইতে য়ুরোপে স্বর্ণ, তাম্র, পারদ, নীল, রেশম, বহুমূল্য প্রস্তর, গজদন্ত, কৌস্তুবী প্রভৃতি প্রেরিত হইত। পূর্ব্ব-য়ুরোপের বণিক্‌গণ এই সমুদায় দ্রব্য আরও অধিকতর মূল্যে পশ্চিম-য়ুরোপের নিকট বিক্রয় করিত। ভারত ও য়ুরোপের মধ্যে সপ্তম শতাব্দীতে, এইরূপে অপ্রত্যক্ষ (Indirect) বাণিজ্যের সূত্রপাত হইয়াছিল।

আরব-বণিক্‌গণ দুইভাবে বাণিজ্য করিতেছিল। প্রথমতঃ পারস্য, আফগানিস্থান, এশিয়া-মাইনরের মধ্য দিয়া স্থলপথে—দ্বিতীয়তঃ আরব-

সাগর, লোহিতসাগর অতিক্রম করিয়া মিশরের মাঝখান দিয়া ভূমধ্যসাগর উত্তীর্ণ হইয়া জলপথে।

খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ভারতীয় নাবিকগণ পণ্য-পরিপূর্ণ তরণী লইয়া য়ুরোপে বাণিজ্য করিতে যাইত, কিন্তু য়ুরোপীয় বণিক্‌গণ তখনও ভারতে বাণিজ্য করিতে আগমন করে নাই। খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর পর হইত পণ্য-পুরিপূর্ণ রোমক-তরণী সপ্তগ্রাম প্রভৃতি বন্দরে দৃষ্ট হইত—ইহা অনেকেই অবগত আছেন।

সপ্তম শতাব্দীর পূর্ব্বে যে সমুদায় য়ুরোপবাসী ভারতবর্ষে পদার্পণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের কেহ বা অদম্য বিজয়-বাসনা চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত, আর কেহ বা নদী-নির্ঝর-শোভিতা বর্ষীয়সী ভারতের অপর্য্যাপ্ত শোভা-সম্পদ্ সন্দর্শন করিবার জন্য।

এই সমস্ত অতৃপ্ত বিজিগীষু ও স্বেচ্ছাপর্য্যাটকগণ স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া ভারতের অতুল ঐশ্বর্য্য ও অপরিচিত শোভাসম্পদের কাহিনী প্রচার করিতেন।

যাহা হউক, খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে আরবীয়-বণিক্‌গণ যখন এশিয়া ও য়ুরোপীয় বাণিজ্যে আপনাদের একাধিপত্য বিস্তার করিতেছিল, তখন পর্য্যাটক-মুখে ভারতের অতুল ঐশ্বর্য্যের কাহিণী শ্রবণ করিয়া বর্দ্ধিত-বাসন পশ্চিম-য়ুরোপীয় বণিক্‌গণের অন্তঃকরণে, ভারতের সহিত প্রত্যক্ষ-বাণিজ্য-সংস্থাপনের অত্যুচ্চ আশা ধীরে ধীরে জাগিয়া উঠিতেছিল।

ভারতের অতুল ঐশ্বর্য্য, কালীকটের বাণিজ্য-বহুলতা তাহাদিগকে ভারতের সহিত প্রত্যক্ষভাবে বাণিজ্য করিবার জন্য চুম্বকের মত আকর্ষণ করিতে লাগিল। এই দুর্নিবার আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া, পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে, দুঃসাহসী পর্ত্তুগীজগণ পর্ব্বতপ্রমাণ অন্তরায়ের সম্মুখীন হইয়াও

ভারত-অন্বেষণে বহির্গত হইয়াছিল, এবং বার-বার বিফল-মনোরথ হইলেও অসীম ধৈর্য্য-সহকারে সর্ব্বপ্রথম ভারতের পথ আবিষ্কার করিতে সমর্থ হইয়াছিল।

ভারতের বিপুল ঐশ্বর্য্য ও বাণিজ্য-বহুলতার কথা অবগত হইয়া বাণিজ্য-লিপ্সু পর্ত্তুগীজগণ যখন ভারতে আগমন করিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিল, তখন অলক্ষিতে তাহাদিগের সম্মুখে একটি বিপুল বিঘ্ন আসিয়া দণ্ডায়মান হইল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে আরবীয় বণিক্‌গণ বাণিজ্যে আপনাদিগের একাধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল। স্থল-পথেই হউক আর জলপথেই হউক, তাহাদের অপরিসীম প্রভুত্ব চূর্ণ করিতে না পারিলে, তাহাদের সর্ব্বোন্নত মস্তক অবনত করিতে না পারিলে, পর্ত্তুগীজগণ ভারতের সহিত প্রত্যক্ষভাবে বাণিজ্য করিতে পারিবে না, ইহা তাহারা সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিল।

পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে আরব ও তুর্কীর বণিক্‌গণ সম্মিলিত হইয়া ভারত ও য়ুরোপের বাণিজ্যপথ অবরুদ্ধ করিয়াছিল। য়ুরোপীয় বণিক্‌গণ ইহাতে যথেষ্ট হতবুদ্ধি হইয়া পড়িল, তাহাদের বহুকাল সঞ্চিত উচ্চ-আশার মূলে কুঠারাঘাত হইল।

দুঃসাহসী পর্ত্তুগীজগণ ইহাতে হতবুদ্ধি হইয়া পড়িল ও ভারতের সহিত প্রত্যক্ষভাবে বাণিজ্য করিবার আশায় জলাঞ্জলি দিতে পারিল না। সমুদ্র-পথে অনাবিষ্কৃত নূতন পথ আবিষ্কার করিয়া, ভারতের সহিত প্রত্যক্ষ বাণিজ্যের জন্য পর্ত্তুগীজগণ কৃতসংকল্প হইল।

কলম্বসের জন্মের পূর্ব্বে, ১৪১৫ খৃঃ অব্দে পর্ত্তুগ্যালের রাজকুমার হেন্‌রী ভারত-অন্বেষণে আগমন করিয়া আফ্রিকার পশ্চিম উপকূলে উপনীত হয়েন এবং এই স্থান হইতেই তিনি আফ্রিকার সর্ব্বদক্ষিণ অন্তরীপে গমন করিবার পন্থা নিরূপণ করিয়াছিলেন। তাঁহার দৃঢ়বিশ্বাস ছিল যে

একবার আফ্রিকার বিস্তীর্ণ ভূভাগ উত্তীর্ণ হইতে পারিলে ভারত-গমনের পথ সুগম হইবে।

হেন্‌রীর পর অলঞ্জো (Alonzo V) এবং তৎপর দ্বিতীয় জন (John II) স্বর্ণপ্রসূ ভারতভূমি আবিষ্কার করিবার জন্য অনন্য-সাধারণ চেষ্টা করিয়াছিলেন। অর্থের অসচ্ছলতা হেতু পর্ত্তুগ্যাল-নরপতি দ্বিতীয় জন অংশীদার জুটাইবার আশায় ঘোষণা করিলেন যে, যদি কেহ ভারত-অভিযানে অংশীদার হইতে ইচ্ছা করেন, তবে তাহাকে উপযুক্ত অর্থ, সৈন্য ও জলযান দ্বারা সাহায্য করিতে হইবে। অংশীদার না হইলে কেহই ভারত-বাণিজ্যের অংশ গ্রহণ করিতে পারিবেন না।

দ্বিতীয় জনের সকাতর অনুনয় অরণ্য-রোদনে পরিণত হইল। কেহই তাঁহার ঘোষণা-পত্র বিশ্বাসের সহিত গ্রহণ করিতে পারিলেন না। নিরুপায় জন ইহাতেও পশ্চাদ্‌পদ হইলেন না। তাঁহার অন্তরে ভারত-আবিষ্কারের যে অদম্য-আশা মুকুলিত হইয়া উঠিয়াছিল, তাহা তাঁহাকে কিছুতেই নিরস্ত হইতে দিল না। পোপের (Pope) নিকট হইতে সনন্দ গ্রহণ করিয়া এক বিরাট অভিযানের আয়োজন কবিলেন। ডিগো (Diego Cam) এই অভিযানের অধিনায়কত্ব গ্রহণ করিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তিনি আফ্রিকার পশ্চিম-দক্ষিণ প্রান্ত হইতেই প্রত্যাবর্ত্তন করিতে বাধ্য হইলেন।

ইহাতেও জন হতোদ্যম হইয়া পড়িলেন না, বরং অধিকতর অধ্যবসায়ের সহিত পুনর্ব্বার বিপুল আয়োজন করিয়া বারথোলেমো উইয়াজ (Bartholemo Wiaz) নামক কোন সাহসী পর্ত্তুগীজকে ১৪৮৫ খৃঃ অব্দে ভারত-সন্ধানে প্রেরণ করিলেন। বারথোলেমো ডিগোর পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া ১৪৮৬ অব্দে আফ্রিকার দক্ষিণ উপকূল পর্য্যন্ত আগমন করিয়াছিলেন। এই স্থানে দৈব তাহার প্রতিকূল হইল,—অবিচ্ছিন্ন বারিবর্ষণ ও প্রবল বাত্যায় বারথোলেমোর জলযানগুলি বিধ্বস্ত হইতে লাগিল। এই

দুর্দিনে নাবিকগণ অপরিজ্ঞাত সাগরে জলযান চালনা করিতে অসম্মত হইল। নিতান্ত অনিচ্ছায় নিরুপায় বারথোলেমো স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে বাধ্য হইলেন। প্রবল-বাত্যা বিতাড়িত হইয়া ভগ্নাশ ও হতোদ্যম বারথোলেমো যে অন্তরীপ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন, তিনি তাহাকে 'Cape of Storms' নামে অভিহিত করেন।

বারথোলেমোর ব্যর্থ অভিযানের এক বৎসর পরে, ১৪৮৭ খৃঃ অব্দে Covilham নামক কোন দুঃসাহসী পর্ত্তুগীজ বীর অশেষ বিপৎপাত ও প্রবল অন্তরায় পদদলিত করিয়া স্থলপথে পারস্য-উপসাগরের পশ্চিম প্রান্ত পর্য্যন্ত আগমন করেন এবং তথা হইতে আরবীয় অর্ণবপোতে আরোহণ করিয়া কালীকটে উপনীত হয়েন। কেহ কেহ বলেন Covilham ডিগোর অধিনায়কত্বে আফ্রিকার পশ্চিম উপকূল পর্য্যন্ত আগমন করিয়াছিলেন। তাহার পর ডিগো (Diego Cam) যখন ভারতীয়-ভৈষজ্য-বিক্রেতৃ ভেনিস বণিকগণের অনুসন্ধানার্থ লোক প্রেরণ করেন, তখন কভিলহাম (*Pedro de Covilham*) বহু পরিশ্রমে ও অক্লান্ত অনুসন্ধানে ঐশ্বর্য্যময় ভারতের উর্ব্বর সৈকতে উপনীত হয়েন। যাহা হউক, আমরা বহু অনুসন্ধানেও তাহার ঘটনা-বহুল জীবনের লুপ্তকাহিনী উদ্ঘাটিত করিতে পারি নাই।

পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতে পর্ত্তুগীজগণ ভারত-অন্বেষণের জন্য যে অক্লান্ত চেষ্টা ও বিপুল আয়োজন করিতেছিল, তাহার ফলে উক্ত শতাব্দীর শেষভাগে তাহারা আফ্রিকার স্বর্ণ-উপকূলের সহিত মৃদু মন্দ-ভাবে বাণিজ্য করিতে আরম্ভ করিয়াছিল।

কভিলহামের ভারত-আগমনের পাঁচ বৎসর পরে, ১৪৯২ খৃঃ অব্দে খৃষ্টোফার কলম্বস্ (Christopher Colombus) স্পেনের জাতীয় পতাকা উড্ডীয়মান করিয়া ভারত-অন্বেষণে বহির্গত হইয়াছিলেন। এই

অভিযানের ফলে স্বর্ণপ্রসূ ভারত-ভূমি আবিষ্কৃত না হইলেও সম্পূর্ণ এক অভিনব মহাদেশ আবিষ্কৃত হইয়াছিল। বিপুল আনন্দে ও বিজয়োল্লাসে কলম্বসের ফলপ্রসূ প্রত্যাবর্ত্তন অভিনন্দিত হইল।

কলম্বসের সার্থক অভিযানের পাঁচ বৎসর পরে, ১৪৯৭ খৃঃ অব্দে এনামুয়েল (Enamuel) পর্ত্তুগীজরাজ-সিংহাসনে অধিরূঢ় হইলেন। রাজ-সিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়া ভারতবর্ষের সহিত প্রত্যক্ষ বাণিজ্য-সংস্থাপন করিবার জন্য তিনখানি জলযান সুসজ্জিত করিয়া তিনি যে বিরাট-অভিযানের আয়োজন করিলেন, ভাস্কোদাগামা (Vascodegama) নামক একজন বিচক্ষণ পর্ত্তুগীজ বীরপুরুষকে তাহার নেতৃত্বপদে বরণ করা হইয়াছিল। ১৪৯৭ খৃঃ অব্দে লিসবন্ হইতে যাত্রা করিয়া ভাস্কোদা-গামা বহু কষ্টে আফ্রিকার দক্ষিণ উপকূলে আসিয়া উপনীত হইলেন। বারথোলেমো ভগ্নাশ হইয়া আফ্রিকার যে উপকূল হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, সেই অন্তরীপে আগমন করিয়া গামার আশার সঞ্চার হইল। তিনি তথায় কতকগুলি ভারতীয় বণিকের সাক্ষাৎ লাভ করেন এবং তাহাদের নিকট হইতে ভারতসম্বন্ধীয় অনেক তথ্যের আবিষ্কার করিয়া কৃতজ্ঞতার নিদর্শনস্বরূপ 'Cape of Storm' নাম পরিবর্ত্তিত করিয়া উহাকে উত্তমাশা বা Cape of Goodhope নামে অভিহিত করেন। আজি প্রায় চারি শতাব্দী পরেও উহা ঐ নামেই অভিহিত হইয়া বিশ্ব-সমক্ষে গামার অসমসাহসের অপূর্ব্বকাহিনী স্মরণ করাইয়া দিতেছে।

উত্তমাশা অন্তরীপ হইতে উত্তর-পূর্ব্বাভিমুখে যাত্রা করিয়া ১৪৯৮ খৃঃ অব্দের ২০শে মে তারিখ গামা কালীকটে উপনীত হইলেন। আশাহীন কার্য্যে (desperate services) নিযুক্ত করিবার নিমিত্ত গামার সহিত একজন লোক ছিল। কালীকটে উপনীত হইয়া গামা তাহাকে

উপকূলে প্রেরণ করেন। কিন্তু এতদ্দেশীয় ভাষা হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারায়, উক্ত লোকটী বন্দী হইয়া টিউনিসের (Tunis) কোন মুর-ভবনে নীত হইল। গৃহ-স্বামী স্পেন ও পর্তুগ্যালের ভাষায় বিলক্ষণ কথোপকথন করিতে পারিতেন। তিনি গামার জলযানের সমীপবর্ত্তী হইয়া আপনার তরণী হইতে পর্তুগীজ ভাষায় চীৎকার করিয়া বলিলেন,— 'আপনাদের সৌভাগ্যবশতঃই আপনারা এই মণিমুক্তাগড়া ভারতে পদার্পণ করিয়াছেন। বেনেমশলা ও ভৈষজ্যদ্রব্য, বহু মূল্য প্রস্তর ও মণিমুক্তা এবং জগতের যাবতীয় ঐশ্বর্য্যের আকরভূমি এই ভারতবর্ষে পদার্পণহেতু আপনারা জগৎপিতা পরমেশ্বরকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতাজ্ঞাপন করুন।' দ্বিভাষীর (Interpreter) সহিত এই সাক্ষাৎকারে পর্তুগীজগণের অন্তঃকরণ বিপুল পুলকে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল! তাহারা অকূল সমুদ্রে কূল পাইলেন!!

গামা মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্ব না করিয়া স্থানীয় শাসনকর্ত্তা জামোরীণের নিকট আপনাদের আগমন-সংবাদ প্রেরণ করিলেন। তিনি তখন রাজধানী হইতে কিয়দ্দূরে অবস্থান করিতেছিলেন। ইত্যবসরে গামা কোন নিরাপদ স্থানে আপনাদের জলযানগুলি 'নঙ্গর' করিলেন।

২৮শে মে দ্বাদশ জন অনুচর পরিবৃত হইয়া গামা জামোরীণদর্শনে যাত্রা করিলেন। 'পাল্কী' আরোহণ করিয়াও বৃহৎ জনতা-পরিবেষ্টিত হইয়া গামা উৎকণ্ঠ-চিত্তে জামোরীণের রাজধানী পনিয়ানিতে (Poniany) উপনীত হইলেন। জামোরীণের অতুল-ঐশ্বর্য্য, অপর্য্যাপ্ত ধন-সম্পদ এবং চাকচিক্যময় হর্ম্ম্যাবলী সন্দর্শন করিয়া গামা ও তাঁহার অনুচরবর্গ বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইল!

আদর-আপ্যায়ন সমাপ্ত হইলে গামা ও তাঁহার অনুচরবর্গ একটি নির্জ্জনগৃহে জামোরীণের সহিত সাক্ষাৎকার করিয়া সবিস্তারে আপনাদের

আগমনের কারণ বিবৃত করিলেন। জামোরীণও ঔৎসুক্য ও আনন্দের সহিত তাঁহাদের বিবরণ শ্রবণ করিতে লাগিলেন।

পরদিবস পর্ত্তুগীজগণ জামোরীণকে চারিখানি রক্তবস্ত্র, ছয়টি টুপী, চারিটি প্রবাল, কতকগুলি ব্রাস, একবস্তা চিনি, দুই পিপা তৈল এবং এক পিপা মধু উপঢৌকন প্রদান করিলেন। জামোরীণের অতুল-ঐশ্বর্য্যের নিকট এ উপহার নিতান্ত তুচ্ছ হইলেও তিনি অত্যন্ত সন্তুষ্টচিত্তে বিদেশীর উপঢৌকন গ্রহণ করিয়াছিলেন।

পর্ত্তুগ্যাল-নরপতি জামোরীণের নিকট কয়েকখানি পত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন। পত্রগুলির মধ্যে একখানি আরবীয় ভাষায় লিখিত হইয়াছিল। জামোরীণ তাহা সসম্ভ্রমে গ্রহণ করিয়া গামাকে বাণিজ্য করিবার আদেশ প্রদান করিলেন।

যে মপলাই-বণিক্‌গণ কালীকটের বাণিজ্যে আপনাদিগের একাধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল, তাহাদিগেরই সহিত পর্ত্তুগীজগণের প্রথম কোন্দল আরব্ধ হইল। পর্ত্তুগীজগণকে আপনাদের বিপুল স্বার্থের বিষম অন্তরায় মনে করিয়া তাহারা জামোরীণের নিকট তাহাদিগের বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করিল—তাহাদিগকে নানাপ্রকারে উৎপীড়ন করিতে লাগিল।

মপলাইদিগের অত্যাচারে কালীকট বিপৎসঙ্কুল মনে করিয়া গামা-প্রমুখ পর্ত্তুগীজগণ আপনাদিগের স্বদেশজাত নগণ্য পণ্যদ্রব্যের বিনিময়ে বহুমূল্য ভারতীয় পণ্যসম্ভার সংগ্রহ করিয়া অদ্ধবৎসর অবস্থানের পর কালীকট পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। কোন কোন ঐতি-হাসিক বলেন যে, কালীকট পরিত্যাগ করিবার পূর্ব্বে মপলাইগণকর্ত্তৃক গামাকে কঠোর যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইয়াছিল। অনুকূল সমীরণসংযোগে গামা ১৪৯৯ খৃঃ অব্দের সেপ্টেম্বর মাসে স্বদেশে উপনীত হইয়াছিলেন। জামোরীণ গামার সহিত পর্ত্তুগীজ নরপতির নিকট একখানি পত্র প্রেরণ

করিয়াছিলেন। অনেক ঐতিহাসিকের বিশ্বাস, জামোরীণের অত্যাচারেই গামা এদেশ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। প্রাগুক্ত পত্রপাঠে পাঠকের সে বিশ্বাস অপনোদিত হইবে, এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া আমরা পত্রখানি উদ্ধৃত করিবার প্রলোভন সংবরণ করিতে পারিলাম না। পত্রখানি এইরূপ,—'Vasco de Gama, a nobleman of your household has visited my kingdom and has given me great pleasure In my kingdom, there is abundance of cinnomon, cloves, ginger, pepper and precious stones what I seek from thy kingdom is gold, silver, coral and scarlet' অর্থাৎ 'আপনাদের দেশের, ভাস্কোদাগামা নামক জনৈক সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক আমার সাম্রাজ্য পরিদর্শন করিয়া আমাকে বিমল আনন্দ প্রদান করিয়াছেন। আমাদের দেশে দারুচিনি, লবঙ্গ, আদা, লঙ্কা, বহুমূল্য প্রস্তর প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। আমি আপনাদিগের দেশ হইতে স্বর্ণ, রৌপ্য, প্রবাল ও রক্তবর্ণ চাই।'

লিসবন্ নগরে কলম্বসের প্রত্যাগমন যেমন মহাসমারোহে অভিনন্দিত হইয়াছিল, গামার প্রত্যাগমনও সেইরূপ বিপুল উৎসব ও জাতীয় বিজয়-উল্লাসে সুসম্পন্ন হইল। স্পেন-পর্ত্তুগালের দিগ্‌দিগন্তে আনন্দধ্বনি পড়িয়া গেল। পর্ত্তুগীজগণ ভারতে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার অলীক-কল্পনায় আত্মহারা হইয়া উঠিল।

গামা স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়া ভারতের সম্পদ্ ও ঐশ্বর্য্যের কাহিনী বর্ণনা করিয়া স্বদেশবাসিগণের হৃদয়ে অদম্য ঔৎসুক্য জাগাইয়া দিল। ইহার পর নবনব অভিযানে ভারতের পথ সুগম ও সহজসাধ্য হইয়া আসিল।

গামার স্বদেশে প্রত্যাগমনের পর বৎসর ফিরিতে না ফিরিতে রাজ্য-

লিপ্স্ পর্ত্তুগীজগণ পুনর্ব্বার এক বিরাট্ অভিযানের আয়োজন করিয়া পিদ্রো অলভেরেস কেব্রাল (Pedro Alvares Cabral) নামক জনৈক সাহসী ও বুদ্ধিমান পর্ত্তুগীজ বীরকে উহার নেতৃত্বপদে বরণ করিলেন। ত্রয়োদশখানি অর্ণবপোতে দ্বাদশশত সৈন্য লইয়া কেব্রাল ১৫০০ খৃঃ অব্দের ৯ই মার্চ্চ ভারতঅভিমুখে যাত্রা করিলেন। ডিগো ও বার-থোলেমো এবার কেব্রালের সঙ্গীরূপে আসিয়াছিলেন।

প্রতিকূল-পবনে বিতাড়িত হইয়া কেব্রাল ব্রাজিল আবিষ্কার করিলেন। এই স্থানে প্রবল-বাত্যায় বারথোলেমোর জলযানখানি আরোহী সমেত নিমজ্জিত হইল। প্রবল-বাত্যার অবসানে অবশিষ্ট জলযানগুলি অনুকূল বায়ুর সাহায্যে মেলিন্দায় (Melinda) আগমন করিয়া 'নঙ্গর' করিল। এই স্থান হইতে গুজরাট-নাবিকগণের পরিচালনায় পর্ত্তুগীজগণ ১৩ই সেপ্টেম্বর তারিখে কালীকটে আসিয়া উপনীত হইল।

গামা স্বদেশে প্রত্যাগমন করিবার সময় গোয়ার জলযানগুলির উপর অমানুষিক অত্যাচার করিয়া যান। মপলাইগণের প্ররোচনায় ও গামার কৃতঘ্নতায় জামোরীণ এবার আর পর্ত্তুগীজদিগকে আশ্রয় প্রদান করিতে সাহসী হইলেন না। মপলাইগণ একদিন সকলের অজ্ঞাতসারে পর্ত্তুগীজ-গণের কালীকটস্থিত কুঠী আক্রমণ করিয়া গুপ্তভাবে তাহার অধ্যক্ষ কোরিয়া (Ayres Correa)-কে নিহত করিয়া যায়।

ক্রুদ্ধ কেব্রাল ভয়ানকভাবে ইহার প্রতিশোধ লইয়াছিলেন। তিনি মপলাইগণের দশখানি জলযান অধিকার করিয়া, সমস্ত দ্রব্যসম্ভার আপনা-দের জলযানে স্থানান্তরিত করেন ও তাহাদের অর্ণবপোতগুলি অগ্নি-প্রয়োগে ভস্মীভূত করিয়া ফেলেন। ইহার পর তিনি অনর্গল গোলাবর্ষণে নগরটির ধ্বংস-সাধন করিয়া কোচীন-অভিমুখে পলায়ন করেন।

কোচীনে পর্ত্তুগীজগণ সসম্ভ্রমে অভ্যর্থিত হইল। বাণিজ্যের জন্য সে

স্থানে তাহাদিগকে বিশেষ বেগ পাইতে হয় নাই। ইতোমধ্যে জামোরীণ পঞ্চদশ সহস্র সৈন্ত সমেত ২৫।৩০ খানি জলযান সুসজ্জিত করিয়া কেব্রালের বিরুদ্ধে প্রেরণ করিলেন।

কেব্রাল কোচীন হইতে ক্যানানোর (Cannanore) অভিমুখে পলায়ন করিলেন এবং তথায় এতদ্দেশীয় দ্রব্যসম্ভারে আপনাদের জলযান-গুলি পরিপূর্ণ করিয়া ১৫০১ খৃঃ ৩১শে জুলাই স্বদেশে উপনীত হইলেন।

কেব্রালের স্বদেশে পদার্পণের পূর্ব্বেই তিনখানি জলযান নুয়েভার (Juan de Nueva) অধিনায়কত্বে ভারত অভিমুখে যাত্রা করিয়া গোয়ার নিকটবর্ত্তী অঞ্চিদ্বীপে (Anchideva) প্রবেশ করে, এবং তথা হইতে পুনর্ব্বার যাত্রা করিয়া কোচীনে উপনীত হইল। কোচীনরাজ কোচীনস্থিত পর্ত্তুগীজগণের সহিত সদয় ব্যবহার করিতেছিলেন, ক্যানানোর-অধিপতিও নুয়েভাকে ধারে লঙ্কা, লবঙ্গ প্রভৃতি আপন দ্রব্য-সম্ভার প্রদান করিয়া তৎপ্রতি সহানুভূতির পরিচয় প্রদান করিয়া-ছিলেন।

জামোরীণ তখনও গামা ও কেব্রালের অপ্রত্যাশিত ব্যবহার ভুলিতে পারেন নাই। তাঁহার অন্তর নিরন্তরই প্রতিহিংসানলে দগ্ধ হইতেছিল। কোচীনে নুয়েভার সৌভাগ্য-সূত্রপাত অবলোকন করিয়া তিনি তাঁহার বিরুদ্ধে এক বিপুল বাহিনী প্রেরণ করেন। নুয়েভার সাহসী ও সুশিক্ষিত সৈন্যের নিকট জামোরীণ-সৈন্য পরাজিত হইল। ইহার পর জামোরীণ নুয়েভাকে আপন প্রাসাদে নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইলেন। বিশ্বাসঘাতকতার ভয়ে নুয়েভা নিমন্ত্রণ-গ্রহণে অসম্মত হইলেন এবং জল-যানগুলি এতদ্দেশীয় দ্রব্যসম্ভারে পূর্ণ করিয়া য়ুরোপ অভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

নুয়েভার স্বদেশপ্রত্যাগমনে পর্ত্তুগীজগণ ভারতের ঐশ্বর্য্য ও রাজ-

শক্তির সঠিক সংবাদ প্রাপ্ত হইল। ভারত হইতে মুসলমানগণের বাণিজ্য সমূলে উৎপাটিত করিয়া পর্ত্তুগীজবাণিজ্যের প্রতিষ্ঠা করাই পর্ত্তুগীজ বণিক্‌গণের একান্ত ইচ্ছা ছিল, এবং তাহারা ইহাও সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিল যে, পূর্ব্ব-অপেক্ষা বৃহৎ বৃহৎ অভিযান প্রেরিত না হইলে মুসলমান-বাণিজ্যের উচ্ছেদসাধন করা যাইবে না।

এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া পর্ত্তুগাল-নরপতি বিংশতি অর্ণবপোত-সংযোগে এক বিপুল নৌদল সংগৃহীত করিয়া কেব্রালকে উহার অধিনায়কত্বে বরণ করিতে চাহিলেন। কিন্তু কেব্রাল অসম্মত হওয়ায় গামা ঐ পদ গ্রহণ করিলেন এবং স্বীয় অনুজ ষ্টিফেন, (Stiphen) ও ভিন্সেণ্টোব (Vincento) সহিত সংমিলিত হইয়া ভারত-অভিমুখে ধাবমান হইলেন।

আফ্রিকার উপকূলে বাণিজ্যকুঠী সংস্থাপন করিয়া, এই সমস্ত জল-যান মেলিন্দায় একত্রিত হইল। যখন তাহারা ক্যানানোরের নিকটবর্ত্তী হইয়াছে, তখন একখানি মুসলমান অর্ণবপোত অগণিত মক্কাযাত্রী লইয়া মক্কা যাইতেছিল। দুর্দ্ধর্ষ পর্ত্তুগীজগণ অদ্ভুত রণ-কৌশলে ও বিপুল পরাক্রমে মুসলমান জলযানখানি অধিকার করিল। মক্কাযাত্রী মুসলমান-গণের উপর যে বিষম অত্যাচার অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহা সহজে বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না। শিশুযাত্রিদিগকে বন্দী করিয়া পর্ত্তুগীজ জল-যানে প্রেরণ করা হইল। পর্ত্তুগীজগণের অত্যাচারে তাহারা খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষা গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিল। বন্দী যাত্রী ও নাবিকগণকে মুসল-মান অর্ণবপোতে অবরুদ্ধ করিয়া অগ্নিসংযোগে ভস্মীভূত করা হইল। হায়, ধর্ম্মনিষ্ঠ মুসলমানগণের অন্তিম অভিশাপেই বুঝি এত শীঘ্র ভারত হইতে পর্ত্তুগীজগণের প্রভুত্ব বিলুপ্ত হইয়াছিল।

দুইশত ধর্ম্মনিষ্ঠ মুসলমানকে অগ্নিদগ্ধ করিয়া গামা, কালীকট উচ্ছেদ-

সাধন-মানসে ক্যানানোর ও কোচীনের নরপতি ও কুইনলনের সাম্রাজ্ঞীর সহিত সংমিলিত হইয়া কালীকট অভিমুখে ধাবিত হইলেন।

কালীকটের নিকটবর্ত্তী স্থান হইতে কতকগুলি ধীবরকে বন্দী করিয়া গামা জামোরীণের নিকট সংবাদ প্রেরণ করিলেন যে, যদি তাহাদিগকে কালীকটে উপনিবেশ স্থাপন করিবার অনুমতি প্রদান না করা হয়, তবে অচিরেই বন্দীদিগকে নিষ্ঠুরতার সহিত নিহত করা হইবে। জামোরীণের নিকট হইতে উত্তর আসিবার প্রতীক্ষা না করিয়াই গামা বন্দী ধীবর-দিগকে নিহত করিলেন এবং তাহাদের ছিন্নমস্তক ও ছিন্ন চরণ জামোরীণ-সকাশে প্রেরণ করিলেন। ইহার পর তিনি অগ্নি-সংযোগে নগর ভস্মীভূত করিলেন, অধিবাসিগণের যথাসর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিলেন এবং মুসলমান বাণিজ্য-তরণী সকল করায়ত্ত করিয়া কোচীন অভিমুখে পলায়ন করিলেন।

বিবাদ নিষ্পত্তি করিবার জন্য জামোরীণ গামাকে আহ্বান করিয়া পাঠাইলেন। অর্দ্ধপথে জামোরীণের বিশ্বাসঘাতকতা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়া গামা ১৫০৩ খৃঃ অব্দের ২০শে ডিসেম্বর য়ুরোপ-অভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

য়ুরোপে প্রত্যাগমন করিবার পূর্ব্বেই তিনি কোচীন ও ক্যানানোর নরপতিগণের সহিত বন্ধুত্ব-সূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন এবং ভিন্সেণ্টোকে কোচীন ক্যানানোরস্থিত পর্ত্তুগীজ বাণিজ্যকুঠীর অধ্যক্ষরূপে নিযুক্ত করিয়াছিলেন।

গামার পলায়নে সুযোগ বুঝিয়া, জামোরীণ কোচীনরাজ্যের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিলেন এবং পর্ত্তুগীজগণকে আপনার হস্তে অর্পণ করিতে আদেশ প্রদান করিলেন। কোচীনরাজ অদম্য উৎসাহে যুদ্ধ করিলেন। ভিন্সেণ্টো আপনার সৈন্য-সামন্ত লইয়া সমুদ্রবক্ষে অবস্থান করিতেছিলেন, তিনি কোন পক্ষে যোগ দেওয়া অভিপ্রেত মনে করিলেন না। ইতোমধ্যে

আলবুকার্ক (Alonzo Albuquerque) ফ্রানসিস্কো (Fransisco) এবং আণ্টোনিয়া নামক তিনজন দুর্দ্ধর্ষ পর্ত্তুগীজের অধিনায়কত্বে ৯ খানি সৈন্য-পরিপূর্ণ জলযান আসিয়া যুদ্ধস্থানে উপস্থিত হইল। পর্ত্তুগীজ-সৈন্যের আগমনে হতাশ-কোচীনরাজ ট্র্যাম্পারার (Triampara) অন্তঃকরণে আশার সঞ্চার হইল। জামোরীণের সৈন্য পর্ত্তুগীজগণের প্রচণ্ড আক্রমণ-সহ্য করিতে পারিল না। জামোরীণ পরাজিত হইয়া সন্ধি করিতে বাধ্য হইলেন।

পর্ত্তুগীজগণের ব্যবহারে সন্তুষ্ট হইয়া কোচিন-রাজ তাহাদিগকে দুর্গ নির্ম্মাণ করিতে আদেশ প্রদান করিলেন। এই আদেশ অনুসারে পর্ত্তুগীজগণ কুইনলনে (Quinlon) একটী সুরক্ষিত ও অভেদ্য কুঠী নির্ম্মাণ করিলেন।

এই সময়ে পেচিকো (Duarte *Pacheco*) নামক কোন সাহসী পর্ত্তুগীজকে কোচীন-কুঠীতে স্থাপন করিয়া আলবুকার্ক প্রভৃতি পর্ত্তুগীজ-বীরগণ স্বদেশাভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

সুযোগ বুঝিয়া জামোরীণ ৫০,০০০ সৈন্য সমভিব্যাহারে কোচিন আক্রমণ করিলেন। কোচীনরাজ প্রমাদ গণিলেন! তাঁহার সমস্ত আশা-ভরসা অন্তর্হিত হইল!!

এই দুর্দ্দিনে পেচিকো আপনার অলৌকিক বীরত্বের প্রকৃষ্ট পরিচয় প্রদান করিলেন। অল্পমাত্র সৈন্য লইয়া পেচিকো জামোরীণের বিপুল বাহিনী পরাজিত করিলেন। হতাবশিষ্ট ৩২০০০ সৈন্য লইয়া জামোরীণ পলায়ন করিলেন।

ইতোমধ্যে ত্রয়োদশখানি জলযানের অধিনায়করূপে সোয়ারেজ (Lope Soarez) কালীকট অবরোধ করিলেন, আপনার সমস্ত প্রার্থনা পূর্ণ করাইয়া লইলেন।

ইহার পর জামোরীণের সপ্তদশখানি অর্ণবযান বলপূর্ব্বক কাড়িয়া লইয়া সোয়ারেজ ১৫০৬ খৃঃ ২২শে জুলাই য়ুরোপ অভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

১৫০৭ খৃঃ ফ্রান্সিস আলমিডা (Don Franseis Almeida) ভারতের রাজপ্রতিনিধিরূপে দ্বাবিংশখানি অর্ণবযান ও পঞ্চদশসহস্র সৈন্যের অধিনায়করূপে ভারত-অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

গোয়ার নিকটবর্ত্তী অঞ্জিদ্বীপে একটী সুরক্ষিত দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া, ট্র্যাম্পারার জন্য রত্নখচিত স্বর্ণময়-রাজমুকুট লইয়া তিনি কোচীন অভিমুখে ধাবমান হইলেন। কোচীনরাজ ট্র্যাম্পারা রাজকার্য্য হইতে ইতোমধ্যে অবসর গ্রহণ করিয়াছিলেন। তৎস্থানে তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র অভিষিক্ত হইয়াছিলেন।

অকস্মাৎ আসন্ন বিপদে পর্ত্তুগীজগণের ভাগ্য-গগন মেঘাচ্ছন্ন হইল। সমস্ত দেশীয় রাজন্যবৃন্দ সংমিলিত হইয়া পর্ত্তুগীজদিগের উচ্ছেদ-সাধনে বদ্ধপরিকর হইলেন। চৌলের (Choule) নিকট উভয়-পক্ষীয় সৈন্যের সংঘর্ষ হইল। একশত নাবিক সমভিব্যাহারে পর্ত্তুগীজ-সেনাপতি আলমিডা (Lorengo Almeida—Franseisএর পুত্র) দেশীয় রাজন্যবৃন্দের হস্তে বন্দী ও নিহত হইলেন। পর্ত্তুগীজগণের সৌভাগ্য-রবি ক্ষণকালের জন্য মেঘম্লান হইল !!

১৫০৯ খৃঃ ২রা ফেব্রুয়ারী পর্ত্তুগীজগণের সহিত মিসরবাসী ও মপলাইগণের সহিত ডিউ দ্বীপের নিকট এক বিষম যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এই যুদ্ধে মপলাইগণ ও মিসরবাসিগণ সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত ও পরাজিত হইয়াছিল।

ইহার পর আলবুকার্ক পর্ত্তুগীজ-ভারতের শাসনকর্ত্তা হইয়া আসিলেন। ইহার সময় পর্ত্তুগীজ-ভারত উন্নতির অত্যুচ্চ সীমায় আরোহণ করিয়াছিল।

১৫০৯ খৃঃ অব্দে কণ্টিনহো (Marshal Don Fernando Continho) কালীকট আক্রমণ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার মনোরথ সিদ্ধ হয় নাই। কণ্টিনহোর ব্যর্থ আক্রমণ সার্থক করিবার অভিপ্রায়ে আলবুকার্ক এ বৎসরই তিন সহস্র সৈন্য লইয়া কালীকট আক্রমণ করিলেন। পর্ত্তুগীজ-সৈন্যগণ অগ্নিসংযোগে নগরটী ধ্বংসীভূত করিয়া ফেলিল। জামোরীণের ঐশ্বর্য্যপরিপূর্ণ রাজপ্রাসাদ লুণ্ঠিত হইল। উপায়ান্তর না দেখিয়া জামোরীণ পলায়নপর নায়র-সৈন্য একত্র করিয়া হুহুঙ্কারে শত্রুসৈন্যের উপর পড়িল। রণোন্মত্ত দুর্দ্ধর্ষ নায়র-সৈন্যগণের সম্মুখে পর্ত্তুগীজগণ স্থির থাকিতে পারিল না। আলবুকার্ক স্বয়ং গুরুতর-রূপে আহত হইলেন। পর্ত্তুগীজ-সৈন্যগণ ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে লাগিল।

১৫১১ খৃঃ অব্দে ইস্‌মাইল আদিলখাঁর সুযোগ্য সেনাপতি কমল খাঁ গোয়া অধিকার করেন। গোয়ার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য ও বাণিজ্যের উপ-কারিতা হৃদয়ঙ্গম করিয়া আলবুকার্ক উহা পুনর্গ্রহণ করিতে মনস্থ করেন।

এইরূপ মনস্থ করিয়া আলবুকার্ক অকস্মাৎ একদিন অগণিত সৈন্য-সমভিব্যাহারে গোয়া অবরোধ ও অধিকার করিলেন। ইহার অল্পদিন পরেই তিনি গোয়াকে পর্ত্তুগীজ-ভারতের রাজধানী বলিয়া ঘোষণা করিলেন। চারিশত বৎসর পর আজিও গোয়া পর্ত্তুগীজ-ভারতের রাজধানীরূপে বিদ্যমান থাকিয়া আলবুকার্কের কীর্ত্তি উদ্‌ঘোষিত করিতেছে।

১৫১৪ খৃঃ অব্দে আলবুকার্ক অরমজ্ (Ormoz) অধিকার করেন ও তথায় একটী সুদৃঢ় দুর্গ নির্ম্মাণ করেন।

অরমজ অধিকারের এক বৎসর পরে ১৫১৫ খৃঃ অব্দের ১৬ই ডিসেম্বর আলবুকার্ক মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন।

আলবুকার্ক আপনার অসাধারণ বীরত্বে ও অধ্যবসায়ে স্বজাতির গৌরব বর্দ্ধিত করিয়াছিলেন—ভারতমহাসাগরে পর্ত্তুগীজ-প্রভুত্ব বিস্তৃত করিয়াছিলেন।

আলবুকার্কের পরবর্ত্তী শাসনকর্ত্তা সোয়ারেজ (Lopé Sourez) আদন অধিকার করিবার নিমিত্ত একদল সৈন্য পরিচালনা করেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তাহার চেষ্টা সার্থক হয় নাই।

১৫১৭ খৃঃ অব্দে ফার্ণাণ্ডো (Fernando *Perez* de Andrada) কাণ্টনে উপনীত হইয়া চীনের সহিত য়ুরোপের প্রথম বাণিজ্য-সম্বন্ধ সংস্থাপিত করেন।

১৫২১ খৃঃ অব্দে ডিগো লোপেজ (Diego Lopez) চল্লিশখানি জলযান ও ৩০০০ সৈন্য লইয়া ডিউ দ্বীপ-অভিমুখে গমন করেন। ডিউ দ্বীপে উপনীত হইয়া তিনি তত্রস্থ শাসনকর্ত্তার নিকট একটী দুর্গ নির্ম্মাণ করিবার আদেশ প্রার্থনা করিলেন, কিন্তু প্রত্যাখ্যাত হইয়া যখন ফিরিয়া আসিতেছিলেন, তখন মালিক ইয়াজ নামক জনৈক সাহসী সেনাপতি তাঁহার নিকট হইতে একখানি জলযান কাড়িয়া লয়েন।

১৫২৪ খৃঃ অব্দে গামা তৃতীয়বার পর্ত্তুগীজ-ভারতের শাসনকর্ত্তা হইয়া আসিলেন, কিন্তু মাত্র তিনমাসকাল শাসন করিবার পর কোচানে দেহত্যাগ করেন।

১৫০০ খৃঃ অব্দ হইতে ১৬০০ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত পর্ত্তুগীজগণ এশিয়ার বাণিজ্যে সম্পূর্ণরূপে একাধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল। 'তাহারা জাপান হইতে উত্তমাশা অন্তরীপ পর্য্যন্ত ভূভাগের একমাত্র শাসনকর্ত্তা ছিলেন।'

প্রাচ্যমহাদেশে তাহাদের এইরূপ বিপুল প্রভাব পরিলক্ষিত হইলেও এরূপ বিস্তৃত সাম্রাজ্য রক্ষা করিবার জন্য যে অপরাজেয় রাজশক্তি এবং

নৈতিক-চরিত্রের প্রয়োজন, তাহা তাহাদিগের ছিল না। খৃষ্টান-ধর্ম্মে তাহাদিগের অবিচল রক্ষণশীলতা বিধর্ম্মীদিগকে তাহাদের শত্রুরূপে পরিগণিত করিয়াছিল। যাঁহারা পর্ত্তুগীজ-ভারতের তাৎকালিক ইতিবৃত্ত অধ্যয়ন করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন, পর্ত্তুগীজগণ কিরূপ কুসংস্কারাপন্ন ও নিষ্ঠুর ছিল। তাহাদিগের নির্ম্মম নিষ্ঠুরতায় ভারত-ইতিহাসের কত পৃষ্ঠা যে মসী-নিন্দিত হইয়া রহিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। পর্ত্তুগীজ-শাসনকর্ত্তৃগণের মধ্যে একমাত্র আলবুকার্কই এদেশবাসিগণের মঙ্গল-সাধনে তৎপর ছিলেন। একমাত্র তিনিই দেশীয় নরপতিগণের সহিত সখ্যতা সংস্থাপন করিয়াছিলেন। তাঁহার ন্যায়পরায়ণতা ও সুবিচারে রাজ্যলক্ষ্মী একদিকে যেমন তাঁহাকে কৃপা করিতেন, তাঁহার অতুলনীয় সাহস ও প্রোজ্জ্বল প্রতিভায় বিজয়-লক্ষ্মীও তেমনই তাঁহার কণ্ঠদেশে জয়মাল্য পরাইয়া দিয়াছিলেন। পর্ত্তুগীজগণের মধ্যে একমাত্র তিনিই এদেশবাসিগণের আন্তরিক প্রীতি আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। গোয়ার হিন্দুগণ এমন কি মুসলমানগণও আলবুকার্কের মৃত্যুর পর তাঁহার জীর্ণ সমাধির পুনঃসংস্কার করিয়া যথার্থ কৃতজ্ঞতার পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন। আলবুকার্কের অযোগ্য উত্তরাধিকারী শাসনকর্ত্তৃগণ যখন গোয়ার হিন্দু-মুসলমানগণের উপর নির্য্যাতন করিতেছিলেন, তখন তাহারা তাহাদিগের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবার নিমিত্ত আলবুকার্কের সমাধি-মন্দির-দুয়ারে নতজানু হইয়া ভগবান্‌কে প্রাণ ভরিয়া ডাকিত।

আলবুকার্কের উত্তরাধিকারিগণের মধ্যে যে সকলেই অযোগ্য উৎপীড়ক মাত্র ছিল—এমন কথা কেহ জোর করিয়া বলিতে পারে না। তাহাদিগের মধ্যেও কেহ কেহ ভারত-আকাশে সমুজ্জ্বল নক্ষত্রের ন্যায় প্রতিভাত হইত।

নুনো (Nuno da Cunho) ১৫২৪ খৃঃ অব্দ হইতে ১৫৩৮ খৃঃ অব্দ

পর্য্যন্ত পর্ত্তুগীজ-ভারতের শাসনকর্ত্তার পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তাহারই সময় পর্ত্তুগীজ-বণিক্‌গণ সর্ব্বপ্রথম বঙ্গদেশে বাণিজ্য করিবার জন্য গমন করে এবং রীতিমতভাবে বঙ্গদেশের সহিত বাণিজ্য করিতে প্রবৃত্ত হয়। এই সময়ে একটী বিশেষ ঘটনায় পর্ত্তুগীজগণের ভাগ্য-গগন সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিল। এবং এই ঘটনায় বঙ্গদেশে তাহাদের প্রতিপত্তি সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

পর্ত্তুগীজগণ যখন বঙ্গদেশে পদার্পণ করিল, তখন বিজয়লক্ষ্মীর অনুগ্রহ-ভাজন সেরশাহ ধীরে ধীরে মস্তক উন্নত করিয়া দাঁড়াইতেছিলেন। অদ্ভুত-কর্ম্মা ও অনন্য-সাধারণ যোদ্ধা সেরশাহ যখন সদলবলে বঙ্গদেশ আক্রমণ করিলেন, তখন বঙ্গদেশের আফ্‌গানবংশীয় স্বাধীন নরপতি বড়ই প্রমাদ গণিলেন।

তিনি পূর্ব্ব হইতেই পর্ত্তুগীজগণের সাহসিকতা ও বীরত্বের-কাহিনী অবগত ছিলেন। এ দুর্দ্দিনে পর্ত্তুগীজগণের শরণাপন্ন হওয়া অপেক্ষা তিনি আর কোন উপায় দেখিলেন না। পর্ত্তুগীজগণও এ স্বর্ণসুযোগ পরিত্যাগ করিল না। তাহারা অচিরে বঙ্গাধিপের সাহায্যার্থ ৫০০ সৈন্য প্রেরণ করিল। পর্ত্তুগীজদিগের কৃপায় বঙ্গেশ সে যাত্রা অব্যাহতি লাভ করিলেন।

কৃতজ্ঞতার নিদর্শনস্বরূপ বঙ্গেশ পর্ত্তুগীজগণকে বঙ্গের কতিপয় স্থানে বাণিজ্যাবাস নির্ম্মাণ করিবার অনুমতি প্রদান করিলেন। এই আদেশ-অনুসারে বঙ্গদেশের যে সমুদায় স্থানে বাণিজ্যাবাস নির্ম্মিত হইয়াছিল, হুগলি তাহাদিগের অন্যতম।

যাহা হউক, ক্যাষ্ট্রো (Joao de Castro) মৃত্যুর পর পর্ত্তুগীজ-ভারতের শাসনকর্ত্তা হইয়া আসিলেন। তিনি ১৫৪৫ খৃঃ অব্দ হইতে ১৫৪৮ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত এদেশে অবস্থান করিয়াছিলেন। আলবুকার্ক ও

সুনোর ন্যায় তাঁহার যশঃসৌরভও পর্ত্তুগীজভারতের দিগ্‌দিগন্তে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল। ক্যাষ্ট্রো ডিওদ্বীপ পর্ত্তুগীজগণের শাসনাধীন করিয়াছিলেন। তিনি গুজরাট-সুলতানের নিকট হইতে কৃতকার্য্যতার সহিত গোয়া নগর রক্ষা করিয়াছিলেন।

ক্যাষ্ট্রো যে শুধু একজন দুর্দ্ধর্ষ সৈনিকমাত্র ছিলেন তাহা নহে, তিনি পর্ত্তুগীজশাসনপদ্ধতি সংস্কার করিবার জন্যও যথাসাধ্য প্রয়াস পাইয়াছিলেন। জোয়াও ডি ক্যাষ্ট্রোর অন্তর্দ্ধানের সঙ্গেসঙ্গেই ব্র্যাগাঞ্জা (Constantino de Braganza) পর্ত্তুগীজ-ভারতের সর্ব্বময় শাসনকর্ত্তা হইয়া এদেশে আগমন করিলেন। তিনি রাজ-পরিবারের অন্তর্ভুক্ত। ক্যাষ্ট্রো যে কার্য্য-সম্পাদনে অসমর্থ হইয়াছিলেন, ব্র্যাগাঞ্জা স্বীয় প্রজ্ঞাবলে তাহা সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়াছিলেন।

দমন-বিজয়ে ব্র্যাগঞ্জার অমর যশঃ সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া রহিয়াছে। আজিও 'দমন' পর্ত্তুগীজ ভারতের অন্যতম রাজ্যরূপে বিদ্যমান থাকিয়া বিজয়ী ব্র্যাগাঞ্জার অমরকীর্ত্তি উদ্‌ঘোষিত করিতেছে।

ব্র্যাগাঞ্জার পর এথেড্ (Luis de Athaide) পর্ত্তুগীজ ভারতের শাসন-কর্ত্তা হইয়া আসিলেন। তিনি দুইবার প্রতিনিধির পদে নিযুক্ত ছিলেন। প্রথমবার ১৫৬৮ খৃঃ অব্দ হইতে ১৫৭১ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত। দ্বিতীয়বার ১৫৭৮ খৃঃ অব্দ হইতে ১৫৮১ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত।

তাঁহার প্রথমবার শাসনকালে তিনি কোন বৃহৎ-সন্ধি-ব্যাপারে বিজড়িত ছিলেন।

১৫৬৫ খৃঃ অব্দে বিজয়-নগরের হিন্দুরাজ মুসলমানগণের নিকট সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হয়েন। বিজয়-লক্ষ্মীর বরমাল্য লাভ করিয়া মুসলমানগণ পর্ত্তুগীজগণের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিতে লাগিলেন। অচিনের অর্দ্ধ-অসভ্য রাজাও এই ষড়যন্ত্রে যোগদান করিয়াছিলেন।

মালাক্কা এবং মালাবর-কূলের সমুদায় পর্ত্তুগীজউপনিবেশ মুসলমান-গণের বিপুল-বাহিনীকর্ত্তৃক অবরুদ্ধ হইল। অসীম সাহসে দুঃসাহসী পর্ত্তুগীজ-সেনাপতিগণ তাহাদেব সম্মুখীন হইয়া তাহাদিগকে পরাজিত করিতে লাগিলেন।

১৫৭০ খৃঃ অব্দে পর্ত্তুগীজ-রাজপ্রতিনিধি দশমাস কাল ধরিয়া বিজাপুর নৃপতির নিকট হইতে গোয়া রক্ষা করেন। ভারতের অশিক্ষিত সৈন্যগণ যুদ্ধ-বিশারদ পর্ত্তুগীজ সৈন্যগণেব নিকট পুনঃপুনঃ পরাজিত ও বিধ্বস্ত হইতে লাগিল।

মালক্কায় দুইশত মাত্র পর্ত্তুগীজ-সৈন্য গোলাবারুদের সাহায্যে ১৫০০০ পঞ্চদশ সহস্র ভারতীয় সৈন্যকে পবাজিত করে। ১৫৭৮ খৃঃ অব্দে মালাক্কা পুনর্ব্বার অচিনরাজকর্ত্তৃক অবরুদ্ধ হয়, কিন্তু সে যাত্রাও অত্যল্পসংখ্যক পর্ত্তুগীজসৈন্য দশসহস্র অচিনসৈন্য পরাজিত করিয়া তাহাদের সমস্ত গোলাবারুদ কাড়িয়া লইল। ১৬১৫ ও ১৬২৮ খৃঃ অব্দে মালক্কা অচিনরাজকর্ত্তৃক আরও দুইবার আক্রান্ত হইয়াছিল, কিন্তু দুইবারই তাহারা পর্ত্তুগীজ-সৈন্যগণেব নিকট পরাজয় স্বীকাব করিতে বাধ্য হইয়াছিল।

১৫৮০ খৃঃ অব্দে দ্বিতীয় ফিলিপের সময় পর্ত্তুগাজ রাজসিংহাসন স্পেন-রাজসিংহাসনের সহিত সংযুক্ত হয়। এই সময় হইতেই পর্ত্তুগাজগণের বাণিজ্য-প্রাধান্য ক্রমশঃ হ্রাস পাইতে থাকে। ওলন্দাজ, ইংরেজ প্রভৃতি স্পেনের শত্রু পর্ত্তুগীজ-বাণিজ্যতরণী আক্রমণ ও লুণ্ঠন করিতে লাগিল।

যাহা হউক, ১৬৪০ খৃঃ অব্দে পর্ত্তুগীজ-রাজ-সিংহাসন পুনর্ব্বার পৃথক্ হইল, ইতোমধ্যে ওলন্দাজ, ইংরেজ প্রভৃতি য়ুরোপের অন্যান্য জাতি ভারতে প্রবেশ লাভ করিয়াছিল। নবাগতদিগের সহিত প্রতিযোগিতায় পর্ত্তুগীজগণ আর পারিয়া উঠিতেছিল না। তাহাদের দৃপ্ত উৎসাহ ও

অদম্য উদ্যমে 'ঘুণ' ধরিয়াছিল। নবাগতদিগের অপরাজেয় প্রতিযোগিতার সম্মুখে উৎসাহশূন্য পর্ত্তুগীজদিগের ভারতীয় সাম্রাজ্য তপ্ত-মরুভূমিতে বারি-বিন্দুর মত দেখিতে দেখিতে মিলাইয়া গেল।

১৫৯০ খৃঃ অব্দ হইতে ১৬১০ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত পর্ত্তুগীজগণের চরম-উন্নতির যুগ। ইহার পর হইতে তাহাদিগের শক্তি ক্রমশঃ হ্রাস পাইতে থাকে।

সপ্তদশ শতাব্দীর কিঞ্চিদধিক প্রারম্ভে পর্ত্তুগীজগণ নির্ব্বুদ্ধিতাবশতঃ সম্রাট্ সাজাহানের বিরক্তি উৎপাদন করিল। ক্রুদ্ধ সম্রাট্ পর্ত্তুগীজদিগকে বঙ্গদেশ হইতে বিতাড়িত করিতে আদেশ প্রদান করিলেন। তাঁহার আদেশ প্রতিপালিত হইতে মুহূর্ত্তমাত্রও বিলম্ব হইল না। বঙ্গদেশের বাণিজ্যজীবী মুসলমানগণ পর্ত্তুগীজগণের উপর প্রথম হইতে বিদ্বেষ পোষণ করিত। এই সুযোগে তাহারাও সম্রাট্‌সৈন্যগণের সহিত যোগদান করিল।

একে তো পর্ত্তুগীজগণ, ইংরেজ, ওলন্দাজ প্রভৃতি য়ুরোপীয় বণিক্-গণের সহিত প্রতিযোগিতায় হীনবল হইয়া পড়িতেছিল, তাহার উপর সাজাহানের এই নির্ম্মম আদেশে তাহারা হতবুদ্ধি হইয়া পড়িল। শত্রুর আক্রমণ প্রতিরোধ করিবার তাহাদের আর সামর্থ্য ছিল না। অবিলম্বে সাজাহানের আদেশ প্রতিপালিত হইল—বঙ্গদেশের বণিক্-সম্প্রদায় হইতে পর্ত্তুগীজ বণিক্‌গণের নাম চিরকালের জন্য মুছিয়া গেল! হায়, যদি তাহারা সাজাহানকর্ত্তৃক বিতাড়িত হইয়া চিরকালের জন্য বঙ্গদেশ পরিত্যাগ করিত, তবে হয়ত তাৎকালিক বঙ্গবাসিগণকে নির্ম্মমভাবে নিপীড়িত হইতে হইত না, তবে হয়ত নিঃসহায় বাঙ্গালীদিগকে ফিরিঙ্গি-গণের দারুণ অত্যাচার হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য আত্মহত্যা প্রভৃতি ঘৃণিত কার্য্যে লিপ্ত হইতে হইত না!!

সাজাহানকর্ত্তৃক বঙ্গদেশ হইতে বিতাড়িত হইয়া পর্ত্তুগীজগণ চিরকালের জন্য এদেশ পরিত্যাগ করিল না। যাহারা পর্ব্বতপ্রমাণ অন্তরায় পদদলিত করিয়া, অলঙ্ঘ্য সিন্ধু লঙ্ঘন করিয়া সুদূর ভারতে বাণিজ্যের জন্য আগমন করিয়াছিল, তাহারা সামান্য কারণে ভারত পরিত্যাগ করিতে পারে না। বঙ্গদেশ হইতে বিতাড়িত হইয়া তাহারা চট্টগ্রাম, আরাকান, প্রভৃতি নিম্ন-বঙ্গে আশ্রয় গ্রহণ করিল এবং জীবিকাসংস্থান করিবার জন্য দলে-দলে জলপথে দস্যুতা করিয়া বেড়াইতে লাগিল।

বার্ণিয়ার, টেভার্ণিয়ার প্রভৃতি তদানীন্তন পরিব্রাজকের ভ্রমণ-বৃত্তান্ত পাঠে আমরা জানিতে পারি যে, পর্ত্তুগীজ জলদস্যুগণের দারুণ অত্যাচারে লোকের ধনপ্রাণ নিরাপদ ছিল না। তাহারা অতর্কিত আক্রমণে এদেশবাসীর ধনপ্রাণ বিপন্ন করিত, টাকা-কড়ি লুণ্ঠন করিত, ঘরবাড়ী জ্বালাইয়া দিত। তাহাদের অত্যাচারে প্রকৃতির রম্যকানন, শ্যামল-শস্য সমাচ্ছন্ন পল্লী-জননী শ্মশানের বিভীষিকায় পরিণত হইত।

পর্ত্তুগীজ জলদস্যুগণ পূর্ণবয়স্ক পুরুষ ও অল্পবয়স্ক বালকদিগকে বলপূর্ব্বক ধরিয়া লইত এবং দাঁড় টানিবার নিমিত্ত আপনাদের দলভুক্ত করিয়া লইত। তাহারা সতীর সতীত্বনাশ করিত, সম্মানার সম্মান ক্ষুণ্ণ করিত। কখনও বা তাহারা আপনাদিগেরই মধ্যে পরস্পর মারামারি কাটাকাটি করিত, পুরোহিতদিগকে নিষ্ঠুররূপে নিহত করিত। স্বজাতি ও স্বধর্ম্মীর রক্তে আপনাদিগের হস্ত কলঙ্কিত করিত। দস্যুতা, লুণ্ঠন, পরপীড়ন প্রভৃতি ঘৃণিত কার্য্যই তাহাদিগের জীবিকা ছিল।

কখনও কখনও পর্ত্তুগীজ জলদস্যুগণ আরাকানের মগগণের সহিত মিলিত হইয়া নদীতে নদীতে বিচরণ করিত, নদীপার্শ্বস্থিত গ্রাম্য অধিবাসিগণের বিপণি-শ্রেণী লুণ্ঠন করিত, উৎসবাদি ভাঙ্গিয়া দিত, কর্ম্মচারিগণের উপর দারুণ অত্যাচার করিত। কখনও বা তাহারা পরিবারের

পুরুষগণকে নিষ্ঠুরভাবে নিহত করিয়া স্ত্রীলোকগণকে বন্দী করিয়া লইয়া যাইত। এইরূপ বন্দীকৃত স্ত্রীলোকগণকে কখনও বা তাহারা স্থানীয় বিপণিতে বিক্রয় করিত আর কখনও বা গোয়ার পর্ত্তুগীজগণের নিকট বিক্রয় করিয়া হৃদয়হীনতার পরিচয় প্রদান করিত। এই সমুদয় পর্ত্তুগীজ জলদস্যুগণের নিমিত্ত সুন্দরবনের নিকটবর্ত্তী মনোরম দ্বীপাবলী জনশূন্য হইয়া পড়িয়া থাকিত।

কবিকঙ্কণ চণ্ডী এক স্থানে পর্ত্তুগীজ জলদস্যুদিগের স্পষ্টতঃই উল্লেখ করিয়াছেন, যথা,—

"ফিরাঙ্গির দেশ খান বাহে কর্ণধারে।
রাত্রিতে বাহিয়া যায় হরমাদের ডরে॥"*

বার্ণিয়ার পাঠে আমরা আরও জানিতে পারি যে, পর্ত্তুগীজ জলদস্যুগণ যে শুধু সমুদ্রের উপকূলবর্ত্তী ভূভাগেই দস্যুতা করিত, তাহা নহে, তাহারা সমুদ্র-উপকূল হইতে ৬০।৭০ মাইল দূরবর্ত্তী ভূভাগেও লুণ্ঠন করিত।

বঙ্গদেশ তখন মোগল-সরকারের অধীন হইলেও পুলিসের সুবন্দোবস্ত না থাকায় বাঙ্গালার নিরীহ প্রজাবৃন্দ এই সমুদায় পর্ত্তুগীজ জলদস্যুগণের নির্ম্মম নিষ্ঠুরতা হইতে নিষ্কৃতি পাইত না।

আরাকান-বাসী মগের অত্যাচার, রক্ষকরূপে ভক্ষক জমীদারের দারুণ নিপীড়ন ও সর্ব্বোপরি পর্ত্তুগীজ জলদস্যুগণের আকস্মিক আক্রমণ এই সমস্ত মিলিয়া বাঙ্গালা দেশকে বাস্তবিকই তখন 'মগের মুলুক' করিয়া তুলিয়াছিল।

পর্ত্তুগীজগণের সংস্পর্শে আসিয়া ভারতবাসিগণের মধ্যে একটী কুৎসিত

---

* হরমাদ শব্দ স্পেনিস্ armada শব্দের অপভ্রংশ।

রোগের সৃষ্টি হইয়াছিল। আধুনিক বৈদ্যগ্রন্থে ঐ রোগটী 'ফিরিঙ্গ' নামে অভিহিত,—

'গন্ধরোগঃ ফিরঙ্গোঽয়ং জায়তে দেহিনাং ধ্রুবম্।
ফিরঙ্গিণোঽতিসংসর্গাৎ ফিরঙ্গিণ্যাঃ প্রসঙ্গতঃ॥
ফিরঙ্গসংজ্ঞকে দেশে বাহুল্যেনৈব যদ্‌ভবেৎ।
তস্মাৎ ফিরঙ্গ ইত্যুক্তো ব্যাধির্ব্যাধিবিশারদৈঃ॥'

ফিরঙ্গদেশীয় স্ত্রী বা পুরুষগণের সহিত সংসর্গ করিলে এই রোগ উৎপন্ন হয় এবং উক্ত দেশে ইহার বহুল প্রচার বলিয়া ব্যাধিবিশারদগণ ইহার 'ফিরঙ্গ' নাম রাখিয়াছেন।

পর্ত্তুগীজগণ জলদস্যুরূপে বঙ্গে দারুণ অত্যাচার করিলেও আমরা অনেক আবশ্যক সামগ্রীসম্ভারের জন্য তাহাদের নিকট ঋণী। আমাদিগের মধ্যে ও আমাদের ভাষার মধ্যে এখনও পর্ত্তুগীজপ্রভাব পরিলক্ষিত হইয়া থাকে।

পেয়ারা, আনারস, আতা, নোনা, সপেটা, কামরাঙ্গা, বিলাতী বেগুণ, কাজুবাদাম, চীনা-বাদাম এবং সন্তরা প্রভৃতি ফল পর্ত্তুগীজগণই এদেশে আনয়ন করে।

পর্ত্তুগালের অন্তঃপাতী সিন্ত্রা (Cintra) নগর হইতেই বোধ হয় 'সন্তরা' ফলের নামকরণ হইয়াছে এবং বৃন্দাবনদাস রচিত চৈতন্যভাগবতে উল্লিখিত 'সমতারা' ফলও বোধ হয় এই 'সন্তরা' নামের অপভ্রংশ।

বার্ণিয়ার পাঠে আমরা জানিতে পারি, পর্ত্তুগীজগণ নানাবিধ ফলের মোরব্বা প্রস্তুত করিতে পারিত।

পর্ত্তুগীজগণ সূর্য্যমুখী, রজনীগন্ধা, মুকুটফুল, বিলাতী-তুলসী, পীত-করবী, গাঁদা ও অন্যান্য সুন্দর সুন্দর পুষ্প মেক্সিকো হইতে এ দেশে আনয়ন করিয়া ভারতীয় পুষ্পের শ্রীবৃদ্ধিসাধন করে।

ওলন্দা, কপি, কড়াইস্থটী প্রভৃতি য়ুরোপীয় তরিতরকারীও আমাদিগকে পর্ত্তুগীজগণের কথাই স্মরণ করাইয়া দেয়।

সালসা, আন্নাপান এবং জোলাপ প্রভৃতি ভৈষজ্য-তরুও পর্ত্তুগীজগণই দক্ষিণ আমেরিকা হইতে এ দেশে আনয়ন করে।

পাঁউরুটী, বিস্কুট প্রভৃতি রোগীর পথ্য প্রস্তুতকরণ আমরা পর্ত্তুগীজগণের নিকটই প্রথম শিক্ষা করি। 'পাক-রাজেশ্বর' নামক আধুনিক সংস্কৃত গ্রন্থে 'ফিরঙ্গরোটী' বা পাঁউরুটী প্রস্তুত করিবার প্রণালী লিখিত আছে।

যে আরামদায়ক তাম্রকূটের ধূমপান করিয়া লক্ষ লক্ষ শ্রমজীবী নূতন উদ্যম পাইতেছে, তাহাও আমাদিগকে পর্ত্তুগীজদিগেরই নাম স্মরণ করাইয়া দেয়। খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে এদেশে তামাকুর প্রথম আমদানী হয়।

পর্ত্তুগীজগণ সুনিপুণ বেহালা-বাদক ছিল। তাহারাই এদেশীয় যাত্রায় বেহালার প্রচলন করে।

পর্ত্তুগীজদিগের অনুকরণের ফলে এদেশীয় পুরুষ ও নারীর মধ্যে এক সময়ে লবেদার ও ফিরিঙ্গি খোপার বহুল প্রচার ছিল।

কুপন, বিস্তি, প্রমারা খেলা এবং স্বর্ত্তি ও নিলাম দ্বারা দ্রব্যাদি ক্রয়-বিক্রয়ের প্রথা পর্ত্তুগীজগণই এদেশে প্রথম প্রবর্ত্তিত করে।

আজিও অনেক বাঙ্গালী পর্ত্তুগীজগণের অনুকরণে যীশুমাতা মেরীর নাম গ্রহণ করিয়া শপথ করে। 'মাইরি' শব্দ 'মেরী'র অপভ্রংশ ভিন্ন কিছুই নহে। এলিজাবেথের শাসনসময়ে ইংলণ্ডেও 'ম্যারী' শব্দ এই অর্থেই প্রযুক্ত হইত।

দারুণ গ্রীষ্মে যে আমরা টানাপাখা ব্যবহার করি, তাহার জন্যও আমরা পর্ত্তুগীজগণের নিকট ঋণী।

বঙ্গভাষায় যে সমুদায় পর্ত্তুগীজ শব্দ ব্যবহৃত হয়, তাহার একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা প্রদান করিয়াই আমি আমার নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধের পরিসমাপ্তি করিব।

মূল পর্ত্তুগীজ শব্দ	বঙ্গভাষায় ব্যবহৃত পর্ত্তুগীজ শব্দ
Ananarz	আনারস
Aia	আয়া
Alcatrao	আলকাৎরা
Almario	আলমারি
Alfinite	আলপিন
Hollanda	ওলন্দা
Couve	কপি
Catatua	কাকাতুয়া
Caju	কাজুবাদাম
Canastra	কানেস্তারা
Carambola	কামরাঙ্গা
Cris	কিরিচ
Coupon	কুপন
Cathedra	কেদারা
Gamella	গামলা
Egreja	গীর্জ্জা
Chavi	চাবি
Janella	জানালা
Jalapa	জোলাপ
Tabaco	তামাকু

Tendedeira	তুন্দুর বা তুন্দুল
Toalha	তোয়ালে
Leilao	নিলাম
Annona	নোনা
Prato	পরাত
Padre	পাদরি
Pao	পাঁউরুটি
Pipa	পিপা
Pistol	পিস্তল
Peru (পক্ষীবিশেষ)	পেরু
Posta	পোস্তা
Prego	প্রেক
Forma	ফর্‌মা
Sorte	সুর্ত্তি
Sabao	সাবান
Viola	বেহালা
Marria	মাইরি
Salsaparrilha	সালসা
Mastro	মাস্তল
Marca	মার্কা
Sagu	সাগু
Sapotilla	সপেটা
Botelha	বোতল
Fita	ফিতা
Baldi	বাল্‌তি
Sacola	সাঁকালি (থলিয়া)

শ্রীনরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত

গো-দুগ্ধ

বাঙ্গালীর প্রধান খাদ্য ভাত, মাছ এবং দুগ্ধ। যাঁহারা মাংস আহার করেন না, তাঁহাদের শরীরের সর্ব্বাঙ্গীন পুষ্টির জন্য দুগ্ধ অতি আবশ্যকীয়। আমাদের শরীর-ধারণের জন্য যে যে মৌলিক পদার্থের যে পরিমাণে প্রয়োজন, দুগ্ধে সে সবই প্রায় সেই সেই পরিমাণেই বিদ্যমান আছে। সেইজন্যই আবশ্যক হইলে, শুধু দুগ্ধ পান করিয়াই প্রাণধারণ করা যাইতে পারে। কিন্তু আজকাল দুগ্ধ আর সহজপ্রাপ্য নহে। এমন একদিন ছিল, যে দিন সমস্ত গোয়ালেই দুই একটা গরু থাকিত, তাহাতে গৃহস্থের প্রয়োজনমত দুধ পাওয়া যাইত। কিন্তু আজকাল সহরের ত কথাই নাই, অধিকাংশ গ্রামিক ভদ্রলোকেরও কেনা দুধের উপর নির্ভর করিতে হয়। গত ২।৩ বৎসর যাবৎ আমাকে সরকারী কার্য্যোপলক্ষে রাজসাহী ও ঢাকা-বিভাগের অনেক জায়গায় ঘুরিতে হইয়াছে, যেখানে গিয়াছি, সকলেই আমাকে অনুরোধ করিয়াছেন, গবর্ণমেণ্ট হইতে বিশুদ্ধ দুগ্ধের সরবরাহের জন্য যাহাতে কোন একটা বন্দোবস্ত করা হয়। এমন সহর নাই, এমন গ্রাম নাই, যেখানে দুধের মূল্য গত ১০।১২ বৎসরে ৩।৪ গুণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত না হইয়াছে। অধিকাংশ জায়গাতেই আজ কাল তিন আনা চারি আনার কমে একসের দুধ পাওয়া যায় না। তাহার ভিতর কয়ভাগ যে গাইয়ের বাঁটের আর কয়ভাগ যে পচাপুকুরের তাহা কাহারও জানা অসাধ্য। সরকারী রিপোর্টে প্রকাশ বঙ্গদেশে শতকরা ১৫(?) শিশু এক বৎসরের ভিতর মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

ইহার ভিতর ১০ লিভার-সংক্রান্ত পীড়ারোগে আক্রান্ত। আমি ডাক্তার নহি, [illegible] মুখে শুনিয়াছি, যে দূষিত দুগ্ধই অথবা দুগ্ধের অভাবই

ইহার প্রধান কারণ। অনেক বাড়ীতে দুগ্ধের পরিবর্ত্তে কন্‌ডেন্সড্‌ মিল্ক, হরলিকস্‌ মিল্ক ব্যবহৃত হইয়া থাকে। দেশের এই যে অবস্থা হইয়া দাঁড়াইয়াছে, ইহার প্রতীকার আবশ্যক, তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন। রোগ প্রতীকারের পূর্ব্বে রোগের কারণ নির্ণয় করা আবশ্যক। আমাদের কৃষকেরা যে শুধু অতিরিক্ত লাভের লালসায় দুধে জল মিশাইয়া টাকায় চারিসের দুধ বিক্রয় করে, তাহা নহে। বিশ বৎসর পূর্ব্বে গাভী পালন করায় যে সুবিধা ছিল, আজ-কাল আর তাহা নাই। পূর্ব্বে যে গ্রামে দুইশত গাই অনায়াসে চরিয়া বেড়াইত, আজকাল সেই গ্রামে বিশটি প্রাণীর গোচারণ ভূমি নাই। এজন্য কৃষকগণ কতটা দায়ী এবং জমিদারগণ কতটা দায়ী, তাহা বলা দুঃসাধ্য। এক, ধানের খড় ভিন্ন যে অন্য কোনও রকম ঘাস জন্মাইয়া গরুকে খাওয়ান যাইতে পারে অথবা খাওয়ান আবশ্যক, এ ধারণা আমাদের কৃষকদের নাই। সে নিজে দুবেলা পেট ভরিয়া খাইতে পায় না, গরুর খাবার কোথায় পাইবে? দেশে গো-চারণের ভূমি নাই, গাই-বলদ সব অস্থি-কঙ্কালসার, তাহার ফলে আমাদের শিশুরাও রুগ্ন, দুর্ব্বল। সম্প্রতি এ সম্বন্ধে অনেক আন্দোলন হইতেছে, এই আন্দোলনের ফলে এ বিষয়ে গবর্ণমেণ্টেরও মনোযোগ আকর্ষিত হইয়াছে। ভারত-গবর্ণমেণ্টের আদেশে প্রত্যেক প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট এ বিষয়ে তদন্ত করিতেছেন। কিন্তু যাঁহারা এ বিষয়ে কিছু চিন্তা করিয়াছেন, তাঁহারা সকলে বোধ হয় নিম্নলিখিত কয়েকটী বিষয় লক্ষ্য করিয়াছেন। বঙ্গদেশে বিশেষতঃ উত্তরবঙ্গে, হালের জন্য বেহারী বলদের ব্যবহার ক্রমশঃই বৃদ্ধি-প্রাপ্ত হইতেছে এবং দেশীয় বলদ ও গাভী উভয়ই দ্রুত গতিতে অধোগতি প্রাপ্ত হইতেছে। নানা কারণে আমাদের দেশে গোজাতির এরূপ দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে। ইহার মধ্যে নিম্নলিখিত ৩টি কারণ প্রধান বলিয়া বোধ হয়।

(১) গোচারণ-ভূমির অভাব।

(২) পোয়াল অথবা অন্য কোন উপযুক্ত খাদ্যের অভাব।

(৩) বংশবৃদ্ধির জন্য অল্পবয়স্ক এবং দুর্ব্বল ষাঁড়ের ব্যবহার।

লোকসংখ্যা-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে উপযুক্ত পরিমাণে শস্য উৎপাদন আবশ্যক।

ইহা দুই উপায়ে সাধিত হইতে পারে। প্রথমতঃ সারপ্রয়োগ এবং অন্যান্য উন্নত কৃষিপ্রণালী অবলম্বন দ্বারা প্রতি বিঘা জমি হইতে অধিক পরিমাণে শস্য উৎপাদন, অথবা অধিক পরিমাণ ভূমি আবাদ। প্রথম উপায় অবলম্বন যৎকিঞ্চিৎ শ্রম ও অর্থসাপেক্ষ, পুরাকাল হইতে যে সমস্ত প্রণালী চলিয়া আসিতেছে, আমরা সহজে তাহার পরিবর্ত্তন করিতে চাই না। কাজেই যে উপায় সহজসাধ্য, তাহাই অবলম্বন করি, আমরা বেশী পরিমাণ জমি আবাদ করি। ফল এই হইয়াছে যে, খুব কম গ্রামেই গাই চরাইবার স্থান আছে। যে সমস্ত যৎসামান্য শ্রমসাধ্য উপায়ে জমির উৎপাদিকা-শক্তি বৃদ্ধি হইতে পারে, আমরা তাহাও অবলম্বন করি না। আমি একটা সাধারণ দৃষ্টান্ত দিতেছি। রেলভ্রমণের সময় অনেকেই লাইনের দু'ধারে স্তূপীকৃত গো-হাড় দেখিয়া থাকিবেন। ইহার উদ্দেশ্য অনেকেই হয়ত জানেন না। এই রাশিকৃত হাড় কলিকাতায় চালান হয়। সেখানে কলে চূর্ণীকৃত হইয়া চাবাগানে অথবা ইংলণ্ড-জার্ম্মনি ইত্যাদি জায়গায় রপ্তানী হইয়া, সেই সমস্ত দেশের ভূমির উৎপাদিকাশক্তি বৃদ্ধি করে। আমরা গাভীর মুখের গ্রাস কাড়িয়া লইয়া সেই জমিতে ধান বুনি এবং আরও অধিক পরিমাণে গো-হাড় সঞ্চয়ের সহায়তা করি। সম্প্রতি বঙ্গীয় কৃষিবিভাগ হাড়ের গুঁড়া সারের প্রচলনের জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিতেছেন, গবর্ণমেণ্ট এ সব বিষয়ে কি করিতেছেন—এস্থলে তাহা আমার বক্তব্য নহে। আমাদের দেশের জমিদারগণ যদি স্থিরপ্রতিজ্ঞ

হন, যে গো-চারণভূমি চাষের জন্য পত্তনি দিবেন না, এবং যে সমস্ত ভূমি পত্তনি দেওয়া হইয়াছে তাহার পুনরুদ্ধার সাধনের চেষ্টা করেন; তবে এই দুরবস্থার অনেকটা প্রতীকার করিতে পারেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সারব্যবহার ও অন্যান্য উপায় দ্বারা ভূমির উৎপাদিকা-শক্তি বৃদ্ধির উপায়ও করিতে হইবে। নতুবা "গরু মারিয়া জুতা দান" করা হইবে। এই বিষয়ে আর একটি বক্তব্য আছে, ইংরাজিতে যাহাকে Inertia বলে, আমাদিগের ভিতর সেই বৃত্তিটি খুব প্রবল। আমরা সহজে স্থান-পরিবর্ত্তন করিতে চাই না, আমরা শুইতে পারিলে বসিতে চাই না, বসিতে পারিলে উঠিতে চাই না। পিতৃ-পিতামহ যে গ্রামে বাস করিয়া গিয়াছেন, অর্দ্ধাহারঅনাহারে থাকিলেও আমরা সহজে তাহার পরিবর্ত্তন করিতে চাই না। নিম্নলিখিত তালিকায় দেখা যাইবে, আমাদিগের দেশে এখনও চাষ-উপযোগী কত জমী পতিত রহিয়াছে। কারণ চাষের জমীর বিস্তৃতি বন্ধ রাখিতে হইলে যাহাতে অল্প জমিতেই সেই পরিমাণ শস্য উৎপন্ন হইতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। আমাদের কৃষকেরা এই সমুদায় জায়গায় না যাইয়া হাতের কাছে যাহা পায় তাহাই চাষ করিয়া ফেলে।

২। ঘাসের পর ধানের খড়ই আমাদের দেশের গো-জাতির প্রধান খাদ্য। কিন্তু আজকাল ইহাও খুব দুর্ম্মূল্য হইয়া উঠিয়াছে। সহরের আশে-পাশে গ্রামের খড় প্রায় সমুদয় সহরে চলিয়া যায়, বিদেশী বলদের আমদানী বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নানাস্থানে গো-হাট এবং মেলার সৃষ্টি হইয়াছে। এই সমস্ত স্থানের অধিকাংশ খড় হাটে চলিয়া যায়, গ্রাম্য গো-পালের ভাগ্যে জোটে না। সমুদয় পাশ্চাত্য-দেশেই গো-জাতির আহারের জন্য মকাই, বিট ইত্যাদি নানা রকম ফসল উৎপন্ন করা হইয়া থাকে; বেহার-অঞ্চলেও গরুর জন্য জোয়ারের চাষ করা হইয়া থাকে। কিন্তু বঙ্গদেশে

ইহার প্রচলন নাই। কোন কোন জায়গায় বিশেষতঃ চর-জমিতে ধানের পর মাষকলাই ছিটাইয়া দেওয়া হয়, এবং তাহা গরুর খাদ্যের জন্য ব্যবহৃত হয়। এই রীতির আরও প্রচার বাঞ্ছনীয়। অনেক জেলাতে ধান কাটিবার কিছু পূর্ব্বে কলাই অথবা খেসারি ছিটাইয়া দিলে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে গরুর আহার জুটিতে পারে। যখন টাকায় আধমণ দুধ পাওয়া যাইত, এবং গো-চারণের অভাব ছিল না, যখন ২৫৲ টাকায় উৎকৃষ্ট গাভী পাওয়া যাইত, তখন গরুর আহারের জন্য কোনও ফসল উৎপাদনের আবশ্যক ছিল না। কিন্তু আজকাল ১৲ টাকায় ৫।৬ সেরের বেশী দুধ খুব কম জায়গাতেই পাওয়া যায়। ৬০।৭০৲ টাকার কম একটা ভাল গাই পাওয়া যায় না, গো-চারণ ভূমি নাই বলিলেও চলে। এই অবস্থায় গরুর আহারের প্রতি আরও বিশেষ দৃষ্টি আবশ্যক। জোয়ার ইত্যাদি ফসলের চাষ প্রবর্ত্তন দরকার।

৩। সুস্থ ও সবলকায় পিতামাতা হইতেই সুস্থ সন্তান আশা করা যাইতে পারে। সতেজ বৃক্ষের বীজ হইতেই সতেজ চারা আশা করা যাইতে পারে, ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত সত্য। কিন্তু দুঃখের বিষয় চাষের প্রধান সহায়, গোজাতির সম্বন্ধে একথা আমরা ভুলিয়া যাই। অধিকাংশ স্থলেই বলবান্ ষাঁড়গুলিকে বলদ করিয়া দুর্ব্বল ষাঁড়গুলিকে বংশবৃদ্ধির জন্য রাখা হয়। সাধারণতঃ তিন বৎসরের পূর্ব্বে ষাঁড় পূর্ণাবয়বপ্রাপ্ত হয় না, এবং ইহার পূর্ব্বে ষাঁড়কে গাভীর সঙ্গে মিশিতে দেওয়া উচিত নহে। কিন্তু এই নিয়ম কোনও স্থলেই রক্ষিত হয় না, অনেক স্থলেই ষাঁড়গুলিকে প্রথমতঃ দুই তিন বৎসর গাভীর সঙ্গে মিশিতে দিয়া, পরে বলদ করা হয়, ইহাতে সন্ততি সবল অথবা সুস্থকায় হইবে, কি প্রকারে আশা করা যাইতে পারে? ফলে পুরুষানুক্রমে গোজাতির অতি দ্রুতগতিতে অবনতি হইতেছে।

অনেকেই হয়ত ভাবিয়া দেখেন নাই যে, একটি ষাঁড় হইতে তাহার জীবিত দশায় প্রায় সহস্রাধিক বৎস উৎপন্ন হয়। ইহা হইতে পাঠকগণ উপলব্ধি করিতে পারিবেন। উৎকৃষ্ট ষাঁড়ের নির্ব্বাচনের উপর সমস্ত গোজাতির উন্নতি কতটা নির্ভর করিতেছে। পূর্ব্বে শ্রাদ্ধাদির সময় বৃষোৎসর্গ মহাপুণ্য কার্য্য বলিয়া পরিগণিত হইত। দেশের লোকের নিকট এই সমস্ত ষাঁড় পবিত্র বলিয়া বিবেচিত হইত। এই সমস্ত ষাঁড় যথেচ্ছা বিচরণ করিত, এবং সবল ও সুস্থকায় ছিল, বংশবৃদ্ধির জন্য প্রায়শঃই এই সমস্ত ষাঁড়ই ব্যবহৃত হইত; এবং তাহাদের সন্ততিগণ সবল ও সুস্থকায় হইত। আমরা আজকাল সুশিক্ষিত হইয়া, কুসংস্কার কাটাইয়াছি। মুনিঋষিগণ যে সমস্ত লোকাচার প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন, তাহার অধিকাংশই কুসংস্কার বলিয়া উড়াইয়া দিয়াছি। এই বৃষোৎসর্গ যে আমাদের গোজাতির উন্নতির একটি প্রধান উপায় ছিল, তাহা আমরা কখনও ভাবিয়া দেখি নাই। "মরা গরু ঘাস খায় না" বলিয়া আমরা শ্রাদ্ধশান্তি পরিত্যাগ করিয়াছি, কিন্তু তাহার এই ফল হইয়াছে যে, আমরা জিয়ন্তগরুকে মারিতে বসিয়াছি। যে দুই চারিটি ষাঁড় আছে, তাহাদেরও আহার নাই, ক্রমশঃ অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িয়াছে এবং অনেক স্থানে সেগুলি অযথা অত্যাচারে প্রপীড়িত হইয়া থাকে। ইহার প্রতীকার অতি সত্বর আবশ্যক। গ্রাম্য পঞ্চায়তগণ মিলিয়া যদি একটি অথবা ততোধিক উপযুক্ত ষাঁড় প্রত্যেক গ্রামে রাখিবার ব্যবস্থা করেন এবং গাই-পিছু (প্রতি) সামান্য কিছু ধরিয়া লন, তবে বোধ হয়, বিনা-খরচে ইহার একটা প্রতীকার হইতে পারে। জমিদারগণও তাঁহাদের মফস্বলের কাছারীতে এইরূপ একটা ষাঁড় রাখিতে পারেন।

তবেই দেখা যাইতেছে, আমরা তিন উপায়ে গবাদি পশুর কথঞ্চিৎ উন্নতিসাধন করিতে পারি—(১) বংশবৃদ্ধির জন্য বলবান্ ও সুলক্ষণ-

যুক্ত, ষাঁড়ের ব্যবহার এবং অধিক পরিমাণ দুগ্ধবতী গাভীর নির্ব্বাচন; (২) গোচারণভূমি বৃদ্ধি, (৩) জোয়ার ও তজ্জাতীয় ঘাস উৎপাদন।

আমাদের দেশের জমিদার ও ভূম্যধিকারিগণ এ বিষয়ে একটু দৃষ্টিপাত করিলে, অনেক কাজ করিতে পারেন। কিন্তু সাধারণতঃ দেখা যায় যে, আমাদের দেশের ভূম্যধিকারিগণ খাজনা লইয়া প্রজা পত্তনেরই পক্ষপাতী, কারণ আমাদের সাধারণ ধারণা যে, নিজের তত্ত্বাবধানে খামার করিয়া লাভ করা যায় না, বস্তুতঃ এরূপ বিশ্বাসের যথেষ্ট ভিত্তি আছে। নিজে চাষ করিয়া খুব কম ভদ্রলোকেই লাভবান্ হইয়াছেন, বরং অনেকেই এ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া নিবৃত্ত হইয়াছেন।

ইহার কারণ আমার যাহা মনে হয় এইখানে তাহার একটু আলোচনা দরকার, আমি আমার মূল বিষয় হইতে একটু দূরে সরিয়া পড়িতেছি, কিন্তু এ বিষয়টি কিছু আলোচনা না করিলে আমার মূল বক্তব্য পরিস্ফুট করিতে পারিব না, আশা করি শ্রোতৃ-মহোদয়গণ মার্জ্জনা করিবেন। যাঁহারা এইরূপ ভাবে চাষে প্রবৃত্ত হন, তাহাদের অনেকেরই এ সব বিষয়ে অভিজ্ঞতা নাই। প্রায়ই বেতন-ভোগী কর্ম্মচারীর উপর নির্ভর করিতে হয়। ইহাদের এ সব বিষয়ে বিশেষ কোন অভিজ্ঞতা নাই। সাধারণতঃ কৃষকগণ যাহা বোঝায়, ইহারা তাহাই বোঝেন, নূতন কিছু শিখিতে চাহেন না। অনেকে মনে করেন, মূল্যবান্ বৈদেশিকযন্ত্র ব্যবহার ব্যতীত আমাদের প্রচলিত কৃষি-প্রণালীর বিশেষ কোনও উন্নতি হইতে পারে না, এ ধারণাও সম্যক্ ঠিক নহে। বৈদেশিক শুধু ২।১টী যন্ত্রই এ পর্য্যন্ত আমাদের ব্যবহারোপযোগী বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। আমাদের ভদ্র চাষাদের প্রধান অন্তরায় তাঁহারা প্রতিযোগিতায় সাধারণ কৃষকদের সঙ্গে পারিয়া উঠেন না। কৃষকেরা স্ত্রীপুত্র সবাই মিলিয়া কাজ করে, ইহাদের মজুরি তাহারা খরচের মধ্যেই গণ্য করে না। কিন্তু ভদ্র-

লোকদের প্রত্যেক কাজ বেতনভুক্ ভৃত্যদ্বারা করাইতে হয়। বিশ্বাসী ভৃত্য, যে প্রভুর কাজ নিজের কাজের ন্যায় মনে করিবে, এমন বিশ্বাসী ভৃত্য পাওয়া যায় না, কাজেই তাহার খরচ বেশী পড়িয়া যায়। কিন্তু এরূপ অনেক ফসল আছে, যাহার আবাদ-প্রণালী আমাদের কৃষকেরা সম্যক্‌রূপে জানে না, অথবা জানিলেও অর্থাভাবে অথবা অন্য কোনও কারণে সেই সমস্ত প্রণালী যথাযথভাবে অনুসরণ করিতে পারে না। এই সমস্ত ফসলের চাষ ভদ্রচাষাদিগের পক্ষে বিশেষ উপযোগী এবং লাভজনক। ইক্ষু, আলু, তামাক ইত্যাদি এই শ্রেণীর অন্তর্গত। বঙ্গীয়-কৃষি-বিভাগ আমাদের কৃষি-প্রণালীর উন্নতি সম্বন্ধে সর্ব্বদাই নানাবিধ পুস্তকাদি প্রকাশ করিয়া থাকেন, কিন্তু সাধারণ কৃষকগণের ভিতর এই সমস্ত উপদেশ পৌঁছায় না। অথবা পৌঁছাইলেও তাহাদের রক্ষণশীলতা-নিবন্ধন তাহারা সেই সমস্ত উপদেশানুসারে কার্য্য করিতে চাহে না। যাহাতে কৃষকগণের ভিতর এই সমস্ত উপদেশ পৌঁছায় সেইজন্য বঙ্গীয় কৃষি-বিভাগ এইবার বিশেষ বন্দোবস্ত করিয়াছেন, কিন্তু তাহা এই প্রবন্ধে বক্তব্য নহে। ভদ্র চাষীগণ কৃষি-বিভাগের উপদেশ অনুযায়ী বিজ্ঞান-সম্মত প্রণালী অনুসারে, এই সমস্ত শস্যের আবাদ করিলে, বিশেষ লাভবান্ হইতে পারেন। মধ্যবিত্ত অবস্থাপন্ন ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক পরিচালিত এই সব কৃষিক্ষেত্রে কয়েকটি গাভী রাখিবার বন্দোবস্ত অনায়াসেই করা যাইতে পারে। গোময় সাররূপে ব্যবহৃত-ক্ষেত্রের উৎপাদিকাশক্তি বৃদ্ধি করিবে এবং দুগ্ধ বিক্রয় করিয়া লাভ তো হইবেই, অধিকন্তু দেশের একটী মস্ত অভাব দূর হইবে।

পশ্চিম-দেশীয় গাই হইতে প্রথম বেশী দুধ পাওয়া যায় বটে, কিন্তু দুই তিনটী বাছুর হইবার পরই আর সেরূপ দুধ থাকে না। বিশেষতঃ গাভীর উপযুক্ত ষাঁড় সব সময় পাওয়া যায় না। এইরূপ গাভীর

যেরূপ যত্ন দরকার, আমাদের কৃষকগণের তাহা ক্ষমতার অতীত। কাজেই এই সব গাভীদ্বারা দেশের গোজাতির চিরন্তন কোনও উন্নতি হইতে পারে না, উপযুক্ত যত্নের অভাবে এই সমস্ত গাই অনেক সময় দেশীয় গাই অপেক্ষাও নিকৃষ্ট হইয়া পড়ে।

বঙ্গীয় কৃষি-বিভাগ দেশের এই অসুবিধা দূরীকরণার্থে সম্প্রতি একটি ডেয়ারী ফার্ম খুলিয়াছেন। সে সম্বন্ধে ২।৪টী কথা বলিয়াই এই প্রবন্ধের শেষ করিব। •

এই কৃষি-ক্ষেত্রের প্রধান উদ্দেশ্য স্থানীয় গো-জাতির উন্নতিসাধন, কিন্তু চাষবাস করিয়া লাভ করা যাইতে পারে, ইহা প্রমাণ করা দ্বিতীয় উদ্দেশ্য। যদি দেখা যায় যে, এই কৃষিক্ষেত্রে অনুষ্ঠিত প্রণালী দ্বারা চাষ করিলে লাভ দাঁড়াইতে পারে, তাহা হইলে আমাদের দেশের যুবকবৃন্দের অর্থাগমের একটী নূতন উপায় হইবে। এই কৃষিক্ষেত্রের আয়তন ১০০০ বিঘা। আপাততঃ ইহাতে ১০০ গাভী রাখার বন্দোবস্ত করা হইতেছে। গোচারণ-ভূমি ব্যতিরেকে অন্যান্য জমিতে ধান, পাট, ইক্ষু, তামাক ও আলুর চাষ করা হইবে। একটী সব্‌জী বাগানও থাকিবে, গাভী ব্যতীত হাঁস, ছাগ, মুরগী এবং সুবিধামত অন্যান্য পশু রাখা হইবে। নানাবিধ ফলবান্ বৃক্ষ রোপণ করা হইবে। এই ক্ষেত্রে একটী এঞ্জিন্ থাকিবে, আকমাড়াই, সর্ষপ হইতে তৈল-প্রস্তুত, গরুর দানা ভাঙ্গা, জাব-কাটা, জলতোলা ইত্যাদি কার্য্য এই এঞ্জিনের সাহায্যে সংসাধিত হইবে। চাষের যে প্রধান অন্তরায় মজুরের অভাব তাহা অনেক পরিমাণে, এই এঞ্জিনের দ্বারা দূরীভূত হইবে, আশা করা যায়।

এই কৃষিক্ষেত্র সম্বন্ধে যদি কেহ বিশেষরূপে জানিতে চান, তবে কৃষি-বিভাগের অধ্যক্ষ মহোদয়ের নিকট চিঠি লিখিলেই জানিতে পারিবেন। যদি উপস্থিত শ্রোতৃগণের ভিতর কেহ কখনও রঙ্গপুরে আগমন করেন,

তাহা হইলে আমরা যথাসাধ্য তাঁহাদিগকে কৃষিক্ষেত্র দেখাইতে এবং তাহার কার্য্য বুঝাইতে চেষ্টা করিব।

শ্রীযতীন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী

প্রাচীন ভারতে ধাত্রীবিদ্যা

আমাদের দেশে আজকাল ধাত্রীর কার্য্য নীচজাতীয়া স্ত্রীলোকেরা করিয়া থাকে। একে অশিক্ষিতা, তাহাতে সামাজিক প্রথানুযায়ী অস্পৃশ্যা হওয়ায় ধাত্রীরা স্বভাবতঃ অপরিষ্কারভাবে থাকিয়া নানাপ্রকার আধি-ব্যাধির মন্দির। এক কথায় চলিষ্ণু দাতব্যচিকিৎসালয় বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। আমরা জ্ঞানের অপব্যবহার করিয়া এমনই জ্ঞানশূন্য হইয়াছি যে, জানিয়া দেখিয়া, পরীক্ষা করিয়াও এই শ্রেণীর স্ত্রীলোকের হাতে আমাদের গৃহলক্ষ্মীর, আমাদের ভবিষ্যৎ বংশের, জীবন অকাতরে ন্যস্ত করিয়া নিশ্চিন্ত ভাবে শান্তিলাভ করিয়া থাকি। সূতিকাগৃহে বর্ষীয়সী জননীগণ অস্পৃশ্যা হইবার ভয়ে, তীর্থাদিদর্শনের ফল লোপ হইবার ভয়ে, গঙ্গাস্নানের মহিমা নষ্ট হইবার আশঙ্কায় যাইতে চাহেন না। দূর হইতে সমবেদনা দেখাইয়া অজ্ঞানান্ধকারাচ্ছন্ন সংক্রামক পীড়ার প্রসূতি ধাত্রীর হস্তে আপনার বধূ বা দুহিতাকে সমর্পণ করিয়া, মনে মনে পঞ্জিকা-কারের লিখিত সেই "অস্তি গোদাবরীতীরে জম্ভলানামে রাক্ষসী" মন্ত্র আবৃত্তি করিতে থাকেন। অসহায়ের সহায় ভগবান্, স্বভাবশক্তিবলে হতভাগ্যা বঙ্গনারীকে সুপ্রসব করাইয়া বাঙ্গালী হিন্দুর অস্তিত্ব রক্ষা করি-তেছেন। বাঙ্গালী-হিন্দুর সূতিকাগৃহ-নির্ম্মাণপ্রথা এক অদ্ভুত ব্যাপার। বায়ু চলাচলের পথ নাই, জলসিক্ত আর্দ্রভূমির উপর ধনুকাকারে কুঁড়ে

উঠানে হইয়া থাকে। উচ্চতায় দশমবর্ষীয় শিশুর মস্তকও এই কুঁড়ে ঘরের শীর্ষস্থান স্পর্শ করিতে পারে। তাহার উপর কেহ এই সূতিকা-গৃহের নিকটে আসিতে পারিবে না। সূতিকাগৃহ স্পর্শ করিলেই তাহাকে স্নান করিতে হইবে—ইত্যাদি কুসংস্কারাচ্ছন্ন হইয়া শতকরা ৭৫টী সদ্যোজাত শিশু ইহধাম পরিত্যাগ করিয়া যাইতেছে। আমাদের জ্ঞান-গরিমা যতই বৃদ্ধি হইতেছে, ততই আমাদের বিলাসতরঙ্গের উৎস ছুটি-তেছে। আমরা আমাদের অর্জ্জিত জ্ঞানের অপব্যবহার করিতেছি। জ্ঞানে কুসংস্কারান্ধকার দূর করিয়া থাকে। আমাদের জ্ঞান আমাদের নৈতিকশক্তি হ্রাস করিয়া দিতেছে। আমাদের জ্ঞানী অচল-অটল স্থাণুবৎ দাঁড়াইয়া থাকিয়া আপনার জ্ঞানের উপাসনায় অনন্তে মিশাইয়া যাইতেছেন।

ভারতে বহুকাল হইতে যে জ্ঞান সংস্কাররূপে বংশপরম্পরা চলিয়া আসিতেছে, পৃথিবীর অন্য দেশে তাহার আজ পর্য্যন্তও আবিষ্কার হয় নাই। আবিষ্কার হইলেও তাহা নূতন তথ্যরূপে জগতে প্রচারিত হইতেছে। আমাদের দেশের নিরক্ষর স্ত্রীলোকেরাও জ্ঞাত আছে, গর্ভের লক্ষণ কি কি? কত দিনে সন্তান হইতে পারে? গর্ভের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে কি কি করিতে হয়, তাহা বঙ্গ-গৃহিণীগণ পরিজ্ঞাত আছেন। আমাদের দেশে চান্দ্রমাস-অনুযায়ী গর্ভকাল গণনা হইয়া থাকে। অষ্টমমাস হইলে গর্ভিণীর স্থানান্তরে যাওয়া নিষেধ। প্রথম রজোদর্শনের দিনে পঞ্চজন "এয়ো" বা সধবা স্ত্রীলোকে পাঁচটি ফল নব রজস্বলা রমণীর অঞ্চলে বাঁধিয়া দিয়া তাঁহাকে নির্জ্জন গৃহে বাস করিতে উপদেশ দেন। পুরুষ বা সূর্য্যের মুখ দেখিতে দেওয়া হয় না। ইহার পর শাস্ত্রমতে সংস্কারাদি কার্য্য হইয়া থাকে। তারপর গর্ভাধান। হিন্দুর সকল কার্য্যের সহিতই ধর্ম্মকর্ম্মের সম্বন্ধ। এখানে হয়ত পাশ্চাত্য পণ্ডিত বলিবেন, শিশুর দন্তোদগম হইলেই

তাহার মাংস হজম করিবার শক্তি হয় না। আমরা কোন বিষয়ের মীমাংসা করিবার শক্তি রাখি না, প্রাচীন কথার সমাবেশ করিবারই ইচ্ছা করি।

মহাভারতের পাঠক অবগত আছেন, রাজা পরীক্ষিৎ ষষ্ঠমাসে ভূমিষ্ঠ হইয়া ৬৫ বৎসর কাল জীবিত ছিলেন। জন্মমাত্র শিশুর জীবনীশক্তির চিহ্নমাত্র ছিল না। কুলক্ষয়ের সময়ে জন্মিয়াছিলেন বলিয়া অর্জ্জুন-তনয় অভিমন্যু-পুত্রের নাম পরীক্ষিৎ হইয়াছিল। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ শিশুর জীবন সঞ্চার করিয়াছিলেন। আজ-কালকার স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান বলিয়া থাকে যে, ১৮০ দিনে যে সন্তান জন্মে তাহাও জীবিত থাকিতে পারে। এই তথ্য অতিপুরাকালে ভারতের লোকে আধুনিক মেডিক্যাল্ জুরিশ-প্রুডেন্সের হইলেও জানিতেন। পুরাকালে লোকশিক্ষাদি জন্য পুরাণাদি পাঠের ব্যবস্থা ছিল। পৌরাণিক জ্ঞান-গরিমা এইভাবে লোক-সমাজে প্রচারিত হইয়া সাধারণের হিতসাধন করিত। এখন পুরাণপাঠ লোপ পাইয়াছে। শিক্ষিত লোকেরাও এখন পুরাণাদি পাঠ করেন না। কাজেই প্রকৃত হিন্দুধর্ম্মের শাসনাদি লোকের নিকট অপরিজ্ঞাত থাকিয়া কুসংস্কার প্রকৃত ধর্ম্মের স্থানাধিকার করিয়া হিন্দুকে অহিন্দুর সাজে সাজাইয়া ভয়ঙ্কর বৈষম্য উপস্থিত করিয়াছে। হিংসায় ও ভেদজ্ঞানে হিন্দু রসাতলে যাইতে বসিয়াছে! জ্ঞানের অপব্যবহার আর কাহাকে বলে?

পরীক্ষিৎ-জননী উত্তরার সূতিকাগৃহের যে বর্ণনা ব্যাসদেব অশ্বমেধ পর্ব্বে পরীক্ষিতের জন্মদিনে করিয়াছেন, তাহা আজকালকার কুসংস্কারাচ্ছন্ন বাঙ্গালী হিন্দু সকলেরই পাঠ্য। সেই সূতিকাগৃহ আজকালকার রাজা-মহারাজের বিলাসনিকেতনকেও সাজ-সজ্জায় ম্রিয়মাণ করিয়া দেয়। ইহার কেবল এইমাত্র বিশেষত্ব যে, সকলের শয়নগৃহ হইতে পৃথক্ স্থানে সন্নিবেশিত। প্রসবকালে সকল প্রৌঢ়ারমণীগণ সূতিকাগৃহে উপস্থিত

থাকিয়া প্রসবের সাহায্য করিয়াছিলেন। সদ্যোজাত শিশুকে কোলে করিয়া পাণ্ডব-জননী কুন্তী উপবেশন করিয়াছিলেন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এই শিশুর জাত-কর্ম্মাদি সকল কার্য্য স্বয়ং নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন। আজ সদ্যোজাত-শিশুর জাতকর্ম্ম কেহ করিলে, তাঁহাকে পতিত হইতে হয়। এই মহাভারতে নাড়ীচ্ছেদে বংশের নীল বা চোঁচ ব্যবহার প্রথার কথা আছে। নাড়ীর গাঁইট বা গিরা হইতে চারি অঙ্গুলি ব্যাপিয়া একটি গিরা শক্ত করিয়া বাঁধিয়া নাড়ীর গাঁইটের নিকট একটি বন্ধন দিয়া দুই বন্ধনের মধ্যভাগে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ পরীক্ষিতের নাড়ীচ্ছেদ করিয়াছিলেন। এই প্রথা এখনও ভারতে প্রচলিত আছে। ইহাতে রক্তপাত হইতে শিশুর জীবন রক্ষা করে। মহাভারতের শান্তিপর্ব্বে গর্ভস্থ ভ্রূণের অবস্থাদির বর্ণনা আছে। প্রথমমাসে ক্ষুদ্র সূত্রবৎ আকার ধারণ করে। দ্বিতীয়-মাসে মস্তকের, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদির, মেরুদণ্ড, মূত্রাশয় ও হৃদ্‌পিণ্ডের আকার-পরিগ্রহের চিহ্ন দেখা যায়। তৃতীয়মাসে জীবের "ফুলের" (placenta) সঞ্চার হয়। এই সময়ে দেহের আকার দুই অঙ্গুলি হয়। চতুর্থ মাসের ভ্রূণে স্ত্রী-পুরুষ-আকৃতি দেখা দিয়া থাকে। জীবদেহও পঞ্চাঙ্গুলি পরিমাণ দীর্ঘ হয়। পঞ্চমমাসে জীব-শরীরের মস্তকে চুল ও নখের সঞ্চার হইতে থাকে। শরীরের পরিমাণও দ্বাদশ অঙ্গুলি হইয়া থাকে। সপ্তমমাসে জীবশরীরের চক্ষু ফুটিয়া থাকে। অষ্টমমাসে গর্ভিণী হইতে প্রাপ্ত আচ্ছাদনাদি হইতে ক্রমশঃ বিয়োজিত হইতে থাকে। নবমমাসে জীবের বীজকোষ, অণ্ডকোষ পর্য্যন্ত লম্বিত হইয়া অধঃশিরা হইতে আরম্ভ করে। দশমমাসে অধঃশিরা হইয়া ভগবানের নাম করিতে থাকে। গর্ভিণীর দেহের সহিত নাড়ী দ্বারা জীব সংযোজিত থাকায় জীবদেহ গর্ভিণীর দেহের সহিত পরিপুষ্ট হইতে থাকে। তৃতীয়মাস পর্য্যন্ত "ফুল" দ্বারা জীব-শরীর পুষ্ট হইতে থাকে। আধুনিক ধাত্রীবিদ্যা সম্ভবতঃ ইহার অধিক আজ

পর্য্যন্ত অগ্রসর হইতে পারে নাই। ইহার পর গর্ভরক্ষার নানাকথা প্রসঙ্গ আছে, এমন কি গর্ভিণীর আহারাদির বিচারও হইয়াছে। এমন কি, গর্ভিণীর চলাফেরার কষ্ট হইলে, তলপেটে ব্যাণ্ডেজ-মত বন্ধনীর দ্বারায় গর্ভরক্ষার উপদেশ পর্য্যন্ত আছে।

মহাভারতের আদিপর্ব্বপাঠে অবগত হওয়া যায় যে, ক্ষত্রিয়গণের তাড়-নায় ঔর্ব্ব মুনির জননী পলাইয়া হিমালয়-পর্ব্বতের গুহায় আশ্রয় গ্রহণ করেন। তথায়ও ক্ষত্রিয়গণ তাঁহার গর্ভস্থ সন্তানকে বিনাশ করিবার কামনায় উপস্থিত হইলে জননী ব্রহ্মবিদ্যা সন্তান প্রসব করেন। মহাভারত-কার লিখিয়াছেন, তিনি ক্ষত্রিয়ভয়ে ভীতা হইয়া তাঁহার গর্ভ আপনার উরুদেশে সংস্থাপিত করেন। হিমালয় পর্ব্বতেই সন্তান প্রসব করেন। উরু হইতে সন্তান প্রসব হয় বলিয়া সন্তানের নাম ঔর্ব্ব হয়। উরুদেশেও গর্ভ হইতে পারে, সেই আদিকালেও ভারতীয় ঋষিগণের জানা ছিল। আজকালকার ধাত্রী-বিদ্যার পাঠকও জানেন False pain pregnancy হইতে পারে। False pain tube উরুদেশে সংস্থাপিত। ইশার দৈর্ঘ্য ৩।৪ ইঞ্চের বেশী হইবে না। False pain pregnancyর সন্তান জীবিত থাকিতে পারে কি না তাহা আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞান বলিতে পারে কি না আমরা পরিজ্ঞাত নহি।

আমাদের দেশে সন্তান প্রসব হইবার পর ছয় দিনের দিন ষষ্ঠীপূজা হইয়া থাকে। এই পূজা-ব্যাপারে আধুনিক শিক্ষিত লোকে হয়ত বলিবেন, ইহাও হিন্দুর একটী কুসংস্কার। বাস্তবিক পক্ষে ইহার সঙ্গে প্রাচীন ধাত্রী-বিদ্যার অতি নিকটসম্বন্ধ জড়িত আছে। হিন্দুর বিশ্বাস "ষষ্টী জাগর বাসরে" বিধাতাপুরুষ আসিয়া সদ্যোজাত শিশুর ললাটে তাহার জীবনের শুভাশুভ ঘটনাবলী লিখিয়া দিয়া যাইয়া থাকেন। এখান হইতে "ললাট-লিপির" সৃষ্টি। কিন্তু ইহার মধ্যে ধাত্রীবিদ্যার যে তথ্য লুক্কায়িত আছে,

তাহা সাধারণ-চক্ষে প্রতিভাত হয় না। ছয় দিবস অতীত হইলে প্রসবের বিপদ্ হইতে প্রসূতি নিরাময় হয়েন। সদ্যোজাত শিশুরও ধনুষ্টঙ্কারে প্রাণ যাইবার আর কোনও সন্দেহ থাকে না। ছয় দিন অতীত হইলে প্রসূতির আর সূতিকাজ্বর হইবার আশঙ্কা থাকে না। আধুনিক ধাত্রী-বিদ্যা-বিশারদগণ বলিয়া থাকেন, ছয় দিনের মধ্যে প্রসূতির যে জ্বর হয়, তাহার নাম "Puperal fever" সূতিকাজ্বর। এই জ্বরে অনেক প্রসূতি কালকবলে পতিত হইয়া থাকেন।

প্রসূতিকে একাকী প্রসবান্তে সংসারের গোলমাল হইতে দূরে রাখিতে হয়। তাহাকে প্রসবান্তে কিছু দিন সাংসারিক কোনও কার্য্যে যোগ দিতে দেওয়া উচিত নহে। প্রসূতিকে সর্ব্বতোভাবে বিশ্রাম করিতে দেওয়া উচিত। এমন কি প্রসূতিকে পরিবারের কোনও লোকজনের সহিত মিশিতে বা কথাবার্ত্তা কহিতে দেওয়া কর্ত্তব্য নহে। এই তত্ত্বও প্রাচীন ভারতে অপরিজ্ঞাত ছিল না। এই কারণেই প্রাচীন ঋষিগণ স্মৃতি-শাস্ত্রে প্রসূতির এক মাস কাল অশুচির ব্যবস্থা করিয়াছেন। এই অশুচি-ব্যাপার যদি না থাকিত, তাহা হইলে কত শত প্রসূতি যে কাল-কবলে কবলিত হইতেন, শুভঙ্করও বোধ হয় তাহার সংখ্যা করিতে পারিতেন না। কুসংস্কার এখানে Segregationএর কার্য্য করিয়া প্রসূতির স্বাস্থ্যরক্ষা করিয়াছে। সংক্রামক পীড়া স্পর্শাদিদোষ হইতে আর প্রসূতিকে আক্রমণ করিতে পারে না। এক মাস কাল এই ভাবে একাকী বিশ্রামাগারে বসবাস করিয়া প্রসূতি স্বাস্থ্যোন্নতি করিয়া থাকেন। প্রসবের দিন প্রসূতিকে হিন্দু গৃহিণীগণ উপবাসী রাখিয়া থাকেন। দ্বিতীয় দিনে প্রসূতিকে তাঁহারা লঘু পথ্য দিয়া থাকেন এবং তৃতীয় দিন হইতে ষষ্ঠ দিন পর্য্যন্ত একাহারের ব্যবস্থা আছে। সপ্তম দিবস হইতে আতপ চাউলের অন্ন ও মৎস্যের ঝোলের ব্যবস্থা হইয়া থাকে। এইভাবে পূর্ণ

এক মাস অতীত হইলে প্রসূতি ক্ষৌরাদি-কার্য্য করিয়া সূর্য্যার্ঘ্য দিয়া শুচি হইয়া থাকেন। এইভাবে ধর্ম্ম-কার্য্যের ভাণে শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা পালন করিয়া অজ্ঞাতভাবে হিন্দুগণ তাঁহাদের ধাত্রী-বিদ্যার পরিচয় দিয়া আসিতেছেন। অশিক্ষিতা ধাত্রীদের অজ্ঞানতাবশতঃ এই সকল নিয়ম ও বন্ধনের মধ্যেও দুর্ঘটনা হইয়া থাকে। আধুনিক শিক্ষিতগণ সেদিকে একবারও দৃষ্টিপাত করেন না। জ্ঞানী এইভাবে আপনার জ্ঞানের অপব্যবহার করিয়া কত বিপদ্-আপদে পড়িয়া অশান্তি ভোগ করিতেছেন, তাহা তাঁহার ভাবিবার বা চিন্তা করিবার অবসর আছে কি না আমরা আদৌ বুঝিতে অক্ষম।

পুরাণাদির কথা ছাড়িয়া দিলে প্রাচীন মেয়েলীব্রত-কথার মধ্যেও প্রাচীন ভারতের ধাত্রীবিদ্যার অনেক নিদর্শন পাওয়া যায়। সন্তানহিত-কামনায় জননীগণ ষষ্ঠীপূজার অনুষ্ঠান বৎসরের মধ্যে কয়েকবার করিয়া থাকেন। আমরা এখন সেগুলি কুসংস্কার বলিয়া সমাজ হইতে বিতাড়িত করিতেছি। কিছুদিনের পর আর "ব্রত" কথার চিহ্ন পর্য্যন্তও থাকিবে না। ক্রমে প্রাচীন ধাত্রীবিদ্যা একবারে ভারত হইতে বিলুপ্ত হইবে।

উচ্চ-উপাধিধারীর কথা বলি না। যাঁহারা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি পরীক্ষা দেওয়ার ক্ষমতাপ্রাপ্তি আশয়ে পাঠ আরম্ভ করিয়া থাকিল তাঁহারাও কালিদাসের রঘুবংশের তৃতীয় সর্গে পাঠ করিয়াছেন, সুদক্ষিণার গর্ভ-লক্ষণ প্রকাশ পাইলে গর্ভরক্ষার জন্য ও সুপ্রসবের নিমিত্ত মহারাজ "অজ" কি কি ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। প্রাচীন ধাত্রীবিদ্যা আপনার গুণ-গৌরবে এমন প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিল যে মহাকবি কালিদাস তাঁহার কাব্যমধ্যে তাহার উল্লেখ পর্য্যন্ত না করিয়া পারেন নাই। আর আজ গর্ভাবস্থায় প্রথম তিন মাসের বমন-উদ্রেক দেখিলে আমরা তাহা নিবারণ করিতে অসমর্থ। প্রাচীনা বলিয়া দিবে লবঙ্গের জল খাইলে সেই বিবমিষা একবারে সারিয়া যাইয়া প্রসূতিকে শান্তি দিয়া থাকে।

আমরা এই পরম উপকারী বিদ্যায় একবারে উদাসীন হইয়া পদে পদে অশান্তি ভোগ করিতেছি। লোকশিক্ষা-প্রচারের প্রধান সহায় মাসিক ও সাপ্তাহিক কাগজাদিতে কবিতা, উপন্যাস প্রভৃতি স্থান পায়, কিন্তু এসম্বন্ধে কোনও কথা লিখিত ও পঠিত হয় না। অন্তঃপুরবাসিনীদিগকে এ বিষয় শিক্ষা দেওয়ার কোনও চেষ্টা M. D, M. B. L. M. S,রা করেন না। অন্য দেশের সম্রান্তীয়াও আপন আপন সন্তানকে জীবনের অভিজ্ঞতা জ্ঞাপক করিয়া শিক্ষা দিয়া থাকেন। কেবল অতি প্রয়োজনীয় বিষয়ে উদাসীন থাকিয়া আমরা জ্ঞানের অপব্যবহার করিয়া থাকি বলিয়াই আমাদের কবি আমাদের জাতীয় জীবন এক কথায় প্রকটিত করিয়া গিয়াছেন, "ভারত শুধুই ঘুমায়ে রয়।"

শ্রীকালীকান্ত বিশ্বাস।

ভারতে রোগোৎপত্তির কারণ এবং পল্লীবাসের অযোগ্যতা

সর্ব্বসুখ-স্বাস্থ্য-প্রদায়িনী ভারতভূমি বর্ত্তমান সময়ে দুঃখ ও অস্বাস্থ্যের আবাসে পরিণত হইয়াছে। ইহার মূলানুসন্ধান করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, দারিদ্র্যই তাহার মূলীভূত কারণ। দারিদ্র্যের ভীষণ পীড়নে, এক-দিকে যেমন নিজ শ্রম-লব্ধ ফলের অসদ্ভাবহেতু শ্রম-বিরক্তি জন্মিতেছে, অপরদিকে তেমনি তদ্ধেতু স্বাস্থ্যভঙ্গ হইতেছে। কাহাকে কোন্ কর্ম্মে যত্নাধিক শ্রম করিতে বলিলে, প্রত্যুত্তর পাওয়া যায়, "যে বিদ্যা শিখিয়াছি, তাহারই পারিশ্রমিক পাইতেছি না—আর পরিশ্রম করিয়া কি করিব ?"

শ্রমবিমুখতায় যেরূপ স্বাস্থ্যের হানি হয়; আবার উদরপূর্ত্তির জন্য নিয়মাধিক শ্রমহেতু সেরূপ দেহের ক্ষয় হয়। সে ক্ষতিপূরণের সংস্থান-অভাবে জীবনের জড়ীয়-ভিত্তি শিথিল হইতেছে, কাজেই দেহ ব্যাধির আবাসস্থল হইতেছে। আবশ্যকীয় পরিমিত পুষ্টিকর খাদ্যদ্রব্যের অভাব ও অপাচ্য দ্রব্যের সমধিক প্রভাবহেতু পরিমাণরক্ষা না হওয়ায় পোষণ-প্রবাহ (Nutritive stream) স্থাপিত হইয়া জীবনী-শক্তির (Vital force) স্তব্ধতা আনয়ন করে, এবং তাহাতেই দেহে নানাবিধ বীজাণুরূপ শত্রুর আধিপত্য বিস্তার করিবার সুযোগ ঘটিয়া থাকে। মূলকথা, দেহের জীবনী-শক্তি-সম্পন্ন কোষাবলীর (Cell protoplasm or amoeba) অবসাদই রোগোৎপত্তির কারণ।

বর্ত্তমানকালে ভারতে বাষ্পীয় শকট, বাষ্পীয় পোত, এবং কল-কারখানার অত্যধিক প্রচলন অস্বাস্থ্য ও দারিদ্র্যের অন্যবিধ উদ্দীপক কারণ। এই সবের প্রচলনের যে আবশ্যকতা নাই, তাহা বলা যায় না। কারণ, দেশে সভ্যতাবিস্তার, ভাবের আদান-প্রদান, কিঞ্চিৎ ধনবৃদ্ধি, আমদানী-রপ্তানীর এবং শীঘ্র যাতায়াতের সুবিধা হইতেছে। তবে, দেশ-কাল বুঝিয়া প্রচলন-নিয়মের ব্যবস্থা করিতে হইবে, এবং দেশ, কাল, পাত্র বিবেচনা করিয়া প্রচলনের গতি-নির্ণয় করিতে হইবে। এই সমুদায়ের যতই প্রসার-প্রতিপত্তি পাইতেছে, ততই ভারতবাসী অকর্ম্মণ্য হইয়া দরিদ্র হইতেছে এবং বীর্য্যহীন হইয়া ব্যাধির করাল-কবলে নিপতিত হইতেছে। ইহাতে ভারতবাসীর যেমন যাতায়াতের, আমদানী-রপ্তানীর সুবিধা ও শ্রমের লাঘব হইয়াছে সত্য, তেমন আবার নদীর প্রাকৃতিক স্রোত অবরুদ্ধ হওয়ায়, বদ্ধ-জলাশয়, ডোবা, খাল-বিল ইত্যাদির সৃষ্টি হইয়া অবিরত পূতিবাষ্পোদ্গমে এবং দূষিত পানীয় সেবনে জন-সমাজ পীড়িত হইয়া পড়িতেছে। দেশব্যাপী রেলের রাস্তা হওয়ায়, রাস্তার

দুইধারে গর্ত্ত খনন করা হইতেছে এবং রাস্তার বাঁধের দরুণ জমির জল-নিকাশ হইতে পারিতেছে না। এই উভয় কারণেই বহু সময় ব্যাপিয়া জল আবদ্ধ থাকায় পূতিবাষ্পের উদ্ভব হইয়া ম্যালেরিয়ার বীজ সৃষ্টি করিতেছে। পরন্তু নদীর উপর সেতু নির্ম্মাণ করায় প্রাকৃতিক স্রোত বাধা পাইয়া নদী ক্ষীণা হইতেছে। আবার নদীর উপর অবিরত ষ্টীমার চলায়, প্রাকৃতিক বায়ু-বিতাড়িত-তরঙ্গাঘাতে দুইকূল ভাঙ্গিয়া যে পরিমাণে নদী ভরাট হয়, তদপেক্ষা অবিরত ষ্টীমারের তরঙ্গাঘাতে নদী অধিক ভরাট হইতেছে। স্বাভাবিক স্রোত এবং বায়ু-তাড়িত তরঙ্গাঘাতে নদীর এককূলই স্বভাবতঃ ভাঙ্গে, কারণ, স্রোতের তীব্রতা একদিকেই হয় এবং বায়ুও একদিকেই প্রবাহিত হইয়া থাকে। স্বভাবতঃ এক কূল ভাঙ্গে, অপর কূল গড়ে। আর, এই অবিরত অস্বাভাবিক তরঙ্গাঘাতে নদীর উভয় কূলই সমভাবে ভাঙ্গিয়া নদীর অবস্থা হীন করিয়া ফেলে। অর্ণবযান চলিবার উপযুক্ত ক্ষেত্র অর্ণব-ই, বোধ হয়, নদীসমূহ নহে। এই ক্ষীণকায় নদীসমূহে ষ্টীমার চলিবার সুবিধার জন্য, ষ্টীমার-কোম্পানী আবার নদীর উভয় পার্শ্ব বাঁধিয়া বিস্তৃত স্রোতকে এক-স্রোত করায়, উভয় পার্শ্বই শৈবালময় হইয়া জল অপেয় হইয়া উঠিতেছে। ষ্টীমার-কোম্পানী ক্ষীণ দেহকে একেবারেই মৃতদেহে পরিণত করিতে যাইতেছেন।

"রাজহংস করে কেলি স্বচ্ছ-সরোবরে,
যায় কি সে কভু আর পঙ্কিল সলিলে, শৈবালদলেরধাম।"

এই চিরপ্রসিদ্ধ কথাটি এখন দেখি কেবল কবির কল্পনাতেই পর্য্যবসিত হইতে চলিল। স্বচ্ছসরোবর ত এখন শৈবালদলেরধাম পঙ্কিল সলিলে পরিণত হইয়াছে, তটিনীও এখন পঙ্কিল সলিল ও শৈবাল-দলের-ধাম হইতে চলিল। রাজহংস এখন কেলি করিবে কোথায়? সেজন্য এখন দায়ী হইবেন কে? নদীর এই হীনতার কারণেই দুর্ভিক্ষ আর

ষ্টীমারের প্রতাপেই হউক, ক্রমে ক্রমে বাঙ্গালীর প্রধান খাদ্য মৎস্যাদির বংশলোপ হইতেছে। নদীর ক্ষীণতায় জল দূষিত হইতেছে এবং তদুপরি আবার মৎস্যাদির (Natural scavengers and purifiers) অভাবে জলের আবর্জনাদির পরিষ্কারের ত্রুটিতে আরও বিষদুষ্ট হইয়া রোগোৎপত্তির কারণ হইতেছে। কল-কারখানার অত্যাধিক প্রচলনে, সহরে ও পল্লীগ্রামে বিভিন্ন রুচির বৈদেশিক লোক মাত্রাধিক বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহাতে খাদ্যদ্রব্য অত্যধিক মহার্ঘ্য ও অপ্রাপ্য হইয়া উঠিতেছে। এই লোকবৃদ্ধিহেতু খাদ্যদ্রব্যের অভাবই মনুষ্যসমাজে জীবন-সংগ্রামের একমাত্র কারণ এবং ইহাই চুরি-ডাকাইতির প্রশ্রয়দাতা। অভাবেই লোকের স্বভাব নষ্ট হয়। লোকবৃদ্ধি হইতেছে, অথচ খাদ্য ও বাসস্থান 'যথাপূর্ব্বং তথাপরং' কিন্তু অংশী অনেক; কাজেই, ঘোরতর সংগ্রামের পর যোগ্যতমের বা প্রবলতমের উদ্বর্ত্তন-ফলে (Survival of the fittest or strongest) বিজয়িদলই নানাপ্রকার বাধা-বিঘ্নের ভিতর দিয়া ঈপ্সিত-দ্রব্যপ্রাপ্তির যোগ্য হইয়া উঠিতেছে। যোগ্যের ও অযোগ্যের বৃদ্ধির তারতম্যানুসারে ধ্বংসের অনুপাত নিরূপিত হইয়া থাকে। যোগ্যতমের মাত্রাতীত পরিবর্দ্ধনই অযোগ্যের বিনাশের কারণ। আত্মরক্ষার জন্য প্রাণান্ত-পরিচ্ছেদ চেষ্টাপরায়ণতার যে অবস্থা, তাহারই নাম Struggle for existence—সত্ত্বা বাঁচাইয়া রাখিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা। অযোগ্য হইতে যোগ্যের যে পার্থক্য-সংঘটন, তাহারই নাম Natural selection—প্রাকৃতিক পাত্রনির্ব্বাচন। আর, অযোগ্যের উচ্ছেদ এবং যোগ্যের উদ্বর্ত্তন, তাহারই নাম Survival of the fittest-যোগ্যতমের উদ্বর্ত্তন। বর্ত্তমান সময়ে, ভারত, এই অবস্থাত্রয়ের কোন্ অবস্থায় উপনীত তাহা বিশেষ চিন্তা করিবার বিষয়। গৃহ-কার্য্যাদির জন্য মুটে-মজুর-পাইটের বিশেষ অভাব হইতেছে এবং কল-কুঠীর আবর্জ্জনাদি

ও ব্যক্তিসঙ্ঘের মলমূত্রাদিতে স্থানীয় জলবায়ু দূষিত হইয়া উঠিতেছে। সহর পরিষ্কারের ব্যবস্থা থাকায় এবং খাদ্য দ্রব্যাদির ও মজুর লোকের আমদানী থাকায় তত অসুবিধা হইতেছে না, কিন্তু এ সবের অভাবে গ্রামের অবস্থা বড়ই শোচনীয় হইয়া উঠিতেছে।

যে সময় হইতে ভারতে এ সবের প্রচলন বেশী হইয়াছে, সেই সময় হইতেই রোগের প্রকোপ বেশী হইয়াছে, দেখা যাইতেছে। যখন এ সবের প্রচলন ছিল না, তখনও ভারতভূমি বর্ত্তমান সময় অপেক্ষা আর্থিক ও দৈহিক-সম্বন্ধে সমধিক সমৃদ্ধশালিনী ছিল। তখনও ভারত হইতে বহুবিধ পণ্যসমূহ বিদেশে রপ্তানি হইত এবং কোটি কোটি টাকা ভারতে আসিত। ভারতবাসী নীরোগ শরীরে স্বাস্থ্যসুখ ভোগ করিয়া দীর্ঘজীবী হইত। স্থিতিশীল দরিদ্রতা বা নৈসর্গিক পরিবর্ত্তন যে কোন প্রচ্ছন্ন কারণেই হউক, সুজলা-সুফলা-শস্যশ্যামলা ভারতভূমি এখন একরূপ নির্জলা-নিষ্ফলা-বিরলশস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আবার, গোচারণ-ভূমির অভাবে এবং দরিদ্র গোরক্ষকদিগের অসমর্থতায় গবাদির খাদ্য-সংরক্ষণের বড়ই অভাব পরিলক্ষিত হইতেছে, তদ্ধেতু গোকুল অন্নাভাবে বড়ই দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছে এবং হীনস্বাস্থ্য গাভী দ্বারা কৃষকেরা আবার হলকর্ষণ করায় তাহারা আরও অসুস্থ ও অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িতেছে। অতএব, দিন-দিনই দেশে দুগ্ধের পরিমাণ স্বল্প হইয়া যাইতেছে। আজকাল পুষ্করিণীর পাড়, রাস্তার ধার এবং জমির আলি ব্যতীত গোচারণ-যোগ্য স্থান বাঙ্গলাদেশে সুদুর্ল্লভ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। দেখিতে পাওয়া যায়, এক্ষণে অনেক জমিদার পুষ্করিণীর পাড়, ভরাট পুষ্করিণীর গর্ভ পর্য্যন্ত জমা-বন্দোবস্ত করিয়া ফেলিতে আরম্ভ করিয়াছেন। তাহার ফলে, সর্ব্বত্রই খোঁয়াড়ের সংখ্যা অনেক বৃদ্ধি পাইতেছে। গোচারণ-যোগ্য-ক্ষেত্র না রাখাতে প্রত্যহ বহু গো, মহিষ খোঁয়াড়ে পড়িতেছে। এই

সমস্ত পাপজনক কার্য্যগুলির জন্য অনেকাংশে জমিদার মহাশয়দিগকেই দোষী সাব্যস্ত করা যাইতে পারে। যদি এখনও জমিদারবর্গ বিশেষতঃ হিন্দু জমিদারবর্গ একটু ত্যাগশীল না হন, ধর্ম্মবিশ্বাসী না হন, তবে অচিরাৎ দেখিতে পাওয়া যাইবে—তাঁহারা পেটের দায়ে উঠান চষিতে আরম্ভ করিয়াছেন এবং গরুমহিষগুলি খোঁয়াড়ের সম্পত্তিতে পরিণত হইয়া গিয়াছে। ইহার ফলভোগ সকলকেই সমভাবে করিতে হইবে।

হায় রে! আর মাঠে মাঠে পূর্ব্বের ন্যায় হৃষ্টপুষ্ট গরুর পাল দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না। আহা! সেই শ্যামলবৃন্দাবনে শ্যাম সখা-সনে গোপাল মধুর বংশীরবে আর বিচরণ করে না। সুস্থকায় বৎসগণ ঊর্দ্ধ-পুচ্ছ হইয়া ইতস্ততঃ পরিভ্রমণকরতঃ নব দুর্ব্বাদল ও প্রচুর মাতৃস্তন্য ভক্ষণ করে না। ধবলী-শ্যামলী গাভী সকলের সুমধুর হাম্বারবে শ্যামল বৃন্দারণ্য আর মুখরিত হয় না। তাহাদের সে স্বাধীনতাসুখ চলিয়া গিয়াছে—আনন্দসূচক হাম্বারবের বিষাদ-ধ্বনি এখন কাণে বাজিতেছে। ২৫।৩০ বৎসর পূর্ব্বেও এই বাঙ্গলাদেশে যথেষ্ট পতিত জমি ছিল। সর্ব্বত্রই যথেষ্ট গো-মহিষ ছিল এবং সে সমস্ত পশুগুলির স্বাস্থ্য অনেক ভাল ছিল। সে সময় অনেক গৃহস্থের এক মণ, দেড় মণ পর্য্যন্ত দুগ্ধ হইত। ছোট ছোট উৎসব অনুষ্ঠানে অনেক গৃহস্থ দুগ্ধ, ঘৃত এবং মাখন প্রভৃতির কার্য্য ঘর হইতেই চালাইয়া লইতে সমর্থ হইতেন। এখন একখানা গ্রাম ঘুরিলে অর্দ্ধ মণ দুগ্ধ সংগ্রহ করা দুঃসাধ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

পশুজাতির মধ্যে গোজাতির মন সর্ব্বাপেক্ষা সহজে বিরক্ত হয়—এই বিরক্তচিত্ততাহেতু তাহাদের দুগ্ধের অতি সহজেই গুণের ব্যত্যয় হয়। সুস্থ গাভীর দুগ্ধে যে সকল উপাদান থাকে, ব্যাধিগ্রস্ত কিম্বা বিকৃতচিত্ত গাভীর দুগ্ধে তদ্বিপরীত উপাদান দৃষ্ট হয়। এ ছাড়া অন্য দ্রব্যাদিও থাকিতে পারে। এই সকল দ্রব্য তাহাদের খাদ্য হইতে আসে। অনেক

সময় গাভীর খাদ্য নানাবিধ তৃণাদি, গাছপালা ও শস্যের গন্ধ দুগ্ধে অনুভূত হয়। গাভীকে অধিক পরিমাণে সুরাসার পান করাইলে তাহা দুগ্ধের সহিত নির্গত হয়। দুর্গন্ধপূর্ণ স্থানে অনেকক্ষণ রাখিয়া দিলে দুগ্ধেও তদনুরূপ গন্ধ অনুভূত হয়। গাভীর অনেকক্ষণ ঠাণ্ডায় থাকা, জলে ভিজা কিম্বা গরমে থাকা প্রভৃতি কারণে দুগ্ধের উপাদান ও পরিমাণের তারতম্য হয়। বিভিন্নজাতীয় গো-দুগ্ধের উপাদানেরও বিভিন্নতা দেখা যায়। গাভীকে দিনে দুইবার দোহন করিলে প্রাতের অপেক্ষা সন্ধ্যার দুগ্ধে স্নেহজাতীয় উপাদানের আধিক্য দৃষ্ট হয়। অতএব, গৃহস্থের বিশেষ বিবেচনা করিয়া তদনুযায়ী গাভীর খাদ্যের ব্যবস্থা করা উচিত। কারণ, খাদ্যের তারতম্যে দুগ্ধেরও তারতম্য হইয়া থাকে। গাভীসকল মুক্তভাবে উন্মুক্ত ময়দানে চরিয়া খাইতে পারিলে, তাহাদের স্বাভাবিক জ্ঞান বা প্রবৃত্তি অনুসারে উপযোগী খাদ্য এবং আহারোপযোগী খাদ্যাংশ (esculent parts) তাহারা বাছিয়া খাইতে পারে, তাহাতে তাহাদের শরীরের বিশেষ উপকার সাধন হয়। শাস্ত্রীয় স্বাস্থ্য-কথায় বলে,—

"স্বচ্ছন্দ বাহার দেহ বৎস সুস্থকায়।
সে গাভীর দুগ্ধ সদা অমৃত যোগায়॥"

মুক্তভাবে উন্মুক্ত বায়ুতে ইচ্ছামত বিচরণ করিতে পারিলে তাহাদের স্বাস্থ্যও ভাল থাকে এবং মনও প্রফুল্ল থাকে, তাহাতে দুগ্ধের উপকারিতা শক্তি বর্দ্ধিত হয়। কথায় বলে, গোজাতির মনোভাব বুঝা কঠিন। অতএব, তাহাদের ব্যাধিনিরূপণও কঠিন হয়। তবে, মুক্ত ময়দানে স্বেচ্ছামত চড়িতে পারিলে ব্যাধি-প্রতীকারের জন্য নিজেরাই অনেক ঔষধ-তুল্য তৃণাদি বাছিয়া খায়। বাঁধা গরুর খাদ্যে তাহা হয় না—খাদ্য-সহযোগে অনেক অনুপযোগী অখাদ্যাংশও তাহাদের উদরস্থ হয়। তাহাতে ব্যাধি হয় ও দুগ্ধের গুণের তারতম্য হয়। লোকে কথায় বলে, "বাঁধা

গরুর যোগা ঘাস"। তবে, গৃহস্থের গৃহে কতকগুলি খাদ্য দেহপুষ্টির জন্য সংগৃহীত থাকে। গোমাতা মনুষ্য-মাতা হইতেও শ্রেষ্ঠ। মনুষ্য-মাতা কেবল সন্তানকে শৈশবেই স্তন্যদান করিয়া থাকেন, কিন্তু, গোমাতা মানবকে শৈশব হইতে বার্দ্ধক্য পর্য্যন্ত সমভাবে দুগ্ধপ্রদান করেন। অতএব, এই গরীয়সী গোমাতার খাদ্য এবং সেবা-শুশ্রূষার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা উচিত। এই জন্যই হিন্দুরা গোজাতিকে এত সম্মানের চক্ষে দেখিয়া থাকেন।

একেই ত দুগ্ধ উৎপন্ন হইতেছে না, যাহা হইতেছে তাহাও দূষিত; অধিকন্তু, গোয়ালারা ব্যবসায় রক্ষার জন্য একভাগ দুগ্ধে তিনভাগ নানা-স্থানের দূষিত জল অতর্কিতভাবে মিশ্রিত করায় সে দুগ্ধ আরও বিষদুষ্ট হইতেছে। এবম্বিধ ব্যাপারগুলি রোগোৎপত্তির প্রধান কারণ হইয়া উঠিতেছে। স্বভাবতঃ দুগ্ধেই রোগ-বীজাণু বেশী উৎপন্ন হয়। অতএব, সে দুগ্ধ বিশুদ্ধ হওয়া একান্ত প্রয়োজন। যতপ্রকার খাদ্য আছে তন্মধ্যে দুগ্ধই নানাপ্রকার বীজাণুবর্দ্ধনের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা উপযোগী। সেজন্য ইহাতে নানাপ্রকার বীজাণু সহজেই জন্মিয়া থাকে। সুস্থ গাভীর দুগ্ধ ভিতরেই বীজাণুপূর্ণ কিম্বা বাহির হইবার সময় বীজাণুযুক্ত হইতে পারে। অবিকৃতাবস্থায় ইহাদিগের মধ্যে কতকগুলি রোগোৎপাদনকারী। আর, বিকৃতাবস্থায়ও অত্যধিক পরিমাণ বীজাণুর সৃষ্টি হয়। বিশেষ বৈজ্ঞানিক উপায়ে দোহন করিলে সুস্থ গাভী হইতে বীজাণুশূন্য দুগ্ধ পাওয়া যাইতে পারে। এই দুগ্ধকে বীজাণুশূন্য পাত্রে রাখিলে দুই বৎসর পর্য্যন্ত অবিকৃত অবস্থায় থাকে। সাধারণতঃ এরূপ দুগ্ধ পাওয়া অসম্ভব। সহরে ক্রেতার নিকট দুগ্ধ পৌছিতে ৬ হইতে ১২ ঘণ্টা পর্য্যন্ত সময় লাগে এবং এই সময় মধ্যে বীজাণুর সংখ্যাও যথেষ্ট বৃদ্ধি পায়। বাজারের দুগ্ধ সকল সময়েই বহুপরিমাণ বীজাণুপূর্ণ থাকে। এই সকল কারণে, ইহাদের সংখ্যার অনেক তারতম্য হয়।

আমেরিকার কলোম্বিয়া প্রদেশে নির্দ্ধারিত আছে যে, প্রথম শ্রেণীর ১৭ কোটা দুগ্ধে (in ice of certified milk) ৫০০০এর অধিক বীজাণু থাকিবে না। বিশেষরূপ উপায় অবলম্বন করিলেও দুগ্ধে বীজাণুর সংখ্যা ইহাপেক্ষা কম করা যায় না। ১৭ ফোটার (ice) ৫০০০এর অধিক হইতে ১,০০,০০০ লক্ষ পর্য্যন্ত বীজাণু থাকিলে তাহা দ্বিতীয় শ্রেণীর দুগ্ধ (Inspected milk) বলিয়া পরিগণিত হইবে।

যে দুগ্ধ অনেকক্ষণ অনাবৃত অবস্থায় রাখা হইয়াছে, তাহাতে বীজাণুর মাত্রা অধিক হয়। বীজাণুর সংখ্যা গণনা দ্বারা দুগ্ধ ব্যবহারের উপযোগী কি অনুপযোগী সে বিষয়ের বিশেষ কোন সিদ্ধান্ত হয় না। সংখ্যা-গণনা অপেক্ষা বীজাণু কোন্ জাতীয় তাহা জানাই অধিক আবশ্যক। দুগ্ধজাত অধিকাংশ জীবাণুই নিরাপদ, তাহারা কেবল দুগ্ধের পুষ্টিকারিতা হানি করিয়া নিজেদের সংখ্যা বৃদ্ধি করে। কিন্তু সময়ে সময়ে যক্ষ্মা, ডিফ্থিরিয়া, টাইফয়েড, কলেরা, উদরাময় এবং অন্যান্য সংক্রামক ব্যাধির বীজাণু থাকিয়া দুগ্ধকে বিপজ্জনক করিয়া তুলে। সাধারণ বীজাণুর কতকগুলি দুগ্ধের অম্লত্ব উৎপাদন করে, কতকগুলি দুগ্ধের পচনে সহায়তা করে এবং অপর কতকগুলি বর্ণের পরিবর্ত্তন করে।

ভারতে দিন-দিনই খাদ্য-দ্রব্যাদির অভাব হইতেছে, বিশেষতঃ বাঙ্গলায়, বাঙ্গালীর প্রধান খাদ্য মৎস্যের অভাব, দুগ্ধ-ঘৃতাদির অভাব। বাঙ্গালী জীবন রক্ষা পাইবে কিরূপে? যে একটু দুগ্ধ মিলে তাহাও বিষাক্ত। অতএব বর্ত্তমান সময়ে ইহার প্রতীকারের উপায় চিন্তা বিশেষ প্রয়োজনীয় হইয়া পড়িয়াছে। নহিলে, ভারতবাসী ক্রমেই ধ্বংসের পথে দ্রুত অগ্রসর হইবে।

নিম্নভূমি পূর্ব্ববঙ্গেই পাটের চাষ-আবাদ বেশী। তদ্দেশেও ইদানীং জলাভাববশতঃ পাট-পচনের সুবিধা এবং পাট-আঁশের উন্নতি-কল্পে মুগুকর-

নদীসমূহে পাট-পচন-প্রথা প্রচলন করায় নদীর জল অপেয় হওয়ায় ম্যালেরিয়ার প্রকোপ দিন দিনই বৃদ্ধি পাইতেছে। পাট-পচন-ক্রিয়াও কতকগুলি জীবাণু দ্বারা সংসাধিত হয়। এই সকল জীবাণু সেই পচন-জলে, পাটের জাগে এবং বায়ুতে অবস্থিতি করে। এই সকল জীবাণু অধিকাংশই মশক-বীজ-সম্ভূত বলিয়াই অনুমিত হয়। কারণ, মশকমাতা প্রধানতঃ দূষিত ও আবর্জ্জনাপূর্ণ জলেই ডিম্ব ত্যাগ করে। এই ডিম্ব এবং ডিম্ব-স্ফুট কীটগুলি ক্ষুদ্র মৎস্যাদির আহার, তাহারা ইহাদিগকে দেখিতে পাইলেই খাইয়া ফেলে। কাজেই, এরূপ স্থানেই ইহারা ডিম্ব প্রসব করিতে বাধ্য হয়। মশক-জীবনের মূলতত্ত্বও ইহাই। যে সব স্থানে এই পাট-পচন বেশী হয় এবং যথায় নল-খাগড়া উদ্ভিজ্জ ইত্যাদি আবর্জ্জনা-পূর্ণ দূষিত জলাশয় বেশী, তথায় মশক ও ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব বেশী দেখা যায়। ঐরূপ স্থানেই ঐরূপ জীবোৎপত্তির সম্ভাবনা স্বাভাবিক। কারণ, প্রাচ্য ও প্রতীচ্য উভয় দেশের বিবৃতিবাদী পণ্ডিতেরা "যৌন-নির্ব্বাচন" ও "প্রাকৃতিক-নির্ব্বাচন" এই দুই সূত্র লইয়াই সকল শ্রেণীর জীবের উৎপত্তি স্থির করিতে প্রায় একই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। ডারুইন বলেন, বিভিন্ন শ্রেণীর বিভিন্ন জীবে একই জীবাঙ্কুরের (Protoplasm) ভিন্নরূপ বিকাশ। আর, সাঙ্খ্যদর্শনকার কপিল বলেন যে, বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত বস্তুই মূল প্রকৃতির ভিন্নরূপ বিকাশ। উভয় প্রায় একই কথা। উভয় কথারই বেশ সামঞ্জস্য দেখা যায়।

ম্যালেরিয়া পল্লীগ্রামবাসীর প্রধান শত্রু হইয়া উঠিয়াছে। বর্ষার পরই ম্যালেরিয়ার সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রকোপ দেখা যায়। পূতিবাষ্প হইতে উদ্ভূত একপ্রকার জীবাণু হইতে সর্ব্বপ্রথম ম্যালেরিয়ার উৎপত্তি হয়। নহিলে, প্রথম ম্যালেরিয়ার রোগী কোথা হইতে আসিল? ম্যালেরিয়াগ্রস্ত রোগীর রক্ত পরীক্ষা করিয়া বৈজ্ঞানিকগণ একরূপ জীবাণু দেখিতে

পাইয়াছেন। এই জীবাণু যে ম্যালেরিয়ার কারণ তাহাব স্থিরসিদ্ধান্ত হইয়া গিয়াছে। এই জীবাণু ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে ফরাসী ডাক্তার ল্যাভেরান্ (Laveran) কর্ত্তৃক প্রথম আবিষ্কৃত হয়। ল্যাভেরান্ ইহাকে প্লাজমোডিয়াম্ ম্যালেরিয়া (*Plasmodium malaria*) নাম দিয়াছেন। ইহাকে বাঙ্গলায় ম্যালেরিয়া-বীজাণু নামে অভিহিত করা যাইতে পারে। মশক-দংশনেব দ্বারা এই জীবাণু মনুষ্য-শরীরে ক্রমশঃ সংক্রামিত হয়। মশকের সাহায্যে এই বীজাণু একদেহ হইতে দেহান্তরে, একস্থান হইতে স্থানান্তরে সঞ্চারিত ও সংবাহিত হইয়া থাকে। ইহারা ম্যালেবিয়ার বাহনমাত্র। কিন্তু সকল প্রকার মশক ম্যালেবিয়াবাহী নহে। "এনোফিলিস্ রসিয়াই" নামক কেবল এক জাতীয় মশকই ম্যালেরিয়া-বিষ বহন করিয়া থাকে। এনোফিলিসের কয়েকটি উপশ্রেণী আছে। এই মশক দ্বারাই বীজাণু মনুষ্য-শরীর মধ্যে নীত হয়। 'এনোফিলিস' দংশন করিলেই যে জ্বর হইবে, তাহা নহে। ম্যালেরিয়া বীজাণু 'এনোফিলিসের' শরীর মধ্যে স্বতঃ উৎপন্ন নহে। ইহারা পরাঙ্গপুষ্ট কীটাণু—স্বাধীনভাবে জীবন-ধারণ করিতে পারে না। ইহাদেব প্রথম আশ্রয়দাতা মনুষ্য, দ্বিতীয় আশ্রয়দাতা মশক। ম্যালেরিয়াগ্রস্ত রোগীকে দংশন করিলেই রোগীর শরীর হইতে বিষ মশকে সংক্রামিত হয়। যথন এই-জাতীয় মশা ম্যালেরিয়াগ্রস্ত রোগীকে দংশন করে, তখন রোগীব রক্তের সহিত ম্যালেরিয়ার বীজাণুগুলি মশার পেটের ভিতর প্রবেশ করে ও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। পরে যথন ঐ মশা কোন সুস্থ ব্যক্তিকে কামড়ায়, তখন সেই বীজাণুগুলি মশার হুলের ভিতর দিয়া দেহে প্রবেশ লাভ করে এবং রক্তের সহিত মিশিয়া যায়। ইহার পর ঐ বীজাণুগুলি সেই সুস্থ ব্যক্তির রক্তের ভিতরেই বসবাস করিতে থাকে। জীবরাজ্যে ম্যালেরিয়া-কীটাণুর স্থান সর্ব্বনিম্নস্তরে অবস্থিত। ইহারা প্রোটোজোয়া (Protozoa)

নামক জীবাণু শ্রেণীর অন্তর্গত। প্রোটোজেয়া জীবাণুর বিশেষত্ব এই যে, ইহাদের দেহ একটিমাত্র কোষ (cell) দ্বারা নির্ম্মিত। এই কোষটি প্রোটোপ্লাজম্ (Protoplasm) নামক জৈবণিক পদার্থ দ্বারা পরিপূর্ণ। কালক্রমে এই প্রাক্‌প্রাণী বা প্রোটোপ্লাজমের বিভাগ হয় এবং বিভক্ত আদিপদার্থ প্রাণপঙ্ক এক একটি নূতন জীবাঙ্কুর বা কোরককীটাণুতে (spores) পরিণত হয়। এই কোরককীটাণুগুলি রক্তের লোহিত-কণিকার মধ্যে আবদ্ধ না থাকিয়া বিমুক্ত হইয়া রক্তের মধ্যে ভাসিয়া বেড়াইতে থাকে। পুনরায় লোহিত-কণিকার মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাহার সর্ব্বস্বধন যে হেমোগ্লবিন্ (Hoemoglobin) তাহা আহার করিয়া বেশ হৃষ্ট-পুষ্ট ও পরিণত হইয়া উঠে। আবার নূতন কোরক-কীটাণু উৎপাদন করিবার কালে রোগীর জ্বর দেখা দেয়। লোহিত-কণিকার যে অংশটুকু দেহসাৎ করিতে পারে না, তাহা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিন্দুর আকারে উহাদের গা-ময় ছড়াইয়া থাকে—ইহার নাম মেলেনিন্ (Melanin)। জীবাণু ও উদ্ভিজ্জাণুদিগের বংশবৃদ্ধি-প্রথা অতি অদ্ভুত। একটি প্রাণী দুইভাগে বিভক্ত হওয়ায় দুইটি প্রাণী উৎপন্ন হয় এবং ইহার প্রত্যেকে পুনরায় বিভক্ত হইয়া চারিটি প্রাণী সৃষ্টি করে। এইরূপে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই একটি প্রাণী হইতে লক্ষ লক্ষ প্রাণীর উৎপত্তি হইতে পারে। এইরূপ বাড়িয়া বাড়িয়া ইহাদের গাত্রনিঃসৃত বিষাক্ত রস দ্বারা রক্তকে দূষিত করে এবং তাহা হইতেই ম্যালেরিয়া-জ্বরের উৎপত্তি হয়। আমাদের দেশে এনোফিলিস্ মশক চিরকালই আছে, অথচ পূর্ব্বে এত ম্যালেরিয়া ছিল না। ইহার মুখ্য কারণ, ম্যালেরিয়া রোগীর অভাব। ম্যালেরিয়া রোগীর অভাবের সঙ্গে দেশ-বাসীর আর্থিক স্বচ্ছলতা—জলবায়ুর বিশুদ্ধতা—পল্লী বাসযোগ্য ছিল। ম্যালেরিয়া রোগীই সুস্থ ব্যক্তির ম্যালেরিয়া জন্মাইবার গৌণ বা উদ্দীপক

কারণ। এনোফিলিস্-বহুল স্থানে ম্যালেরিয়া রোগী আসিলেই তথাকার অধিবাসীদিগের ম্যালেরিয়া হইবার খুব সম্ভাবনা থাকে।

কোন কোন জায়গায় সময়ে সময়ে মশকের সংখ্যা এত বেশী হয় যে, সন্ধ্যার সময়ও বসিতে হইলে মশারি খাটাইয়া বসিতে হয়। বিশেষতঃ বর্ষাকালে ইহাদের উপদ্রব অত্যন্ত অধিক হয়। এই মশকজাতির আকৃতি-প্রকৃতি এবং ব্যবহার জানিয়া রাখা আবশ্যক, তাহা হইলে আমরা পূর্ব্ব হইতে সাবধান হইতে পারি। বিশেষ মনোযোগ-সহকারে না দেখিলে কেবল ছোট, বড় ব্যতীত সব মশকই এক রকমের বোধ হয়, কিন্তু তাহা নহে। সাধারণ মশক ও ম্যালেরিয়াবাহী মশক এই দুই রকমের মশক আছে। ইহাদের মধ্যে পার্থক্য আছে। সচরাচর যে সকল মশক দেখা যায়, তাহারা সাধারণজাতীয়। সাধারণ মশকের পেটের নীচে ডোরা ডোরা দাগ ও একটী হুল আছে। এই হুলটি মশার শরীরের সহিত সমকোণে থাকে, কাজেই দেওয়ালের গায়ে সোজা হইয়া বসে। আর ম্যালেরিয়াবাহী মশকের পালকে ছিট্ ছিট্ দাগ আছে, সাধারণ মশকের ন্যায় হুল ছাড়া হুলের দুই পাশে দুইটি শুঁড় থাকে, আর হুলটি সাধারণ মশার ন্যায় শরীরের সহিত সমকোণে না থাকিয়া সরলভাবে অবস্থান করে, তজ্জন্য রক্তশোষণ এবং আহারগ্রহণমানসে মনুষ্য-শরীরে এবং দেওয়ালের গায়ে বক্রভাবে বসিয়া থাকে। সাধারণ মশক অপেক্ষা এনোফিলিস্ দেখিতে সরু। মশকের মধ্যে স্ত্রীজাতি শুধু রক্তপান করিয়া থাকে। পুরুষজাতি পরমবৈষ্ণব—ফল-মূলের রস পান করিয়া জীবনধারণ করে। স্ত্রী-পুরুষকে চিনিবার সহজ উপায়—পুরুষের রেক্ (atenua) পালকযুক্ত হংসপুচ্ছের ন্যায়, স্ত্রীজাতির তাহা নহে। এ ছাড়া স্ত্রীমশকের পেট অনেক সময় ডিম্ব-পরিপূর্ণ থাকে। মশকের উদরে যদি রক্ত থাকে, তাহা হইলে তাহারা

নিশ্চয় স্ত্রীমশক, কেননা পুরুষ-মশক কখন রক্তপান করে না। এনো-ফিলিস্ খানা, ডোবা ইত্যাদি যে সকল স্থানে জল বদ্ধ থাকে, তথায় ডিম পাড়ে। ডিম হইতে অত্যন্ত ক্ষুদ্র শুঁয়াপোকার ন্যায় মশক-শাবক সকল নির্গত হয়। কিছুকাল যাবৎ ইহাদের পালক বাহির হয় না। এই সকল শাবক একবার করিয়া নিশ্বাস লইবার জন্য জলের উপর ভাসিয়া উঠে এবং পরক্ষণেই আবার ডুবিয়া যায়। মশকশাবকের পক্ষোদগম হইলে তাহারা জল হইতে উড়িয়া যায়। নিকটে কোন লোকালয় থাকিলে, সেইখানেই আশ্রয়গ্রহণ করে। গ্রাম হইতে অর্দ্ধক্রোশ ব্যবধান মধ্যে মশক-উৎপত্তির পক্ষে যদি কোন অনুকূল জলাশয় প্রভৃতি না থাকে, তাহা হইলে ম্যালেরিয়া না হইবারই কথা। ইহারা অধিক দূর কি অধিক উচ্চে উড়িয়া যাইতে পারে না এবং বাড়ীর উপরের গৃহে ইহাদিগকে কদাচিৎ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের কয়েকটী উপশ্রেণীর মধ্যে কয়েকজাতীয় এনোফিলিস্ কদাচ লোকালয়ে আসে। ইহারা সচরাচর বন, জঙ্গল, পাহাড়-পর্ব্বতে বাস করে। আবর্জ্জনাদিই জঙ্গলের মশকের প্রধান খাদ্য। লোকালয়ে মশক প্রথমতঃ গলিত খাদ্যদ্রব্যাদির দ্বারা আকৃষ্ট হয়; পরে মনুষ্য-শোণিতের আস্বাদ পাইলে গৃহমধ্যেই বসবাস করিতে থাকে। এনোফিলিস্-মশকের একটী বিশেষ ধর্ম্ম এই যে, ইহারা অন্ধকারে থাকিতে ভালবাসে এবং সন্ধ্যার পূর্ব্বে প্রায়ই বাহির হয় না। ইহারা নিশাচর, দিবাভাগে অন্ধকার-গৃহের কোণে, বাক্স, আলমারী, সিন্দুক ইত্যাদির তলদেশে, আরসি, ছবি, আলনাস্থিত কাপড়, জামার পশ্চাদ্ভাগে এবং ভাঁড়ের মধ্যে, গোশালায়, আস্তাবলে, গৃহস্থিত কলসী প্রভৃতির ভিতরে লুকাইয়া থাকে, সূর্য্য অস্ত যাইবামাত্র শীকার অন্বেষণে বাহির হইয়া পড়ে এবং লোকজনকে দংশন করিতে থাকে। গৃহের আলোক দ্বারা আকৃষ্ট হইয়াও এবং সন্ধ্যাকাল ব্যতীতও অতি প্রত্যূষেও দরজা, জানালা

খোলা পাইলে বাহির হইতে অনেক মশা গৃহমধ্যে প্রবেশ করে। ঊষার আলোক ফুটিতে না ফুটিতে ইহারা অদৃশ্য হইয়া পড়ে। ইহারা রাত্রি ভিন্ন দিবাভাগে কদাচিৎ দংশন করিয়া থাকে। এই কারণে রাত্রি-কালকেই ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হইবার প্রশস্ত সময় বলিতে হইবে। এনোফিলিস্-মশকের জীবন কত দিন স্থায়ী হয়, তাহা ঠিক জানা যায় নাই। তবে, শীতঋতু দেখা দিলে অধিকাংশই মরিয়া যায়।

মশকের স্বাভাবিক শত্রুও অনেক। ডিম্বাবস্থায় ও কীটাবস্থায় ক্ষুদ্র মৎস্যকুল, ব্যাঙ ও ব্যাঙাচি ইহাদের বিশেষ শত্রু। পরিণতাবস্থায়, টিক্‌টিকি, গিরগিটি, মাকড়সা, বাদুড়, চামচিকা ও পেচক প্রভৃতি ইহাদের ঘোরতর বৈরী।

এইরূপ স্বাভাবিক ধ্বংসসত্ত্বেও ইহাদের বংশ-বৃদ্ধির যে সব উদ্দীপক কারণ বর্ত্তমান রহিয়াছে এবং ইহারা যেরূপ ম্যালেরিয়া-রাক্ষসীর ক্ষিপ্রগামী বাহকের কার্য্যে তৎপর থাকিয়া ইহার সঞ্চারের সহায়তা করিতেছে, তাহাতে ইহার ত্বরিত প্রতীকারের চেষ্টা অবশ্যকর্ত্তব্য। মশক-বংশ ধ্বংস এবং ম্যালেরিয়া-নিবারণের যে সব বৈজ্ঞানিক উপায় আছে, তাহাও বহু-ব্যয়সাধ্য। দেশের আর্থিক ও দৈহিক অবস্থা একেবারেই হীন হইয়া পড়িয়াছে। বিজ্ঞান বলেন, ম্যালেরিয়া প্রশমন-যোগ্য।—প্রমাণ, পানেমার এবং যশোহরের স্বাস্থ্যোন্নতি। এই ম্যালেরিয়া দূর হইলে দারিদ্র্যও অনেকাংশে দূর হইবে। কিন্তু, ইহার প্রতীকারের চেষ্টা আমাদের সদাশয় প্রজাবৎসল গভর্ণমেণ্টের কৃপাদৃষ্টির উপরই বেশী নির্ভর করিতেছে। কেননা, তাঁহার প্রজাগণের অবস্থা বড়ই শোচনীয়।

সহরের উন্নতিতে বড় আসে যায় না। পল্লীগ্রামের উন্নতি-অবনতির উপরই দেশের উন্নতি-অবনতি বিশিষ্টরূপে নির্ভর করে। সহরের

উন্নতিতে দেশের স্বল্পসংখ্যক লোকের এবং বিদেশের বহুসংখ্যক লোকেরই উন্নতি সাধিত হয়। এইরূপ উন্নতিতে সমগ্র দেশের স্বাস্থ্য ও অর্থ-সম্বন্ধে ক্ষতি ভিন্ন লাভ অধিক হয় না। পল্লীগ্রামসমূহে বিশুদ্ধ পানীয় জলের বিশেষ অভাব হইয়া দাঁড়াইয়াছে। গ্রামবাসীর আর্থিক স্বচ্ছন্দতার অভাবে গ্রাম্য-পুষ্করিণীগুলি বহুদিনাবধি সংস্কার না হওয়ায়, জলজ উদ্ভিদপূর্ণ, পঙ্কিল-সলিল পানে গ্রামবাসী রুগ্ন হইয়া পড়িতেছে। পল্লীবাসীর স্বাস্থ্যোন্নতির গৌণ-ফলই সহরের এবং দেশের সমৃদ্ধি।

পল্লীগ্রামগুলি জঙ্গলাদিতে পূর্ণ—হিংস্রজন্তুর আবাসস্থল। গ্রামে ভাল চিকিৎসক নাই, ভাল লোক নাই, ভাল রাস্তা-ঘাট নাই, ভাল পানীয় জল নাই, চাকর-বাকর, মুটে-মজুর পাওয়া যায় না—সকলেই স্ব-স্ব প্রধান—যাহারা বৃত্তি বা চাকরাণ ভোগ করিয়া পূর্ব্বে দশকর্ম্মের সাহায্য করিত, এখন আর তাহারা কর্ম্ম করিতে চাহে না। এমন কি তাহারা উচ্চজাতির স্পৃষ্ট-অন্ন গ্রহণেও অসম্মতি প্রকাশ করে। গ্রামে যে কোন রকমের ক্রিয়াদি করিতে গেলেই পরিচারকের অভাবে তাহা সম্পন্ন হওয়া অসম্ভব হইয়া পড়ে। নবশাখ-সম্প্রদায়গণও নিজেদের উচ্ছিষ্ট উত্তোলনে অস্বীকৃত হয়—এখন কর্ম্মকর্ত্তার সে কার্য্য সম্পাদন না করিলে আর উপায় নাই। বর্ত্তমান সময়ে ইহার প্রতীকারের উপায় উদ্ভাবন করাও একটী বিশেষ আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে।

নিম্নতন জাতিকে উদ্বর্ত্তনের অবকাশ দেওয়াও বর্ত্তমান সময়ে আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে, সন্দেহ নাই। কারণ ব্যবসায়-বাণিজ্যাদিতে ব্যবহারিক কার্য্যকলে এবং সমাজ-শাসনের স্বাধীনতার খর্ব্বতায় তাহাদের অর্থাগম হওয়ায়, তাহারা ধনশালী হইতেছে। সে অর্থে তাহারা নিজেদের জ্ঞানোন্নতি এবং দেশের অনেক কার্য্য করিবার উপযুক্ত সামর্থ্য লাভ করিতে পারে। কিন্তু ক্রমোন্নতিই জগতের স্বাভাবিক নিয়ম। তাহারা

একেবারেই সিদ্ধি চাহিতেছে—ইহাই অস্বাভাবিক। ঋদ্ধির বহু পরে সিদ্ধি আসে।

গ্রামে অল্পসংখ্যক বড় লোকদের কার্য্যাদি একরূপ চলিয়া যায়—কিন্তু বহুসংখ্যক মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকের পল্লীবাস একরূপ অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে। গ্রামে কেবল দলাদলি—কেবল পাটওয়ারী বুদ্ধি—কেবল হিংসা-দ্বেষ। পল্লীগ্রামগুলি বিভীষিকাময় স্থান হইয়া উঠিয়াছে। গ্রামের লোকের কর্ম্মহীনতাও ইহার উদ্দীপক কারণের অন্যতম। যেহেতু, মানব কর্ম্মশীল। নিষ্ক্রিয় মানবের অস্তিত্ব কষ্ট-কল্পনার বিষয়; মানুষ নিষ্ক্রিয় হইয়া বসিয়া থাকিতে পারে না। এখন যদি পল্লীগ্রামের বর্ত্তমান অভাব-অভিযোগগুলির সংস্কার আরম্ভ হয়, তবে পল্লীবাসীর অনেক কাজ করিবার থাকে—কর্ম্মক্ষেত্র প্রসারিত হয়—এবং হিংসা-দ্বেষের অবসরও কম হয়। পক্ষান্তরে পল্লীগ্রামসমূহ বাসের উপযুক্ত হয়।

এখন সমন্বয়ের যুগ। বাক্য ও কার্য্য উভয়ই সমভাবে চলিবে। নীরব কর্ম্মের যুগ পশ্চাৎ আসিতেছে। এইরূপ সুধী-সংহতির উদ্দেশ্য হইবে দেশের ও জাতির অভাব-অভিযোগের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা। সে উদ্দেশ্য যদি কেবল লেখনী ও মসীসংযোগে একটা চিহ্নমাত্র সরণী আবিষ্কার করতঃ সভাসমিতিতে উপস্থিত হইয়াই স্থগিত রহে—তবে দেশের ও জাতির অভাব-অভিযোগের প্রতীকার কি হইল?—সাহিত্য-সম্মিলনে কেবল সাহিত্যেরই শ্রীবৃদ্ধি-সাধন হওয়ায় একাজ পূর্ণ হইল—সাহিত্য-সংরক্ষণের যে স্থানের অভাব তাহা রহিয়াই গেল।

সোণার বাঙ্গলার সে স্বনামধন্য নাম-গৌরব এখন আর নাই—অভাব-অভিযোগের বিষাদময় কলঙ্ক-কালিমায় বাঙ্গালা বড়ই কলঙ্কিত।—বাঙ্গলার পল্লী-নিবাস বাসের অযোগ্য হইয়া উঠিয়াছে। অভাব-অভিযোগগুলি তিরোহিত হইয়া আবার পল্লীগ্রামসমূহ মানুষের বাসযোগ্য

হইলে মধ্যবিত্ত বাঙ্গালী আর নির্ব্বংশের পথে অগ্রসর হইবে না, তাহারা যাহা উপার্জ্জন করে, তাহাতেই লক্ষ্মীশ্রী অর্জ্জন করিতে পারিবে। বাঙ্গলার পল্লীবাস পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইলে, বাঙ্গালীর সমাজ আবার সজীব হইবে, বাঙ্গলার পুরাতন মনুষ্যত্বের আদর্শ আবার সমুজ্জ্বল হইবে—কলঙ্ক-কালিমা ঘুচিয়া বাঙ্গালা আবার সোণার বাঙ্গলায় পরিণত হইবে। অভাব-অভিযোগাদি ছিল না বলিয়াই লোকে তখন পল্লীগ্রামে থাকিতে ভালবাসিত।

সমৃদ্ধসহরে জলের কলের সৃষ্টি হওয়ায়, জনসাধারণের পরিষ্কৃত পানীয়ের ও জলের অভাব খুব দূর হইয়াছে সত্য; কিন্তু পক্ষান্তরে, বোধ হয় পীড়াদির ততোধিক বৃদ্ধি হইতেছে। জল-নালিকাগুলি রোগ-বীজের যেন আবাসস্থল হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সহরে জলদানের বিরাম-কালে জলাধারে ও জল-নালিকার আবদ্ধস্থানে আর্দ্রতাহেতু যে সব জীবাণুর উদ্ভব হয়, সে সব জীবাণু জল-স্রোতের সহিত জল-গ্রাহকদের ব্যবহারে আসে এবং আরো ঐ সমস্ত স্থানে জলীয় বাষ্প দ্বারা যে ময়লা পড়ে, তাহা হইতেও ঐরূপ জীবাণুর উদ্ভব হইয়া থাকে। গঙ্গাজলে এরূপ রোগনাশক পদার্থ বিদ্যমান আছে যে, তাহাতে রোগ-বীজ সংস্পর্শমাত্র বিনষ্ট হইয়া যায়। গভর্ণমেণ্টের আদেশক্রমে জীবাণুবিৎ পণ্ডিতগণ ইহা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া ইহার সত্যতা প্রতিপাদন করিয়াছেন। গঙ্গা-জলের এই সর্ব্বপ্রধান উপকারিতার জন্যই হিন্দুরা গঙ্গাজলকে এত সম্মান করিয়া থাকেন। বহুকাল পূর্ব্বে আর্য্যভারতে, বোধ হয়, ইহার পরীক্ষা হইয়াছিল। সেই ব্যাধিবিনাশক মলিন গঙ্গাজল জলের কলে কৃত্রিম উপায়ে শোধিত হইয়াই আরো জীবাণুময় হইতেছে। যে স্থানে অন্য নদী হইতে জল-সংগ্রহ হয়, সে স্থানে ত আরও হইবার কথা। সহরে, লোক-বৃদ্ধির সহিত স্বাস্থ্যরক্ষার এত নিয়মাদি থাকা সত্বেও পীড়ার প্রকোপ

কমিতেছে না কেন? ইহাই আমাদের জিজ্ঞাস্য। যে পরিশ্রুত জল (Distilled water) নির্দ্দোষজ্ঞানে আমরা পান করিয়া থাকি, অণুবীক্ষণ-যন্ত্র সাহায্যে তাহার মধ্যেও বহুসংখ্যক বড় বড় জীবাণু দৃষ্ট হয়। বড়গুলি আবার ছোটগুলিকে খাইতেছে, অযোগ্যের উচ্ছেদ এবং যোগ্যের বা প্রবলের উদ্বর্তন হইতেছে। জগতের সর্ব্বত্রই এই শাসন-তন্ত্রের বিধান চলিতেছে।

ভারতে, পূর্ব্বকালের পল্লীবাসী স্ত্রীলোকগণের প্রাতে ও সন্ধ্যায় কলসী কক্ষে করিয়া নদী হইতে জল আনয়ন-প্রথাটি মন্দ নয়। ইহাতে এক-দিকে স্রোতের বিশুদ্ধ জল পানীয়-স্বরূপে আনা হয়, অপরদিকে, আবার বিমুক্ত বিশুদ্ধ বায়ুতে বিচরণ ও পরিশ্রমজন্য স্বাস্থ্যের উন্নতি সাধিত হয়। বর্ত্তমানকালে, এ প্রথার প্রচলন কম হওয়ায়, বোধ হয়, পল্লি-বাসিনীদের স্বাস্থ্যহানিই হইতেছে।

অনেকে হয়তো বলিতে পারেন যে, পাশ্চাত্যদেশে জীবিকা-উপায় বড়ই আয়াস-সাধ্য। তথায় বৈজ্ঞানিক যন্ত্র-সাহায্যে পরিশ্রম লঘু এবং কিছু সময় উদ্বৃত্ত হইলেও জীবিকা-অর্জ্জনের ও বর্ত্তমান জ্ঞান-পিপাসা-তৃপ্তির জন্য আরও পরিশ্রম করিবার থাকে। সুফলা ভারত-ভূমিতে জীবিকা-অর্জ্জন বর্ত্তমান সময়ে অপেক্ষাকৃত সহজ-সাধ্য, ও পূর্ব্ববৎ অভাব-বোধের ন্যূনতা, বৈজ্ঞানিক-যন্ত্র-সাহায্যে পরিশ্রম লঘু এবং সময় উদ্বৃত্ত হইলেও শরীর-চালনায় উপযুক্ত অভাব ঘটিয়া ব্যাধির আগম হয়, পক্ষান্তরে বিলাসিতাও আশ্রয়গ্রহণ করে। শিক্ষানুরাগের প্রভাবেই কর্ম্মক্ষেত্র বাড়িয়া যায়? যন্ত্র-সাহায্যে পরিশ্রম লঘু ও সময় উদ্বৃত্ত হইলেই যে, উপযুক্ত অঙ্গ-চালনায় অভাব ঘটে এবং বিলাসিতা বাড়ে, বাস্তবিকপক্ষে তাহা নহে। অর্থকরী শিক্ষায় অনুরাগের অভাবেই কর্ম্মক্ষেত্র সঙ্কুচিত হওয়ায় উক্ত দোষ-সমুদায় প্রশ্রয় পায়। একটি সামান্য বিষয়েই দেখিতে পাই, যাঁহাদের অনেক

আবাসদ্বারেই কাষ্ঠ-নির্ম্মিত কি প্রস্তর-নির্ম্মিত যে সকল পুরাতন কারু-কার্য্যখচিত চৌকাট-কপাট এখনও আছে, তৎসমুদায় পূর্ব্বকালের শারীরিক পরিচালনার এবং অর্থকরী শিক্ষায় অনুরাগের সমধিক সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। সে সময়ের হস্তনির্ম্মিত যে সমস্ত শিল্পচাতুর্য্য দেখা যায়, তাহা বর্ত্তমানকালের যন্ত্রনির্ম্মিত শিল্পকার্য্য হইতে একেবারে নিকৃষ্ট নহে।

ষড়্‌ঋতুর আবাসভূমি ভারতে এখন আবার ঋতুগুলির প্রভাবও সমভাবে উপলব্ধি হয় না। এই সমতাবিলোপও স্বাস্থ্যভঙ্গের কারণান্তর্গত। সর্ব্বসুখ-স্বাস্থ্য-বিধায়িনী ভারতভূমিকে মহাকালরূপিণী ম্যালেরিয়া, কলেরা, বসন্ত ও প্লেগ এই রাক্ষসী-চতুষ্টয় গ্রাস করিয়া ফেলিতে উদ্যত হইয়াছে। সম্প্রতি আবার কনিষ্ঠা ভগিনী বেরিবেরী আসিয়া ইহাদের দলপুষ্টি করিয়াছে। জ্যেষ্ঠা ভগিনীগণ রক্তের লোহিতকণা শোধন করিয়াছে, কাজেই দেহে জলের ভাগ বেশী হওয়ায় বেরিবেরীতে ক্ষমতা প্রকাশ করিবার সুযোগ ঘটিয়াছে, ক্ষয়াধিক্যই অবসাদের কারণ। দেহে আবার রক্তের লোহিতকণাধিক্য না হইলে এ অবসাদক-পদার্থের (Fatigue stuffs) বিনাশ হইবে না।

যে সব উদ্দীপককারণে এই সব রোগোৎপত্তি হইতেছে, সেই কারণ-নিচয়ের মধ্যে পূতিবাষ্পই (ম্যালেরিয়া) সর্ব্বপ্রধান কারণ বলিয়া বিবেচিত হয়। ম্যালেরিয়ার পরিচয়, সমসংজ্ঞা, নির্ব্বাচন, কারণতত্ত্ব, লক্ষণতত্ত্ব, নিদানতত্ত্ব, শ্রেণীভেদ, রোগের গতি ও পরিণতি ইত্যাদি আলোচনা করিলে, দেখিতে পাওয়া যায়, অন্তয়োগগুলি ইহারই নামান্তর মাত্র। ম্যালেরিয়া যে কি পদার্থ, তাহা অদ্যাপি সম্পূর্ণরূপে নিরূপিত হয় নাই, উহা একপ্রকার বিশেষ বিষাক্তপদার্থ এইমাত্র জানা গিয়াছে। কোন কোন জীবাণুবিদ্ পণ্ডিতের সিদ্ধান্ত এই যে, সূর্য্যোত্তাপে আর্দ্রভূমি হইতে যে পূতিবাষ্পের উদ্ভব হয়, তাহাতে এই সকল বিষাক্ত জীবাণু সমুৎপন্ন হয়।

এই বিষাক্ত পদার্থের পরিমাণ ও প্রকারভেদে এবং ভিন্ন ভিন্ন রোগীর শারীরিক প্রকৃতির বৈলক্ষণ্য অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন লক্ষণাবলী প্রকাশ পায় এবং তাহাই বিভিন্ন রোগ নামে অভিহিত হয়।

দেশ-কাল ও অবস্থার অনুকূলতা অনুসারে এই জীবাণু উৎপন্ন হয় এবং ইহা জল ও বায়ুতে ভাসমান থাকে। সেই দূষিত জল ও বায়ু শরীরস্থ হইলেই এই সব পীড়া উৎপন্ন হয়। অতএব, যাহাতে দেশের জল-বায়ুর বিশুদ্ধতা রক্ষা করা যায়, তাহার উপায় উদ্ভাবন না হইলে, এই মহামারীর হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাওয়া কঠিন। প্রাচ্য ও প্রতীচ্য উভয়দেশের "বিবরণীতে" দেখা যায় যে, যখনই দেশে দুর্ভিক্ষ ও দরিদ্রতা বৃদ্ধি পায়, তখনই ব্যাপক পীড়ার প্রাদুর্ভাব হয় এবং দরিদ্রদিগের মধ্যেই এই পীড়াদির প্রকোপ বেশী দেখা যায়। মূলকথা, দেশের দারিদ্র্য দূরীভূত না হইলে জল বিশুদ্ধ হইবে না, জল-বায়ু বিশুদ্ধ না হইলে ম্যালেরিয়াও অপসারিত হইবে না এবং ম্যালেরিয়া-বীজ বিদূরিত না হইলে জন-সাধারণের স্বাস্থ্যোন্নতি হইবে না। স্বাস্থ্যোন্নতি না হইলে বৈধানিক-তন্তু-কোষগুলির জীবনী-শক্তির হ্রাস-ক্রিয়া (tissue cell in state of low vitality) বিদূরীত হইবে না। জীবনী-শক্তির হ্রাস হেতুই সর্ব্ব-প্রকার ব্যাধির উৎপত্তি হয়। তাই, হোমিওপ্যাথির আবিষ্কর্ত্তা মহাত্মা হানিমান্ বলিয়াছেন যে, "Diseases are produced only by the disturbed Vital-Force." উপরিউক্ত বিষয়গুলির গুরুত্ব অধিক এবং বর্ত্তমান সময়ে ইহার প্রতীকারের চেষ্টাকরাও দেশবাসীর একান্ত প্রয়োজনীয় হইয়া উঠিয়াছে।

শ্রীনলিনীকান্ত বসু।

মধ্যবিত্ত শ্রেণীর দুরবস্থা

অভাবমোচন ও বিলাস

মানুষ তাহার অভাব-মোচন-উদ্দেশ্যে রাত্রিদিন পরিশ্রম করিতেছে। সংসারের কৃষি-শিল্প-বাণিজ্যাদির বিপুল আয়োজনের উদ্দেশ্য মানুষের নানাবিধ অভাব মোচন করা। সহরের কলকারখানা বা গ্রামের পারিবারিক শিল্পকর্ম্ম, মন্থরগতি গরুর গাড়ী অথবা বেগবান্ মেল-ট্রেণ, নৌকা বা সামুদ্রিক জাহাজ, মুদীর দোকান অথবা বড় বড় হৌস্ বা ব্যাঙ্ক প্রভৃতি সবগুলিই মানুষের নানাবিধ অভাব-মোচনের জন্য সৃষ্ট হইয়াছে। অভাব-মোচনের জন্য সমগ্র সমাজ শ্রমবিভাগ নির্দ্দেশ করিয়া নিম্নলিখিত কার্য্য-প্রণালী অবলম্বন করিয়া থাকে—[পর পৃষ্ঠা দেখ]

প্রথমে কৃষিজাত দ্রব্য অথবা খনিজ পদার্থ হইতে দ্রব্য প্রস্তুতকরণের উপকরণ-সামগ্রী পাওয়া যায় (ক)। ঐ সমস্ত উপকরণ লইয়া কারখানা-ফ্যাক্টরীতে দ্রব্য প্রস্তুত হয় (খ)। পরে বাণিজ্যের দ্বারা যাহার অভাব তাহার নিকট নীত হইয়া অভাবমোচন করে (গ)। এই তিন প্রকার কার্য্যের জন্য প্রত্যেক ক্ষেত্রেই পরিশ্রম এবং মূলধনের সংযোগ প্রয়োজনীয়। ধনোৎপাদনের জন্য অহোরাত্র যে বিপুল পরিশ্রম লাগিতেছে, উহার বিনিময়ে মানুষ প্রথমতঃ আপনার অভাবমোচন করিতে পারিতেছে। আত্যন্তিক অভাবমোচন করিয়া উদ্বৃত্ত ধন হয় বিলাস-ভোগ (ঘ) অথবা ভবিষ্যৎ লাভের আশায় ধনোৎপাদনের জন্য পুনরায় নিয়োজিত করিতেছে (ঙ)। শেষোক্ত অর্থপ্রয়োগই সমাজের অর্থবৃদ্ধির বিশেষ সহায়। দুই একটি উদাহরণ দিলে স্পষ্ট বুঝা যাইবে। কোন কৃষক শস্য বিক্রয় করিয়া কিছু টাকা পাইয়াছে। সে ঐ টাকায় যদি একখান লাঙ্গল

ক

কৃষি এবং খনিজ দ্রব্য।
দ্রব্য প্রস্তুত করণের
উপকরণসামগ্রী
উৎপাদন।

পরিশ্রম
মূলধন

উদ্বৃত্ত ধনভোগ
বিলাস-সামগ্রী

খ

দ্রব্য প্রস্তুত করণ

ঘ

ধনোৎপাদন-ক্রিয়ার
ক্ষতিপূরণ
মূলধন

পরিশ্রম
মূলধন

গ

দ্রব্য বিক্রয়
বাণিজ্য

পরিশ্রম
মূলধন

অথবা জমির উপযুক্ত সার ক্রয় করে, তাহা হইলে ভবিষ্যতে তাহার কৃষিকার্য্যে পরিশ্রমের অনেক লাঘব হইবে। কিন্তু যদি সে তাহা না করিয়া মদ খাইয়া ঐ টাকা খরচ করিয়া ফেলে, তাহা হইলে তাহার পূর্ব্ব

পরিশ্রমের কোন চিহ্নই থাকিবে না। সাময়িক উত্তেজনায় ক্ষণিক আমোদের জন্য অর্থ ব্যয়িত হইল, অর্থব্যয়ের কোন স্থায়ী ফললাভ হইল না। আর একটি উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে। কোন জমিদার কি করিয়া তাঁহার অর্থব্যয় করিবেন ঠিক করিতে পারিতেছেন না! বিদ্যালয়-স্থাপন, পুষ্করিণী-খনন, শিল্পব্যবসায়-প্রবর্ত্তন প্রভৃতির জন্য অর্থ ব্যয় করা তাহার ইচ্ছা, কিন্তু সম্প্রতি পারিষদবর্গের পরামর্শে তিনি নৃত্যগীতাদির জন্য অনেক অর্থব্যয় করিতেছেন। যেস্থলে অর্থবয়ের ফল অধিককালব্যাপী হয় না, তাহাকে আমরা প্রচলিত কথায় বিলাস-ব্যাপার বলিয়া থাকি। নৃত্য-গীতাদিতে অর্থব্যয়ের ফল বেশীক্ষণ থাকে না; অপরদিকে সেই পরিমাণ অর্থে যদি একটি ব্যবসায় বা বিদ্যালয় চলিতে থাকে, এই প্রকার অর্থ-ব্যবহারের সুফল আমরা অনেক বৎসর পর্য্যন্ত দেখিতে পাই। ধনবিজ্ঞানের দিক্ হইতে শেষোক্ত প্রকার অর্থ-ব্যবহারকে মূলধননিয়োগ (ঙ) বলা হয়। ইহার দ্বারা দেশের ধনবৃদ্ধি অথবা নৈতিক এবং মানসিক উৎকর্ষ সাধিত হইয়া থাকে। একদিক্ হইতে দেখিতে গেলে মানসিক অথবা নৈতিক উন্নতি সমাজের ধনবৃদ্ধির উপায় মাত্র।

যেখানে অর্থ-ব্যবহার বৈষয়িক উন্নতির কোন কাজেই আসে না, অর্থ আছে অতএব অর্থব্যয় করিতে হইবে, নিজের বা সমাজের শক্তি বৃদ্ধির জন্য যখন উহা নিয়োজিত হয় না, কেবলমাত্র ক্ষণিক সুখের জন্য স্বার্থান্ধদিগের দ্বারা ব্যয়িত হয়, তখন উহাকে আমরা বিলাসিতা, সৌখীনতা, বাবুয়ানী বলিয়া থাকি।

এইস্থলে একটি কথা মনে রাখা আবশ্যক। সামাজিক রীতিনীতি এবং দেশের জল-বায়ু অনুসারে অনেক দ্রব্য বিভিন্ন দেশে নিত্য আবশ্যক অথবা বিলাস-সামগ্রী হইয়া থাকে। ইউরোপে জুতা এবং জামা পরিধান কোন শ্রেণীর পক্ষেই বিলাস নহে, আমাদিগের দেশে দরিদ্র কৃষকগণের

পক্ষে উহা বিলাস হইবে। আমাদিগের মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের পক্ষে ছাতা ব্যবহার বিলাস নহে, কিন্তু ইউরোপে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে উহা বিলাস হইবে। চীন দেশে চা-পান বিলাস নহে, আমাদিগের দেশে ইহা বিলাস (চ)। বাস্তবিক পক্ষে বিভিন্ন দেশের জলবায়ু এবং সামাজিক অভ্যাস-অনুসারে বিলাসসম্বন্ধে আলোচনা করিতে হইবে। দেশের জলবায়ু এবং সামাজিক অনুষ্ঠানকে কেহ অবজ্ঞা করিতে পারে না। কিন্তু যদি কেহ কতকগুলি কৃত্রিম অভাব-মোচন করিবার জন্য শুধু ব্যস্ত হয়, অথচ ঐ সমস্ত অভাব-মোচন না করিলেও বৈষয়িক জীবন-সংগ্রামে তাহার শক্তির হ্রাস হয় না, তাহা হইলে ধনবিজ্ঞান অনুসারে আমরা তাহাকে বিলাসী বলিব।

বিলাস-ভোগসম্বন্ধে কয়েকটি মতামত

একণে বিলাস-ভোগ কোন ব্যক্তিবিশেষ এবং সমগ্র সমাজের পক্ষে কতদূর বাঞ্ছনীয় তাহা বিচার করিতে হইবে। বিলাসীরা বলিয়া থাকেন, আমরা যদি বিলাস ভোগ না করি, অধিকসংখ্যক লোক কোন কাজ না পাইয়া অনাহারে থাকিবে। অনেক লোক বিলাস-সামগ্রী প্রস্তুত করিবার জন্য পরিশ্রম করিতেছে, উহাদিগের কাজ গেলে সমাজের ক্ষতি হইবে। কিন্তু একটু ভাবিয়া দেখিলে তাঁহাদিগের ভ্রম দূর হইবে। যে টাকা তাঁহারা বন্ধুবান্ধবদিগের সহিত আমোদ-প্রমোদের ক্ষণস্থায়ী সুখের জন্য খরচ করিতেছেন, সেই টাকায় যদি তাঁহারা একটি হাসপাতাল নির্মাণ করিয়া দিতেন, তাহা হইলে রোগীদিগের খাদ্য, বস্ত্র, ঔষধ প্রভৃতি উৎপাদনের জন্য প্রায় ততগুলি শ্রমজীবী কাজ পাইত। শ্রমজীবীদিগের পক্ষে ফল সমানই হইত। উপরন্তু সমাজে একটি চিরস্থায়ী অনুষ্ঠানের সূচনা হইত; যাহাদিগের জীবন দুর্ব্বহ এবং অন্ধকারময় তাহারা কিয়ৎ-

পরিমাণে সুখী হইয়া সমাজের শক্তি ও আনন্দবৃদ্ধি করিত। এমন কি যদি ধনীরা বিলাস-ভোগে অর্থব্যয় না করিয়া ব্যাঙ্কে টাকা রাখিয়া দেন, তাহা হইলে ব্যাঙ্কের দ্বারা উহা ব্যবসায়-বাণিজ্যে নিয়োজিত হইবে। অনেক শ্রমজীবী এইরূপে কাজ পাইবে এবং ধনীদিগের অর্থও বৃদ্ধি পাইবে। য়্যাড্যাম্ স্মিথ বলিয়াছিলেন, কোন ধনী যদি কয়জন চাকর নিযুক্ত করেন, তিনি ক্রমে গরীব হইতে থাকিবেন, কিন্তু যিনি শিল্পী নিযুক্ত করেন, তিনি আরও ধনী হইবেন। কিন্তু এক্ষেত্রে ধনীর নিজের অর্থবৃদ্ধি অপেক্ষা সমাজের অর্থ এবং আনন্দবৃদ্ধি অধিক বাঞ্ছনীয় মনে করিতে হইবে। বিলাসীরা আরও বলিয়া থাকেন, সমাজের যদি বিলাস-ভোগের আকাঙ্ক্ষা না থাকে, তাহা হইলে অভিনব অভাব-মোচনোপযোগী অভিনব দ্রব্যসম্ভার প্রস্তুত হইবে না। ইহার ফলে সমাজের ধনোৎপাদন-শক্তি হ্রাস পাইবে, কর্ম্মশক্তি ক্রমাগত একই প্রকার অভাব-মোচন-উদ্দেশ্যে ব্যয়িত হইলে উহা বিকাশ লাভ করিতে পারিবে না। কিন্তু এই প্রসঙ্গে উৎপাদনের আর এক দিক্ও বিবেচনা করা কর্ত্তব্য। ধনোৎপাদন সময়-সাপেক্ষ। সমাজ যদি নিত্যনূতন জিনিষ চাহে, তাহা হইলে অনেক জিনিষ, যেগুলি কারখানায় প্রস্তুত হইতেছে, সেগুলি বাজারে আসিবার পূর্ব্বেই পুরাতন হইয়া যাইবে। ঐগুলি যদি বিক্রয় না হয়, তাহা হইলে সমাজের কত পরিমাণ শক্তি যে ব্যর্থ হইবে তাহা সহজেই অনুমেয়।

নীতির দিক্ হইতে দেখিতে গেলে বিলাস-ভোগ সর্ব্বথা নিন্দনীয়।

রাস্কিন একস্থলে লিখিয়াছেন—যতদিন পর্য্যন্ত সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তিই উপযুক্ত আহার এবং বাসস্থান লাভ না করিতে পারে, ততদিন সে সমাজে বিলাসভোগ অতি নিষ্ঠুর কার্য্য এবং সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জনীয়। রাস্কিনের এ কথা অস্বীকার করা যায় না। বাস্তবিকপক্ষে ইউরোপ-

আমেরিকায় অর্থের যেরূপ অপব্যবহার হয়, তাহা ধারণা করিলে বিপুল অর্থশালী পাশ্চাত্য-সমাজের পক্ষেও এ কথার সার্থকতা উপলব্ধি হয়। আমেরিকায় এক একজন কোটিপতি বান্ধুবান্ধবদিগের সহিত ভোজনে বসিয়া এক রাত্রে কোটি টাকাও খরচ করিয়া থাকেন! সেখানকার ধনীরা কে সর্ব্বাপেক্ষা উদ্ভট উপায়ে অর্থব্যয় করিতে পারে, এই চিন্তাতেই ব্যস্ত! পাশ্চাত্যজগতে যেরূপ বিপুল অর্থোপার্জ্জন, সেরূপ অর্থের অপব্যবহারও সমানভাবে দেখা দিয়াছে। অথচ অসংখ্য শ্রমজীবী আহার্য্য এবং পরিচ্ছদের ব্যয় সঙ্কুলান করিয়া উঠিতে পারে না।

আমাদের বিলাসভোগ

আমাদের দেশে আজকাল বিলাস-ভোগ কি পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে, তাহা ভাবিবার বিষয় হইয়াছে। বাঙ্গালাদেশের বিভিন্ন জেলা হইতে পারিবারিক ব্যয়ের তালিকা সংগ্রহ করিয়া আমি একটি আদর্শ (average) তালিকা গঠন করিয়াছি। উহা হইতে দেশের মধ্যবিত্ত এবং শ্রমজীবী সম্প্রদায়ের মধ্যে বিলাস-সামগ্রীতে ব্যয়ের পরিমাণ বুঝা যাইবে—আমি তিন-চারি বৎসর হইতে বৈষয়িক তথ্য সংগ্রহ করিতে আরম্ভ করিয়াছি। আমি তিনটি আদর্শ তালিকা প্রস্তুত করিয়াছি, ঐ তালিকাগুলি লইয়া স্কুল-কলেজের ছাত্রগণ বিভিন্ন জেলা হইতে নানাবিধ বৈষয়িক তথ্য সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর নিকট হইতে সংগ্রহ করিতেছেন। স্থানে স্থানে যে সকল নৈশ বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে, উহাদের শ্রমজীবি কৃষক অথবা শিল্পিগণও এই সমস্ত তথ্যসংগ্রহের বিশেষ সহায়তা করিয়াছে।

যে সমস্ত তথ্য আমরা শ্রমজীবিগণের নিকট হইতে জানিয়াছি, ইহাতে আমাদের কঠোর দারিদ্র্য নিরূপিত হয়। দারিদ্র্যের অনেক কারণ আছে। একটি কারণ আমাদের দেশে ধন-বিজ্ঞানের সৃষ্টি হয় নাই। ইহার

প্রধান কারণ আমাদের দেশে এখনও বৈষয়িক জীবনের মূল তথ্যগুলি এখনও বিশেষভাবে সংগ্রহ আরম্ভ হয় নাই। মৈমনসিংহের অধিবেশনে সাহিত্য-সম্মিলনের বৈষয়িক তথ্য-সংগ্রহ-সমিতি নামে একটি Com-

	মজুর	কৃষক	সূত্রধর	কর্ম্মকার	দোকানদার	দীন মধ্যবিত্ত
১। খাদ্য	৯৫'৪	৯৪'০	৮৪'৫	৭৯'০	৭৭'৭	৭৪'০
২। বসন	৪'০	৩'০	১১'০	১১'০	৯'০	৪'৭
৩। চিকিৎসা	×	১'০	১'০	৫'০	৫'৯	৮'০
৪। শিক্ষা	×	×	×	×	১'০	৬'৩
৫। সামাজিক ক্রিয়াকলাপ	'৬	২'০	২'৫	৪'০	৫'০	৮'০
৬। বিলাসের সামগ্রী	×	×	১'০	১'০	১'৪	২'০
মোট	১০০'০	১০০'০	১০০'০	১০০'০	১০০'০	১০০'০

mittee স্থাপন করিয়াছিলেন। ইহার উদ্দেশ্য ছিল, বৈষয়িক তথ্য সংগ্রহ করিয়া, এই সমস্ত তথ্য নিরূপণের দ্বারা ভারতীয় ধনবিজ্ঞান সৃষ্টি করা। ধনী-লোকদিগের ব্যয়ের তালিকা সংগ্রহ করিতে পারা যায় নাই; তাঁহাদিগের তালিকা সংগ্রহ করিলে উঁহাদিগের বিলাস-সামগ্রীতে ব্যয়ের পরিমাণ জানা যাইত। উল্লিখিত তালিকাটি হইতে বুঝা যায় যে, কয়েক শ্রেণীর শ্রমজীবী শিক্ষার জন্য ব্যয় না করিয়াও বিলাস-সামগ্রী ক্রয় করে। মধ্যবিত্তদিগের মধ্যে বিলাস-সামগ্রীর জন্য ব্যয় সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। প্রত্যেক শ্রেণীর সামাজিক ক্রিয়াকলাপের জন্য অর্থব্যয়, বিলাস, শিক্ষা এবং চিকিৎসার জন্য ব্যয় অপেক্ষা অধিক। আমাদের বিলাসিতা, বিশেষতঃ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে বিলাসিতাই অবনতির মুখ্য কারণ।

সামাজিক ক্রিয়াকর্ম্মে ব্যয় বিলাসিতা নহে

এ ব্যয়কে অনেকে অর্থের অপব্যবহার মনে করেন। আধুনিক কালে ইহার ভার যে দুর্ব্বহ হইয়া উঠিয়াছে ইহা স্বীকার্য্য। ইউরোপীয় সভ্যতার সমাগমে এ দেশের চালচলন খুব বাড়িয়া গিয়াছে। অনেকগুলি নূতন কৃত্রিম অভাব সৃষ্ট হইয়াছে, কাজেই এক্ষণে সামাজিক ক্রিয়াকলাপগুলি সংক্ষেপে সারিতে অনেকে বিশেষ মনোযোগী হইতেছেন। কিন্তু পাশ্চাত্য-জগতের মাপকাঠির দ্বারা আমাদের সামাজিক ক্রিয়াকলাপগুলি বিচার করা অনুচিত। আমাদের ক্রিয়াকর্ম্ম সমুদয় ধর্ম্ম এবং সমাজানুমোদিত; হিন্দুজাতি যে সামাজিক আদর্শ উপলব্ধি করিয়াছিল, ঐ আদর্শের দিক্ হইতে ইহাদিগকে বিচার করিতে হইবে।

ভারতবর্ষে ব্যক্তির সহিত সমাজের সম্বন্ধ

আমাদিগের দেশে একান্নবর্ত্তী পরিবারের প্রতিপত্তি এখনও কেহ অস্বীকার করিতে পারিবেন না। স্বজাতি এবং সমাজের মর্য্যাদা লোপ

পায় নাই। ব্যক্তিবিশেষের সুখদুঃখে স্বজাতিদিগের সহানুভূতি এবং সমবেদনা এখনও শ্রদ্ধার সামগ্রী রহিয়াছে। কোন হিন্দুকে আমরা তাহার জ্ঞাতি এবং স্বজাতিবর্গ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া ভাবিতে পারি না। তাই হিন্দু তাহার মাথায় দারিদ্র্যের গুরুভার বহন করিয়াও সামাজিক ক্রিয়াকর্ম্মে তাহার জ্ঞাতি এবং স্বজাতিবর্গের সহিত আমোদ-আহ্লাদ করিতে কুণ্ঠিত হয় না। এ প্রকার অনুষ্ঠান স্বেচ্ছাচারী ব্যক্তির নিকটতম বন্ধুদিগের সহিত বিলাসভোগের জন্য নহে,—ইহা আমাদিগের সামাজিক জীবনের সাধনার ফল। ইহা উচ্ছৃঙ্খলতা নহে, ইহা সমাজের বন্ধন। সামাজিক ক্রিয়াকলাপগুলি সমাজের সহিত হিন্দুর জীবন্ত যোগ-অনুভূতির ফল। হিন্দু জন্ম হইতেই সেবার জন্য উৎসৃষ্ট। প্রথমে পারিবারিক জীবন, তাহার পর জাতিগত বা সামাজিক জীবন তাহার কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্ণয় করিয়া দেয়। পরিবার, জাতি বা সমাজকে উপেক্ষা করিয়া কেহই স্বেচ্ছাচারী হইতে পারে না, স্বেচ্ছাচারী হইলে সমাজ তাহার কঠোর শাস্তি-বিধানের ব্যবস্থা করিয়াছে। হিন্দুসমাজ ব্যক্তিগত জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া জাতিত্ব বিকাশের পথ মুক্ত করিয়া দেয়। গাছে যেমন পৃথিবী হইতে শিকড় ছাড়াইয়া ফল ধরিতে পারে না, সেইরূপ হিন্দুর ব্যক্তিত্ব বিশাল সমাজ-ভূমিকে অতিক্রম করিয়া বিকাশ লাভ করে না।

পাশ্চাত্যজগতে ব্যক্তির সহিত সমাজের সম্বন্ধবিচার

আজ-কাল নূতন সভ্যতার সংস্পর্শে আসিয়া আমাদিগের দেশ এক নূতন প্রকার ব্যক্তিত্বের পরিচয় পাইয়াছে। এ ব্যক্তিত্ব পরিবার এবং সমাজবন্ধনকে অবজ্ঞা করে, এমন কি গৃহবন্ধনকেও অস্বীকার করিতে অনেক সময় কুণ্ঠিত হয় না। বন্ধনের ভিতর দিয়াই যে মুক্তি, তাহা স্বীকার করে না। সমস্ত বন্ধনকে শৃঙ্খলের মত দূরে নিক্ষেপ করিতে

পারিলে এ ব্যক্তিত্ব স্ফূর্ত্তিলাভ করে না। ব্যক্তিত্ব বিকাশ তখনই সম্পূর্ণ, যখন বিলাস-ভোগ উচ্ছৃঙ্খল হয়, নিজ ইচ্ছা সর্ব্বোচ্চ সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হইয়া সমাজের সমস্ত দাবীকেই অগ্রাহ্য করে। পাশ্চাত্য-জগতে এ আদর্শ কোন দেশবিশেষের নহে। সমগ্র পাশ্চাত্য-সমাজ বহুশতাব্দীর ক্রম-বিকাশের ফলে এই আদর্শেরই পুষ্টিসাধন করিতেছে। অন্তর্দ্দেশীয় বাণিজ্য এবং যুদ্ধবিগ্রহ এবং স্বদেশে জীবন-সংগ্রামের প্রতিযোগিতায় ফলে এই আদর্শই সেখানে প্রাধান্যলাভ করিয়াছে। ইহার ফলে পাশ্চাত্য-সমাজের মনুষ্যের কর্ম্ম-শক্তির যেরূপ পরিচয় পাওয়া গিয়াছে, জগতে আর কোথাও এরূপ পাওয়া যায় নাই। কিন্তু মনুষ্য সেখানে শক্তিশালী হইলেও আপনার শক্তির অপব্যবহার করিতেছে। ইহাতে সমাজে ঘোর অশান্তি এবং বিপ্লবের সূচনা দেখা দিয়াছে। বিগত ৪ঠা মার্চ্চ প্রেসিডেণ্ট উড্রো উইলসন্ আমেরিকার যুক্তরাজ্যের সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়া একটি সুন্দর বক্তৃতাতে আমেরিকার জাতীয় জীবনের কঠিন সমস্যাগুলি বিশদভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। আমেরিকা জগতের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা ধনী, আমেরিকার ব্যবসায়ী এবং ধুরন্ধরগণের প্রতিভার নিকট সভ্যজগৎ মস্তক অবনত করিয়া রহিয়াছে। কিন্তু বিপুল অর্থো-পার্জ্জনের সঙ্গে অর্থের নিকৃষ্ট ব্যবহারও আমেরিকাবাসিগণকে জগতের সমক্ষে লজ্জা দিতেছে। অর্থোপার্জ্জনের বিনিময়ে সমাজে যে সমস্ত ভয়ানক ব্যাধি প্রবেশ করিয়াছে, তাহার দিকে দৃক্‌পাত নাই—টাকার ঝন্‌ঝনানির শব্দে অসংখ্য শ্রমজীবীর রোদন-ধ্বনি শুনা যায় না। আমে-রিকা বড় হইয়াছে, বড় হওয়াতে তাহার দীনতা আরও প্রকাশ পাইয়াছে।

পাশ্চাত্য-সমাজ যে ব্যক্তিত্বকে তাহার বিপুল প্রয়াসের মধ্য দিয়া ফুটাইয়া তুলিয়াছে, উহা মানব-সভ্যতার পরিপোষক নহে বলিয়া সেখানকার চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ বিবেচনা করিতেছেন। তাঁহারা সকলেই

একটা নূতন যুগের জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। এই নূতন যুগে সমাজের সহিত ব্যক্তির সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠতর হইবে। সমাজের বাহিরে, দীনদরিদ্র-দিগের দৈনন্দিন জীবন-প্রবাহ হইতে দূরে নিঃসম্পর্কভাবে বাস করা হেয় হইবে। সমাজ যে সকলকে লইয়া,—সমাজে সকলেই সুখশান্তির জন্য পরস্পরের মুখাপেক্ষী, এবং এজন্য সকলেরই পরস্পরের নিকট কর্ত্তব্য আছে,—এ জ্ঞানের তখন উপলব্ধি হইবে। ধনী বা নির্ধন, পণ্ডিত বা মূর্খ সকলেই যে মানুষ—তাহার বোধ হইয়া মনুষ্যত্বের আর অমর্য্যাদা হইবে না। মানুষের মনুষ্যত্বের প্রতি যখন শ্রদ্ধা বাড়িবে, তখন প্রজাতন্ত্র এক নূতন প্রাণ পাইবে, সমাজের সকরুণ সহানুভূতির সুরের সহিত আপনার সুর মিলাইবে, উহার মঙ্গল সাধন করিতে আপনার সমস্ত শক্তি নিয়োগ করিবে। রুসোর ঐক্যমন্ত্র, ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের উচ্চ নৈতিক আদর্শ, শেলির গভীর সমবেদনা, এবং ম্যাজিনির ধর্ম্মমূলক প্রজাতন্ত্রবাদ হইতে আরম্ভ করিয়া কার্লাইল এবং এমার্শনের মানব-পূজা, ধনবিজ্ঞানবিদ্-গণের সমাজ-তন্ত্রবাদ, জেমস্ ও বার্গনার আধ্যাত্মিকতা এবং আধুনিক চিত্রকলার অতীন্দ্রিয়তা প্রভৃতি স্থিরভাবে অনুধাবন করিলে সকলেরই মধ্যে একটা নূতন যুগের ভাবুকতা,—মহাপ্রাণ নবজীবনের সূচনা দেখিতে পাই। পাশ্চাত্য-জগৎ এক বিপুল আন্দোলনের সম্মুখে রহিয়াছে।

আধুনিক হিন্দুসমাজে পরানুকরণ

আমাদের বিশেষ দুর্ভাগ্য,—ইউরোপ যে সময়ে আপনার সভ্যতার মূলমন্ত্র এবং আদর্শগুলি আমূল পরিবর্ত্তন করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছে, আমরা এখন সে গুলিই খুব আগ্রহের সহিত আমাদের জাতীয় জীবনে অবলম্বন করিতে উদ্যত হইয়াছি। ইউরোপীয় জাতিদিগের রাষ্ট্রীয় ও বৈষয়িক উন্নতি, এবং তাহাদিগের সাম্রাজ্য ও বাণিজ্য বিস্তার করিবার

ক্ষমতায় মুগ্ধ হইয়া আমরা আমাদিগের জাতীয় আদর্শ এবং সামাজিক অনুষ্ঠানগুলির প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়াছি। আমাদিগের দেশে পুরাতন এবং নূতন আদর্শের মধ্যে তুমুল দ্বন্দ্ব বাধিয়া গিয়াছে। ইউরোপীয় সভ্যতার প্রভুত্ব এবং প্রাবল্যের নিকট আমাদের জাতীয় আদর্শগুলি হার মানিতে চলিয়াছে। আমাদের একান্নবর্ত্তী পরিবার এবং জাতিভেদ-প্রথার প্রতি শ্রদ্ধা কমিয়া আসিতেছে। ইউরোপ যখন আপনার মাপ-কাঠি পরিবর্ত্তন করিতে উদ্যত হইয়াছে, আমরা ঠিক তখনই ইউরোপীয় মাপকাটি এদেশে আনিয়া উহা দ্বারা আমাদিগের সমস্ত অনুষ্ঠান বিচার করিতেছি। ইউরোপের সমাজ-বিরুদ্ধ ব্যক্তিত্বের আদর্শ আমরা ভারতবর্ষে আনিয়া উপস্থিত করিয়াছি। অথচ আমাদের সমাজের পক্ষে ঐ আদর্শ গ্রহণ করিবার সামর্থ্য একেবারেই নাই বলিলেও চলে। আমরা একান্নবর্ত্তী পরিবারের মধ্যে অশান্তিকলহ আনিয়াছি, পাশ্চাত্যগৃহস্থের স্বার্থপরতা আনিয়াছি বটে, কিন্তু তাহার স্বাধীনতা এবং কর্ম্মদক্ষতা লাভ করিতে পারি নাই। আমরা আমাদিগের জাতিভেদপ্রথাকে বন্ধন মনে করিয়া উহার বিরুদ্ধে চীৎকার করিতে আরম্ভ করিয়াছি, অথচ ইউরোপের ঐক্যমন্ত্র হজম করিবার শক্তি আমাদিগের নাই। পাশ্চাত্য-সমাজে ব্যক্তিগত জীবনের স্বাতন্ত্র্য ব্যক্তির স্বাধীন-জীবিকার্জ্জনের উপায় হইয়া সমাজের বিপুল অর্থোৎপাদনের সহায় হইয়াছে। কিন্তু আমাদের দেশে পাশ্চাত্য-আদর্শের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা তাহার উচ্ছৃঙ্খলতার আবরণ মাত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছে। স্বাধীন অন্ন-সংস্থানের কোন চেষ্টা হইতেছে না, অথচ পরিবারবর্গের প্রতি কর্ত্তব্যকর্ম্মে অনাস্থা হইয়াছে। স্বার্থপরতার সঙ্গে অর্থ-পৈশাচিকতা এবং ভোগ-বিলাস-স্পৃহা সমাজকে আক্রমণ করিতেছে। ইউরোপীয় আদর্শের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা আমাদের সমাজে বিলাস-প্রিয়তা এবং সমাজ-বন্ধনের শৈথিল্য আনিয়া দিয়াছে।

পরানুকরণের কুফল

পূর্ব্বেই আমাদের শ্রমজীবিগণের বিলাস-সামগ্রীতে ব্যয়ের পরিমাণ দেখান হইয়াছে। মধ্যবিত্তদিগের বিলাস-খাতে ব্যয় যে অন্যশ্রেণী অপেক্ষা অধিক বলা হইতেছে, ইহার প্রতি এখনও সমাজের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় নাই। আমাদের দেশে এখন হিন্দুজাতির উচ্চশ্রেণীর সংখ্যা যে হ্রাস পাইতেছে তাহার কারণ, সমাজে ভোগ-বিলাসের বৃদ্ধি এবং বৈষয়িক জীবনের প্রবাহ-রোধ। নদীপ্রবাহের বেগ হ্রাস, বহুবৎসর চাষ, কৃষকের অল্পতা প্রভৃতি কারণে ভূমির উর্ব্বরতা হ্রাস পাইতেছে। গ্রাম্যশিল্পগুলি কলকারখানার সহিত প্রতিযোগিতায় বিধ্বস্ত হইতেছে। শিল্পিগণের বংশ-পরম্পরালব্ধ কর্ম্মনৈপুণ্য ব্যর্থ হইতেছে। দেশে মধ্যবিত্তদিগের জন্য শিল্প-ব্যবসায় শিক্ষার-বিশেষ কোন আয়োজন নাই। ধুরন্ধরগণেরও আবির্ভাব হয় নাই। অপরদিকে ভোগবিলাসের বাসনা বাড়িয়াই চলিতেছে। পল্লীগ্রামের কুটীরেও বিলাসিতার স্রোত পৌছিয়াছে। কৃষক এবং শ্রমজীবীদিগের মধ্যে কাঁসা-পিত্তলের বাসনের পরিবর্ত্তে এনামেলের বাসনের প্রচলন আরম্ভ হইয়াছে। কাঁসা-পিত্তলের বাসনগুলি এনামেলের বাসন অপেক্ষা অধিককালস্থায়ী এবং ভাঙ্গিয়া গেলেও ঐগুলি কাঁসা-পিত্তলের দরে বিক্রয় হয়। কিন্তু এনামেলের জিনিষগুলি অব্যবহার্য্য হইলে উহাদিগের পরিবর্ত্তে আর কিছু পাওয়া যায় না। বাস্তবিক পক্ষে তৈজসপত্রগুলি দরিদ্রদিগের মূলধনবিশেষ। অবস্থা মন্দ হইলে ঐগুলি বন্ধক রাখিয়া বা বিক্রয় করিয়া দৈনিক খরচ চালান যাইতে পারে। কিন্তু সম্প্রতি কৃষকগণ এনামেল বাসনের চাকচিক্যে মুগ্ধ হইয়া দুর্দ্দিনের সহায় ঐ সমস্ত তৈজসপত্রকে ত্যাগ করিতেছে। জামা, জুতা, এবং মিহি সূতার বিলাতী কাপড় পরিধানও আরম্ভ হইয়াছে। দেশের

বিদ্যালয়ের এমনি গুণ—কোন কৃষক বা শ্রমজীবী কয়েকদিন পণ্ডিত মহাশয়ের কাছে পড়িলেই বাবু না হইয়া ফিরিতে পারে না। অনেক সময় এমনি চাল বিগড়াইয়া যায় যে, তাহারা বসিয়া থাকিবে সেও ভাল, তবু বাপ-পিতামহের কর্ম্ম করিবে না।

মধ্যবিত্তদিগের দুরবস্থা

মধ্যবিত্তেরা এ বিষয়ে সর্ব্বাপেক্ষা দোষী। তাঁহাদিগের মধ্যে সকলেই চাকুরীজীবী। আফিস আদালতে তাঁহাদিগকে কাজ করিতে হয়, কাজেই তাঁহারা বিদেশী বেশভূষা, চালচলন অবলম্বন করিতেছেন। কার্য্যোপলক্ষে তাঁহাদিগের সহরে থাকা আবশ্যক। গ্রাম অপেক্ষা সহরে সংসারের খরচ অনেক অধিক। গ্রামে থাকিয়া অনেক গৃহস্থ মৎস্য, শাক-সবজী বিনামূল্যে পাইয়া থাকেন, কিন্তু সহরে আসিয়া ঐগুলি ক্রয় করিতে হয়।

আহার্য্য সামগ্রীর মূল্য শতকরা ২৭৲ এবং অন্য সামগ্রীর মূল্য শতকরা ২২৲ বাড়িয়াছে। ইহার ফলে মধ্যবিত্তদিগের অবস্থা ক্রমশঃ মন্দ হইতেছে। চাকুরীজীবিদিগের মাহিয়ানা বাড়িবার আশা নাই। বরং শিক্ষিত ব্যক্তিগণের সংখ্যা যতই বৃদ্ধি পাইতেছে ততই উহা কমিতেছে। শিক্ষিত ব্যক্তিগণ ব্যবসায়-বাণিজ্যে অথবা অন্যপ্রকার স্বাধীন অন্নসংস্থানের দিকে মন বেশী দেন নাই। বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশের হার-বৃদ্ধির সঙ্গে গভর্ণমেণ্টের আফিস-আদালতে বা ব্যবসায়ীদিগের আফিসে কেরাণীগিরি পাওয়া কঠিন হইয়াছে; উকীল, মোক্তার, ডাক্তার প্রভৃতি স্বাধীন ব্যবসায়িগণের গড় আয় বিশেষ কমিয়াছে। অপরদিকে দেশের মূল্যাধিক্যের সমস্ত ভারই মধ্যবিত্তদিগের উপর পড়িয়াছে, কারণ মূল্যাধিক্যের সহিত তাহাদিগের আয়-বৃদ্ধির কোন সম্বন্ধই নাই।

অধিকমূল্যের বিদেশী বেশভূষা পরিধান, চা-পান, সিগার-সিগারেট, ধূম-সেবন, বরফ-পান প্রভৃতির সঙ্গে সহরে অবস্থানের অন্যবিধ আনুষঙ্গিক ব্যয়ের পরিমাণও বৃদ্ধি পাইয়াছে। যাতায়াতে সময়সংক্ষেপউদ্দেশ্যে না হইয়া অনেক সময়ে আরাম উপভোগের জন্য কেরাণীদিগের মধ্যে ট্রামের টিকিট বিক্রয় হইতেছে। সহরে স্বাস্থ্যরক্ষা, জলের কল, জল-সরবরাহ এবং আবর্জ্জনা-পরিষ্কারের জন্য মিউনিসিপালিটি-সমূদয়ের খরচ খুব অধিক হইয়াছে, অনেক সহরেই মিউনিসিপাল্ ট্যাক্সের পরিমাণ দুর্ব্বহ হইয়া পড়িয়াছে। তাহার পর সহরের বাড়ী-ভাড়াও বাড়িয়াই চলিতেছে। উপরন্তু সমস্ত দিন কঠোর পরিশ্রম করিয়া চাকুরীজীবিগণ বিশ্রামলাভের জন্য উৎকট আনন্দ-উপভোগের পক্ষপাতী হইতেছেন। উহাতে তাঁহাদিগের কেবলমাত্র যে অধিক ব্যয় হইতেছে তাহা নহে, নৈতিক অবস্থারও অবনতি হইতেছে। এই সমস্ত কারণে মধ্যবিত্তদিগের অবস্থা ক্রমে শোচনীয় হইয়া উঠিতেছে।

ক্রমিক সংখ্যা-হ্রাস

মধ্যবিত্তদিগের ব্যয় বাড়িতেছে, অথচ অন্ন-সংস্থানের সুবিধা হইতেছে না, সুতরাং তাঁহাদিগের পক্ষে আধুনিক চালচলন রক্ষা করা অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে। বৈষয়িক অবস্থায় যদি ক্রমোন্নতি না হয়, তাহা হইলে সমাজে হয় লোক-সংখ্যা হ্রাস পাইবে, না হয় সমাজানুমোদিত চালচলন রক্ষিত হইবে না। অধিকাংশ স্থলেই চালচলন রক্ষা করিবার জন্য সমাজের সমস্ত শক্তি ব্যয়িত হয়, লোকসংখ্যা হ্রাস পাইতে থাকে। ফ্রান্স এবং নিউ ইংলণ্ডে বৈষয়িক জীবন-সংগ্রাম ইউরোপের অন্য দেশ অপেক্ষা কঠোর হওয়াতে এই দুই দেশে লোক-সংখ্যার বৃদ্ধির অনুপাত অধিক কম। এজন্য এই দুই দেশের সমাজবিজ্ঞানবিদ্‌গণ বিশেষ চিন্তিত

হইয়াছেন। আমাদের দেশে উচ্চজাতিসমূহের সংখ্যা যে ক্রমশঃ হ্রাসপ্রাপ্ত হইতেছে তাহার প্রধান কারণ একই—আমাদের দারিদ্র্য। ইউরোপীয় সভ্যতার সংস্পর্শে আসিয়া আমাদের চালচলন উচ্চ হইয়াছে, অনেক নূতন কৃত্রিম অভাবের সৃষ্টি হইয়াছে, কিন্তু ঐ চালচলন রক্ষা, ঐ সমস্ত নূতন নূতন অভাব মোচন করিবার জন্য দেশের নূতন নূতন বৈষয়িক অনুষ্ঠানের সূচনা হয় নাই। আমাদের বৈষয়িক জীবন-প্রবাহ প্রবলতর না হইয়া বরং বৎসরের পর বৎসর ক্ষীণ হইতেছে। কাজেই সমাজ তাহার লোক-সংখ্যা বৃদ্ধি না করিয়া চালচলন রক্ষা করিবার জন্য অধিক ব্যস্ত হইয়াছে।

ধনবৃদ্ধির উপায়—বিলাসবর্জ্জন

ধনবিজ্ঞান-বিদেরা বলিয়াছেন, ধনাগমের প্রধান উপায় মূলধনবৃদ্ধি। ধনী এবং মধ্যবিত্ত-সম্প্রদায় অন্নবস্ত্রাদির অভাব মোচন করিয়া যদি বিলাস-সামগ্রীতে তাঁহাদিগের উদ্বৃত্ত ধন-ব্যয় না করেন, পরন্তু উদ্বৃত্ত ধন শিল্প-বাণিজ্য-ব্যবসা ইত্যাদিতে নিযুক্ত হয়, তাহা হইলে দেশের ধনবৃদ্ধি অতি শীঘ্রই হইবে।

ধনী এবং মধ্যবিত্ত-সম্প্রদায়ের বিলাস-বর্জ্জন, কৃষি ও ব্যবসায়-ক্ষেত্রে যোগদান এবং উদ্বৃত্ত ধন-নিয়োগ জাতীয় ধনবৃদ্ধির একমাত্র উপায়।

আধুনিক কালে আমাদের দেশে কোন্ শিল্প এবং ব্যবসায় বিশেষ লাভজনক,—ফ্যাক্টরী, ছোট কারখানা অথবা গৃহশিল্প ইহাদিগের মধ্যে কোন্ অর্থোৎপাদন-প্রণালী বিভিন্নক্ষেত্রে অবলম্বন করা কর্ত্তব্য, বহির্বাণিজ্য এবং অন্তর্বাণিজ্য দ্বারা আমাদের মধ্যবিত্তেরা কি পরিমাণ লাভ করিতে পারেন, এ সমস্ত বিষয়ের শীঘ্রই মীমাংসা না করিলে বৈষয়িক জীবনে উন্নতির আশা করা বৃথা। এই প্রবন্ধে উক্ত জটিল বিষয়গুলি আলোচনা

করা হইবে না। কিন্তু ধনোৎপাদনের আর একটি দিক্,—ধনী এবং মধ্যবিত্তদিগের বিলাস-বর্জ্জনসম্বন্ধে দুই একটি কথা বলা আবশ্যক—

পূর্ব্বে সমাজের দিক্ হইতে বিলাস-বর্জ্জনের আবশ্যকতার কথা বলা হইয়াছে। যে সমাজে অনেক লোক অন্নবস্ত্রাভাব মোচন করিতে সমর্থ নহে, সেখানে বিলাস-ভোগ নিশ্চয়ই সমাজ-নিন্দিত এবং নীতি-বিরুদ্ধ। ধনোৎপাদনের দিক্ হইতে দেখিতে গেলেও বিলাস-বর্জ্জনের উপকারিতা বেশ বুঝা যাইবে। ধনোৎপাদন-ক্রিয়ায় সমাজের অনেক শক্তি ব্যয় হয়। এই শক্তিব্যয়ের ফলে সমাজ তাহার নানাবিধ অভাব মোচন করিতে পারে। শারীরিক অভাবগুলি মোচন করিয়া সমাজ যদি ক্রমাগত নূতন নূতন কৃত্রিম অভাব সৃষ্টি করিতে থাকে, তাহা হইলে শেষে সমাজ তাহার সমস্ত শক্তি নিয়োগ করিয়াও তাহারই চিন্তাপ্রসূত অভাবগুলি মোচন করিতে সমর্থ হইবে না। বিলাসিতার,—সৌখীনতার সীমা নাই, কিন্তু সমাজের শক্তির সীমা আছে। সুতরাং ব্যক্তির মত সমাজেরও তাহার নির্দ্দিষ্ট শক্তির যথোচিত ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। বিলাসভোগে শক্তির অপব্যয় করিলে সমাজ ক্রমে দুর্ব্বল হয়।

ভোগে অশান্তি

কেবলমাত্র ধনবৃদ্ধির জন্য এবং সামাজিক জীবনে আনন্দ-ভোগের জন্যও বিলাস-দমন আবশ্যক।

পাশ্চাত্য-সমাজে অশান্তি

পাশ্চাত্য-জগতে ভোগবিলাসের আকাঙ্ক্ষা খুব বাড়িয়া গিয়াছে। এ কারণ ধনী এবং দরিদ্র সম্প্রদায়ের মধ্যে ব্যবধান খুব বেশী হইয়া পড়িয়াছে। এক দিকে কঠোর দারিদ্র্য আর এক দিকে বিলাস-ভোগের লীলাখেলা, ইহাই পাশ্চাত্যজগতের বৈষয়িক জীবনের চিত্র। অর্থের তারতম্যানুসারে পাশ্চাত্য-সমাজ বিশিষ্ট জাতিসমূহে বিভক্ত হইয়াছে।

অর্থপূজার বিপুল সমারোহের মধ্যে সমাজের ধর্ম্ম, প্রেম এবং আধ্যাত্মিকতা ক্রমশঃ লোপ পাইতেছে। প্রকৃত ধর্ম্ম নাই, এখন ধর্ম্মের ভাণ মাত্র হইয়াছে। ধর্ম্মের মহাপ্রাণ ভাবুকতা পাশ্চাত্যসমাজের আব্‌হাওয়াতে পুষ্টি-লাভ করিতে পারিতেছে না। ধর্ম্মঅভাবে সমাজে উচ্ছৃঙ্খলতা প্রবেশ করিয়াছে। পারিবারিক জীবনের প্রতি শ্রদ্ধা আর নাই, এমন কি গৃহবন্ধনের শৈথিল্যও দেখা দিয়াছে। রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও অসংযম,—রাষ্ট্রীয়-জীবন দলাদলির ভাবে বিভোর হইয়া উঠিয়াছে। দলাদলি ভুলিয়া সমগ্র সমাজের যাহা প্রকৃত অভাব তাহা চিন্তা করিবার অবসর নাই। ইহার সঙ্গে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অর্থের প্রতিপত্তিও দেখা দিতেছে।

• ইউরোপে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে সত্য, কিন্তু ধনকুবেরগণই ব্যবসা-বাণিজ্যসম্বন্ধীয় সমস্ত আইনকানুন নিয়ন্ত্রিত করিতেছেন। সমাজের চিন্তাপ্রণালীর মধ্যেও বিশেষ পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে। সাহিত্য-জগতে মহনীয় ভাব ও সত্য আর আবিষ্কৃত হইতেছে না। যে বিদ্যা অর্থকরী নহে তাহার সম্মান কমিয়া আসিতেছে। শিক্ষার উদ্দেশ্য নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক উন্নতি নহে। জীবিকার্জ্জনোপযোগী কর্ম্মশক্তির বৃদ্ধি শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য হইয়াছে।

বিজ্ঞান বিলাস-সামগ্রী প্রস্তুত করণের জন্য নিয়োজিত হইতেছে,—সমাজের বিশ্রাম-ভোগ যাহাতে সহজসাধ্য হয় এবং বিশ্রাম লাভ করিয়া সমাজ যাহাতে আপনার আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধন করিতে পারে তাহার-দিকে দৃক্‌পাত নাই। তৃপ্তির অভাব দেখা দিয়াছে। ডারুইন প্রমুখ সমাজ-তত্ত্ববেত্তারা বলিয়াছেন, বিজ্ঞানের সহিত চিত্রকলাও এখন বিলাস-উপভোগের সহায় হইয়াছে। সমাজের নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক আদর্শের সহিত তাৎকালিক চিত্রকলার যে জীবন্ত সম্বন্ধ ছিল, তাহা এখন লোপ পাইয়াছে।

বিলাস-ভোগের সহিত সমাজে সহানুভূতির অভাব দেখা দিয়াছে। ডারুইনপ্রমুখ সমাজ-তত্ত্ববেত্তারা বলিয়াছেন—সমাজ কেবলমাত্র প্রতিযোগিতার ভিতর দিয়াই উন্নতিলাভ করিতে পারে। তাঁহারা বুঝাইয়াছেন, প্রতিযোগিতার ফল সক্ষমের জয় এবং অক্ষমের পরাজয়, সক্ষমেরাই সমাজের উন্নতির পথ নির্দ্ধারণ করিয়া দেয়। এই মতই পাশ্চাত্য-জগতে সাধারণতঃ গ্রাহ্য। কিন্তু বিবর্ত্তনবাদের এই মূল তথ্যটি সমাজ-বিজ্ঞানের শেষ কথা নহে। কেবলমাত্র প্রতিযোগিতার দ্বারাই সমাজের ক্রমোন্নতি হইতে পারে না, প্রতিযোগিতার সহিত সহযোগিতাও সমাজের ক্রমবিকাশ নিয়ন্ত্রিত করে। কিন্তু পাশ্চাত্যসমাজ প্রতিযোগিতাকেই এখন সভ্যতাবিকাশের মূলমন্ত্র বলিয়া স্বীকার করিয়াছে,—সহযোগিতা সামাজিক উন্নতির কিরূপ সহায়, তাহা অনুভব করিতে পারে নাই। সুতরাং প্রতিযোগিতা এবং তাহার অবশ্যম্ভাবী ফল অনৈক্যকে বর্ত্তমানে পাশ্চাত্যজগৎ স্বাভাবিক বলিয়াই স্বীকার করিয়া লইয়াছে।

আধুনিক সমাজ-তন্ত্রবাদ

কিন্তু এই অনৈক্যের সহিত যে বিলাসভোগের উচ্ছৃঙ্খলতা এবং সমবেদনার অভাব দেখা গিয়াছে, তাহাতে অসন্তুষ্ট হইয়া আধুনিক পাশ্চাত্য-পণ্ডিতেরা এক নূতন দর্শনের সৃষ্টি করিতেছেন। তাঁহারা অনৈক্য অস্বীকার করেন। তাঁহাদের মূলতত্ত্ব ঐক্যের উপরই প্রতিষ্ঠিত—ইহার নাম সোসিয়ালিজম্ বা সমাজতন্ত্রবাদ। তাঁহারা বলেন, অনৈক্য নহে, ঐক্যই স্বাভাবিক, —পাশ্চাত্য-সমাজে শতকরা ৮০ জন এখনও স্বদেশোৎপন্ন ধনসম্পদের পাঁচ ভাগের একভাগও ভোগ করিতে পারিতেছে না, তাহার কারণ তাহাদিগের কর্ম্ম বা বুদ্ধিশক্তির অভাব নহে। তাহার কারণ ধনীরা শ্রমজীবিগণকে তাহাদিগের প্রাপ্য হইতে বঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছেন। এইরূপে কৃত্রিম

অবৈধ উপায়ে শ্রমজীবিগণকে দরিদ্র করা হইয়াছে। এই বলিয়া তাঁহারা ধনীদিগকে বিচার করিবার ভার নিজদের হাতেই লইয়াছেন। ধনীরা বিলাস-উপভোগে উন্মত্ত, তাঁহাদিগের সম্পত্তি কাড়িয়া লইয়া দরিদ্র শ্রমজীবিগণের মধ্যে ভাগ করিয়া দিতে হইবে। ইহাতে যদি তুমুল বিপ্লব উপস্থিত হইবার আশঙ্কা থাকে, তাহা হইলে অধিক পরিমাণে ট্যাক্স করিয়া ধীরে ধীরে ধনীদিগের নিকট হইতে সম্পত্তি দরিদ্রদের আয়ত্তে আনিতে হইবে। যতদিন পর্য্যন্ত দেশের সমস্ত সম্পত্তি এবং মূলধন সমাজের হস্তগত না হয়, ততদিন তুমুল আন্দোলন চালাইতে হইবে। শেষে সমাজ দেশের সমগ্র ধনসম্পত্তির অধিকারী হইয়া প্রত্যেকের অভাবানুযায়ী ধন বিতরণ করিবে। বিলাসিতা চিরকালের জন্য লোপ পাইবে। অথচ কর্ম্মশক্তিও হ্রাস পাইবে না। সমাজের সহিত ব্যক্তির সম্বন্ধ তখন আরও ঘনিষ্ঠ বলিয়া বিবেচিত হইবে। প্রত্যেকে আপনার দায়িত্ব বুঝিয়া সমাজের প্রতি আপনার কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিতে কুণ্ঠিত হইবে না। অলস হইয়া সমাজের নিকট হইতে আপনার প্রাপ্য লইতে সকলেই লজ্জিত বোধ করিবে। সমাজতন্ত্রবাদীদের ইহাই আশা। মানুষ তখন প্রকৃত মনুষ্যত্ব লাভ করিতে পারিবে,—সমাজে প্রতিযোগিতা এবং অনৈক্য থাকিবে না, ভ্রাতৃপ্রেম এবং সহকারিতা সমাজের ভিত্তি সুদৃঢ় করিয়া দিবে।

সমাজ-তন্ত্রবাদের অলীকতা

সামাজিক-জীবনে ঘোর অশান্তির ফলে এই উদ্ভট কল্পনার সৃষ্টি। সমাজে অনৈক্য না থাকিলে এক বৈচিত্র্যহীন সমতা আসিয়া সমাজকে আক্রমণ করিবে, ইহাতে সমাজ অচিরেই প্রাণহীন এবং অন্তঃসারশূন্য হইয়া পড়িবে। ইহা কখনই বাঞ্ছনীয় নহে। অধিকন্তু মনুষ্য যতদিন দেবত্বপ্রাপ্ত না হয়, ততদিন সমাজতন্ত্রবাদীদের আশা কার্য্যে পরিণত

হইবে না। প্রতিযোগিতা এবং অনৈক্য উভয়কে মানিয়াই মনুষ্য-সমাজ গঠন করিতে হইবে। কিন্তু প্রতিযোগিতা এবং অনৈক্য যাঁহাতে সমাজের মঙ্গলবিধানে প্রযুক্ত হয়, তাহার উপায় নির্দ্ধারণ করিয়া দিতে হইবে।

হিন্দুসমাজে ঐক্য ও অনৈক্যের সমন্বয়

আমাদের পুরাতন সমাজ বিভিন্ন আশ্রম এবং অধিকারভেদ সৃষ্টি করিয়া একদিকে প্রতিযোগিতা রক্ষা এবং অপর দিকে গোষ্ঠীর প্রভাবকে প্রবল রাখিয়াছিল। ইহার ফলে সমাজ ব্যক্তিত্বকে রক্ষা করিয়া উহার সহিত গোষ্ঠীজীবনের সামঞ্জস্য বিধান করিতে পারিয়াছিল। একদিকে ব্যক্তিত্ব বিকাশ, অপরদিকে সামাজিক জীবনে শৃঙ্খলা-বিধান, হিন্দু-সমাজের ইহাই উদ্দেশ্য ছিল। হিন্দুসমাজের এ আদর্শ এখন লুপ্তপ্রায়। মুসলমান-বিজয়ের পর হিন্দুসমাজের ক্রমোন্নতির পথ রুদ্ধ হইয়াছে। এই কারণে হিন্দুসমাজের আদর্শগুলি পরিস্ফুট হইতে পারে নাই। এই কারণেই হিন্দুর জাতি, কুল এবং ধর্ম্ম ক্রমশঃ ব্যক্তিগত হইতেছে, সমাজে গোষ্ঠী-জীবনের প্রভাব লোপ পাইতেছে। বিশাল সামাজিকত্বের আদর্শ ত্যাগ করিয়া হিন্দু এখন বাহ্য আচার-ব্যবহার এবং কার্য্য-কলাপের বিশিষ্টতা সৃষ্টি করিয়া সমতাস্থাপন এবং গোষ্ঠীর প্রভাব রক্ষা করিতে প্রয়াসী হইয়াছে। ইহাতে পদে-পদে অকৃতকার্য্য হইতেছে। আধুনিক কালে বৈষয়িক জীবন-সংগ্রাম দিনে-দিনে যতই কঠোর হইতেছে, ততই আচারমূলক সামাজিক ব্যবস্থা হীনবল হইয়া পড়িতেছে। বিশিষ্ট আচার-ব্যবহার এখন হিন্দুজাতির মধ্যে সমতা স্থাপন করিতে পারিতেছে না। আধুনিক হিন্দু-সমাজ-বন্ধনকে অগ্রাহ্য করিতেছে, সমাজ-বিরুদ্ধ ব্যক্তিত্ব এখন পুষ্টিলাভ করিতেছে। হিন্দুসমাজের ক্রমবিকাশ এখন ঠিক বিপরীত দিকে হইতেছে। হিন্দুসমাজ অহিন্দু হইতে চলিয়াছে।

হিন্দুসমাজের বাণী

কিন্তু এককালে হিন্দু-সমাজই সাম্য ও বৈষম্যের মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া আমাদের বৈষয়িকজীবনে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য এবং ধর্ম্মজীবনে শান্তি এবং আনন্দ আনিয়া দিয়াছিল। হিন্দুসমাজ প্রতিযোগিতা রাখিয়াও স্বৈরাচার ও অসংযমের শাস্তিবিধান করিয়াছিল, অধিকার-ভেদ মানিয়াও স্বার্থপরতা এবং উচ্ছৃঙ্খলতাকে দমন করিয়াছিল। হিন্দুসমাজ অনৈক্যকে বরণ করিয়াছিল, কিন্তু প্রেম এবং ভাবুকতার দ্বারা বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে সদ্ভাব, সমতা ও প্রকৃত ঐক্য প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিয়াছিল। আধুনিক ধনবিজ্ঞানবিদ্‌গণ বিলাসবিষ-জর্জ্জরিত পাশ্চাত্যজগতে ঐক্যমূলক সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করিয়া সমাজের ঘোর অশান্তি দূর করিবেন বলিয়া যে আশার কথা প্রচার করিয়াছেন, তাহা বাস্তবিকই পাগলের পাগলামি। অনৈক্যকে না মানিয়া সমাজগঠন করা অসম্ভব। অনৈক্যকে মানিতেই হইবে, অথচ অনৈক্য যাহাতে অত্যাচার ও নির্য্যাতনে পরিণত না হয়, তাহার প্রতি-বিধান করিতে হইবে। এই কথা পাশ্চাত্যজগতে প্রচারিত হওয়া আবশ্যক।

বিংশ শতাব্দীতে হিন্দু-সমাজ এই কথাই পাশ্চাত্য জগতের নিকট প্রচার করিবে। ঐ কথা প্রচারিত না হইলে পাশ্চাত্য-জগতের দুঃখ এবং অশান্তির অবসান হইবে না। শান্তি চাই, স্বস্তি চাই। বিলাস-অর্চ্চনার নিষ্ফল আয়োজনের ভারে প্রপীড়িত পাশ্চাত্য সভ্যতার অন্তঃস্থল হইতে দীনতার করুণ ক্রন্দন বিশ্বদেবতার চরণে পৌঁছিয়াছে। তাই বিশ্বজগতের সর্ব্বত্র নূতন জীবনের আয়োজন চলিতেছে। হিন্দুসমাজ ঐক্য ও অনৈক্য, সাম্য ও বৈষম্য, ভোগ ও ত্যাগের সমন্বয় সাধন করিয়া এক নূতন জীবনের অমৃত-মন্দাকিনী-ধারা ধাতার কমণ্ডলু হইতে মর্ত্ত্যে আনয়ন করিবে। আমরা আমাদের জাতীয় জীবনের সেই ভবিষ্যৎ সার্থকতার আশায় রহিলাম।

শ্রীরাধাকমল মুখোপাধ্যায়।

হিন্দু-মুসলমানসম্বন্ধে চিন্তার কতিপয় জলবিম্ব

বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনীতে হিন্দু মুসলমানকে ও মুসলমান হিন্দুকে চিনিতে চেষ্টা করা একটী অবশ্য কর্ত্তব্যকার্য্য। পুরাতন ঐতিহাসিকতত্ত্ব, প্রত্নতত্ত্ব যাহা আজি সাহিত্যিকগণের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়া আছে, তাহার সমস্ত তত্ত্বেই হিন্দু মুসলমানের কীর্ত্তি ও স্মৃতি বিজড়িত রহিয়াছে। ভারতবর্ষে খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে মুসলমান প্রবেশ-লাভ করিয়াছে। স্বীয় বাহুবলে মুসলমান প্রবেশাধিকার লাভ করিয়া ভারতবর্ষকে নিজের করিয়া লইয়াছিল। পুনরায় নিজের জন্মভূমিতে ফিরিয়া যাইবার ইচ্ছা পরিত্যাগ করিয়া পুরুষ-পুরুষানুক্রমে ভারতবর্ষকে স্বকীয় করিয়া লইয়াছিল। কেবল তাহাই নহে, এসিয়াবাসী মুসলমান ভারতবর্ষের অধিবাসিগণকে অস্পৃশ্য, ঘৃণ্যজাতি মনে না করিয়া তাহাদের সঙ্গে রীতি-মত সম্বন্ধ পাতাইয়া পুত্রকন্যাগণের আদান-প্রদান পর্য্যন্ত চালাইয়াছিল।

এ দিকে যেমন সৌধরাজেশ্বরী তাজমহল, মতি-মসজিদ, দেওয়ান-খাস, দেওয়ান-ই-আম, আদিনা, সেকান্দ্রা নির্ম্মাণ করাইয়া জগৎসমক্ষে মুসলমান তাহার উন্নত ও প্রশস্ত-হৃদয়, অগাধ সৌন্দর্য্যজ্ঞান, জগৎ-উন্মাদ-কারী কীর্ত্তি স্থাপন করিয়াছিল, তেমনি ব্যবহারে ভক্তি ও ভালবাসার প্রস্রবণ ছুটাইয়া সমগ্র ভারতবাসীকে আপন করিয়া ফেলিয়াছিল। সাধে কি ভক্তি ও ভালবাসা-পরিপ্লুত "দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা" ধ্বনি দরবার সভায় সমুত্থিত হইয়াছিল। পলিসি অথবা কূটশাসননীতি সে সময় হিন্দু কিম্বা মুসলমানের হৃদয়কে নিয়মিত করিয়াছিল না, যাহা কিছু তাহাদের হৃদয়ের কথা তাহাই আমরা এই সুদূর ভবিষ্যতে শুনিতে পাইতেছি। আবুলফজল-ফৈজীর সংস্কৃতভাষা-চর্চ্চা, সংস্কৃতের হিতোপদেশ-পুথি আরবী ভাষায় কালিয়া-দামনা গ্রন্থে পর্য্যবসিত হইয়া মুসলমান-জগৎকে দেখাইয়াছে

যে স্বাতন্ত্র্য মুসলমান-ধর্ম্মের রীতি অথবা নীতি নহে। তাহা যদি না হইত, তাহা হইলে মুসলমান অ্যাটলান্টিক মহাসাগর হইতে প্রশান্ত মহাসাগর পর্য্যন্ত স্বীয় প্রাধান্ত বিস্তার করিয়া বহু শতাব্দী ধরিয়া সে প্রাধান্ত বজায় রাখিতে ও সেই প্রাধান্তের সাহায্য জগৎবাসীগণের নিকট পাইতে সক্ষম হইত না। হাফেজ, উমর খইউম, সাদি, মৌলাবায়, আধ্যাত্মিক জগতে যে আলোড়ন উৎপাদন করিয়া গিয়াছেন, তাহা আজি পর্য্যন্ত চিন্তা-সমুদ্রে লহরীলীলা দেখাইতেছে এবং সভ্যজগৎ যত দিন অক্ষুন্ন থাকিবে তত দিন দেখাইবে। বিশেষতঃ ভারতবর্ষের পশ্চিমপ্রান্ত হইতে পূর্ব্ব প্রান্ত পর্য্যন্ত প্রদেশসমূহ মুসলমানের কীর্ত্তি-কলাপ দ্বারা মুখরিত রহিয়াছে।

ইস্লামের একেশ্বরবাদ, মাদকদ্রব্য বর্জ্জনব্যবস্থা, ও ভ্রাতৃভাব শিখ-ধর্ম্মের প্রধান ভিত্তিস্তম্ভ। গুরু নানক মুসলমানধর্ম্ম-গুরুগণের 'সা' উপাধিতেই প্রথিত হইয়াছেন।

যুক্তপ্রদেশেও মহামতি কবিরশাহ হিন্দু ও মুসলমানধর্ম্মকে একই সূত্রে গ্রথিত করিতে চেষ্টা করিয়া কবিরপন্থী ধর্ম্মের সৃষ্টি করিয়াছেন। এ ধর্ম্মেরও বীজমন্ত্র ইসলামের জগজ্জনীন ভ্রাতৃভাব। শাহ নানক ও কবিরের অনুসরণ করিয়া বহু সাধুগণ মুসলমান ধর্ম্ম দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া হিন্দু-ধর্ম্মকে মুসলমান ধর্ম্মমতের যোগে এক করিয়া নূতন নূতন ধর্ম্মমত প্রবর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন।

তৎপর ইংরেজাধিকারের প্রাক্কালে মহাত্মা রামমোহন রায় ইসলাম-ধর্ম্মগ্রন্থ কোরানশরিফ এবং হিন্দুধর্ম্মের বেদ-উপনিষদ্ আদি-মন্থন করিয়া যে অমৃত সংগ্রহ করিয়াছিলেন তাহারই ফলে 'লা এলাহা ইল্লেল্লা' জগদীশ-বাণীর প্রতিরূপ একমেবাদ্বিতীয়ম্ শ্লোকের উদ্ধার করিয়া হিন্দু ধর্ম্মকে জগৎবাসীর সমক্ষে অতি উচ্চে স্থাপিত করিয়াছেন। রামমোহন

রায়ের আরবী পারসী ভাষায় জ্ঞান এত গভীর ছিল যে, মুসলমান মৌলবী-গণই তাঁহাকে মৌলবী রামমোহন রায় বলিয়া অভিহিত করিতে সঙ্কোচ প্রদর্শন করেন নাই। এই গভীর জ্ঞানই মুসলমানধর্ম্মের ভাণ্ডার হইতে রামমোহন রায়ের নিমিত্ত খোলা ছিল, তাহারই ফলে ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রবর্ত্তন।

উপরের লিখিত ধর্ম্মমতগুলির প্রবর্ত্তনে ভারতবর্ষীয় হিন্দুভ্রাতাগণের যে আধ্যাত্মিক উন্নতির কারণ হইয়াছে তাহা বোধ হয় সকলেই স্বীকার করিবেন এবং সেজন্য ইসলাম যে কার্য্য করিয়াছে তাহা বোধ হয় সকলেই বিদিত আছেন। ইসলামের নিকট ভারতবর্ষীয় হিন্দু এত ঋণী থাকা সত্বেও প্রত্যেক নাটক-নভেল দেখিতে পাইয়াছিলাম। মুসলমানকে সমস্ত অপকর্ম্মের কর্ত্তা এবং অতীব ঘৃণ্য ও অস্পৃশ্যজাতীয় মানব বলিয়া পরিকীর্ত্তিত করিয়াছেন। মোগলসম্রাট্গণ ভোগবিলাস-লালসায় নিমজ্জিত বিশাল সাম্রাজ্যের একচ্ছত্র অধীশ্বরগণ হিন্দু গ্রন্থকার-গণের হস্তে অশীতি বৎসরের অথর্ব্ব, অর্ব্বাচীন জ্ঞানহীন ক্রীড়াপুত্তলীর ন্যায় জীবন অতিবাহিত করিয়াছেন বলিয়া লাঞ্ছিত। বঙ্গীয় সাহিত্য বঙ্গীয় মুসলমানগণের জন্য আগ্নেয়গিরির অগ্নিস্রোত বর্ষিত হইয়াছে। মুসলমান যদি সাহিত্য-চর্চ্চার নিমিত্ত সেই সাহিত্যক্ষেত্রে বিচরণ করিতে অগ্রসর হয়, তবে অগ্নিস্রোতের জ্বালায় তাহাদের পদতল ও হৃদয় এবং শরীর ঝলসাইয়া যায়। এজন্যই মুসলমানগণের দুর্ণাম রটিয়াছে যে, বাঙ্গলার মুসলমানগণ বঙ্গীয় সাহিত্যচর্চ্চা হইতে বিরত। সুখের বিষয় বঙ্গীয় সাহিত্যিকগণের মতিগতি অনেকটা সংযমিত হইয়াছে। মুসলমানকে কৃষ্ণবর্ণে রঞ্জিত করা বড় প্রশংসার কার্য্য বলিয়া এখন সাহিত্যিকগণ আর ভাবেন না। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মুসলমানের সহিত সহানুভূতি দেখাইয়া স্বদেশপ্রিয়তার কোনও নিয়ম লঙ্ঘন করিয়াছেন বলিয়া মনে করেন নাই, সেজন্য মুসলমানগণ তাঁহাদিগের

প্রশংসা করিতেছেন। সাহিত্য-সম্রাট্ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় হইতে আরম্ভ করিয়া সেদিন যে অমর কবি হঠাৎ ইহধাম বিস্মৃত হইয়া ধরাতলে লুণ্ঠিত হইয়াছেন, সকলেই তাঁহাদের অনেকগুলি মুসলমান পুরুষকে অমবিস্তর কলঙ্ককালিমায় অপ্রিয়দর্শন করিয়াছেন। মুসলমান সাহিত্যিক-গণ সে কথা হিন্দুভ্রাতাগণকে না বলিলে তাঁহাদের কর্ত্তব্য-কার্য্যের ত্রুটী হয় বলিয়া বিবেচনা করি। অল্পদিন হইতে মুসলমান সাহিত্যিকগণ শিক্ষা করিয়াছেন যে, বাঙ্গলাভাষা কেবল বাঙ্গালী হিন্দুরই মাতৃভাষা নহে। বাঙ্গালী মুসলমানগণেরও মাতৃভাষা এবং যদিও ভদ্র মুসলমানগণের মধ্যে সামাজিক ভদ্রতা রক্ষা করার নিমিত্ত উর্দ্দূভাষা ব্যবহার করা হয়, কিন্তু সুখে-দুঃখে রোগে-তাপে বাঙ্গালা ভাষাতেই হৃদয়ের মর্ম্মবেদনা সমুত্থিত হইয়া থাকে। সেজন্য আজি-কালিকার পাশ্চাত্য-শিক্ষা মুসলমানকে বাঙ্গালা সাহিত্যচর্চ্চার নিমিত্ত প্রবুদ্ধ করাইয়াছে। অল্পদিন হইল, ভারত-বাসীর চিন্তাস্রোতের গতি কতক ফিরিয়াছে। এখন নিজের স্বার্থ লইয়া ব্যস্ত থাকা ইষ্টের কারণ নহে বলিয়া অনেকে বুঝিতে পারিয়াছেন। হিন্দু-মুসলমান স্বার্থ স্বার্থ করিয়া মাতিয়া থাকিলে কাহারই মঙ্গলকর নহে, ইহা কেহ কেহ বুঝিতে পারিয়াছেন। এই চক্ষু ফুটিলে মুসলমান বহুশতাব্দী ধরিয়া যে উপকার করিয়া আসিয়াছে, তাহাও হিন্দু ক্রমে ক্রমে স্মরণ করিবে। তখন মুসলমানকে যে গালাগালি করিয়াছে তজ্জন্য লজ্জিত হইবে। মুসলমানও বুঝিতে পারিবে যে শত শত বহিতে যে মুসলমানবিদ্বেষ উদ্গীরিত হইয়াছে, তাহা ভ্রমপ্রমাদ মাত্র। মুসলমান বহুশতাব্দী ধরিয়া ভারতবর্ষের অধিবাসী হওয়াতে হিন্দুর সমান অধিকারী হইয়াছে। হিন্দু যেমন আর্য্যদিগের দোলমঞ্চ হইতে ভারতবর্ষে আসিয়া অনার্য্যদিগকে তাড়াইয়া স্বীয় আধিপত্য স্থাপন করিয়াছিল—মুসলমানও তাহাদিগের পথেরই অনুসরণ করিয়াছিল। এখন উভয় জাতিই ভারতবর্ষের অধিবাসী।

ঘটনাচক্রে উভয়ে একই রাজার প্রজা—উভয়েরই স্বার্থ সমান। ভারতবর্ষের উন্নতি ও ভারতবর্ষের অধিবাসিগণের উন্নতি হিন্দু-মুসলমান উভয়েরই তুল্যরূপে বাঞ্ছনীয়। ইংরেজ কবি স্ত্রীজাতি ও পুরুষজাতিসম্বন্ধে যে কথা বলিয়াছেন আমরা হিন্দু-মুসলমানসম্বন্ধে সে কথা প্রয়োগ করিতে পারি—

> "The one's cause is thc others
> They rise or sink together
> Dwarfed or God-like bond or free"

মৌলবী ইয়াকুমুদ্দিন আহম্মদ

পল্লীচিত্র

হে আমার পল্লীভবন, তোমার স্মৃতি আমার প্রাণে-প্রাণে বিজড়িত। তোমার সুখ-স্মৃতি আমার অনেক দুঃখ-যন্ত্রণা দূর করে, ঘোর দুর্দ্দিনে, গভীর কাতরতার মধ্যেও হৃদয়ে অতুল আনন্দ-ধারা ঢালিয়া দিয়া আমাকে ক্ষণকালের জন্য বিশুদ্ধ প্রেমের স্রোতে ভাসাইয়া লইয়া যায়। হে আমার জন্মপল্লি, আমার শৈশবের মাতৃক্রোড়, তোমার শ্যামল-বক্ষে, কত বার কত আনন্দে বাল্য-ক্রীড়া-কৌতুকে স্বর্গসুখ অনুভব করিতাম, তোমার বনফল সুধাফল বলিয়া সঙ্গীগণ সঙ্গে কাড়াকাড়ি করিয়া খাইতাম। এখন রাজভোগে সে আনন্দ কই, সে মধুরতা কোথায়। মানুষের জীবন-পল্লীতে, কায়া-নগরে, হৃদয়-পল্লী-ভবনে, মস্তকনগর-হর্ম্ম্যে, ধর্ম্ম-পল্লীবাসীর কুটীরদ্বারে প্রহরী, নাগরিকের অট্টালিকায় ভিখারী। মানবজাতীয় জীবনের প্রথম সামগান পল্লীকুটীর হইতে, মানবের প্রথম প্রেমতান পল্লীর নিকুঞ্জ হইতে—মানবের স্বর্গের সোপান পল্লী-পথ হইতে উত্থিত। পৃথিবী-দর্শনাকাঙ্ক্ষী দেবকুমারগণ প্রথমে পল্লী-কুটীরেই

আতিথ্য-স্বীকার করিয়াছিলেন। তাই পল্লীর শুষ্ক নদীও প্রেম-প্রবাহিণী, পল্লীর বনতরু কল্পতরু, পল্লীর শ্যামল-প্রান্তর কমলার লীলাভূমি। পল্লীর বনফল সুধামাখা।

সেই প্রাচীন বদরীবৃক্ষ ডালে ডালে কত সুখ-স্মৃতি গাঁথিয়া রাখিয়াছে। যখন বৃক্ষে আরোহণ করিতে অসমর্থ ছিলাম, তখন ঐ বৃক্ষটীকে কত আপনার জন বলিয়া কত মধুর-সম্ভাষণে একান্ত আপনার জনের ন্যায় জ্ঞান করিয়া কখনও বা প্রেমভরে কখনও বা অভিমানে সুপক্ব অম্লমধুর বদরীফল প্রার্থনা করিয়াছি। বায়ু-সঞ্চালনে বা বিহঙ্গ-চঞ্চুতাড়নে স্খলিত ফল পাইয়া অতিথি-বৎসল বৃক্ষকে প্রাণ ভরিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়াছি। যদি ঐ বৃক্ষকে কল্পবৃক্ষ না বলিব তবে কি কাল্পনিক স্বর্গের অদৃষ্ট, অলৌকিক, অপ্রাকৃত বৃক্ষকে কল্পবৃক্ষ বলিয়া ধন্য হইব।

পথপ্রান্তে জয়মণির বটবৃক্ষ। কোন্ অতীত কালে জয়মণি কোন শোকনিবারণ জন্য এই বৃক্ষ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল, তাহা ঐতিহাসিক লিপিবদ্ধ করে নাই, কবি কোন কাহিনাতে গায় নাই, কিন্তু জয়মণি এই পুণ্যফলে শান্তিধামে অনন্ত সুখভোগ করিতেছে। এই পথ-তরু জয়মণির কীর্ত্তিস্তম্ভরূপে, ভক্তিমান্ পুত্ররূপে আপন প্রতিষ্ঠাত্রী দেবীর যশোকীর্ত্তন করিতে করিতে মায়ের মায়ার মত ছায়া বিস্তার করিয়া পথিকের ক্লান্তি দূর করিয়া আপনি ধন্য হইতেছে। অর্থব্যয় ব্যতীত পুণ্যার্জ্জনের কোন পন্থা নাই বলিয়া যাহাদের ধারণা, তাহারা এই বৃক্ষ-মূলে বসিয়া বৃক্ষ-জীবনের পুণ্য-কাহিনী অবগত হইয়া পুণ্যার্জ্জনের নূতন পথ শিক্ষা করিয়া ধন্য হউন। কোন্ শুভ-মুহূর্ত্তে কোন্ ক্লান্ত পথিকের ঘর্ম্মাক্ত কলেবর-নিরীক্ষণে জয়মণির কোমল-হৃদয়ে করুণার ধারা প্রবাহিত হইয়াছিল, সেই অমৃতোপম স্নেহরসে সিক্ত করিয়া জয়মণি এই পুত্রসম পথতরু প্রতিষ্ঠিত করিয়া ধন্য হইয়াছিল তাহা কে বলিবে? ধন্য জয়মণি!

আজিও তোমার পাদপ-পুত্র, মনুষ্য, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ সকলকে সমভাবে শান্তিদান করিতেছে, এবং তোমার অক্ষয় সদাব্রতের পুণ্যদ্বার উন্মুক্ত রাখিয়াছে। যদি পরকাল থাকে, যদি পাপ-পুণ্যের জন্য তিরস্কার-পুরস্কার থাকে, তবে এই পথতরুর স্থাপয়িত্রী নিশ্চয় পরকালে অতুল আনন্দ উপভোগ করিতেছে। অয়ি মা, বঙ্গপল্লি, তোমার সন্তান-সন্ততি যেমন পরদুঃখে কাতর, বোধ হয় আর কোন দেশের সন্তান সেরূপ নাই। বঙ্গপল্লির ধূলিকণা তীর্থধূলী, পঙ্কিল জল তীর্থ-সলিল, প্রত্যেক তরু কল্পতরু।

ঐ ক্ষুদ্র নদী এখনও আঁকিয়া বাঁকিয়া কৃষক-ক্ষেত্রের নিকট দিয়া ধীরে ধীরে বহিয়া যাইতেছে। কত বর্ষায়, কত গ্রীষ্মে উহার স্রোতে পা ঢালিয়া দিয়া সাঁতার কাটিতাম, শরীর শীতল হইত, প্রাণ জুড়াইত। অনেক দিন জলকেলি করিতে করিতে চক্ষু রক্তবর্ণ হইত, শরীর শীতল হইয়া আসিত, তবু ক্লান্তি নাই, শ্রান্তি নাই, কেবল নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ। তখন এই নদীবক্ষ মাতৃবক্ষ বলিয়া অনুমিত হইত। পল্লীর ক্ষুদ্রনদী, স্নেহভরা মা আমার, যখন তোমার কূলে বটের মূলে ছুটাছুটী খেলিয়া ক্লান্ত হইতাম, তখন করপুটে তোমার জলপান করিয়া শান্ত হইতাম। স্বর্গের প্রান্তরে প্রান্তরে শত মন্দাকিনী বহিয়া যাউক, দেববালকগণ তাহাতে আনন্দ-কোলাহলে দেবক্রীড়া করুক, চাইনা আমি সে স্বর্গের সুখ, তুমি আমার শান্তি-বিধায়িনী, তুমিই আমার মোক্ষ-দায়িনী। তোমার ক্রোড়ে নয়ন মুদিয়া তোমার সলিলের অণুতে অণুতে দেহের প্রতি অণু মিশাইতে পারিলে ধন্য হইব। সেই আমার স্বর্গ, সেই আমার মুক্তি।

ওগো পল্লী-রমণি, জগজ্জননীর প্রতিমা, পাঠের অবকাশে বা খেলার অবসরে যখনই ক্ষুধার্ত্ত হইয়া সঙ্গীসহ তোমার সমীপে উপনীত হইয়াছি, তখনই তুমি মায়ের মত আপন-পর বিচার না করিয়া যত্নে রক্ষিত পল্লী-ফলমূল, মোয়া-মুড়ি দ্বারা আমাদের নানা ভোগ যোগাইতে। যেন

সকলেই তোমার সন্তান, সকলের জন্যই তোমার স্নেহ শতমুখী গঙ্গাধারা। আমরা যেন ব্রজবালক, তুমি যেন আমাদের মা যশোদা।

ঐ যে গ্রাম্য ভোগের মধ্যে স্নেহমাখা তাহা নাগরিক ভোগে কোথায়? সে স্নেহ-মাধুরী স্বর্গে কল্পনা করা যাইতে পারে, প্রকৃতপক্ষে পল্লীতেই উপভোগ করা যায়।

ওগো পল্লীলক্ষ্মি, তুমি মানবজাতির আদি-জননী, যে শৈশবে তোমার স্নেহ-সরোবরে অবগাহন করিবার অবসর পায় নাই, সে নিতান্ত অধম, তাহার শিক্ষা অসম্পূর্ণ রহিয়া গিয়াছে। তাহার প্রেমের পূর্ণ বিকাশ হয় নাই, হৃদয় সঙ্কীর্ণ রহিয়া গিয়াছে।

যখন পল্লীকুটীর-দ্বারে অপরাহ্ণ-ছায়া গড়িয়া পড়ে, পল্লীবধূ বৈকালিক গৃহ-কার্য্যে রত থাকে, ঘুঘুগুলি পুরবীতে বিভূগীতি গাইতে আরম্ভ করে, তখন বাহির-আঙ্গিনায় ভাগবত বা মহাভারত খুলিয়া পল্লীবৃদ্ধ মধুরস্বরে পাঠ আরম্ভ করেন, ধর্ম্মে ঢাকা ভক্তি মাখা হৃদয় লইয়া পল্লীর নর-নারী একে একে আসিয়া আঙ্গিনায় উপনীত হয়, পড়িতে পড়িতে বৃদ্ধ তন্ময়, শুনিতে শুনিতে শ্রোতৃবৃন্দ সংসারের জ্বালা-যন্ত্রণা হইতে বিমুক্ত, তাহারা যেন সুখদুঃখের অতীত কোন এক অজানা আনন্দধামে উপনীত। শুনিয়াছি, স্বর্গে বৃহস্পতি বেদগান করেন দেবসভায়। শুনেন দেবরাজ ইন্দ্র ও তাঁহার অমাত্যবর্গ। সেখানে পাপী-তাপীর স্থান নাই। তাই প্রাণ ঐ দেবসভা উপেক্ষা করিয়া পল্লীসভার দিকে ধাবিত হয়, চায় না প্রাণ বৃহস্পতির বেদধ্বনি শুনিতে, চায় প্রাণপল্লী বৃদ্ধের চরণতলে বসিতে। এখানে পুণ্যাত্মা ও পাপীর প্রভেদ নাই। এখানে পাপ-তাপ জুড়াইবার অবসর আছে, ইন্দ্রের সভায় পুণ্যাত্মার ভোগ-সময় শেষ হইয়া পুণ্যক্ষয় হয়, পল্লীসভায় পাপ বিদূরিত হইয়া অক্ষয় পুণ্য সঞ্চিত হয়।

দেবতার দুয়ারে ভিখারী, কেহ শিবত্ব, কেহ বিষ্ণুত্ব, কেহ ব্রহ্মপদ লাভের আশায়। রাজদ্বারে ভিখারী কেহ বা অর্দ্ধেক রাজত্ব কেহ বা রাজকন্যালাভের প্রত্যাশায়। নগরে নানা বিষয়ের খাতা লইয়া প্রার্থী উপস্থিত, কিন্তু পল্লীকুটীরদ্বারে অভাবের ভিখারী মুষ্টিভিক্ষায় তুষ্ট। নাগরিক লজ্জার খাতিরে চাঁদার খাতায় দস্তখত করিবার সময় বুঝিয়া বাক্স চাবি হারাইয়া ফেলে। আর পল্লীদুয়ারে ভিক্ষুক উপনীত হইলে তিন বৎসরের মেয়েরাও তাহার দুঃখে কাতর। পল্লীভাণ্ডার দরিদ্রের জন্যই উন্মুক্ত, তাই করুণাময়ী বালিকা ভিক্ষা দিতে উৎসুক।

আবার বিকালে হরিনাম করিতে করিতে ভিক্ষুক উপস্থিত, নাম বিলাইয়া যাইতেছে, অযাচিতভাবে যে যাহা দান করিয়াছে তাহাতেই সন্তুষ্ট। এমন অযাচিতভাবে নাম-গান, এমন অকাতরে ইহপরকালের সম্বলবিলীন, এমন অকুণ্ঠিতভাবে ভিক্ষা-দান দেবের দুর্লভ বঙ্গেই সম্ভব।

বঙ্গের পল্লীতে মুষ্টিভিক্ষার প্রচলনে বঙ্গের গৃহে গৃহে অন্নপূর্ণার আবির্ভাব সূচিত হয়, কোথায় আছে পৃথিবীর এমন প্রচলন, যাহা কোটীপতির অর্থ-সাহায্যে অসম্ভব, মুষ্টিভিক্ষায় দরিদ্র পল্লীবালা তাহা সম্ভব করিয়া রাখিয়াছে। ধন্য পল্লী, ধন্য তোমার অধিবাসী।

ভারতের সভ্যতা পল্লী হইতেই উপ্ত হইয়া, পল্লী হইতেই বিশালতা লাভ করিয়াছিল। দয়ার আধার বুদ্ধদেব রাজকুলে জন্মিয়া রাজগৃহে লালিত-পালিত হইয়াও, পল্লীতেই আপন অলৌকিক প্রতিভায় লোকশিক্ষায় ধরা ধন্য করিয়াছিলেন। শঙ্করের অবতার শঙ্করাচার্য্য পল্লী হইতেই স্বীয়-মত প্রচার করিয়া ভারতবাসীর হৃদয়ে ধর্ম্মভাব জাগরূক করিয়াছিল। এই বঙ্গপল্লী হইতেই জয়দেব, চণ্ডিদাস বঙ্গভূমি মুখরিত করিয়াছিল। কাশীদাস, কৃত্তিবাস প্রভৃতি লোকশিক্ষকগণ আপন আপন মঙ্গলগানে বঙ্গভূমি পবিত্র করিয়াছেন, বঙ্গ-পল্লীই বাঙ্গালীর মহাতীর্থ, বঙ্গের এমন

পল্লী নাই, যেখানে কোন মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়া তাহা ধন্য করে নাই। ইতিহাসে তাহার প্রমাণ না থাকিলেও পথতরু, পান্থশালা, দেবমন্দির, জলাশয় প্রভৃতি একদিকে পল্লী-মহাজনের কীর্ত্তিস্তম্ভরূপে বিরাজিত, অন্য-দিকে নামহীন গ্রাম্যকবির কাহিনীতে কথঞ্চিৎ ব্যক্ত। পল্লীর কত সাধু, কত মহাত্মা, বন-যূথিকার ন্যায় আপনি পরিমল বিস্তার করিয়া ঝরিয়া পড়িয়াছে কে বলিবে?

এখানে অভাব আছে, অশান্তি নাই, দান আছে, ঘটা নাই। পরোপকার আছে, আড়ম্বর নাই। সহানুভূতি আছে, অহঙ্কার নাই। আতিথেয়তা আছে, প্রত্যাখ্যান নাই। অনেক ছিল, অনেক গিয়াছে। এখনও যাহা আছে, তাহা বঙ্গ-পল্লীতেই অবিকৃত অবস্থায় আছে।

ওগো আমার স্বদেশবাসি, যদি বাঙ্গালায় স্বর্গসুখ আনিতে চাও, যদি বাঙ্গালীর মুখে হাসি, বুকে আশা, হৃদয়ে প্রেম, কুটীরে শান্তি, বাহুতে বল আনিতে চাও, তবে একবার পল্লীর দিকে ফির। পল্লীতে গোবিন্দের দোলে ফাল্গুনে বঙ্গপল্লী ছেলা-খেলায় শ্রীকৃষ্ণের লীলাভূমি করিয়া তোলে, যেখানে জাতীয় মহোৎসব দুর্গোৎসবের উপলক্ষে ভেদা-ভেদ ভুলিয়া সার্ব্বজনীন প্রেমের মধুরতা বহিয়া যায়। যে পল্লীর পঞ্চায়ত-সভায়, সামাজিকতায়, পূজায়, পার্ব্বণে, কথকতায়, পুরাণপাঠে, শ্মশানে, রাজদ্বারে, বৃক্ষস্থাপনে, জলাশয়-প্রতিষ্ঠায়, অতিথিসৎকারে মুষ্টি-ভিক্ষায়, রামায়ণ, কবিকঙ্কণ গানে, যাত্রা, কবি, হুলী, সারী জারী প্রভৃতি স্বল্প-ব্যয়, আমোদ-প্রমোদে সভ্যতার প্রাণপ্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। সেই পল্লীর শিক্ষার দিকে দৃষ্টিপাত করুন। যেখানে উচ্চবংশে সন্তান শিক্ষার অভাবে স্বার্থপর ও নীচমনা হইতেছে, নীচবংশ ও দরিদ্রসন্তান পঙ্কত্বপ্রাপ্ত হইতেছে, তাহার শিক্ষার দিকে দৃষ্টিপাত করুন। যেভাবে পল্লীর শিক্ষা চলিয়া আসিতেছে, সেই পক্ষেই তাহাদের শিক্ষার বিধান করিতে হইবে;

আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রাচীন পুরাণ একত্র করিয়া সরল ভাষায় পল্লী-বাসীকে শিক্ষা না দিলে সাহিত্যের অঙ্গ অসম্পূর্ণ রহিয়া যাইবে।

বঙ্গের পল্লীশিক্ষা বিশেষরূপে সুসম্পন্ন হইলে, আবার বঙ্গ পল্লী-ভবন আনন্দভবনে পরিণত হইবে। শত শত রামকৃষ্ণ, চৈতন্য, নিত্যানন্দ, চণ্ডিদাস প্রভৃতি আবার বঙ্গপল্লী হইতে জন্মগ্রহণ করিয়া লোকশিক্ষায় ধরা ধন্য করিবে। বঙ্গপল্লী স্বর্গে পরিণত হইবে। বঙ্গপল্লীর নিরক্ষর নিরন্ন দরিদ্র কৃষক ও শিল্পীর হৃদয়ে সরলতা ও পবিত্রতা বিরাজ করিতেছে, তাহা শতগুণে বর্দ্ধিত হইয়া বঙ্গপল্লীকে দেবপল্লীতে পরিণত করিবে।

শ্রীমাধবচন্দ্র পোদ্দার।

আয়ুর্ব্বেদোক্ত শস্ত্র-নির্ম্মাণ

গত বৎসর (১৯১২) জুন মাসে আমি নিম্নলিখিত পত্রখানি বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সম্পাদক মহাশয়কে লিখিয়াছিলাম।

মান্যবর সাহিত্য-পরিষদ্-সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু—

সবিনয় নিবেদন,

অদ্য আপনার নিকট যে প্রস্তাব লইয়া উপস্থিত হইতেছি, তাহা অনেক দিবস হইতে আমি ভাবিয়া রাখিয়াছি, কিন্তু এ বিষয়ে নিজের অক্ষমতা-জ্ঞানে এতদিনে প্রস্তাবটি কার্য্যে পরিণত করিতে পারি নাই। কয়েক বৎসর ধরিয়া আমি আয়ুর্ব্বেদে রসায়ন-শাস্ত্রের কথঞ্চিৎ আলোচনা করিতেছি, সেই উপলক্ষে আয়ুর্ব্বেদের অন্যান্য বিভাগও অল্পবিস্তর পাঠ

করিয়া থাকি। আয়ুর্ব্বেদবিদ্যার্থিমাত্রেই সুশ্রুতের অতি বিস্তৃত অস্ত্র-চিকিৎসা (Surgery) পাঠ করিয়া মুগ্ধ না হইয়া থাকিতে পারেন না। সুশ্রুতে ১২৪ প্রকার বিভিন্ন প্রকারের যন্ত্র ও শস্ত্রের উল্লেখ আছে। উহারা কোন্ কোন্ দ্রব্যের দ্বারা প্রস্তুত হইবে, আকারে কত বড় ও উহাদের ব্যবহার বিস্তৃত ও বৈজ্ঞানিকভাবে বর্ণিত আছে। বড়ই আক্ষেপের বিষয় এই যে, প্রাচীন ভারতের গৌরবস্থল এই শস্ত্র-চিকিৎসা অধুনা ভারত হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়াছে; একণে দেশীয় শস্ত্র-চিকিৎসা অজ্ঞ নরসুন্দরবর্গের হস্তে গিয়া পড়িয়াছে। পুনরায় শস্ত্র-চিকিৎসা দেশের আয়ুর্ব্বেদ-ব্যবসায়ীদিগের মধ্যে প্রচলিত করিবার জন্য কি কি উপায় অবলম্বন করা যাইতে পারে তাহাই একণে বিচার্য্য।

অবশ্য প্রথম ও প্রধান উপায় হইবে বৈজ্ঞানিকভাবে আয়ুর্ব্বেদীয় কলেজ স্থাপন করা ও তথায় বৈজ্ঞানিক শস্ত্র-চিকিৎসা আয়ুর্ব্বেদ-বিদ্যার্থী-দিগকে শিক্ষা দেওয়া। এইরূপ বৃহৎ ব্যাপারে দেশের সমগ্র শক্তির সমবায় প্রয়োজন হইবে। আমাদের মত অবসর ও সামর্থ্যবিহীন ব্যক্তির এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করা আদৌ ফলদায়ক হইবে না।

আমার মনে হয় যে, এই শস্ত্র-চিকিৎসা আয়ুর্ব্বেদ-ব্যবসায়ীদিগের মধ্যে প্রচলিত করার দ্বিতীয় উপায় হইতে পারে—আয়ুর্ব্বেদোক্ত বিভিন্ন যন্ত্র ও শস্ত্রের নমুনা প্রস্তুত করিয়া প্রকাশ্য প্রদর্শনীতে প্রদর্শন করা। অন্ততঃ এইরূপ নমুনা প্রস্তুত করার একটা বৈজ্ঞানিক দিক্‌ও আছে, এবং সেইজন্য সাহিত্য-পরিষদ্‌কে এই বিষয়ে পত্র লিখিতে সাহসী হইলাম। আমার অনেকদিন হইতে মনে হইতেছে যে, আমি নিজেই সুশ্রুত ও বাগ্‌ভটের প্রধান প্রধান শস্ত্রের দুই সেট করিয়া নমুনা প্রস্তুত করিয়া এক সেট সাহিত্য-পরিষদে ও আর এক সেট এসিয়াটিক-সোসাইটির মিউজিয়মে প্রেরণ করি। এই সকল শস্ত্রের কয়েকটি চিত্র বিভিন্ন গ্রন্থে দেখিতে

পাই। গণ্ডালের ঠাকুর সাহেব কৃত "History of the Aryan Medical Science" গ্রন্থে ২৮টি শস্ত্রের সুন্দর চিত্র আছে। Dr. Wise কৃত "Commentary on the Hindu System of Medicine" নামক গ্রন্থেও অনেকগুলি ছবি আছে। কবিরাজ নগেন্দ্রনাথ সেনের সুশ্রুতের বঙ্গানুবাদেও অনেকগুলি চিত্র দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু কোন গ্রন্থে সকলগুলির চিত্র দেওয়া দেখিতে পাই নাই। আমি নিজে আয়ুর্ব্বেদ-ব্যবসায়ী নহি। এ ক্ষেত্রে এই প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করিবার অধিকার আমার নিজের নাই বলিয়া মনে করি ও সেইজন্য সাহিত্য-পরিষদের বিজ্ঞানশাখার অন্তর্ভুক্ত বলিয়া এই প্রস্তাব সাহিত্য-পরিষদে প্রেরণ করিতে সাহসী হইলাম।

আমার মনে হয় নিম্নলিখিত উপায়ে এই বিষয়ে কার্য্য আরম্ভ করা যাইতে পারে।

(১) পরিষদ্ প্রথমে আয়ুর্ব্বেদ-ব্যবসায়ী ও অন্যান্য ইচ্ছুক ব্যক্তিদিগকে লইয়া একটি কমিটি নির্ব্বাচিত করিতে পারেন। আমি এই কমিটির মধ্যে কার্য্য করিতে স্বীকৃত আছে।

(২) এই কমিটি নিম্নলিখিত কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিবেন :—

(ক) যাবতীয় প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত আয়ুর্ব্বেদীয় যন্ত্র ও শস্ত্রের বিবরণ ও চিত্র-সঙ্কলন করা।

(খ) কোন্ কোন্ ধাতুর দ্বারা প্রত্যেক যন্ত্র বা শস্ত্র নির্ম্মিত হইবে ও প্রত্যেকটির আকার ও মাপ কিরূপ হইবে তাহা নির্ণয় করা।

(গ) তাহাদের মধ্যে কোন্ কোন্ অস্ত্রের নমুনা প্রস্তুত করা প্রয়োজন তাহা নির্দ্ধারণ করা। দৃষ্টান্ত স্বরূপ "শলাকা" ত্রিশ প্রকার আছে। উহার মধ্যে হয়ত ৩।৪ টির নমুনা প্রস্তুত করিলেই যথেষ্ট হইবে। এই কমিটির কার্য্য ছয় মাসের মধ্যে শেষ হওয়া উচিত। তাহার পর

Bengal Chemical & Pharmaceutical Worksএ বা দেশীয় অন্য কোন কারখানে দুই সেট করিয়া নমুনা (অন্ততঃ ১ সেট) প্রস্তুত করিয়া প্রকাশ্য প্রদর্শনীতে প্রদর্শন করা যাইতে পারে। পরিষদ্‌ যদি এই কার্য্য গ্রহণ করেন, তাহা হইলে আমি উহার ব্যয়কল্পে ১০০৲ টাকা প্রদান করিতে স্বীকৃত আছি। এই কার্য্যে এক বা দুই শত টাকার বেশী খরচ হইবে না বলিয়া আমার বিশ্বাস। এ সম্বন্ধে পরিষদের ইচ্ছা জ্ঞাপন করিলে বাধিত হইব। ইতি ভবদীয় শ্রীপঞ্চানন নিয়োগী

ইহার উত্তরে পরিষৎ আমাকে জানান যে আমার প্রস্তাব পরিষদ্‌ কর্ত্তৃক অনুমোদিত হইয়াছে এবং প্রস্তাবটি কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য ১৩১৯ সালের ১৬ই আষাঢ়ের পরিষদের কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতেতে নিম্ন-লিখিত ব্যক্তিগণকে লইয়া এক শাখা-সমিতি গঠিত হইয়াছে।

১। কবিরাজ শ্রীযুক্ত দুর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্রী
২। " " যোগেন্দ্রনাথ সেন এম্‌ এ, বৈদ্যরত্ন
৩। " " গণনাথ সেন এম্‌ এ, এল্‌-এম্‌-এস্‌
৪। " " যামিনীভূষণ রায় এম্‌ এ, এম্‌ বি
৫। " " দক্ষিণারঞ্জন রায় চৌধুরী এল্‌-এম্‌-এস্‌
৬। " " শীতলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
৭। ডাক্তার " জ্ঞানেন্দ্রনাথ কাঞ্জিলাল
৮। " পি, সি, রায়, ডি এস্‌ সি, পি, এচ, ডি, সি আই, ই
৯। " পঞ্চানন নিয়োগী এম্‌ এ
১০। " মনোহর দাস বিশারদ
১১। " বনওয়ারীলাল চৌধুরী বি এ, বি, এস্‌ সি

(সম্পাদক)

সেই পত্রে আমি আরও জ্ঞাত হই যে, যথাসম্ভব শীঘ্র এই শাখা-সমিতির অধিবেশন আহূত হইবে। কিন্তু আজ প্রায় এক বৎসর অতীত হইল, এই শাখা-সমিতির একটিও অধিবেশন হয় নাই। এই বিষয় এই সম্মিলনে উপস্থিত করিবার আমার উদ্দেশ্যে এই যে, প্রকাশ্য সভায় এ বিষয়ের কথঞ্চিৎ আলোচনা হইলে এই বিষয়ে শাখা-সমিতির মনোযোগ আকৃষ্ট হইতে পারে। আয়ুর্ব্বেদোক্ত বিবিধ শস্ত্রনির্ম্মাণসম্বন্ধে আমার বক্তব্য পত্রখানিতেই ব্যক্ত করিয়াছি। এখানে এ সম্বন্ধে বেশী কিছু বলিবার নাই। যদি কেহ মনে করেন যে, এই সকল শাস্ত্রের নমুনা প্রস্তুত-ক্রিয়া আয়ুর্ব্বেদ-ব্যবসায়ীদিগের মধ্যে শস্ত্রবিদ্যার প্রচলনকল্পে সহায়তা করিবে না, আমি তাঁহাদিগের দৃষ্টি শস্ত্রনির্ম্মাণ-ক্রিয়ার বৈজ্ঞানিক দিক্‌টার প্রতি আকর্ষণ করিতে ইচ্ছা করি। প্রাচীন ভারতের চিন্তা-শক্তির এই অমূল্য নিদর্শন দেশ হইতে বহুদিন লোপ পাইয়াছে, কিন্তু তাই বলিয়া এই সকল শস্ত্রের কিরূপ আকার, গঠন ও ক্রিয়া ছিল তাহা কি এ জন্মে কেহ প্রত্যক্ষ করিতে পাইবে না? এই কার্য্য আমার মত অনভিজ্ঞ ব্যক্তির দ্বারা নিষ্পন্ন হইলে সুষ্ঠুভাবে নিষ্পন্ন হইবে না, পূর্ব্বোক্ত অভিজ্ঞ শাখা-সমিতি কর্ত্তৃক নিষ্পন্ন হইলে উহা সর্ব্বজনগ্রাহ্য হইবে। এই ভরসায় আমি দেশের অভিজ্ঞ জনসাধারণের ও উপরোক্ত শাখা-সমিতির দৃষ্টি পুনরায় এই বিষয়ের প্রতি আকৃষ্ট করিতে ইচ্ছা করি। যদি প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে আমি আরও ১০০৲ টাকা আমার পরিচিত ব্যক্তি ও বন্ধু-বান্ধবগণের মধ্য হইতে তুলিয়া দিব স্বীকার করিতেছি।

পরিশেষে গত বৈশাখের "ভারতী" হইতে মৎপ্রণীত "সুশ্রুত" নামক প্রবন্ধ হইতে "সুশ্রুতোক্ত অস্ত্রচিকিৎসা" অংশ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম, পাঠক-পাঠিকা ইহা হইতে [illegible] শস্ত্রবিদ্যার কথঞ্চিৎ পরিচয় পাইবেন।

সুশ্রুতোক্ত অস্ত্র-চিকিৎসা

(১) শিক্ষা

সুশ্রুত অস্ত্রচিকিৎসা আট ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন—(১) ছেদ্যক্রিয়া (কোন অঙ্গছেদন করা), (২) ভেদ্যক্রিয়া (কোন স্থান ভেদ করা), (৩) লেখ্যক্রিয়া (কোন স্থানের চর্ম্ম উত্তোলন করা), (৪) বেধ্যক্রিয়া (দূষিত রক্তাদি বাহির করিয়া দিবার জন্য শিরাদি ভেদ করা), (৫) এষ্যক্রিয়া (নালীঘা, বাঘী প্রভৃতি রোগে ক্ষতাদির পরিমাণ অন্বেষণ করা), (৬) আহার্য্যক্রিয়া (অশ্মরী প্রভৃতি রোগোদ্ভূত দ্রব্যাদি বাহির করা), (৭) বিস্রাব্যক্রিয়া (স্রাব উৎপাদন করা), ও (৮) সীবন (সেলাই করা)। চিকিৎসকে অস্ত্রক্রিয়াদি কর্ম্মে পারদর্শিতা লাভ করিতে হইলে শাস্ত্র অধ্যয়ন করিলেই চলিবে না, অস্ত্রাদির দ্বারা প্রকৃতরূপে ছেদনাদি অস্ত্র-ক্রিয়া বহুদিবস ধরিয়া অভ্যাস করিতে হইবে। কিরূপ কৌতূহলোদ্দীপক উপায়ে গুরুশিষ্যকে বিবিধ অস্ত্রক্রিয়া শিক্ষা দিতেন, তাহার অভ্যাস নিম্নে প্রদত্ত হইল।—

১। ছেদ্যক্রিয়া (incision)—কুমড়া, লাউ প্রভৃতি দ্রব্যকে ছেদন করিয়া অঙ্গচ্ছেদনাদির প্রণালী শিক্ষা করিতে হইবে।

২। ভেদ্যক্রিয়া (puncturing)—চামড়ার থলি, মৃত পশুর প্রস্রাবের থলি বা চামড়ার থলির মধ্যে জল ও কর্দম পুরিয়া তাহা ভেদ করিয়া ভেদ্যক্রিয়া শিক্ষা করিতে হইবে।

৩। লেখ্যক্রিয়া (scratching)—মৃত পশুর লোমযুক্ত চর্ম্ম আঁচড়াইয়া শিক্ষা করিবে।

৪। এষ্যক্রিয়া (probing)—ঘুণধরা বাঁশ বা কাঠ, অথবা শুষ্ক লাউর মুখে অস্ত্র প্রবেশ করাইয়া এষ্যক্রিয়া শিক্ষা করিবে।

৫। আহার্য্য (extraction)—কাঁঠাল প্রভৃতি ফলের মজ্জা এবং মৃত পশুর দন্তে যন্ত্র প্রবেশ করাইয়া এই ক্রিয়া শিক্ষা করিবে।

৬। বিস্রাব্যক্রিয়া (evacuating fluids)—মোমের দ্বারা পূর্ণ একখানি সিমুলকাষ্ঠে যন্ত্র প্রবেশ করাইয়া রক্তপূঁজাদি স্রাব করিবার প্রণালী শিক্ষা করিবে।

৭। সীব্যক্রিয়া (sewing)—বস্ত্র বা নরম চর্ম্ম সূচীদ্বারা সেলাই করিয়া সীব্যক্রিয়া শিক্ষা করিতে হইবে।

৮। বেধ্যক্রিয়া (boring)—মৃত পশুর শিরা বা পদ্মের ডাঁটা বিঁধিয়া বেধ্যক্রিয়া শিক্ষণীয়।

৯। বন্ধনকার্য্য (bandage)—বস্ত্রাদির দ্বারা নির্ম্মিত পুরুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বন্ধন করিয়া বন্ধনকার্য্য শিক্ষা করিবে। কোমল মাংসপেশী বা পদ্মের ডাঁটা বন্ধন করিয়া সন্ধিবন্ধন শিক্ষা করিবে।

১০। ক্ষার ও অগ্নিকার্য্য (cautery by caustics and fire)—মৃত পশুর কোমল মাংসখণ্ডের উপর ক্ষার ও অগ্নি প্রয়োগ করিয়া শিক্ষা করিতে হইবে।

১১। বস্তিকার্য্য (catheterisation)—জলপূর্ণ কলসীর প্রান্তভাগ ছিদ্র করিয়া তাহার স্রোতে এবং লাউর মুখদেশে বা সেইরূপ অপর দ্রব্যে পিচকারী প্রয়োগ করিয়া বস্তিক্রিয়া শিক্ষণীয়।

এইরূপে অস্ত্রক্রিয়া সম্যক্‌রূপে শিক্ষা করিবার পর চিকিৎসাকার্য্যে অভ্যাস ও দক্ষতালাভ করিলে চিকিৎসক চিকিৎসাকার্য্যে প্রবৃত্ত হইবেন। অস্ত্র প্রয়োগ করিবার পূর্ব্বে চিকিৎসক তৎকর্ম্মোপযোগী যন্ত্র, অস্ত্র, তুলা, বস্ত্রখণ্ড, সূত্র, পাখা, শীতল ও উষ্ণজল প্রভৃতি দ্রব্য ও উপযুক্ত সবল পরিচারক সংগ্রহ করিবেন। মূঢ়গর্ভ, উদর, অর্শ, অশ্মরী, ভগন্দর ও মুখরোগে অস্ত্র করিতে হইলে রোগীর আহারের পূর্ব্বে অস্ত্র-ক্রিয়া সম্পাদন

করিতে হইবে। চিকিৎসক বিশেষ সতর্কতার সহিত অস্ত্র প্রয়োগ করিবেন, যেন সূক্ষ্ম শিরা ও স্নায়ু কাটিয়া না যায়। অস্ত্র করিবার পর অঙ্গুলির দ্বারা পূঁযরক্ত বাহির করিয়া দিয়া নিমপাতাদি কষায় দ্রব্যের জলে বেশ করিয়া ক্ষতস্থান ধৌত করিয়া দিবেন। পরে তিল বাটা, মধু ও ঘৃতমিশ্রিত করিয়া পলিতা বা বস্ত্রখণ্ড মাখাইয়া ক্ষতমধ্যে পুরিয়া দিবেন ও তদুপরে মসিনার পুলটিশাদি দিয়া তিন চারি পর্দ্দা কাপড়ের দ্বারা শক্ত করিয়া বাঁধিয়া তিন দিবস অতিবাহিত হইলে ক্ষতের বন্ধন খুলিয়া পুনরায় নিমপাতাদির কষায়জলে ধৌত করিয়া ঔষধাদি দিয়া পুনরায় বাঁধিয়া দিবেন। এইরূপ যতদিবস ক্ষত বেশ শুকাইয়া না যায় ততদিবস ধৌত করিয়া ঔষধ ও মলম লাগাইয়া দিবেন।

(২) যন্ত্র

অস্ত্র-প্রয়োগকল্পে সুশ্রুত ১২৫ প্রকার অস্ত্রের উল্লেখ করিয়াছেন। সেগুলি আবার দুই ভাগে বিভক্ত—যন্ত্র ও শস্ত্র। যন্ত্র সর্ব্বসমেত ১০১টি, ও শস্ত্র ২৪ প্রকার। যন্ত্রের মধ্যে হস্তই প্রধানতম যন্ত্র, কারণ হস্ত ভিন্ন অন্য যন্ত্রই প্রয়োগ করা যায় না। যন্ত্রগুলি আবার ছয়ভাগে বিভক্ত—(১) স্বস্তিক যন্ত্র (চব্বিশ প্রকার); (২) সন্দংশ যন্ত্র (দুই প্রকার), (৩) তাল যন্ত্র (দুই প্রকার), (৪) নাড়ীযন্ত্র (বিংশতি প্রকার), (৫) শলাকাযন্ত্র (আটাইশ প্রকার) ও (৬) উপযন্ত্র (পঁচিশ প্রকার)। এই সকল যন্ত্র লৌহ বা স্বর্ণাদি পাঁচটি ধাতুর দ্বারা নির্ম্মিত হইত। আবশ্যকমত অন্যপ্রকার যন্ত্রাদি প্রস্তুত করিবার ব্যবস্থাও সুশ্রুত দিয়া গিয়াছেন।

১। স্বস্তিকযন্ত্র—অষ্টাদশ অঙ্গুলি দীর্ঘ এবং দুই খণ্ড লৌহ একটি খিল দ্বারা আবদ্ধ। সিংহ, ব্যাঘ্র, মৃগ প্রভৃতি দশ প্রকার পশুর ও কাক,

চিল, শকুনি প্রভৃতি চতুর্দ্দশ প্রকার পক্ষীর, সর্ব্বসমেত চব্বিশ প্রকার জন্তুর মুখের সাদৃশ্যে চব্বিশ প্রকার স্বস্তিযন্ত্র নির্ম্মিত হইত। হাড়ের মধ্যে বাণ বা কোন প্রকার শল্য বিদ্ধ হইলে তাহা বাহির করিবার জন্য স্বস্তিকযন্ত্রই ব্যবহৃত হইত।

২। সন্দংশ যন্ত্র—ষোল অঙ্গুলি দীর্ঘ। এক প্রকার সন্দংশ যন্ত্র কর্ম্মকারের সাঁড়াশীর মত ও অপরটি ক্ষৌরকারের সন্নার মত। চর্ম্ম, মাংস, শিরা ও স্নায়ু হইতে ক্ষুদ্র শল্য বা কণ্টক বাহির করিবার জন্য সন্দংশ যন্ত্র ব্যবহৃত হইত।

৩। তাল যন্ত্র—বার অঙ্গুলি দীর্ঘ। কর্ণ-নাসিকাদির ভিতর হইতে মলাদি বাহির করিবার জন্য ব্যবহৃত হইত।

৪। নাড়ীযন্ত্র—নানা আকারে নির্ম্মিত ও নানা কার্য্যে ব্যবহৃত হইত। অর্শোযন্ত্র, অঙ্গুলিত্রাণ-যন্ত্র প্রভৃতি নাড়ীযন্ত্রের রূপান্তর।

৫। শলাকাযন্ত্র—আটাইশ প্রকার—শলাকাযন্ত্র বিভিন্ন-কার্য্যে ব্যবহৃত হইত বলিয়া নানা আকারে নির্ম্মিত হইত।

(৩) শস্ত্র বা অস্ত্র

সুশ্রুত শস্ত্র বা অস্ত্র বিংশতি প্রকার বলিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন—(১) মণ্ডলাগ্র, (২) করপত্র, (৩) বৃদ্ধি, (৪) নখশস্ত্র, (৫) মুদ্রিকা, (৬) উৎপলপত্র, (৭) অর্দ্ধধার, (৮) সূচী, (৯) কুশপত্র, (১০) আটীমুখ, (১১) শারীরমুখ, (১২) অন্তর্মুখ, (১৩) ত্রিকূর্চ্চক, (১৪) কুঠারিকা, (১৫) ব্রীহিমুখ, (১৬) আরা, (১৭) বেতসপত্রক, (১৮) বড়িশা, (১৯) দন্তশঙ্কু, (২০) এষণী।

এই সকল অস্ত্র ছেদক্রিয়া, ভেদক্রিয়া, এষণক্রিয়া, সীবন প্রভৃতি পূর্ব্বোক্ত অষ্টপ্রকার অস্ত্রপ্রয়োগক্রিয়ায় প্রয়োজনানুসারে ব্যবহৃত হইত।

সকল অস্ত্র উৎকৃষ্ট লৌহের দ্বারা নির্ম্মিত, তীক্ষ্ণধারবিশিষ্ট, উত্তমরূপে ধরিবার উপায় বিশিষ্ট ও দন্তবিহীন হওয়া আবশ্যক। অস্ত্রসকলের ধার ভেদে মসূরকলায়ের ন্যায় স্থূল হইতে অর্দ্ধচুল প্রমাণ সূক্ষ্ম হওয়া আবশ্যক। অস্ত্রের ধার সমান রাখিবার জন্য অস্ত্র শিমূলকাঠের খাপে রক্ষিত হইত এবং অস্ত্রে শান দিবার জন্য মাষকলাইয়ের রংবিশিষ্ট প্রস্তর ব্যবহৃত হইত।

কিরূপ দুরূহ অস্ত্রচিকিৎসার উপদেশ সুশ্রুত দিয়া গিয়াছেন, দৃষ্টান্তস্থলে আমরা গর্ভস্থিত মৃতসন্তান ছেদন করিয়া বাহির করিবার প্রক্রিয়া এস্থলে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম—"গর্ভস্থ মৃতসন্তান হস্ত-সাহায্যে বাহির করিতে না পারিলে অস্ত্র দ্বারা ছেদন করিয়া বাহির করিতে হইবে। কিন্তু সন্তান যদি জীবিত থাকে, তাহা হইলে কদাচ অস্ত্রপ্রয়োগ করিতে নাই, কারণ তাহাতে গর্ভিণী ও সন্তান উভয়েরই মৃত্যু হইয়া থাকে। গর্ভস্থ মৃতসন্তান বাহির করিতে হইলে, গর্ভিণীকে আশ্বাস-প্রদানপূর্ব্বক মণ্ডলাগ্র বা অঙ্গুলি-শস্ত্র দ্বারা প্রথমতঃ গর্ভের মস্তক বিদীর্ণ করিবে, এবং শঙ্কু (আকর্ষণী) যন্ত্রের দ্বারা খণ্ড খণ্ড খর্পরগুলি বাহির করিয়া, পরে বক্ষঃ ও কক্ষদেশ ধরিয়া নিষ্কাশিত করিবে। যদি মস্তক বিদীর্ণ করিতে না পারা যায়, তাহা হইলে অক্ষিপুট বা গণ্ডদেশ ধরিয়া বাহির করিতে হয়। গর্ভস্থ সন্তানের স্কন্ধদেশ অপত্যপথে আবদ্ধ হইলে, সেই স্কন্ধসংলগ্ন বাহু ছেদন করিতে হয়। গর্ভস্থ বালকের উদর, দৃতি অর্থাৎ ভিস্তীর ন্যায় বায়ুপূর্ণ থাকিলে, তাহা চিরিয়া অন্ত্রসমূহ আগে বাহির করিবে। ইহাতে গর্ভস্থ দেহ শিথিল হইয়া পড়ে, সুতরাং তখন অনায়াসেই বাহির করিতে পারা যায়। জঘন-দেশ দ্বারা অপত্যপথ অবরুদ্ধ হইলে, জঘনদেশের অস্থিখণ্ডসকল ছেদন করিয়া নিষ্কাশিত করিবে।......মৃতগর্ভ ছেদন করিয়া বাহির করিতে হইলে, মণ্ডলাগ্র নামক অস্ত্রই প্রয়োগ করা উচিত; ইহাতে তীক্ষ্ণাগ্র বৃদ্ধিপত্র অস্ত্র প্রয়োগ করিতে নাই; করিলে গর্ভিণীকে আঘাত লাগিতে

পারে।" হায়! অধুনা আয়ুর্ব্বেদ-ব্যবসায়িগণের নিকট গর্ভস্থ মৃত-সন্তানের ছেদনের কল্পনাও আকাশকুসুমরূপে প্রতীয়মান হইয়া থাকে, এমন কি তাঁহারা মণ্ডলাগ্র বা অন্য প্রকার অস্ত্র কখনও স্বচক্ষে দেখেন নাই! এমন দিন কি আসিবে না যখন আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসায় আবার উন্নত অস্ত্রচিকিৎসা স্বকীয় উচ্চ-আসন গ্রহণ করিতে সমর্থ হইবে?

শ্রীপঞ্চানন নিয়োগী